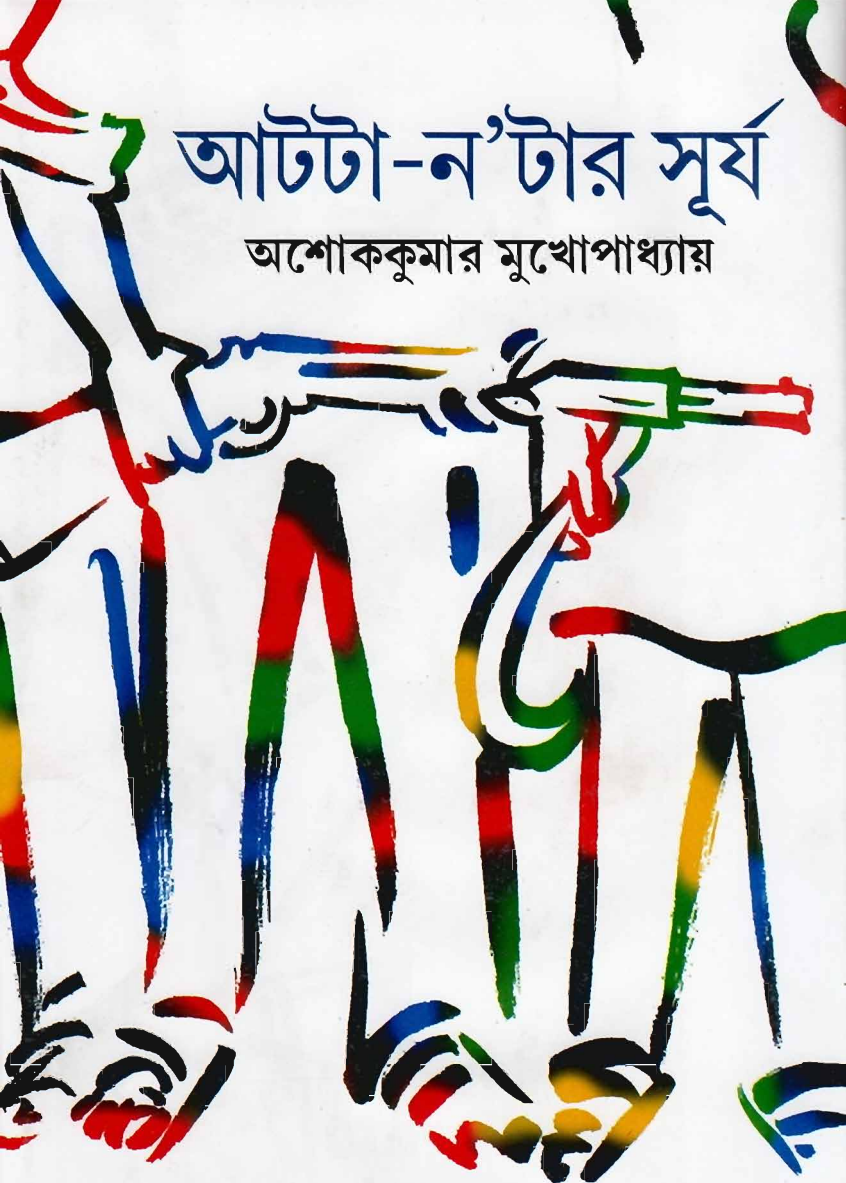


আটটা-ন'টার সূর্য

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়



১৯৬৩-২০১০ সময়কালের পটভূমিতে
 লেখা এই আখ্যানে ইতিহাসের পরম্পরার
 সমান্তরালে বয়ে যায় সম্পর্কের পুণ্যতোয়া।
 এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির ফতোয়া মেনে
 না-নেবার কারণে কলেজ-অধ্যাপক সুকান্তির
 সম্পর্ক চুকে গিয়েছিল দলের সঙ্গে। তারপর
 ১৯৬৭। নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে
 নকশালবাড়িতে অভ্যুত্থান। ১৯৬৯-এ নতুন
 কমিউনিস্ট পার্টির উন্মেষ হলে সুকান্তি আবার
 যুক্ত হন সমাজ বদলাবার কর্মকাণ্ডে। সুকান্তির
 সূত্রে চলে আসে সদ্য-যুবক নিরুপম-চিরন্তনের
 দল। মগরার দ্রোণাচার্য আর পাঞ্চালীর গভীর
 প্রেম। দ্রোণের কবিতা, দয়িতা আর বিপ্লব
 একাকার। পাঞ্চালীও সেই রক্ত-ঝরা পথে।
 দ্রোণের বাবা নিবারণ জীবনকে ভালোবাসেন।
 হিসাবের খাতা থেকে বৃক্ষ, প্রতিটির মধ্যে তিনি
 প্রাণ খুঁজে পান। কথা বলেন তাঁরই প্রতিবিশ্বের
 সঙ্গে। অত্যাচারী পুলিশের লালবাজারে বিরল
 ব্যতিক্রমী সাব-ইন্সপেক্টর কনকেন্দু।
 নকশালদের ওপর তার উর্ধ্বতনের কুৎসিত
 নির্যাতনে সে সায় দিতে পারে না। আবার
 অস্বীকারও করতে পারে না। দ্বন্দ্বৈ ক্ষতবিক্ষত
 হয়ে যায়। কলকাতায় নিরুপমের সঙ্গে পরিচয়
 হয়েছিল পাঞ্চালীর। পরবর্তীতে গুলিবিদ্ধ
 নিরুপমের শুষ্কায় অন্য মাত্রা পায় দ্রোণ-হারা
 পাঞ্চালীর সেই সম্পর্ক। প্রতিটি চরিত্রের
 হৃদয়ভরা ভালোবাসা। ভালোবাসার তীব্রতায়,
 স্বপ্নের মাধুর্যে এরা কখন যেন একে অপরের
 আত্মজন হয়ে যায়। এক অদৃশ্য গ্রন্থিতে জুড়ে
 যায় নিবারণ-সুকান্তি-দ্রোণ-পাঞ্চালী-নিরুপম।
 তাদের কেউ মারা গেলেও স্বপ্ন মরে না। সেই
 স্বপ্ন যে বুলেট-প্রুফ!

আটটা-নটার সূর্য

আটটা-নটার সূর্য

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়



দে'জ পাবলিশিং

কলকাতা ৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীমতী তিলোত্তমা মজুমদার
সুজ্ঞনেষু,

কৃতজ্ঞতা

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, দেবদত্ত গুপ্ত, অদिति বসু
রায়, অমিতাভ রায়, স্বপন দাসাধিকারী, কিশোরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন, দেবাশিস
ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার ঘোষ, অভিজিৎ মজুমদার, অনিতা মজুমদার, মধুমিতা মজুমদার,
নীহার রায়, জ্যোতি রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, শংকর রায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক চন্দ, অরুণ
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম চক্রবর্তী, সুরজিত সেন, লিয়াকত আলি, জিৎ
চৌধুরী, কল্লোল দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু খাঁড়া এবং দেবাশিস পাঠক।

৩৭৩ই ৭৭৭ রাখা ভাল, যদিও এই আখ্যায়িকার প্রতিটি অধ্যায় এগিয়েছে ইতিহাসের পটভূমিতে, ৩৭ এই গ্রন্থ নকশালবাড়ি আন্দোলনের কোনও ইতিহাস-বই নয়, সেই দারুণ সময়ে প্রচলিত সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব আর দেখা, না-দেখা বিভিন্ন ঘটনার নির্ভরে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাস। যেখানে তথ্যের সঙ্গে মিশেছে নিখাদ কল্পনা।

এই আখ্যানে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের গমনাগমন থাকলেও, তাঁদের চলনের নিরানব্বই ভাগ কাল্পনিক। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে আঁচে-আন্দাজে চেনা মানুষের আভাস পাওয়া গেলে, তাদেরও কল্পনাপ্রসূত ধরে নেওয়াই ভাল। কারণ সেইটাই সত্য।

দশ বছর আগে একদিন যখন নকশালপন্থী রাজনীতি নিয়ে তথ্য-উপন্যাস লেখার কথা মনে আসে, ভাবা যায় নি তা এত বড়সড় আকার নেবে। তখন কেন্দ্রে শুধু চারু মজুমদার। পরবর্তীতে তার সঙ্গে যোগ হয় কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ। ক্রমশ আরও চরিত্র ভিড় জমাতে শুরু করে। ছুটে বেড়াতে হয় নানান জায়গায়, বিশেষত জলপাইগুড়ি আর হুগলি জেলায়। নোটখাতা ভরে ওঠে তথ্য। কতরকম যে বিচিত্র মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হয়! এদের প্রত্যেকের জীবন নিয়ে এক-একটি আখ্যান হতে পারে। তাদের দু-একজনের নাম রয়ে গেল ‘কৃতজ্ঞতা’ তালিকায়, যার প্রথম নামটি কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর এবং আরো কয়েকজনের জীবন, ব্যক্তিত্বের কিছু জলছাপ রয়ে গেল এই উপন্যাসের ‘পাঞ্চালী’ চরিত্রে।

নকশালবাড়ির প্রেক্ষাপটে শুধু নয়, তার তত্ত্ব নিয়ে উপন্যাস পাঠকের ভাল লাগবে? আশঙ্কা ছিল। বন্ধু ঋতুপর্ণ ঘোষের আনুকূল্যে ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে সংবাদ প্রতিদিন দৈনিকের ‘রোববার’-এ রচনাটি ধারাবাহিক ছাপা হতে থাকে। দেড় বৎসরাধিক কাল ধরে যা চলেছে। এই সময় জুড়ে কত অজানা, অচেনা পাঠক যোগাযোগ করে অযাচিত উৎসাহ দিয়েছেন, ভাবলে আপ্তভূত লাগে। ভরসাও পাওয়া যায়। এঁদের দু-একজনের সং-পরামর্শ মেনে কিছু কিছু পরিমার্জনাও করেছি।

চারু মজুমদারের পুত্রকন্যার সৌজন্যে পাওয়া গেছে স্ত্রী লীলাকে কারাগার থেকে লেখা তাঁর চারটি চিঠি। সময়কাল ১৯৬৩-৬৬। অপ্রকাশিত এই পত্রগুলির অংশবিশেষ এই রচনায় উদ্ধৃত। সেসবের কাঁচিছাঁটা হয়ে শিলিগুড়ির মহানন্দপাড়ার বাড়িতে পৌঁছনো চিঠিগুলির প্রতিলিপি এই বইয়ে দেওয়া গেল।

শেষ করবার আগে কৃষ্ণাদি এবং ঋতুপর্ণ ছাড়াও আরও তিনজনের কথা বলতেই হবে। প্রথমত দে'জ-এর শুভঙ্কর (অপু) দে। যার আন্তরিক আগ্রহে এই বই প্রকাশিত। দ্বিতীয় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমন্তদাকে অনুরোধ মাত্রই উনি এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে দ্বিধাহীন সম্মতি জানিয়েছেন। এবং লিখেছেন। তৃতীয়জন আমার স্ত্রী শোভনা মুখোপাধ্যায়, যে আমার লেখার সময়টি অবাধ রাখতে সচেষ্ট ছিল। ধারাবাহিক চলবার সময় অকুণ্ঠ মতামতও জানিয়ে গেছে। এদের সবাইকেই আন্তরিক ধন্যবাদ।

২০ জুলাই ২০১৩
কলকাতা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

PRISONER'S LETTER

45-1563

श्री

1. The family name is [unclear]
 2. The family name is [unclear]
 3. The family name is [unclear]
 4. The family name is [unclear]
 5. The family name is [unclear]
 6. The family name is [unclear]
 7. The family name is [unclear]
 8. The family name is [unclear]
 9. The family name is [unclear]
 10. The family name is [unclear]

1. 2002-03-24 10:00 AM
2. 2002-03-24 10:00 AM
3. 2002-03-24 10:00 AM
4. 2002-03-24 10:00 AM
5. 2002-03-24 10:00 AM
6. 2002-03-24 10:00 AM
7. 2002-03-24 10:00 AM
8. 2002-03-24 10:00 AM
9. 2002-03-24 10:00 AM
10. 2002-03-24 10:00 AM

[illegible]

16/3/73
 17/3/73
 18/3/73
 19/3/73
 20/3/73
 21/3/73
 22/3/73
 23/3/73
 24/3/73
 25/3/73
 26/3/73
 27/3/73
 28/3/73
 29/3/73
 30/3/73
 31/3/73
 1/4/73
 2/4/73
 3/4/73
 4/4/73
 5/4/73
 6/4/73
 7/4/73
 8/4/73
 9/4/73
 10/4/73
 11/4/73
 12/4/73
 13/4/73
 14/4/73
 15/4/73
 16/4/73
 17/4/73
 18/4/73
 19/4/73
 20/4/73
 21/4/73
 22/4/73
 23/4/73
 24/4/73
 25/4/73
 26/4/73
 27/4/73
 28/4/73
 29/4/73
 30/4/73
 1/5/73
 2/5/73
 3/5/73
 4/5/73
 5/5/73
 6/5/73
 7/5/73
 8/5/73
 9/5/73
 10/5/73
 11/5/73
 12/5/73
 13/5/73
 14/5/73
 15/5/73
 16/5/73
 17/5/73
 18/5/73
 19/5/73
 20/5/73
 21/5/73
 22/5/73
 23/5/73
 24/5/73
 25/5/73
 26/5/73
 27/5/73
 28/5/73
 29/5/73
 30/5/73
 31/5/73
 1/6/73
 2/6/73
 3/6/73
 4/6/73
 5/6/73
 6/6/73
 7/6/73
 8/6/73
 9/6/73
 10/6/73
 11/6/73
 12/6/73
 13/6/73
 14/6/73
 15/6/73
 16/6/73
 17/6/73
 18/6/73
 19/6/73
 20/6/73
 21/6/73
 22/6/73
 23/6/73
 24/6/73
 25/6/73
 26/6/73
 27/6/73
 28/6/73
 29/6/73
 30/6/73
 1/7/73
 2/7/73
 3/7/73
 4/7/73
 5/7/73
 6/7/73
 7/7/73
 8/7/73
 9/7/73
 10/7/73
 11/7/73
 12/7/73
 13/7/73
 14/7/73
 15/7/73
 16/7/73
 17/7/73
 18/7/73
 19/7/73
 20/7/73
 21/7/73
 22/7/73
 23/7/73
 24/7/73
 25/7/73
 26/7/73
 27/7/73
 28/7/73
 29/7/73
 30/7/73
 31/7/73
 1/8/73
 2/8/73
 3/8/73
 4/8/73
 5/8/73
 6/8/73
 7/8/73
 8/8/73
 9/8/73
 10/8/73
 11/8/73
 12/8/73
 13/8/73
 14/8/73
 15/8/73
 16/8/73
 17/8/73
 18/8/73
 19/8/73
 20/8/73
 21/8/73
 22/8/73
 23/8/73
 24/8/73
 25/8/73
 26/8/73
 27/8/73
 28/8/73
 29/8/73
 30/8/73
 31/8/73
 1/9/73
 2/9/73
 3/9/73
 4/9/73
 5/9/73
 6/9/73
 7/9/73
 8/9/73
 9/9/73
 10/9/73
 11/9/73
 12/9/73
 13/9/73
 14/9/73
 15/9/73
 16/9/73
 17/9/73
 18/9/73
 19/9/73
 20/9/73
 21/9/73
 22/9/73
 23/9/73
 24/9/73
 25/9/73
 26/9/73
 27/9/73
 28/9/73
 29/9/73
 30/9/73
 1/10/73
 2/10/73
 3/10/73
 4/10/73
 5/10/73
 6/10/73
 7/10/73
 8/10/73
 9/10/73
 10/10/73
 11/10/73
 12/10/73
 13/10/73
 14/10/73
 15/10/73
 16/10/73
 17/10/73
 18/10/73
 19/10/73
 20/10/73
 21/10/73
 22/10/73
 23/10/73
 24/10/73
 25/10/73
 26/10/73
 27/10/73
 28/10/73
 29/10/73
 30/10/73
 31/10/73
 1/11/73
 2/11/73
 3/11/73
 4/11/73
 5/11/73
 6/11/73
 7/11/73
 8/11/73
 9/11/73
 10/11/73
 11/11/73
 12/11/73
 13/11/73
 14/11/73
 15/11/73
 16/11/73
 17/11/73
 18/11/73
 19/11/73
 20/11/73
 21/11/73
 22/11/73
 23/11/73
 24/11/73
 25/11/73
 26/11/73
 27/11/73
 28/11/73
 29/11/73
 30/11/73
 1/12/73
 2/12/73
 3/12/73
 4/12/73
 5/12/73
 6/12/73
 7/12/73
 8/12/73
 9/12/73
 10/12/73
 11/12/73
 12/12/73
 13/12/73
 14/12/73
 15/12/73
 16/12/73
 17/12/73
 18/12/73
 19/12/73
 20/12/73
 21/12/73
 22/12/73
 23/12/73
 24/12/73
 25/12/73
 26/12/73
 27/12/73
 28/12/73
 29/12/73
 30/12/73
 31/12/73

6102

Passed, may be Posted.

Abstract

AEP-A 100-114-01-0100

(S. F. Ghosh)
Dum Dum Central Jail

ভূমিকা

গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশক ভারতবর্ষের ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের জীবনে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন এনেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের জোয়ারে হাজার হাজার যুবক-যুবতী আরুঢ় হয়ে এদেশের অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে ব্রতী হন। তাঁদের সেই বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন অশোককুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বর্তমান উপন্যাস ‘আটটা-ন’টার সূর্য’-তে। ঐ আন্দোলনের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির (চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুনীতি ঘোষ, ভ্রোণাচার্য ঘোষ) পাশাপাশি দেখতে পাই কিছু কাল্পনিক প্রতিমূর্তি যারা গল্পের স্রোতটাকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আন্দোলনের গতির প্রতিটি মোড়—তার সাফল্য, তার ব্যর্থতা, তার বীরত্বপূর্ণ মুহূর্ত, তার অন্তর্ঘাতী অধঃপতন—জীবন্ত হ’য়ে ওঠে এই সব চরিত্রগুলির চলাফেরা, কথাবার্তা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি এক বিশেষ ঢং-এ রচিত—যাকে রলা যেতে পারে documentary novel বা তথ্য-নির্ভরশীল ঐতিহাসিক দিনলিপি ও চরিত্রের সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার একীকরণের রচনাশৈলী। সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট জ্বলন্ত হ’য়ে ওঠে যখন অশোক সরাসরি উদ্ধৃত করেন সিপিআই (এম এল)-এর পত্র-পত্রিকা থেকে, সংবাদপত্র ও রেডিওর ঘোষণা বা পুলিশ কর্তৃপক্ষের সরকারী নির্দেশ। এই প্রামাণিক দলিল-ভিত্তিক বিবরণীর গণ্ডি ভেঙ্গে কাল্পনিক চরিত্রগুলি মনোজগতে ডুব দেয়। ব্যক্তি মানুষের প্রেম ভালোবাসা, রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুর প্রয়োজনের চাপে সারল্যের বিলুপ্তি—এ সব-ই কাহিনীকে সমসাময়িক তথ্যের নথিপত্র থেকে বৃহত্তর চিরকালীন সত্যানুসন্ধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই ধরনের প্রামাণিক দলিল-ভিত্তিক documentary novel-এর একটা বৈশিষ্ট্য tendentiousness বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাহিনী বিন্যাস যা অনেক সময় রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত। ‘আটটা-ন’টার সূর্য’ উপন্যাসে লেখকের রাজনৈতিক বক্তব্য স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত। নকশালপন্থী বিপ্লবী ও ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি—এ দুই পক্ষের লড়াই-এর ময়দানে তাঁর সহানুভূতি প্রথম পক্ষে। সাহিত্যে এই ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বা bias-এর স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নিয়ে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, এই পক্ষানুরাগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নিঃসৃত হওয়া উচিত; লেখক কখনোই যেন পাঠকদের উপর, উপন্যাসে বর্ণিত সামাজিক সংস্কারের ভিত্তিঃপ্রমাণ হিসেবে ব্যবহার না করে।

লেখা চিঠি, নভেম্বর ২৬, ১৮৮৫)। অশোক ংষ্ট উপন্যাসে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন কিছু নির্বাচিত ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ, চরিত্রের মধ্যে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে, যা পাঠকদের মনোনিবেশ আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিরন্তন ইতিহাসের শাখা বেয়েট ষাট-সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময়, রাজনৈতিক গগনে প্রভাতের সূর্যের যে তাজা কিরণগুলিকে অচিরে ও অসময়ে নির্বাণিত করা হয়েছিল, আজ তারা আবার উদিত হচ্ছে তমসার মেঘ ঠেলে—এই বিশ্বাসের ঘোষণাতেই অশোক তাঁর উপন্যাস শেষ করছেন।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
দেহরাদুন, ৭ই জুলাই, ২০১৩

সূর্যকিরণ যখন তেজপাতা গাছের ফাঁক দিয়ে, পেয়ারাগাছের ডাল ছুঁয়ে, কলাগাছের শিরা উপশিরা জাগিয়ে দেবে, ছেলেরা আসবে খেলতে। এ চলে আসছে সেই কবে থেকে। তখন বঙ্গদেশের ছটি বিভাগ — চম্পা, কাজঙ্গলা, পুন্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত আর কর্ণসুবর্ণ। এই জয়পুর গ্রাম কর্ণসুবর্ণ বিভাগে। পরে, ব্রিটিশ আমলে, বর্ধমান দ্বিখণ্ডিত হলে জয়পুর চলে গেল নতুন জেলা হুগলিতে। জেলা নতুন কিন্তু ছেলেরা চালিয়ে যায় তাদের পুরনো খেলা। জলঝুপ্পা, হোলডুগ, তই তই

হুগলি জেলা পশ্চিমের তিরিশ বছরের মাথায় মড়ক লাগল ম্যালেরিয়ার। প্রথমে চব্বিশ পরগনার হালিশহর। তারপর গঙ্গার পশ্চিমতীর ধরে হুগলির বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, ত্রিবেণী পৌঁছে গেল মড়ক। ত্রিবেণীতে থামা নয়। সরস্বতী নদীর দুইকূল ধরে ম্যালেরিয়ার অভিযান অব্যাহত। অনতিবিলম্বে পৌঁছে গেল মগরা, সপ্তগ্রাম, হোসেনাবাদ।

ত্রিবেণীর উত্তরে মড়কের শুরু জয়পুর গ্রাম থেকে। এরপর চলে যায় বাগাটি, নয়াসরাই, ডুমুরদহ, বলাগড় হয়ে পাণ্ডুরা।

মড়ক ছড়ালেও ছেলেরা খেলা ছাড়েনি। জয়পুর গ্রামে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিল যে ছেলেটি সেও দীপ নিবে যাবার আগে, জ্বরের ঘোরে আবৃত্তি করেছিল একটি খেলার ছড়া — ‘এক নৌকা আলোচাল এক নৌকা ঘি, দাদা গেছে বিয়ে করতে সওদাগরের নি’। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার একদশক পরেও জয়পুরের ছেলেদের খেলা চলেছে।

পূর্বে বাগাটি, উত্তরে ডেমরা আর দক্ষিণে মগরা থেকে ত্রিবেণী যাবার রেললাইন — এই হল জয়পুরের জগৎ। এই ভূখণ্ডে নদী আছে তিনটি — সরস্বতী, বেহলা আর কুন্তী। সরস্বতী, বেহলার নামডাক থাকলেও ছেলেদের প্রিয় জয়পুরের কোলঘেঁষা কুন্তী নদী। নদীতে কোমরজলে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে বলে যায়, প্রাচীন ছড়া —

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠ হে।

তোমার ভাসুর বলে গেছে বেগুন কোট সে।।

বেগুন হোল ফালা ফালা,

বউ পালাল দুপুরবেলা,

ও বেগুনটি ফুটো নাক ভাব লেগেছে।

ভাবভাব কদম্বের ফুল ফুটেছে।

এরপরেই দু-তিনটি ছেলে একযোগে বলে ওঠে —

কদম কুড়াতে কদম কুড়াতে পেয়ে গেলাম মালা।

দাম কুড়াকুড় বাদি বাজে তুলারামের খেলা।।

ছড়া শেষ হতেই ছেলেরা একে অপরের গায়ে জল ছেটায়। একটি ছেলে এক হাতে জল নিয়ে অন্যদের দেখিয়ে বলে— আমার হাতে কি? জল। এক ডুবে তলৈ। তবে যদি পাই, এক গেরাসে খাই। এই অবধি বলেই ছেলেটি দ্রুত ডুব সাঁতার দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। অন্যরা ডুব দেয় তাকে ধরার চেষ্টায়।

ছেলেদের খেলা চললেও তার বহিরঙ্গে এসেছে কিছু পরিবর্তন। স্বাধীনতার এক-দেড় দশক পরে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো হুগলির এই এলাকাতেও এসে আস্তানা গেড়েছে পূর্ববাংলার বহু ভিটেছাড়া পরিবার। ফলে, ছেলেদের কারো কারো মুখে পাওয়া যায় পূর্ব বাংলার টান। জলের খেলায় প্রাচীন ছড়ার সঙ্গে ঢুকে পড়েছে একালের কবিতাও। স্কুলপাঠ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বলছে মগরা জয়পুরের ছেলেরা — বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে / ছেলেবেলার গান — / বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / নদেয় এল বান।।

নবীন সূর্যের তাপে কুস্তী নদী তিরতির করে উঠতেই ছেলেরা এল। বাঘা, বিছে, সমীর, বেচা, পাস্ত আর দ্রোণ। বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম নবম শ্রেণীর ছাত্র সবাই। স্কুলে ছুটি থাকায় কিছু আগেই খেলতে বেরিয়েছে ওরা। এদের মধ্যে দ্রোণাচার্য ছেলেটি বেশ আকর্ষক। ধ্বধবে ফর্সা, তীক্ষ্ণ নাক, এলোমেলো চুল, রোগাপাতলা ছেলেটির আয়ত চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। ক্ষিপ্ত গতিতে সে যখন নদীর তীরে ঝাঁপায় কিংবা গাছের ফাঁক দিয়ে মেঠোপথে ছুটে চোরপুলিশ খেলে, হৃদয়বাকের তুলনা মনে পড়ে। শুধু চেহারা নয়, দ্রোণের কথাবার্তাতেও স্বাতন্ত্র্য আছে। ছোট্ট ছোঁড়ার সময় সে প্রায়শই জীবনানন্দ দাশ নামক এক কবির রচনা বলে যায় — আমার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে — এই বাংলায়। মগরা লাইব্রেরিতে এই কবির দুটি বই আছে। — ধূসর পাণ্ডুলিপি, আর রূপসী বাংলা।

নদীর জলে আজ ছোট্ট বিরঝিরে ঢেউ। এ সময় ব্যাঙ লাফ খেলায় মজা। চ্যাপ্টা পাতের মতো বেশ কিছু ইট-মাটির খণ্ড জোগাড় করে ওরা। মাটির চাড়াতে এমনভাবে ছুঁড়তে হবে, সেটি জলের সমান্তরালে তীর গতিতে যাবার সময় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে ঢেউয়ের মাথা। যার ছোঁড়া খোলামকুচি সবচেয়ে দূরে যাবে, সেই বিজয়ী।

বাঘার ছোঁড়া ইটের টুকরোটি একবারও না লাফিয়ে সোজা ডুবে গেল জলে। হেসে উঠল সবাই। গুরুতেই নিশানা স্থির করা একটু মুশকিল। দুয়েকবার ছোঁড়বার পর ক্রমশ হাতের টিপ খুলে যায়।

বেচার নিশানা খুব ভালো। শরীরকে অনুভূমিক করে ঢিল ছুঁড়ল সে। খোলামকুচিটি তিনবার লাফিয়ে, ছুটে চতুর্থবারের মাথায় ডুবল।

ছেলেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল, আরিঃ শালা!

দ্রোণাচার্যের দিকে তাকাল বেচা। গর্বে ঝলমল করছে তার মুখ। কদিন আগেই টার্জান-টার্জান খেলার সময় বেচার সঙ্গে দ্রোণের মারামারি হয়েছে। বেচা দ্রোণকে লাথি মেরেছিল। দ্রোণ বেচার ডানহাতের কনুই মুচড়ে দিয়েছে। এখনও অল্প ব্যথা আছে তার। সেই হাতেই ঢিল ছুঁড়ে তিনবার ব্যাঙ লাফ করিয়েছে, কম কথা নয়।

ডানহাতে ইটের টুকরো নিয়েও ছোঁড়ার আগে দ্রোণ তা বাঁ-হাতে নিয়ে নিল।

সমীর বলল, কিরে দ্রোণা, তুই তো ল্যাটা নয়, তবে যে বাঁ হাতে ছুঁড়ছিস?

বেচার ডানহাত জখম। সে ওই হাতে ছুঁড়ে তিনবার লাফ করিয়েছে ইটটাকে। ডান হাতে ছুঁড়লে দ্রোণ অনায়াসে চার-পাঁচবার ব্যাঙ লাফ করাতে পারবে। কিন্তু সেটা ঠিক বিচার হবে না। বাম হাতে ছুঁড়ে সে বেচাকে সহমর্মিতা জানাতে চাইল। মুখে অবশ্য বলল অন্য কথা। — দেখি না বাঁ হাতে চেষ্টা করে। দু-হাতেই অভ্যাস রাখা ভালো।

দ্রোণের ছোঁড়া টিল তিনবার লাফিয়ে তলিয়ে গেল। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। বেচাও অবাক।

বিছে বলল, তোর তো বাঁ হাতেও ভালো টিপ।

উত্তর না দিয়ে চোখ নাচিয়ে হাসল দ্রোণ।

বেশিক্ষণ ব্যাঙবাজি ভালো লাগল না সমীরের। বাঘা-বিছেও একমত। ওরা টার্জান-টার্জান খেলার প্রস্তাব দিল সবাইকে। এ খেলায় টার্জান হবে একজন। সে গাছের এ-ডাল ও-ডাল করে এক গাছ থেকে অন্য গাছ যাবে। এক থেকে একশো গোনার মধ্যে যে বেশি দূর যেতে পারবে সেই টার্জান। ছোটদের পত্রিকায় টার্জানের ছবিতে-গল্প পড়ে ছেলেরা এই খেলা বানিয়েছে। ওরা নানানরকমভাবে খেলে টার্জান-টার্জান। কখনও দু-তিনজন হয় টার্জানের শত্রু। এক সঙ্গী থাকে টার্জানের। সঙ্গীকে নিয়ে গাছের ডালে দুলতে দুলতে টার্জান লড়াই চালায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে। এমন দোদুল্যমান লড়াইরত অবস্থায় বেচা দ্রোণকে লাগি মেরেছিল। তারপরেই মারামারি দু'জনের। মাস ছয়কু আগে এই খেলার সময় গাছের ডাল থেকে পড়ে হাত ভেঙেছিল দ্রোণের। তবু এই খেলা ছেলেরা খুবই প্রিয়।

টার্জান-টার্জান খেলতে ভালো লাগছিল না দ্রোণের। সে বলল, তার চেয়ে বরং যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা যাক। বেচাও সায় দিল দ্রোণের কথায়।

যুদ্ধ-যুদ্ধ আদতে টার্জান-টার্জান খেলার এক নতুন সংস্করণ। অনতিপূর্বে সীমানা নিয়ে বিবাদের জেরে চিনের সঙ্গে লড়াই বেধেছিল ভারতের। চিনের বাহিনী ভারতের উত্তর-পূর্ণ সীমান্ত দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে পৌঁছে যায় একেবারে আসামের সীমানায়। একমাস যুদ্ধের পরে তারা একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে বিতর্কিত সীমান্তের বারো মাইল উত্তরে সরে যায়।

যুদ্ধ থেমে গেলেও ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে তর্ক চলেছে। কেউ বলে চিন প্রথম আক্রমণ করেছে, কেউ বলে ভারত। অবশ্য যুদ্ধের সময় চিনের পক্ষ নিয়ে কথা বলা বেশ শক্ত ছিল। বিশেষত, কলকাতায়। বললেই, হয় আশপাশের লোক তাকে বিদ্রূপ করবে, নয়তো সরকার জেলে ভরে দেবে। কলকাতার চিন-বিরোধী জিগির পৌঁছে গেছে গ্রামাঞ্চলেও। জয়পুরের ছেলেরা শুরু করেছে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা।

এ খেলায় একদল চিনের পক্ষে, অন্যরা ভারতের দলে। চিনাপক্ষের ছেলেরা উঠে যায় গাছের ডালে। ভারতীয় শিবিরের ছেলেরা একে একে চিনাপক্ষের দিকে গুলতি তাক করে ছুঁড়তে থাকে ছোট ছোট পেয়ারা, কুল বা করমচা। এসবই যুদ্ধবাজদের গুলি। আক্রান্ত ছেলেরা এ-ডাল ও-ডাল করে বাঁচবার চেষ্টা করবে। ওদের গায়ে লাগাতে পারলে ভারতীয় দল পাবে এক পয়েন্ট। এরপরে ভারতীয় দলকে চড়তে হবে গাছের ডালে। তখন চিনারা গুলতি তাক করবে ওদের দিকে। প্রত্যেক দল দশবার গুলতি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে বিরোধী পক্ষের দিকে। যা বদনাম হয়েছে চিনের, কেউই স্বেচ্ছায় চিনা পক্ষে যেতে চায় না। সেজন্য

একটি চ্যাপ্টা মাটির চাড়ায়ে আকাশে ছুঁড়ে, টস করে ঠিক করণে হয় কে কোন পক্ষ।
টসে জিতলে বিজয়ীরা হয় ভারত।

টসে হেরে গেল দ্রোণরা। দ্রোণ, বেচা, সমীর এক দলে। অন্য দলে বাঘা, বিছে
আর পাস্ত। একটি গাছের তিনটি ডালে তিনজন চড়ে বসল। মাটি থেকে প্রথমে গুলতি
চালাল বিছে। সমীরের কান ঘেঁষে চলে গেল পেয়ারা। গায়ে লাগেনি, অতএব পয়েন্ট
পেল না বাঘারা। দ্রোণরা হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে। চাংওয়া মিনকুও বলে চিংকার
করে উঠল ওরা। চাংওয়া মিনকুও। চাংওয়া মিনকুও। এই রণহুকারটি ওরা নিয়েছে
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি থেকে।

পাস্ত'র গুলতি নিশানা অশ্রান্ত। অন্য ডালে সরে পড়বার আগেই পেয়ারাটি তীব্র বেগে
বেচার ডান পায়ে এসে লাগল। ভারতীয় দল এক পয়েন্ট পেয়েছে। বাঘারা চিংকার
করে উঠল — চিনেম্যান চিনেম্যান চিনে চলে যা, চাং চুং করিয়া আরশুলা খা। পাস্ত,
বিছে লাফাতে লাফাতে বলল, ঘচাং ফুং, ঘচাং ফুং।

গাছের ডালে দ্রোণের চলন সত্যিই টার্জানের মতো। প্রথম দশবারের চেষ্টায় ওর গায়ে
একটিবারও গুলি লাগাতে পারল না কেউ। বাঘা তবু চেষ্টা করে যাচ্ছিল দ্রোণের গায়ে
মারতে। কিন্তু গুলতিবাজের চোখ ও আঙুল দেখে, ছুটুপ বন্ধুটির গতিপথ আন্দাজ করে
মুহূর্তের মধ্যে অন্য ডালে সরে যাচ্ছিল দ্রোণ। ভারতীয় পক্ষ ফক্ষে যেতেই হেসে উঠছিল
চিনপক্ষের ছেলেরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা জমে উঠল। দু'দলেরই কুড়ি পয়েন্ট হয়েছে। ঠিক হ'ল আর
এক রাউন্ড খেলা হবে। অর্থাৎ ভারতীয় দলকেই দশবার গুলতি ছোঁড়ার সুযোগ। চীনপক্ষও
গুলতি ছুঁড়বে দশবার। যার পয়েন্ট বেশি হবে সেই বিজয়ী।

শেষ রাউন্ডে খুবই উত্তেজনা। দু'দু'বার ফক্ষে যাবার পর তৃতীয়বার সমীরের গায়ে
লাগিয়ে দিল বিছে। দ্রোণ আরও সাবধানি। কোনোভাবেই গায়ে লাগাতে দিলে চলবে
না। এ-ডাল, ও-ডাল করতে করতে নজর রাখছিল বাঘার গুলতির দিকে। পাস্ত বা বিছের
গুলতি ছোঁড়ার কায়দাটা বুঝে নেবার পর ওদের এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু
বাঘা হঠাৎ করে গুলতি চালায় যার ফলে সবসময় বোঝা যায় না ঠিক কখন ছুটে আসবে
ওর গুলি।

বাঘা আকাশের দিকে তাকিয়েছে। তারপরেই ওপরের দিকে তাক করল গুলতি। একি
বাঘার চালাকি? ওপরের দিকে তাক করে অকস্মাৎ দ্রোণের দিকে গুলতি চালাবে? সরে
যাবার আগেই যাতে দ্রোণকে পেড়ে ফেলা যায় সেজন্যই কি এই অভিনয়?

বাঘা আকাশের লক্ষ্যেই গুলতি ছুঁড়ল। তীক্ষ্ণ আওয়াজ হ'ল কোন পাখির। বাঘা ছুটল
কুন্তী নদীর দিকে। ওর পেছনে ছুটল সবাই।

এক শঙ্খচিলের বাচ্চাকে গুলতি চালিয়েছে বাঘা। বাচ্চাটির বুকের কাছটি সাদা। ডানায়
ঈষৎ সোনালি আভা, রোদদুরে মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠছে। ডানায় আঘাত লেগেছে
পাখিটির।

আহত পাখিটিকে দেখে দ্রোণ হতভম্ব। মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার কথা যার সে
কি না আহত হয়ে পড়ে আছে কুন্তী নদীর তীরে! হয়তো মানুষ নয় — হয়তো বা

শঙ্খচিল শালিখের বেশে। জীবনানন্দ ফিরে এসেছেন, পড়ে আছেন আহত হয়ে। ডানা ভেঙে গেছে।

বাঘা ধরতে যাচ্ছিল পাখিটিকে। দ্রোণাচার্য চিৎকার করে উঠল, খবরদার।

স্কুলের নামকরা গোলকিপার দ্রোণ ঝাঁপিয়ে পড়ে শঙ্খচিলটিকে কোলে তুলে নিল। তার দু'চোখে আশুন। শরীর কাঁপছে থরথর করে।

এই দ্রোণকে বাঘা ভালো করে জানে। জানে সবাই। সামনে এগিয়ে ওর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে প্রবল ঝুঁষি খেতে হবে। দাঁত, মুখ ফেটে যাবে সে মুষ্ট্যাঘাতে। বাঘা চুপ করে গেল। জুজু অনায়াসে।

দ্রোণ একটি কথাও বলল না। শঙ্খচিলটির ডানায় হাত বুলোতে বুলোতে সে এগিয়ে গেল মেঠো পথ ধরে।



দিনালিপি লিখছেন নিবারণচন্দ্র। পাতার উপরে লেখা হয়ে গেছে 'শ্রীশ্রী দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ'। তারিখও লিখেছেন — ৩ এপ্রিল ১৯৬৪। এরপরে কোন বাক্যটি দিয়ে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছেন না নিবারণ। আজ তিরিশ বছর হ'ল দিনালিপি লিখছেন তিনি কিন্তু আরম্ভের সেট ঝিঙ্গা এখনও গেল না। এক সাদামাঠা মনুষ্যের জীবনে প্রত্যেক দিন এমন কী ঘটনা ঘটে যাতে অগ্রপশ্চাৎ এত চিন্তা করতে হয় আর তা ছাড়া এ তো কোনো সাহিত্যকর্ম নয় যে ভেবেচিন্তে বৃদ্ধি প্রয়োগ করে লিখতে হবে প্রথম বাক্যটি, যার পরে পরেই বর্ণার মতো মেয়ে আসবে গদ্যের দালা। ততসং কিছু গোপ্য পরেও প্রথম বাক্যটি লিখতে আজও আড়ম্ব লাগে নিবারণচন্দ্রের। ঝিঙ্গা আগে।

কাকে দিয়ে আরম্ভ করবেন? বড় মেয়ে বিমলার কথা দিয়ে? হারাধন আর বিমলা এখন ভালই আছে। বছর পাঁচেক আগে জামাইয়ের চাকরি ছিল না, তখন প্রায় প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন নিবারণ। চিন্তাও হ'তো খুব। কী হবে বিমলার। এখন জামাই রিষড়ার এক কারখানায় ছোটখাট কাজ পেয়েছে। টেনেটুনে চলে যায় ওদের সংসার। সবচেয়ে বড় কথা ওদের মাথার উপর ছাদ আছে। হোক না শরিকি বাড়ি কিন্তু ওদের নিজস্ব ঘর তো আছে একখানা। আধপেটা একপেটা খেয়ে তবু চালানো যায় কিন্তু মাথার উপর কোনো আচ্ছাদন না থাকলে যে কী অনিশ্চিত অবস্থা হয়, জানা আছে নিবারণচন্দ্রের।

বিবাহের একবছর পরেই ভিটেছাড়া হতে হয়েছে তাঁকে। বিমানক্ষেত্র না কী সব হবে কারণ দেখিয়ে সরকার অধিগ্রহণ করল তাঁদের দশ বিঘে জমি। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে হ হ করে। ক্ষতিপূরণ বাবদ যা পাওয়া গেল এবং সেই অর্থ পরিবারের মধ্যে ভাগ হবার পর যা হাতে এল, তা দিয়ে শহরাঞ্চলে কিছু করা যায় না। কোথায় শুরু করা যায় নতুন বসবাস? পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের সঙ্গে থাকতে রাজি নন নিবারণ। ভিটেচ্যুত হবার সময় সবাই মিলে গল্পনা দিয়েছে হৈমবতীকে। ওরা বলেছে হৈম অলক্ষ্মী, না হলে বিবাহের পরেই ভদ্রাসন ছাড়তে হয়।

ভাগ্যিস কোনো সন্তানাদির আগমন হয়নি সে সময়, তা'লে দুর্ভাগ্য আরও বাড়ত।

মহামায়ার কৃপায় অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এসবাসের আশঙ্কাতা। মগরার জয়পুর গ্রামে আট বিঘে জমি কিনেছিলেন নিবারণ। এ জমিতে নাকি একদা নগরাল হতো, কাপালিকের আসন ছিল অতীতে — এমনই রটনা লোকমুখে। এজন্য কিছু সন্তোষেই পাওয়া গিয়েছিল নতুন এই বাস্তুজমি। ছোট্ট একতলা বাড়িও করে ফেলা গেল ক্ষতিপূরণের টাকায়। তবে বাড়ির মধ্যে থাকার চাইতে, নিজের জমিতে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করেন নিবারণচন্দ্র। কেনবার সময় কিছু গাছ ছিল জমিতে। তিনি আর হৈম লাগিয়েছেন বহু চারা। গাছগুলি তাঁদের সন্তানদের মতোই, খুব কিছু যত্ন পায়নি, তবু বেড়ে উঠেছে তরতর করে। হুগলির মাটি খুব উর্বর। যাই লাগানো হয়, বেড়ে ওঠে ঠিক। নিয়মিত পরিচর্যার দরকার হয় না।

বসবাসের অনিশ্চয়তা দূর হলেও জীবিকার স্থায়িত্ব এল না নিবারণের। কিছুকাল বিদ্যুৎ পর্যদে খাতা লেখার কাজ করেছেন তিনি। ওপরওলার সঙ্গে বনিবনা হ'ল না। জেদ করে ছেড়ে দিলেন চাকরি। যোগ দিলেন বাগাটি কলেজে। পার্টটাইম চাকরিতে। কলেজ অফিসের ফাইল নিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে যেতে হয় হুগলি এবং কলকাতাতেও। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের নানান হুকুম তামিল করতে হয়। সবমিলিয়ে মাসান্তে বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিয়মিত পাওয়া যায় না সে অর্থ। অধিকাংশ সময়ই বেতন পাওয়া যায় দু-তিন মাস পরে। এই বেতনে চার সন্তানের সংসার চালানো খুবই শক্ত। বাগানের তেজপাতা, ডাঁটা, সিম, লেবু, কপি বিক্রি করে, গাছের বেল, পেয়ারা খেয়ে কোনোমতে চলে যায় সংসার। চলে যে যাচ্ছে, এ ভগবানের এক বিচিত্র লীলা! ভাত না খেয়ে দিনের পর দিন শুধু ডাল সেদ্ধ আর বেল খেয়ে কাটানোর ক্ষমতাও হয়েছে তাঁদের। বহুবার।

নিবারণ ঠিক করলেন একাধিক পার্টটাইম কাজ ধরতে হবে। হিসাবের খাতা লেখায় তাঁর কিছু পারদর্শিতা আছে। তাঁর হস্তাক্ষরও অপূর্ব। মগরার এক মুদির দোকানের হিসেবের খাতা লেখবার কাজ জুটল। মাসিক বেতন দশ টাকা। এতেও তো হয় না খুব কিছু। আরও কাজ চাই। কিন্তু এ অঞ্চলে হিসাবের খাতা লেখবার লোক কোথায়? বহু চেষ্টায় মগরাতে এক ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই শৈল আচার্যের হিসাবের খাতা লেখা শুরু করেছেন নিবারণ। মাস গেলে পাওয়া যায় পাঁচ টাকা। মন্দ নয়। যখন দুটি লুঙ্গির দাম পাঁচ টাকা, এক কেজি লবণ তেরো পয়সা, এক বোতল কেরোসিন পঁচিশ পয়সা, একমুদ্রা চাল তেইশ টাকা, সেই হিসেবে পাঁচ টাকা বেতন, খারাপ নয়। কিন্তু ব্যস্, ওই একটিই কাজ, আর পাওয়া গেল না। তবে শৈলবাবুর খাতা লিখে প্রভূত আনন্দ পান নিবারণ। বাজারদর জানা হয়ে যায় তাঁর। মজাও লাগে। কেজি প্রতি পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সার যে চা শৈলবাবু কেনেন সংসারের জন্য তা তো নিবারণ কল্পনাও করতে পারবেন না নিজেরদের জন্য। নিজেরা না খেলেও, তাঁর হাতে লেখা হয়ে যাচ্ছে অন্য এক মধ্য আয়ের সচ্ছল পরিবারের, চা-পানের হিসেব। হিসাবের খাতার মাধ্যমে তিনি জেনে যাচ্ছেন সে পরিবারের খাদ্যরুচি, পেয়ে যাচ্ছেন আচার্য্যির পো'র মানসিক গঠনের পরিচয়। এ বড়ো মজার কাজ! হিসাবের খাতা থেকে শিক্ষাও নিয়েছেন নিবারণ। আগে ষোলো পয়সার একটি খাতা কিনে দিনলিপি লিখতেন তিনি। শৈলবাবুর হিসাব রাখতে গিয়ে দেখলেন, ওই খাতা একসঙ্গে ছাঁট কিনলে তা জ্ঞানববই পয়সার বদলে চুরানববই পয়সায় পাওয়া যায়। সেই থেকে নিবারণও খাতা কেনেন একসঙ্গে আধডজন। সেই খাতার

একটিতেই আজ দিনলিপি লিখছেন তিনি।

বিমলারা ঠিক আছে। তাঁদের তুলনায় বিমলারা ভালোই শুরু করেছে সংসার। ওদের নিয়ে এখনই যেমন চিন্তা করবার মতো কিছু নেই। চিন্তা নেই কমলাকে নিয়েও। কমলার বর রেলে কাজ করে। টিকিট চেকার। কালো কোট গায়ে সকালবেলায় বেরিয়ে যায়। হাওড়া-ব্যাঙ্কল-বর্ধমান-দুর্গাপুর ঘুরে ফিরে আসে। পালা-পার্বণে এ বাড়িতে ফল-মিষ্টি পাঠায় কমলা। দুটি ছেলে নিয়ে কমলা-শিবনাথও ভালোই আছে।

চিন্তা হয় বিমলা কমলার মধ্যবর্তী ধনঞ্জয়কে নিয়ে। সাতবছর আগে ভারত কমলট্রাকশন কোম্পানিতে কেরানির চাকরি নিয়ে সে ছেলে চলে গিয়েছিল উত্তরপূর্ব ভারতে। কামরূপ জেলায় রাস্তা গালাগান কাজ করছিল কোম্পানিটি। ওইখানেই কাজ চলবার সময়ে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেল ধনঞ্জয়। গৌহাটি হসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল কিছুদিন। তারপর বাড়িতে ফিরে এল। দেখা গেল জোয়ান ছেলেটি একেবারে বদলে গেছে। সামান্য কারণে ভয় পায়, অকারণে রেগে ওঠে বিষম। মাসখানেক আগেই নিতাই-সাধন-পরশদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের প্রবল মারামারি হয়। ওরা যদিও বলেছে ধনা-ই আগে মেরেছে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না নিবারণের। ধনঞ্জয় নিশ্চয় ওদের চাল পাচার করবার ধান্দা জেনে বাধা দিতে গিয়েছিল, সেজন্যই ওরা কুকুর ঠ্যাঙান দিয়েছে ধনাকে। মারবার পর ওরাই আবার থানার সেকেন্ড অফিসারকে বলে কয়ে ধনাকে হাজতে পুরে দিয়েছে। গ্রহের কী ফের, নির্দেশ হওয়া সত্ত্বেও বড় ছেলে হাজতে।

কিন্তু ধনঞ্জয়কে নিয়েও লিখতে হচ্ছে কবলা না নিবারণের। দু'সপ্তাহ পরে ওর মামলা উঠবে। হয়তো জামিন পাওয়া যাবে তখনও আজ ওর বিষয়ে লেখবার মতো নতুন কোনো কথা নেই।

তবে কি থৈমকে নিয়ে লিখছেন তিনি? হৈম। হৈমবতী। সারাজীবন ছায়ার মতো পাশে থেকে গেল যে মহিলা, তাকে নিয়ে আলাদা করে লেখার মতো কোনো কথা মনে পড়ল না নিবারণের। কখনও কি লিখেছেন হৈমকে নিয়ে? পুরোনো দিনলিপির পাতা ওষ্ঠাতে থাকলেন তিনি।

আটচল্লিশের ৯ ডিসেম্বরের লেখায় এসে থমকে গেলেন নিবারণচন্দ্র। বাংলা সন ১৩৫৫। ২৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। ওইদিন জন্মেছিল তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তান।

.....দুপুরে খাবার পর হৈম বলেছিল পেটটা কেমন করছে। বিকেলে বেরোবার সময় জিজ্ঞাসা করে জানলাম ভালোই আছে। তারপরে রাত্রি নটায় শোবার সময়েও কিছু ছিল না। এক ঘুমের পর উঠে দেখি হৈমর ব্যথা ধরেছে। পাঠাবার মতো কাউকে না পেয়ে কমলা আর ধনঞ্জয়কেই পাঠালাম বাগাটি থেকে আত্মীয়দের ডাকতে। আমি রইলাম হৈমর পরিচর্যায়। শ্রী ভগবানের কৃপায় আপনা আপনিই হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার রাত্রি আড়াইটার সময় পুত্রসন্তান প্রসব করল হৈম।

পুরোনো দিনলিপি পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল নিবারণের। এরপরে যে খরচের হিসেব লিখেছিলেন আজ ষোলো বছর পরেও না দেখে বলে যেতে পারেন তিনি। বাজার চোন্দো আনা, রেড়ির তেল দশ আনা, মাছ ছয় আনা, গামছা, কাপড় ইত্যাদি দশ আনা। মোট দুটাকা নয় আনা। এছাড়া ছিল দ্বাই বিদায়ের খরচ। পুরো এক টাকাই দিতে

হয়েছিল সেবার। তখন চার পয়সায় এক আনা, যোলো আনায় এক টাকার যুগ। এর একদশক পরে আনা গিয়ে এল নয়া পয়সা। তারপর নয়া পয়সার 'নয়া' ভাব চলে গিয়ে পড়ে রইল শুধু পয়সা। দিনলিপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিবারণ লক্ষ করলেন, সেই আনা-র যুগ থেকে পয়সার সময় পর্যন্ত হৈমবতীর কথা তিনি বিশেষভাবে লিখেছেন ওই একবারই। বিশেষভাবে না লিখলেও আরো দুয়েকটি তারিখে উল্লেখ আছে হৈমর। যেমন কনিষ্ঠ ছেলেটিকে নিয়ে হৈম ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল বছর সাতেক আগে। ওরা স্নান সেরে ফেরার পর সেই শীতের দুপুরে নিশ্চিন্তে দাওয়ায় বসে দিনলিপি লিখেছিলেন তিনি। কিংবা চিন-যুদ্ধের বছরে হাতে টাকা না থাকায়, সংসার চালানোর জন্য হৈম দিয়ে দিয়েছিল তার শেষ জোড়া চুড়ি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংসার চালানোর জন্য বিক্রি করতে হয়েছিল সেই সোনার চুড়িগাছি। এর উল্লেখ তিনি করেছেন রোজনামাচায়। আতান্তরে আর একটি কাজ করতে হয়েছিল ছ'বছর আগে। বিক্রি করতে হয়েছিল বেশকিছু জমি। পুরো জমি কোনো একজনকে বিক্রি করা যায়নি। দশজনকে ভাগে ভাগে বেচতে হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই এককালীন কিছু টাকা দিয়েছে, বাকি টাকা দিয়ে যাচ্ছে কিস্তিতে। একজন তো প্রত্যেকদিন পাঁচটাকা করে শোধ দেয়। এককালীন টাকা পাওয়ায় জমি বিক্রির উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। প্রথমে বিমলা, কয়েক বছর পরে কমলার বিবাহ দিতে পেরেছেন নিবারণচন্দ্র।

কিস্তির টাকা সবাই ঠিকমতো দেয় না। এজন্য মাঝে মাঝেই তাগাদায় বেরতে হয় নিবারণকে। সাইকেল নিয়ে যেতে হয় পাণ্ডুরা, ভায়ড়া, নমাজগ্রাম। ত্রিবেণীও গেছেন কয়েকবার।

পুরোনো ডায়েরির পৃষ্ঠায় অতীত চুরে আসে সিনেমার মতন। জমি বিক্রির জন্য কোনো কষ্ট নেই আজ কিন্তু সোনার চুড়ি বিক্রির কথাটি দেখে হৈমর জন্য মন কেঁদে উঠল নিবারণের। এই রোদন নির্জনে অশ্রুমাচন করায়, লিখতে সায় দেয় না।

হৈমবতীর প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্রটির মুখ মনে এল। অবিকল মায়ের মুখ পেয়েছে। নানান মজার কথা বলে, হৈ হৈ করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে সে। ওর অট্টহাসির ধরণটি অবশ্য মায়ের নয়, বাপের সঙ্গে মেলে। পাড়ার ভরদ্বাজবাবু শ্রীমানের কোষ্ঠীবিচার করে জানিয়েছেন, ছেলের নামযশ হবে। "মা-বাবার কৃপায় যদি সত্যিই ছেলেটির নামডাক হয়, তবেই এত কষ্ট সার্থক।

সাংসারিক কষ্টের বুঝ আছে ছেলেটির। নতুন ক্লাসে ওঠবার পর কোনোদিন নতুন বই কেনার জন্য বায়না করেনি সে। নিজের চেষ্টায় পুরোনো বই বিক্রি করে নতুন ক্লাসের পাঠ্য বই উঁচু ক্লাসের কোনো ছাত্রের থেকে কিনে এনেছে বরাবর। অভাবের সময় গাছের ডাঁটা, তেজপাতা পেড়ে বাজারে বিক্রি করেছে। একবার তো ডাঁটা পাড়তে গিয়ে ডাল থেকে পড়ে হাতে চোট পেয়েছিল শ্রীমান। গুরুতর কিছু হতে পারত কিন্তু হয়নি।

এত সংবেদী বলেই ছেলেটিকে ভালো লাগে হৈমবতী এবং তাঁর। কিন্তু ইদানীং শ্রীমান বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। পড়াশুনোতেও মন নেই তেমন। বাংলায় ভালো করলেও অঙ্কতে খুবই কাঁচা। অঙ্কের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা প্রয়োজন। ছেলের বয়োভাপনার খবর এসেছে স্কুল থেকে। স্কুলের চেয়ার, ফ্যান ভেঙেছেন ছোটোবাবু। শাস্তিস্বরূপ পাঁচটাকা জরিমানা

করা হয়েছে। শুধু জরিমানাতেই শেষ নয়, নাকচ করা হয়েছে ছেলের ফ্রিশিপ। অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক ডেকেছিলেন নিবারণচন্দ্রকে। বলেছেন, ওকে অন্য স্কুলে নিয়ে যেতে।

নিবারণ অনুভব করলেন এবার দিনলিপি প্রথম বাক্যবন্ধের কাছাকাছি এসে গেছেন তিনি। এই কনিষ্ঠ ছেলের কথাই অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছিল এতক্ষণ। এইবার অবয়ব পাবে তাঁর ভাবনা। ছেলোটো এত অশান্ত অবস্থা হয়ে উঠেছে কেন? সবাই বলে তাঁর এবং হেমন অত্যধিক প্রজ্ঞা পেয়ে ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে। তবে কি কঠোর শাসন দরকার? শাসন নিশ্চয় করা দরকার কারণ স্কুলের চেয়ার ভাঙবার, সিলিং ফ্যানের ব্রড বোর্ডে বোঁকিয়ে দেবার পক্ষে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

জরসানার প্রজ্ঞাতির মূহুর্তে দ্রোণাচার্য ঘরে ফিরে এল।

দ্রোণা, সারাক্ষণ খেলে বেড়ালেই চলবে? পড়াশোনার দরকার নেই?

নিবারণের স্বর বেশ কঠোর। মুখাবয়ব রুক্ষ। চোখ বিস্ফারিত।

দ্রোণাচার্য নতমুখে এসে দাঁড়াল। হাতে শঙ্খচিল।

এ কী! শঙ্খচিল ধরে আনলি কেন?

ধরিনি। ডানায় জখম আছে। কদিন রাখি.... সেরে উঠলে উড়িয়ে দেব।

দ্রোণ সমস্ত ঘটনা জানায় পিতৃদেবকে। হৈমবতীও এসে গিয়েছিলেন ঘরে। তিনি শুধু বলেন, শঙ্খচিল মঙ্গলের চিহ্ন। সাবধানে রাখিস বাকু।

এর মধ্যে শুভ বা অশুভ কী যে ইঙ্গিত আছে বুঝে উঠতে পারেন না নিবারণচন্দ্র। তবে এ ঘটনায় তাঁর মনটা দ্রব হয়ে যায়। এক আহত পাখির জন্য যে ছেলের এত দরদ, সে কী করে স্কুলের চেয়ার টেবিল ভাঙে! পঠনপাঠনের জায়গায় হট্টগোল করে? ভেবে পান না তিনি। নিশ্চয়ই স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর দোষ আছে। দ্রোণ স্পষ্টবক্তা বলে হয়তো এর ওপর রাগ আছে কিছু শিক্ষকের।

দিনালিপি বাক্যসমূহ এসে যায় নিবারণচন্দ্রের কলমে। তিনি লেখেন, ‘চেয়ার ভাঙার জন্য যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী স্কুল হইতে ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইবার কথা বলেন, সে স্কুলে সেই শিক্ষকদের নিকট ছাত্রদের শিক্ষা দিতে দেওয়া এক হিসাবে পাপ; অপরাধ শিক্ষকদের কারণ তাঁরা ছাত্র পরিচালনা করিতে পারেন না। উপরন্তু তাদের প্রিয় ছাত্রেরা তাদের নিকট যা কিছু মিথ্যা লাগায় সেইটাই তারা বেদবাক্য হিসাবে গ্রহণ করে বিচারের অভিনয় করিয়া থাকেন। জরিমানা করে ছেলেকে শাস্তি দেওয়া হয় না, সে শাস্তি ছেলের অভিভাবককে দেওয়া হয়.....’ নিবারণ লিখে চলেন।



রাত্রে ঘুম হয়নি সুকান্তির। তিনতলার বারান্দায় বসে সারারাত বৃষ্টিপতনের শব্দ শুনেছেন তিনি। লেডি ডাফরিন হাসপাতাল থেকে ভেসে এসেছে আসন্নপ্রসবের চিৎকার। ধারাপাতের শব্দে মিশেছে নবজাতকের কান্নার আওয়াজ। বউবাজার স্ট্রিট থেকে এসে তিনচারটি কুকুর আরবান গেরিলার মতো অতর্কিতে ছুটে গেছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে। মাঝরাত থেকে

সন্ধ্যাবেলায় ঠেলাগাড়ি স্কট লেন ধরে বৈঠকখানা বাজারের গন্তব্যে। আমহাস্ট স্ট্রিটের এই বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা যায় সব।

ভোররাতের দিকে বৃষ্টি থেমে গেল। শুকতারা দেখা গেল স্পষ্ট। অন্যদিনের মতোই সেনবাড়ির মোরগ ডেকে উঠল। তারপরেই কাকের ডাকাডাকি। শীতের সকালেও জগৎলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ঝাঁপ খুলে গেল। রবিবার, সকাল-সকাল জিলিপি কচুরির খন্দের এসে যাবে। আশ্চর্য! যেন এতক্ষণ কিছুই ঘটেনি ধরাধামে!

অথচ, গত বিকেলে প্রকৃতির একেবারে অন্য রূপ। সুহাসিনীকে কবরে শোয়ানোর পর সে কী বৃষ্টি! গ্রেড ডিগাররা বেলচা ফেলে চলে গেল দূরে, গাছের তলায়। প্রশান্ত নির্বিকার মুখে সিমেন্টি অফিসে বসে। যাজক হলে বোধহয় এমনই আত্মকেন্দ্রিক নিলিপি বসে যায় চোখে মুখে।

এই দাদার কথা ভেবেই মা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। ধর্মাস্তরের যুক্তি হিসাবে মা বলতেন, আমার যখন পনেরো বছর, প্রশান্ত জন্মেছে। আমি মরলে ওকে কেউ আমার কাছে এগোতে দেবে না। ও স্নান মুখে দূরে দাঁড়িয়ে আমার শ্মশানযাত্রা দেখবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না।

সুকাণ্টি হেসে ফেলতেন।

মা, তুমি তো তখন মারা গেছসহ্য-অসহ্যের কথার। প্রশান্ত গভীর গলায় বলতেন, যাজকরা তার নিজের মা'কে কবরে অর্পণ করছে আরে না, ও কাজটা অন্য যাজককে করতে হয়।

মা অবুঝের মতো মাথা নাড়তেন। নিজের সিদ্ধান্ত বদল করবেন না। দাদা খ্রীষ্টান যাজক হবার কিছুকাল পরেই মা ওই যুক্তিতে খ্রীষ্টানধর্ম নিলেন।

সেই মা, খোলা আকাশের তলায় গোগারে গুয়ে ভিজছেন। সহ্য করতে পারেননি সুকাণ্টি। বেলচা তুলে নিয়ে মা'র কফিনের ওপর মাটি দিয়ে গেছেন তিনি। যতক্ষণ না সব ঢেকে যায়। কাদাখেলার নেশায় পেয়েছিল তাঁকে!

গোরস্থান-অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রশান্ত। আকাশের দিকে তাকালেন কয়েকবার। বৃষ্টি থামানোর প্রার্থনা করছিলেন বোধহয়!

সুহাসিনীও আকাশের দিকে আঙুল তুলেছিলেন একবার। কিশোরবেলার সেই কথা স্পষ্ট মনে পড়ে সুকান্তির। তাঁকে কোলের কাছে টেনে মা বলেছিলেন, জানো সুকু যারা বিশ্বাস করে ওই আকাশে ভগবান আছেন, তারা মানুষ হিসেবে একেবারে অপদার্থ। জর্জ বার্নার্ড শ'র কথা। মা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টি করবার সময় পড়েছেন কোনো বইয়ে। কিংবা তার আগেও হতে পারে। মামাবাড়িতেও তো পড়াশোনার আবহাওয়া ছিল। দাদামশায় বামচরণ ভট্টাচার্য ছিলেন যশোরের নামী সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁর পিতৃদেবের পথ ধরেই বড়মামা সোমেশ্বর কলকাতার কলেজে সংস্কৃতে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। বিবাহের আগে অবধি সুহাসিনী নিয়মিত পাঠ নিয়েছেন সংস্কৃত কাব্য এবং ইংরেজি গদ্যের। ছোটমামাকেই বাগে রাখতে পারেননি দাদামশায়। তিনি যুক্ত হয়ে পড়লেন সন্তাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে। ঝড়েশ্বর ভট্টাচার্যকে ধরতে কতবার যে লালপাগড়ি, খাকি উর্দি পরা লালমুখো ব্রিটিশ পুলিশ হানা দিয়েছে যশোরের বাড়িতে! তল্লাশি করার নামে তারা

গিজনাপএ, আসবাব, ঘর-গেরস্থাপির জিনিসপত্র ছত্রাকার করে ফেলে দিয়েছে উঠোনে। গালা দিতে এলে দিদিমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দেড় বছর আত্মগোপন করে থাকার পর ঝড়েশ্বর ধরা পড়েছেন কলকাতায়। জেলের গাণ্ডা উন্নীতির দাবীতে তখন বন্দীরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছে। ব্রিটিশ জেলার এবং পুলিশের কড়া গাণ্ডাপনায় সেই আন্দোলনের খবর কিছুতেই কারাগারের প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে যেতে পারছে না। আলিপুর জেলে বসে সংস্কৃত কবিতা লিখলেন ঝড়েশ্বর। জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেন কবিতাটি সোমেশ্বরের কাছে পাঠাবার। দাদা সংশোধন করে, দশবার পর তিনি কবিতাটি প্রকাশ করবেন কোনো পত্রিকায়। অনুমতি পাওয়া গেল।

সোমেশ্বর পড়লেন কবিতাটি। সংস্কৃত কবিতাটির ছত্রে ছত্রে জেলের অব্যবস্থার বর্ণনা এবং অনলন প্রতিবাদের বিবরণী। বাংলা অনুবাদ করে লেখাটি তিনি পাঠিয়ে দেন সংবাদপত্রে। খবর বেরিয়ে যাবার পর ইংরেজরা হতবাক। ওরা কুল-কিনারা পায়নি এই খবর ফাঁস রহস্যের।

মুণ্ডি পাবার পর ছোটমামা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শুরু করলেন। মাঝপথে ছেড়েও দিলেন। তারপরে ছেলে পড়ানো, আয়ুর্বেদচর্চা এসব নিয়েই কাটছিল। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

ঝড়েশ্বরের প্রভাব পড়েছিল সুহাসিনীর ওপর। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন সুহাসিনীও। কিন্তু সে তাঁর বিয়ের অনেক পর।

তেরো পেরোতেই তোড়জোড় করে সুহাসিনীর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার বিদ্যাপতি রায়ের সঙ্গে। জমিদারির আয় থেকেই চলে বিদ্যাপতিদের সংসার।

গামাচরণ ভেবেছিলেন তাঁর নিজের সম্পত্তির কিছু মেয়ে-জামাইকে দিলে ওরা নিজেরা আলাদা করে কিছু করে নেবে। বিদ্যাপতিকে আয়ুর্বেদ শেখাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন গামাচরণ। কিন্তু বিদ্যাপতির উৎসাহ নেই।

ক্রমে জানা গেল, এক কাকার বংশবদ খিদমতগার হয়ে ঘুরে বেড়ান বিদ্যাপতি। কাকা শিকারে গেলে, বিদ্যাপতি সঙ্গে যান মাংস রান্নার জন্য। মাঝরাত্রে রামবাগান থেকে টালমাটাল পায়ে বাড়ি ফিরলে কাকাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে জুতো খুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া বিদ্যাপতির কাজ। অথচ তখন অন্য আত্মীয়রা বিদ্যাপতিকে জমিদারির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা শুরু করেছেন।

খবর পেয়ে বামাচরণ এলেন মেয়ে-জামাইকে দেখতে। মেয়েকে দেখেই বুঝলেন সুহাসিনী সুখে নেই। জামাইয়ের খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন বিদ্যাপতি নিম্ন রান্নায় আর পাশে বসা সেই কাকা কড়া থেকে মাংস তুলে চাখছে। আহত, ক্রোধান্বিত বামাচরণ দুই নাতি সমেত মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেন যশোর। তখন প্রশান্ত তিন বছরের, সুকান্তির গ্যাস এক।

এরপরে সমঝোতার চেষ্টা হয়েছিল একটা। কিন্তু হিটলার-স্তালিনের অনাক্রমণ চুক্তির মতই তা স্থায়ী হয়নি বেশিদিন। সুহাসিনীকে ছেড়ে চলে গেছেন বিদ্যাপতি।

সুকান্তির বাল্যস্মৃতিতে বাবা নেই, শুধুই মা। তখন তারা সোমেশ্বরের বাড়িবাগানের বাড়িতে। ভোরবেলা বারান্দায় এককাপ চা হাতে সুহাসিনী। পূর্বদিকে তাকাবেন কিছুক্ষণ।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বলবেন, নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। আরো একদিন দিলে মোরে বাঁচিবার
অধিকার।

প্রথম চুমুকটি দেবার পর খোলা গলায় আবৃত্তি করবেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান

আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,

দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমার

সে মহাদানেরই যোগ্য করে

অতি-ইচ্ছার সংকট হতে

বাঁচায়ে মোরে।

চা-পান শেষে দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে যাবেন স্কুলের উদ্দেশ্যে। অদূরেই ব্রাহ্মদের
স্কুল। সেখানে সেলাই দিদিমনির কাজ পেয়েছেন সুহাসিনী। দুপুরে বাড়ি ফিরে মামিমার
সঙ্গে হাত মিলিয়ে দশ বারোজনের রান্না শেষ করবার পর, গার্হস্থ্যের টুকিটাকি সেরে তিনি
চলে যান মহিলা সংগঠনের কাজে। কমিউনিস্ট পার্টির কমরেডদের জন্য এই মহিলা সমিতি
একটি মেডিক্যাল সেন্টার চালায়। বাংলার জেলায় জেলায় গড়ে তিনদিন অন্তর একজন
করে পার্টি কমরেড রোগে ভুগে মারা যাচ্ছেন। কলেরা আর বসন্তের প্রকোপ খুব বেশি।
মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশি দিনাজপুর জেলায়। তারপরেই বীরভূম আর জলপাইগুড়ি।
তুলনায় কলকাতার কমরেডদের মৃত্যুর হার কম। শুধুও চাপ আছে মেডিক্যাল সেন্টারের
কাজে।

নানান কাজে ভুলে থাকতে চাইলেও আরো বারে যৌন তাড়নায় কাতর হয়েছেন
সুহাসিনী। স্কুলের সম্পাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। গৌরবর্ণ, সুদর্শন ভদ্রলোকের এক
হাতে চুরুট, অন্য হাত সুহাসিনীর পিঠে। দুজনার চোখ বোজা। স্থান কাল ভুলে একে
অন্যকে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছেন। এক অধর অন্যটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। চায়ের
কাপ হাতে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই এ দৃশ্য দেখে স্থাগুবৎ সুকান্তি। দ্রুত
বেরিয়ে আসতে গিয়ে চলকে পড়েছিল গরম চা। তখন সুকান্তির স্বর ভাঙছে। শরীরে
নানান ওঠাপড়া।

এই প্রণয়পর্বের শেষ অঙ্কটিও মনে আছে সুকান্তির। তোলা উনুনের ধোঁয়ায় ঢেকে
আছে দোতলার সিঁড়ি। উপরের ধাপে সুহাসিনী। হাতে একটি ছোট বাস্ম।

মা বললেন, খুব সাবধানে এটা কোথাও ফেলে আয়। দেখিস বাবা, কেউ যেন জানতে
না পারে।

কোনও কৌতূহল হয়নি সুকান্তির। মা'র আদেশ পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুঝেছেন, ওই বাস্মে একটি ভূণ ছিল।

সুহাসিনীর স্বাধীন মনোভাবটি পেয়েছে তাঁর দুই ছেলেই। এমনকী তাঁর বেহিসেবি
যৌনাচারের ধরগতিও কিয়ৎপরিমাণে চারিয়ে গেছে দুজনের মধ্যে।

প্রশান্ত'র সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল তার মামাতো বোনের। বাদুড়াগানের বাড়িতে
তখন অনেকগুলি সমবয়সী ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বড় হচ্ছে। তাদের একজনের সঙ্গে দাদার
যৌনসম্পর্ক হবে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। যা অবাক করেছিল সুকান্তিকে, দাদা সেই

মামাতো বোনকে বিবাহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাড়িতে তুমুল অশান্তি। মাকে বড়মামা বলেছিলেন, এমন করলে পুলিশ কেস হয়।

মা কোনো উত্তর দেননি। আবার দাদাকে ভর্ৎসনাও করেননি। অবশেষে, প্রশান্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। যাজক হয়ে প্রথমে গিয়েছিল কলকাতা। গোয়ায় ছিল কিছুদিন। তারপরে ফিরে এসেছে কলকাতায়। সার্কুলার রোডের একটি চার্চে ও থাকে।

দাদার মতো অতটা বেশরোয়া না হলেও কামনার টানে মাঝে মধ্যে নিবিদ্ধ এলাকায় গিয়েছেন সুকান্তি। একবার এই পল্লীর রাস্তায় হাঁটছিলেন। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। দু'ধারে সারি সারি বারবধিতা। সন্ধ্যা প্রসাধন সেরে ওরা দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। অনেকেরই সিঁদুরের রঙ ফাকাশে লাল। হলুদ মিশে আছে লালের সঙ্গে। এদের সিঁদুরের রঙ অন্যরকম কেন? এ কি সস্তার কোনো রঙ না সত্যিই সিঁদুর?

—দাদাধাবু আসবে না কি?

সুকান্তি দেখলেন। বাতাসী! বাদুড়বাগানের বাড়িতে একসময়ে পরিচারিকার কাজ করেছিল।

বাতাসী আবার বলল, বসবে নাকি গো!

ওর দাঁতে পানের ছোপ। মোটা ঠোটদুটি গাঢ় লাল। শুনদুটি বন্ধুবন্ধনী ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাথায় যেন বিস্ফোরণ হ'ল সুকান্তির। আর কোনোদিন যাননি নিবিদ্ধ পল্লীতে।

ঘটনাটি মনে পড়ায় এত বছর পরেও সুকান্তির বিবমিষা হল। রাস্তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি।

হকাররা খবরের কাগজ বিলি করছে আমহাস্ট স্ট্রিটে। নিমদাঁতন হাতে চার পাঁচজন লম্বাচাকী হাসপাতালের দেওয়ালে সটানো সংবাদপত্র পড়ছে। তিনতলার বারান্দায় এসে পড়ল ইংরেজি দৈনিক। হাতে নিতে ইচ্ছে হ'ল না। খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিলেই হয়।

জীবনে অনেককিছু ছেড়েছেন সুকান্তি। স্নাতকোত্তর পড়াশোনার পর ছেড়েছেন সিগারেট। কাশির সঙ্গে মাঝে মধ্যে রক্ত উঠছিল। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল যক্ষ্মা নয়, ফুসফুসের কিছু অংশ ছড়ে গেছে। মনের জোর করে সিগারেট ছেড়ে দেন সে সময়। সিগারেটের পর ছেড়েছেন কলকাতা।

দিনাজপুর রিপন কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েছেন সুকান্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন থেমেছে। জার্মানি পরাজিত। তিনমাস আগে ইতালিতে জনসমক্ষে মুসোলিনী আর তার প্রেমিকার ফাঁসি হয়ে গেছে। আপানে অ্যাটমবোমা ফেলেছে আমেরিকা। কলকাতায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তুলে।

দিনাজপুরে শুরু হয়ে গেল তেভাগা আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের দাবি উৎপন্ন ধানের ঠিকভাগের দু'ভাগ পাবে যারা জমি চাষ করে সেই বর্গাদার বা আধিয়ার, একভাগ জোতদারের। জোতদার জমির মালিক। কিন্তু সে নিজে জমি চাষ করে না।

সুকান্তি আন্দোলনে মেতে উঠলেন। পুলিশ গুলি চালালে তদন্তদলের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান তিনি। শহরে ফিরে এসে কংগ্রেস ময়দানের জনসভায় তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন।

ভোতাধার, পুঁজিশের অত্যাচারের বিবরণ দেন। সভার মানুষ শ্লোগান দেয় ইনকিলাব জিন্দাবাদ তেভাগা চাই নিজ খোলানে ধান তোলা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়ে গেলেন সুকান্তি।

আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত থাকলেও মা'কে নিয়মিত চিঠি লিখতেন সুকান্তি। চিঠিতেই জানিয়েছিলেন রেবার কথা। রেবা মিত্র দিনাজপুরের স্কুল শিক্ষিকা। সুশ্রী গড়ন। তেভাগার সমর্থনে দিনাজপুরের অনেক সভাসমিতিতে ওকে গান করতে দেখা যায়। অপূর্ব গান করে। সঙ্গীত বড় প্রিয় সুকান্তির। বড় দুর্বলতার জায়গাও। গানের টানেই রেবাকে ভালো লেগে গেল। নিজে এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তারপরে বিবাহ।

স্বাধীনতার বছর কাটিয়ে, দাঙ্গার বছরের গোড়ায় সুকান্তি বদলি হয়ে চলে এলেন কলকাতায়। সেই থেকে মধ্য কলকাতার এই ভাড়াবাড়িই তাঁর ঠিকানা।

কলকাতায় চলে আসবার পর নিয়মতান্ত্রিক রেবার দাপটে জীবনযাপনে কিছু শৃঙ্খলা এসেছিল। নিয়ম মেনে সুরভি জন্মায়। রেবা হেয়ার স্কুলে গানের দিদিমণির চাকরি পেয়ে যায়। গানের সঙ্গে ভূগোলও পড়ায় সে। দাদার কাছে থাকলেও সুহাসিনী নিয়মিত আসেন এ বাড়িতে। থেকে যান দুয়েক দিন।

শুধু একটি ছন্দপতন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ হারালেন সুকান্তি। আজ পঞ্চাশ ছুঁতে চলার বয়সে পৌঁছে কারণটি ভাবলে মজাই লাগে। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টিতে তখন বি. টি. রণদিভে-র নেতৃত্ব। প্রায় প্রতিদিন পার্টির ইউনিটগুলিতে চলছে নানান রদবদল। পুরোনো মুখ চলে গিয়ে আসছে নতুন মুখ। লেখক, বুদ্ধিজীবীদের সভায় ঘোষণা করা হ'ল, বিপ্লব এসে গেছে। শিল্পী সাহিত্যিকদের উচিত অবিলম্বে শ্রমিক-কৃষক এলাকায় গিয়ে লড়াইয়ে অংশ নেওয়া। এজন্য, তাঁদের লেখাপড়ার কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে হয়, হবে। সভায় তুমুল হট্টগোল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানানেন। লিখতে না পারলে সাহিত্যিক যে মাথা কুটে মরে যাবেন! মানিকবাবুকে সমর্থন করেছিলেন সুকান্তি। তাঁর সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন পত্র-পত্রিকায়। পার্টির থেকে চাপ এল লেখা প্রত্যাহার করবার। সুকান্তি করেননি। হারালেন সদস্যপদ।

সেদিনও এমন সারারাত ভেগে বসেছিলেন সুকান্তি। সকালে সব শুনে মা বললেন, ঠিক করেছ বাবা, এরকম ফতোয়া দিয়ে বিপ্লব হবে নাকি?

ভালো লেগেছিল।

মা'র সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললে রেবা রেগে যায় জেনেও সুকান্তি কথা বলতেন সুহাসিনীর সঙ্গে। দাদুর কথা, বাবার কথা। বছর জিজ্ঞেস করা কথা আবার জিজ্ঞেস করতেন।

যেদিন সকালে উঠে জানলে বাবা তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন, কেমন লাগল? মা যেমন চুপ করে থাকতেন, তেমনই রইলেন। মাথাভর্তি রূপোলি চুলের বেশ কয়েকটি চোখের কাছে এলোমেলো উড়ছে। সুহাসিনীর দৃষ্টি দূরে নিবন্ধ। জীবনের বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী ওই চোখ সমস্ত তাৎক্ষণিকতাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে দূরে কোথায়!

রেবা যথারীতি সুরভিকে বকাবকি শুরু করেছিল। রান্নাঘরে কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দ।

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন সুকান্তি। জীবনকে জানতে ইচ্ছে করে। পার্টির

কাজ না থাকায় পাড়ার ছেলেরদের সঙ্গে মেশবার সময় পেয়ে গেলেন তিনি। দুর্গাপুজোয় মধ্য সাজিয়ে নাটক হল, প্রজাতন্ত্রদিবসে ফুটবল ম্যাচ। একটি ক্লাব ছিলই। সুকান্তির উৎসাহে ছেলেরা সেই ক্লাবঘরে পাঠাগার গড়ে তুলল। পাড়ার কয়েকটি পরিবার ওই পাঠাগারের জন্য পুরোনো বই দান করলেন। ভালো কাজে লোক জুটে যায়। সুকান্তির কথায় পাড়ার ছোট বড় সবাই এগিয়ে এল। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন বাচ্চা-বুড়ো সবার সুকান্তিদা। বাড়িতে থাকলেই তার ঘরে পাড়ার লোক আসার বিরাম নেই। কেউ আসে আড্ডা মারতে, কেউ সমস্যা নিয়ে।

সুকান্তির ভালোই লাগে মানুষের মধ্যে এই মিশে যাওয়া। কিন্তু রেবার প্রকৃতি অনারকম। ও যে কোনো সম্পর্ক অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করে।

ক্রমশ সন্দেহবাতিক বেড়ে উঠেছিল রেবার। যে কোনো মহিলা সুকান্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই, তা রেবার প্রশ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুহাসিনীকেও ছাড় দেয় না সে। সুকান্তি ক্ষতবিক্ষত হবেন জেনেও তাঁকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আক্রমণ করে যায় রেবা।

খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল একদিন। রাত্তিরে খেতে বসে সুকান্তি গল্প করছেন। বিভিন্ন রকমের ভাষণ শোনার কথা। প্রায় দেড় দশক আগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে জোলিও গুপ্তীর বক্তৃতা শুনেছিলেন তিনি। কুরীর কথা শুনে বোঝা গিয়েছিল মানুষটির যুক্তিবোধ প্রখর। সুহাসিনীর মতে শ্রেষ্ঠ বক্তা সোমনাথ লাহিড়ী। ওর মতো আবেগসঞ্চার করার ক্ষমতা কারো নেই।

সুহাসিনী বললেন, সোমনাথের বক্তৃতা শুনে মনে হয় মাটি ফেটে যাবে।

সুকান্তি একমত। মা'র হাত ধরেছিলেন তিনি।

হঠাৎ রেবা খাওয়া ছেড়ে উঠে পাড়ার ঘরে ঢুকে দরজার খিল দিল। অনেক ডেকেছিলেন সুকান্তি, রেবা সাড়া দেয়নি। কাতর গলায় দরজা খোলার আবেদন করেছিলেন সুহাসিনী। রেবা দরজা খুলল। ওর সর্বশরীরে রাগ ফেটে পড়ছে।

মা বললেন, আমি দেখেছি, এ বাড়ি এলেই সুকুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়। তুমি কি চাও না আমি এখানে আসি?

রেবা বলে উঠলো, না আসবেন না আপনি অত্যন্ত নোংরা। আপনার কীর্তি জানতে বাকি নেই কিছু আমার।

রেবার মুখ ঘুণায় বেঁকে গিয়েছিল।

ঘুমন্ত ছেলের ধুতি খুলে গেছে আর আপনি তা দেখতে আজ সকালে বারবার এ ঘরে উঁকি দিচ্ছিলেন..... কেন? কেন?আপনি না মা?

সুহাসিনীর মুখ রক্তশূন্য।

হ্যাঁ আমি মা সেজন্যই ও ঘরে গিয়েছিলাম। সুকান্তি আমার ছোট ছেলে, অনেক কষ্টে ওকে মানুষ করেছি.....আজ থেকে সুকুর পর হয়ে গেল।

থামুন আর বক্তৃতা দিতে হবে না।

রেবার কথায় সুকান্তি রেগে উঠে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। চেয়েছিলেন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে। কিন্তু এমন কিছু কথা আছে যা বলে ফেলার পর, ফেরানো যায় না।

সেদিনও এমনই বিনিদ্র কেটেছিল সারারাত। সেদিনও পূর্বের আকাশে শুকতারা ফুটতে

দেখেছিলেন সুকান্তি। মায়ের জীবনের সেইসব ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রেবার কানে কেমন করে গেল, ভেবে পাননি। তিনি বলেননি, এমন কী কোনো দুর্বল মুহূর্তেও।

ভোরবেলায় চায়ের কাপ হাতে মা প্রার্থনা করলেন না। বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় বসে সুকান্তি দেখলেন মা হেঁটে যাচ্ছেন আমহাস্ট স্ট্রিট ধরে, উত্তর দিকে। সেটা ছিল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের বছর। তারপর মা আর কখনই এ বাড়ির কড়া নাড়েননি।

মা চলে যাবার পর নিয়মিত দাদার বাড়িতে যেতেন সুকান্তি। আড্ডা জমে যেত অচিরেই।

মা'র গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ল। মারণ রোগটি বেড়েও গেল দ্রুত। কথা বলতে কষ্ট। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল সুহাসিনীর। দিন তিনেক আগে বিকেলে মা'কে দেখতে গিয়েছিলেন সুকান্তি।

জিঞ্জের করলেন, আজ দুপুরে কী খেয়েছো?

মা বললেন, ছাই খেয়েছি..... ছাই।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

সুহাসিনী বলেছিলেন, সুকু রাত হচ্ছে বাড়ি যাও।

সুকান্তির দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। বারান্দার থাম আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

ছুটির সকালে বাজার করতে চলেছেন বাবুরা। বাজার ভর্তি খলি দেখে লোকটির সাংসারিক বৃত্তান্ত অনুমানের চেষ্টা করেন সুকান্তি। তার প্রিয় খেলা। আজ ইচ্ছে করলো না। ভিড়ের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন নিরুপমকে। নিরুপম হেয়ার স্কুলের দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে। ওর ডান হাতে ফুটবল। হেঁটে আসছে স্কট লেন থেকে আমহাস্ট স্ট্রিটের দিকে।

সুকান্তি বুঝলেন নিরুপম তাঁর কাছে আসছে। আজ এ পাড়ার সঙ্গে তালতলার ফুটবল ম্যাচ। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব সুকান্তির।

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেতেই দরজা খুললেন সুকান্তি।

এ কী! এখনও রেডি হননি! চলুন চলুন দেরি হয়ে গেছে। ঠিক নটায় ম্যাচ আরম্ভ হবার কথা। রেফারির বাঁশিটা সুকান্তির দিকে বাড়িয়ে দিল নিরুপম।

মা'র কথা বললেই নিরুপম কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যাবে বিলক্ষণ জানেন সুকান্তি। ব্যক্তিগত কষ্ট চেপে বহুজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার মজাই আলাদা। এতে কষ্টের অনুভূতি আরও বাড়ে, ক্রমশ চেপে বসে, ধীর লয়ে পান করা সুরার মতন।

সুকান্তি মা'র কথা জানালেন না নিরুপমকে। বললেন, চল যাওয়া যাক। তিন মিনিট লাগল ধুতি ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পড়তে। শোবার ঘর থেকে রেবা বেরিয়ে এসেছিল। ওর চোখে মুখে এক রাশ বিরক্তি। কিন্তু এখন বিরক্তি গ্রাহ্য করবার সময় নয়।

নিরুপমকে নিয়ে সুকান্তি বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।



হিলকার্ট রোডে পেট্রোল পাম্পের গা ঘেঁষে পশ্চিমদিকে ঢুকে গেছে সংকীর্ণ মাটির রাস্তা। রাস্তা ধরে কিছু এগোলেই মহানন্দা পাড়া। শিলিগুড়ির অন্যান্য এলাকার তুলনায় এই পল্লীটি কিঞ্চিৎ নির্জন। বেশ কিছু কাঠের বাড়ি এবং সংলগ্ন জমি থাকার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের এ পাড়া তেমন ঘন বসতিপূর্ণ মনে হয় না। একটি খোলা মাঠও আছে। ছেলেরা খেলাধুলা করে সেখানে। খেলার মাঠের বিপরীতে একটি ছোট কাঠের বাড়ি। একতলা বাড়িটির লাগোয়া জমিতে একাধিক কাঁঠাল গাছ। রাস্তা থেকে এক চিলতে জমি পেরিয়ে বাড়িটিতে ঢুকতে হয়।

মহানন্দা পাড়ার এ বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা নানান লোকের আনাগোনা। কেউ কেউ আবার থেকেও যায় দুয়েক রাস্তির। বাড়িটিতে ঘর বলতে দুটি। একটি ঘর বড় — সেখানে সবাই শোয়। অন্যটি ছোট।

বড় ঘরের এককোণে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঐশ্বর্যশোয়া ভঙ্গীতে বসে আছেন যে মানুষটি, তিনি চারু মজুমদার। পরনে লুঙ্গি আর হাতওয়ালা গেঞ্জি। গরম চাদর জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে। পবিত্র শান্তি খোকনরা বসেছে মোড়ায়। ডাক্তার ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায় এসেছেন চারুকে দেখতে। ক্ষীরোদনাথ বসেছেন ডাক্তারকে কেউ চিনবে না এ পাড়ায়। সবাই বলে কালু ডাক্তার।

চারু অসুস্থ। কিছুকাল আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তারপর থেকেই শরীর ভালো যাচ্ছে না।

কারাগার নতুন নয় চারুর কাছে। স্বাধীনতার আগে দু'বার গেছেন। স্বাধীনতার পর এই নিয়ে তিনবার হয়ে গেল। তবে এবারের কারাবাসে শরীর ভেঙেছে চারুর। জেলে অনশন আন্দোলন করেছিলেন তিনি। মুখে নল পুরে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টায় দাঁত ভেঙে দিয়েছে ওয়ার্ডাররা। কঙ্কালসার চেহারায়, দাঁত ভাঙা মুখে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সেই বৃদ্ধ দেখায় চারুকে। জেল থেকে ছাড়া পাবার কিছুকাল পরেই দার্জিলিং গিয়েছিলেন জেলা কমিটির মিটিঙে যোগ দিতে। ফেরবার পথে বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। হৃদযন্ত্রের অসুখ ধরা পড়েছে চারুর। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ণ বিশ্রামের।

শরীর ভাঙলেও তাঁর ঐশ্বর্য রক্তবর্ণ পদ্মপলাশ লোচনের ঔজ্জ্বল্য কমেনি। কৃশকায় হবার জন্য চোখ দুটি আরও বড় দেখায়। রক্তচাপ মাপা শেষ হতে ডাক্তারবাবুর মুখ গভীর হয়ে গেল। মৃদু হেসে চারু বললেন, কত দেখলেন?

কাণ্ডবাবু বললেন, এখনও প্রেসার বেশ কমের দিকে। ওষুধ খাচ্ছে তো ঠিকঠাক?

— হুঁ

— বুকে বাথা হয়েছিল এর মধ্যে?

— না

চাকর চোখের পাতা একটু টেনে লালাও অংশটি দেখে নিলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, পার্টি ভেঙে গিয়ে ভালোই হ'ল কী বল?

বিশ্রামে থাকলেও বই পড়া, তর্কের তো বিরাম নেই। বরং আড্ডা বিতর্কে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় চাকর।

চাকর বললেন, ভিয়েররি শুভ। এই যে আলাদা একটা কাঠামো হয়ে গেল, দেখবেন এর মধ্যে দিয়েই লড়াই শুরু করবার সুযোগ এসে যাবে।

কালুবাবু তো শুধু পারিবারিক ডাক্তার নন, বন্ধুও। ওঁর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে যেতে পারেন চাকর।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ভেঙে দুটুকরো হয়ে যাবে, জানাই ছিল। স্বাধীনতার পরের বছরে, সেই দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় থেকেই ক্রমশ বিরোধ বেড়েছে।

কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির সিদ্ধান্ত — এই আজাদি বুটা। দেশবিভাগ নাকচ করে, সারাদেশে সরাসরি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পুঁজির বিলোপ করতে হবে। সময় এসে গেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর। পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল সরকার। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে চাকরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বেআইনি হবার তিনমাস পর হাইকোর্টের রায়ে বৈধতা পেয়ে গেল দল। বন্দির ছাড়া পেল।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরের বছর থেকেই অভ্যুত্থানের পন্থা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। তেলঙ্গানার লড়াই চালানো অস্ত্রের কমরেডরা বললেন বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক। অর্থাৎ আগে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে তারপর সমাজতান্ত্রিক রাস্তায় হাঁটবার জন্য পুঁজির বিলোপ করতে হবে। ওঁরা জানিয়েছিলেন চিনের বিপ্লবের পথই ভারতীয় বিপ্লবীদের নেওয়া উচিত। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অস্ত্রের কমরেডদের কথাবার্তাকে বিশেষ আমল দিল না। তবে, আগের জমানার অনেক কিছুই পার্টি নতুন কর্মসূচী নেওয়া হল।

ইতিমধ্যে আবার কারাগারে পাঠানো হয়েছে চাকরকে। এবার বঙ্গা জেল। ভূটানের পাদদেশে ডুমার্সে ইংরেজ আমলের কুখ্যাত বঙ্গা অন্তরীণ শিবিরটিকে আবার চালু করেছে সরকার।

সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল দল। আবার ছাড়া পেল সবাই। নির্বাচনের বছরেই চাকর বিবাহ। লীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে।

মাদুরাইতে তৃতীয় কংগ্রেসের পর থেকেই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে জাতীয় নীতির প্রশ্নে বিরোধ জন্মতে থাকে। পালঘাটে চতুর্থ কংগ্রেসে মতানৈক্য বাড়ে।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নিয়ে এলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার তত্ত্ব। শোষক আর শোষিতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাও বলা হ'ল। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আর সহাবস্থানের কথা শোনা গেল অমৃতসরে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে।

দলের উপর থেকে নীচ অবধি শুরু হল মতামতের লড়াই। এক অংশ বলে অবিলম্বে শ্রমিক কৃষকের সখ্যের ভিত্তিতে বামপন্থী দলগুলির সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা উচিত। সংযুক্ত ফ্রন্টই সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাবে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শক্তিশালী অংশের অভিমত জাতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে রেখে, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। প্রথম অংশের নাম হল ইউনাইটেড ডেমোক্রটিক

ফ্রন্ট আর দ্বিতীয় অংশ পরিচিতি পেপল ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট হিসাবে। চর্চা কথায় এলা হতে থাকল ইউ ডি এফ আর এন ডি এফ।

পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ আর কেরালায় ইউ ডি এফ-ওয়ালাদের প্রভাব বেশি। এঁরা ক্রুশ্চেভের রাস্তাকে নাকচ করে দিলেন। ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী। পশ্চিমবঙ্গের ইউ ডি এফ-পন্থী নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের উৎসাহে তাঁর ঘনিষ্ঠ সরোজ দত্ত আলবানিয়ার পার্টি অব লেবার প্রকাশিত এনভার হাজার সংশোধনবাদ-বিরোধী দলিলগুলি গোপনে ছেপে বিলি করার ব্যবস্থা করলেন।

সরোজ দত্তের মতো চারুও ইউ ডি এফ-পন্থী। সেই চল্লিশের দশক থেকে চারু জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিক কৃষক এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি থেকে চলে এসেছেন দার্জিলিং জেলায়। দীর্ঘকাল শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে থেকে কৃষিক্ষণ, ফসলের ভাগ, জমির অধিকার ইত্যাদি দাবি আদায়ের আন্দোলন করা চারু জানেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের অবস্থা পাষ্টানো সম্ভব নয়।

ইউ ডি এফ - এন ডি এফ মতবিরোধ চরমে উঠল অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ায়, পার্টির গঠন কংগ্রেসে। এন ডি এফ-ওয়ালাদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে, গৃহযুদ্ধ ছাড়াই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখল করবার সুযোগ আছে। এন ডি এফ-দের বক্তব্য, এ প্রস্তাব মূলত জওহরলাল নেহরু সরকারের পক্ষ সমর্থন ছাড়া কিছু নয়। কংগ্রেসিদের মন পাবার তাগিদে এ প্রস্তাবের প্রবক্তারা মার্কসবাদ বিচ্যুত হয়ে বহু দূরে সরে গেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার বিরোধ বাড়বার পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মতবিরোধ।

বিজয়ওয়াড়ার কংগ্রেসের ছমাস পরেই মস্কোতে অনুষ্ঠিত হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ষাটবৎসরীয় কংগ্রেস। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বারবার জোর দিলেন শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সহাবস্থান প্রতিযোগিতার উপর। কংগ্রেসে উপস্থিত চিনের প্রতিনিধি টো এন পাই সরাসরি জানালেন এ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, সংশোধনবাদী লাইন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও রুশপন্থী আর চিনপন্থী দু'ভাগ হয়ে গেল। এন ডি এফ ওয়ালারা রুশপন্থী আর ইউ ডি এফ-দের বলা হয় চিনপন্থী। এরপরেই ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি। সীমানা বিরোধ। যুদ্ধ। ভারতরক্ষা আইনে চিনপন্থীদের থেপ্তার।

চারু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি, পরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। দমদমে থাকার সময়েই পেলেন পিতা বীরেশ্বরের মৃত্যুসংবাদ। প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলেন দশ বারো দিন। আবার জেলে ফেরা।

জেলের মধ্যেই চিন-রাশিয়ার বিতর্কের দলিল আসতে লাগল। চারু খুঁটিয়ে পড়েন দু'পক্ষের যুক্তি। বিপ্লব করতে হলে চিনের পথই ঠিক। ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদের স্বরূপ সবাইকে জানানো প্রয়োজন।

চিনপন্থীরা উপায় বের করলেন। এঁদের হাতে ছিল 'হাওড়া হিতৈষী' নামে এক পত্রিকা। পত্রিকাটির নাম পাণ্টে করা হ'ল দেশহিতৈষী। সাপ্তাহিক দেশহিতৈষীতে সংশোধনবাদের

বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে লিখতে শুরু করলেন চিনপত্নীরা। ভয় ছিল, যদি দেশহিতৈষী বন্ধ করে দেয় সরকার। আর একটি পত্রিকা নথিবদ্ধ করে রাখা দরকার। ‘দেশব্রতী’ নামে আর একটি পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হল।

শোধানবাদের বিরুদ্ধে লেখালেখির লড়াই জমে ওঠার মুখে প্রকাশ পেল পার্টির নেতা এস এ ডাক্সের গোপন চিঠি। দেখা গেল ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পনের প্রমাণ রয়েছে চিঠিগুলিতে।

পার্টি ভাগ হয়ে গেল। কলকাতায় ত্যাগরাজ হলে দলের সপ্তম কংগ্রেস। প্রকৃতপক্ষে এ হল নতুন পার্টির প্রথম অধিবেশন। নতুন পার্টির নাম হল কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট), চলতি কথায় সি পি আই (এম)।

নতুন কাঠামো হওয়ায় চারু খুশি। যদিও দল গঠনের পর তিনমাস কেটে গেল এবং এখনও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছে না। সোভিয়েত পার্টির কিছু খারাপ, চিন পার্টির কিছু ভালো এমন একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছে, তবু এই দলের মধ্যে থেকেই বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বিপ্লবী সংগ্রামটাই দরকার — এই কথাটা বারে বারে জোর দিয়ে বোঝাতে চান চারু।
— বুঝলে হে, এই খোলামেলা, কিছু সুবিধা আদায়ের সংগঠন নয়, সত্যিকারের বিপ্লবী দল বানাতে হবে আমাদের।

পবিত্র বলে, চারুদা কাদের নিয়ে গড়বেন বিপ্লবী দল?

— বিপ্লবী কর্মী নিয়ে

— কারা বিপ্লবী কর্মী?

— যারা নিজের উদ্যোগে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই হিসাবে কাজের ধারা ঠিক করতে পারে, তারাই।

চারুর বক্তব্য, প্রত্যেক পার্টি সভাকে পাঁচজনের অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ, অন্তত একটি করে বানাতে হবে। ওরা অন্য কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবে। এই গ্রুপের বৈঠক হবে গোপন জায়গায়, সভার কাগজপত্র রাখতে হবে গোপনে। এই সক্রিয় দলের কর্মী রাজনৈতিক শিক্ষা এবং কাজে পারদর্শী হয়ে উঠলে, তাকে দিতে হবে দলের সদস্যপদ। সদস্যপদ আসার পর সে আর তার গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না।

শান্তি বলল, কিন্তু আপনি নতুন কী বলবেন এদের?

— দেখ, আমাদের মূল কাজটা হল কৃষিবিপ্লব। এই বিপ্লবের কার্যক্রম, উপকারিতার কথা যত বেশি করে শ্রমিক, মধ্যবিত্তকে বোঝাতে পারব, তারা তত কাছে এগিয়ে আসবে আমাদের।

কালুবাবু বলেন, আরে সে তো তোমাদের এই নতুন পার্টিও বলছে।

চারু স্থির চোখে দেখেন কালু ডাক্তারকে। তারপর মৃদু হেসে মাথা নাড়েন।

— বলছে বটে কিন্তু সেই লক্ষ্যে যেন ঠিক এগোচ্ছে না.....আসলে বহুদিন ধরে শোধানবাদী কাজকর্ম করার ফলে এদের অনেকের মধ্যে জড়তা এসে গেছেএরা মনে করছে কৃষকসভা আর ট্রেড ইউনিয়ন করাটাই একমাত্র কাজ।

— হ্যাঁ তাই তো, কিন্তু আর কী করবার আছে?

— আছে আছে

— আমাদের সমস্ত আন্দোলনের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সর্বহারাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কথটা বাদ দিলে সে পাটি আর বিপ্লবী থাকে না..... আর এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল শুরু করতে হবে।

থোকন বলল, তাহলে কি আমরা বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে যে সব আন্দোলন করেছি এতকাল, তা অচল? চারু বললেন, আমি কখনওই সে কথা বলছি না। সব যুগে সবরকম আন্দোলন চালাতে হয় কিন্তু আন্দোলনের ধরন নির্ভর করে শাসকশ্রেণীর ওপর।

পবিত্র, থোকন দু'জনেই বলে ওঠে, কেন? আমরা কী ধরনে আন্দোলন করব, ওরা ঠিক করে দেবে কী করে?

চারু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় এক মুসলমান কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে চারু দেখেছিলেন তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর জমিদারের গুণ্ডার পাশবিক অত্যাচার। বিপন্ন কৃষকটি চারুকে কাতরকণ্ঠে বলেছিল, কমরেড, বদলা নিতে পারবি না? পরমুহূর্তে নিরস্ত্র মানুষটি সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে গুণ্ডাটিকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছিল। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিনের নিরস্ত্র কৃষক তাকিয়ে ছিল দলের নেতাদের দিকে। নেতারা কৃষকদের সশস্ত্র হবার কথা বলেননি। উচিত ছিল এলাকাগত ভাবে দা-ছুরি-লাঠি দিয়ে কৃষকদের সশস্ত্র করা। তাই নিজেই সুযোগমতো আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া।

সেই তেভাগার পর থেকে সরকার ভারতবর্ষের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ধারাবাহিকভাবে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই দমন পীড়নের শাসনে জনতাকে নিরস্ত্র এগিয়ে দেবার অর্থ তাদের মনোবল একটা সবকিছু ভেঙে দেওয়া। আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। এ তো সহজকল্পিত কথা। এটা বুঝতে না কেন?

চারু বলেন, মরণে যায়। এটা কোনো প্রশ্ন হলে? আজকে যখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ তাল চালায়, মানুষ মারে, আমরা কী করি, না শোকমিছিল। এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে মানুষের সাহস জাগে না। শাসক যখন সশস্ত্র, আমাদেরও আমাদের মতো করে সশস্ত্র হতে হলে। তবেই মানুষের মধ্যে ভরসা জাগবে, জোয়ার আসবে।

শান্তি পবিত্র থোকন-কালুবাবুর জিজ্ঞাসু চোখের সামনে চারু বলে যেতে থাকেন নতুন কথা।

বেলা গড়িয়ে যায়। আড্ডা ভাঙে। কিন্তু চারুর মাথায় ঘুরপাক খায় আড্ডার কথাই। সক্রিয় প্রতিরোধ করার জন্য কর্মীদের আগলে রাখাও দরকার। ওদের জন্য চাই উপযুক্ত শেল্টার আর যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুধু সক্রিয় কর্মী নয়, প্রতিরোধের কলাকৌশল শেখাতে হবে গণআন্দোলনে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষকেও। গুলির সামনে শুয়ে পড়া বা কোনো শত্রু আড়ালে চলে যাওয়া, ব্যারিকেড গড়ে তোলা এইসব শেখাতে হবে তাদের। সক্রিয় কর্মীদের চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেবার। প্রথমদিকে হয়তো তেমনভাবে বদলা নেওয়া যাবে না কিন্তু একটু লেগে পড়ে থাকলেই সাফল্য পাওয়া যাবে। এই সাফল্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে দিলেই সাধারণ মানুষের ভয় হতাশা কেটে যাবে। এমনভাবেই তো প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে সব দেশে। মাও সে-তুও একেই বলেছেন টিটু

বদলা নেবার লক্ষ্যটিকেও ঠিক করা দরকার। জনতা রেগে উঠে আক্রমণ করে সরকারি বাড়ি, নয়তো ট্রাম-বাস-ট্রেন। যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে কী লাভ? আঘাত করতে হবে ঘৃণিত আমলা, পুলিশ কর্মী, মিলিটারি অফিসারদের। মানুষকে বোঝাতে হবে, দমননীতি থানা করে না, করে থানার দারোগাবাবু, আক্রমণ করে সরকারি গাড়ি বা যানবাহন নয়, সরকারি দমনযন্ত্রের মানুষ। সেই মানুষগুলিকে আক্রমণ করতে হবে।

নতুন চিন্তায়, নতুন দিনের চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন চারু। চিন্তাভাবনাগুলি লিখে ফেললে কেমন হয়? পরে সেগুলি নিয়ে আরো অনেক অভিজ্ঞ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

লেখার ব্যাপারে চারুর বরাবরের অনীহা। কিন্তু চিন্তাগুলি ক্রমশ অধিকার করে তাঁকে। কুয়াশার মতো ঘিরে থাকে, ভেসে বেড়ায়। লিখতেই হবে।

ইজি চেয়ারের হাতলে কাগজ কলম নিয়ে শুরু করে দেন লেখা বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য। প্রথম রচনাটির পর লেখার ইচ্ছে আরও বেড়ে যায় চারুর। সব কথা বলা যায়নি প্রথমটিতে। লেখেন, 'শোধানবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলুন।' তারপরেও বেরিয়ে আসতে থাকে আরও আরও কথা।

ফ্রান্স-আমেরিকা-জাপান-কম্বোডিয়া-দক্ষিণ ভিয়েতনামের তরুণেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দুনিয়াজোড়া বিক্ষোভের শব্দ পাশি ভারতবর্ষেও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে কংগ্রেস সরকার উচ্ছেদের দাবীতে। অতীত সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে। খাদ্য সংকট আর মূল্যবৃদ্ধিতে বিস্মিত জনতা নিরস্ত্র আন্দোলনের পথ ছেড়ে কলকাতার দমদমে বাজার লুট করেছে। উত্তম-মধ্যম দিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীদের। এই পদ্ধতির নাম হয়ে গেছে দমদম দাওয়াই। জেলায় জেলায় এমন পদ্ধতির প্রয়োগ করছে মানুষজন ক্রমশ আগ্রহী।

পরিবেশের প্রভাব এসে গেল চারুর রচনায়। পঞ্চম নিবন্ধটির শিরোনাম দিলেন, '১৯৬৫ সাল কী সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে?'

কিন্তু রচনাটি শেষ হবার আগেই এক ভোররাতে মহানন্দা পাড়ার কাঠের বাড়িটি ঘিরে ফেলল পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন চারু মজুমদার।



বছরের শুরুটা হয়েছিল খারাপ ভালো মিশিয়ে।

খারাপ, কারণ দ্রোণ নবম শ্রেণী থেকে দশমে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রগতিপত্র নিতে গিয়ে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি শ্রীমান। এক সপ্তাহ কোনো খোঁজ নেই ছেলের। খুবই উদ্বেগে ছিলেন নিবারণ।

শীতলা মন্দিরের গুণিনকে ধরেছেন। গ্রহ, নক্ষত্র বিচার করে প্রভাস গুণিন জানিয়েছিল ছোটব্যাটা কলকাতায় রয়েছে। মগরার জ্যোতিষী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীকে দিয়েও কোষ্ঠীবিচার

করানো হয়েছে। চক্কোস্তিও বলেছিল, দ্রোণাচার্য কলকাতায় নিরাপদে আছে। কমলা জানিয়েছে, পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন দ্রোণা কিছু টাকা চাওয়াতে, সে পাঁচ টাকা দিয়েছিল ছোটভাইকে। কিন্তু পাঁচটাকাতে একটা মানুষের কতদিন চালানো সম্ভব? জানা গিয়েছে, ছেলে চাকদাতেও গিয়েছিল তার ছোটমামার কাছে। সেখানেও সত্যি-মিথ্যে যা হোক বলে কিছু টাকা জোগাড় করেছে।

অষ্টম দিনে দ্রোণের চিঠি এসেছিল। চিঠিতে জানা গেল, সে ট্রেনে চেপে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। কোথা থেকে চিঠি লিখে, উল্লেখ নেই। ডাক-বিভাগের ছাপ থেকে বোঝা যায় পটিনা থেকে এসেছে ওই চিঠি। অর্থাৎ শ্রীমান কলকাতায় নেই। আবার এমনও হতে পারে সে কলকাতাতেই আছে কিন্তু বাড়ির লোকদের বিভ্রান্ত করবার জন্য কোনো পরিস্থিতিতে দিয়ে পটিনা থেকে পোস্ট করিয়েছে চিঠিটা।

চিঠি পাবার পর কিছুটা স্বস্তি। শ্রীমান নিরাপদেই আছে। আবার শীতলা মন্দির এবং মগরায় গিয়েছিলেন নিবারণ। চিঠির কথা শোনার পরেও গুনিরের বস্তুব্য দ্রোণা কলকাতাতেই আছে। প্রভাস জয়পুরের বাড়ির চারপাশে মন্ত্র পড়ে বন্ধন করে দিয়ে গেল। আর কোনো অমঙ্গল ঢুকবে না নিবারণের বাড়ি। দুষ্ট গ্রহের প্রভাব কিছুটা এড়ানো যাবে। চাকাত ও জ্যোতিষী অবশ্য বলেছিল ছেলে কাজ খুঁজতে দিল্লি পাড়ি দিয়েছে। নিরাপদেই আছে দ্রোণাচার্য। কাজের ব্যবস্থাদি হলেই বাড়ি ফিরবে।

বারো দিনের মাথায় খারাপ কেটে গিয়ে ভালোবাসা ভাঙল। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তার গলার আওয়াজ পেয়েছিলেন নিবারণ। দ্রোণাচার্য ফিরে এসেছে। বাড়িতে হেঁটে। শ্রীমান গিয়েছিল লক্ষ্মী। উপস্থিত ভাইকে ছোটবাবু তার ভ্রমণকাহিনী সবিস্তার বলে চলেছে।

নিবারণের পাগ হয়নি বরং গর্বিত হয়েছিল। ছেলেটা এত কম পরিশ্রমে লক্ষ্মী ঘুরে কতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এসে। বারোদিন অর্থাৎ দু'শো অষ্টআশি ঘণ্টা তাকে কিছু না কিছু আশ্চর্য্যভর সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। তবু সে হার মানেনি। এমনই শিং ভাজা গো। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিল নিবারণের। কিন্তু তিনি তা করেননি। দ্রোণার গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন শুধু।

বিগত কদিনে উদ্বেগের মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে মগরার স্কুল থেকে দ্রোণাচার্যের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে রেখেছিলেন নিবারণ। শৈল আচার্যের মাধ্যমে চন্দননগরের ডাঃ শীতলপ্রসাদ ঘোষ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলা হয়েছিল। অনেক অনুনয় অনুরোধের পর প্রধানশিক্ষক মশাই দ্রোণাচার্যকে দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এসব কেতাবি পড়াশুনো করে কী যে হবে? সংসারের যা অবস্থা, শ্রীমান কোনো কাজে ঢুকে পড়তে পারলে, দু'পয়সা আসে ঘরে। অবশ্য যতক্ষণ না কোথাও কাজ পাচ্ছে, পড়াশুনো করাই ভালো। শেষ অবধি চন্দননগরের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল দ্রোণাচার্য।

বছরের শেষ রাতে দিনলিপি পাতা উলটোতে গিয়ে নিবারণ দেখলেন বৈচিত্র্যময় ঘটনা বলতে ওই একটিই — বছরের গোড়ায় দ্রোণের চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা। পরবর্তী দিনলিপি তো গতানুগতিকতায় ভরা। সেই হিসাব এবং হিসাব। অবশ্য আটটা নটার সূর্য : ৩ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিষপত্রের দামের ওঠাপড়ার খবরও বেশ আকর্ষণ।

শৈল আচার্যের হিসাব খাতাটি কাছে টেনে নিলেন নিগারচন্দ্র। আচার্যিয়ার খাতায় বাজারদর, রেশনের চাল-গম-চিনি-ময়দার হিসাব পড়তে পড়তে রাত গড়ান হয়ে এল।

এক বছর আগে যে সংসার সাড়ে তিনশো চারশো টাকায় চলে যেত, উনিশশো পঁয়ষট্টিতে তা চালাতে লাগছে পাঁচশো টাকা। দ্রুত দাম বেড়ে চলেছে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্রের।

পঁয়ষট্টির সতেরো সেন্টেম্বরের হিসাবের দিকে চোখ গেল নিবারণের। ৭ কিলো ২০০ গ্রাম চাল ৫.৯০ টাকা, ৬ কিলো ৬০০ গ্রাম গম ৩.৭০ টাকা, ৬০০ গ্রাম ময়দা ৪৩ পয়সা, ১ কিলো ৯০০ গ্রাম চিনি ২.৫৩ টাকা। সর্ব্বের তেলের দাম হু হু করে বেড়ে গেছে। পাওয়াও যায় না সবসময়। আচার্যি বাদাম তেল খাওয়া শুরু করেছে ওই সেন্টেম্বরের মাস থেকে — ৪ কেজি বাদাম তেলের দাম ১৯.৫০ টাকা। খোলাবাজার থেকেও চাল কিনে ঘরে মজুত রাখছে আচার্যি। ১৫০ কিলোগ্রাম চালের দাম ১৩৫ টাকা।

এর পরের দিনই আচার্যিয়ার ছেলে মিঠুর পা কেটে গেছে। হিসাবের খাতায় লেখা — ডাক্তারের ফি, স্টিচ করা সহ ৭ টাকা। অ্যাস্টিটিউটেনাস ১.৭৮ টাকা। অন্যান্য ওষুধ ৪৫ পয়সা। রিকশা ভাড়া ৫০ পয়সা। মোট ব্যয় ৯.৭৩ টাকা।

সেন্টেম্বরের মাসেই শৈলবাবুর কনিষ্ঠ শ্যালিকা 'শ্রীমতী টুলু ব্রহ্ম' হয়েছে। নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো এবং তা ডাকটিকিট মেরে পাঠাতে মোট ব্যয় ২৩.৯০ টাকা। তালসহ সিস্ট্র ট্রাঙ্ক ১৮.৮৮ টাকা। কাপড় জামা, জুতো, বিছানাপত্র ইত্যাদি খাতে ২৫৩.১৫ টাকা। প্রসাধনী ১৭.৬১ টাকা। বাসনপত্র ১৩৯.২৭ টাকা। বরেক্ত সোনার বোতাম ৯০ টাকা। বরপণ ৩৫১ টাকা। বর আনবার খরচ ১১৩.৪৬ টাকা। ব্রীতিভোজ ১০৫২.৯৪ টাকা। প্যান্ডেল, রান্নার বাসন এবং যাতায়াত ২০৫ টাকা। ঘটক ৩০ টাকা। নাপিত ৬১ টাকা। ঘড়ি ২০০ টাকা। মোট ২৫৫৬.২২ টাকায় বিয়ে হয়ে গেল।

অক্টোবরের গোড়ায় গৃহশিক্ষকের দক্ষিণার হিসাব। মিঠুর গৃহশিক্ষক ২০ টাকা। আর মনার খাতে ৫ টাকা।

দ্রোণাচার্যের জন্যও গৃহশিক্ষক রাখতে পারলে ভালো হয়। অন্তত অঙ্ক শেখানোর জন্য শিক্ষক দরকার। কিন্তু কীভাবে তার সংস্থান করা যাবে? হিসাবের খাতা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেন নিবারণ। রাত গড়িয়ে চলে।

দ্রোণ গভীর নিদ্রায়। ঘুমোলে ওর দেবশিশুর মতো চোখ ঢেকে যায়। কমে যায় মুখের ওজ্জ্বল্য। দ্রোণাচার্যের বালিশের পাশে নীল খাতা। খাতাটি কিছুকাল আগে নেড়ে চেড়ে দেখেছিলেন নিবারণ। তাঁর অভ্যেস ছেলেও পেয়েছে। ছোটব্যাটা অবশ্য হিসাব লেখে না। এলোমেলো নানান মনের কথায় ভরা ওর খাতা। খাতার একপাশে লেখা ছিল, কবিতার নাম জীবনসর্বস্ব কথাশিল্প। অন্যপাতায়, অন্তরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নাম কবিতা।

ছেলে কি কবিতা লিখছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি নিবারণ। কবিতার মতো দেখতে একটি রচনা ছিল খাতায়। রচনাটির নাম পথচারী। লেখাটির অন্যসব ভুলে গেলেও প্রথম দুটি চরণ মনে আছে নিবারণচন্দ্রের। পায়চারি করতে করতে আবৃত্তি করেন তিনি।

লিখব আমি কী, সবকিছু তো আমায় ছেড়ে

অতল শূন্যে বিলীন.....

এই পয়সে এমন হারাবার কষ্টবোধ কেন? দ্রোণাচার্যের ঘুমন্ত ঠোটদুটি নড়ে ওঠে।
নিগারন মুদ্রা চাষেন। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে।

গাড়ির দাওয়ায় এসে দাঁড়ান নিবারণ। নিস্তব্ধ চরাচর। আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ
অবস্থানে আনড়। যেন কুরুক্ষেত্রের সৈন্য সমাবেশ। কিছু পরেই শুরু হয়ে যাবে তারায়
তারায় যুদ্ধ। ভীষ্ম-দ্রোণ-শল্য বনাম যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন। কৌরব বনাম পাণ্ডব।

নিগারনের আবক্ষলিখিত স্মৃতির মধ্যে দিয়ে খেলে গেল পৌষের হিমবাতাস। তুষারধবল
জোৎস্নাখানি নিবারণের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন অবিকল নিবারণের মতো দেখতে আর
এক প্রৌঢ়।

কী, ভেঁটে ভেঁটে জেলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখতে পারছ না বলে মনখারাপ করছে?
৬

ভেঁগো না, ও নিজে নিজেই শিখে নেবে জীবনের সবকিছু।

কিন্তু অঙ্ক শেখানোর জন্য তো কাউকে দরকার?

দেখো ও নিজেই পারবে। আর তা ছাড়া ও ঠিক অঙ্কের হিসাব জানা ছেলে

৭ ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

স্বপ্ন তো আমিও দেখি। একটু ভালোভাবে বাঁচবার স্বপ্ন।

হ্যাঁ তোমার স্বপ্নই তো চারিয়ে গেছে ওর মধ্যে। দ্রোণও ভালোভাবে বাঁচতে চায়।

এমন স্বপ্ন দেখলে কষ্ট পেতে হয় খুব।

হ্যাঁ, কষ্ট তো পাবেই, আবার আনন্দও থাকবে।

আর কত কষ্ট আসবে বলতো? বড়ো ছেলে গ্রহবৈগুণ্যে জেলহাজতে, ছোটছেলেকে
ঠিকমতো ভরণপোষণ করতে পারি না..... সেই কবে থেকে তো গ্রহণের দশা চলছে
আমাদের এরকম করে বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না। এর চেয়ে একেবারে জ্বলেপুড়ে
মর শেষ হয়ে গেলেই তো ভালো।

৮ বাঁচবে, কোনো শপ নেই। অন্য প্রৌঢ়টির সঙ্গে বাগানের প্রতিটি গাছ, গাছের প্রতিটি
পাখি শুরু হয়ে নিবারণের কথা শোনে। কিছু পরে নিবারণের মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষটি
মাথা নাড়েন। তাঁর ঠোটের উচ্চারণের সঙ্গে জোৎস্না-ধোয়া দাড়ি নড়ে ওঠে। প্রৌঢ়টি
গীতার শ্লোক বলেন, — ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

দুর্বলতা তো কাটাতেই হবে। মরে যাওয়া অত সহজ নয়। বাগানের পুষ্পাবৃত পথে
হাঁটতে হাঁটতে নিবারণ কুড়িয়ে নেন ভূমিতে পড়ে থাকা ফুল এবং ফল। আত্মা অবিনাশী।
কোনো অভাবের আশুন কোনো শস্ত্র তাকে ধবংস করতে পারে না। গীতা মুখস্থ নিবারণের।
প্রৌঢ়টির বলা শ্লোকের প্রেরণায় নিবারণের ওঠে এসে যায় সাংখ্যযোগের অন্যান্য
শ্লোকগুলি। আমলকী গাছের কাণ্ড স্পর্শ করে তিনি মুস্তকণ্ঠে আবৃত্তি করেন,

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কথুমর্হতি॥

...
নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

শ্লোক উচ্চারণের মাঝে একজোড়া জুলজুলে চোখ এগিয়ে আসে। নিবারণ তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন কুড়িয়ে পাওয়া ফল এবং ফুল।

হৈমবতীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। তিনি শুনেছিলেন নিবারণের সংলাপ। মানুষটি চিরকাল অদ্ভুত। মাঝে মধ্যেই, ভোররাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে নিজের সঙ্গে কথা বলে যান। জিজ্ঞেস করলে বলেন অবিকল তাঁর মতো দেখতে এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ডাক্তার বলেছে এ হ'ল হ্যালুসিনেশন। প্রহেলিকা। সবই মায়ার খেলা। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলায় ক্ষতি তো হয়নি অন্যদের, সেজন্য কোনো চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়নি নিবারণের। প্রথম প্রথম ভয়-অস্বস্তি লাগলেও এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন হৈমবতী।

বাড়ির দাওয়া থেকে নিবারণের গলা মিলিয়ে যেতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন হৈম। মানুষটা যাচ্ছে কোথায়?

দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই শিউলি ফুলের গন্ধ পেলেন হৈম। অঙ্ককার একটু ফিকে হয়েছে। গীতার শ্লোক শুনে আগুতিকারের দিকে তাকাতেই মেরুদণ্ড বেয়ে তুষারস্রোত নেমে এল হৈমবতীর।

একটি গুনো শিয়ালকে ফল খাওয়াচ্ছেন নিবারণ। শিয়ালটির ধারালো দন্তসারি আধো অঙ্ককারেও দেখা যাচ্ছে বেশ। নিবারণের কাঁধে মাথায় কয়েকটি পাখি নেমে এসেছে। মানুষটি ক্রক্ষেপহীন। শিয়ালটিকে ফল খাওয়াচ্ছেন তার নিজ মনে বলেই চলেছেন, কর্মে তোমার অধিকার, তার ফলে তোমার কোন অধিকার নেই হে। ফলে কোনো অধিকার নেই।।



রেশন দোকানের লাইন দেখে থমকে গেল নিরুপম। সকাল সাড়ে পাঁচটায় এসেও বাইশ জনের পরে দাঁড়ানার জায়গা পেল সে। অর্থাৎ তার মতো আরো অনেকেই খবর পেয়েছে, আজ রেশনে চাল পাওয়া যাবে। সেজন্য দোকান খোলার দেড় ঘন্টা আগেই লাইনের সারি বন্ধ দোকানের দরজা থেকে শুরু হয়ে বৈঠকখানা বাজারের গলিপথে ঢুকে পড়েছে।

বাইশ জন। গড়ে পাঁচ মিনিট করে লাগলে একশো দশ মিনিট। দোকান খোলার প্রায় দু'ঘন্টা পরে নিরুপমের রেশন নেবার পালা আসবে। সাড়ে দশটায় স্কুল শুরু। চিন্তা নেই, ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে। দ্রুত হাঁটলে দশমিনিটও লাগে না। নিরুপম লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লাইনের প্রথমে যে দাঁড়িয়েছে, সেই নীলপ্যান্ট, খয়েরি হাওয়াই শার্ট পরা ছেলেটি হঠাৎ তার ঝোলা থেকে টুথপেস্ট ব্রাশ বের করে দাঁত মাজতে শুরু করল। অচিরেই তার মুখ ভরে উঠল টুথপেস্টের ফেনায়। সে পিছনের লোকটিকে হাতের ইঙ্গিতে, শরীর ভাষায় বোঝাল, মুখ ধুয়ে ফিরে আসছে। এর সঙ্গে সুপ্ত অনুরোধ, ফিরে এসে ওই জায়গায়

দাঁড়াতে তাকে কেউ বাধা দিয়ে হইহই করলে দ্বিতীয় লোকটিকে তার সমর্থনে বলতে হ'ল, না না উনি ছিলেন।

খট্টায়াজন বলল, ঠিক আছে যান, কিন্তু দেরি করবেন না...

প্রথমজন সবেগে মাথা নেড়ে শরীর ভাষায় বোঝাল, না না শীগগিরই ফিরছে। আঙুল তুলে মুখ দেখাল। অর্থাৎ সে মুখটা ধুয়েই ফিরে আসছে। তারপরেই দৌড়ে চলে গেল গাজারের দিকে। ওইখানে নিশ্চয়ই চাপাকল কিংবা টিউবওয়েল আছে। শরীরভাষায় মনে হয় ছেলেটি সরল-সিধে ধরনের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন দু'জন করে দশ পনেরজন দাঁড়িয়ে গেল নিরুপমের পিছনে। পিছনে তাকিয়ে সুকান্তদাকে খুঁজল নিরুপম। নেই। শিশিরদাও নেই। পিছনে গুঞ্জন — আজ নাকি চাল দেবে ... সেক্স চাল... গমও এসেছে... স্কুল যাবার পথে, হাতে সময় থাকলে, একবার সুকান্তদাকে চালের খবর জানিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়।

মুখ ধুতে যাওয়া ছেলেটি ফিরে এল মিনিট পনের পরে। নিজের জায়গায় দাঁড়াতেই পিছন থেকে আওয়াজ, যাবাবা এ মদন আবার কোথেকে? হাওয়াই শার্ট ফিরে তাকিয়ে টিম্ননীকারকে খুঁজল। পেল না। তখন অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বলল, আরে আমি এখানেই ছিলাম, এই একটু হাত-মুখ ধুতে গেলাম আর কি...।

— ওরে সাতকড়ি তুই কি এখানে বিস্না পেছো শুইচিলি নাকি?

নিরুপমের ঠিক পিছনের ভদ্রলোকের গলা। মূর্খ দেখল নিরুপম। মাঝবয়সী। সাদা পাঞ্জামা, মেটে রঙের পাঞ্জাবী। বহু ব্যবহারে জীর্ণ।

সাতকড়ি চকিতে পিছনে ফিরে দাঁত বের করে হাসল। সত্যি নিখিলদা, এখন সেরকমই করতে হবে মনে হচ্ছে... যা কিনতে যাচ্ছি কেরোসিন কয়লা পাঁড়কুটি সর্বের তেল, সবচেয়ে লাইন ...

সামনের দিকের একজন যোগ দিল, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সিনেমা হল টু বার্নিং ঘাট সব জায়গায় ... আর পারা যায় না মশাই...

কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর নিখিলদার গভীর গলা — সরকার তোমাদের ডিসম্পিন, ধৈর্য এসবের ট্রেনিং দিচ্ছে... পছন্দ হবে কেন?

নিরুপম বুঝে গেল, এ হল ছদ্ম গভীর্য। পিছন ফিরে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে মৃদু হাসল।

— সরকার কত ভাবে তোমাদের জন্য... এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম এইসব দোকানের প্রত্যেকটিতে খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যারা রাতে এসে লাইন দেবে, তারা দোকানের সামনে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকতে পারে...

ভদ্রলোক সত্যিকথা বলার মতো করেই উচ্চারণ করলেন বাক্যগুলি। সাতকড়ি কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

ভাব সাতকড়ি ... বন্ধ দোকানের সামনে আমরা সারি সারি খাটিয়া পেতে শুয়ে আছি...খাটিয়ার লাইন...

নিখিলদার রহস্য গুণতে পারে নি সাতকড়ি। সে খুব সরল গলায় বলল, তাই নাকি? তাহলে তো ভালই হয়।

এতক্ষণ সবাই নিখিলদার কথা উপভোগ করছিল, সাতকড়ির কথায় হা-হা করে হেসে উঠল।

কিছুদিন আগেও সবাই সকাল থেকে লাইনে দাঁড়াত না। কেউ কেউ নিজে দাঁড়াবার বদলে রেখে যেত রেশনের থলি, ইটচাপা দিয়ে। দোকান খোলার মুহূর্তে হাজির হত থলের মালিকরা। তারা ছাড়াও দোকানের দরজা খুলে লাইন সচল হবার মুহূর্তে ঢুকে পড়তো কিছু বেলাইনের লোক। জনা পনেরোর লাইন নিমেষে হয়ে যেত পঁচিশ জনের সারি। কিছুদিন আগে নিয়ম হয়ে গেছে, থলে রেখে চলে গেলে আর ওই জায়গায় ঢোকা যাবে না। লাইনের কোনো লোককে বলে গেলেও না। কোনোভাবেই লাইন রাখা চলবে না। লাইনে দাঁড়াতেই হবে।

বেলাইনে ঢোকা নিয়ে মজার গল্পও চালু হয়ে গেছে। রেশন দোকানের বন্ধ দরজার সামনে সকাল থেকে লাইন পড়েছে। হঠাৎ দেখা গেল বেঁটে খাটো ভুঁড়িওলা একটি লোক লাইনের সামনে ঢুকতে যাচ্ছে। পেছনের লোকজন চিৎকার করে উঠল। এই এই বেলাইনে ঢুকছে, বের করে দে, বের করে দে। খর্বাকৃতি লোকটি কিছু বলতে গেল। কেউ তার কথা কানে তুলল না। জনতার আওয়াজ, যান যান, একবারে পেছনে যান। লাইনে দাঁড়ান। লোকটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল লাইনের একেবারে সামনে, লোকটি আবার উদয় হয়েছে। কয়েকজনকে পাশ কাটানো লোকটি পৌঁছে গেছে দোকানের দরজার কাছে। এবার লাইনের পেছনে দাঁড়ানো এক যুবকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। যুবকটি ছুটে এসে ভুঁড়িওলার কলার চেপে ধরল।

বেলাইনে ঢোকা হচ্ছে? আমরা সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি.....ইয়ার্কি নাকি। যুবকটির হাত ছাড়িয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েছিল বেঁটেখাটো লোকটি। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই যুবকটি তার গালে খান্না কষিয়ে দিল। খর্বাকৃতি লোকটি খুবই রেগে উঠেছে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, দূর শালা, আজকে দোকানই খুলব না।

রেশনের দোকানের মালিককে নিয়ে এমন রগড়ের কথা গত সপ্তাহে রেশন নিতে এসে গেল গেছে নিরুপম।

শুধু মজার টটাক নয়, রেশনের লাইনে গাঙীর কথাবার্তাও হয় প্রচুর। অনেকক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়ালে গা হয়, রাজনীতির কথা, খাদ্যসংকটের কথা উঠবেই। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কংগ্রেস সরকারের সমর্থকের সঙ্গে তর্ক বেধে যাবে বিরোধী পক্ষের সমর্থকের। সুকান্তিদা শিশিরদা থাকলে তো একেবারে মারমুখী তর্ক। শুনে শুনে জ্ঞান বেড়ে গেছে নিরুপমের। বার্ষিক পরীক্ষার খাতায় সে এখন অনায়াসে খাদ্য সংকট ও রেশন ব্যবস্থা নিয়ে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখে ফেলতে পারে। এইসব কথা ভাবলে রেশন লাইনে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট কিছু কমে। তাছাড়া সব সময় ভাঁড়ামো দেখতে শুনে ভালো লাগে না। আজকেও নিরুপম পুরনো কথা মনে করবার চেষ্টা করল।

দেশে খাদ্য-সংকট। সরকারি হিসাবে পঞ্চাশ কোটির দেশে উপোসী মানুষের সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। খাদ্য-সংকট মোকাবিলায় শহরাস্থলে রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু ১৯০০ গ্রাম চাল-গম পাওয়া যায়। মফস্বল শহরে

চালু হয়েছে আধা-রেশনিং। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বছরের গোড়ায় জানিয়েছেন সনাইফে খাদ্য দেওয়াই নতুন সরকারের কাজ এবং এজন্য প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু সংকট এখনও কাটেনি।

আমদানির গল্প তো নতুন নয়। শুধু আমেরিকা থেকেই পাবলিক ল ৪৮০ খাতে বছরে সাট লক্ষ টন গম আমদানি করা হয়। একে চলতি কথায় পি এল ফোর এইট্রি গম বলে সবাই। এই গম আমদানি বাবদ দেয় অর্থ ভারত সরকার জমা রাখে এদেশেরই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সেই টাকায় বিভিন্ন লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকের আমেরিকা ভ্রমণের ব্যবস্থা হয় — এমনই গুজব। চোখে দেখা ঘটনা আর গুজব, সব মিলিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশ খেপে উঠছে রাজ্যের মানুষ। অনাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দল থেকে বিতাড়িত অজয় মুখোপাধ্যায়। অজয়বাবু নতুন দল গড়েছেন — বাংলা কংগ্রেস। বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই দলও সরকারের সমালোচনা করছে। চালের সংকটের পাশাপাশি অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে বহুগুণ। শুরু হয়েছে কেরোসিন সংকট। প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যাচ্ছে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধের খবর। বসিরহাটের স্বরূপনগরে স্কুলের ছেলেরা চাল-কেরোসিনের দাবিতে মিছিল করেছিল। পুলিশ গুলি চালিয়েছে। নিহত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলাম। কিছুদিন পরেই, কৃষ্ণনগরে এমনই এক মিছিলে আবার পুলিশের গুলি। মারা গেছেন সতেরো বছরের আনন্দ হাইত। প্রতিবাদ আন্দোলনকারীরা সাধারণ ধর্মঘট হরতাল পালন করেছে। ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড় চলছে রাজ্যজুড়ে। পুলিশ মিলিয়ে মারা গেছে পঁয়তাল্লিশ জন। পুলিশের গুলিতে নিহতদের খতিয়ান দিয়ে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি দুঃখের। কিন্তু আন্দোলনকারীদের তরফে প্ররোচনা ছিল। আক্রান্ত হবার পরেই পুলিশ গুলি চালায়। গুঁর হিসাবে মোট চৌত্রিশজন মারা গেছে। মাত্র আশিজন আহত। এর উল্টোদিকে আহত পুলিশের সংখ্যা দু'শো বত্রিশ আর নিহত হয়েছে দু'জন পুলিশ। এছাড়া আন্দোলনকারীরা একষড়িটি সরকারি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে। চল্লিশটি ট্রেন ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত। একশোটি রেলওয়াগন এবং কোচ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গুলি চালনার যুক্তি হিসাবে শিশিরদা বলেছিলেন, আন্দোলনকারীরা আইন নিজের হাতে নিয়ে চালের আড়ত আক্রমণ করবে, পুলিশ এলে রাস্তা আটকাবে, অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়বে আর পুলিশ কিছু করবে না? — তোমরা শালা পুলিশ ভ্যানে বোমা মারবে আর তার বদলে পুলিশ কি তোমাদের রসগোল্লা ছুঁড়বে?

সুকান্তিদার মুখ লাল হয়ে গেল।

— কে বলেছে আমরা আগে মেরেছি? তোমরা শালা চালের মজুতদারদের প্রশ্রয় দেবে, ওদের টাকায় ভোট করবে.... ওরা অন্যায়ভাবে চালের কালোবাজারি করে যাবে, প্রতিবাদ হবে না? সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিধান রায়ের জমানা পেরিয়ে প্রফুল্ল সেনের রাজত্বে এলাম আমরা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী-পুলিশমন্ত্রীর কথাবার্তা একইরকম রয়ে গেল আক্রান্ত হয়েই পুলিশ গুলি চালায় ন্যাকামি।

রেশন লাইন দুপক্ষে ভাগ হয়ে গেল। অধিকাংশই টিফিনী সহযোগে সমর্থন করছিল সুকান্তিদাকে। শিশিরদার সমর্থকরা পেরে উঠছিল না তেমন। দু'দলের মধ্যে তুমুল

ব্যবহৃত। হাতাহাতি হবার উপক্রম। কিন্তু রেশন লাইনে প্রাচীন বটগাছের মতো দুয়েকজন বৃদ্ধও থাকেন। বটের জটার মতন শিরাফোলা হাত পা। আস্তিনে গুটিয়ে রাখা বহু বছরের অভিজ্ঞতা। ওঁদের সান্নিধ্যে এলেই শান্তির ছায়া। এমনই এক বৃদ্ধ থামিয়ে দিলেন ঝগড়া।

—আরে বাপু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কী হবে? বরং এসো সবাই মিলে এই রেশন দোকানটিকে অনাচারমুক্ত করার চেষ্টা করি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সবাই। বৃদ্ধটি বলতে লাগলেন রেশনের লাইনে শৃঙ্খলা আনার কথা। মালিককে ঠিক সময়ে দোকান খুলতে বাধ্য করার উপায়। সুকান্তিদার পছন্দ হয়নি বৃদ্ধটির কথা। কিন্তু লাইনের অন্য সবাই বেশ সায় দিয়েছিল তাঁর প্রস্তাবে। রাজনীতির তর্ক বন্ধ। কথাবার্তা বইতে লাগল উন্নয়নের খাতে। সেই থেকেই ইট চাপা থলি ফেলে রাখার বেলাইনি কায়দা একেবারে বন্ধ।

সরকার বিরোধী ক্ষোভ জমে উঠেছে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও। কলেজের কিছু সাহসী ছেলেমেয়ে স্টুডেন্টস ফেডারেশনকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা তাদের এই সংসদকে চলতি কথায় এস এফ নামে ডাকে। এস এফ-এর বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি পড়াশুনোতেও ভালো। এজন্য তারা শিক্ষকদেরও ভালোবাসা পায়। কলেজে সস্তার ক্যান্টিন, ফিশোৎসব, ছাত্রসংসদের নির্বাচনের পাশাপাশি এস এফ রাজ্য রাজনীতির কথাও বলে। রাজ্য রাজনীতি ছাড়িয়ে চলে যায় আন্তর্জাতিক সমস্যা। বিদেশের ছাত্র আন্দোলনের খবর পৌঁছে দেয় কলেজ চত্বরে। জৈয়তনামের মানুষের মার্কিন আগ্রাসন বিরোধী লড়াইকে সহমর্মিতা জানিয়ে শ্লোগান দেয় — তোমার নাম আমার নাম হো চি মিন, জৈয়তনাম। কলেজে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এস এফ।

কিন্তু এই বামপন্থী সংগঠনকে মেনে নেয়নি সরকারি শিক্ষাবিভাগ। আটজন সক্রিয় ছাত্রসংগঠককে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তিনজনকে কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি করতে রাজি নয় তারা।

এর প্রতিবাদে ছেলেমেয়েরা কলেজ ধর্মঘট শুরু করল। ধর্মঘট সফল। মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ। তবু এস এফ এর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে। শেষ অবধি হয়তো এগারোজনকে কলেজে ফেরত আনা গিয়ে না কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মূল লড়াই জিতে গেছে। কলেজে খোলাখুলিভাবে এস এফ সংগঠন করবার প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ পরাজিত।

তবু প্রেসিডেন্সি নয়, বঙ্গবাসী-সুরেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-স্কটিশ চার্চ-সিটি সহ কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী সমর্থকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জঙ্গী ছাত্ররা প্রকাশ করেছে তাদের মুখপত্র — ছাত্রফৌজ। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় বেরিয়েছে — মানুষ কেড়ে খাবে না কেন?

লড়াকু ছাত্রদের বেশ কয়েকটি গ্রুপ আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এরা। কিন্তু আন্দোলন শুরু হলে সবাই একযোগে লড়তে নামে।

— সত্যি বলতে কি সারা দেশজুড়ে ছাত্ররা অব্যাহত হয়ে উঠেছে ক্রমশ। এক বছর আগেও ছাত্রদের অব্যাহতার ঘটনা ছিল দুশো একাত্তরটি। সেই অমান্যতা বেড়ে এখন ছ'শো সাত। ভারত সরকার এর প্রতিকারের পথ খুঁজতে বলেছেন শিক্ষাবিদদের। বলেছিলেন সুকান্তিদা। নিরুপম মনে করবার চেষ্টা করল সুকান্তিদার বলা সব কথা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী অভিভাবক। মধ্যপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ উপাচার্য মনে করেন রাজনীতি নয়, এ হ'ল আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন। ব্যাসালোরের উপাচার্য ছাত্রদের পেছনে গোয়েন্দা লাগাবার পরামর্শ দিয়েছেন। উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতে যোগব্যায়ামে ছাত্রদের গরম মাথা ঠান্ডা করা দরকার। যোগব্যায়ামের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হ'ল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপরে সুকান্তিদা মৃদু হেসেছিলেন। বললেন, জান তো সব চেয়ে ইন্টারেস্টিং পরামর্শ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি সর্বোপলী নাথাকৃষ্ণন। তাঁর দাওয়াই — ছাত্ররা নিয়মিত মহাভারত পাঠ করুক।

নিরুপম অবাক।

— সত্যি?

— হ্যাঁ গো

— কিন্তু মহাভারতে তো প্রচুর মারপিট! ওইটা পড়ে কি করে মাথা ঠাণ্ডা হবে ছেলেদের?

সুকান্তিদা হেসেছিলেন।

— ওই মারপিটের পরেই যে মহাপ্রস্থান রওনা হতে হবে, বোধ হয় সেই কথা বুঝতে শিখবে ছেলেরা...

এইবার নিরুপম হেসে উঠেছিল। সুকান্তিদা গভীর মুখে বলেছিলেন, সমস্যাটা কোথায় জান? উনি আরও বিশদে বলেছিলেন ছাত্রদের সমস্যার কথা।

শিক্ষাত্রতীরা ছাত্রদের গরম মাথা ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে চিন্তিত হলেও ছাত্রদের প্রধান উদ্বেগ তাদের ভবিষ্যৎ। বারো-তেরো বছর আগে ছিল এক লক্ষ তেষাট্টি হাজার, সেই নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা এখন ন'লক্ষ সতেরো হাজার। এক ব্যাঙ্কে মাত্র কয়েকটি করণিক পদের জন্য আঠাশ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে আছেন তিনশো ইঞ্জিনিয়ার, অসংখ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং বারো হাজার গ্রাজুয়েট। পাশ করবার পর চাকরির নিশ্চয়তা যখন নেই, পড়াশুনোকে অসার মনে হতে বাধ্য। আর তা ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। গোটা সমাজব্যবস্থাটাই পালটে ফেলা দরকার — এমন চিন্তাও ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের ছাত্রদের মধ্যে।

রেশন লাইনে দাঁড়াবার উপযোগিতা অনেক। সত্যি মিথ্যে মেশানো এমন বিচিত্র খবরে পুরো পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোয় চলে আসে। এর ওপর বাড়ির ইংরেজি দৈনিকটি পড়ে নিলে বেশ বোঝা যায় পরিপার্শ্বকে। রাজনীতির আলোচনা করতে অসুবিধা হয় না নিরুপমের। স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে আসর জমানো যায়। এমনকী রেশন লাইনের সেই শান্ত বৃদ্ধটির সঙ্গেও আত্মবিশ্বাস রেখে গল্প করা যায় খানিকক্ষণ।

বৃদ্ধটির প্রভাবে কাজ হয়েছে। লাইনে শৃঙ্খলা এসেছে। দোকান ঠিকঠাক খুলছে। আজও ঠিক সময়েই খুলে গেল রেশন দোকান। লাইন সচল হ'ল।

দোকানের ভেতর সেই এক ছবি। জানালার গরাদের ওপারে দিলুদা ক্যাশমেমো লিখছে, টাকা মিছে, প্রিন্ট মিছে। প্রিন্ট হাতে, থলি হাতে বিশাল দাঁড়িপাল্লার সামনে ক্রোতা। পাল্লায় ওজন ৩.৫৫ পাঁচ কিলো ৮০, ছ'কিলো গম, দেড় কিলো চিনি.....। দোকান চত্বরে ব্ল্যাকবোর্ডে

খড়ি দিয়ে লেখা 'চাল — সাধারণ ৮৪ পয়সা প্রতি কেজি, মিহি ৯৬ পয়সা প্রতি কেজি, অতি মিহি ১.২০ পয়সা প্রতি কেজি।'

রেশন নেবার পর ক্রেতার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। যেন সবচেয়ে বড় কাজটি এইমাত্র নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল। লাইনে দাঁড়ানো কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, দাদা চাল কেমন?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেউ তাঁর থলেতে হাত ঢুকিয়ে ডান হাতের আঙুলে তুলে নেন অল্প কিছু চাল। বাম হাতের তালুতে রেখে পরখ করেন চালের প্রকৃতি। চালে দুর্গন্ধ আছে কি না? কাঁকড় বেশি না কম? অনেকেই দোকানের বস্তার তলানি চাল-গম নিতে চান না। তলানিতে কাঁকড় বেশি থাকে।

সবকিছু শিখে নিয়েছে নিরুপম। খোঁজখবর রেখে ঠিকঠাক রেশন সংগ্রহ করাটাও বেশ কঠিন কাজ। কঠিন কাজটি আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে সে। দশ-বারো কিলো রেশন বহন করাটাও রপ্ত হয়ে গেছে। দু'হাতে মোটামুটি সমান ওজনের থলি নিতে পারলে কষ্ট কম হয়। বাড়ি ফেরার পথে ঘামে জামা ভিজ়ে যায় নিরুপমের। মাঝপথে সেনবাড়ির রোয়ায়। কিছুকাল আগেও সেখানে থলি রেখে দু'মিনিট দাঁড়াত নিরুপম। এখন আর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। সে মনে মনে বলতে থাকে—

উঠিল পবন পথে, ঘোরতর রবে, / রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন / উজ্জ্বল মৈনাক-শৈল, অশ্বর উজ্জলি! / শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারি ধনুঃ / বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে / ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি!

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দাপট নিরুপমকে ভারবহন করবার শক্তি জোগায়। এমনভাবে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

রেশনের থলি রেখেই দু'মিনিটে স্নান শেষ করল নিরুপম। সাত মিনিট লাগল খেতে। শুছিয়ে বেরুতে আরও পাঁচ মিনিট। ত্রুত পা চালিয়ে সময়মতো পৌঁছে গেল স্কুল। স্কুল যাবার পথে আমহার্স্ট স্ট্রিটের কেরোসিন দোকানে জানা গেল সাড়ে পাঁচটায় কেরোসিন পাওয়া যাবে।

নিরুপমের অনেক বন্ধুই মনে করে খাদ্য থেকে শুরু করে চাকরি সংকটের জন্য দায়ী কংগ্রেস সরকার। ক্রাসে এক কংগ্রেস নেতার ছেলে পড়ে। নাম সুশীল। মাঝে মাঝে ওাকেও সবাই মিলে খেপায় ওরা। রেগে গেলে সুশীলের ফর্সা মুখ লাল হয়ে যায়, তোতলাতে থাকে।

কেমিস্ট্রি ক্লাসে ছোট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ঢালছিল নিরুপম। হাত ফসকে কাঁচের পাত্রটি পড়ে গেল ল্যাবরেটরির টেবিলে। টেবিলে রাখা বুনসেন বার্নারে জল গরম করছিল সুশীল। সুশীলের সাদা জামার নীচের দিকে লেগে গেল কমলা রঙের ডাইক্রোমেট। নিরুপম অপ্রস্তুত। ও বলে উঠল, সরি সরি.....

হঠাৎ সুশীল ছুটে এসে চড় কষিয়ে দিল নিরুপমের গালে।

— বাঁ-বাঁদরামি হচ্ছে

নিরুপম হতবাক। সে তো ইচ্ছে করে কিছু করেনি।

চড় মেরেও শাস্ত হ'ল না সুশীল। পাত্রে রাখা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ছুঁড়ে দিল নিরুপমের দিকে।

মত সবে যাবার চেষ্টা করেছিল নিরুপম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর জামার ডান দিকের ঠাণ্ডা লাগে গেল কমলা রঙ। মারামারি লাগবার আগেই অনিমেঘ রথীনরা সুশীলকে জোগ করে সরিয়ে নিয়ে গেল। চিরন্তন রইল নিরুপমের পাশে।

হৃদয়ভাব কাটেনি নিরুপমের। কোনো অন্যায় করেনি সে। অসতর্ক ছিল, একটা ভুল করেছে, সেজন্য 'সরি'-ও বলেছে সুশীলকে। তা সত্ত্বেও সুশীল ওকে চড় মারল।

কেমিস্ট্রি স্যারের থেকে চিরন্তন জেনে এল, অকজ্যালিক অ্যাসিড দিয়ে ধুলে জামার কমলা রঙ উঠে যাবে। ল্যাবরেটরি থেকে অকজ্যালিক অ্যাসিড জোগাড় করে স্কুলের বাগানে গিয়ে জামা ধুয়ে ফেললো ওরা। সত্যিই রঙ উঠে গেল। ভেজা জামাটাই পরে নিল নিরুপম। পুণ্য থেকে বেরিয়ে ওরা এসে বসল কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে। গাল জ্বালা করছিল নিরুপমের। চিরন্তন বলল, চিন্তা করিস না.....জামার রঙ তো উঠে গেছেদ্যাখ এখুনি শুকিয়েও যাবে।

নিরুপম কিছু বলতে পারল না। হ হ করে কান্না এসে গেল। কেউ ভুল স্বীকার করলে তাকে মারতে হয়? জামার জন্য নয়, নিরুপমের খারাপ লাগছিল অন্যায়ভাবে মার খাবার জন্য। ওকে চড় মেরে গেল সুশীল আর ও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারল না! নিজের গালে চড় মারল নিরুপম। আবার মারতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই চিরন্তন ওর হাত ধরে ফেলল।

—পাগলামো করিস না।

নিরুপমের কাঁধে হাত রাখলো সে।

—শালা, নেতার ছেলে হয়ে ভাবছে কীভাবে চড় মারা যায়।

ওরা দুজনেই ঠিক করল এর বদলা দিতে হবে। চিরন্তনের দাদা ডাক্তারি পড়ে। থাকে হিন্দু হোস্টেলে। নিরুপমকে জোর করে দাদার কাছে নিয়ে গেল চিরন্তন।

কয়েকদিন পরে, হিন্দু হোস্টেলের রাস্তায় সুশীল বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়ে গেল। কারা মারল জানা গেল না। এটুকুই বোঝা গেল, যারা মেরেছে তারা ডাক্তারি পড়ে। কারণ সুশীলকে পেটানো হয়েছে উরুর হাড় দিয়ে। ডাক্তারি পরিভাষায় যার নাম ফিমার।



ঘুম ভেঙে গেল দ্রোণাচার্যের। বাইরের আলোর কোমল ভাব দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিল ঊষাকাল। অভ্যাসমতো দাঁত মাজতে যাচ্ছিল সে। বাতাসে হালকা ঠান্ডা, শিরশিরে ভাব। গায়ের চাদর সরিয়ে মাটিতে পা রাখতেই পাওয়া গেল মৃদু উত্তাপ। বোঝা গেল সকাল নয়, দুপুর। বাগান থেকে টুক টুক শব্দ আসছিল। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল কাঠঠোকরা পাখিটিকে। দ্রোণাচার্য নিশ্চিত এখন মধ্যদুপুর। পাখিটা রোজ এসময় কাঠবাদাম গাছের ডালে ঠোকর মারবে। পেয়ারাগাছের দিকে তাকাতে চোখে পড়লো চন্দনা পাখিটিকে। ডানপায়ে একটি ছোট্ট পেয়ারার দখল নিয়ে লাল ঠোটে ঠুকরে চলেছে সবুজ পাখি। বাস্তবিকই এখন দুপুর। কিন্তু কেন মনে হয়েছিল সকাল? গভীর ঘুম সময়জ্ঞানও

লোপ পাইয়ে দেয়!

মুখে চোখে জল দিয়ে আসবার সময় বোঝা গেল বাড়িতে কেউ নেই। বাবা বেরিয়েছে টাকা জোগাড়ের চেষ্টায়, মা এসময় প্রতিবেশীদের বাড়ি যায় গল্প করতে। দাদা যে কোথায় গেছে, বোঝার উপায় নেই।

তক্তাপোশে বসতেই মনে পড়ল স্বপ্নের কথা। ললিতাকে স্বপ্নে দেখেছে সে। সেই চন্দননগরের স্কুলে পড়বার সময় আলাপ হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে। চিঠি বিনিময়ও হয়েছে দু-চারটি। তারপরে তো স্কুলে পড়া ছেড়েই দিল দ্রোণাচার্য। বহুদিন হ'ল ললিতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তবু কেন স্বপ্নে আসে মেয়েটির মুখ? শীতের দুপুরে নির্জনে অতীতের দুঃখ-স্মৃতি রোমন্থনে কষ্ট আছে। আবার কী এক নেশাও আছে।

চন্দননগরের স্কুল ছাড়তে দুঃখ হয়েছিল দ্রোণের। কিন্তু বাড়ির অবস্থা তো মরণাপন্ন রোগীর মতো। অবিলম্বে কিছু পথির জোগাড় না করতে পারলে, রোগী বাঁচবে না।

স্কুলের কেতাবি শিক্ষা, ডিগ্রি এ সবার কোনো মূল্য নেই, বুঝলি — বাবা বলেছিল।

— তার চেয়ে রোজগারের উপায় দ্যাখ, তাহলেই সব কিছু হবে।

সেই থেকে দ্রোণাচার্য কাজ খুঁজতে নেমে পড়েছিল। কলকাতায় গিয়ে গাড়ি চালানো শিখছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলে হয়তো চাকরি মিলতে পারে। ড্রাইভারের চাকরি করতে করতে তখন আবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়া কথা ভাবা যাবে। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারির ফল বেরুতেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দ্রোণাচার্যের। কারণ, ওর বন্ধুদের অনেকেই স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে চলে গেছে। বেচা চুকে গেছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। বাবা পড়ছে বাড়ির কাছেই বাণ্যে কলেজে। গতমাসেই সমীর এসেছিল। ও এখন কলকাতায় থেকে বি.কম পড়ছে।

সমীর বলেছিল, কলকাতায় এঙ্গে দেখা করিস। কফি হাউসে আড্ডা মারা যাবে।

সমীরের কলেজের বন্ধুদের দুয়েকজন কবিতা লেখে। কফি হাউসে গেলে নতুন কবিদের সঙ্গে আলাপও করা যায়। দ্রোণাচার্য গিয়েছিল কলকাতায়। আলাপ হয়েছিল রূপম-সুতীর্থ-ওভরদের সঙ্গে। ওরা কবিতা লেখে, লিটল ম্যাগাজিন বের করে। দু'কাপ কালো কফি চার ভাগ করে চুমুক দিতে দিতে ওরা কবিতা নিয়ে কথা বলেছিল বহুক্ষণ। ওদের নানান বিষয়ে নানান মত কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সবাই এক। তা হ'ল জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ ওদের প্রিয়তম কবি। বিষুং দে-র কবিতাও দ্রোণাচার্য ফিরে ফিরে পড়ে। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতা পড়লেই কী এক বোধ কাজ করে!

কফি হাউসের আড্ডার আকর্ষণ অমোঘ! প্রথম আড্ডার পরই তা বুঝে গেছে দ্রোণ। কাজ খোঁজার ছুতোয় ও মাঝে-মাঝেই মগরা থেকে চলে যায় কলকাতায়। আসল গন্তব্য কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস। সারাদিন গল্প করে ফেরবার সময়ও ক্লাস্তি লাগে না একেবারে বরং নতুন কিছু লেখবার জন্য মন ছুটফট করে।

স্কুল ছাড়লেও লেখা ছাড়তে পারেনি দ্রোণাচার্য। কবিতা যেন ওর রক্তে মিশে গেছে। এক একটি শব্দ, চিত্রকল্প, কবিতার ভঙ্গি আশ্চর্যভাবে ওর মনে এসে যায়। একদিন ম্যাজিকের মতো এসে গিয়েছিল একটি চরণ — যেরকম নতজানু বাসনা চিরদিন আত্মসমর্পণ করে ঘনিষ্ঠ নারীর কাছে। সে লিখেছিল ললিতাকে। কিন্তু আত্মসমর্পণের কথা জানালেও ললিতা

আর যোগাযোগ রাখেনি। শুধু ললিতা নয় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পুতুল, পাপিয়া, অশোকাণ্ড। মেয়েদের মাধুর্য কাঙালের মতো পেতে চায় দ্রোণ। কিন্তু ওরা সরে যায়, দুপরে চলে যায় তাকে ফেলে। কোনো নারীই ওর সঙ্গে বেশিদিন সম্পর্ক রাখে না। কেন? ও প্রতিষ্ঠিত নয় বলে?

সম্পর্ক রাখতে দ্রোণ মিথ্যে বলেছে, সে কলেজে পড়ে। কলেজেই তো পড়ার কথা ওর। হয়তো ধরা পড়ে গেছে কারও কাছে এই মিথ্যাচার। একজনের থেকে অন্যজন, তার থেকে আরেক — সবাই জেনে গিয়েছে দ্রোণ মিথ্যাবাদী, তাই ছেড়ে চলে গেছে। কেন গোয়েনি কেউ ওকে? সে তো জাত মিথ্যাবাদী নয়। প্রেমের কাঙাল। একটু প্রেম পাবার জন্য সে ধূতরোর ফলও চিবিয়ে খেতে পারে। কেউ বোঝে না কেন?

মণিকারও উস্তাপহীন হয়েছে কিছুকাল আগে। ত্রিবেণী থেকে ফেরার পথে এই মেয়েকে দেখে মনে পড়েছিল— চোখে চোখ পেলো মনে হয়, যেন চিরচেনা হল পলকের ভঙ্গ। বিষুৎ দে-র কবিতার এই চরণ যেন মণিকার উদ্দেশ্যে লেখা।

মণিকার সঙ্গে আলাপ হ'ল। চিঠিপত্র বিনিময় হ'ল কিছুকাল। তারপর মণিকা দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এখন শিবানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তীব্র ভালোবাসা তৈরি হয়েছে শিবানীর জন্য। শিবানীও কবিতা লেখে। পুতুলের পর শিবানীর মতো অসাধারণ মানবী আর দেখেনি। শিবানীও কী চলে যাবে দূরে?

নির্জন দুপুরে কষ্ট বাড়ে দ্রোণাচার্যের। এসময় একা থাকতে মন চায়। ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। মা'র ফিরে আসবার সময় হয়ে গেছে। দেখা হলেই জিগগেস করবে হাজার একটা কথা। কথা বলতে ভালো লাগে না তার। কবিতার খাতা-ডায়েরি নিয়ে দ্রোণ বাগানের দিকে যায়। মাঝপথে আর সঙ্গে দেখা।

হৈমবতী বলেন, কী রে আবার কোথায় যাস?

দ্রোণাচার্য বলে, এই এখানেই

হৈমবতী ওর হাতের খাতার দিকে তাকান। বুঝে যান ছেলের লেখার নেশা চেপেছে। ও এখন পেয়ারাগাছের ডালে বসে যাবে। চলে যাবে পাতার আড়ালে। হৈম কিছু বলেন না আর।

দ্রোণ গাছে উঠে নিজস্ব জায়গায় হেলান দেয়। এই গাছের প্রতিটি পাতা, প্রতিটি বাকল তাকে জানে। চেনে এ গাছের কাঠ পিঁপড়েরাও। পিঁপড়ের সার ওর বসার বিষ ঘটায় না। দুয়েকটি কাঠবিড়ালি এ-ডাল ও-ডাল করবার সময় ওর দিকে তাকায়। দ্রোণের মনে হয় ওরা তার কাণ্ড দেখে মুচকি হাসছে। পেয়ারা পাতার গন্ধে স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে উপস্থিত মুহূর্তের পৃথিবী। গাছে মিশে যেতে যেতে মণিকার কথা মনে পড়ে বারংবার। কবিতা এসে যায়।

দারুণ জ্বরের মধ্যে মুহুপ্রায়, আমাকে বাঁচাও

মণিকা, শরীরের রক্ত দ্রুত সব নিঃশেষিত

তৃপ্তহীন আলোচনা করে গেছে তোমার নির্দেশে।

মণিকা, মণিকা তুমি, একবার কাছে এসে শরীরে শরীর ঘেঁষে

জ্বালা দাও এ দুপুরে, রক্তের গভীর অনটনে।

আমাকে বাঁচাও তুমি এ কঠিন জ্বরের উস্তাপে।

ফেরারী বালক সেই মরে গেছে বহুদূর রাতে
তুমি এসে আলো জ্বালো, অখণ্ড স্মৃতির অবশেষ
মিটুক জ্বলন্ত রাতে, ছায়াঢাকা আলোচনা ভেবে—
কপালে তোমার হাত একবার এ বিদেশে দাও;
মণিকা, মণিকা তুমি, মুছে দাও অসুখ আমার।

একটানা পুরো লিখে ফেলার পর মনের ভার কিছু কমে।

কবিতায় মুক্তির স্বাদ পায় দ্রোণাচার্য। কবিতা কি তাকে সম্মান দেবে? খ্যাতি প্রতিপত্তি চায় সে। সামাজিক স্বীকৃতি তার দরকার। কবিতা লিখে তার কিছু জানাচেনা হয়েছে মাত্র। সে লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠায়। সমাদরে ছাপাও হয় সে-সব কবিতা। কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ পায় সে। সম্প্রতি হালিশহরে, আগরপাড়ায় কবিতা পড়ে এসেছে দ্রোণ। কবি সম্মেলনের উপস্থিতি শ্রোতা কবিতা প্রশংসাও করেছে তার। কিন্তু এখনও অনেক রাস্তা যেতে হবে তাকে। বাংলা সাহিত্যের জগতে সে তার নিজস্ব একটি স্থায়ী আসন বানাবেই।

ইতিমধ্যে সে তিনটি খাতা শেষ করেছে কবিতা লিখে। তারই একটির পাতা পরম স্নেহভরে উন্টে যায় দ্রোণাচার্য। পুরনো কবিতা পড়তে ভালো লাগে। লজ্জাও বোধ হয়। কয়েকটি কবিতাকে তো বেশ অপরিণত মনে হ'ল। কিছু কবিতার মাত্র একটি চরণ পছন্দ হ'ল। বাকি সব ফেলে দেওয়া যায়। একটি কবিতায় চোখ আটকে গেল। সেই বসিরহাটের খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত মুরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা।

পৃথিবীর শেষ স্বপ্নে পড়ে আছে পুষ্কলের শব
মাছি শুধু একা এক উড়ে যায় দুপুরের দ্বাণে
মানুষের কাছে খাদ্য চেয়ে হয়েছে নীরব
বুলেট দিয়েছে খাদ্য অসম্ভব কিশোরের প্রাণে।

কী ভীষণ জীবনানন্দের প্রভাব কবিতায়! আরো দুটি স্তবক আছে কবিতাটির। পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। অবশ্য কবিতাটির তলায় দ্রোণ লিখে রেখেছিল — জীবনানন্দের ঋণ প্রকট। আসলে এটা গানের জন্য লিখলাম। খাতার শেষ পাতার মন্তব্যটি মৃদুস্বরে পড়ে নিল দ্রোণ — এ কবিতার খাতাখানাও শেষ হল, কিন্তু কই, সেই অপূর্ব কবিতা তো সৃষ্টি করতে পারলাম না? যা সৃষ্টি হলে আমি কবিতা লেখাই ছেড়ে দেব। তবে কি অপূর্ব কবিতা আমি কোনো দিনই সৃষ্টি করতে পারব না? সে এক সৃষ্টির অতীত সৃষ্টিলোকে বাস করে? আমি কবে খুঁজে পাব তাকে? আমি তো তারই অপেক্ষায় আছি। বেঁচে আছি তারই জন্য। যেদিন, যে-মুহূর্তে সৃষ্টি হবে সেই অনাস্বাদিতপূর্ব কবিতা — আমি সেদিন আমার নীলামের বাজনা বাজিয়ে দেব। বলব — এ জগতে আমার মতো সুখী আর কেউ নয়।

ডালে হেলান দিয়ে নীরবে বসে রইল দ্রোণাচার্য। সত্যি, কবিতা ছাড়া নিজেকে ভাবতে পারে না সে। ড্রাইভারি করলেও সে কবিতা লিখবে। দোকানদারি করলেও হিসাবের খাতার পাশে পাশে লিখে যাবে আশ্চর্য সব লাইন। তখন কি শিবানীকে সে পাবে? ভেতরটা শিবানীর জন্য উথালপাথাল করে কিন্তু এখনও তাকে সে কথা বলতেই পারেনি

দ্রোণ। বুকের গভীরে পেয়ারাপাতার ছাণ ভরে দ্রোণ লিখতে থাকে বেদনার কথা —
 জীবনের গৈরিক তপস্যা করে যেতেই হবে। আমি চাই বা না চাই, বাধা দিই, প্রয়োজন
 বোধ করি বা না করি — আমাকে করে যেতেই হবে। এ এক দুশ্চর তপস্যা। কঠিন
 তপস্যা। আমি যা চাই তা কোনোদিন পাব না, যা ধরব তাই-ই হারাবে — গৈরিক তপস্যার
 শেষে শুধু শান্তি, অতি ভয়ংকর বা অতি রমণীয় সেই মৃত্যু যাকে মার্কসবাদ বা অস্তিত্ববাদ
 কেউই অস্বীকার করতে পারেনি। এ পৃথিবীর কেউ কোনোদিন পারে না। মাঝে মাঝে
 তাই অনুশোচনা জাগে কেন আমি জন্মেছিলাম, আর জন্মলামই যদি তবে আমার
 অনুভূতিগুলো কেন এমন তাঁক হল। অথচ মৃত্যুতেই শেষ আমার, আমি স্পষ্ট জেনে
 গেছি।

মৃত্যুর কথা বারবার মনে আসে দ্রোণের। এ পৃথিবীর কাছে যেন মৃত্যুর বেশি আজ
 কিছু পাওনা নেই, আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

এই যে মরণের চিন্তা, তা যেন ভালোবাসারই ও-পিঠ। শিবানীর কথা ভাবলেই গলার
 মধো, বুকের কাছাকাছি কষ্ট বাড়ে। কষ্ট থেকে এসে যায় মৃত্যুচিন্তা। দ্রোণ লিখে চলে
 শিবানীকে ভালোবেসে আমি ক্রমশ এক রহস্যময় মানসিকতা লাভ করছি। বুঝে উঠতে
 পারছি না এর শেষ কোথায়।আমায় সাহসী হতেই হবে। শিবানীর কাছাকাছি যেমন
 করে পারি পৌঁছবই। নইলে বোধহয় সমস্তই বৃথা। আমার যৌবনের অসফল ইচ্ছা!
 টুকরো লেখার শেষে শিবানীকে দেখতে ইচ্ছে করে খুব। চটি গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে
 পড়ে দ্রোণাচার্য।

বাগাটি কলেজের সামনে রেললাইন। বাকী মালগাড়ি নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে। দুপুরের ঘুম
 দিচ্ছে।

আনমনে পথ চলে দ্রোণাচার্য। ব্রিজে রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় গজঘন্টা।
 শিবানীদেব বাড়ির সামনে গিয়ে অদ্ভুত সংকোচ চেপে বসে। শিবানীকে কীভাবে বলবে
 ভাপোয়াসি? শিবানী যদি ওকে গ্রহণ না করে? প্রবল আপত্তি জানায়? তাহলে তো আবার
 এক রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণার সূচনা। ভেতর থেকে শিবানীর মায়ের গলা ভেসে আসে। দ্রোণ
 তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলে যায়।

আসাম লিংক রোডে উঠে হাঁটতে হাঁটতে দ্রোণ যায় সরস্বতী নদীর কাছে। ব্রিজের
 পাশ দিয়ে নেমে নদীর ধারে বসে কিছুক্ষণ। ওর ছায়া দীর্ঘ হয়, মিশে যায় নদীর জলে।
 বিজ্ঞান ও শ্রম দিয়ে বাস-লরি ছুটছে। দ্রোণের কানে সে-সব শব্দ আসে না। শিবানী ক্রমশ
 তার সমগ্র চেতনা অধিকার করে নেয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ায় দ্রোণাচার্য। নিঃশব্দ পথিকের মতো হেঁটে যায়। নদীর
 দু'পাশে পাটোড়ের মতো ক্রমশ উত্তল জমি। পাটোড়ের গৈরিক আলো ক্রমশ ন্মান। গেরুয়া
 শিল্পের কিনারা। পৌঁছে গেছেন সূর্য। রক্তবসনা মেঘেরা আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছে
 তাদের দৈন্যতাকে।

একা, ঠোঁটে গেতে ভাপো লাগছিল দ্রোণের। যেন পৃথিবীতে সে-ই প্রথম এ রাস্তা
 দিয়ে হাঁটছে, সে-ই প্রথম এ দৃশ্যগুলি দেখছে। অন্য সব কাজকে এই পর্যটনের কাছে
 অকিঞ্চনকর মনে হা।

ক্রমশ সন্ধ্যা হয়। ফেরান পথে গজগন্টার মুখে আসতেই, দেওয়ে তোলাপাড়। দ্রোণ পৌঁছে যায় শিবানীদের বাড়ি।

ডাক দিতে শিবানীই সাড়া দেয়। দরজা খুলে গোনায় আসে।

— আরে তুমি!

হলুদ শাড়ি আঁট করে পরা, লাল ব্লাউজ, কপালে লেপটে যাওয়া আঁগনের টিপ, চুল চূড়া করে বাঁধা শিবানীর মুখমণ্ডলে হালকা ঘামের আবরণ।

মুখোমুখি পড়ে দ্রোণাচার্য বুঝে উঠতে পারে না কী বলবে শিবানীকে। যন্ত্রের মতো বলে, রান্না করছিলে?

শিবানী হাসে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলে, ওই আর কি ...

অজুহাত মাথায় এসে যায় দ্রোণের।

— নতুন কিছু লিখেছ নাকি? একটা পত্রিকা কবিতা চাইছে... দেওয়া যায় তাহলে।

— হ্যাঁ লিখেছি।

দ্রোণকে ঘরের ভেতর ডাকে শিবানী। মোড়া এগিয়ে দেয়। এগিয়ে দেয় কবিতার খাতা। এই যে, এই তিনটে নতুন।

শিবানীর মুখোমুখি বসে কবিতা পড়ে যায় দ্রোণাচার্য। মাথায় একটিও অক্ষর প্রবেশ করে না। ঘরের মধ্যে শিবানীর তাঁতের শাড়ির গন্ধ ঘুরে ঘুরে আসে। শিবানী কি তার দিকে তাকিয়ে আছে? কী দেখছে সে? তার পড়ার ভঙ্গি? মুখের ভাব? যদিও শিবানীর থেকে দূরেই বসেছে দ্রোণ, তবু ওর শরীরের গন্ধ পড়ে যায় সে। ওর নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনে নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে।

— কেমন লাগল?

দ্রোণ মাথা তুলে তাকায়। শিবানী হাসছে। চোখে জিজ্ঞাসা। দ্রোণ বলতে পারে না যে পড়াই হয়নি।

— খুব, খুঁটব ভালো।

প্রেমে পড়ে এটুকু মিথ্যা বলায় কোনো পাপ নেই। শিবানী খুশি হয়ে ওঠে। সেই বিভ্রাময় মুখ দেখে পুণ্যের পরশ পাওয়া যায়।

শিবানী চা করে খাওয়ায়। চা খেতে খেতে কথা চলে। শিবানী জানতে চায় কবে এবং কোথায় প্রকাশিত হবে তার কবিতা। দ্রোণ জানিয়ে দেয় পত্রিকার নাম, সম্ভাব্য সময়।

কথা বলতে বলতে দ্রোণ অনুমান করবার চেষ্টা করে তার সম্পর্কে শিবানীর মনোভাব। ওর প্রতি কি বিশেষ কোনো টান আছে শিবানীর?

দ্রোণ বলে, কবিতা লেখার পর প্রথমই কাকে পড়াতে ইচ্ছে করে? শিবানী বলে, যাকে সামনে পাই তাকেই, কখনও মা, কখনও রঞ্জু মাসি.....দিদাকেও পড়ে শুনিয়েছি অনেক সময়।

শিবানী হাসে। মনোমত উত্তর না পেয়ে দ্রোণ একটু হতাশ হয়। অবশ্য যুক্তি দিয়ে বিচার করলে শিবানীর তো এমনটাই করার কথা। ওর বাবা রেলের কাজ করেন — সকাল থেকে রাত অবধি বাড়ির বাইরে। বাড়িতে মাসিমা, মাসিমার বোন আর ওর দিদা। বাড়িতে বসে লিখলে তো এদেরকেই পড়াতে হবে। সবই ঠিক। কিন্তু যুক্তি দিয়ে তো মনের আবেগ বিচার হয় না।

দ্রোণ আবার বলে, বিশেষ কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না?

শিবানী ডুকু নাচিয়ে হাসে।

হাঁ কবিতা ভালোবাসে যারা তাদের সবাইকে।

বিশেষ কোনো মানুষকে চিহ্নিত করল না শিবানী।

প্রাইমারি স্কুলে পড়বার সময় থেকে দ্রোণ শিবানীকে চিনলেও ওর সঙ্গে কবিতা নিয়ে ব্যালালাপ করবার মতো পরিচয় হয়েছে, মাস ছয়েক। ওর কবিতা পড়বার, নিজের কবিতা শোনাবার মতো খনিষ্ঠতা হয়েছে। শিবানীর তরফে তার বেশি কিছু হয়েছে কিনা আজও বুঝে উঠতে পারল না দ্রোণ। শিবানীর কথায় ভদ্রতাবশত হাসা দরকার, তাই হাসল সে। বলল, আমার কবিতায় যেমন নারীর জন্য আকাজক্ষার কথা থাকে, তোমার লেখায় কেন পুরুষ থাকে না? প্রশ্নটা করেই বোকাবোকা লাগে নিজেকে। কিন্তু শিবানী সপ্রতিভ।

— একেক জনের ধরন এক এক রকম.....আর আমার কোনো আকাজক্ষা নেই।

এর পিঠে কোনো কথা ভেবে পেল না দ্রোণ। কোনোরকমে বলল, ও আচ্ছা।

কিছুক্ষণ শুকতার পর দ্রোণ বলল, মাঝে মধ্যে আমার খুব এদিক-ওদিক চলে যেতে ইচ্ছে করে তোমার করে না?

গ্রীবাভঙ্গি করে শিবানী বলে, হ্যাঁ.....করে।

দ্রোণের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়। শিবানীর দিকে আগিয়ে যায়।

— যাযো? আমার সঙ্গে যাবে?শুক্রবার বৃষ্টির কলেজে কবিতা পাঠের আসর হবে, যাযো সেখানে?

— আমার তো কলেজ খোলা.....কলেজ কামাই করা যাবে না।

শিবানীর বলা 'কলেজ' কথাটা ধাক্কা দেয় দ্রোণকে। সে যে কোথাও পড়ে না জানলে শিবানী কেমনভাবে নেবে তাকে? দ্রোণের অঙ্গভঙ্গি বাড়ে। দ্রুত প্রসঙ্গ পালটায় সে।

এনোমেলো টুকরো কথায়, শুকতায় আলাপচারিতা চলে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। এর বেশি আর বসা যায় না। ভদ্রতায় বাধে।

দ্রোণ বলে, এবার তবে চলি.....

শিবানী বলেনা আরো একটু বসো। সে উঠে দাঁড়ায়। ঠিক আছে তাহলে।

চৌকাঠ পৈরোবার সময়ে দ্রোণ শিবানীর চোখে চোখ রেখে মনে মনে বলে, আমি তোমায় ভালোবাসিআমার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে তুমিআমার চেতনার আকাশ জুড়ে তুমি। মুখে কিছু না বলেই সে ঘরে ফিরে আসে।

রাত ঘন হলে দ্রোণাচার্য কলম হাতে নেয়। খাতায় লেখা হয়ে যায় কয়েকটি চরণ :

শিবানী তোমার চুলের ভিতর

রয়েছে প্রদীপ রয়েছে খবর

এবং তোমার দেহের ভিতর

আমার নিবিড় গোপন কবর

কবিতা লেখার পরও আবেগের তীব্রতা কমে না। প্রশমন হয় না কষ্টের। সে ডায়েরির পাতায় লিখতে থাকে শিবানী, শিবানী, শিবানীশিবানী আমার।



বুড়াগঞ্জের বাদরঝুলি মাঠে সভা। যারা শুনতে এসেছে তারা সবাই চুপচাপ বসে। নৈঃশব্দের কারণ তারা উত্তেজিত। তারা বস্তুর কাছ থেকে নতুন কোনো কথা শুনতে চায়। তবে এইটুকু সবাই জানে সামনে জোর লড়াই। আগের কয়েকটি ছোটখাট ঝামেলায় তারা বুঝে গেছে কিছু পেতে গেলে ভাল কথায় হবে না, জোর খাটাতে হবে। সেইজন্য তারা তীরের ফলা শান দিয়ে রেখেছে। টানটান করে বেঁধেছে ধনুকের ছিলা। লড়াই চলতে পারে কিছুদিন। সে সময় দু'মুঠো খেতে হবে তো। গ্রামের মধ্যে তাই বানানো হয়েছে ধর্মগোলা। কচি ছেলেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জোগাড় করেছে ধান, চাল। সেই শস্যদানা তিল তিল করে জমান হয়েছে ধর্মগোলায়। গ্রাম ঘেরাও হলে অন্তত কয়েকটা দিন কোনো পরিবারেই খাদ্যের অভাব হবে না। তারপর দেখা যাবে।

কানু সান্যাল বলতে উঠলেন। মাঝারি উচ্চতা, শ্যামবর্ণ, টানটান চেহারা। উনি কম কথার মানুষ। দু-কথা বলেই আসল কথায় এলেন — কমরেডস্, কাল থেকে জমিদারি, জোতদারি উচ্ছেদের লড়াই... কাল থেকে আমরা শুরু করব জমি দখল...

সমবেত আদিবাসী, রাজবংশী কৃষকরা ডান হাতের তীরধনুক আকাশে তুলে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল — কাল সে শুরু হওয়া জমানা।

জনতার কোলাহল একটু কমতেই কানু সান্যাল ধরলেন, হ্যাঁ কমরেডস্, কাল সত্যিই এক নতুন দিন আসতে চলেছে... কাল থেকে জমির নতুন সীমানা তৈরি করে ভূমিহীনদের মধ্যে সেই দখল করা জমি বিলি করবে মহাকুমা কৃষক সমিতি...

আবার সবাই আকাশ কাঁপান গলায় চিৎকার করল। এবার আর থামলেন না বক্তা। যেসব জোতদারের অস্ত্র আছে, কেড়ে নিতে হবে... নিরস্ত্র করতে হবে ওদের। পুরনো দলিল জ্বালিয়ে দিতে হবে...

কানুদার বক্তৃতা চলবার সময়েই আমি ভিড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছি, কদম বলল। আমি জানি, এই রকম শরীর খারাপ নিয়েও আপনি অপেক্ষা করে আছেন শুধু এই খবরটুকুর জন্য।

চারু মৃদু হাসলেন। চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। যাক, তাহলে পারা গেছে... এইবার কিছু কাজের কাজ হবে...

কদম বলল, চারুদা আমি আর দাঁড়াব না... লুকিয়ে এসেছিলাম, এইবার আবার লুকিয়ে পালাতে হবে...

চারু বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সাবধানে, বাড়ির আশেপাশে নিশ্চয়ই পুলিশের চর থাকবে, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে যেতে হবে। কদম হাসল। জানি তো ... এই কায়দাও তো আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদের...

কদম চলে গেল। ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন চারু। এখন ব্যাথাটা কিছু

কমেছে। দীর্ঘনিশ্বাস টানলেন তিনি। ব্যথা বাড়লে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালানোও লক্ষ্য হয়ে পড়ে। চারু চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিলেন।

গ্রামা আটমাস হয়ে গেল, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন চারু। জেলে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কার্ডিয়াক অ্যাজমা বেড়ে গিয়েছিল খুব। জলপাইগুড়ি থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুর মেট্রাল জেল। পিজি হাসপাতালে ছিলেন কয়েকমাস। এখন বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত। ব্যথা বাড়লেই পেলিডিন ইনজেকশন। কতটা ব্যথা হলে ইনজেকশন নিতে হবে, বুঝে গেছেন চারু। তিনি সময়মতো জামিয়ে দেন কালু ডাক্তারকে।

বাড়িতে বসে থাকলেও সঙ্গীসাথীরা নিয়মিত দেখা করে চারুর সঙ্গে। আলাপ-আলোচনাও করে নিজস্ব যুক্তিগুলি শানিয়ে নেওয়া যায়। ওদের প্রশ্নের উত্তরে তরাই অঞ্চলের বিশেষত্ব বোঝাতে হয়।

দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের সমতলভাগের নাম তরাই। তরাইয়ের জঙ্গল কেটে ব্রিটিশরা বসিয়েছিল চা বাগান। রাঁচি, ছোটনাগপুর, মালভূম, পুকলিয়া, মেদিনীপুরের সাঁওতাল, গুঁরাও, মুন্ডা, মাগেসিয়া এইসব আদিবাসীদের দলে দলে নিয়ে আসা হয় জঙ্গল সাফ করার জন্য। দার্জিলিং পাহাড় থেকে আনা হয় নেপালী, লেপচা। ভুটানের রাজাদের থেকে জলপাইগুড়ির দখল নিয়ে সেখানেও বনভূমি কেটে চা-বাগান বানানো ইংরেজরা। যেসব জায়গায় চা-বাগান হয়নি সে এলাকার পত্তনি পেয়েছিল রাজবংশীরা। রাজবংশী কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। শাকপাটা খেয়েই চাবের জন্য খাটে। এমনই ওদের মাটির টান, উপোস করে মরলেও ভিটেমাটি ছাড়বে না। অন্যদিকে সাঁওতালরা নেপালী আদিবাসীরা চাষ ছাড়াও চা-বাগানে জম খাটে। দুটাকা মজুরিতে সারাদিন জমগানের কাজ, অবসরে সাহেবদের খিদমতগারি। কলাঞ্চলের পাশে গড়ে ওঠে জটাঞ্জোড়া, কামতাগুড়ি, দিনগাড়াহাট, নলবাড়িজোতের মতন বড় গঞ্জ, মজুরমা। জামদার, উকল, ডাক্তার, ব্যবসায়ীদের ভিড় সেখানে। অন্যদিকে ভুখারা উদয়গুড়ি খেটে মরে তরায়ের চা-বাগানে, জোতে। শীতকালে ওদের হাড় কঁপে যায়। শরৎ বাস্তুর ঘর ভেসে যায়, চালা উড়ে যায়। দার্জিলিং পাহাড় এবং তরাই বনাঞ্চলের গ্রাম, বাস্তুর মানুষেরা অধিকাংশই গরীব। ওদের ভাষা আলাদা কিন্তু দারিদ্র্য একইরকমের।

তরাই অঞ্চলকে নিজের হাতের তালুর মতন চেনেন চারু। সেই পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে আই এস সি ক্লাসে পড়বার সময় থেকেই হাফ প্যান্ট, ছিটের ফুলহাতা শার্ট আর কাঁধে খোলা নিয়ে তরাই অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। মাটিদেওয়া, ধানিবাড়ি, নলবাড়ি, নকশালবাড়ির গরীব কৃষকদের বাড়ি থেকেছেন। রাজবংশী ভাষা তো আগেই শেখা হয়েছিল, হিন্দি জবানও রপ্ত করে নিয়েছেন।

গরীব কৃষকদের দুঃখকষ্টের কাছে আই এস সি পড়াশুনা অর্থহীন হয়ে গেছে। ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন চারু। মন দিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির কৃষকসংগঠনের কাজে। চলে এসেছেন জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড়। পরে কামতাগুড়ি, শিলিগুড়ি। তারপর থেকে পার্টির কাজে উত্তরবঙ্গের গ্রাম-জোতের প্রায় প্রতিটিতে যেতে হয়েছে চারুকে। কৃষক সংগঠনের কাজে সেই যে বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল চারু, তাদের অনেকেই মনে রেখেছে তাঁকে। প্রিয় চারুদার অসুস্থতার খবর

পেয়ে তারাই আসা-যাওয়া শুরু করেছিল শিলিগুড়ির মহানন্দা পাড়ায়। পুরনো সঙ্গীদের পেয়ে শুরু করেছিলেন নতুন কথা।

— কাণ্ড দেখো.....শোধানবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে সি পি আই (এম)-এর জন্ম হ'ল, সেই পার্টির নেতৃত্ব এখন চীনা পার্টির বিরোধিতা করছে, সোভিয়েত শোধানবাদীদের সমালোচনা করতে বারণ করছে। কারণ এতে নাকি সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাবে। আরে বাবা, এখনকার যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হ'ল মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা।

সঙ্গীরা হেসে সায়া দেয়। চারু উৎসাহ পেয়ে বলেন, এইসব নেতাদের কথা থেকে মনে হয় শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনই হ'ল এ যুগের প্রধান সংগ্রাম কৌশল।

দার্জিলিংয়ের নেপালী কমরেড কৃষ্ণভক্ত বলে, পার্টি কিন্তু অশান্তির কথাও বলছে। এই যে 'মজুত উদ্ধার', 'ঘেরাও', 'লাগাতার ধর্মঘট'-এর ডাক দিয়েছে পার্টি, তা তো ঠিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নয়।

চারু বলেন, নয়ই তো। কিন্তু এই সব সংগ্রাম করলে শাসকরা দমননীতি প্রয়োগ করবে, লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাস চালাবে। তার বিরুদ্ধে তোমাকেও প্রতিরোধ গড়তে হবে, সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। যেই ভূমি অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের কথা বলবে, নেতারা বলবেন এ হঠকারিতা।

কদম বলে, তাহলে এখন আমাদের কাজ কী হওয়া উচিত?

চারু বলেন, আমাদের এখন তিনটি আন্দোলন..... শ্রমিক আর কৃষকের ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল গঠন..... এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে আমাদের সবার উচিত গ্রামে গিয়ে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা। দু'নম্বর হ'ল প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ চাই। আর তিন নম্বর কথা হ'ল পার্টিটাকে একটা সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

খুদন বলে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষকসভার আন্দোলনের কী হবে?

— দেখ খুদন, এ যুগ সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগ। ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষকসভার আন্দোলন আজকের বিপ্লবীজোয়ারের যুগে প্রধান সহায়ক শক্তি হতে পারে না।

খুদন কিছু বলতে যায়। চারু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এর থেকে এমন ভাবা উচিত নয় যে ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষকসভা আজকের যুগে অচল। দেখ বাপু, ট্রেড ইউনিয়ন-কৃষকসভা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার সংগঠন। এর মধ্যে আমাদের থাকতেই হবে।

নতুন চিন্তা লিখে ফেলা দরকার। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পঞ্চম নিবন্ধটি শেষ করেছিলেন চারু। পুরনো কমরেডদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সূত্রে লিখে ফেলেন আরো দুটি নিবন্ধ। তাঁর বক্তব্য নিয়ে যাতে পার্টির মধ্যে আলোচনা হয় এজন্য প্রথম দলিলটি দলের নেতাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন চারু। কিন্তু কোনো আলোচনা হয়নি। উলটে এক সংবাদসংস্থা লিখে দিয়েছে, দলের ভেতরে ভিন্ন মতের প্রচার করছেন চারু মজুমদার। তিনি তো ওই লেখা দেন নি ওদের! তবে কে দিল?

নেতারা না চাইলেও পার্টির মধ্যে উৎসাহীরা চারুর নিবন্ধগুলি জোগাড় করে পড়েছে। দার্জিলিং জেলা কমিটিতে খুবই উদ্দীপনা। কমিটির ছাব্বিশজনের মধ্যে উনিশজনই চারুর মতবাদে সমর্থক। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের কর্মসূচিও জেলা কমিটির সভায় অধিকাংশের ভোটে পাস হয়ে গেছে। ভাল খবর এসেছে কলকাতা থেকেও। চিন্তা, কমিউন, সূর্য সেন গ্রুপ কলকাতার এইসব বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা ভাবছে। সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, অসিত সেন এইসব নামী মার্কসবাদী নেতারা গড়েছেন আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ (এনোবি) কমিটি। পার্টির অভিমুখ সশস্ত্র লড়াইয়ের দিকে, কেরালাই তাঁদের উদ্দেশ্য। চারু একা নয়। দূরে বসে অন্যরাও ভাবছে একই কথা। পার্টির মধ্যে আলোড়ন তোলার আহ্বান গানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে চারু কানু'র উৎসাহ পেয়ে চা-বাগানের শ্রমিকদের আন্দোলনে এসে গেছে জমীদার। গঙ্গারাম চা বাগানে ধর্মঘটের সময় জুলুম করতে এলে দালালদের তীরধনুক নিয়ে তাড়া করেছিল আদিবাসী শ্রমিকরা। এ সব বেশ কয়েকমাস আগের ঘটনা।

একদিন পুরনো সঙ্গী কানু সান্যাল দেখা করতে এল।

চারুদা এইবার সেরে উঠুন।

ঠাা সেরে উঠতেই হবে ... সামনেই তো জোর লড়াই ... আদিবাসী শ্রমিকরা হাতে অস্ত্র নিয়েছে। চারুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কানু হাসে। আমাদের এখানে তীরধনুক হাতে লড়াইয়ের বৌক এসে গেছে, কিন্তু কলকাতার পার্টি অফিসের চেমারে বসা নেতারা অত তাড়াতাড়ি সামনে এগোতে চায় না... কি যে অদ্ভুত ব্যবস্থা চারুদা ভাবছেন পারবেন না...

খুব ভাবতে পারি। চারু চোখ বড় করে হাসেন। শুনলাম হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন আমি নাকি দলনিরোধী কাজ করেছি ... এমন করলে সাসপেন্ড করা হবে আমায় ...

ঠিকই বলেছেন। কানু মাথা নাড়ে। আমি কোঙারের বিরুদ্ধে ফাইট করেছি ... বললাম, আপনার কোনো অধিকার নেই এই কথা বলার ... প্রতিবাদ করতেই ও একেবারে কেঁচো...

চারু হেসে বললেন, কাণ্ড দেখ! আমাদের লড়াইয়ের মনোভাব দেখে মালিক, দালাল, পার্টি নেতা সবাই ভয় পেয়ে গেল....এই লড়াইয়ের মনোভাবটাই আসল.....সেখানে আমরা সফল।

একটু আগে কদম খবর দিয়ে যাবার পর থেকে চারুর মাথায় এইসব অনতিঅতীতের ঘটনাই সার বেঁধে আসছে। চলে যাচ্ছে।

৮৩র্থ সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই সি পি আই (এম) নেতৃত্ব পুরোদমে লেগে পড়েছে নির্বাচন জেতার লড়াইতে। অন্যান্য লড়াই থেকে মনোযোগ সরে গেল তাদের।

নির্বাচনের আগে সি পি আই আর সি পি এম এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য হয়নি। বাংলা কংগ্রেস আর সি পি আই মিলে গড়েছে প্রগতিবাদী সংযুক্ত বামফ্রন্ট। সি পি আই (এম) অন্যান্য বামদলের সঙ্গে মিলে গড়েছে সংযুক্ত বামফ্রন্ট। দুই ফ্রন্টেরই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস।

শিলিগুড়ি মহকুমায় ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি এই দুই কেন্দ্রে চারু মজুমদারের দুই সঙ্গী জঙ্গল সাঁওতাল আর সৌরেন বসুকে সি পি আই (এম) প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হল। চারু খুশি। যদিও নির্বাচন নয়, সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলই মুক্তির পথ কিন্তু নির্বাচনের সময় ওই দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রামের কথা বলা যাবে উপস্থিত জনতাকে। শোনানো যাবে গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার কৌশল। দেওয়া যাবে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ার আহ্বান। চারু বলেন, এই সুযোগে ধুম প্রচার চালাও বিপ্লবের। দেখো, বিপ্লবের আগে সশস্ত্র কথাটা যেন বাদ না যায়।

জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরেন বসু জিততে না পারলেও, রাজ্যে নির্বাচনের রায় গেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মোট আটটি রাজ্যে কংগ্রেস হেরে গেছে। স্বাধীনতার দু'দশক পরে এই পার্টি একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তেতে-পুড়ে থাকা সাধারণ মানুষের আনন্দ আর ধরে না। নির্বাচনের আগে যা সম্ভব হয়নি, পরবর্তীতে তা-ই হল। বাংলা কংগ্রেস-সি পি আই জোট আর সি পি আই (এম)-এর বামজোট মিলেমিশে গড়ে উঠেছে চোদ্দো পার্টির যুক্ত ফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সাধারণ লোকের অনেক আশা। এবার বোধ হয় ভালো কিছু হবে। চারু অবশ্য বারে বারেই বলেছেন, এদের ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই ভালো কিছু করার। ভোটের রাজনীতির মোহে পড়ে পার্টি নেতাদের বিপ্লবী ভাবমূর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মাত্র কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গেল চারু মজুমদারের কথা অশ্রান্ত। চোদ্দো পার্টির সরকারে খেয়োখেয়ি লেগেই আছে। কোনোমতে সরকার টিকিয়ে রাখতে সি পি আই(এম) মরিয়া। পার্টির পলিটব্যুরো বলে দিয়েছে, অকংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলিকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে। নানান আন্দোলন করে ক্ষমতায় আসার পর এখন আন্দোলনের নাম শুনলেই হাঁ-হাঁ করে উঠছেন নেতারা। ঘেরাও-ধর্মঘট করতে নিষেধ করা হচ্ছে কর্মীদের। চারু খুবই বিরক্ত।

তীব্র ক্ষোভ থেকে চারু লিখে ফেলেন অষ্টম নিবন্ধ। পার্টি নেতৃত্ব তো আমলই দিচ্ছে না লেখাগুলিকে। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয় নিবন্ধগুলি চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে পাঠাতে হবে। কিন্তু কীভাবে পাঠানো যাবে? দার্জিলিংয়ের কমরেড কৃষ্ণভক্ত শর্মা দায়িত্ব নেয় চারুর রচনাগুলি নিয়ে যাবার।

আবার একদিন ভোরবেলায় কানু এল। সঙ্গে জঙ্গল, কদম, খুদন, সৌরেন।

কানু বলল, চারুদা কমরেড কৃষ্ণভক্ত আপনার লেখাগুলো নিয়ে নেপালের পথে রওনা হয়েছে ... ওইখান থেকে তিব্বত হয়ে পিকিং শৌঙ্খার চেষ্টা করবে ... ও নিজের সাইকেল বিক্রি করে পেয়েছে পঞ্চাশ টাকা, রাহাখরচ বলাতে ওইটুকুই ... চটের বস্তায় ভরে নিয়েছে সব লেখা, তার ওপরে অবশ্য চিড়ে শুড়

— নেপাল যাচ্ছে কি করে?

— পায় হেঁটে।

— সে কী?

সৌরেন হাসল। বলছে তো, ও পারবে ...

সৌরেনের হাসিতে প্রজ্ঞা বাস। চারু বিরক্ত হলেন। দেখ, কৃষ্ণভক্তকে আমি ভাল

করে জানি, যার ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ রেখ না ... সে যখন দায়িত্ব নিয়েছে, বেঁচে থাকলে যা নিশ্চিত পৌছে যাবে চিনে। একটু থামলেন চারু, তারপর বললেন, এখন অন্য কথা বল ...

কানু বলল, চারুদা আপনার অনুমান একদম ঠিক, আন্দোলনের নাম শুনলেই হাত তুলে নিষেধ করছেন নেতারা ... অথচ —। চারু থামিয়ে দিলেন, অথচ আমাদের পার্টি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়েছে। ... দেশজুড়ে কৃষকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, লখনির্দেশ চাইছে অথচ আমরা ওদের বলছি না সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা, বন্দুক সংগ্রহের কথা। ... আমরা আট নম্বর লেখা গে এই নিয়েই।

জঙ্গল বলল, পার্টি না বলুক, চলুন চারুদা আমরা নিজেরাই শুরু করে দিই। কদম, খোকন, খুদন প্রায় একযোগে বলে উঠল, কিন্তু আমরা কি পারব? চারু তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, আরও না করেই এত সংশয় কেন? না পারলে, মরব ... এর বেশি আর কি হবে? আমি জঙ্গলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত... আর কেউ না করুক আমাদের শুরু করা উচিত।

ওরা তিনজন চুপ করে গেল। এইবার একটু নরম গলায় চারু বললেন, একবার এইভাবে আন্দোলন করে দেখাই যাক না কি হয়? না পারলে সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার চেষ্টা করব ... কী? ঠিক বলেছি?

এইবার ওদের তিনজনের মুখেই হাসি। ওরা মাথা নেড়ে সমর্থন করল চারুকে। কানু সামান্যের দিকে তাকালেন চারু। দেখ, রামবোঁটা জ্যেত কৃষক সম্মেলনে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছি তাই জেতের

কানু মাথা নেড়ে সমর্থন করল।

দেখ, এইবার মনে হচ্ছে যে পূর্ব এলাকায় নির্বাচনের সময় আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছি। সেই নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া আর শিলিগুড়ি থানার কিছু এলাকায় জমি দখল করে লড়াই শুরু করবার সময় এসে গেছে ...

এইবার কদম বলল, আমি একমত। খুদন, খোকন, সৌরেনও মাথা নাড়ল। কানু মাথা না নাড়লেও বলল, ঠিকই বলেছেন চারুদা, এ লড়াই আমাদের শুরু করতেই হবে কারণ গরিব কৃষকরা ফসলকাটার আন্দোলন করতে করতে অনেক দূর এগিয়েছে, এখন তারা জমির দখল চায়...

চারু বললেন, দেখেছ ... কানুর বিশ্লেষণ একেবারে ঠিক ... এখন আমরা যদি সামনে গিয়ে ওদের পাশে না দাঁড়াই, তাহলে বলতে পার একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ... চল সবাই এগিয়ে যাই ...।

একটু থেমে চারু আবার বললেন, যে জায়গাটা আমরা ঠিক করলাম সেই নকশালবাড়ির অঞ্চল একবার ভেবে নাও। এর উত্তরে দার্জিলিং পাহাড়। দক্ষিণে বিহার। পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান। পশ্চিমে মেচি নদীর ওপারে নেপাল। কোনো কারণে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র লুকোতে হলে খুব সহজেই পারা যাবে। ওই এলাকায় শুধুই কৃষক আর শ্রমিক। চাষ-আবাদে জ্যেত জমি আর চা-বাগান।

খোকন যোগ দিল, যে জায়গাগুলো আমরা অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য বাছলাম, সব

মিলিয়ে তা প্রায় তিনশো বর্গকিলোমিটার এলাকা আর গুনসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ ...।

সেদিনের সেই মিটিঙের পরে আজকের এই ঘোষণা বয়ে আনল কদম। নয়া ইতিহাস লিখতে চলেছে নকশালবাড়ির শ্রমিক কৃষক। এই পথেই আগামীতে ভারতবর্ষ মুক্ত হবে। মাতৃভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে নতুন সূর্যের আলোয়। জন্ম নেবে নতুন মানুষ। তাদের হাতে ধানের শীষ, মুখে হাসি। এই পথেই ক্রমশ মুক্ত হবে সারা দুনিয়া। চারু চোখ খুললেন। উত্তেজনা, আবেগের কম্পন বয়ে চলেছে সারা শরীর জুড়ে।

পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয়ে গেল অভ্যুত্থান। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনশোটি জমি দখল করে ফেলল কৃষক সমিতি। তিনজন বড় জোতদারের বাড়ি হামলা চালিয়ে বন্দুক দখল করে, দলিলপত্র ছিঁড়ে ফেলল তারা। কিছু জোতদার ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেও অনেকেই চেষ্টা করল পুলিশের সাহায্যে দীর্ঘদিন বসবাসকারী কৃষকদের উচ্ছেদ করতে। সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের কর্তৃপক্ষ বাগানের দক্ষিণে জাবর আলি জোতটি তাদের এলাকা বলে দাবি করল। ওরা উৎখাতের চেষ্টা করল ওই জমিতে চাষ করে খাওয়া বিগুল কিশাণকে। উচ্ছেদের সময় সংঘর্ষে মাথা ফেটে গেল বিগুল কিশাণের। খবর পেয়ে আড়াই-তিনশো জনের দলবল নিয়ে ছুটে এলেন জঙ্গল সাঁওতাল। পুলিশ ফিরে গেল। জমির দখল ছাড়তে হ'ল না বিগুল কিশাণকে। এই ঘটনার পরেই জোতদারদের হামলার বিরুদ্ধে সজাগ করবার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি-কাসিদিওয়া-নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় কৃষকেরা নিয়মিত মিছিল শুরু করল।

এই ঘটনার উল্লেখ করে একটি ইস্তাহার প্রকাশলেন চারু মজুমদার। জঙ্গল সাঁওতালের নামে ছাপা এই প্রচারপত্র উত্তরবঙ্গে বিলি করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতাতেও এইটি ছেপে প্রচার করা দরকার। একজন কাউকে সন্নিবেশ দিয়ে পাঠাতে হবে।

বাড়ি থেকে বেরুতে না পারলেও নকশালবাড়ি এলাকার কৃষক আন্দোলনের প্রতিটি খবর পেয়ে যান চারু মজুমদার। কানু-জঙ্গল-খোকন-কদম-খুদন প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ওরা কোনো নিরীহ চেহারার কমরেডের মাধ্যমে খবর পাঠায়। চারু সেই কর্মীটির মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন প্রয়োজনীয় বার্তা।

কৃষকদের জমি দখলের খবর, ফসল বিলি করে দেবার খবর, ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বাজারে গুজব, জঙ্গল সাঁওতাল ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে জোতদারদের মুণ্ড কাটতে কাটতে শহরের দিকে আসছে। পুলিশ সন্ত্রস্ত। কৃষকরা নাকি বাঘধনুক নামে এক মরণফাঁদ বানিয়েছে। জঙ্গলে পাতা আছে সেই ফাঁদ। আচমকা বাঘধনুকের দড়িতে পা লাগলেই তীর ছুটে এসে এফোড় ও-ফোড় করে দেবে জঙ্গলে অনুপ্রবেশকারীকে। নকশালবাড়ির হাটে পুলিশ খোঁজখবর করেছে বাঘধনুকের।

কৃষক সমিতি স্থির করেছে গ্রামে পুলিশ ঢুকতে দেবে না। যে অঞ্চল তারা দখল করেছে, এ তাদের নিজেদের এলাকা। এখানে খাটবে শুধু তাদের আইন। পুলিশও গ্রামে ঢোকবার জন্য মরিয়া। দু-তিনবার ঢোকার চেষ্টা করে বিফল হয় তারা। কৃষকরা তীরধনুক নিয়ে তাড়া করে গ্রাম ছাড়া করেছে তাদের।

এক সন্ধ্যায় প্রসাদুজোত থেকে হেদল এল। বেশ উত্তেজিত।

— কি কমরেড হেদল, ওদিকের শব্দ শুন্য চারু ডুক উঠে করে তাকালেন।

পুলিশ দারোগা সোনাম ওয়াংদি খতম ...

কমরেড চারু পিঠ সোজা।

আজ ... আজই এই ২৪ মে। হেদলু বিস্তারে যায়।

সকালে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ জোর করে নকশালবাড়ির গ্রামে ঢোকে। সমিতির সিদ্ধান্ত মানা করতে চায় না ওরা। অন্যদিকে কৃষকরাও তাদের সিদ্ধান্ত বজায় রাখবেই। বড়ঝোতের কাছে সংঘর্ষ হয়ে গেল। কৃষকের ছোঁড়া তীরে পুলিশের দারোগা সোনাম ওয়াংদি নিহত। ওয়াংদির মৃত্যু দেখে পুলিশ বাহিনী দৌড় লাগাল। বড়ঝোতের খবর জুড়ে পড়ে চারুদিকে। তারাবাড়ি, জয়সিংজোত, ঘুঘুঝোরা গ্রাম থেকে হাজারখানেক কৃষক সশস্ত্র মিছিল করে যায় বড়ঝোত। দখল করা এলাকাগুলিতে চব্বিশঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করেছে কৃষকরা।

কমরেডরা সবাই খেপে আছে ... গ্রামে পুলিশ ঢুকলে আবার লড়াই হবে। হেদলু গলল।

ঠিক আছে, সাবধানে চলাফেরা করবেন ... সাবধানে।

হেদলু হাসল। একদম চিন্তা করবেন না কমরেড। আমায় ওরা ধরতে পারবে না।

— তবু সাবধানে ...

— ঠিক আছে ... কাল আবার আসব। হেদলু চলে গেল।

পরদিন আসতেই ওর থমথমে মুখ দেখে চারু বুঝে গেলেন, কিছু অঘটন ঘটেছে। মুখে কিছু না বলে ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

— কমরেড আমাদের এগারোজন মহিলা-বাচ্চাকে মেরে দিয়েছে পুলিশ ...

হেদলুর গলা বুজে এল। ঠোট কমরেড ধরলেন চারু মদুমদার। তিনি নীরবে তাকিয়ে গেলেন হেদলুর দিকে। কিছু পরেই হেদলু বলতে শুরু করল। ঘটনাটিকে ছবির মতো দেখতে লেলেন চারু।

গতকাল রাতেই পুলিশবাহিনী জয়সিংজোত, ঘুঘুঝোরা-র দয়্যারাম জোত হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে কৃষকদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেছিল। ওই অঞ্চলে জমির চতুর্দিকে ছোট ছোট জঙ্গল। পুলিশ বুঝে গেল কৃষক-গেরিলারা তীরধনুক হাতে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। রাতের বেলায় তাই আর পুলিশবাহিনী ওই দিকে এগোবার সাহস পায় নি। ওরা ঘুঘুঝোরা মেচবন্ডির দিকে ফাঁকা জমির মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকে।

আজ ভোর হতে পুলিশবাহিনী নকশালবাড়ির কাছে কাটিয়াজোত যাবে, কিন্তু সামনে বহু কৃষকের জমায়েত। পুলিশ অফিসার এগিয়ে গিয়ে বলেন, আমাদের চলে যেতে দিন। কৃষকরা যেতে দেন। পুলিশ নকশালবাড়ির দিকে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে ওরা ট্রাকে চেপে ব্যাসাইজোত হয়ে পানিট্যাক্সির দিকে যায়। এদিকে জয়সিংজোত, ঘুঘুঝোরায় পুলিশ ঢুকেছে শুনে ব্যাসাইজোত আর প্রসাদুজোতের পুরুষ কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওইদিকে দৌড়ে যায়। মহিলাদের বলা হয়, পরে মিছিল করে এসে যোগ দিতে। পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে প্রসাদুজোতের স্কুলের সামনে জড়ো হন কৃষক-রমণীরা। এমন সময়ে পুলিশবাহিনীর ট্রাক ব্যাসাইজোত থেকে এসে হাজির প্রসাদুজোতে। পুলিশের উদ্দেশ্যে দিকার ঝুড়ে দেন নিরস্ত্র মহিলারা। পুলিশ ওই মহিলাদের ওপর এলোপাথাড়ি

গুলি চালাতে শুরু করল।

নারীদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। গুলি খেয়ে মহিলারা একে একে লুটিয়ে পড়ছেন। তাজা রক্তে ভিজ়ে যায় আবাদের মাটি। শিশু, নারী মিলিয়ে মোট এগারো জন মারা গেছেন। প্রসাদুজোতের বাতাস ভারী। কোনো ঘরে আর উনুন জ্বলে না। ঘরে ঘরে অরক্ষন। পুলিশের আক্রমণের মুখে গ্রামের পুরুষেরা অন্যত্র আত্মগোপন করেছেন। মৃতের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পুরুষটিও গ্রামের বাইরে। নিখর দেহগুলিকে মাঠেই ফেলে রাখল পুলিশ। পাহারায় রইল একটি বাহিনী। কিছুকাল পরে গাড়ি এল। এগারোটি মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল কালিম্পঙের মর্গে।

আবার ঠোট চেপে কান্না রোধ করবার চেষ্টা করলেন চারু। হেদলুকে বারে বারে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন ঘটনার অনুপুঙ্খ। কাগজে লিখলেন তারিখ - ২৫ মে ১৯৬৭। লিখতে থাকলেন নিহতদের নামগুলি — আটজন মহিলা — ধনেশ্বরী দেবী, ফুলমতি দেবী, গাউড্রাউ শৈবানী, নয়নশ্বরী মল্লিক, সামশ্বরী শৈবানী, সীমান্বরী মল্লিক, সোনামতি সিং, সুকুবালা বর্মণ আর একটি পনেরো বছরের ছেলে খরসিং মল্লিক। দুই মেচ রমণী গাউ ড্রাউ আর সামশ্বরীর পিঠে বাঁধা ছিল তাদের দুই ফুটফুটে শিশু। পুলিশের গুলি ফুঁড়ে দিয়েছে বাচ্চা দুটিকেও। চারু স্তম্ভিত। এরা কী দানব? চারুর চোখে জল এসে গেল। সমাজবদলের লড়াইয়ে আগামীতে এমন আরও রক্তক্ষিত হবে। যুক্তি তাই বলে। কিন্তু হৃদয় যে মানতে চায় না। এমনভাবে নিরস্ত্র মহিলাদের মারতে পারল পুলিশ? চারু আত্ননাদ করে উঠলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন শারীরিক ঘটনা ক'টা ঘটেছে? আর এই পৈশাচিক কান্ড ঘটাল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ! সি পি আই (এম) যার শরিক!

— আমাদের এগারোজনের জানুয়ারি নিয়ে নিল ওরা...। হেদলু আবার বলল। চারুর বাঁধ ভেঙে গেল এইবার। অস্ত্র গাড়িয়ে গেল গাল বেয়ে। হেদলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, জীবন থাকতে এই শহীদদের ভুলব না আমরা।

আটজন রমণী মারা গিয়ে নকশালবাড়ির নাম পৌঁছে দিলেন দেশের প্রতিটি কোনায়। কৃষক মা-বোনেরা প্রসাদুজোতের 'যে জায়গায় শহীদ হয়েছেন, তা খড়িবাড়ি আর নকশালবাড়ি থানার সীমানা অঞ্চলে। কিন্তু সীমানায় ঘটলেও নকশালবাড়ি নামটাই লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গেছে। প্রতিটি সংবাদপত্রের শিরোনামে নকশালবাড়ি। শুধু নকশালবাড়ি নয়, মানুষের রাগ ছড়িয়ে পড়েছে খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়াতেও। খবর সংগ্রহের প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ভিড় জমালো চারু মজুমদারের বাড়িতে।

এমন উত্তাল সময়েও শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঘরে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন চারু। মন মানে না। একদিন মনের জোর করে তেরো কিলোমিটার বাসে গিয়ে, দু' কিলোমিটার পায়ের হেঁটে কৃষককর্মীদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করে এলেন। ওদের মনোবল ভাঙে নি। ওরা লড়াই চালিয়ে যেতে চায়।

গ্রামে পুলিশি আক্রমণের খবর এলে চারু অস্থির হয়ে ওঠেন। ক্রমশ পুলিশের তৎপরতা বাড়ছে। গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প বসিয়েছে পুলিশ। বাড়ছে পুলিশ-কৃষক সংঘর্ষ। এলাকা থেকে নির্গমনের পথগুলি পুলিশ বন্ধ করে দিচ্ছে। ১৮৭নি তাম্রাশি চলেছে নেপাল কিংবা বিহারে যাবার রাস্তায়। পূর্ব পাকিস্তান পালানোও সহজ নয়। পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মারা

গান। এঁরা গান। পুলিশি আক্রমণের মুখেও প্রায় তিনমাস ধরে কৃষকেরা প্রতিরোধ চালিয়ে গাছে, এ ভাবসেই বুক ভরে ওঠে। রেডিও পিকিং সমর্থন করেছে কৃষকদের এই লড়াই। এরই পিঠোপিঠি খবর এল চিনের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা পিপলস্ ডেইলি স্বাগত জানিয়েছে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে। ওরা সম্পাদকীয় লিখেছে — ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। মাও সে-তুঙের দেশ তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে এ কি কম কথা। আবেগে চোখে জল এসে যায় চারুর।

চীন সমর্থন জানালেও অভ্যুত্থানের এলাকার অবস্থা ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠল। সমিতির নেতাদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। আশ্রয় নিতে হচ্ছে জঙ্গলে। শয়ে শয়ে কৃষক গ্রেপ্তার হচ্ছে। ধরা পড়ে গেলেন জঙ্গল সাঁওতাল।

সেপ্টেম্বরের সকালে মহানন্দা পাড়ার বাড়িতে আবার হেদলু এল চিরকুট নিয়ে। কানু সান্যালের লেখা। লেখা পড়ে চারু গভীর হয়ে গেলেন। দেওমুনি চা বাগানের কাছে পুলিশের খেরাও-এ পড়ে গেছে কানু-খোকনসহ ছ'জন। ওদের অন্যত্র সরাতে না পারলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু অবধারিত। চারু নিমেষে স্থির করে ফেলেন ওদের উদ্ধারের পরিকল্পনা। ওদের পাঠান চিরকুট রেখে অন্য একটি ছোট কাগজে চারু লিখলেন, আমি আসছি। চিন্তা কর না। তোমরা দেওমুনি চা বাগান আর কেঁটপুরের মাঝামাঝি জঙ্গলে লুকিয়ে থেকো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ওইখানে থাকব। আমি সিগন্যাল দেব, শীতাল রেখ। তাঁর অসুস্থতা এমনই, শরীরকে গুরুত্ব না দিয়ে চারুর উপায় নেই, কিন্তু ঔষধীয় গুরুত্ব দিতে গেলে এমন ক্ষতি হয়ে যাবে, যা পাহাড়ের মতো ভারী। চারু জানেন, সংগ্রাম মানে কেবল বাহ্যিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধাচার নয়। সংগ্রাম জারি থাকে নিজের দেহে, মনে, এমনকী হৃদয়েও।

পরিকল্পনা অনুযায়ী চারু মোটর স্টারেরেজে গিয়ে ব্যবস্থা করেন একটি জিপের। জাইভারটির নাম খুশি, চারুকে খুবই ভালোবাসে। ছেলেটি কম কথার মানুষ। খুবই নির্ভরযোগ্য।

সন্ধ্যাবেলায় প্যান্ট শার্ট গলিয়ে, টর্চ হাতে, কাঁধে কোলা নিয়ে চারু বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে সৌরেন। শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ির রাস্তায় প্রতিসন্ধ্যায় মিলিটারি গাড়ি টহল দেয়। ওরা সার্চ লাইট ফেলে দেখে। চারু শান্তভাবে বসে থাকেন গাড়িতে।

নির্দিষ্ট জায়গায় জিপ দাঁড় করালেন চারু।

— তোমার জামাটা একটু দাও ভাই। খুশিকে বললেন চারু।

ছেলেটা অবাক হয় কিন্তু তার কালিঝুলি মাখা জামাটা খুলে দিয়েও দেয়।

— আমারটা তুমি পর। নিজের জামা খুলে ওর দিকে এগিয়ে দেন চারু। এইবার খুশির চোখে অস্বস্তি ফোটে।

দেরি কর না ... তাড়াতাড়ি পরে নাও ... আমি তোমারটা পরে নিচ্ছি... ছেলেটি যন্ত্রমুগ্ধের মতো চারুর নির্দেশ পালন করে।

বাঃ! ওড! ... তুমি এইবার বনেটটা খুলে গাড়ির পেছনের সীটে বস... চোখের ইঞ্চিতে সৌরেনকেও ওর পাশে বসতে ইঙ্গিত করেন।

গাড়ির বনেট খুলে টর্চ জ্বালিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়েন চারু। কিছু পরে তিনটি পুলিশ গাড়ি একে একে চলে যায়। টহলদার গাড়িগুলি সন্দেহ করল না। খারাপ গাড়ির বনেটে

মাথা গোঁজা মিস্ত্রিকে কেনই বা করতে যাবে? ওরা সার্চলাইট জ্বালিয়ে এদিক ওদিক দেখে চলে গেল। পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই বনেট থেকে মাথা বের করেন চারু। জঙ্গলের দিকে টর্চের আলো বৃত্তাকারে ঘোরান চারবার। পাঁচবার। সঙ্গে সঙ্গেই দলকা জঙ্গল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল কানু-খোকন-খুদন-কেশব-ফনি-কামাখ্যা সবাই। দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ল তারা। বনেট বন্ধ করে চারু বললেন, জলদি জোরসে ছোটো।

জিপ বাগডোগরা হয়ে বিধাননগরের দিকে ছোটো। কানুর গায়ে হাত বোলাতে থাকেন চারু। খাওয়া হয়নি তোমাদের ... তাই না?

কানু হাসে, হ্যাঁ চারুদা ... তা প্রায় তিন দিন...

খোকন বলে, তেষ্ঠা পেলে গলা ভেজাতে হয়েছে নদীর জলে...

কেশব বলে, আমার তো পেট খারাপ হয়ে গেল...

ফনি, কামাখ্যা হেসে ওঠে। সে এক কাণ্ড, পরে কোনো দিন সে গল্প বলব আপনাকে চারুদা...

ঝোলা থেকে মুড়ি-বাদামের ঠোঙা বের করেন চারু, ওদের দিকে এগিয়ে দেন। নাও আপাতত এইটা খেয়ে নাও...। ওরা সবাই হইহই করে খেতে থাকে।

বিধাননগর পেরিয়ে, সোনাপুরের ওভারব্রিজের কাছে গাড়ি থামে। চারু পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে যান রেল লাইনের ধারে একটি ছোট্ট বাড়িতে। চারুর পচাগড়ের বন্ধু মুক্তি সিং-এর বাড়িতে ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ অঞ্চলে পুলিশের তৎপরতা কম। অনেক ভেবেচিন্তে ওদের এখানে এনেছেন মুক্তি।

কানুদের নামিয়ে দিয়েই শিলিগুড়ি ফিরতে হয় চারুকে। বেশি দেরি দেখে গ্যারেজের অন্য কেউ উতলা হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দিলেই মুশকিল।

— এইবার আমার জামাটা ফেরৎ দিন। খুশি হাসে। ও হ্যাঁ, তাই তো। চারুও মৃদু হাসেন। আবার জামা বদল হয়। ফেরার পথে হঠাৎ গভীর হয়ে যান চারু।

সৌরেন বলে, চারুদা কী হল? এত চূপচাপ? চারু বলেন, ঘটনা যখন ঘটে যায়, আমরা তাকে জানতে পারি.....কিন্তু এই ঘটনা ঘটানোর পেছনে কত দুঃখ, কত চোখের জল, কত বীরত্বের কাহিনী লুকিয়ে আছে তা আমরা তখনই জানতে পারি না।

উম্টো দিক থেকে এসে মিলিটারি ট্রাক চলে যায়। ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় সৌরেন দেখে চারুর আয়ত চোখদুটি জলে টলটল করছে।



বাবুঘাট চত্বরটি বড় বিচিত্র। দশটি স্তম্ভের সারির মাঝখানে প্রধান ফটক। মূল প্রবেশপথের দুধারে আবার দুটি করে স্তম্ভ। গভীর এই গথিক স্থাপত্য পেরোতেই সিমেন্টের চাতালের ওপর সারি সারি তালাবন্ধ আলমারি। ওড়িয়া ভাষায় লেখা কিছু পোস্টার। তেলমাশি থেকে পিণ্ডদান সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে এখানে। পুজোর তৈজসপত্র তো বটেই, চাইলে গামছাও ভাড়া পাওয়া যায়।

দোকানদারদের হাঁকডাক কানে না নিয়ে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল দ্রোণাচার্য। পানো গো পানো ধাপের পর কিছু অংশ সমতল তারপর আবার সিঁড়ির ধাপ। মাত্র দুটি ধাপ দেখা যাচ্ছে। বাকি জলের তলায়। এখন জোয়ারের সময়। ভাটা পড়লে নীচের বেশ কয়েকটি ধাপ জেগে উঠবে। তখন সেখানে গিয়ে জলে পা ডুবিয়ে বসা যায়। আপাতত ওপরের ধাপেই স্থিত হ'ল দ্রোণ। ডান দিকে একটি গোলগাল মাঝবয়েসি পুরুষ মাথা কামাচ্ছে। এরপরেই লোকটি গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে আসবে। বাঁ দিক এক বিশাল বশু পেংটি পরে শুয়ে। তাকে ভীমবিক্রমে তেলমাশিশ করে চলেছে একটি চোয়াড়ে ছেলে। এইরকম মাশিশ খেলে হাড়পাঁজরা ভেঙে যেত দ্রোণের। কিন্তু চর্বি খলখলে লোকটি নিশ্চয়ই বেশ আরাম পাচ্ছে। কোনো যন্ত্রণার প্রকাশ নেই লোকটির কোথাও।

ড্রাইভিং শেখার অবসরে, এর আগেও দ্রোণাচার্য বেশ কয়েকবার এসেছে বাবুঘাটে। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছে চারপাশের সবকিছু। আজ নিজের মনে চূপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই ভালো লাগছিল না। বস্তুত, বিরক্ত লাগছিল তার। বিরক্তির কারণ অবশ্য আছে। সকালে, বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হয়েছিল। মগরা স্টেশনে পৌঁছতেই চোখের সামনে দিয়ে দশটা চল্লিশের ট্রেন বেরিয়ে গেল। পরের ট্রেন আধঘন্টা লেট। মগরা থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে বেলতলায় মেটর ভেহিকলস্ এলাকায় যতক্ষণে পৌঁছল, ড্রাইভিং ক্লবের মাষ্টার চলে গেছে। আজকেও ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হাতে পাওয়া গেল না।

একেকদিন এমন হয়। কোনো কাজই হতে চায় না। দ্রোণ নিশ্চিত, আজ কফি হাউসে গেলেও সমীর রূপম কাউকে পাবে না। অতএব বাবুঘাট। রকমারি মানুষের ভিড়ে একা থাকতে মন্দ লাগে না এখানে।

একা থাকলেও নির্বিকার হতে পারেন দ্রোণ। যদিও ড্রাইভিং পরীক্ষায় পাশ করেছে সে, মাষ্টারের কাছে ওর লাইসেন্স রাখা আছে। বাকি টাকাটা দিলেই সে পেয়ে যাবে গ্যাড্‌ টালানার বৈধ অনুমতি পত্র। সবই ঠিক। তবু লাইসেন্সটা পেল না বলে রাগ হচ্ছে দ্রোণের ওপর। ওটা হতে থাকলে, বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে, আজকেই দু-এক জায়গায় ড্রাইভারের চাকরির খোঁজখবর করতে পারত।

অশান্তির মুহূর্তে দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়ায় এক বাদামি বেড়াল। দ্রোণ বেড়ালের চোখে চোখ রাখে। বেড়ালও তাকায়। কে কতক্ষণ অপলক তাকাতে পারে? বেড়ালটির সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে দ্রোণ। দ্রোণের পলক পড়ে যায়, বেড়ালের চোখ নড়ে না। ছোট্ট একটা হাই তোলে বাদামি বেড়াল। মুচকি হাসে যেন। লেজমোটা মার্জারটি আঙুল-ধীরে চলে যায় বাঁ দিকের ঘাট বরাবর।

বেড়ালের যাত্রাপথের শেষে দেখা যায় জনাদশেক স্নানরতাকে। অন্তর্বাসহীন ভেজা শাড়িতে অধিকাংশের নারী শরীর দৃশ্যমান। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। বেড়ালটি তাকিয়ে থাকে। বেড়ালের কান ডিঙিয়ে দ্রোণের দৃষ্টি আটকে যায় এক বিশেষ নারীর শরীরে। মহিলার শরীরটি দেখা, ওর নিতম্ব। জলের মৃদু ঝাপটে নিতম্ব দুলছে। গামছা দিয়ে গা ঘষে মহিলা। গামছা ফেলে তালে আকাশের দিকে ছিটকে ওঠে বাদামি, বর্জুল স্তনযুগল। ভ্রমরকালো স্তনযুগল থেকে জল ধরে পড়ে। এমন স্তনে মুখ রেখে মরে যেতেও সূখ।

একবার ডুব দিয়ে উঠতেই মহিলার নিম্নাঙ্গের পরিধান শিথিল হয়ে আসে। বেড়ালটি

দৌড়ে পালায়।

দ্রোণের শরীর কাঁপে। বিশেষ অঙ্গটি জেগে উঠেছে। প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। মুক্ত হতে চায় ক্ষুধার্ত বাঘ। আর কিছু এগোলেই অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। জোর করে নিজেকে সংযত করে দ্রোণ। মাথা নিচু করে তাকায় নিজের নাভিদেশে। জোরে শ্বাস নেয়। উগ্রতা কমে আসে। প্যান্টের তাঁবু আস্তে আস্তে সমতল হয়ে যায়। সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ে সে।

হাওড়া থেকে রামপুরহাট লোকাল চেপে মগরা। মগরা থেকে জয়পুর হাঁটা পথ। বাড়ি পৌঁছতে বিকেল। বিছনায় শুতেই দুপুরের স্মৃতি হানা দেয়। শিবানীর কথাও মনে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি খালি। খালি বাড়িতে ইচ্ছা অবাধ হয় দ্রোণের। সে দ্রুত লুঙ্গি খুলে ফেলে পুরুষাঙ্গ শক্ত মুঠোয় ধরে। কল্লনায় লেহন করে স্নানরতার সূর্যমুখী স্তন, নিম্ননাভির অরণ্যানী, কামড়ে ধরে স্তনবৃন্ত। হাত চলে মগরা-হাওড়াহাওড়া-মগরা.....মগরা-হাওড়া....। শিবানীর মুখ বসে যায় স্নানরতার শরীরে। শিবানীর কি এমনই? বজ্রপাতের মতো বীর্য আসে।

আত্মরতির পর মন খারাপ লাগে। ডায়েরির পাতায় আঁকিবুকি কাটে। শব্দের পাশে শব্দ বসায় দ্রোণ — নিঃসঙ্গ বিছনায় কামনার ডাকে, যৌবন তরল হয় আঙুলের ফাঁকে।

বিমর্ষতা তরল নেশার মতো। কেবল ছড়িয়ে পড়ে যত আকাজক্ষা, যত না হওয়া, যত দুঃখ-কষ্ট তাকে ঘিরে ফেলে আপাদমস্তক। হৃদয়ের সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেয়নি বলে আত্মধিকার জন্মায় দ্রোণের। বাবার ওপর বৃত্তি হয় খুব। দ্রোণ লিখতে থাকে।

এককালে ভাবতাম ডিগ্রির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু এখন ঠেকে ঠেকে একটা ব্যাপার শিখেছি — বাস্তব জীবনে বিশেষ করে চাকরি প্রভৃতি আর্থিক উপার্জনের ক্ষেত্রে ডিগ্রির মূল্য অপরিসীম। অবশ্য এই যে 'ডিগ্রির কোনো দাম নেই' জাতীয় ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছিল, তার জন্য মুখ্যত দায়ী আমার বাড়ির পরিবেশ এবং বিশেষ করে বাবা।ছোটবেলা থেকে অর্থাৎ যেদিন থেকে বাইরের মানুষের কথা বোঝবার মতন অনুভূতি জেগেছে — সেই তখন থেকেই তোতাপাখির বুলি মুখস্থ করার মতন বাবার মুখে শুনে আসছি 'ডিগ্রির কোনো দাম নেই। ও তো একটা কাগজ মাত্র। আসলে জ্ঞানই হচ্ছে সেরা জিনিস।' কথটা আসলে সত্য, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে মানুষের পরিমাপ যে হয় না, দুর্ভাগ্য সেটাই।

.....যখনই বাড়িতে কোনো বগড়াঝাটি হয়েছে বা আমি কোনোরকম দোষ করেছি তখনই দেখেছি বাবার যতো রাগ আমার বইগুলোর ওপরে। এবং কথায় কথায় স্কুল বন্ধ করে দেওয়াটাও একটা নিতানৈমিত্তিক ঘটনার মতো দাঁড়িয়েছিল। এইসব মানসিক আঘাতজনিত ব্যাপারের সঙ্গেই সমান্তরালভাবে জড়িত সংসারের দারিদ্র্য ও অর্থসংকট। এবং সবশেষে দায়ী আমি নিজে। আমার নানা বিষয়ে মাথা গলাবার আগ্রহ, গল্পের বইয়ের নেশা, এক্সারসাইজ, খেলা ইত্যাদি ব্যাপার এই বিশেষ মতবাদটিকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করেছে, আর সাহায্য করেছে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিতে। বর্তমানে তারই ফলস্বরূপ ক্লাস টেন অবধি পড়ে বসে থাকতে হয়েছে। জানি না ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ডিগ্রি পাওয়া সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বাইরের পৃথিবীতে ঠেক খেতে খেতে আবার নতুন করে পড়াশুনো করবার আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এটা স্পষ্ট বুঝতে

সানাত সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, ভালো লিখতে চাইলে, আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন। আর একমাত্র ডিগ্রিরই ক্ষমতা আছে, তা পাবার সুযোগ করে দেওয়া।

সোণ এলোমেলো লিখে যায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা-মার কথোপকথনের শব্দ নাতে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ বন্ধ করে সে শোনে সংসারের হতমান অবস্থার কথা। দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান কীভাবে হবে সেই নিয়ে আলোচনা চলে।

পরের দিন থেকেই আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজ খুঁজতে নেমে পড়ে দ্রোণাচার্য। সারাদিনে শুধু একটাই কাজ কাজ খোঁজা। কাজ খুঁজতে চন্দননগর - ব্যাণ্ডেল - কলকাতা চষে বেড়ায়। কলকাতায় ড্রাইভারের চাকরি জোটের উপক্রম হয়েও শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া হল। আবার কাজ খুঁজে চলে দ্রোণ। সকাল থেকে রাত — একইরকম অবস্থা চলতেই থাকে।

একটরকম অসুখা চলে রাজ্যে। সেই কংগ্রেস আমলে যা ছিল — অতি সামান্য কারণে পুলিশের গুলি বর্ষণ — তাই-ই থাকে। খাদ্যের অনটনে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত, বাজারের সব কিছু দাম দিনের পর দিন উর্ধ্বগামী। সব একই থাকে।

মগরা অঞ্চলেও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একই অবস্থা। সংগ্রামের কথা বলে গাজার গরম রাখে জেলা পার্টি। রবি-কানাই-সঞ্জিত-সমরদের সঙ্গে ভিড়ে যায় দ্রোণাচার্য। দেখাশোনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পোস্টার মারে। স্লোগান দিয়ে মিছিলে নামে। নিয়মমতো পার্টি অফিসে হাজিরা দেয়। পার্টি অফিসে সেই একই আলোচনা — যুক্তফ্রন্ট সরকার ডাঙার চক্রান্তকে প্রতিহত করতে হবে।

ওগলি জেলাপার্টির নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ সিঁড়ি বোঝায়, যে রাস্তায় পার্টি চলেছে, এ রাস্তায় হবে না। সবই তো আগের মতো রয়ে গেল। দ্রোণ বোঝে। দ্রোণের রাগ হয়। সে ডায়েরির পাতায় লেখে — বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার একটা পুরো গাণ্ডু সরকার। এবং তার সঙ্গেই গাণ্ডু কোম্পানি হচ্ছে বর্তমান মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। গদির মোহ তাদের পেয়ে এসেছে। তারা ভুলে গেছে জনগণের কথা, ভুলে গেছে কৃষক-শ্রমিকের কথা, ভুলে গেছে সর্বহারাদের শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা।যতো দেখছি ততোই এক অসহনীয় কষ্টের ভিতর কবরপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ কী হতে চলেছে? এইভাবে কি কমিউনিজম আসতে পারে?অথচ কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক বড় কম দিন হল না, প্রায় আট মাস — কিন্তু কি করল তারা? জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ, গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলা, মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করা —এ সবের কতটুকু তারা করেছে? মুখেই শুধু বড় বড় বুকনি মেরে গেছে, আর কিছু নয়।

রাগের শেষে ক্রান্ত লাগে দ্রোণের। সব ছেড়ে-ছুড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। গাসে চেপে, পায়ে হেঁটে সে ঘুরে আসে নিকটবর্তী গ্রামগুলি — লোহার, বেহুলা, বৈদেডাঙা, বলাগড়। গ্রামগুলির মানুষজন আলাদা কিন্তু নিসর্গের সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণাঙ্গগুলির চারপাশে তালবীথি - খেজুরগাছ - বাবলাঝোপ - পুকুর। মাঝে মাঝে দীর্ঘা মাঠ, উদ্দাম বাতাস। আবার গাছপালা, বসতির চিহ্ন এবং গৃহস্থ মানুষ।

কিছু নতুন গণ্ডারের স্লুক-সন্ধান কবিতার খাতায় লিখে রাখে দ্রোণাচার্য। আঁতপুর হাওড়া থেকে মাটিন পাইনে যেতে হয়। অযোধ্যা পাহাড় — হাওড়া থেকে চক্রধরপুর লোকালে। চন্দ্রকেতুগড় — শ্যামবাজার থেকে প্রাইভেট বাস ভাড়া এক টাকার কম।

গোসাবা — শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকাল, তারপর লঞ্চ।

কিন্তু ভবঘুরে পর্যটনেও তো কিছু খরচ আছে। জীবনের সমস্যা তো একটাই — পয়সা নেই।

হাতে তেমন পয়সা না থাকলেও, এক বিকেলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দ্রোণাচার্য। বন্ধুদের সঙ্গে জিপে করে ফ্রেজারগঞ্জ যাবার মিথ্যে গল্প বলে বাবাকে। হাত খরচের জন্য বাবার থেকে পাওয়া যায় চার টাকা। ডায়েরির পাতার ভাঁজে কিছু খুচরো টাকা রাখা ছিল। সব মিলিয়ে পাথৈয় দাঁড়ায় দশটাকা।

বর্ধমান থেকে দিল্লি কালকা মেলে উঠে পড়ে দ্রোণ। ভিড় থাকলেও অসংরক্ষিত কামরার কিনারায় এক চিলতে বসার জায়গাও পেয়ে যায়! ট্রেন চলতে শুরু করলে, মানুষের কথা কমে আসে। নিচুগ্রামে খণ্ড খণ্ড কথা, চলমান সংসার, ট্রেন চলার বিকুম-বুকুম শব্দ — সব মিলিয়ে রাতের রেলগাড়ি বড় মায়াময়। সারাজীবন এমনভাবে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে পারলে দ্রোণ বেঁচে যায়।

দুর্গাপুর পেরোতে শিবানীর কথা মনে পড়ে একবার। একটু হ হ করে বুক। শিবানীকে আজও লেখা হ'ল না ভালোবাসার কথা। সে কি শিবানীর ওপর অভিমান করে দূরে চলে যাচ্ছে? দ্রোণ বোঝে না ঠিক। কিন্তু এই গন্তব্যহীন পর্যটন তার প্রাণে কিছু আরাম দেয়। চলন্ত কামরায়, কাঁপা অক্ষরে দ্রোণ লেখে।

হাজারিবাগ পেরিয়ে গেছি নিছক অবহেলে

পরের কথা পরে

ট্রেনের ভিড়ে মৃদু কণ্ঠস্বরে

শব্দ শুনি — কি পেলো তুমি

কি তুমি পেতে এলে?

'গয়া'-র এখন উধাও কণ্ঠস্বর

সামনে মোগলসরাই —

ভিড়ের মধ্যে তাই তো অতঃপর

নিজের অশ্রু নিজের কাছেই ঝরাই।

মোগলসরাই স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে হাঁটবার সময় কাশী যাবার ট্রেনের ঘোষণা শুনতে পায় দ্রোণ। বারানসী.....কাশী। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাশীগামী ট্রেনে উঠে পড়ে সে।

বাসনগর স্টেশন পেরোতেই কাশী। সকালবেলায় ব্রিজের ওপর থেকে মনোরম দেখায় কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গা। নির্মল, পুণ্যতোয়ার ওপর সারি সারি কালো নৌকো। মানুষকে কী অকিঞ্চিৎকর লাগে প্রকৃতির কাছে। সুন্দরও লাগে।

হরসুন্দরী ধর্মশালায় থাকার জায়গা পেয়ে গেল দ্রোণ। তারপর কাশীর রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, ঘাটে বসা। কাশীর গলিতে ঝাঁড়, জুয়াখেলা - সস্তার চাল দেখতে দেখতে হনুমান ঘাট। রত্নাকর উদ্যানে বিজনে নিজের সঙ্গে বসে থাকা কিছুক্ষণ। এলানো বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলবাড়ি হয়ে ধর্মশালায় ফেরা। আহার বলতে দিনে দু-বার পাঞ্জাবি দোকানে সস্তর পয়সার পাউরুটি আর চা।

মধ্যদুপুরে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি লোককে গাঁজা খেতে দেখে দ্রোণেরও ইচ্ছে জাগে।

সমস্ত উপকরণ কিনে বাঙালিটোলার মধ্যে দিয়ে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে যায়। মৈসুর খাট-হুমান খাট পেরিয়ে চেন সিং ঘাট। ঘাটের কিনারায় বসে গাঁজা টানার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকঠাক টান দিতে পারে না। নেশাও জমে না কিছু। আকাশে মেঘ বৌদ্রের খেলা দেখে দ্রোণ। বিকেলের গঙ্গার ত্রোতে নিজের অশান্ত মনের ছবি। সন্ধ্যার বোঁকে তুলসীঘাটের পথ দিয়ে ফের ধর্মশালা। দিনের শেষে পয়সা গুনতে গিয়ে দেখা যায় মাত্র তিনটাকা পড়ে আছে। রাতের আহ্বার বাদ দেয় দ্রোণ। বিগত তিন দিনের লেখা কবিতাগুলি পড়ে যায়। শেষের পর লম্ব গোঁখেছে ঠিক, কিন্তু কবিতা হয়নি যেন। বিস্ফোভ জাগে। তবে কি সে লিখতে পারবে না সেই প্রিয় কবিতাটি? তবু এমন পর্যটনে আনন্দ অপার। অলৌকিক সম্পদে ভরা। লেখার উপকরণ পাওয়া যায় প্রচুর।

কালীতে এসেও কাজের খোঁজ নেয় দ্রোণ। এক তাঁতের কারবারির কাছে যায় সে। ব্যবসায়ীটি পনের দিন আসতে বলে। পরের দিন গেলে আবার পরের দিন। হাতে যখন একটি মাত্র টাকা, বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

বাড়ি ফিরে পরদিনই কলকাতায় যায় দ্রোণাচার্য। নতুন লেখাগুলি কফি হাউসের বন্ধুদের শোনায। সমীর-রূপম-শুভঙ্করের ভালো লাগে কবিতাগুলি।

শুভঙ্কর উচ্ছ্বসিত।

— গুরু একদম বাঘের বাচ্চার মতো লিখেছ... এই জন্ম করে যাবে সুগভীর পর্যটনে পর্যটনে / জানা ছিল তাও

— একেবারে চাবুক। রূপম বলে।

ওরা টেবিল চাপড়ায়। দ্রোণ হাসে। পরিতৃপ্তির হাসি।

সমীর বলে, চলো গুরু, জন্ম করে যাবার আগে আজ বাংলা হয়ে যাক।

বাংলার থেকে বাংলা মদ কথাটা দ্রোণের বেশি পছন্দের। আগে মাত্র একবারই সমীরের ঠোংটলে খট মদে চুমুক দিয়েছিল। ভালো লাগেনি। মদ খাওয়া নিয়ে মনের মধ্যে কোথাও একটা গালা টের পায় দ্রোণ। সে ইতস্তত করে।

এখন যাবে? আসলে আমার হাতে পয়সা নেই।

আরে আমরা আছি নাচলো চলো যাওয়া যাক।

বন্ধুদের উৎসাহের তোড়ে দ্রোণ ভেসে যায়।

ওয়েলিংটনের দক্ষিণ দিকে একটু এগোলেই ডান হাতে সরু গলি। শেষ প্রান্তে দেশী মদের দোকান। পানশালায় ঢুকতেই দেশী মদের গন্ধ। একতলায় অধিকাংশ লোকই দাঁড়িয়ে পান করছে। পানরত ভিড় ফুলে ফেঁপে চলে গেছে 'টয়লেট' অবধি। ওরা দোতলায় যায়।

পার্থ আর শিবশঙ্কর বসে আছে। ওরা খুব বন্ধু। পার্থ কলকাতা করপোরেশনে কাজ করে। অনেক নামী লোকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ। নামী পত্রিকায় ওর কবিতা ছাপা হয়। সমীরের মতো পার্থ তেমন কিছু লেখে না। এই নিয়েই ওদের মাঝে মাঝে কথার লড়াই জমে। পান করবার পর ওদের লড়াই বেড়ে যেতে পারে। দ্রোণ একটু শঙ্কিত হয়। পার্থ উল্লাসে দ্রোণের দিকে হাত বাড়ায়। টেঁচিয়ে ওঠে। আরে আরে চলে এসো, চলে এসো ব্রাদার।

ভজনে মুখোমুখি এসে পড়ে। শিবশঙ্কর রেলকোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। সে-ই সবাইকে ভাল খাওয়াবে আজ। শিবশঙ্কর পয়সা দেয়। কালীমার্কা বোতল আসতে থাকে।

শেষ হয়। আবার আসে। মদের সঙ্গে শালপাতার ঠোঙায় আসে অনুপান। বিটনুন দেওয়া শাঁকালু। নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ সহ কাবলিছোলা। আলুকাবলিও আসে। এখানকার আলুকাবলিতে টমেটোর ফালি পাওয়া যায়।

অনুপান সহযোগে ছোট-ছোট চুমুকে দেশী মদ পান করে দ্রোণ। প্রথমে গলা জ্বালা করে ওঠে, পরে সহ্য হয়ে যায়। মাথা টলমল করে ওঠে একটু।

ঢকঢক করে আধবোতল গলায় ঢেলে নেয় পার্থ। তারপর দ্রোণের দিকে তাকায়।
— গত রাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাটি নামিয়েছি.....একটা অনবদ্য পয়ার.....শুনবে নাকি?
দ্রোণ কিছু বলার আগেই, সমীর বলে ওঠে, অনন্ত পয়ার কেটে আমি মাথার মুকুট তৈরি করেছি।

—আ হা হাঅপূর্ব.....একেবারে মারকাটারি। রূপম বলে।

— কার লেখা গুরু? সমীরের দিকে তাকায় শুভঙ্কর।

সমীর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। মুচকি হেসে বলে, দ্রোণাচার্য ঘোষের।

পার্থ হঠাৎ খেপে ওঠে। — বান্চোত, আমাকে অপমান করা হচ্ছে? আমার মতো সনেট লিখতে পারবে ওই মগরার বকরা?

কিছু লোক আছে যারা সর্বত্র সব কাজের জন্য তারিফ পেতে চায়। পার্থ সেই গোত্রের। অकारণে পার্থ তাকে গালাগালি করলেও দ্রোণ বোঝে। সে কথা, কিন্তু সমীর বোঝে না।

— অত রঙবাজির কী আছে বে, শালা ঢামুস.....সনেট লেখবার আগে যা, দুবেলা দ্রোণের হিসি খা।

পার্থ-সমীরে লেগে যায়। গালাগালিতে কুজনেই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। একজন জেলেপাড়া - হাড়কাটাগুলির বাতাসে হাঙ্গামা গালাগালির নব্যতম সংস্করণ ছাড়ে তো অন্যজন রামবাগান - সোনাগাছির লেটেষ্ট। ফ্লিকতালে শিবশঙ্কর বোতল উপুড় করে গলায়। জড়িত স্বরে বলে, অ্যাই, অ্যাই তোরা কেউ গান কর না.....ঝগড়া থেমে যাবেগান ধর না মাইরি.....অ্যাই অ্যাই আরো দু'বোতল।

শিবু বোতল আনতে যায়। এক রসিক বৃদ্ধ গান ধরে, লাগ, লাগ, লাগ, লাগ.....পাগিয়ে বসে আছি।

গানের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে পার্থ-সমীরের ঝগড়া থেমে যায়। শিবশঙ্কর দু'হাতে দু'বোতল নিয়ে ফিরে আসে। পার্থ-সমীরের চোখে চোখে কিছু কথা হয়। প্রথমে, পার্থ 'একটু আসছি' বলে বেরিয়ে যায়। তারপরে সমীর। তারপরে রূপম-শুভঙ্কর।

দ্রোণ ভেবেছিল, ওরা বাথরুমে গেছে, ফিরে আসবে। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারে, শিবশঙ্করের পানের বহর দেখে ওরা চারজনেই পালিয়েছে। শিবশঙ্কর তো পার্থর বন্ধু। এমন অবস্থায় ওকে ফেলে পালান পার্থের। দ্রোণ পালাতে পারে না। শেষ বোতলের অর্ধেকের বেশি ঢেলে নেয় শিবশঙ্কর। বাকিটা দ্রোণ। বোতল শেষ করেই শিবশঙ্কর বমি করতে শুরু করল। বমির পর টেবিলে মাথা রেখে নির্জীবের মতো পড়ে আছে। শিবুকে দেখে দ্রোণেরও বমি পাচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল বোঁ বোঁ করে। যেন নাগরদোলায় পাক খাচ্ছে। মুখে চোখে জল দিয়ে আসায় কিছু স্বস্তি পেল সে।

টেবিল থেকে মাথা তুলে শিবশঙ্কর হঠাৎ বলল, আমায় তোমরা কেউ ভালোবাসো

না আমি জানি....দেখেছ, পার্থ কেমন ছেড়ে গেল আমার.... শিবশঙ্করের অনুযোগ ক্রমশ পিলালে পার্ণগত হয়। — ওরা কেন চলে গেল? কেন চলে গেল?অ্যাই আরো এক গোতল... শিবশঙ্করের অস্থিরতা বেড়ে উঠছিল। দ্রোণ বুঝতে পারছিল না কী করে সামলাবে ওকে। এরপর আরও খেলে শিবশঙ্করকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। ওকে পানশালা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া দরকার।

শিব আমাকে ধরো.....এসো, চলো বেরিয়ে যাই।

শিবশঙ্কর ঘেরোতে চাইছিল না। ওর একটা হাত নিজের বাঁ কাঁধে নিয়ে, ডান হাতে কোমর ধরে এক হ্যাঁচকা মারতেই শিবশঙ্কর সোজা উঠে দ্রোণের গায়ে এসে পড়ে। শরীরের ভার ছেড়ে দেয়।

শিবশঙ্করকে নিয়ে দ্রোণ চলে আসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর। একটা বেঞ্চিতে গিয়ে দেয় শিবকে। নিজেও শুয়ে পড়ে পাশের বেঞ্চিতে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর শিবশঙ্কর উঠে বসে। হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে আর বলে, আমার সবাই ছেড়ে যায়....সবাই..... কেউ ভালোবাসে না আমার.....কেউ না.....তুমিও ছেড়ে চলে যাবে? বলো, যাবে?

অপ্রকৃতিস্থকে সাজনা দেবার কোনো মানে হয়? আর কী-ই বা বলবে দ্রোণ? দ্রোণকেও তো সব ভালোবাসার মানুষ ছেড়ে চলে যায়। তবু মানুষের সংকটে মানুষই পাশে দাঁড়ায়, মনের প্রদাহ জুড়োতে সাহায্য করে।

দ্রোণ বলে, সবাই তোমায় ভালোবাসে শিবশঙ্কর। একদিন, কয়েকজনের পালিয়ে যাওয়া দেখে হাল ছেড়ো না বন্ধ।ভালোবাসার পাশে দাঁড়াও, দেখবে একদিন ঠিক ভালোবাসা পাবে। দ্রোণ বলতে থাকে।

পূকের ভিতর থমকে থাকা কান্না, আমার কান্না

তোমাকে নিয়ে আর না

ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে শুধু গোপন কান্না

তোমাকে নিয়ে আর না।

শিবশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেও, দ্রোণ জানে সে নিজের উদ্দেশ্যেই বলে যাচ্ছে কথাগুলি।



কলকাতায় খবর এসে গেছে। প্রথমে এসেছিল জঙ্গল সাঁওতাল স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার ওরাইয়ের কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ান। মাত্র কয়েকটি কপি এসেছিল শহরে।

সুকান্তির কাছে ইস্তাহারটি নিয়ে এসেছিল পঞ্চানন সরকার। পঞ্চানন সুকান্তির থেকে পাঁচ বছরের ছোট। বালুরখাটে থাকে। হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে। দিনাজপুরে থাকাকালীন আলাপ হয়েছিল পঞ্চাননের সঙ্গে। তেভাগা পর্বে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সুকান্তির। রেবার সঙ্গে আলাপ ওর পর, তাঁর আর রেবার মধ্যে বার্তা চলাচলের দায়িত্ব নিয়েছিল

পঞ্চানন। রেবাও ওকে পছন্দ করে। সেজন্যই পঞ্চাননকে নিজের কাছে রাখতে অসুবিধে হয় না সুকান্তির। পঞ্চানন প্রায় প্রতিমাসেই একবার কলকাতায় আসে। এই শহরে এলেই ও সুকান্তির বাড়িতেই থাকে, এটাই নিখিঁত নিয়ম।

সে রাতেও আড্ডা জমে উঠেছিল। পঞ্চানন দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের নানান খবর। বিশেষত দিনাজপুর ও দার্জিলিঙের। কৃষকরা এখন অনেক জঙ্গী হয়ে উঠেছে। আর ছোটখাট টুকটাক আন্দোলন নয়, এখন ওরা বড় কিছু করবার জন্য মরিয়া! পঞ্চানন এখনও কমিউনিস্ট পার্টি করে। ও সি পি আই এম-এর সঙ্গে আছে। কথায় কথায় রাত গভীর হয়। সুকান্তি শোবার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। পঞ্চানন বলে, সুকান্তিদা একটা কথা—

সুকান্তি তাকান পঞ্চাননের দিকে। বোলা থেকে একটি ইস্তাহার বের করে পঞ্চানন।

— সুকান্তিদা, চারুবাবু পাঠিয়েছেন এই লিফলেটটা এখানে ছাপিয়ে বিলি করতে হবে সাহায্য চাই।

চারুবাবু যে চারু মজুমদার, বুঝতে অসুবিধে হয় না সুকান্তির। উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন ওর সঙ্গেও তো আলাপ হয়েছিল। ভঙ্গলোক বেশ প্রাণবন্ত। হাত বাড়িয়ে ইস্তাহারটি নিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলে ন সুকান্তি। ভালো লেখা। তাঁর পঞ্চাননকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান।

— হ্যাঁ বিলি করা যাবে কিন্তু কবে চাইছ? ... কত কপি ভাপাতে হবে?

— কালকেই ছাপা চাই, পরশু বিলি করব ... হাজার দুয়েক ছাপালে আপাতত চলে যাবে।

— ঠিক আছে, পরশু রবিবার পরদিনই বিলি করা যাবে।

পরদিনই পঞ্চাননকে নিয়ে সুকান্তি গেলেন বাগমারিতে নির্মলবাবুর ছাপাখানায়। নির্মলবাবু পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির লোক। স্বাধীনতা পত্রিকায় কাজ করতেন। নিজের ছাপাখানা করেছেন। এখন আর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু বামপন্থীদের এরকম ছোটখাটো লিফলেট ছেপে দেন, পয়সা নেন না।

নির্মলবাবু বললেন, আসুন সুকান্তি স্যার, কী ব্যাপার? সুকান্তি ইস্তাহারটি দেখালেন। জানালেন অভিপ্রায়। নির্মলবাবুর চোখে সম্মতি।

হ্যাঁ হয়ে যাবে, কিন্তু একটাই মুশকিল এখনই এক নিমন্ত্রণলিপি ছাপার কাজ চলছে।

— কখন শেষ হবে?

— তা হতে হতে সম্ভব ছটা।

অপেক্ষা করলেন সুকান্তিরা। মাঝপথে অন্য কাজের অছিলায় বাইরে গিয়ে দুজনেই পাউরুটি-ঘুগনি খেয়ে এলেন। না হলে, নির্মলবাবু নিশ্চিত ওঁদের খাবার ব্যবস্থাও করবেন। একজনের থেকে এতটা সাহায্য নিতে ইচ্ছে করে না।

বিকেল চারটে নাগাদ বিদ্যুৎ চলে গেল। এল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। কাজ শেষ হ'ল রাত আটটা নাগাদ। এরপর নিমন্ত্রণলিপি ছাপার লাল কালি মুছে, মেশিনে কালো কালি চাপিয়ে, ছাপার ব্যবস্থা করতে রাত হয়ে যাবে। মাঝে আবার বিদ্যুৎ চলে যাবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যেভাবেই হোক ইস্তাহারটি-অবিলম্বে ছাপা দরকার।

সব শুনে নির্মলবাবু বললেন, তবে কি লাল কালিতেই ছেপে দেব?

পাশাপাশি পলপ, না না লাল কালিতে নয়।

সুকাণ্ড পলপেন, কেন? নয় কেন?

না, মানে, আমরা ইস্তাহার তো সাধারণত কালোতেই ছাপি।

কিন্তু পক্ষা, সময় বাঁচাতে হলে লাল কালিতে ছাপাই তো ভালো.... আর তা ছাড়া, বেশ একটা নতুন ব্যাপার হবে।

সুকাণ্ডির কথাটা নির্মলবাবু মৃদু হাসলেন। তারপর পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে লাল কালিতেই ছাপা যাক, কী বলেন?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

সুকাণ্ডি জোর দিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ছেপে ফেলুন। কাল সকালেই সব বিলি পেশাক্ষ করতে হবে।

রাও কাবার হলে, রবিবার সকালবেলায় সুকাণ্ডির বাড়ি পৌঁছে গেল কুড়ি বাস্তিল লিফলেট। নির্মলবাবু লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সারাদিন ধরে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিতদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ল এক-একটি বাস্তিল। হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে প্রচারপত্রটির নাম হয়ে গেল জঙ্গল সাঁওতালের লাল লিফলেট।

লিফলেট ছড়িয়ে দেবার দিন পনেরো পরে কফি হাউসে গিয়েছেন সুকাণ্ডি। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন। হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে এক তরুণ কণ্ঠ ভেসে এল। এই দ্যাখ লাল লিফলেট। সুকাণ্ডি আড়চোখে দেখলেন ছোট্ট একটা কেক। উনিশ-কুড়ি বছরের হবে ছেলেটি। সে তার বাব্বীকে বলছে, এ লিফলেট বন্ধু দিয়ে ছাপা। মেয়েটির দু'চোখে বিস্ময়। সে বলছে, সত্যি?

ওকণ্ঠি জানায়, হ্যাঁ সত্যিএই লিফলেট জঙ্গল সাঁওতাল, বিগুল কিষাণ এঁরা নিজের গায়ে দিয়ে ছেপেছেন।

সুকাণ্ডি হাসলেন। একটা বড় কিছু ঘটলে, তাকে ঘিরে এভাবেই উপকথার জন্ম হয়। লাল লিফলেটের মতন, নকশালবাড়িতে যুক্তফ্রন্টের পুলিশ বনাম কৃষকের সংঘর্ষ, কৃষক রমণী নিহত হবার সংবাদও কলকাতায় পৌঁছে গেছে দ্রুত। শাসকের গদিতে বসলে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট সবাই এক। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। তখন আর গুলি চালিয়ে সংগ্রামী মানুষ মারতে হাত কাঁপে না, মন অস্থির হয় না। অতএব, নির্বাচন নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করতে হবে। জোতদার-জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে তা ভূমিহীন বিত্তহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। নকশালবাড়ি সেই রাস্তা দেখিয়েছে। আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে উঠেছে নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি।

কিছুকাল আগে থেকেই চেনা সাজানো ছকের বাইরে গিয়ে সত্যিকারের লড়াই চাইছিল পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ছাত্ররা। রাজ্যের সমগ্র ছাত্রসংখ্যার হয়তো কুড়ি শতাংশ হবে এই জমী ভাঙে দল। কিন্তু এদের পরে নীরব সমর্থন অধিকাংশের। কারণ, ছাত্ররা জানে, লাল কংগ্রেস চাকরি নেই, খাদ্য নেই। তারা বুঝতে শুরু করেছে পাঁচ লক্ষাধিক গ্রাম এবং ষাটশাশো শতাধিক ভারতবর্ষ আদতে একটি বৃহদাকার গ্রাম। কৃষি সমস্যাই এদেশের দৈন্যদশার

মূল কারণ। ভূমি সম্পর্কের মৌলিক রূপান্তর ছাড়া ভারতবাসীর মুক্তি নেই।

কলকাতার কলেজের ছাত্রদের অনেকেই নকশালবাড়ির আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্টোদিকে হিন্দুস্কুলের দেওয়ালে নকশালবাড়ির সংগ্রামী কৃষকদের অভিনন্দন জানিয়ে ছেলেরা পোস্টার মেরেছে — সশস্ত্র বিপ্লব মুক্তির পথ।

কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়, সভা-সমিতিতে, কফি হাউসে, স্কুল-কলেজের আড্ডায় জোর প্রচার চলে নকশালবাড়ির পক্ষে। প্রচার চলে চব্বিশ পরগনা, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া — রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। সি. পি. আই (এম) কর্মীদের অনেকেই এই আন্দোলনের সমর্থক — তাদের বলা হয় নকশালবাড়ি গ্রুপ। যারা নয়, তারা অফিশিয়াল গ্রুপ।

ভাগাভাগি প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট হয়ে যেতেই নকশালবাড়ির সমর্থকদের বহিষ্কার শুরু করল পার্টি। স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন সদস্যদের মধ্যে যারা নকশালবাড়ির সমর্থক তাদের বেছে বেছে তাড়ানো হচ্ছে। কোনো ছাত্র-ইউনিটের সংখ্যাগরিষ্ঠ তরাইয়ের ওই আন্দোলনের সমর্থক হলে, তা ডেঙে দেওয়া হচ্ছে। ফেডারেশনের মুখপত্র ছাত্রসংগ্রামে ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিতাড়িত সদস্যের নাম।

একই পন্থায় পার্টি সদস্যদেরও তাড়াতে শুরু করেছে ওরা। দেশহিতৈষী সাপ্তাহিকের কয়েকটি সংখ্যায় সুশীতল রায়চৌধুরী নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে খবর ছেপেছিলেন। ওঁর সঙ্গে নকশালবাড়ি সমর্থকদের মত বিনিময় ছিল। এসব ব্যোড়াপনা বেশিদিন সহ্য করল না পার্টি নেতৃত্ব। পত্রিকা অফিসের দরজা নিল অফিশিয়াল গ্রুপের বাহিনী! তার পরেই ঘোষণা করল, দেশহিতৈষীর অফিসকে তারা 'সি আই এ'-র কবলমুক্ত করেছে। বিরোধীদের আমেরিকার গোয়েন্দা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সি আই এ-র চর বললে সহজেই তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো জোরজুলুমের সামাজিক অনুমোদন পাওয়া যায়! নিচু স্তরের পার্টি কর্মীদের বোঝানো সহজ হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাই সুশীতল রায়চৌধুরীকে এক কথায় সরিয়ে দিতে খুব কিছু অসুবিধে হ'ল না।

বিতাড়িত হবার পর নকশালবাড়ির সমর্থকদের উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা ছপতে শুরু করল নতুন সাপ্তাহিক — দেশব্রতী। মূল্য ২০ পয়সা। সম্পাদকমঞ্জুরী সভাপতি — শ্রী সুশীতল রায়চৌধুরী। 'গোপাল মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক সেক্সুরি প্রিন্টার্স ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা - ৯ হইতে মুদ্রিত এবং ২৪ পরগণা, কায়স্থপাড়া, পূর্বাচল রোড, পোঃ হালতু হইতে প্রকাশিত'। যদিও প্রকাশের দিন বৃহস্পতিবার, তবু একদিন আগেই, বুধবার দুপুর-বিকেলের দিকে পাওয়া যায় কাগজ।

কৌতূহলবশে দেশব্রতীর প্রথম সংখ্যাটি কিনেছিলেন সুকান্তি। প্রথম পাতায় কমরেড মোহিত মৈত্রের ছবি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানপন্থী মোহিত মৈত্র ছিলেন 'দেশহিতৈষীর' সম্পাদকমঞ্জুরী সভাপতি। অফিশিয়াল গ্রুপ তাঁকে সংকীর্ণতাবাদী বলেছে। তিনি মারা যাবার পর যথোপযুক্ত সম্মান জানায়নি ওরা। দেশব্রতীর অভিমানী লেখকরা তাঁকে সম্মান জানিয়ে লিখেছেন, 'আমরা অবাধা, আমরা দুর্ভাগ্যবান, ২১কারী, সংকীর্ণতাবাদী, আমরা মোহিত

মেএর শিখা।' আটপাতার পত্রিকাটির পেছনের পাতায় সাহায্যের আবেদন — দেশব্রতী পরিচালনার জন্য দশ হাজার টাকা অবিলম্বে প্রয়োজন। সংগ্রহ আরম্ভ করুন, অর্থ প্রেরণের ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে।

নতুন পত্রিকার নতুন কথা পড়তে ভালো লাগল। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা দরকার। যদিও বছরদিন হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু এজন্য আশেপাশে লালিত মনের গঠন পাশ্টায় না। আদর্শ ও বিশ্বাস সহজে যাবার নয়। দেশব্রতীর সঙ্গে দু'দশক আগে পড়া স্বাধীনতা পত্রিকার ভাষার মিল পান সুকান্তি। বিদ্রোহের খবর পড়ে তাঁর গায়ে কীটা দেয়, সদ্য পঞ্চাশ পেরনো শরীর টানটান হয়ে ওঠে।

রাগিবার সকালে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন সুকান্তি।

দরজায় কড়ানাড়ার আওয়াজ। রেবা স্নানে গেছে। সুকান্তি উঠলেন। দরজা খুলতেই নিকুপম চিরন্তন।

— কী হে মানিকজোড় ... কী খবর? সুকান্তি হাসলেন। আবার ফুটবল-ম্যাচ নাকি। নিকুপম হেসে ফেলল। কী করে বুঝলেন?...

— দু'জনে যেরকম কেজো মুখ করে এসেছ, বুঝব না?

চিরন্তন বলল, আজ নয়, আগামী রোববার ...লেবুতলার সঙ্গে খেলা ...

— এস ভেতরে এস, বৃন্তাস্তটা জানা যাক।

ওদের নিয়ে বারান্দায় যাবার সময় কলঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

— তোমরা বারান্দায় বস, আমি দু-মিনিট আসছি ... চা খাবে তো? ... নাকি দুধে চকোলেট গুঁড়ো?

— না না, চা..। দু'জনের সম্মেলন গলা।

হ্যাঁ, তাই তো, তোমরা বড় হয়ে গেছে ... এখন আবার বালকদের পানীয় কেন? আমারই খেয়াল করা উচিত ছিল। সুকান্তি হেসে রামাঘরে গেলেন। সুরভি বেরিয়েছে, রেবা নিশ্চয় খাবে। অতএব চার কাপ চায়ের জল হলেই চলবে। একবার কলঘরে গিয়ে বেরোতেই জল গরম। চা তৈরি।

তিন কাপ চা, ছটা বিস্কুট নিয়ে বারান্দায় ফিরতেই সুকান্তি দেখলেন, নরম দাড়ি গোঁফে মুখ ভরে ওঠা দুই কিশোর দেশব্রতী নাড়াচাড়া করছে। প্রথম সংখ্যা।

— কী হে এর সম্পাদকীয়টা পড়েছ? দেশব্রতীর ডাক?

নিকুপম বলল, না সুকান্তিদা কেমন লিখেছে? ভালো?

সুকান্তি মৃদু হাসেন। ভালো-খারাপ বলতে পারব না, তবে লেখাটা পত্রিকার জাত চিনি দিয়েছে।

কি রকম? চিরন্তনের চোখে জিজ্ঞাসা। নিকুপম বলল, একটু পড়ুন না সুকান্তিদা...

সুকান্তি শোনাতেই চাইছেন।

ভালো কিছু পড়লে তার রেশ থেকে যায়। তা প্রিয়জনদের পড়াতে ইচ্ছে করে। একটু গলা ঝেঁড়ে, কাগজটি টেনে নেন তিনি। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে পড়ে যান— 'এখন বিশ্ববী গণসংগ্রামের জোয়ার চলেছে। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নকশালবাড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য স্থানে এবং

এদিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় নকশালবাড়ির ডেউ পৌঁছে গেছে। শাসকশ্রেণী দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাদের ভয় কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) পাছে তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এই লড়াইকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টির (মাঃ) নেতৃত্ব সংশোধনবাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন এবং প্রাণপণ শক্তিতে এই সংগ্রামের রাশ টানছেন। সংশোধনবাদকে যারা প্রধান বিপদ বলে মুখে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যে হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারছেন না। পার্টির মধ্যে যে নূতন শক্তির অভ্যুদয় হচ্ছে তাতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছেন। নকশালবাড়ির সৌরবময় সংগ্রামকে এরা উস্কানিদাতা দালালদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলতেও দ্বিধা করছেন না। সংগ্রামকে নিন্দা করে এবং সংগ্রামচালনাকারী জেলা পার্টি নেতৃত্বকে বরবাদ করে দিয়ে এরা পুলিশী সম্মানের সাহায্যই করছেন। এরা এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছেন যে, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরীক্ষিত জঙ্গী ও সাহসী পার্টিকর্মী ও নেতাদের এরা দলে দলে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে পার্টি থেকে বের করে দিচ্ছেন এবং ফলাও করে কাগজে নাম প্রকাশ করে দিচ্ছেন এবং এইভাবে পুলিশ ও গোয়েন্দার সুবিধা করে দিচ্ছেন।

সুকাণ্ড থেমে গেলেন। এমন ঘটনা আউচলিশ-উনপঞ্চাশেও ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টিতে। যেহিঁ বি টি রণদিভের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের লাইন পাল্টে পার্টিতে নির্বাচনে নামবার শান্তিপূর্ণ লাইন এসে গেল, রণদিভের সমর্থকদের বলা হল উগ্রপন্থী ট্রটস্কাইট। তারা অদ্ভুতভাবে ধরা পড়তে লাগল পুলিশের হাতে। অনেককেই রাজ্য ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। 'সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে।

কী হ'ল, থামলেন কেন? নিরুপমের গলা।

সুকাণ্ডি আবার পড়তে শুরু করলেন— 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গী কমরেডরা যে লড়াই শুরু করেছেন এবং গণআন্দোলনের ও কৃষক অভ্যুত্থানের জোয়ারে যে লড়াই ক্রমেই শক্তিশালী ও বিস্তৃত হচ্ছে তাকে বর্তমান পার্টি নেতৃত্ব স্বৈরাচারী নীতি দ্বারা স্তব্ধ করতে পারবেন না। একদিন সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ে নূতনভাবে পার্টি গঠিত হয়েছে, আজ আবার সে পার্টি সংশোধনবাদী নেতৃত্ব কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করছে। এদের হাত থেকে পার্টিকে বাঁচাতে হবে। পার্টি এদের সম্পত্তি নয়, অতএব এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করা নয়, পার্টিকে রক্ষা করারই লড়াই। দেশব্রতী হবে এই লড়াইয়েরই মুখপত্র।'

পড়া শেষ করে সুকাণ্ডি তাকালেন নিরুপমের দিকে। নিরুপম বলে, ভালো কথা, তবে পার্টির পুরনোপন্থী নেতারা এসব বরদাস্ত করবে কী?

চিরন্তন বলে, হ্যাঁ ঠিক কথা, পার্টি নেতারা নিশ্চয়ই এসব বেশিদিন সহ্য করবে না? কিশোরদ্বয়ের প্রশ্ন শুনে তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দেন না সুকাণ্ডি। এ জিজ্ঞাসা কি নিজস্ব, নাকি লোকমুখে শোনা কথার প্রতিধ্বনি করছে ওরা? এখন সময়টা বড় বিচিত্র। সাধারণ নিরীহ, সাতে-পাঁচে না থাকা মানুষও আজ হাটে-বাজারে, ট্রামে-ট্রেনে, দোকানে-রোয়াকে রাজনীতির প্রশ্ন তুলছে। বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। সে তুলনায় এই দুই কিশোর তো পরিণত। কদিন পরেই হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে কলেজে ঢুকবে। এদের রাজনৈতিক

কথাগাথা! এগা তো স্বাভাবিক। অবশ্য, শোনা কথা বললেও, দোষ কী? জবাব পেলেই ওদের চেতনা জাগবে। দুই কিশোরকে সমবয়সীর মতো কাছে টেনে নেন সুকান্তি। সহজ কথায় পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করেন।

আন্দোলন জঙ্গী করে তোলা এবং নিজেদের প্রয়োজনমত তার রাশ টেনে ধরা, দু-বিশয়েই সি পি আই (এম)-এর নেতারা ওস্তাদ। সেই প্রেসিডেন্সির ছাত্র ধর্মঘটের সময়েই ওদের চরিত্র জেনে নিয়েছে কলেজের ছাত্ররা। ছাত্র ধর্মঘটের একটি পর্যায়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু গহিষ্যুত ছাত্রকে ফেরত নিতে রাজি হয়েছিল। তখন পার্টি নেতারা বললেন, সবাইকে ফেরত না নিলে চলবে না। কোনো সমঝোতা নয়, আন্দোলন চলুক। ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে পার্টি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভালো কথা! ওদেরই পরামর্শে প্রেসিডেন্সির বেকার ল্যাবরেটরিতে ডাঙচুর করা হ'ল। গ্রেপ্তার হল বেশ কিছু ছাত্র-সংগঠক।

এও জঙ্গীপনাকে প্রশয় দেবার পর সাতষট্টির নির্বাচন এগিয়ে এলে নেতাদের সুর বদলে গেল। আন্দোলন তুলে নিয়ে মিটমাট করে নেবার কথা বললেন তাঁরা। তখন আবার কলেজ কর্তৃপক্ষ বেকে বসেছে, একটি ছাত্রকেও তারা আর ফেরত নেবে না। যুক্তফ্রন্ট সরকার গদিত্তে বসবার পরেও বিতাড়িত ছাত্রদের কলেজে ফেরাবার ব্যবস্থা করেনি ওরা। ছাত্র-সংগঠকরা সেদিনই চিনে নিয়েছিল ওই তথাকথিত মার্কসবাদী নেতাদের স্বরূপ।

প্রায় একই সময়ে জীবনবিমা কর্মচারীদের আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা হ'ল। স্টেটবাস কর্মচারীদের ধর্মঘট দুদিনের মাথায় তুলে নেওয়া হল। কারণ, সামনে নির্বাচন। অতএব, অন্য কোনো আন্দোলন নয়। এখন শুধু আওয়াজ তুলতে হবে — ভোট দিন বাঁচতে, তারা হাতুড়ি কাস্তে। কলকাতার কলেজের ছাত্ররা দিনের পর দিন এই দ্বিচারিতা দেখেছে। সেজন্যই আন্দোলনের নামে ভদ্মামির সম্পূর্ণ বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে নকশালবাদের অভ্যুত্থান শুরু হতেই, কলেজের ছেলেমেয়েরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। দেশব্রতীর কথা তাদের ভালো লাগবেই।

সুকান্তির কাছ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনা, আর তার বিশ্লেষণ শুনে দুই কিশোরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিরুপম-চিরন্তনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান সুকান্তি।

— হ্যাঁ, অফিশিয়াল গ্রুপের নেতারা হয়তো বরদাস্ত করবে না এইসব উগ্র কথাবার্তা। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি জন্মেছে লড়াই করার জন্য। লড়াই না থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি থাকারও দরকার নেই। এ কথাটা মাঝে-মধ্যে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বই কি! দেশব্রতী ঠিকই করছে।

দেশব্রতী নিয়ে আড্ডা জমে উঠল। ঠিক হল প্রত্যেক রবিবার সকালে সুকান্তি দেশব্রতী পাঠ করে শোনাবেন ওদের। কাগজটির পরের দুটি সংখ্যা পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটির চাহিদা বেড়ে গেছে দ্রুত। হকাররা বলে, দশহাজার কপি বিক্রি হয় প্রতি সপ্তাহে।

কাগজের স্টলে বলে রাখাতে পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া গেল। চতুর্থ সংখ্যার কাগজের দাম পাঁচশ পয়সা। এই সংখ্যায় পত্রিকার জন্য অর্থ প্রেরণের ঠিকানাও পেয়ে গেলেন সুকান্তি। ৬০এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট।

একদিন পরিচা দলগে গেলেন সুকান্তি। আলাপ হ'ল সুশীতল রায়চৌধুরীর সঙ্গে। ৬৬লোক মৃদুভাষী, চোখে কাগো ফ্রেমের চশমা। কথা বলার সময় একটি বাক্য থেকে

অন্য বাক্যে যেতে একটু বিরতি নেন। হুগলি জেলার লড়াই করা কমিউনিস্ট। ভালো লাগল মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে। কথার শেষে সুশীতল বললেন, নেবেন নাকি রশিদ বই? দেখুন না কিছু টাকা তোলা যায় কিনা টাকা পেলে আমরা দেশব্রতীর শারদসংখ্যা বের করতে পারি।

— হ্যাঁ দিন।

দুটি রশিদ বই নিলেন সুকান্তি। বন্ধু, অধ্যাপকদের কাছে চাঁদা চাইতে অনেকেই দিয়ে দিল। তাঁকে সহকর্মীরা ভালোবাসে ঠিকই কিন্তু এত স্বতঃস্ফূর্ততা আশা করেননি সুকান্তি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছাড়াও, চাঁদা সংগ্রহের সূত্রে ক্রমশ আলাপ হয়ে গেল নিকটবর্তী কলেজগুলির অধ্যাপকদের সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সঙ্গে বঙ্গবাসী বিদ্যাসাগরের অধ্যাপকদের যোগাযোগের সেতু হয়ে দাঁড়াল দেশব্রতীর চাঁদা। বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সুনীতিকুমার ঘোষ নকশালবাড়ির সমর্থক। ওঁর লেখা ‘কালপুরুষ’ পত্রিকায় পড়েছেন সুকান্তি। তথ্যবহুল, যুক্তিনিষ্ঠ লেখা। সুনীতিবাবু সুকান্তির সমবয়সী। ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি সুকান্তির। ওঁকে কেন্দ্র করে অধ্যাপকদের একটি আড্ডাচক্র গড়ে উঠেছে।

আড্ডাচক্রে যাবার পর থেকে নিয়মিত দেশব্রতী পড়েন সুকান্তি। নিরুপম-চিরন্তনকে পড়ে শোনান। কাগজে সভাসমিতির খবর খুবই আকর্ষণীয় লাগে — মিনার্ভা থিয়েটারে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি দিগম পালন করা হয়েছে। লিটল থিয়েটার গ্রুপের উৎপল দত্ত বিভিন্ন জনসভায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের জনসভায় উৎপল দত্ত বলেছেন, নকশালবাড়ি যে আলো জ্বালিয়েছে তা সারা ভারতকে পথ দেখাবে।

দেশব্রতীর ছোটবড় সমস্ত খবর বিন্দু বিন্দু করে সুকান্তির চিন্তায় ভাবনায় অনুভবে ঢুকে পড়ে। ভালোবেসে পত্রিকা পড়লে বোধ হয় এমনটাই ঘটে। কাগজের প্রতিটি টুকরো খবর, সম্পাদকীয়র প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। বাদ যায় না বিজ্ঞাপনও।

লিটল থিয়েটার গ্রুপ বা এল টি জির অজ্যে ভিয়েতনাম নাটকের বিজ্ঞাপনও দেশব্রতীতে বেরোয়। সুকান্তি মনে মনে উচ্চারণ করে পড়ে যান তার কবিতার মতো ভাষা— আমার ভিয়েতনাম আশ্চর্য দেশ, / শিশুরা যেখানে যোদ্ধা বীর / ফুল আর ফলও যেখানে যুদ্ধের অস্ত্র.....। আগামী নাটকের তথ্য জোগাড়ের কাজে উৎপল দত্ত উত্তরবঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে খবরও নজরে পড়ে সুকান্তির। নজরে পড়ে খাদ্যসংকট নিয়ে সভা ডাকার বিজ্ঞপ্তি। শনিবার, সন্ধ্যা পাঁচটায়, রামমোহন লাইব্রেরী হলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য কনভেনশন। আহ্বায়ক — নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি।

শনিবার আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না সুকান্তি। সভার উদ্দেশ্যে পথে নামলেন। রামমোহন লাইব্রেরীর সভা একেবারে হাউসফুল। হলের ভেতর ভর্তি। বাইরেও প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে। প্রায় পাঁচ-ছ’শো লোকের জমায়েত। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেলেন সুকান্তি।

সভা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বক্তাদের গলায় বেশ লড়াইয়ের মেজাজ। কনভেনশনের উদ্দেশ্য জানিয়ে এক বক্তা বললেন, খাদ্যের সংকট নিয়ে আমরা এতকাল যেভাবে, যে

পদ্ধতিতে বিক্ষোভ জানিয়েছি, সম্পূর্ণ বদলাতে হবে। আমাদের গুরু করতে হবে সত্যিকারের সংগ্রামজনসাধারণকে বোঝাতে হবে, অন্য কারোর ওপর ভরসা না রেখে তারা যেন নিজেদের শক্তিতে জোতদার মজুতদারের মজুত করা খাদ্যশস্য দখল করতে এগিয়ে যানকৃষকদের বোঝাতে হবে, তারা যেন জোতদারের গোলায় ধান তুলতে অস্বীকার করেসর্বত্র কৃষকের জমির আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবেসর্বোপরি খাদ্যের দাবিতে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের বিক্ষোভকে সংগ্রামে রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। উপস্থিত সবাই তুমুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল বক্তাকে। একজন শব্দেও গুরু করণেন কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব : ‘পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্যের বিষয়ে কংগ্রেস সরকারের চিরাচরিত পদ্ধতি রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। লক্ষ্য করা গেল যে যুক্তফ্রন্ট সরকার নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া কৃষকের হাতে জমি দিবার দাবির কার্যত বিরোধিতা করিতেছেন এবং এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে, জোতদারের হৃদয়বৃত্তি ও সদিচ্ছার প্রতি আবেদন, গতানুগতিকভাবে পুলিশের উপর নির্ভরতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ধর্না দিবার পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতির দ্বারা তাঁহারা যেন জনসাধারণের দুর্দশাকে কৌতুক করিতেছেন। এই কনভেনশন যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতিকে নিন্দা না করিয়া পারিতেছে না।’

সবাই আবার করতালি দিয়ে সমর্থন জানাল উপস্থাপিত বক্তব্যকে। খুব ঠিক কথা বলা হচ্ছে। খাবার না পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ খরিয়্যা হয়ে উঠেছে, চাল-ডাল-তেল জোগাড় করতে শহরে মধ্যবিত্তদেরও ভোগান্তি মনে, সেই অবস্থায় বামপন্থী মানুষের রায়ে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার শান্তিপূর্ণভাবে, আইন মেনে, আস্তে-ধীরে চলতে চাইছেন। কথার চাপান-উতোর চলেছে শুধু, সংকটের সমাধান হচ্ছে না। মানুষ আর প্রতিশ্রুতি চায় না, সমাধান চায়।

খাদ্য কনভেনশনে এসে ভালোই লাগল সুকান্তির। সুরেন্দ্রনাথ-বঙ্গবাসী-বিদ্যাসাগর কলেজের সহকর্মী অধ্যাপক সমীরণ-মোহিনী-তুষার তো বটেই, দেখা হয়ে গেল বেশ কয়েকজন পূর্ব পরিচিতের সঙ্গে। এ যেন বিক্ষুব্ধ এবং পূর্বনো বামপন্থী, কমিউনিস্টদের পুনর্মিলন উৎসব। সবাই জড়ো হয়েছে নতুন পথের সন্ধানে!

সভার শেষে অধ্যাপক বঙ্গুদের সঙ্গে সুকিয়া স্ট্রিটের চায়ের দোকানে বসা হ’ল। কনভেনশনে রাখা বক্তব্য মনে ধরেছে সবার। সমীরণ বলল, শহরে তবু তো কিছু একটা করে চলছে আমাদের গ্রামে খাদ্য জোগাড় একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে একেবারে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। মোহিনী বলল, সরকার তার অর্থনৈতিক নীতি না পাল্টালে এমন অবস্থা চলবে..... সংকট বাড়বে.....

তুষার বলল, কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে....সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ খতম করতে হবে....আর সমগ্রাণে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারের ক্ষমতা নেই এই মৌলিক পরিবর্তন আনা করার।

সুকান্ত বললেন, তুমি ভালো, এই পরিবর্তনের প্রয়োজনটা অন্তত কিছু লোক আজ বুঝতে পারছে।

তা অবশ্য ঠিক। সবাই সমর্থন জানাল সুকান্তিকে।

মোহিনী বলে, আজ সভায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি এসেছে... পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে পার্টির এই বহু নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

তুষার বলল, শুধু এই রাজ্যে নয় ভাই, নকশালবাড়িতে কৃষক রমণী হত্যার পর বিভিন্ন রাজ্যে পার্টি-নেতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন....উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীরে নেতৃত্ব সমালোচিত হয়েছেবিহার রাজ্য কমিটির সদস্য প্রকাশ্যে পার্টির বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছেন.... অন্ধ্র-কেরালা-পাঞ্জাবে পার্টির মধ্যে বিক্ষোভের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সমীরণ যোগ দেয়, হ্যাঁ ঠিক, যে যুক্তিতে সি পি আই-কে শোধানবাদী বলেছিলাম আমরা, একই যুক্তিতে এই সি পি আই (এম) নেতৃত্বও সংশোধনবাদী। সুকান্তি বলেন, হ্যাঁ দেশব্রতী পড়লে এই ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায়।

চা-টোস্ট সহ আলোচনা চলতেই থাকে। তুষার-মোহিনী-সমীরণ নকশালবাড়ি ও কৃষকসংগ্রাম সহায়ক কমিটির সঙ্গে যুক্ত। ওরা জানায়, এ রাজ্য এবং অন্যান্য সাতটি রাজ্যের বিক্ষুব্ধ সি পি আই(এম) সদস্য এবং বামপন্থীদের নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের কাজ চলছে— অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রিভলুশনারিজ। এই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা বের করা হবে। নাম ঠিক হয়েছে ‘লিবারেশন’। সুনীতিকুমার ঘোষকে দেওয়া হবে সম্পাদনার কাজ।

তুষার বলে, সুনীতিবাবুকে সাহায্য করবার জন্য ভালো ইংরেজি জানা লেখক দরকার.....সুকান্তি, আপনি করবেন?

সমীরণ-মোহিনীও সায় দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো হবে। আপনি আর সুনীতিবাবু একই বয়সী। দুজনেরই মাথা ঠান্ডা। ভালোই চলবে।

কুড়ি বছর আগে হলে অনায়াসেই হ্যাঁ বলতে পারতেন সুকান্তি। কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়েছেন সেই কবে। এখন স্ত্রী রেবা, মেয়ে সুরভিকে নিয়ে একরকম ধরাবাধা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তেমন কিছু বৃহৎ কষ্ট নেই জীবনযাপনে। এমন এক কাজের দায়িত্ব নিলে আজ হোক কাল হোক জীবনে কিছু অনিশ্চয়তা আসবেই। সরকারকে আঘাত করলে, তারা প্রত্যাঘাত করবেই। চাকরির জায়গায় সংকট হতে পারে। সে সব সামলে কি তিনি লিবারেশন-এর কাজে তন্নিষ্ঠ থাকতে পারবেন? আবার এটাও ঠিক, এই অন্যায ব্যবস্থার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। মার্কসবাদের নাম করে এই ভন্ডামির মুখোশ খোলা দরকার। সুকান্তি চট করে সম্মতি দিতে পারেন না। মৃদু হেসে বলেন, দেখি, একটু ভেবে দেখি।

তুষার বলে, হ্যাঁ ভেবে নিন....তবে না বলবেন না। আপনি থাকলে সবাই মিলে বেশ হইহই করে লিবারেশন চালানো যাবে।

সুকিয়া স্ট্রিটের আড্ডার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই দেশব্রতীর দশম সংখ্যা হাতে আসে সুকান্তির। প্রথম পাতায় খাদ্য কনভেনশনের রিপোর্ট। দ্রুত পড়ে নিয়ে সুকান্তি চলে যান শেষের পাতায়। একটি বিজ্ঞপ্তিতে চোখ আটকে যায়।

যে নাটকের নাট্যকার পরিচালক

বিনা বিচারে কারাধিকার হয়েছিলেন;

যে নাটকের বিজ্ঞাপন প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে

বিনা কারণে বন্ধ করা হয়েছিল

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে!

এবং এখন আবার বিজ্ঞাপন ছাপতে

অস্বীকার করেছেন দেশের 'হিতৈষী'

একটি সাপ্তাহিক!

সেই জনমনের কল্লোল শেষ কয়েকটি

অভিনয় এখন চলছে মিনার্ভায়!

আজ ও শনিবার ৬। টায়

রবিবার ৩টা ও ৬। টায়।

এল টি জি-র কল্লোল নাটকের বিজ্ঞপ্তি। সি পি এম-এর 'দেশহিতৈষী' বিজ্ঞাপন ছাপছে না কল্লোল নাটকের! নিরুপমরা এলে সুকান্তি দেখান 'দেশব্রতী'তে ছাপা কল্লোল-এর বিজ্ঞাপন।

নিরুপম বলে, কল্লোল নাটকে তো সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কিছু বলা নেই.....তবে এর প্রচার কেন বন্ধ করতে চায় পার্টি?

সুকান্তি বলেন, উৎপল দত্ত যেরকমভাবে বিভিন্ন সভা সমিতিতে তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, পার্টি নেতারা কখনও সহ্য করবে না তা.....ওরা বলবে উৎপল দত্ত হঠকারী কিন্তু সি আই এ-এর এজেন্ট।

— ঠিক আছে, ওঁরা উৎপলবাবুর সেইসব বক্তৃতার বিরুদ্ধে বলুন কিন্তু এই নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করবেন কেন?

— হ্যাঁ ঠিক কথা, তোমার কল্পায় যুক্তি আছে। কিন্তু পার্টি নেতারা এইসব সরল সোজা যুক্তির ধার ধারে নাওরা ভাবছে উৎপল দত্ত আমাদের কাজের সমালোচনা করছে অতএব ওকে টাইট দাও....দ্যাখো না এই যে দেশব্রতীতে কল্লোলের বিজ্ঞাপন বেরুল এর ফলে উৎপল দত্তের ওপর আরও আঘাত নামাবে পার্টি নেতারা।

কথাগুলি নিরুপম মন দিয়ে শোনে ঠিকই কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা যায় পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি সুকান্তির অনুমান। ও বলেও ফেলে, না না এত সহজ হবে নাপার্টিতেও নিশ্চয় অনেকে উৎপলবাবুকে ভালোবাসেন।

চারদিনের মাথায় সুকান্তির দরজায় নিরুপম কড়া নাড়ে। দরজা খুলতেই নিরুপমের উদ্বেজিত মুখ, হাতে সি পি এম-এর মুখপত্র গণশক্তি।

— সুকান্তিদা, আপনিই ঠিক।

কী হ'ল আবার?

এই দেখুন না গণশক্তিতে কী লিখেছে।

পাঠ্যক্রম গঠন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে ছাপা হয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তি। নিরুপম পাড়ে যায়। 'পাঠ্যক্রম গঠন কমিটির উৎপল দত্ত কখনও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, অতএব তাঁর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সভ্য নন। অতীতে তাঁর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এবং পার্টি বিভক্ত হওয়ার

পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে তিনি প্রচার করেছেন। তাতে পার্টির লাভ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নিজের ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। আজ উৎপল দত্ত হঠকারীদের দলে ভিড়ে গিয়ে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন। তিনি নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। আমাদের পার্টির সভ্য তিনি নন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা আমরা নেব।’

একটু দম নেয় নিরুপম। তারপর গলা চড়িয়ে আবার পাঠ শুরু করে — ‘আমাদের পার্টির সভ্য ও বন্ধুগণের নিকট আমরা অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন শিল্পী উৎপল দত্ত ও তাঁর দলের সঙ্গে কোনো সংস্রব না রাখেন — কোনো সভাসমিতি ও অভিনয়ে তাঁদের যেন নিমন্ত্রণ না করেন।’

পাঠ শেষ করে নিরুপম বলে, না সুকান্তিদা আপনিই ঠিকআশ্চর্য, মতে না মিললে এরকমভাবে ফতোয়া জারি করে পার্টি? সুকান্তির মজা লাগে। আমুদে গলায় বলেন, নিজেদের ঘর সামলানোর জন্য কীরকম বালখিলা উদ্যোগএ যেন কোন একলঘেঁয়ে তার দু’চারজন সঙ্গী-সাথীকে বলছে উৎপল ভারী দুষ্টু ছেলে, ওকে খেলতে নিয়ে না তোমরা!

নিরুপম হেসে ওঠে। সুকান্তিও হাসেন।

সমস্ত আঘাত অবশ্য এমন হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গ থেকে পঞ্চাননের চিঠি বয়ে আনে কিছু অপ্রীতিকর খবর। চারু সঙ্কটময়, সৌরেন বসু সহ উত্তরবঙ্গের চারজনকে বহিষ্কার করেছে পার্টি। পাঁচদিন দুঃখের খবর। যদিও জানাই ছিল, এমনটাই হবার কথা তবু খবরটি পেয়ে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন সুকান্তি। ওঁদের সবাইকে দলে রেখে তাত্ত্বিক লড়াই চালানো যেত না? এতদিন উত্তর মেলে না তৎক্ষণাৎ। প্রশ্ন, বিক্ষোভ ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। কিছু একটা করার দরকার। সুকান্তি ছটফট করেন সারা দিনমান। ঘুমোতে যান একরাশ অস্বস্তি নিয়ে। ঘুম ভেঙে উঠে দৈনিক সংবাদপত্র পড়েন। সংবাদপত্রে পাওয়া যায় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের খবর। উত্তরবঙ্গের ছাত্রনেতা কিষণ চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দিলীপ বাগচী গ্রেপ্তার। পরিমল দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। এঁরা তো বামপন্থী কমিউনিস্ট। আবার এঁদেরকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা জারি করছেন যিনি, সেই পুলিশমন্ত্রীও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট। কি বিচিত্র ব্যবস্থা! সুকান্তির উদ্বেজনা বাড়ে। তবু লিবারেশনের কাজে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না তিনি।

বৃহস্পতিবার নিয়মিত দেশব্রতী আসে। দেশব্রতীতে পাওয়া যায় নকশালবাড়ির সমর্থনে জমায়েতের খবর — হাবড়া-কাশীপুর-বীরভূম-কাটোয়া-ভদ্রকালী-কোতরং-কোমলগরে নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির আঞ্চলিক শাখা খোলা হয়েছে। বিপুল সাড়া পাচ্ছে সংগঠনগুলি। জেল থেকে জঙ্গল সাঁওতালের বাণী এসেছে — নকশালবাড়ির পথই ভারতের মুক্তির পথ। দেশব্রতী মুক্তির স্বপ্ন দেখায় সদ্য পঞ্চাশ পেরনো সুকান্তিকে। একদিন চোখে পড়ে অভূতপূর্ব এক সমাবেশের বিজ্ঞপ্তি :

নভেম্বর বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী স্মরণে : খাদ্য ও বন্দীমুক্তির দাবিতে :

নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে

১১ই নভেম্বর বিকেল ৪টায় মনুমেন্ট ময়দানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন — কমরেড চারু মজুমদার ও

কমরেড শিবকুমার মিশ্র

সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার নাটক ও গান

— নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি

চাটের আগেই ময়দানে পৌছে যান সুকান্তি। সমীরণ-মোহিনী-তুষারও সঙ্গে থাকে।
তখনও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল আসছে। শোভাযাত্রার মানুষের হাতে লেনিন,
শ্রীলঙ্কা, মাও সে-তুঙের প্রতিকৃতি। মিছিলে শ্লোগান উঠেছে — মাও সে-তুঙ লাল
সেলাম.....নকশালবাড়ি লাল সেলাম.....জঙ্গল সাঁওতাল সহ নকশালবাড়ির আন্দোলনে
সমগ্র বন্দীর মুক্তি চাইশ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ। মিছিলের মানুষের হাতে ধরা
পোস্টার — নকশালবাড়ির পথ কৃষি বিপ্লবের পথভিয়েতনামের পথ ভারতের পথ।
ময়দানের সভায় প্রত্যেকেই পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে আসে। কাগজ পেতে বসে সবাই।

সভা আরম্ভ হয়। চারু মজুমদার ছাড়াও মধ্যে মধ্যে রয়েছেন পরিমল দাশগুপ্ত, সত্যানন্দ
ভট্টাচার্য শিবকুমার মিশ্র, সত্যনারায়ণ সিন্ধা, সুশীতল রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে।
চারু মজুমদারের দিকেই তাকিয়ে থাকেন সুকান্তি।

অসুস্থতা সত্ত্বেও শিলিগুড়ি থেকে এসেছেন চারু মজুমদার। জনতা তাঁর বন্ধুতা শুনতে উন্মুখ।
চারুবাবু উঠে দাঁড়ান। পাজামার ওপর ফুলহাতা পোশাক। বাঁ দিকের বুক পকেটে পেন। চোখে
কাপো ফ্রেমের চশমা। চুল কিঞ্চিৎ এলোঁড়ানো। চারুবাবুর হাতে ফুলহাতা সোয়েটার।
দাঁড়াতে গিয়ে অসুস্থ চারুবাবুর পা ঝুঁকি যায়। তাঁর ডানহাত ধরে ফেলেন সুশীতল
রায়চৌধুরী, গাম হাত সরোজ দত্ত।

নকশালবাড়ির সমর্থনে সমবেত মানুষকে অভিনন্দন জানান চারু মজুমদার। তারপর
একটু দম নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, আমি বন্ধুতা করতে পারব না। আপনারা
আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি আপনারা আমাকে নকশালবাড়ির নেতা মনে করেন।
আমার কাছ থেকে নকশালবাড়ি সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু আমি নকশালবাড়ির নেতা
নই। নকশালবাড়ির নেতা কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল, কমরেড খোকন
মজুমদার, কদম মল্লিক এবং আরো অনেক অনেক কৃষক।

উপস্থিত জনতা আবেগে করতালি দেয়। চারু মজুমদার বসে পড়েন। কত বড় মাপের
মানুষ হলে এমনভাবে সবার সামনে অন্যদের মেলে ধরা সম্ভব।

সভার শেষে গান ধরেন অজিত পাণ্ডে। তরাই কান্দে গো, জ্বলছে আমার হিয়া /
নকশালবাড়ির মাঠ জ্বলে সপ্তকন্যার লাগিয়া। গানের তীব্র সুরের অনুরণন সমগ্র ময়দান
চঞ্চলে। গায়ক হঠাৎ থেমে যান। জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, কমরেডস্ আপনারা বসবার
কাগজটাকে জ্বালিয়ে মশাল বানান।

কয়েকজন আগলে দাঁড়ায়। বসবার কাগজটাকে পাকিয়ে লম্বাটে মশাল বানায়
এবং দেশলাই টেকে আগুন জ্বালে। তাদের দেখে অন্য সবাই একইভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে,
কাগজে আগুন লাগায়।

মনুমেন্ট ময়দানে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘনায়মান অন্ধকারে জ্বলতে থাকে সহস্র মশাল। মশালের আলোয় জনতার মুখের কিছু অংশ উদ্ভাসিত, বাকি অন্ধকারে। সহস্র মানুষের চক্ষু, ললাট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সহসা আঁধারে মিলিয়ে যায়। আলো আঁধারে ধরা জীবন্ত ভাস্কর্যের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে চারু মজুমদার। অজিত পাশ্বে গেয়ে চলেন—

খুন ঢেলেছে হাজার চাষী / একটু জমিন্ চাই / নীল ক্ষেতের ওই খুনেতে খুন / মেশাল তরাই.....

মঞ্চে দাঁড়ানো গায়কের গলা ছুয়ে ফেলে তারার সপ্তক। সুরের অপ্রত্যাশিত শিখা আচ্ছন্ন করে নভোমণ্ডল।

এতদিন ধরে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না সুকান্তি, অন্ধকারে আগুনের মশাল দেখে, নেওয়া সহজ হয়। তুষারের হাত চেপে ধরেন।

— আমি আছি।

তুষার - মোহিনী - সমীরণ অবাক চোখে তাকায়।

— হ্যাঁ, আমি লিবারেশন-এর কাজে থাকব।

ওরা তিনজনেই সুকান্তিকে জড়িয়ে ধরে।



বহুদিন কবিতা লিখতে পারেনি দ্রোণাচার্য। এক-একটি ভাবনা আসে বিদ্যুৎ চমকের মতো। ডায়েরির পাতায় লিখেও রাখে দুয়েক পাইন। কিন্তু নানান কাজের ফেরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে মনঃসংযোগ করা হয়ে ওঠে না আর। কদিন পরেই সেই ভাবনার তীব্রতা কমে যায়। তখন অপ্রয়োজনীয় মনে হয় ওই বাক্যবন্ধ। এমনভাবে কত লেখা জন্ম নেবার আগেই মরে যায়! নতুন লেখা এমনই — ভাবনার সঙ্গে কিছুদিন সহবাস না করলে সে অবগুষ্ঠন খুলে ধরা দেবে না কিছুতেই। দেখা যাবে না কবিতার মুখ।

ডায়েরির পাতায় লেখা অণুভাবনাগুলিকে দেখে দ্রোণাচার্য। চরণগুলি কবিতা হয়ে ওঠেনি। পথের ধারে ছেঁড়া হাওয়াই চটির মতো পড়ে আছে। না-লেখা কবিতার জন্য মন খারাপ হয়ে যায় তার। আগে হতাশার সময় কবিতা লিখে সাঙুনা পাওয়া যেত। এমনই দুর্দিন, কবিতাও তাকে ত্যাগ করেছে।

বস্তুত, নিজের জন্য সময় বড় কমে গেছে। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো তো ছিলই, এখন সময় খেয়ে নিচ্ছে পাটির কাজ। সি পি এম-এর সদস্য নয় দ্রোণ, তবু পাড়ার বিলুদার কথায় দলের কাজে কর্মে জুটে গেছে। দলের কাজে থাকলে তার অভ্যন্তরীণ খবরও পাওয়া যায়। মগরা-ত্রিবেণীর অনেকেই মনে করে পাটির অফিশিয়াল গ্রুপ ঠিক পথে চলছে না। নকশালবাড়ি গ্রুপই সঠিক। ওপন নিয়ামত 'দক্ষিণদেশ' পত্রিকা দেয় দ্রোণকে। দক্ষিণদেশে পাওয়া যায় নকশালবাড়ির আন্দোলন সংক্রান্ত নানান খবর। বর্তমান সি পি আই(এম) নেতৃত্ব বিপ্লবের রাডায় ঠাঁট্টে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ তপনের। তবু তপনের মত, এই মুহূর্তে পাটির কাজে থাকা দরকার না হলে আশেপাশের মানুষের

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর এখন তো প্রায় প্রতিদিনই পাটির কিছু না কিছু কাজ থাকবেই।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুযায়ী বাতিল করেছেন রাজ্যপাল ধরমসীর। শপথ নিয়েছে প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পরিচালিত নতুন মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র খোষা। কংগ্রেস দল এই সরকারকে লিখিত সমর্থন জানিয়েছে। পরে তারা এই ফ্রন্টে যোগ দিলে গঠিত হবে পূর্ণ মন্ত্রিসভা। কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে প্রতিবাদী জনসমাবেশ রুখতে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

যুক্তফ্রন্ট সরকার খারিজের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী হরতাল করেছে বামপন্থীরা। কলকাতায় প্রায় নিত্যদিন চলে ১৪৪ ধারা অমান্যের ঘটনা। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ। জনতা ছোঁড়ে টুট পাথর বোমা। মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি উচিয়ে ধেয়ে যায়। কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এবং গুলি চলে। আটান্ন হাজার পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছ'ব্যাটেলিয়ান কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্সের পুলিশ। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়। উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদার গ্রেপ্তার। জেলে প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুধু চারু মজুমদার নয়, লড়াই বামপন্থীর খোঁজ পেলেই, গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। কিন্তু এত দমন-পীড়নের পরেও প্রতিবাদের মাত্রা কমেনি।

প্রতিবাদ আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে মগরাঞ্চলেও। এ অঞ্চলে লালঝান্ডার প্রভাব ভালোই। ফ্রন্ট-সরকার বাতিলের পর লালঝান্ডার মিছিল সমাবেশ বেড়ে গেছে হুগলি জেলায়। ছড়া চালু হয়ে গেছে — হুগলি থেকে বালিখাল, সবই হ'ল লালে লাল।

মগরায় পাটির কাজ বাড়তেই, দ্রোণের খ্যাতি বেড়েছে। টালিখোলার মধ্যে খড় বিছিয়ে গোপন মিটিঙে বসার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে। একশো-চুয়ান্নিশ ধারা অমান্য করবার আহ্বান জানিয়ে মেশিন চত্বরে বক্তৃতা দেয়। বিধু ডাকাতের আঙ্গিনায় গিয়ে বোমা বানাবার এবং গাখার বাণস্থাপ করে ফেলেছে সে। লোকাল কমিটির সেক্রেটারি বিলুদার জন্য জোগাড় করে এনেছে পিস্তল এবং গুলি। পিস্তলের দাম পাঁচশো টাকা এবং প্রতিটি গুলির দাম সাত টাকা। মানকুন্ডু থেকে আনবার আগে অস্ত্রটি ব্যবহার করবার পদ্ধতি শিখে নিয়েছে দ্রোণ। দারুণ জিনিস। লক্ষ্যে বহুদূর, আওয়াজ কম।

বিলুদার জন্য আনলেও অস্ত্রটি দ্রোণকেই দিয়ে দিলেন তিনি।

—এটা তোর কাছেই রাখ।

— আমার কাছে? দ্রোণ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

— হ্যাঁ হ্যাঁ তোর কাছেই রাখ এসব চে গেভারার হাতেই মানায়।

শ্রান্তময় মুখের জন্য ওকে বন্ধুরা আদর করে আর্জেন্টিনা-কিউবা-বলিভিয়া খ্যাত এবং কিছুকাল আগেই শত্রুর গুলিতে নিহত এই বিপ্লবীর নামে ডাকে। বিলুদা জানেন সে কথা। দ্রোণ খুশি হয়। পিস্তল হাতে নিলেই কেমন এক মাদকতা আসে। নিজেকে বেশ দায়িত্ববান মনে হয়। উত্তেজনাও বাড়ে।

প্রথম বোমা গানাতে গিয়েও এমন উত্তেজনা হয়। বোমা বানাতে দুটি রাসায়নিক যৌগ লাগে। পটাশিয়াম ক্লোরেট আর আর্সেনিক ডাই সালফাইড। চলতি কথায়, কলেরা পটাশ আর মোমছাল। প্রথমটি সাদা, দ্বিতীয়টি লাল। দুটি বস্তুরই দাম কিলো প্রতি প্রায়

পঞ্চাশ-পঞ্চাশ টাকা। একটি কৌটোর মধ্যে পেরেক, জালকাঠি, স্টেন চিপস্-এর সঙ্গে ভরে দেওয়া হয় ওই লাল-সাদা-মশলা। তারপর কৌটোটা বন্ধ করে তাকে পাটের দড়ি দিয়ে আস্টে-পৃষ্ঠে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে হয়। শক্ত করে বাঁধাটাই আসল কেরামতি। বাঁধা ভালো হলে, বোমাটি রাস্তা বা দেওয়ালে আছড়ে পড়ামাত্র বিস্ফোরণ ঘটবে। ছিটকে বেরোবে পেরেক, জালকাঠি — স্পিল্‌নটার। মশলা ভরার সময় যাতে বিস্ফোরণ না হয় সেজন্য লাল-সাদা রাসায়নিক দ্রব্য দুটিকে একটু কেরোসিন ছিটিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই বোমাবাঁধাটা ভালোমতো রপ্ত হয়ে গেল। প্রথম যেদিন চারটে বোমা দিয়ে এল বিলুদাকে, গর্বই হচ্ছিল দ্রোণের। ওর সামনেই বিলি হয়ে গেল বোমা — দুটো সপ্তগ্রাম, একটা ত্রিবেণী। চতুর্থটি গেল মনসাতলায়। এরপরেই আরো পাঁচটি বোমা বানাল দ্রোণ। কারণ, বিলুদা পরিকল্পনা করেছে মগরা স্টেশন আর পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দিতে হবে।

বোমা বানালেও ওই কাজটিতে অংশ নিতে হ'ল না দ্রোণকে। তপন, সমীরকেও বলেননি বিলুদা। নিয়ে আসা হল বিধু-পান্ত-নেপাল এসব নামকরা গুস্তা ওয়াগন ব্রেকারদের। ওরাই করল 'অ্যাকশন'। দ্রোণের খারাপ লাগে। তবে কী নেতারা প্রয়োজনমতো একে তাকে ব্যবহার করে? বিধু-পান্ত-নেপালমতো তাকেও কী ব্যবহার করা হচ্ছে? ধরা যাক, অন্য কোনো পার্টিনেতা বিধু-পান্তদের একই কাজ করতে বলল, ওরা কি করবে না? ওরা তো কোনো আদর্শ থেকে কিছু করছে না।

সারাদিন পার্টির গোপন কাজের ব্যস্ততায় কেটে গেলেও দিনের শেষে নিজের কাছে অপরাধী লাগে। সংশয় জাগে। রাতে ডায়েরি খুলে বসে দ্রোণ। পুরনো লেখা পড়ে। না লিখতে পারার জন্য মন খারাপ হয়। ডায়েরির পাতায় লিখতে থাকে অসংলগ্ন চিন্তার কথা — 'আমার এভাবে জড়িয়ে পড়াটা উচিত হচ্ছে কিনা, বুঝতে পারছি না.....ঠিক বুঝতে পারছি না কোন পথে চলবো? পার্টির নীরব সমর্থক থাকবো, না, সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবো? লেখা ছাড়া অন্য কিছু আমার উপযুক্ত জায়গা নয়, উপযুক্ত কাণ্ড নয়। আমাকে তাই লিখতেই হবে, যাই করি না কেন, লেখাকে ছাড়ার কথা কোনো মুহূর্তেই ভাবা চলবে না। তা উচিত হবে না।'শিবানীর কথাও মনে আসে দ্রোণের। শিবানী তার জীবনে এক খণ্ড সবুজ মাঠ। কিন্তু সে কী শিবানীর ভালোবাসা পাবে?

আরও কিছু লিখতে যাচ্ছিল দ্রোণ, বাইরে থেকে ডাক আসে, দ্রোণা আছিস? তপনের গলা। দ্রোণ বাড়ির দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। তপনের সঙ্গে এক বয়স্ক মানুষ, ষাট-ষাটটি হবে। রোগা, লম্বা। মেটে রঙের প্যান্ট, ছাই-ছাই শার্ট। ক্যান্সিসের জুতো। কাঁধে পেটমোটা খোলা।

তপন পরিচয় করিয়ে দেয়, আমাদের মাস্টারমশাই।

দ্রোণ নমস্কার করে। ভদ্রলোক দ্রোণের কাঁধে হাত রাখেন। তাঁর হাতের স্পর্শে আত্মীয়তা অনুভব করে দ্রোণ।

মাস্টারমশাইয়ের ভালো নাম অমূল্য সেন। উনি কিছুকাল আগেও পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। নকশালবাড়িতে কৃষক হত্যার পর পার্টি ছেড়ে দিয়েছেন। মাস্টারমশাইয়ের

জনা গায়েত থাকবার ব্যবস্থা করা দরকার। তপন জানতে চায় দ্রোণদের বাড়িতে রাখা সম্ভব কি না? এ এমন কিছু অসাধ্য কাজ নয়। বাবা-মাকে না জিজ্ঞেস করেই দ্রোণ সম্মতি জানায়। কাউকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে বাবা-মা কোনোদিনই আপত্তি জানাবে না।

মাস্টারমশাই লোকটি বড় ভালো। শান্ত অথচ দৃঢ়। বেশ সহজবুদ্ধির মানুষ। দ্রোণের সঙ্গে আলাপ জমে ওঠে।

মগরার পাটির আকর্ষণের কথা শুনে মাস্টারমশাই বিরক্ত হন। প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। শহরাক্ষলে স্টেশন পোস্ট অফিস পুড়িয়ে, এরকম পটকাবাজি করে কী হবে? পুলিশ এসে কিছু কাজের লোককে ধরে নিয়ে যাবে। জেলে ভরে রেখে দেবে মাসের পর মাস।

তার প্রতিবাদে অনশন, মিছিল হবে কিছুদিন, স্লোগান দেবে পুলিশি জুলুম মানছি না মানি না...কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও.....আবার সব চূপচাপ। ...সব হেঁকো বাৎ, ঠাকডাক হবে অনেক, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না....আর তা ছাড়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? না, আমাদের তোমরা অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছ, আমাদের আবার গদিতে এসেও দাও, এই-ই তো? এ কোনো কাজের কাজ নয়।

কাজের কাজটা তাহলে কী? দ্রোণের চোখের প্রশ্নটি মাস্টারমশায়ের নজর এড়ায় না। তিনি আরম্ভ করেন দেশের কথা দিয়ে। ভারতবর্ষ নৃশংস দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শোষণ করেছে তিন ধরনের শোষণক — বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, জোতদার - জমিদার শ্রেণী আর বিদেশী পুঁজিপতিদের এদেশীয় দাসত্ব তন্ত্রবাহকেরা। ব্রিটিশরাজ চলে গেছে কিন্তু ভারত এখনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদেশী পুঁজিপতিদের নয়া উপনিবেশ। এই শোষণকদের মধ্যে এখন তীব্র সংকট। সংকটের ফল দেখা যাচ্ছে দেশ জুড়ে। শ্রমিক কৃষক-মধ্যবিত্তের কাজ রোজগারের ওপর হিমলা আজ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। শোষণ আর অত্যাচারের জন্য রাষ্ট্রের পরিচালকরা জনতার থেকে যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ততই নৃশংস হয়ে উঠেছে তারা। জনতার বিরুদ্ধে আরও বেশি বেশি করে লেলিয়ে দিচ্ছে পুলিশ মিলাটার। তাকে নিয়মিতভাবে পাশ্টে যেতে হচ্ছে শোষণ করবার কায়দা, ধরতে হচ্ছে নতুন নতুন ভেক। এতদসত্ত্বেও প্রতিদিনই তার মুখোশ খুলে পড়ছে। শাসকদের এই রাজনৈতিক সংকটই হ'ল বিপ্লবের কাল — সমাজব্যবস্থা বদলে দেবার সুবর্ণসময়।

দেশের কথা থেকে রাজ্যের কথায় আসেন মাস্টারমশাই। গত ন'মাসের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী শিল্পাক্ষলে প্রায় পঞ্চাশহাজার শ্রমিককে লে-অফ বা ছাঁটাই করা হয়েছে। কারখানা অফিসে নতুন নিয়োগ একেবারে বন্ধ। বেকারের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। গ্রামের চিত্র আরও ভয়ানক। কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে। বর্গাদার, ভাগচাষী উচ্ছেদ পাড়ছে। খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা একেবারে ছারখার। দুবেলা খাবার জোটানোও সাধারণ অতীত হয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু মানুষের।

মাস্টারমশাই একটু থামেন। এক প্রাস জল খান। মাস্টারমশাইয়ের বলা প্রতিটি কথা দ্রোণের মর্মে ঝিলে যায়। ওঁর কথায় সত্যি আছে। আজকে দ্রোণের বাড়িতেও দু'বেলা ডালমতো রান্না হয় না। অনেক রাত্তিরেই ডালসেদ্ধ, তরকারি সেদ্ধ খেয়ে কাটাতে হয়। কখনও শুণু কটি হয় বাড়িতে। কখনও গাছের বেল খেয়ে দিন কাটে।

এত নিরাশার মধ্যেও আশার কথা শোনান মাস্টারমশাই। মানুষ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। না খেয়ে সে আর মরতে চাইছে না। সে নিজে না খেয়ে আর জোতদারের গোলায় ধান তুলবে না। জোতদার-জমিদাররা পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে জুলুম করবে। তবু আসন্ন ধানকাটার মরশুমে পুলিশ মিলিটারির সশস্ত্র আক্রমণ রুখবার জন্য কৃষকরা বাংলার প্রতিটি জেলায় প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তুলেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামের মানুষ বুঝেছে, এ ছাড়া বাঁচা যাবে না। শহরের শ্রমিক, মধ্যবিত্তরাও বুঝেছে, কৃষকের লড়াই তারও বাঁচার লড়াই। কৃষকের লড়াইকে কেন্দ্র করে তাদের সমর্থন জানিয়ে শহরের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। প্রতিরোধের লড়াই দানা বাঁধছে। সারা বাংলায় এরকম এক বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থা দেখে রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক আমলাবাহিনী বিষম ভয় পেয়ে গেল। তারা তড়িঘড়ি যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে আর একটি পুতুল সরকার খাড়া করল। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। গণতন্ত্রের কোনো ভান রাখার মতো বিলাসিতাও এখন আর দেখান যাবে না। দীর্ঘকাল ধরেই জনতার ওপর অন্যায় আক্রমণ চলছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার আসার আগে চলেছে, যুক্তফ্রন্টের সময়েও কৃষক-শ্রমিক-নারী-শিশু হত্যা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সরকার পরিবর্তন করে হিংস্র আক্রমণের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া গেছে।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেন, শত্রুর এই সংকটের সময় আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধরনটা কী হবে? মানুষ কোন্ পথে এগোবে? খুবই মৌলিক প্রশ্ন। দ্রোণ বুঝতে পারে মাস্টারমশাই নতুন কোনো আন্দোলনের কথা বলতে চাইছেন। সে চুপ করে থাকে। মাস্টারমশাই নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন।

শত্রুর সংকট হ'ল তার দুর্বল মুহূর্ত। জুজুই তাকে ধ্বংস করার সবচেয়ে ভালো সময়। কৃষক-শ্রমিক আজ মুক্তি চাইছে। শত্রুর এই সংকটের মুহূর্তে, যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থীরা কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি সংগ্রামে কোনোরকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে না। বরং আন্দোলন একটু জঙ্গী হয়ে উঠলেই তার রাশ টেনে ধরছে, প্রকারান্তরে আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। নকশালবাড়ির লড়াইয়ে কৃষক রমণীদের হত্যা করে এরা তাই করতে চেয়েছে। এখনকার এই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভকে এরা শহরকেন্দ্রিক হঠকারী আন্দোলনে পরিণত করবার চেষ্টা করছে। শহর এলাকায় উত্তেজনার আবহাওয়া তৈরি করে, দু-চারদিন নিজেদের প্রয়োজনমতো বোমা-পটকা ফেলে, নিরস্ত্র কিছু লোককে পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে দিয়ে এরা আদতে ওই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে। জনতার ক্ষোভকে এরা লাগাতে চাইছে নিজেদের ভোটযুদ্ধের কাজে।

দ্রোণ বলল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছুটা হলেও একটা গণতন্ত্রের বাতাবরণ ছিল। সেটাও যদি ভোটের মাধ্যমে সরকার বদল করে ফিরিয়ে আনা যায়, মন্দ কী?

এইবার শান্ত মানুষটির চোখ জ্বলে ওঠে। বুদ্ধ সোজা হয়ে বসেন। বলেন, যে গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করে সেই আদিকালের কংগ্রেস থেকে আজকের নয়া সংশোধনবাদী সি পি আই(এম), সে কার গণতন্ত্র? দেশের জনগণ শ্রমিক কৃষক। এরাই তো দেশের পনেরো আনা মানুষ। যদি বলো গণতন্ত্র আছে, তাহলে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা, তার পুলিশ-মিলিটারি দেশের এই পনেরো আনার অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষকের হাতে আছে। কিন্তু তা তো নেই। এ হ'ল দেশের এক আনার, বড়লোকদের — জোতদার-জমিদার শ্রেণীর গণতন্ত্র।

এই গণতন্ত্র ভেঙেই জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এক টুকরো ভোটের কাগজ হাতে পাবার নাম গণতন্ত্র নয়।

মাস্টারমশাই হঠাৎ থেমে যান। চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

দ্রোণ ব্যস্ত হয়, কি হল?

উনি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে শাস্ত হতে বললেন। তারপর ইশারায়, জল।

দ্রোণ জল নিয়ে এসে দেখে ওঁর হাতে ওষুধ। ট্যাবলেট গিলে নেবার পর, খোলা থাকে দুটি টিফিন বাগ্ন বেগ করেন।

এই হয়েছে মুশকিল ... দীর্ঘ সময় পেট খালি থাকলেই জ্বালা শুরু হয়। ঠোটে পাখা জড়ান হাসি।

ওঁর পাকস্থলীতে ঘা হয়েছে। এই জন্য যেখানে যান সঙ্গে থাকে সেদ্ধ ভাত। একটি টিফিন বাগ্ন উনি মা-কে দিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। উনি তাদের বাড়ির সব খবর রাখেন। জেনেগুনেই দুটি বাগ্ন নিয়ে এসেছেন। যে অভুক্ত পরিবারে এসেছেন, তাদের না দিয়ে উনি থাকেন না। এই গভীর কথটা নিরুচ্চারে বুঝিয়ে দেন শাস্ত মানুষটি।

দ্রোণের গলায় ঝাঁপিয়ে বাষ্প আসে। সে একবার বলে, মাস্টারমশাই —। আর বলতে পারে না।

মাস্টারমশাই গভীর গলায় বললেন, যাও রামা... দিয়ে এস, আর, যদি সম্ভব হয়, একটা থালা আনবে?

..... নিশ্চয়ই

একটি টিফিন বাগ্ন মা-কে দিয়ে থালা নিয়ে এল দ্রোণ।

নাঃ, এবার এই ভাতটা টেলে নেওয়া যাক...

ভাত আর পেঁপে সেদ্ধ।

এক গ্রাস মুখে তুলে মাস্টারমশাই বললেন, নাও, তুমিও নাও...

ওঁর খাবারে ভাগ বসাতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু না নিলে উনি আবার কি ভাববেন? দ্রোণ ছোট একটি গ্রাস তোলে। অমূল্য সেন মৃদু হেসে আবার কথায় ফিরে যান।

এই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষমতা কতটুকু? সংসদ, মন্ত্রিসভা এগুলো বাইরের ঠাট। আসলে রাষ্ট্র চালাচ্ছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী। রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান শক্তির জায়গা তার আমলাতন্ত্র। তিন নম্বর জোরের জায়গা বিচারবিভাগীয় আমলাতন্ত্র। এই তিনটি সংস্থাই হ'ল ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন শোষকের শোষণ। সংসদ, মন্ত্রিসভা এসব হ'ল উপরি। সংসদ না থাকলেও এ রাষ্ট্র চলবে। এ হেন সংসদীয় গণতন্ত্রের মতিমা কীর্জন করছে ওইসব বামপন্থীরা।

দ্রোণ জানতে চায়, তাহলে এখন আমাদের লড়াইয়ের কায়দা কেমন হওয়া উচিত?

মাস্টারমশাই বলেন, তুমিও ভাবো। তুমি ভাবো, এখন জনগণ কি সেই পুরনো কায়দায় মিছিল, অনশন, বিধানসভা অভিযান এইসব করবে? এ পথে গেলে তো শত্রুরই লাভ। তারা নিজেদের খর গোছাগার সময় পেয়ে যাবে। তাদের পুলিশ সেই লাঠি, গুলি চালাবে, কিছু লোককে গুলোর করবে। তার প্রতিবাদে আবার সেই অনশন, সেই মিছিল, সেই

একঘেয়ে বঞ্চিতা এবং সেই এক পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি— অমুকের মুক্তি চাই, অমুকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, কিংবা কালাকানুন বাতিল করো। এই পন্থার যারা সমর্থক তারা কিন্তু ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শাসক-শোষকদেরই সুবিধা করে দিচ্ছে। মানুষের আন্দোলনকে বিপথে চালাচ্ছে।

মাস্টারমশাই একটু দম নেন। দ্রোণ চুপ করে থাকে। সত্যিই, মিছিল-মিটিঙ আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতার দিকটা সে আগে ভাবেনি।

ভদ্রলোক বলেন, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের মুক্তির একমাত্র রাস্তা হ'ল কৃষি বিপ্লবের পথ। আমাদের দেশে শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষিবিপ্লবই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের একমাত্র পথ। কৃষিবিপ্লবের কথা বলতে বলতে শীর্ণকায় মানুষটির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সারা ভারতে পাঁচ লক্ষের বেশি গ্রাম আছে। দেশের একান্ন কোটি লোকের পঁচাত্তর ভাগ কৃষিজীবী। এবং এই কৃষিজীবীদের অধিকাংশই আজ নিরন্ন। যাদের হাতে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের ভার, তাদের নিরন্ন রেখে, খাদ্য সমস্যার সমাধান না করে, খাদ্যের জন্য দেশটাকে নির্ভরশীল রাখা হচ্ছে আমেরিকার ওপর। আমাদের দেশে খাদ্যসংকট আর শিল্পসংকট সমাধানের জন্য কৃষির ওপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পূর্ণ শেষ করবার কাজই হ'ল কৃষিবিপ্লব। ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ — নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান। এর সফলিঙ্গ যখন সারা ভারতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাবে, এদেশের সমস্ত পুলিশ-মিলিটারি আর আমেরিকার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এসেও তাকে দমন করা যাবে না। এর প্রমাণ রেখেছে চিন, এখন রাখছে ভিয়েতনাম। গ্রামকে মুক্তঘাট করে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ভিয়েতনামের মানুষ বিশ্বের সর্বোত্তম সামরিক শক্তিদারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সে দেশের পাঁচভাগের চারভাগ মুক্ত করেছে। ওখানকার লড়াইয়ে প্রত্যেকদিন আমেরিকা একটু একটু করে হারছে, ভিয়েতনাম প্রতিদিন জিতছে।

এতটা বলার পর মাস্টারমশাই আবার থামেন। ওঁর কথাগুলো এত স্বচ্ছ, যুক্তিগুলি এতটাই স্পষ্ট, সহজ পরস্পরা মেনে আসছিল, বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হ'ল না দ্রোণের। কিন্তু এখন করণীয় কী? কীভাবে এগোতে হবে আমাদের? প্রশ্নগুলি ঘুরপাক খাচ্ছিল। মাস্টারমশাই যথারীতি বুঝে গেলেন দ্রোণের প্রশ্নগুলি। উত্তরও দিলেন।

কৃষি বিপ্লবের রণনীতি হ'ল — গ্রামে মূলঘাঁটি স্থাপন। কৃষকদের মধ্যে থেকে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এলাকায় প্রথম পর্যায়ে আত্মরক্ষীবাহিনী গঠন এবং তাদের উপরে গেরিলা যোদ্ধা তৈরি করা। ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দিকে। প্রসারিত করতে হবে মুক্তাঞ্চল। মুক্তাঞ্চল বাড়তে বাড়তে ক্রমশ গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলতে হবে আমাদের। এই মুক্তিযুদ্ধ জয়লাভের জন্য গড়তে হবে ব্যাপক জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। শহরের শ্রমিক আর মধ্যবিত্তের সমস্ত লড়াই পরিচালনা করতে হবে কৃষিবিপ্লবের সাফল্যের কথা মনে রেখে। শহরের আন্দোলন যেন গ্রামের আন্দোলনের সহায়ক হয়, মাথায় রাখতে হবে। এ কাজ করলেই, শত্রু বাধ্য হবে শহরে তার জমাট বাঁধা শক্তিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে। তখনই সম্ভব হবে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করা, তার শক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে ফেলা। এইভাবে, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিই পারে কৃষিবিপ্লবকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে। আবার, সংগ্রাম ছাড়া এই ধরনের বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে পারে

না। এখন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সাজা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এট দেশে, এই রাজ্যে। অল ইন্ডিয়া কো অর্ডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রিভলুশনারিজ না এ আই সি সি সি আর গঠন তার প্রথম ধাপ। এই কো অর্ডিনেশন তার শাখা খুলেছে রাজ্যের জেলায় জেলায়।

দ্রোণাচার্য শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ বৃহৎ কিছুর সামনে দাঁড়ালে এমন হয়। ভোরবেলায় বাগানসীরা গঙ্গা দেখে এমন হয়েছিল। মাস্টারমশাইয়ের কথায় দেখা যাচ্ছে বহুদূরের দিগন্ত, দিগন্তের সীমানা। এইটাই তো কাজের কাজ। গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি গড়াটাই প্রধান কাজ এখন।

মাস্টারমশাই 'দক্ষিণদেশ' দিলেন। ওকে অনুরোধ করলেন নিয়মিত দক্ষিণদেশ পড়বার। অর্গানাইজিং গ্রুপের কোনো নেতাই তো তাকে এমন গুরুত্ব দিয়ে পার্টির কাগজ পড়তে দেননি, ব্যাখ্যা করেননি পার্টির কাজকর্ম। এক ষাট বছরের বৃদ্ধ উনিশ বছরের তরুণকে কাগজ পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছেন, এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে দ্রোণ আর বলতে চাইল না, সে নিয়মিত দক্ষিণদেশ পেয়ে থাকে। বললো, নিশ্চয়ই পড়ব।

আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে গেল। দ্রোণের হাই উঠছিল। মাস্টারমশাই ঝোলা থেকে আস্তে-আস্তে চাদর বের করলেন। ঝোলাটা উনি খুবই সাবধানে নাড়াচাড়া করছেন। না জানি কি গুপ্তধন আছে ওতে! দ্রোণের মজা লাগছিল।

— চল এইবার শুয়ে পড়া যাক

মাস্টারমশাই চাদর মুড়ি দিয়ে শুলেন। পাশে দ্রোণ।

বিছানায় শুয়েও গল্প চলল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মাস্টারমশাই জেগে উঠলেন। সকাল হয়েছে। কিন্তু সূর্যের আলো এখনও ততটা নিজেকে জাহির করে নি।

পুলিশ ধিরেছে ... তাড়াতাড়ি...। অমূল্য সেনের মুখে মৃদু হাসি। দ্রোণ ধড়মড় করে উঠে বসল। বাইরে ভারী বুটের হাঁটাচলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

— ঘাবড়ে যেও না...মাত্র তিনজন...তাও ওরা নিশ্চিত নয় কোন বাড়িতে আছি...জানলে এখানেই ঢুকত।

মাস্টারমশাই ঠাণ্ডা মাথায় দ্রুত গুছিয়ে নিলেন। হৈম আর নিবারণও ঘরে এসে গেছেন। দুজনেই নিঃশব্দ। দ্রোণ বুঝে গেল, মা-বাবা দু'জনের কেউই ভয় পায়নি। ওদের শুনিয়েই অমূল্য বললেন, আমি থাকাকালীন ওরা ঢুকে এলে, আমি তোমার মেসোমশাই, অনিল রায়... আর যদি পরে এসে খোঁজ করে, বলবে কেউ আসে নি, অমূল্য সেন নামে কাউকে চেন না...

ওঁর বলার ধরনে দ্রোণ হেসে ফেলল, ঠিক আছে। মাথা নাড়ল। নিবারণও শান্ত মুখে মাথা নাড়লেন।

আপাতত ওদের অন্যদিকে পাঠান দরকার। ভদ্রলোক ঝোলার ভেতর হাত ঢোকালেন। চিন্তা কর না, কাছাকাছি আমাদের কমরেডরাও আছে ... শুধু একটা সংকেত পাঠাতে হবে... ওরাও সহজে ছাড়বে না এদের।

০১।৫ দ্রোণের কাছে হাত রাখলেন মাস্টারমশাই।

— পিছন দিকে পুকুর তো?

— হ্যাঁ

— ওড়

কথা বলতে বলতেই ঘরের ভেতর দিয়ে বাড়ির পিছনের পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্রোণ পিছু পিছু চলল।

বাড়ির সামনের দিক থেকে পুকুরঘাট দেখা যায় না। ওই পাড়ে কিছুটা খালি জমি। চারদিক একবার দেখে নিয়েই ঝোলা থেকে হাত বের করলেন মাস্টারমশাই। হাতে রিভলবার।

আকাশের দিকে তাক করতেই দ্রোণ বুঝে গেল উনি শব্দ করে সংকেত পাঠাতে চাইছেন সঙ্গীদের।

— দাঁড়ান, দাঁড়ান ... এতে আর কত আওয়াজ হবে? এর থেকে ভারী জিনিস আছে আমার কাছে। মাস্টারমশাই প্রশ্নসূচক চোখে বললেন, তাই নাকি? দেখ...

এইবার ওঁর গলায় কিছু উত্তেজনার আভাস।

পুকুর ঘাটের অদূরে ঝোপের ভেতর আলগা মাটি সরিয়ে, একটি তোবড়ানো টিনের বাস্ক বের করল দ্রোণ। বাস্কের ভেতরে দুটি বোমা। প্রথমে একটি ছুঁড়ল খালি জমির দিকে। বুম, বু-বুম। পরক্ষণেই দ্বিতীয়টিও ছুঁড়ল একই সঙ্ক্ষে। শুদ্ধতা চুরমার করা আওয়াজ। প্রতিধ্বনিও। সদ্য ঘুম জাগা পাখিগুলি কলকল করতে-করতে উড়ে গেল। সব থেকে বেশি আওয়াজ শুরু করল কাকের দল।

তিন পুলিশই ছুটল পুকুরের ওপারে। দু মিনিট পরেই ওধার থেকেও ভেসে এল বোমার আওয়াজ। একটা, দুটো। তিনটে।

— এই তো, আমাদের ছেলেরা। ভদ্রলোক হাসলেন। বাড়ির সামনের দিকটা একদম ফাঁকা! এইবার পালান যাক। মাস্টারমশাই জুতো পরে নিলেন।

ভদ্রলোক বেরোবার মুখে নিবারণ বললেন, আমার সাইকেলটা নিয়ে যান।

— ওহ তাহলে তো খুব ভাল হয় ... আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ —

— ওই সব ঢঙের কথা না বলে, তাড়াতাড়ি যাওয়া হোক। বেঁচে-বর্তে থেকে দেশটা বদলাতে হবে তো!

মাস্টারমশাইয়ের চোখ চিক্চিক করে। নির্বিকার মুখে দেওয়ালে হেলান দেওয়া সাইকেলটিকে এগিয়ে দিলেন নিবারণ। মাস্টারমশাই যেতে যেতে বললেন, মগরা লাইব্রেরি চত্বরে শিবব্রত নামে একটি ছেলের কাছে সাইকেল রাখা থাকবে ... কালো শার্ট ... একঘণ্টা পরে নিয়ে নেবেন।

বাড়ির অদূরেই মাটির রাস্তা। সেখানে পুলিশ জীপ। ড্রাইভার কানে পইতে পাকিয়ে প্রশ্রাব করছে।

দ্রোণ সঙ্গে যেতে চাইল। মাস্টারমশাই বাধা দিলেন, একদম নয়, বেচারি নিরীহ ড্রাইভার, ওকে পার হয়ে যাওয়া এমন কিছু নয়। উনি হাসলেন। পুলিশ এলে যা শিখিয়েছি---। দ্রোণ মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে ... সাবধানে যাবেন।

খান ঠাা, তুমি চটপট টিনের বাস্কাটা পুকুরে ডুবিয়ে দিয়ে, হাত ধুয়ে ফেল
গেড়ান দগজা খুঁলে হৈম বললেন, তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি...দুগ্গা, দুগ্গা...



দক্ষিণদেশে একটি লেখা পড়ে চমকে উঠল দ্রোণাচার্য। রচনাটির শিরোনাম — ভোটযুদ্ধের
মহাড়া না, কৃষিশ্রম্যই জনগণের মুক্তির পথ। তাকে যে কথাগুলো বলেছিলেন
মাস্টারমশাই, তবু সে কথাই লেখা প্রবন্ধটিতে। তার সঙ্গে আলোচনা করবার পরই
মাস্টারমশাই নিবন্ধটি লিখেছেন — এ কথা ভেবে একটু গর্বও হ'ল দ্রোণের।

এত বড় কথাটা বন্ধুদের জানাতে হয়। দক্ষিণদেশ হাতে দ্রোণ সোজা চলে গেল বাগাটি
কলেজের আড্ডায়।

কলেজ সংলগ্ন এক চিলতে টালির চালের ঘরে চা-বিস্কুট-টোস্ট-ঘুগনি-ডিমভাজা পাওয়া
গায়। কখনও আলুর চপ, মুড়ি। দোকানটি চালান এক বৃদ্ধা। কলেজের ছেলেমেয়েরা
দোকানটির নাম রেখেছে দিদিমার ক্যান্টিন। এখানে চা খেতে খেতে দীর্ঘসময় আড্ডা মারা
গায়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে আনা টিফিন বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। দিদিমা বিরক্ত
হন না। মাঝে মধ্যে মৃদু হেসে বলেন, যা বাক্সে এবার ক্লাসে যা তোরা।

কলেজে না পড়লেও, দুয়েকজন বন্ধুর সঙ্গ্রে দ্রোণও এই ক্যান্টিনের আড্ডায় নিয়মিত
যোগ দেয়। সমভাবাপন্ন বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য, রাজনীতি থেকে কলেজের খুঁটিনাটি খুনসুটি
সব নিয়ে আলোচনা চলে। ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা মারলেই মন ভাল হয়ে যায়।

ক্যান্টিনে ঢুকতেই অমর-বিজন-সহদেবের সম্মেলক চিৎকার — আরে কবি যে.....।
গল্পদের অনুরোধে দ্রোণ তার কবিতা শুনিচ্ছে কয়েকবার। সেই থেকে নাম হয়ে গেছে
কবি। অন্যদিন এই সম্মেলন শুনে ভালোই লাগে কিন্তু আজ দ্রোণ একটু লজ্জা পেল।
পাঞ্চালী বসে আছে। ওর সামনে দ্রোণ একটু সংকোচ অনুভব করে। অজান্তেই তার
মুখের চামড়া টানটান হয়ে যায়। অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে সে বিজনের মুখোমুখি
বসে পড়ল।

— শোন বিজন, জরুরি কথা আছেগ্রামে যেতে হবে আমাদের। দ্রোণ দক্ষিণদেশ
থেকে পড়ে শোনাল কিছুটা অংশ। বিজন বলল, ঠিক আছে কিন্তু আমরা ওখানে গিয়ে
কী করব?

... প্রথমে কৃষকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওদের বোঝাতে হবে ফসলের অধিকার রাখার
কথা ...ফসল কাটার সময়ে পাহারা দেবে আত্মরক্ষী বাহিনী তাদের হাতে থাকবে দেশী
অস্ত্র।

সহদেব মুর্মু গলল, তোমার কথা শুনবে কেন ওরা?

দ্রোণ গলল, সেজন্যই তো প্রথমে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে, আত্মীয়তা অর্জন করতে
হবে। তারপর...

বিজন গলল, ওহে বাবা এ তো অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। কলেজ কামাই করে

দু'একদিন যাওয়া যায় কিন্তু ওখানে পড়ে থাকা.....

আর তা ছাড়া.....। বিজনের মুখের কথা কেড়ে নিল পাঞ্চালী। তুমি বললে আর ওরা মেনে নিল সেই কথা, অত সহজ নয়।

এবার দ্রোণ একটু অপ্রস্তুত। তবু মুখের হাসি ম্লান হতে দিল না সে। কেন? কেন সহজ নয়?

জানা গেল, কলেজে ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। পাঞ্চালী হেরে গেছে। অথচ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী পাঞ্চালী কলেজে খুবই জনপ্রিয়। তার হারের কারণ ব্যাখ্যা করল মেয়েটি। নতুন কথা প্রথমে এক কথায় সবাই মেনে নিতে চায় না। — এই দেখ না, আমি কলেজ নির্বাচনের আগে নকশালবাড়ির সমর্থনে কথা বললামতার জেরে অনেক বামপন্থী বন্ধু আমার বিরুদ্ধে ভোট দিল। ওরা গতানুগতিকতার বাইরে যেতে চায় না।

দ্রোণ বলল, হতেই পারে এরকমসত্যি কথাটা যারা বলেন, তাঁরা প্রথমে একাই থাকেনপরে, পাশে লোকজন আসেগ্যালিলিও যখন পৃথিবী ঘুরছে বলেছিলেন একই দশা হয়েছিল তাঁর।

যুক্তির প্রথম ধাক্কায় পাঞ্চালী চূপ করে যায়। তারপরেই বলে, সেজন্যই তো বলছি কাজটা সহজ নয়। অমর বলে, দ্রোণের কথাটা ঠিক কিন্তু এর আগে তো কখনওই গ্রামে কাজ করতে যাইনি আমরা, সেজন্যই অসুবিধে পড়েছে।

আড্ডার অধিকাংশ বন্ধুই বামপন্থার সমর্থক কিন্তু তারা গ্রামে যেতে রাজি নয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হয় দ্রোণ একাই যাবে গ্রামে — সাতদিনের জন্য। মগরার পূর্বে, ষোলো-সাতেরো কিলোমিটার দূরে গান্ধেগড়। সেই গ্রামের কিছু গরীব কৃষক পরিবারের সঙ্গে সহদেব মূর্মুর আলাপ আছে। এমন এক কৃষক ধীরু সোরেন। তার বাড়িতে দ্রোণের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে সহদেব। এক সপ্তাহ পরে ফিরে এসে দ্রোণ বন্ধুদের জানাবে গ্রামের পরিস্থিতি। তখন ঠিক হবে অন্য কেউ যাবে কি না?

ক্যান্টিনের আড্ডায় যে কথা বোঝাতে দু'ঘন্টা সময় লেগেছিল দ্রোণের, নিজের ক্ষেত্রে তা লাগল দু-মিনিট। সে পরদিনই চলে গেল গান্ধেগড়। জি টি রোড থেকে তেইশ নম্বর বাসে চেপে দিগসুই। তারপর হাঁটা।

গান্ধেগড় পৌঁছে ধীরু সোরেনকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হ'ল না। মাঝারি উচ্চতা, তাম্রবর্ণ, পেটা চেহারার ধীরুকে এক ডাকে সবাই চেনে। আদিবাসী মহলে ওর খুবই প্রভাব। ধীরুদার বাড়িতেই উঠল দ্রোণাচার্য। ধীরু আলাপ করিয়ে দিল গ্রামের আর পাঁচজনের সঙ্গে। নতুন একটি পেশাও ঠিক হয়ে গেল দ্রোণের — বাড়ি বাড়ি ধানঝাড়ার কাজ। দিনমজুরি।

প্রথমদিন ধীরুদার সঙ্গে ধানঝাড়ার কাজটি দেখতে গেল দ্রোণ। যে বাড়িতে কাজ হবে সেই হালদার বাড়ির উঠান গোপন দিয়ে নাকোনা। পরিষ্কার, শুকনো উঠানে পাতা হ'ল কাঠের তক্তা। জড়ো করা হ'ল মাঠ থেকে কেটে আনা শানগাছের আঁটিগুলি। ধীরু, ধীরুর বৌ আদুরি, কানাই, নারায়ণী, আননাস এবং আরো কয়েকজন জড়ো হয়েছে ধানঝাড়ার কাজে।

দু'ভাতে দীক্ষা তুলে নিল একটি ধানের আঁটি। বাঁ পা এগিয়ে ডান পা পিছিয়ে দাঁড়াল। পাতার খাঁটিগুলি আছড়াতে লাগল উঠোনে পাতা তক্তাটির উপর। ধান ছড়িয়ে পড়ল উঠোনে। দীক্ষা আরম্ভ করতেই অন্যরা যোগ দিল।

শুধু চপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলে কি আর কাজ বোঝা যায়? কাজ শিখতে হয় কাজ করে। দ্রোণও হাত লাগাল। কিছুক্ষণ ঝাড়তেই হাত পিঠ ব্যথা হয়ে গেল তার। অথচ দীক্ষা, কানাই, আদুরি এরা কত অনায়াসে ঝেড়ে চলেছে। বাঁ হাত টনটন করছিল বলে ডান হাতে ধানের আঁটি ঝাড়বার চেষ্টা করল দ্রোণ। কিন্তু একহাতে এ কাজ আরও শক্ত লাগে। দীক্ষা তাকে শিখিয়ে দিল ঠিকঠাক দাঁড়ানোর কায়দা, শ্বাস নেবার কৌশল। এইবার কাজটি কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে এল। কাজ করতে করতে মানুষ যা শেখে তা একেবারে জীবন দিয়ে জানা। এ জ্ঞানের কোনো বিকল্প হয় না।

সারা উঠোনে সুবর্ণবিন্দুর মতো ধান ছড়িয়ে পড়েছে। নারায়ণী একটি ছোট ঝাঁটা নিয়ে এল। খেজুর পাতায় তৈরি ছোট্ট সম্মাজনী দিয়ে মহিলাটি ছড়ানো ধান একটি কোনায় জড়ো করতে লাগল। তারপর সেই ধান তোলা হ'ল মাটির জালায়। এখন কদিন এই সদ্যোজাতকে রোদ্দুর খাওয়াতে হবে।

ধানঝাড়ার পর আঁটিগুলি জড়ো করা হচ্ছিল অন্যদিকে। আঁটিগুলি খড় হিসাবে বিক্রি হয়ে যাবে। কিংবা গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে ক্ষেতের মালিক।

ধানকাটা এবং ঝাড়া সব কাজটির জন্য ধীর পেল দেড় টাকা। আদুরিও তাই। দ্রোণ যেহেতু অল্পক্ষণ কাজে লেগেছে, সে পেল আট আনা। নতুন জীবিকার প্রথম উপার্জনটি হাতে পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল দ্রোণ। রাত্তিরে ডায়েরির পাতায় লিখে রাখল প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা। কোনোদিন কবিতায় উঠে আসবে এই অনুভব। এ জীবন নিশ্চয়ই তাকে প্রেরণা জোগাবে নতুন কবিতা সৃষ্টির।

শুধু কবিতার অনুঘটক নয়, গান্ধেগড় জায়গাটা ঝাঁটি হিসাবেও ভালো। পাশেই একহাজার বিঘের মতো সরকারি খাস জমি পড়ে আছে। এখানেই আগামী ফসল তোলার মরশুমে আন্দোলন শুরু করা যায়।

দীক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের এলাকাটি ভালো করে দেখে নিল দ্রোণ। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের জীবনে খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে। অবশ্য, কিছু অসুবিধে হচ্ছিল। সকালে উঠে যাইহোক কিছু খাওয়ার অভ্যেস দ্রোণের। এখানে দীক্ষার বাড়িতে সকালের জলখাবার গরম ভাত — পাওয়া যায় বেলা এগারোটায়। ফলে সকালের খিদে চাপা দিতে প্রচুর জল খেয়ে নেয় দ্রোণ। ভাত খেয়ে তীরধনুক কাঁধে ধীর দ্রোণ দুজনেই যায় হমলো-কুমলোর বিলের দিকে। ওখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ওরা তীর ছোঁড়া অভ্যেস করে কিছুক্ষণ। দীক্ষা দ্রোণকে শেখায় তীর ধনুকের কলাকৌশল আর দ্রোণ দীক্ষাকে শেখায় গাজনীতি। ছোটদের গাজনীতি বই থেকে পাঠ করে শোনায।

ব্যক্ততার মধ্যেও বাবা-মা-দাদার জন্য মন কেমন করে কখনও। দ্রোণ জানে, সে একটি চাকরি না পেলে, তাদের বাড়ির সবাইকে অনাহারে থাকতে হবে। বাবার জমি পিঁকির টাকা ফুরিয়ে এসেছে। গ্রামে আসবার আগে সে দেখে এসেছে, বাড়িতে একবেলা করে আহার জুটবে। এরপর ভাত পাওয়া যাবে না। বাড়ির কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে যায়

দ্রোণ। শিবানীর কথা ভেবেও মন খারাপ হয়। তবে এই দুই বিষয়তা ভিন্ন চরিত্রের। প্রথমটি বাইরে গিয়ে কাজ খুঁজতে তাড়না দেয়, দ্বিতীয়টি বাইরের সব কাজ ফেলে ঘরের কোনায় কবিতার কাছে ফেরবার ইচ্ছে জাগায়।

শিবানী আর কবিতায় অদ্ভুত মিল! এই দুজনােকেই পাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্রোণ কতকাল কিন্তু দু'জনের কেউই তার কাছে ধরা দিচ্ছে না। শিবানীর চিন্তায় অস্থির দ্রোণ গান্ধেগড় থেকেই তাকে চিঠি লেখে। জানতে চায় তার প্রতিক্রিয়া। এর উত্তরে হয় শিবানী তার কাছে আসবে, না হয় চলে যাবে দূরে, বহুদূরে।

পাঁচদিনের মাথায় বাড়ি ফিরে এল দ্রোণ। ও বাড়ি ফিরলেই বাবা-মা'র মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সংসারের অভাব-অনটন যেন কিছুক্ষণের জন্য ওদের সদর থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি পাড়া বেড়াতে যায়।

বাবা বলেন, এই নে, এইটা পরে নে।

নিবারণের হাতে একটি তাবিজ আর এক নীলার আংটি। আংটিটা দ্রোণ চেনে, ওইটি বাবার আঙুলেই ছিল। তাবিজটি নতুন। দ্রোণের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তার ডান হাতে পরতে হবে তাবিজটি। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ডান হাতের মধ্যমায় ধারণ করতে হবে নীলার আংটি।

বাড়ি ফেরামাত্রই পিতৃদেবের এই ব্যবহার আসলে মনের টানের বহিঃপ্রকাশ। ও যখন ছিল না তখন নিশ্চয়ই দু'জনে ভেবেছে দ্রোণের স্বাস্থ্যের কথা, নিরাপত্তার কথা। ভেবে ভেবে তাকে নির্বিঘ্ন রাখার এই উপায় বের করা হয়েছে। দ্রোণের চোখে অশ্রু আসে। কে যেন তার নাম ধরে ডাকে, বাইরে থেকে। সে দ্রুত বারান্দায় চলে আসে। বাইরে ডাকপিওন দাঁড়িয়ে।

শিবানীর চিঠি এসেছে। দ্রোণের হৃদয়স্পন্দন বেড়ে যায়। খাম খুলে চিঠি পড়ে সে। 'এ ধরনের চিঠি আমার কাছে নতুন নয়। তবু কেন জানি না তোমার কাছ থেকে এরকম একটা মনোভাব আশা করিনি। তুমি হয়তো আমায় বুঝতে ভুল করেছ, তাই যা ভেবে তুমি তোমার মনকে ভারাতুর করেছে, আমার মনে তা একবারও স্থান পায়নি। তুমি আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী। তাই বন্ধুত্বের দাবি নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তা নিছক বন্ধুত্বেরই হতে পারে। তোমার কাছ থেকে এর বেশি, আশা করি না। আশা করি আমার স্পষ্ট অভিমত তুমি বুঝতে পেরেছ।.....'

শিবানীর চিঠি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল দ্রোণ। শেষ লাইনটি আবার পড়ল 'বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে তুমি যদি আমার কাছে আসতে পারো আমিও অনুগত গাণহাণ করতে পারব, নচেৎ আমায় ক্ষমা করো।' অগ্নিশলাকা দিয়ে দহন করলেও কি এর থেকে বেশি যন্ত্রণা হয়? তাকে কোনো নারী কোনোদিন ভালোবাসবে না? নিঃশব্দে অভিযাপগ্রস্ত মনে হয়। গলায় জমে ওঠে দুঃখ। বুকে পাথর হয় দুঃখ।

শিবানীকে ভুলতে নানান কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে দ্রোণ। পারে না। দিন কাটে, ব্যথা মরে না। দিনের শেষে অভিমান তীব্র হয়, গলায় বাষ্প জমে। রাত ঘন হলে খাতা কলম খুলে বসে দ্রোণাচার্য।

একদিন দ্রোণ লিখতে শুরু করে। লিখতে চেয়েছিলেন কবিতা। কিন্তু কলম তাকে শিবানীর উদ্দেশ্যে গদ্য লেখায় নিয়ে যায়। কলম লিখে চলে

‘মামা তোমায় ভালোবাসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি, কিন্তু পারিনি। শুধু নিজের গুরুত্ব গুরুত্ব নিয়েই খুঁড়েছি আর রক্ত ঝরিয়েছি। ক্ষতবিক্ষত অন্তর নিয়ে অনন্ত অস্থিরতায় জটিল করেছি। তবু পারিনি তোমার কাছে যেতে, যদি আরও নিষ্ঠুর আঘাত করো। চেষ্টা ছিল তোমাকে ভুলে যাবার, চিরদিনের মতো ভুলে যাবার। রক্ষ বন্ধুর পথ, যা আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, আর কবিতা — এই নিয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারব। এই ছিল আমার ধারণা তোমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর। কিন্তু পারলাম না। তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আমি হেরে গেছি। আমি স্পষ্ট গৃহীত। তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার অসম্ভব, আর তার চেয়েও বেশি অসম্ভব তোমার ভালোবাসা না পেয়ে বেঁচে থাকা।

শিবানী, জীবন তোমার কাছে কীরকম মূর্তিতে দেখা দেয় তা জানি না, কিন্তু আমার কাছে তা ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর। হিম কঙ্কালের মতো ব্যর্থতায় ভরা দিন। শুধু তোমাকে উদ্দেশ্য করে শব্দের মিনার গড়া, আর কবিতার দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব। কিন্তু শুধু এই নিয়ে কি বাঁচা যায়, তুমিই বলো? কোনভাবেই কি তুমি আমায় ভালোবাসতে পারো না? তোমার ভালোবাসা পেতে হলে আর কত কষ্ট করতে হবে? শিবানী আমার।’

লেখাটা যত অনায়াসে হয়ে গেল, তাকে খামবন্দি করে ডাকে দেওয়াটা ততটাই কঠিন। এই চিঠি দিয়ে কী লাভ? শিবানী আর ফিরবে না। মস্তিষ্ক থেকে তিক্ততা বেড়ে যাবে। এখন দ্রোণ ইচ্ছে করলে, শিবানীর সঙ্গে অন্তত সম্মেলন কথাবার্তাও বলে আসতে পারে। এই চিঠি লিখলে হয়তো সেই বাক্যলাপের সূত্রপাতও নষ্ট হয়ে যাবে। আবার চিঠিটি কাছে থাকলেও অসহ্য লাগছে! মনে হয়, এখনই ফিটানো যাক। কিছু দোঁটানার পর চিঠি ভাঁজ করে পালতোলা নৌকো বানিয়ে ফেলে দ্রোণ। ভাসিয়ে দিল কুস্তী নদীতে। নৌকোটি দীর্ঘ হেলতে দুলতে চলে গেল কিছুটা। তারপর ডুবে গেল।

ভোগেন্দ্র আবেগ শমিত হ’ল দ্রোণের। ডায়েরিতে লিখল — ‘নিজেকে ভীষণ একা গোধ গাচ্ছিল। তারপর পার্টির কথা মনে হতেই খুঁজে পেলাম নিজেকে। স্পষ্ট অনুভব করলাম আমি একজন কমিউনিস্ট, সুতরাং এই সামান্য ব্যাপারে আমার ভেঙে পড়া উচিত নয়। এখন একমাত্র কাজ গ্রামে সংগঠন গড়ে বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার করা। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসা। তবুও কিছু কিছু ব্যাপার মনকে চঞ্চল করে তোলে, যেমন এই প্রেম। একজন নারীর মন এবং শরীর নিয়ে ক্রমশ মিশে যাওয়ার কার্যক্রমও তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ভালোবাসা বোধহয় এমন মরীচিকার মতো মানুষকে বিভ্রান্ত করে।’

লেখার পরে ভালোবাসাকে মরীচিকা ভাবতে ভালো লাগছিল না দ্রোণের। শেষ লাইনটি কেটে দিল। তারপরে লিখল — ‘পাঞ্চালীও কি এইরকম? মনে হয় না। কারণ যারা নকশালবাদীরা আন্দোলনকে সমর্থন করে, তাদের প্রাণে ভালোবাসা আছে।’



‘আমাদের পারিবারিক পরিস্থিতি অতীব শোচনীয়। অতি সত্ত্বর আমার বা দ্রোণের একটা কর্মসংস্থান না হইলে একেবারে অনাহার বা আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় উপায় দেখছি না।’ একটানা লিখে থামলেন নিবারণচন্দ্র।

রাজ্যে চাকরির বাজার খারাপ ছিলই, ক্রমশ আরও অবনতি হয়েছে। এখন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউটের সংবাদ। পাশাপাশি বন্দিমুক্তির দাবি, অটোমেশন বেআইনিকরণের দাবিতে প্রতিবাদী সমাবেশের বিবরণ। সব কিছুকে ছাপিয়ে সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন পাওয়া যায় চাকরির সংকটের কথা।

সামান্য সূত্র পেলেই দ্রোণ ছুটে যায় চাকরির খোঁজে। ডগলি, বর্ধমান, গ্যাঙ্গেল তে বটেই কলকাতাতেও ছুটে বেড়ায় সে। গাড়ির ড্রাইভার থেকে দোকানের কর্মচারী যে কোনো ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত ছেলে, কিন্তু পাওয়াই যায় না কাজ। কিছুকাল আগে ব্যাণ্ডেলের এক ডাক্তারখানায় কর্মচারীর কাজ পেয়েছিল দ্রোণ। সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ। তারপর আবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাত নটা। মাইনে দৈনিক দুটাকা। মুটে মজুরের রোজও নয়। তবু নিয়েছিল ওই কাজ। কিন্তু যাতায়াতে মাঝে-মধ্যে দেরি হওয়ায় রাখা গেল না চাকরি। সারা মাস কাজ করার পর দ্রোণ হাতে পেল বত্রিশ টাকা। দেরের দিনগুলোয় কাজে যোগ দিতে তিনি ডাক্তার। এজন্যই মাইনে কাটা পড়ল। দেরি যে তার ইচ্ছাকৃত নয়, ট্রেন লেটের কারণে, বোঝাতে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু পাশ্টা যুক্তি পছন্দ করেন না।

নিবারণ নিজেও বহু চেষ্টা করেছেন শৈল আচার্য্যির খাতা লেখার পাশাপাশি অন্য কোনো কাজ করতে। পাওয়া যায়নি। এখন নিবারণ আগামীর কথা আর ভাবতে পারেন না। সকাল হবার পর থেকে সেই দিনটা কী করে খেয়েপারে কাটাবেন, ভেবে যান তিনি। বিব্রত হন। আবার হঠাৎ কোনো সাময়িক সমাধানসূত্র পাওয়া যায়। ক’দিন আগেই যেমন দ্রোণের স্কুলে জমা রাখা কশান মানি বাবদ বারো টাকা ফেরত পাওয়া গেল। সেই টাকায় কেনা হ’ল মুগ। লেবু, নুন, আদা দিয়ে মুগসেদ্ধ খেতে ভালোই লেগেছিল। এখন যেমন নরহরিবাবুর সঙ্গে কথা বলে কিছুটা ভরসা পাওয়া গেছে। তিনি নিবারণের থেকে পনেরো কাঠা জমি বেনামে কিনবেন। কাঠাপ্রতি পাঁচশো টাকা দিতে রাজি ভদ্রলোক। কম দাম নয়! কিন্তু টাকাটা উনি একবারে দেবেন না, প্রতিদিন পাঁচটাকা করে শোধ করবেন। ভাববার সময় নিয়েছেন নিবারণ। উকিলের পরামর্শ নিয়েছেন। এমনটা করা যায়, যদি ভদ্রলোক পুরো টাকাটা দেবার পর তবেই জমি রেজিস্ট্রি করতে রাজি থাকেন।

বাড়ির মতো রাজ্যটাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। তিনমাস যেতে না যেতেই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে পদত্যাগ করেছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম জারি হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন।

রাষ্ট্রপতির শাসনে নিবারণের সংসারে খুব কিছু পরিবর্তন হয়নি। অভাব-অনাহার-আমৃত্যু। এট তিনটি শব্দ তাঁর মনে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে তাঁদের বিবাহবার্ষিকীর দিন চলে গেল। নিবারণ ডায়েরিতে লিখলেন — বিবাহবার্ষিকীর দিনে কি সুন্দর খানার বাগছা - একবাটি সাবু ও একমুঠা মুড়ি। দ্রোণের একটি বন্ধু এসেছিল এবং রাগেও ছিল। কিন্তু একমুঠা মুড়ি ছাড়া কিছুই দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

অনলা একটি অপলাসনের কাজ করলেন হৈমর সঙ্গে। বহুযুগ পরে নিবারণের ওষ্ঠ স্তীর অসাব্যক্ত শরীর স্পর্শ করল। হৈম লক্ষ্মীমন্ত। এত অভাবের মধ্যেও তাঁর হাসি মরে না।

ভৈরবশ্রী'র জাতির মতন শৈল আচায্যির হিসাবের খাতাও নিবারণকে জীবনের সঙ্গে লগ্ন রাখা। নিজের ডায়েরি সরিয়ে রেখে আচায্যি মশায়ের খাতা কাছে টেনে নেন তিনি। হিসাবের খাতার পাতা উন্টে যান। পেছনে চলে যান, সামনে আসেন। কখনও উনিশশো ত্রিশটি সাল। তারপরেই আটশটি। মাঝে-মাঝে সাতষট্টির দিকে ফিরে তাকান।

ভৈরবশ্রী জানুয়ারিতে রেশনের চাল — সাধারণ : কিলো প্রতি ৮৪ পয়সা, মিহি : ৯৬ পয়সা আর অতি মিহি : ১ টাকা ২০ পয়সা। ছেঁষটিতে খাদ্যসংকট। খাদ্য সংকটের পালাপাশি কেরোসিন সংকট। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বেড়েছে অসন্তোষ। রাজ্যের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। কিন্তু এসব ঘটনার আঁচ-স্বাগনি আচায্যির পরিবারে। সে তেইশে জানুয়ারি সপরিবার বেনারস যাত্রা করেছেন। একমাস কাটিয়ে আবার ফিরেছে মগরায়। খরচ কত? ট্রেনভাড়া — ১৫০ টাকা, পয়সা, অন্যান্য পরিবহণ ৪৯ টাকা, কলিকাতা ১০ টাকা, বাড়ি ভাড়া এবং ভ্রমণের বেতন ৬০ টাকা ইত্যাদি সব মিলিয়ে খরচ পড়েছে ৬৬৯ টাকা ৩৯ পয়সা। কলিকাতায় ফিরেই নিজের ওজন মেপেছে আচায্যি। ওজন হ্রাসের টিকিটটিও হিসাবের খাতায় আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে রেখেছিলেন নিবারণ। টিকিটে লেখা আছে, লোক জানা গায়ে আচায্যির ওজন তখন বাহাস্তর সের।

হিসাবের খাতা পড়ে শৈল আচায্যির মনের গড়নটি বোঝবার চেষ্টা করেন নিবারণ। লোকটি শৌখিন। বছরে একবার সপরিবার বেড়াতে যাবার মতো মাসে একবার সে কলকাতায় গিয়ে থিয়েটার দেখবেই। যেমন ছেঁষটির অক্টোবর মাসে ও দেখেছে 'দাবী'। খরচ ৭ টাকা। বই পড়ার অভ্যাস নেই ওর। কিন্তু স্ত্রীর আত্মীয়ের বিবাহে সে বই উপহার দেয়। 'ব্রহ্ম মিত্রের 'শুভযোগ'। দাম ৩ টাকা। একটু হাতখোলা যাদের, তারা আজকাল অনেকেই ওই লেখকের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপহার দিচ্ছে। মুখে মুখে ছড়া চালু হয়ে গেছে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, বিয়েবাড়ি চললাম। অবশ্য ঘনিষ্ঠজনদের ক্ষেত্রে আচায্যিও উপহারের আর্থিক মূল্য বাড়িয়ে দেয়। ছেঁষটির জুলাই মাসে দুটি বিবাহে আচায্যির দেওয়া দুটি উপহারের মূল্য সে কথাই জানান দিচ্ছে। ও একটিতে দিয়েছে টেলিগ্রাফিক আয়রন — ১৩ টাকা ২৫ পয়সা। অন্যটিতে পাইলট পেন — ১০ টাকা। দামদস্তুর ক্ষেত্রেও আচায্যির নতুন জিনিস চেখে দেখবার প্রবণতা রয়েছে। ছেঁষটির মে মাসের প্রথম তারিখে ওর বাড়িতে প্রথম ঢুকেছে অরেঞ্জ স্কোয়াশ। দাম ২ টাকা ৬৩ পয়সা। অক্টোবর, ঠান্ডার মাসে এসেছে ড্রিংকিং চকোলেট — ৫ টাকা ২৬ পয়সা। মগরার মতো মধ্যস্থলে এসবাস করে এটসব জিনিসপত্র মরে আনতে বেশ মনের জোর লাগে।

নিজে অভুক্ত থেকে একটি সম্বল পরিবারের হিসাবের খাতা দেখা আত্মনির্ভরতার মতো। এই পীড়নে এক বুক কষ্ট জমে, চোখ অশ্রু ভরে যায়। তবু এই হিসাব লেখা এবং সময়ে-সময়ে তা উল্টে-পাল্টে দেখা, নেশার মতো। গোয়েন্দা কাহিনীর আকর্ষণের মতো হিসাব তাঁকে গ্রাস করে নেয়। পাকা রহস্যভেদীর মতন নিবারণ অনুমান করবার চেষ্টা করেন আচাখির মনস্তত্ত্ব। ছেষট্টি-সাতষট্টি-আটষট্টি সময়কালের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও তাঁর নজর এড়ায় না। ছেষট্টির চব্বিশে ফেব্রুয়ারি যে কেরোসিন কেনা হ'ল ৫৯ পয়সায়, তেরোই মার্চ তার দাম পড়ল ৮৪ পয়সা। ছেষট্টিতে যে সর্বের তেলের দাম কিলো প্রতি ৪ টাকা ৩০ পয়সা। সাতষট্টির এপ্রিল মাসে তা হয়েছে ৫ টাকা ৮৮। ছেষট্টিতে আচাখির মাসকাবারি খরচ ছিল সাড়ে চারশো-পাঁচশো টাকা। আটষট্টিতে সেই সংসার চালাতে মাসে সাড়ে সাতশো-আটশো টাকা লেগে যাচ্ছে।

মাসে-মাসে এই টাকা খরচ করা নিবারণের কাছে স্বপ্নের মতো। এই অঙ্কের ধারেকাছেও যায় না তার মাসিক খরচ। কিন্তু আশ্চর্য! শৈল আচার্যর ওপর ঈর্ষা হবার বদলে তার জন্য করুণাই হয় নিবারণের। জিনিসের এমন অগ্নিমূলা হলে কেমন করে সংসার চালাবে মানুষ? মানুষ যে মরিয়া হয়ে ক্রমশ রেগে উঠছে, তা অকাণ্ড নয়।

দ্রোণও যে ক্রমশ খেপে উঠছে, বোঝেন নিবারণচন্দ্র। ছেলে যে রাজনৈতিক দলে আছে এবং তা যে ঠিক সরকারি সি পি আই (এম) নই, সেটুকুও বোঝেন তিনি। ছেলের 'দক্ষিণদেশ' পড়া হয়ে গেলে, তিনিও দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন সেই কাগজে। ইদানীং দক্ষিণদেশের সঙ্গে দেশব্রতীও আনছে দ্রোণ। সেটি কাগজের বক্তব্য প্রায় এক। দু'পক্ষই দেশে কৃষিবিপ্লব করতে চায়। নাম আলাদা হ'লেও তেমন কোনো তরিতফাত চোখে পড়ে না নিবারণের। তবে দেশব্রতীর ভাষা একটু সহজ।

দেশব্রতী দক্ষিণদেশের মতন সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সি পি আই-এর ডাঙ্গে আর সি পি এম-এর রণদিভে-র মধ্যে মূলে কোনো পার্থক্য নেই। যেন নিবারণের ধারণার সমর্থনেই দেশব্রতীতে একটি লেখা ছাপা হয়। একটি ইংরেজি দৈনিকের লেখা উদ্ধৃত করা হয়েছে রচনাটিতে যার থেকে স্পষ্ট গ্রামাঞ্চলে শ্রী ধরণের আন্দোলন হবে সে সম্পর্কে সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে করে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনার গুণ এখনও নীচে এবং আঞ্চলিক দাবিদাওয়া পূরণের আন্দোলন করেই তা বাড়াতে হবে। দু'দলেরই চোখের সামনে রয়েছে আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন এবং দু'পার্টিই মনে করে ঘটনাত্মকভাবে গ্রামের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। অতএব সি পি আই সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে রণদিভে কোম্পানির ভীষণ তাত্ত্বিক লড়াই দেখে শাসকশ্রেণীর বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। বরং তাঁরা মুখে জামার হাতা আড়াল দিয়ে একটু হেসে নিতে পারেন। নিবারণ বারংবার পড়েন লেখাটি। কখনও মনে মনে কখনও অনুচকঠে। ডায়েরিতে টুকতে থাকেন পছন্দের বাক্যগুলি।

.....মস্তব্য নিষ্পয়োজন। ভীষণ বাগ্যুদ্ধ চলতে থাকুক ডাঙ্গে চক্র ও নয়া সংশোধনবাদীচক্রের মধ্যে, ভূপেশ গুপ্ত - রণদিভের মধ্যে, নাসু-গোপালন ও গোবিন্দ নায়ারের মধ্যে, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও ভূপেশ গুপ্তের মধ্যে — আসলে এসবই হচ্ছে বিপ্লবী

কমীন্দেব ও জনগণকে দামা দেবার জন্য — শাসকগোষ্ঠীর এতে শক্তি না হয়ে খুশি হবার কথা। কারণ এই বাগযুদ্ধের আড়ালে চলছে গলাগলি, আঁতাত। দু'পাটিই চাইছে কৃষকশ্রমীকে নকশালবাড়ির পথ থেকে নির্বাচনের পথে টেনে আনতে। যে ভীম আসনে গিয়ে দুশ্লাসনের বৃক চিরে রক্ত পান করছেন, তিনিই আবার সাজঘরে গিয়ে ঐ দুশ্লাসনেরই সঙ্গে এসে এক কলকোয় গাঁজা টানছেন। আসরের ভীম দেখে বিচলিত হওয়া না, সাজঘরের ভীমের দিকে তাকাও।

শেষ লাটিনটি পড়ার সময় প্রভূত রগড় অনুভব করেন নিবারণ। লেখকের নাম মনে রেখে দায় ললাজা নিশ্চয়ই ধ্যানাম। দেশপ্রতীক পুরনো সংখ্যাগুলি নেড়ে চেড়ে শশাঙ্কের লেখা খোঁজবার চেষ্টা করেন নিবারণচন্দ্র। পেয়েও যান। শশাঙ্ক বেশ সহজ, সাবলীল ভাষায় স্বল্পকথায় নাগা গিরাহীদেবের চরিত্র বুঝিয়েছেন। ওরা জানতে চাইছে নকশালবাড়ির খবর কী? লিখেছেন রোডেশিয়ার কৃষকস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। এই দুটি বিষয়েই কিছুই জানা নেই নিবারণের। কিন্তু লেখাটি পড়ে ওদের চিনতে অসুবিধে হয় না।

পুরনো দেশপ্রতীক পাতায় হঠাৎ চোখে পড়ে স্থানীয় খবর। বাঁশবেড়িয়ায় রবীন্দ্র ও গোর্কি জয়ন্তী অনুষ্ঠান! বাঁশবেড়িয়া মগরার কাছেই। খবরটি পড়তে থাকেন নিবারণ। 'গত ১৮ই মে গণশিল্পী সংস্থার শাখা 'রানার' আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী ও গোর্কি জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও গোর্কির সংগ্রামী জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রভাত গোস্বামী। পরে সংগীত পরিবেশন করেন প্রজ্ঞাপারমিতা রায়, অর্চনা চৌধুরী, প্রেমেন শূর ও মশু ঘোষ। কৃষি বিপ্লবের উপর নাটক পরিবেশন করেন সাম্মিক শাখা এবং নকশালবাড়ির কৃষক জীবনের উপর নাটক পরিবেশন করেন অজিত পাণ্ডে। প্রায় আড়াই সত্ৰাধিক দর্শক দীর্ঘ রাত পুষে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।'

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের সঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান জুড়ে মেঘমাটি। বেশ নতুন রকমের লাগে। মগরা লাইব্রেরী থেকে আনা গোর্কির 'মা' পড়েছেন নিবারণ। এটা একাধিক গল্পও পড়েছেন তিনি। সবচেয়ে ভালো লাগে 'মানুষের জন্ম' গল্পটি। একটি মানুষ জন্মানোর মধ্যে তার মায়ের কত না লড়াই, কত না কষ্ট স্বীকার, কত না ভালোবাসার উত্তরণ! এইসব অনুভব করা যায় গল্পটি পড়লে। এই মানবপ্রেমিক গোর্কির কথা বলা হয়েছে এমন এক মঞ্চ থেকে যেখানে পরিবেশিত হয়েছে আর এক বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের গান। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে নতুন রকমের! রোমাঞ্চকর!

এক একটি ঘটনা বিভিন্ন মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। খবরটি পড়ে নিবারণ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল মৃত্যু সমাসন্ন। মৃত্যুর পর তিনি বাড়ির বাগানেই শুয়ে থাকতে চান। মৃত্যু কিংবা জন্মবার্ষিকীতে উত্তরসূরীরা তাঁর স্মৃতিস্মরণে কয়েকটি কাঠচাঁপা ছড়িয়ে দিলে বেশ হয়। ছোট ছোটোটা যদি ওর লেখা একটি কাগজ পাঠ্য করে, মন্দ হয় না। দৃশ্যটি কল্পনা করে নিবারণের প্রাণ আরাম পেল। ভায়েকটি আগার কাছে টেনে নিয়ে কলম খুললেন। মনের কথা বাক্যে রূপান্তরিত হবার সময় একটি সংগীতী হওয়া গেল আমার বংশধরের কাছে অনুরোধ এবং আদেশ হঠাৎ যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমাকে সংস্কার না করে যেন আমাদের বাগানে সমাধি দেওয়া হয়

পূর্ণচ্ছেদ দেবার আগেই দ্রোণের গলা পাওয়া গেল।

— দূর দূর অফিশিয়াল গ্রুপ ওইরকমই পশ্চিমবঙ্গে ওরা অটোমেশনের বিরোধিতায় কিন্তু কেরালায় ওদের সরকার রাজ্যে অটোমেশন করছে ওদের দ্বিচারিতার শেষ নেই ব্যাটারা হাড় বজ্জাত..

এক নারীকণ্ঠের হাসি শোনা যায়। নারী বলে, জানো তো হুগলি জেলার বত্রিশ জন সদস্য সি পি আই ছেড়ে দিয়েছে

অপরিচিত কণ্ঠ। নিবারণ জানালায় চোখ রাখেন। দ্রোণের সঙ্গে একটি মেয়ে। দ্রোণের সমবয়সী কি একটু ছোটই হবে মেয়েটি। ষোলো-সতেরো বয়েস হবে ওর। ওরা দুজনে পেয়ারা গাছের পাশ দিয়ে তেজপাতা গাছের দিকে এগিয়ে গেল। পেয়ারা গাছ পেরোবার সময় দ্রোণ গাছের ডালের দিকে আঙুল তুলে কিছু একটা দেখায় মেয়েটিকে। তেজপাতা গাছ পাক দিয়ে ওরা ঘরের দিকে আসে। দ্রোণ বলে, সংশোধনবাদী সি পি আই-এর মতন এই নয়া-সংশোধনবাদী সি পি এম-ও শুধু কিছু টাকা পয়সা পাইয়ে দেবার, মাইনে বাড়ানোর লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ইতিহাস এই সংগ্রাম চালাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম দেয়নি.. সোশ্যাল ডেমোক্রটিক পার্টিওগেই এইসব আন্দোলন করে থাকে, এই-ই তাদের ধ্যানজ্ঞান.. তাদের কাজকর্মের সীমা...কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণীসংগ্রামের পার্টি কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম তাদের মূল কাজ নয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম এবং প্রধান কাজ হ'ল সমস্ত অ-শ্রমিক শোষিত মানুষের সমর্থন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য কায়েম করবার জন্য তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক আর সাংগঠনিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া।

— বাঃ! এতো একেবারে দক্ষিণদেশের লাইন.....তুমি মুখস্থ করে ফেলেছ? মেয়েটি হাসে।

— হ্যাঁ দক্ষিণদেশের লাইন হতে পারে কিন্তু ভুল তো নয়?

— ভুল তো বটেই। প্রত্যেক শ্রেণীসংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম.... একটা শুধু শ্রেণীসংগ্রাম, অন্যটা অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম এমন দূরকম শ্রেণীসংগ্রামের কথা মার্কসবাদ বলে না...এ বিষয়ে অসিত সেন লিখেছেন দেশব্রতীতে, পড়ে নিও....দ্রোণের ওক গেনে যায়। দ্বন্দ্ব চললেও নিবারণ বুঝতে পারেন ওদের মধ্যে বেশ সখা ভাব জাগোছে। জানাপার কাছাকাছি আসতে মেয়েটিকে ভালো করে দেখেন নিবারণ। পরণে ডাঁতের শাড়ি, ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির রঙ পরিষ্কার। কানের লতিতে, থুতনির ওপর রক্তবর্ণ তিল। মেয়েটির চোখে চশমা, মাথার মাঝখানে সরু সঁখি বেশ একটা স্কুল দিদিমণিসুলভ আপাতকঠিন ভাব এনে দিয়েছে।

নিবারণ বললেন, হৈম দেখ তো কে এ'ল।

হৈমবতী তক্তাপাশ ছেড়ে বারান্দার দিকে এগোলেন। দ্রোণ বলল, মা এর নাম পাঞ্চালী, বাগাটি কলেজে পড়ে।

মেয়েটি হৈমবতীকে প্রণাম করল। ডান হাতের আঙুল দিয়ে মেয়েটির থুতনি স্পর্শ করলেন হৈম। তারপর চুশন করলেন আঙুলগুলি। এ হ'ল হৈম'র আশীর্বাদ দেবার ধরণ!

হৈমবতী বললেন, এসো এসো, ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকেই নিবারণকে দেখিয়ে দ্রোণ বলল, আমার বাবা।

পাঞ্চালী বাগানে এসে প্রণাম করল। নিবারণ প্রণাম নিলেন। তারপর করজোড়ে বললেন, অগণন মঙ্গল করুন। মেয়েটি হাসল।

মেসোমশাট, ভগবানের মঙ্গল করবার ক্ষমতা কমে গেছে। নিবারণ আমোদ পেলেন। চোখে জিআসাত ফুটল।

হ্যাঁ মেসোমশাট সত্যি, ...ভগবানের বয়েস হয়েছে না ... উনি এখন কানে কম শুনছেন। চোখেও কম দেখছেন ... ক্ষমতাও কমে আসছে ...এই আমাদের মগরা থানার বড়বাবুর মতো গিনি সনকারি নেতাদের বচন ছাড়া এক পা-ও নড়তে পারেন না।

সবটি ভেসে ওঠে। মেয়েটি বেশ প্রাণবন্ত।

নিবারণ বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়?

বাগেশ্বর...বলাগাড় রোড।

হেমবতী দ্রোণের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ হে, প্রথম দিন বাড়িতে এল...ওকে কিছু খাওয়াবি না?

গুণট জটিল প্রশ্ন। বাড়িতে যে দেবার মতো তেমন কিছু খাবার নেই একথা সব থেকে ভালো জানে হেমবতী। তবু এমন প্রশ্ন তুলে ও ছোটব্যাটাকে বিব্রত করছে কেন? নিবারণ একটি গিগলি তুললেন। এমন হতে পারে দ্রোণের দিকে তাকিয়ে বললেও, হৈমবতী নিজেকেই সন্তুষ্ট করেছে। দ্রোণ কোনো উত্তর দেবার আগেই নিবারণ বললেন, চলো বাগানে যাওয়া যাক।

বাগানে গিয়ে পাঞ্চালীকে গাছগুলি চেনাচ্ছে শুধু নিবারণ। সাল-তারিখ সহ রোপণ থেকে এদের বৃক্ষ হয়ে ওঠার ইতিহাস বলে যান তিনি। কোন গাছের প্রকৃতি কেমন তাও বলে যান অবলীলয়া।

শোনারা গাছের সামনে আসতেই হৈমবতী বলেন, জানো পাঞ্চালী, এই গাছের ডালে এসে দ্রোণ কবিতা লেখে।

নিবারণ বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ও জানে....

পাঞ্চালী অবাক চোখে তাকায়। ফর্সা মুখে একটু রক্তিমভা লাগে।

কি? জানো না?

মেয়েটি সশ্রুতিসূচক মাথা নাড়ে। হ্যাঁ জানি।

হেমবতী অবাক হন। কী করে জানল?

হৈম, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না।

যদি ঢোকবার আগেই যে ছোটবাবু ওকে নিয়ে বাগানে গিয়েছিল, তা তো আর হৈম দেখেনি।

ও গুলেছি, দ্রোণ তোমায় পেয়ারা গাছের গল্প করেছে।

মেয়েটিও বাগান ভ্রমণে আসে। ও আগে তেজপাতা গাছ দেখেনি। গাছটি খুঁটিয়ে দেখে গম্ভীর। বেলগাছের সায়কটে এসে নিবারণ বলেন, দ্যাখো বাপু আমি নেড়া নই সেজন্য আমি রোজ এট বেলতলায় আসি। বড় স্বাদু আমাদের বেল। খাবে নাকি?

পাঞ্চালী মুদ্র চাশ। চলুদ হয়ে আসা একটি নিখুঁত গোলাকৃতি বেল লক্ষ করে নিবারণ বলেন, দোপা ওটটা লেগে আন তো।

দ্রোণ একটা আঁকশ নিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে বেল পেড়ে নেয়। বেল ফাটিয়ে পাঞ্চালীর হাতে তার অর্ধেকটি তুলে দেন নিবারণ। ফাটানো বেলের খোলার একটি ছোট খাটো টুকরোও দেন ওর হাতে। এইটাকে চামচের মতো ব্যবহার করো। দেখবে এই টুকরো দিয়ে কুরে কুরে বেল খাবার কী মজা।

খাবার পদ্ধতিটা রপ্ত করে নেয় পাঞ্চালী। মেয়েটিকে সহজ লাগে নিবারণের। যেন ঘরেরই মেয়ে। হৈমবতীর মুখ দেখেও বোঝা যায় ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে বেশ একটা মনে রাখার মতো কিছু ঘটেছে।

যাবার সময়ে পাঞ্চালী আবার প্রণাম করে নিবারণকে। কী যে এক মছন ঘটে যায় ভেতরে। তিনি দ্রোণের কাঁধে হাত রাখেন। পাঞ্চালীকে বলেন, শোন মা, তুই আমার খুকুমনি, এই পাগলটাকে কখনও ছাড়িস না, ও তোকে খুব ভালোবাসে।

এমন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না পাঞ্চালী। ও মাথা নমিত করে। দ্রোণ বলে, বাবার যত পাগলামো! ও খামোকা ছাড়তে যাবে কেন? আর ছাড়তে চাইলে আমিই বা ছাড়ব কেন? বলো?

দ্রোণ পাঞ্চালীর দিকে তাকায়। নিবারণ বোঝেন মেয়েটির অপ্রস্তুত ভাব কাটাবার চেষ্টা করছে ছোটব্যাটা।

হৈমবতীকে প্রণাম সেরে পাঞ্চালী বেরিয়ে যায়। দ্রোণ ওর সঙ্গে গায় গায়গয়ে দেগার জন্য।

প্রথম আলাপের পর পাঞ্চালী নিয়মিত আশ্রমগরার বাড়িতে। নিবারণ ওকে ব্যাগভর্তি তেজপাতা দেন। কখনও পেয়ারা কিংবা বেল। মেয়েটি আনন্দ করে নিয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন আসবেই পাঞ্চালী। ও এলে হৈমবতীও খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠেন। দ্রোণ চাকরি করে না, নাহলে এখনই ওদের বিবাহ সংঘটিত করে ফেলা যেত। মেয়েটি অবশ্য বি.এ. পড়ছে। পাশ করে ও যদি চাকরি পায়, তাহলেও বিয়ে সম্ভব। এমনটাও ভেবে রেখেছেন নিবারণ। মেয়েটির অপরূপ শ্রীময়ী ভাব আছে। এ শুধু শারীরিক রূপে আসে না, তার সঙ্গে কথাবার্তা, মনোভঙ্গিও সুন্দর হতে হয়।

পাঞ্চালীর আসবার পর থেকেই মগরার বাড়িতে চড়াইপাখির আগমন বেড়ে গেছে। নিবারণ লক্ষ করেন। ডায়েরি পাতায় লেখেন, ইতিপূর্বে আমাদের বাড়িতে চড়াইপাখি আসত না। কচিৎ কখনও এলে দু'টার বেশি আসে নাই। আজ মাসাবধি বেশ কিছু চড়াই আসা যাওয়া করছে। প্রবাদ আছে লক্ষ্মীর শ্রী না থাকলে চড়াই আসে না। তবে আমাদের সংসারে শ্রীময়ী এ'ল?

ডায়েরিতে লিখেও মন শান্ত হয় না নিবারণের। জারুল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করেই নিবারণ দিতে থাকেন চড়াইয়ের আগমনী বার্তা। জারুল গাছের পাতা নড়ে ও কি হাসছে? নিবারণ কষ্ট পান।

— এমনভাবে ব্যঙ্গ করো না....সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের গাড় তমিস্রার মধ্যে এমন ছোটখাটো আশার আলোচিহ্ন আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে....বেঁচে থাকে আগামীর দিকে তাকিয়ে....বল, জারুল গাছ বল?

ঘরের দিকে ফিরে নিবারণ দেখতে পান একটি-দুটি করে মোট ছটি চড়াই পাখি।

এরা খুশি করে কুটো 'আনছে। খুলখুলিতে রাখছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। আবার আসছে।
নিদানশ মুখ হয়ে দেখতে থাকেন চড়াইপাখি। চড়াইপাখির আসা-যাওয়া।



খুলখুলিয়ে খোঁক কলেজ অনেকটাই আপাদা রকমের। স্কুল যদি কলেজ স্কোয়ারের
জলে লিকাকাটা সত্যিকার লাল 'নভিস' টুপি মাথায় হাত-পা ছোঁড়া, তো কলেজ কাশী মিত্র
খাটি খোঁক সাততের গালা পানাপান। খুলখুলিয়ে যদি ডিমের কুসুমের শান্ত-শৃঙ্খলা, কলেজের
দলজায়া সা গাথলেই অনুভব করা যায় সদ্য জন্মানো মুরগি ছানার চাপল্য।

খুলে মতো নিয়মকানুনের অত কড়াকড়ি নেই কলেজে। তার ওপর বঙ্গবাসী কলেজ
তো পাড়ার কলেজ! খুলে পড়ার সময় থেকেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি চৌকাঠ
চিনে গেছে নিরুপম। অজানা অচেনা জায়গায় যাবার মধ্যে যে সংকোচ কাজ করে, এখানে
তা নেই। সব মিলিয়ে কলেজ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য অনেক। নিজের মতো থাকা যায়। নিজস্ব
মত জোর গলায় ঘোষণা করা যায়। আর এক মন্তব্যবিধে ইচ্ছে মতন ক্লাস কামাই
করা যায়। এবার সেই করা ছুটির আবেদনপত্র জমা দিতে হয় না। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে
কলেজে কোমিউ অনার্স নিয়ে পড়তে চুকে নিজেকে বেশ সাবালক লাগে নিরুপমের।

কলেজের শেষে নিরুপম চলে যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রেসিডেন্সির মাঠ কলেজ
জাদুঘর মিলনক্ষেত্র। বিকলবেলায় এখানে সুরেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-সেন্টপল্‌স-স্কটিশচার্চ
ইত্যাদি কলকাতার বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা আসে। উত্তরপাড়ার প্যারিমোহন কলেজ,
দক্ষিণ মোহনাকাল কলেজ থেকেও আসে ছেলের দল। প্রেসিডেন্সির কিছু ছাত্রীও দেখা
মেলো এটিখানে।

কলেজের মাঠে নতুন খবরের ছড়াছড়ি। কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন
ইউনিটগুলি মিলিত হয়ে বেশ একটা নতুন রকমের সিদ্ধান্ত নিয়েছে! দেশে এখন বৈপ্লবিক
পরিণতি। এ সময় শুধু ক্যান্টিন সংস্কারের আন্দোলন আর নয়। কৃষি বিপ্লবের সাফল্যের
জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবে। প্রচার চালাবে
কৃষিবিপ্লবের পক্ষে। মিলিত সভায় দাবি উঠেছে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ
বৈতর্কিত ঘোষণা করবার। খাদ্য-শিক্ষা-চাকরির দাবির ভিত্তিতে, বন্দিমুক্তি ও গণতান্ত্রিক
অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে কলেজে-এলাকায়-জেলায় আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান
জানানো হয়েছে জ্যেষ্ঠদের। ছাত্রফৌজ পত্রিকা এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের খবরাখবর ছাত্র
সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবে। সংবাদপত্রে বের হবার আগেই প্রেসিডেন্সির মাঠে বসে
নিরুপম এটি খবর পেয়ে গেছে।

শুধু এলাকার না দেশের খবর নয়, বিদেশের খবরও আমদানি হয় কলেজের মাঠে।
ন্যাটোজারিয়া থেকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে পড়তে আসা দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক — ক্রিস্টোফার
আর ডোনাল্ড বিদেশের জাতি আন্দোলনের খবর রাখে। ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রবেশদ্বারে ছাত্ররা পোস্টার মেরেছে — এই ভোগী সমাজের মৃত্যু ঘটবেই আমরা একটা নতুন পৃথিবীর গোড়াপত্তন করছি ... কল্পনা মানেই হ'ল ক্ষমতা দখল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশে ছাত্ররা টাঙিয়েছে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের মুখ আঁকা লাল পতাকা। মাও সে-তুঙের ছবি। প্যারিসের রাস্তায় ছাত্ররা লড়ছে পুলিশের মুখোমুখি। ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছে সমগ্র ইউরোপে। ছড়িয়ে পড়েছে জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বার্কলি থেকে লন্ডন, নিউইয়র্ক থেকে প্রাহা কোনো শহর বাদ পড়েনি। এই বাংলার লড়াই ছাত্রনেতা অসীম চ্যাটার্জী, শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রেসিডেন্সির মাঠে বসেই রুড়ি দুচকে, দ্যানিয়েল কোঁ বেডিট, তারিক আলি এইসব বিদেশী ছাত্রনেতাদের নামও শুনতে পায় নিরুপম।

সংবাদপত্রে বের হয় না এমন খবরও পাওয়া যায় আড্ডা চক্রে। চারু মজুমদার যাদের পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন সেই কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার প্রমুখ চারজন গোপনে চিন ঘুরে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে মাও সে-তুঙের দেখা হয়েছে। মাও সে-তুঙ বলেছেন, আমরা তোমাদের নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করি। বলেছেন, দেশে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে। কিছুকাল আগে চারু মজুমদারের শরীর খুবই খারাপ হয়েছিল এখন ক্রমশ ভালো হয়ে উঠছেন। সদা উত্তরবঙ্গ ঘুরে আসা প্রেসিডেন্সির থার্ড ইয়ারের দীপঙ্করদাস মুখে পাওয়া গেল এটি গোপন খবর।

খবর শোনার কিছুকালের মধ্যে 'দেশব্রতী'তে প্রকাশ হ'ল চারু মজুমদারের এচনা যুব ও ছাত্র সমাজের প্রতি। ছোট্ট লেখাটি এক সপ্তাহের মধ্যে পড়ে ফেলে গেল নিরুপম। চারু মজুমদারের কথা খুব সহজে বোঝা যায় — সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন সমস্ত মুক্তি সংগ্রামের শত্রু। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাই এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ছাত্রযুবদের চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধৃতি অনুশীলন করতে হবে। এবং তা প্রচার করতে হবে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে।

কোটেশনস্ অফ চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ কীভাবে পাওয়া যায়? মাঠের আড্ডায় এক দাদাকে বলাতে ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাতে এসে গেল 'সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি'। লাল রেজিন জ্যাকেটে মোড়া, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা - সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া এই বইটি প্রকাশ করেছে 'বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮। চীনা জনগণের প্রজাতন্ত্রে মুদ্রিত।' বইটিকে চলতি কথায় রেডবুক বলে সবাই। মুখে মুখে স্লোগান তৈরি হয়ে গেছে — রেডবুক, রাইফেল দেশে দেশে মুক্তি আনছে, আনবে। নিরুপম ভালো করে উল্টে-পাল্টে দেখল পুস্তিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠা। নামপত্রের পরেই মাও সে-তুঙের সাদা কালো ছবি। তিনশো ষাট পাতার পকেট বইটিতে তেরিশটি অধ্যায়। তিরিশ নম্বর অধ্যায়ের শিরোনাম 'যুবক'। নিরুপম মৃদুস্বরে পড়তে থাকল যুবকদের উদ্দেশ্যে মাও সে-তুঙের কথা — 'পৃথিবী তোমাদের এবং আমাদেরও; কিন্তু অবশেষে তোমাদেরই। তোমরা যুবক, সজীব ও প্রাণশক্তিভরে উচ্ছল, জীবনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, সকালবেলার আট-নটার সূর্যের মতো। তোমাদের উপরেই আশা রাখি'।

হাতে পাবার পর থেকেই রেডবুকটি নিরুপমের সবসময়ের সঙ্গী। ব্যাগে কিংবা পকেটেই থাকে। মাঝে মাঝেই খুলে পড়ে নেয় বইটি। তাঁর চেহারার মতন, মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতিগুলিও সুন্দর। সহজ অথচ গভীর।

দু'পক্ষের মতোই চেয়ারম্যানের অনেকগুলি উদ্ধৃতি মুখস্থ হয়ে গেল নিরুপমের। রেডবুক তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এখন সে নিজের কথা বলতে গিয়ে অনায়াসে মাও সে-তুও উদ্ধৃতি করতে পারে। কলেজের বিতর্কসভায় উদ্ধৃতি সহযোগে বক্তব্য রাখতে পারলে তা বেশ জোরদার হয়। শ্রোতারা অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। সে সময় একটু গর্বও হয় নিরুপমের।

প্রেসিডেন্সির মাঠেই খবর এল নির্বাচন বয়কটের। অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে। মীপঙ্করদা বিবৃতিটি পড়ে শোনালেন সবাইকে। পাঠের শেষ দিকে খান গালায় আগুন এসে গেল 'মহান চীনা বিপ্লবের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয় ধ্বংসের এক প্রবলী যুগে এসে গেল; আমরা এখন এক বিরাট বিপ্লবী জোয়ারের মধ্যে রয়েছি। বিশ্বাসঘাতকেরা তেলেঙ্গানার মহান সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কিন্তু আজ দিগন্তে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান ঘটেছে। ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে নকশালবাড়ি। নকশালবাড়ি ভারতে সংসদীয়বাদের কবর রচনা করেছে। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ সংসদীয়বাদের পক্ষে ভুবে ছিলেন। তারা এখন আলো দেখতে পেয়েছেন। তারা এখন বুঝতে পারছেন যে, নকশালবাড়ির পথই তাদের মুক্তির একমাত্র পথ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের দালাল বিশ্বাসঘাতক ডাঙ্গে চক্র খ ন্যাসংশোধনবাদীরা নকশালবাড়ি দেখে সঙ্গতভাবেই ভীত হয়ে উঠেছে। তাই নকশালবাড়ির স্মৃতিস্তম্ভ যাতে দাবানলে পরিণত হতে না পারে, সেইজন্য তারা আজ শাপলশক্তিগে নির্বাচন ফিরি করছে। অতএব কমরেডস, আমাদের আহ্বান, নির্বাচন মূলাবাদ।'

দুদিন পরেই সম্পূর্ণ বিবৃতিটি দেশব্যপী ছাপা হল। যদিও রাজ্যে এখনও রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু মাঝে মধ্যেই নির্বাচনের খবর শোনা যায়। সি পি এম-এর অফিশিয়াল গ্রুপের নেতারা আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসীদের পরাস্ত করবার হুমকি দেন।

বিবৃতিটি ছাপা হতেই কলেজে-কলেজে শুরু হয়ে গেল নির্বাচন বয়কট প্রসঙ্গে যুক্তি-তর্ক, চাপানউতোর। নির্বাচনের গতানুগতিকতায় সবাই অভ্যস্ত। এর বিরুদ্ধে যাবার কথাটা একেবারে নতুন। নতুন কথা বুঝতে এবং বোঝাতে সময় লাগে। নিরুপমের কলেজের দুই সহপাঠী কল্যাণ আর অঞ্জন দুজনেই অফিসিয়াল গ্রুপের সমর্থক। নির্বাচনের ওপর ওদের ঘোর আস্থা। ওরাও দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব চায়, তবে তার আগে নির্বাচনে নেমে জনগণের চেতনার স্তর বুঝতে হবে, তারপর সেই চেতনাকে উন্নত করতে হবে।

ভিন্ন মতাবলম্বীকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে স্বমতে আনবার একটা নেশা আছে। বোঝাবার প্রসঙ্গে সুকান্তিদাস কথা মনে পড়ে। প্রেসিডেন্সির মাঠে আড্ডা মারলেও সুকান্তিদার বাড়ি গাণার পুরনো অডোয়াসটি বজায় রেখেছে নিরুপম। শুক্রবার দুপুরবেলা সুকান্তিদার সঙ্গে কথা বলার পক্ষে আদর্শ। ওইদিন একটার পর সুকান্তিদার অফ পিরিয়ড। দেড়টার মধ্যে উনি বাড়ি চলে আসেন। আড়াইটার সময় গেলে দেখা যাবে উনি বারান্দায় বসে বই পড়ছেন।

দুই সপ্তাহীকে নিয়ে শুক্রবার দুপুরবেলায় নিরুপম চলে গেল সুকান্তিদার বাড়ি।

আচেনা দু'জনাতে দেখে সুকান্তিদার চোখে বিস্ময়। কৌতুকও মিশলো। অঞ্জনের হাতে

ধরা লিফলেটের বাউন্ডলের দিকে একবার তাকালেন। নিরুপমকে বললেন, কী ব্যাপার?
সদলবলে বিপ্লব করতে বেরিয়েছ বুঝি?

নিরুপম হাসল।

— না, না ওটা তো কয়েকদিন পরে, আপাতত এই দু'জনকে বিপ্লবের পক্ষে টানবার
লড়াই চলছে।

কল্যাণ-অঞ্জনের সঙ্গে সুকান্তিদার পরিচয় করিয়ে দিল নিরুপম।

— সুকান্তিদা, এরা দুজনেই অফিশিয়াল গ্রুপ..... মানে নির্বাচন বয়কটের বিরুদ্ধে।

— ও আচ্ছা।

সুকান্তিদার মুখে স্মিত হাসি।

— ভালো তো, খুব ভালো। যত ভিন্নমতের সঙ্গে তর্ক হবে, তত তোমার নিজস্ব
যুক্তিগুলোকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারবে।

সুকান্তিদা নির্বাচন বয়কট নিয়ে কিছু বললেন না। শুধু বললেন, সি পি এম-এর
অফিশিয়াল গ্রুপটি বড় অদ্ভুত।

কল্যাণ তৎক্ষণাৎ বলল, কেন? অদ্ভুত কেন?

ওর কথায় অনেকটা রাগ এবং কিছুটা শ্লেষ ছিল। সুকান্তিদা গায়ে মাখলেন না।

— যারা একে জায়গায় একেকরকম কথা বলে তারা অদ্ভুত নয়?

অফিশিয়াল গ্রুপের দ্বিচারিতার কথা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন সুকান্তি। নানান প্রসঙ্গ
টেনে উদাহরণ দেবার পর চলে এলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না বা সিপিসি সম্পর্কে
সি পি আই(এম) নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা।

সাতষট্টির আগস্ট মাসে নেওয়া একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে সি পি এম, সিপিসি'র বিরুদ্ধে
এই বলে অভিযোগ করেছিল যে আমরা আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বৃদ্ধি ও
বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজ করেছেন। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত উগ্রপন্থীদের প্রশংসা করে
চিনের কমরেডরা বলছেন যে, তারাই আমাদের পার্টির প্রকৃত বিপ্লবী এবং এইভাবে তাঁরা
আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এই উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপকে সমর্থন করছেন। সি পি এম কেন্দ্রীয়
কমিটি আরো লিখেছে — 'এই অত্যন্ত সংকটময়, যুগসন্ধিক্ষণে পার্টির বিরুদ্ধে বিপজ্জনক
আঘাত এসেছে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে।'

মজার ব্যাপার, ওই একই প্রস্তাবে আবার লেখা হয়েছে, 'বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে
এবং শান্তি-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে চিনবিপ্লবের মহান
এবং ঐতিহাসিক অবদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর ব্যর্থ
হওয়া উচিত নয়। ওরা এও লিখেছে, আধুনিক সংশোধনবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
করে, আধুনিক সংশোধনবাদের বিপদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়ে এবং মার্কসবাদ-
লেনিনবাদের পতাকাকে উর্ধ্ব তুলে ধরে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে
সিপিসি যে শক্তিশালী সাহায্য করেছে তা দুনিয়ার প্রত্যেকটি কমিউনিস্টই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে
স্বীকার না করে পারবে না।'

কল্যাণ-অঞ্জনের দুজনেই একটু থতমত খেয়ে গেল। নিরুপম মজা পাচ্ছে।

অঞ্জনের বলল, আমরা যদি কাউকে হঠকারী আন্দোলনের পক্ষে থাকবার অপরাধে পার্টি

থেকে নাকি কান, তাতে চিনের পার্টির মাথাব্যথা কেন?

সুকান্তিন্দা অতীত ঠান্ডা মাথার মানুষ। তিনি অজ্ঞানের দিকে স্থির চোখে তাকালেন।
কারণ, তোমরা যাকে হঠকারী বলছ, সেই নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে ওঁরা
তা মনে করেন না....ওঁরা তো বলেছেন, এ হ'ল ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ।
.....সত্যি বলতে কী সি পি এম-এর উচ্চস্তরের অন্তত দু'জন নেতা এই আন্দোলনকে
সমর্থন করেছিলেন।

কল্যাণ অজ্ঞান নিকলম তিনজনেই অবাক।

তাই নাকি?

ওঁ! গো।

জানা গেল, সি পি এম নেতৃত্ব যখন অভিযোগপত্র দিয়ে বা না-দিয়ে দল থেকে
নকশালবাড়ির সমর্থকদের বহিষ্কার করছিল, তখন সি পি এম-এর পলিটব্যুরোর সদস্য
এ কে গোপালন এবং সারা ভারত কৃষকসভার সভাপতি জগজিৎ সিং লয়ালপুরী এক
মুক্ত বিবৃতিতে 'সাহসের সঙ্গে কৃষকদের জমির জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করুন' বলে
কৃষকসভার সমস্ত শাখার কাছে আবেদন করেছিলেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা বলেছিলেন,
কেন্দ্রের কংগ্রেসী শাসকরা, স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ এবং সি এস পি নেতৃত্ব নকশালবাড়ির
এই সংগ্রামকে 'হঠকারী' রাজনৈতিক সংগ্রাম বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত
করার চেষ্টা করছে। এবং এইভাবে তারা জোতদার-জমিদারদের সাহায্য করেছে ও কৃষকদের
নাশা সংগ্রামকে উৎপীড়নের সাহায্যে দমন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

অজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে সুকান্তি বললেন, এ সব কথা তোমাদের মুখপত্র 'গণশক্তি'-
তেই পেরিয়েছিল, দেখে নিও।

লেনিনের কথা পাড়লেন সুকান্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, তারপর কমিউনিস্টদের
আন্তর্জাতিক সংগঠন, সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ভেঙে যাবার সময়ে লেনিন বলেছিলেন, যখন
কতকগুলো বাহিনী শত্রুপক্ষে চলে গেছে তখন তাদের নাম উল্লেখ করে বিশ্বাসঘাতক
হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

— মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক এই কাজটাই করেছে....
ওরা স্পষ্টস্পষ্টি ভাস্কের সি পি আই আর সি পি এম-এর সংশোধনবাদী পান্ডাদের
সমালোচনা করেছে।

অজ্ঞানের হাত থেকে কয়েকটি লিফলেট পড়ে গেল। সুকান্তিদা মাটির দিকে আঙুল
দেখালেন।

কীসের লিফলেট গো?

অজ্ঞান বলল, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কিছু দাবির বিষয়....শুনবেন নাকি?

নিশ্চয়, শোনাও না।

অজ্ঞান নড়তে লাগল। ...হ্যাঁটাই, বরখাস্ত, সরকারী বেসরকারী সকল স্তরে চলছে। চাকুরির
সিরাপত্তা বিল। সভাসমিতি, বিক্ষোভের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গ্রাম-
গ্রামান্তরে খাদ্যের জন্য গুরু হয়েছে হাহাকার। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক বহু কর্মী
কিনাশিচারে জেলে এখনও আটক, রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। কংগ্রেসী

রাজ্যপাল ধরমবীর পশ্চিমবাংলার জনজীবনে ডেকে এনেছেন এক গভীর সংকট। এই সংকট অবসানের জন্য চাই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। ...

সুকান্তিদা হাত তুলে থামতে বললেন।

— ব্যস্ ব্যস্! সি পি এম নেতৃত্বকে বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্টকী অপূর্ব বিধান...দারিদ্র্য, বেকারি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ইত্যাদির কোনো আর্থসামাজিক কারণ নেই, সমাজ পাল্টাবার দরকার নেই, শুধু আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসীদের হটাৎ তাহলেই সব দুঃখ ব্যাধির অবসান।

সুকান্তিদার গলায় তীব্র শ্লেষ।

— নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর এতটা ভরসা করছে কারা? না, একটা কমিউনিস্ট পার্টি! যারা সমাজ বদলের জন্য বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলবে, তারা করছে এমন ভুল কাজ! এইবার নিরুপম জোর পেয়ে গেল।

— এ শুধু ভুল নয়, সুকান্তিদা এ মিথ্যাচার..... ওরা ভালোই জানে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলি দূর না করলে এইসব সমস্যার সমাধান হবে না, তবু ওরা বোঝাতে চাইছে বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে..... কেন্দ্রে যতদিন কংগ্রেস সরকার আছে একটু অসুবিধা হবে.....কেন্দ্র দখল করতে পারলে আর ভাবনা নেই.....নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর একটা মোহ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে ওরা।

কল্যাণ বলল, লেনিনের পার্টি তো শুনেছি রাশিয়ার পার্লামেন্ট ডুমা-তে যোগ দিয়েছিল। সুকান্তিদার দিকে তাকাল অজ্ঞান। কী দেখছে?

— হ্যাঁ দিয়েছিল তো.....কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ ঘটনাটা বলো না।

কল্যাণ চুপ করে গেল। অন্যের কথা শুনে কথা বলার এই সমস্যা — শোনা কথায় বেশি এগোন যায় না।

ওকে কোনো খোঁচা দিলেন না সুকান্তিদা। বলতে শুরু করলেন ইতিহাসের কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি তখন জার সরকার এই ডুমা ঘোষণা করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করল। রাশিয়ার মার্কসবাদীদের তখন দুটো গ্রুপ — বলশেভিক আর মেনশেভিক। বলশেভিকদের নেতা ছিলেন লেনিন। ডুমা ভাঙার কৌশল নিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের মতবিরোধ হয়। কিন্তু কল্যাণবাবু, লেনিন ডুমা বয়কটও করেছিলেন.....সেই বসন্তকালে নির্বাচনী অভিযানের গোটা ভিত্তিটাই ছিল সাংবিধানিক মোহবিস্তার যার বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই করার প্রয়োজন হয়েছিল।

লেনিন উদ্ধৃত করলেন সুকান্তি। তখন ডুমার গুরুত্বকে অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছিল; সেজন্যই এই মোহকে রুখবার একমাত্র উপায় ছিল বয়কট। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সার কথাটি হ'ল এ কয়েকবছর অন্তর ঠিক করে শাসকশ্রেণীর কোন সদস্যটি জনসাধারণকে নির্যাতন করবার, শোষণ করবার অধিকার পাবে। এই বুর্জোয়া নির্বাচনে সর্বহারারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক তারপরে তারা এভাবেই ক্ষমতা দখল করবে — একথা যারা বলে তারা হয় বজ্জাত নয় মুখ। এ সবই লেনিনের কথা।

কল্যাণ, অঞ্জন, নিরুপম তিনজনের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকালেন সুকান্তিদা।

ওখানেকার প্রেক্ষাপট আলাদা, মানুষজন আলাদা, ওই ডুমা বয়কট করা ঠিক হয়েছিল কী না তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু এর থেকে আন্দোলনের একটি নীতি তো বোঝায়ে আসছে, তা হ'ল — সংসদের ওপর মোহ সৃষ্টি করলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

অঞ্জন গলল, আমরায় পার্লামেন্টের অসারতা বুঝি কিন্তু নির্বাচনে যোগ দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চাই যে পার্লামেন্টের মাধ্যমে আসল সমস্যার সমাধান হবে না।

নাহ এটা তো নতুন কথা, তোমাদের নেতারা আজকাল এইসব বলছেন নাকি? সুকান্তিদা জোরে হেসে উঠলেন। খুব ভালো কথা, কিন্তু তাহলে চিনের জনযুদ্ধের তত্ত্বের বিরোধিতা কেন করেছে নেতারা?

জানো গেল, কয়েকমাস আগে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সি পি আই(এম) সর্বভারতীয় প্লেনামের গল্প। বর্ধমানেই সেই সভায় অফিশিয়াল গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনের পথে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবার। ওদের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অনেকাংশেই সংশোধনবাদী পন্থা নিয়েছে আবার চিনের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীও সংকীর্ণ। দলের অন্ধপ্রদেশের সদস্যরা চিনের মতো অন্যতর করে সমাজ বদলাবার কথা বলেছিল। সে তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অন্ধের সদস্যরা সভাত্যাগ করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিরাও সরকারী প্রত্যাখ্যানের বিরোধিতা করেছেন।

সশস্ত্র লড়াই থেকে সরে এসে এই সংসদীয় রাজনীতির আবর্ত বেছে নেবার পথ অনেককেই পছন্দ করেননি। বিভিন্ন রাজ্য থেকে হয় বিপ্লববাহীরা অফিশিয়াল গ্রুপ থেকে বোঝায়ে আসছেন, না হলে তাঁদের বুদ্ধির করা হচ্ছে। দলের সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরামের হিমানীমতো নটি রাজ্য থেকে মোট তেরো হাজার তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য সি পি আই(এম) ছেড়ে গেছেন। সব থেকে মজা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে, সেখানে আটশো সদস্যের সবাই দল ছেড়েছেন।

কোনও উত্তর দিতে পারল না কল্যাণ, অঞ্জন। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। সুকান্তিদা প্রসঙ্গ পাল্টালেন।

ভালো কথা, তোমরা 'তীর' দেখেছো?

নিরুপম মাথা নাড়লো। না, দেখা হয়নি।

সে কী! দেখিনি? সবাই মিলে দেখে এসো মঞ্চের উপর দেখতে পাবে নকশালবাড়ির কৃষকদের লড়াই!

তীর সম্পর্কে অনেক শুনেছে নিরুপম। উৎপল দত্তের লেখা এই নাটকটি লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ামিত মঞ্চস্থ করছে মিনার্ভা থিয়েটারে। ইতিমধ্যে একশোটির বেশি অভিনয় হয়ে গেছে। গানো দেখেছে, প্রত্যেকেই ভালো বলেছে। কিন্তু নিরুপমের মনে একটু বাধা আছে। যে উৎপল দত্তকে সে এত শ্রদ্ধা করত তিনি গ্রেপ্তার হবার পর কেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা লা করার মুচলেকা দিয়ে মুক্তি নিলেন? কেন চলে গেলেন বোম্বাই শহরে 'দি গুরু' ছবির নটিং করতে? গানও লিটল থিয়েটার গ্রুপ উৎপলবাবুর মুচলেকা দেওয়াকে খিকার জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে দেশবাসীতে কিন্তু নিরুপমের অভিমান কমেনি।

— না সুকান্তিদা, আমি ওই নাটক দেখবো না, বলে নিরুপম।

— কেন? কী হল? উৎপলের ওপর রাগ করেছ নাকি?

নিরুপম সরাসরি বলল না কারণটি।

— আপনার মনে আছে, এই জ্বলোক কবিতা লিখেছিলেন....শাহেনশা তোমার পুরস্কার তোমার থাক

সুকান্তি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ দীর্ঘ কবিতা....অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে উৎপল লিখেছিলেন এইটি। মুখস্থ আছে তোমার? বলো। নিরুপম আবৃত্তি করে।

পুরস্কার দিতে চেয়ে করেছ যে অপমান

কী জবাব তার দেব, শক্তিমান?

অকস্মাৎ এক শারদ প্রভাতে

বাদশার নেকনজরে উদ্ভাসিত প্রাতে

মুটে-মজুরের কবির অপ্রশস্ত ঘর

লাভ ক'রে তোমার করুণা-বর

হবে ধন্য, আনন্দে দিশেহারা,

এই কি ভেবেছিলে?.....

.....

যে হাতে তুমি দিতে এলে পুরস্কার

সচকিত তাকিয়ে দেখি—

কৃষ্ণগরের রক্তের ফোঁটা তাতে রয়েছে এখনো,

ফোঁটা ফোঁটা গভীরে মেজেয়

নুরুল নামে আমার একটি

ছোট্ট ভায়ের খুন।

মাঝপথে হঠাৎ থেমে যায় নিরুপম।

— এই মানুষ কী করে দাসখত লিখে দেয়, সুকান্তিদা?

সুকান্তি হেসে ওঠেন। বুঝলাম কেন 'তীর' দেখতে চাইছ না। আরে উৎপলও তো এমন অভিমান করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। কবিতাটা পুরো মনে আছে যখন ওই লাইনগুলোকেও মর্যাদা দাও!

এইবার সুকান্তি আবৃত্তি করেন।

আজ তোমার কবিতার মান রাখতে গিয়ে

তোমার সঙ্গেই কি হয়ে যাবে এক হাত?

বেশি ঘাঁটিও না আমায়, রাজার দল,

পুরাতন সুভাষ মুখুয্যে আমার হাতিয়ার।

মানুষ তো পাল্টে যায়। বিপ্লবের কবি, 'পদাতিক'-এর রচয়িতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তো বদলে গেছেন।

— নিরুপম তুমিও বরং উৎপলের মতন বলো, পুরাতন উৎপল দত্ত আমার হাতিয়ার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকপম চুপ করে থাকে।

আরে বাবা, তুমি তো উৎপলের সঙ্গে দলের কাজ করতে যাচ্ছ না ওঁর নাটক দেখতে যাচ্ছ,....কাজ দেখে বিচার করো, ভালো না খারাপ।

সুকাণ্ডদার কথা শুনে জমাট অভিমান অনেকটাই গলে গেল। কল্যাণ-অঞ্জনও নাটকটি দেখতে গাফি। পাওয়া গেল চিরস্তনকেও। তিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবার বিকেলবেলায় নিকপম লৌড়ে গেল মিনার্ডা থিয়েটারে।

দেখতে দেখতে নিকপমের দম আটকে আসছিল। সত্যের কী নিপুণ তীর বর্ণনা। অত্যাচারের দৃশ্যগুলি মর্মভেদ করে যাচ্ছে। ঠিক তখনই হঠাৎ তীর ছুটে এসে বিধে যায় অত্যাচারীর পিঠে। অত্যাচারীদের ঘিরে ধরেছে বিপ্লবী কৃষকরা। ছুটে আসে আরও তীর। অত্যাচারীদের গায়ে বেঁধে। সার্চ লাইট চুরমার হয়ে যায়। এইবার অত্যাচারীর বিচার হবে।

নিকপম চিরস্তন আসন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। চিরস্তন বলে, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। নিকপম চিৎকার করে, মার, মার, মার শালাকে.....মার শালাকে। মার মার...মার মার..। এলোওঁই থাকে নিকপম।



পঞ্চমবার দেখার পর মুগ্ধতার ঘোরে আরও চারবার 'তীর' দেখে ফেলল নিকপম। পঞ্চমবারে নাটকের অনেক টুকটাকি মনে পড়ে গেল। 'উপাসু' চরিত্রের সংলাপ ধার করে কথাবার্তা চালু হয়ে গেল কফি হাউসের আড্ডায়।

পাঁচবার একেলগেলায় কফি হাউসের আড্ডায় খবর আনল চিরস্তন। পনেরোই আগস্ট রাজনৈতিক দলদের মৃত্যুর দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হবে উত্তর কলকাতায়। উদ্যোক্তা কলকাতা জেলা কো অর্ডিনেশন। নিকপম বলল, বাঃ! ব্যাপারটি বেশ ইরিং বিরিং ...। চিরস্তন বলল, ইয়ার্কি নয়, ঠিক মতো লোক জড়ো করতে হবে....

কথার মাঝে অঞ্জন এল। ওকেও মিছিলে নিয়ে যেতে হবে। চিরস্তন ডাকল, আয় অঞ্জন, আয়, আয়। তড়িঘড়ি চলতে গিয়ে চেয়ার উল্টে ফেলল অঞ্জন।

চেয়ারটি সোজা করতে করতে চিরস্তন বলল, কেমন অভদ্র চেয়ার, সোজা হয়ে বসতেই আনো না.....

নিকপম ভাল দিল। ঠিক কথা.....ভদ্রজনোচিত ব্যক্তির যে ফটকচংখা থাকে, তাতে এমন আসন পেলে চোংবোং হয়ে যাওয়ার উপক্রম—

চিরস্তন হাসল। এই ব্যক্তি যে কিছু ওধোং বোধোং এটা স্পষ্ট কিন্তু সেজন্য চেয়ারের এমন চক্রান্তমূলক আচরণ খুবই আবাডাংখা ব্যাপার—

অত্যাচার সবটাই হোসে উঠল। হাসল অঞ্জনও। মিছিলে যেতে রাজি হয়ে গেল সে।

দেশবন্ধু পার্ক থেকে মিছিল শুরু বেলা তিনটোয়। প্রথমে কয়েকবার ইনকিলাব জিলাদার। তারপরে মোগান উঠল, দেশ আভি তনু ভুখা হায়া, ইয়ে আজাদি গুটা হায়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসকশ্রেণীর দুইটি ফ্রন্ট, কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট। সাম্রাজ্যবাদের দুইটি ফ্রন্ট, কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট।

মিছিলের সামনে কলকাতা জেলা কোঅর্ডিনেশন কমিটির বিরাট ফেস্টুন। মিছিলের অনেকের হাতেই লাল ঝাণ্ডা।

আর জি কর রোড ঘুরে, শ্যামবাজার পেরিয়ে বি টি রোডে ঢুকতেই মিছিলে স্লোগান উঠল নকশালবাড়ির। মানুষ যদি বাঁচতে চাও নকশালবাড়ির পথ নাও। নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দাও। ভোট ভোট করে কারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা। নকশালবাড়ি দিচ্ছে ডাক, ভোটের বাস্তব চূলোয় যাক।

চিড়িয়া মোড় ঘুরে দমদম লেভেল ক্রসিং-এর কাছাকাছি এলে স্লোগান উঠল, বিশ্বজুড়ে দিচ্ছে নাড়া মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা।

ঘুঘুডাঙ্গার কাছে বেলঘরিয়া, সোদপুর, দমদম, শ্যামনগরের কর্মীরা মিছিলে এসে যোগ দিলেন।

মিছিলে হাঁটার বেশ মজা। চারপাশের মানুষ তাকিয়ে থাকে। বেশ গর্ব হয়। হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান দেওয়াও রপ্ত করে নিল নিরুপম। অনেকটা দম নিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁক পাড়ল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। সঙ্গীরা প্রত্যুত্তর করল, লাল সেলাম, লাল সেলাম।

দমদম জেলগেটের সামনে মিছিল পৌঁছল সন্ধ্যা পাঁচটায়। আওয়াজ উঠলো কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফেল, কর রে লোকসন। জেলের ভেতর থেকে ভেসে এল কয়েকজন বন্দির স্লোগান। সঙ্গী হলোও ওই পাওয়া যাচ্ছিল বাইরে থেকে। — ব্যালট বাস্তব পুড়িয়ে ফেলো, নকশালবাড়ি গড়ে তুলো। চেয়ারম্যান দিচ্ছে ডাক, শোধানবাদ নিপাত যাক।

মিছিলের শেষে সভা। সভার শেষে অভিযান গ্রুপের শিল্পীরা 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইলেন — জাগো জাগো সর্বহারার, অনশনে বন্দী ক্রীতদাস...।

কলেজ চত্বরে মিছিলের গল্প চলল। উদ্বেজনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুঃসংবাদ — কানু সান্যালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন কদমলাল মল্লিক। পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মারা গেছেন বাবুলাল বিশ্বকর্মা। কলেজের দেওয়ালে লেখা হল — লাল ভারতের লাল কমরেড লাল বাবুলাল লাল সেলাম। তার এক মাস যেতে না যেতেই কানু সান্যাল গ্রেপ্তার! তবে কি নকশালবাড়ি শেষ হয়ে গেল? মোটেই নয়, দাদারা বলেছে, নকশালবাড়িতে নিপীড়ন চলছে, কর্মী নেতারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন, ওই জায়গায় আন্দোলন কিছুটা স্তব্ধ ঠিকই কিন্তু এর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। দেশটা এখন বারুদের স্তুপ। একটা নকশালবাড়ি দেশজুড়ে হাজারটা নকশালবাড়ির জন্ম দিয়েছে। এই আন্দোলন এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে গেছে। 'দেশব্রতী'র হিন্দি সংস্করণ 'লোকযুদ্ধ' বেরিয়েছে। 'লোকযুদ্ধ'র মাধ্যমে হিন্দিভাষীরা নকশালবাড়ির খবারখবর পাচ্ছেন। বিহার-উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা ক্রমশ এই পথ বেছে নিচ্ছেন। লোকযুদ্ধ প্রকাশের পর পিকিং রেডিও বিপ্লবী সাংবাদিকতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নকশালবাড়ির সফুল্লিত দেশজুড়ে দাবানল জ্বালবেই।

মিলনজন্য এসেছেন, আন্দোলন চালাতে থাকলে কানু সান্যালকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে মলালন। ফুল বিক্ষোভ দেখানো দরকার।

বিক্ষোভ মিছিলের পরিচালনা করার সময় প্রেসিডেন্সির মাঠে খবর এল, রবার্ট ম্যাকনামারা কলকাতায় আসছেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে এই ম্যাকনামারা মোট ন'বার ভিয়েতনাম গেছে। এরই আমলে আমেরিকান সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাঁচশো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে মাই লাই গ্রামে। একটি শিশুকে গুলি করল এক আমেরিকান সৈন্য। তার গায়ের লাগালো না। তিন-চার ফুট এগিয়ে গেল সৈন্যটি। আবার ছিট। এবারও লাগল না। অন্য সৈন্যরা হেসে উঠল। তখন সেই আমেরিকান সৈন্য শিশুটির আরও কাছে গিয়ে সরাসরি তার মাথায় গুলি চালাল। ছিটকে পড়ল মাই লাই শিশুটির শিশুটি। এমনই আরও নানান গণহত্যা সংঘটিত করেছে আমেরিকানরা।

ম্যাকনামারার শাস্তানির সীমা নেই। এই লোকটির জ্ঞাতসারেই ভিয়েতনামের মেকং নদীর আলপালেশ খন বনাক্ষলে, ব-দ্বীপে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়েছে আমেরিকান সৈন্য। জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকে গেরিলা যোদ্ধারা, অতএব বনাক্ষল নিষ্পত্তি করে দিতে চলে। দগংস করে দিতে হবে ধনক্ষেত। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বিষাক্ত রাসায়নিক জোগান দিয়েছে ডাউ কেমিক্যাল, মনসান্টোর মতো নামী কোম্পানি। ড্রামের ভেতর ওরা জোগান দেয় রাসায়নিক। ড্রামের ভেতর রঙের সংকেত — এজেন্ট এ, এজেন্ট হোয়াইট....। এদের মধ্যে এজেন্ট অরঞ্জ সবচেয়ে মারাত্মক। এতে আছে ডায়াক্সোন মতো বিষ। বিগত পাঁচ-ছ' বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের চব্বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাক্ষলে অটো কোটি লিটার বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়িয়েছে আমেরিকান যুদ্ধ বিমান। তাজার ভিয়েতনামি কৃষক মারা গেছেন, মারা গেছে তেরো হাজার গবাদি পশু। তাজার তাজার শিশু বিকলাস হয়ে গেছে।

জল এফ কে-৬৬ের সময় থেকে ভিয়েতনামকে নিতুনতুন কায়দায় আক্রমণ করার পরিচালনা করে গেছে এই প্রতিরক্ষা সচিব। জে এফ কে-৬৬ পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লিন্ডন বেন জন্সন বা এল বি জে। প্রেসিডেন্ট বদলেছে কিন্তু ম্যাকনামারার মানুষ মানার চক পাস্টায়ান। ওর কসাইগিরির পুরস্কার হিসাবে সম্প্রতি লোকটিকে বানানো হয়েছে বিশ্বনাথের সভাপতি।

এই রবার্ট ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার আন্দোলনে ছাত্ররা সবাই একমত, একজোটি। ঠিক হল বিশেষ নভেম্বর দমদম এয়ারপোর্টের মুখে বিক্ষোভ দেখাবে ছাত্ররা। মাথার দাঁ দিকে সড়ক সিঁথি, চুল পেতে আঁচড়ানো, চশমা পরা আমেরিকানটির ছবি জোগাড় করে নিয়ে এ'ল চিরন্তন। ছবি দেখে হাতে-হাতে আঁকা হয়ে গেল ম্যাকনামারার অনেকগুলি খুঁচ। কৃশপুতলিকা বানিয়ে তার মাথায় লাগানো হ'ল এই মুখের ছবি।

যুদ্ধবাজ ম্যাকনামারার ওখা আমেরিকার ভিয়েতনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে খোদ আমেরিকান জাতি। অতি সম্প্রতি ছাত্ররা যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ তুলে শিকাগো শহরে পুলিশের সঙ্গে ব্যাটলকেড গণনা করে লড়েছে। পুলিশ তাদের ফিরে যেতে বলে লাঠি চালালে জাতিরা স্তোত্র গায়েছে — হেল নো, উই ওন্ট গো। ছাত্ররা পাস্টা ইট পাথর টুডে মেরেছে পুলিশবাহিনীকে। শিকাগোর ছাত্র আন্দোলনের খবর দিয়ে ক্রিস্টোফার

হাততালি দিয়ে উঠল। হে, হে এল বি জে....

ডেনিস গলা ছাড়ল, হাউ মেনি কিড্‌স্‌ হ্যাভ ইয়ু কিল্‌ড্‌ টুডে?

শিশুঘাতী আমেরিকান সরকারকে ওখানকার ছাত্ররা এমনভাবেই ধিক্কার জানাচ্ছে।

নতুন স্লোগানটি প্রেসিডেন্সির মাঠে জড়ো হওয়া ছাত্রদের পছন্দ হয়ে গেল খুব। সবাই গলা মেলালো ক্রিস্টোফার আর ডেনিসের সঙ্গে।

কুড়ি তারিখে আমেরিকান দুর্বৃত্তটিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য সবাই তৈরী।

এয়ারপোর্টের মুখে বিক্ষোভ মিছিল দেখে প্রশাসনের আমলারা সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যাকনামারাকে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে রাজভবনে নিয়ে যাবার। পরের দিন সারা রাজ্যে স্কুল কলেজে ধর্মঘট ডাকল ছাত্রদের মোট পাঁচটি কেন্দ্রীয় সংগঠন। প্রতিবাদী ছাত্রদের মিছিলে ভরে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। উপাচার্যকে ম্যাকনামারার ভোজসভা বয়কট করবার অনুরোধ জানাল ছাত্ররা। শহর জুড়ে দাহ করা হ'ল ম্যাকনামারার কুশপুতলিকা। বিক্ষোভ মিছিলের গতিরোধ করতে গিয়ে দফায় দফায় পুলিশ জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলল ধর্মতলায়, কলেজ স্ট্রিটে।

ধর্মঘটের পরের দিন সকালে প্রেসিডেন্সির মাঠে আসতেই আবার বিক্ষোভ মিছিলের পরিকল্পনার খবর পেল নিরুপম। ধর্মতলায় আমেরিকান সেন্টার অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে ছাত্ররা।

ধর্মতলার দিকে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সবাই। চিরন্তন ছুটে এসে খবর দিল ধর্মতলা নয় যেতে হবে প্রেসিডেন্সি কলেজের অদূরেই কেশব সেন স্ট্রিট আর কেশব সেন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। ওইখানে আমেরিকান সেন্টার 'ইউসিস'-এর যে শাখা আছে, বিক্ষোভ দেখাতে হবে সেই অফিসের সামনে। একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখালে, তা সামলাতে নাজেহাল হয়ে যাবে পুলিশ। ভাল বুদ্ধি!

মাঠ থেকে নিরুপমরা চলে গেল কলেজ গেটে। চিরন্তন আওয়াজ তুলল — তোমার নাম আমার নাম। সবাই প্রত্যুত্তর করল — ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম। স্লোগান স্লোগানের জন্ম দেয়। আওয়াজ উঠল — বিশ্ব জুড়ে দিচ্ছে নাড়া, মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা। স্লোগানকে দিচ্ছে নাড়া মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা। স্লোগানের পর স্লোগানে আবেগ বেড়ে উঠছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা একটি মিছিলও দাঁড়িয়ে গেল নিরুপমদের জন্মায়ত্তের সামনে। দীপঙ্করদা আওয়াজ তুললেন — সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। সবাই কণ্ঠ মেলাল — ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।

মিছিল চলতে শুরু করল উত্তর দিকে। চলতে চলতেই দ্রুত সংখ্যায় ভারী হয়ে উঠল।

কেশব সেন স্ট্রিটে ঢুকতেই থমকে যেতে হ'ল। ঢাল বন্দুকধারী পুলিশ আমেরিকান সেন্টারের বাড়িটিকে ঘিরে আছে। রাস্তার প্রস্থ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে ঢালধারীরা।

বাধা পেয়ে স্লোগানের পর্দা চড়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর দূর হটো। দূর হটো, দূর হটো। পুলিশের গায়ে হাত তোলা যাচ্ছে না, সেজন্য গলার জোরে, মেদিনী কাঁপানো চিৎকারে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে রাগ প্রকাশিত হতে থাকলো। এখন জোর করে এগোতে গেলেই পুলিশ লাঠি চালাবে, গ্রেপ্তার করবে। দীপক, মানিকের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করে নিলেন দীপঙ্করদা। পরিকল্পনা অনুযায়ী গোবিন্দ-দীপক সহ কুড়ি পঁচিশ জনের একটি দলের সঙ্গে

চলল নিরুপম। কলেজ রো-সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট ঘুরে ওরা পৌঁছে গেল আমেরিকান সেন্টারের পূর্বপ্রান্তে। যাবার পথে ওদের সঙ্গে জুটে গেল সিটি এবং সেন্ট পলস কলেজের ছাত্ররা।

রাস্তার পশ্চিমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন দীপকরদা। চিরন্তন, মানিকও রয়ে গেছে পশ্চিমদিকে। মোগান শুনে বেশ ভালোই ভিড় জমে উঠেছে ওদিকটায়। এদিকে গোবিন্দ-দীপকও মোগান শুক করেছে। নিরুপমদের দিকেও একটু একটু করে সংখ্যা বেড়ে গেছে। এটবার পুলিশ একায়াদায়। পূর্ব পশ্চিমে বিক্ষোভরত ছাত্র আর উত্তর-দক্ষিণে সারি সারি বাড়ি।

৩টা৭ পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করল। দু-তিনটি ছেলে পড়ে গেল রাস্তায়। সামনের পানোর দোকান থেকে দু'হাতে দুটি করে সোডার বোতল তুলে নিল গোবিন্দ আর দীপক। ডান হাত ওপর থেকে नीচে নামিয়ে মৃদু ঝাঁকিয়েই সোডার বোতলটি ছুঁড়ল গোবিন্দ। তারপরেই ছুঁড়ল দ্বিতীয়টি। গোবিন্দের পরেই একই কায়দায় বোতল ছুঁড়ল দীপক। পুলিশের ভেড়ের মধ্যে সোডার বোতল ফাটতেই ওরা লাঠি নিয়ে পূর্ব দিকে তেড়ে এল।

পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ইটের টুকরো ছুটে এল পুলিশের দিকে। আশপাশের বাড়ির ছাদ থেকেও শুরু হয়ে গেল পুলিশ গাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি।

পুলিশও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া লাঠি মারছে ওরা।

এই শিগগির এদিকে আয়। দীপক ডাকল নিরুপমকে। ধাক্কাধাক্কিতে নিরুপম ছিটকে গিয়েছিল অন্যদিকে। দীপকের ডাক শুনে ওরা দিকে ছুটল সে। আমেরিকান সেন্টারের পিপরীত দিকের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা।

গাড়ির ছাদে উঠতেই নিরুপম দেখল ওদের আগেই গোবিন্দ পৌঁছে গেছে সেখানে।

কী রে তুই কখন এলি?

গোবিন্দ হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

দীপক বলল, শীগগির চার্জ কর্শীগগির

-- হ্যাঁ হ্যাঁ করছি।

নিরুপম কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা নীল রেঞ্জিনের ব্যাগ খুলে ফেলল গোবিন্দ। পেরোয়ে এল পাটের দড়ি বাঁধা বোমা।

গোবিন্দ ছুঁড়ল দুটো, দীপক একটা। বুম...বুউম। বুম। উরিঃস্তারা! যেমন আওয়াজ, তেমন ধোয়া। গোবিন্দ বলল।

পশ্চিম দিক থেকে ইটবৃষ্টি অব্যাহত, তার ওপর বোমা। সব মিলিয়ে পুলিশের হতচকিত অণুশা। ওরা দৌড়ে চলে গেল কালো ভ্যানের দিকে।

জান থেকে ভাগ্যমেত বোবা যায় লড়াইয়ের গতি প্রকৃতি। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে জড়ো হওয়া জেলেরা মোগান তুলে এগোবার চেষ্টা করছে। ম্যাকনামারার কুশপুতুলে আঙন লাগিয়ে দিল চিরন্তন।

বাঁক জাম পরা একটি পুলিশ বেঁটে-খাটো মাস্কেট হাতে ওদের তাক করল। গুম...গুম গুম। একটা, দুটো, তিনটে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। এবার চতুর্থ বোমাটিও ছুঁড়ল গোবিন্দ। পুলিশের ওটলার মধ্যে সশব্দে ফাটলো বোমাটি।

একটি টিয়ার গ্যাসের শেল এসে ফাটলো বাড়ির ছাদে নিরুপমের অদূরেই। চোখ জ্বালা করছে খুব। গোবিন্দ বলল, শালারা আমাদের দেখতে পেয়েছে, এবার পালা। ওরা এ বাড়িতে ঢুকবে। গোবিন্দের কথা শেষ হবার আগেই নিরুপম দেখল পুলিশ ছুটে আসছে বাড়ির সদর দরজা লক্ষ্য করে।

বাড়িগুলি ঘেঁষাঘেঁষি হবার মস্ত সুবিধে। ওরা এ-ছাদ ও-ছাদ করতে করতে পেরিয়ে গেল সাতটি বাড়ি। এলাকার প্রতিটি বাড়ি, বাড়ির ছাদ দীপক-গোবিন্দের চেনা। সপ্তম বাড়িটির ছাদের দরজা খোলা ছিল। ওরা সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রাস্তায়। নবীন কুন্ডু লেন। রাস্তায় নেমেই গোবিন্দ বলল, তিনজনকে তিনদিকে পালাতে হবে। গোবিন্দ আর দীপক দু'দিকে চলে গেল। নিরুপম ঢুকে পড়ল বেনিয়াটোলা লেনে।

দৌড়ে এসে হ্যারিসন রোডে পড়তেই দাঁড়িয়ে যেতে হ'ল। বাতাসে টিয়ার গ্যাসের গন্ধ। রাস্তার মাঝ বরাবর দুটো টায়ার জ্বলছে। জ্বলন্ত টায়ারগুলি রাখা হয়েছে চারটি ড্রামের ওপর। ড্রামগুলির উপর দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণ করে। রাস্তার ওপর টহলরত পুলিশ। ফুটপাথ দিয়ে কিছু লোক দু'হাত উপরে তুলে হেঁটে যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও ভালোই ঝামেলা হয়েছে। আমহাস্ট স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল ওদিকেও টায়ার জ্বলছে। একেবারে রণক্ষেত্রের আবহ!

নিরুপমও দু'হাত তুলে রাস্তা পার হয়ে রমানাথ মন্দিরের স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল। এইখান থেকে ভেতরের অলিগলি দিয়ে বাড়ি পৌঁছে ফাটলো খুবই সহজ।

দুটো বাড়ি পেরোতেই একটি মেয়ের দিকে দীপক পড়ল নিরুপমের। হলুদ ছাপা শাড়ি। গায়ে হাতকাটা সোয়েটার। কাঁধে ঝোলা বস্তা। অনুমান করা যায় কলেজ ছাত্রী। মেয়েটির চোখে রুমাল। খুব ধীর পায়ে, যেন একটু কুণ্ঠিত, হাঁটছে। নিরুপম এগিয়ে গেল। সম্ভবত টিয়ার গ্যাসের জন্যই মেয়েটির চোখ রুমাল চাপা।

সে বলল কী হ'ল আপনার, চোখ জ্বালা করছে?

— চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

নিরুপমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, সে কী? মেয়েটি আবার চোখ মুছল।

— চোখে একটু জল দিতে পারলে ভালো হ'ত, কাছাকাছি কোনো টিউবওয়েল নেই? অদূরেই চিন্তামণি দাস লেনে একটি টিউবওয়েল আছে।

নিরুপম বলল, হ্যাঁ আছে, এই তো সামনেই...বড়জোর একশো পা যেতে হবে। কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে হাত ধরে ওইটুকু নিয়ে যেতে পারি। নইলে কোথায় পা পড়বে! মেয়েটি ক্রিষ্ট হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। নিরুপম হাত ধরল।

বেশ কয়েকবার চোখে জলের ঝাপটা দেবার পর মেয়েটি হলুদ শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিল। মেয়েটির ঠোঁটের নীচে লাল আঁচিলটি দেখতে পেল নিরুপম। এতক্ষণ রুমালের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেটি। অথচ এতই আকর্ষণ ওই লাল আঁচিলের — চোখ পড়লে ফেরানো যায় না। পাছে মেয়েটি কিছু মনে করে — নিরুপম দৃষ্টি সরিয়ে নিল। চোখের জলে ভিজে থাকা রুমালটি ব্যাগে পুরলো মেয়েটি।

নিরুপম বলল, এখন কেমন?

— দেখতে পাচ্ছি, তবে ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবটা রয়েছে।

কোথায় যাবেন?

হাওড়া স্টেশন...তারপর ট্রেন চেপে ব্যান্ডেল।

বাইটান থেকে এসেছেন?

হঁ।

কোথায় পড়েন?

বাগাটি কলেজ

কথায় কথায় প্রকাশ হল ওলুদ শাড়ি মেয়েও গিয়েছিল কেশব সেন স্ট্রিটের আমেরিকান সেন্ট্রাল সানডো বিক্রেতা দোকানে। ওর মাথার কাছেই টিয়ার গ্যাসের শেলটি ফেটেছে।

জালপেরি ভাড়াভাড়ি, দৌড়ঝাঁপ। পুলিশের লাঠিচার্জের জেরে দলছুট হয়ে পড়েছে সে।

কাক একা ছেড়ে দিতে মন চাইল না নিরুপমের। সেও হাওড়ার ট্রামে চাপল।

ওলুদ শাড়ি কম কথা বলে। হাওড়ার কাছাকাছি এসে একটি প্রশ্ন করল নিরুপম, —
কোন টায়ার?

সেকেন্ড ইয়ার। আপনার?

নিরুপম বলল, ফাস্ট।

ও ভালো, তাহলে তো আমি বড়, ট্রামের টিকিট আমিই কাটব।

নিরুপমকে কিছুতেই পয়সা বের করতে দিল না ওলুদ শাড়ি।

হাওড়া স্টেশনে ঢুকে বিদায় জানাবার মুহূর্তে নিরুপমের ঘোর কাটল। মেয়েটির নামই জানা হয়নি। তার নামও জানতে চায়নি সে। নিরুপম বলল, কী কাণ্ড দেখুন, এতক্ষণ কথা বললাম, কিন্তু আমরা একে অন্যের নাম জানিনা।

আমার নাম নিরুপম চ্যাটার্জি... আপনার?

নামে কী আসে গায়? বলল সে। অল্প হাসল। ডান হাতে চেপে ধরল ঝোলাটি।

তার ঠোঁট নাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল রঙের আঁচিলটি জ্বলে উঠল।

এতক্ষণ তো নাম না জেনেই কথা বলা গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে।

নিরুপম অবাক। আবার দেখা হবে আমাদের?

নিশ্চয়ই, আমাদের বিক্ষোভ তো চলবেই.....এরকমই মাঠে, ময়দানে, মিছিলে আবার দেখা হয়ে যাবে কোনোদিন।



পান্ডালী কলেজ যাবার রাস্তাটি স্বনির্বাচিত।

সকাল নটায় পাড়ি থেকে বেরিয়ে সে যে বাসটিতে চাপে তার নাম চার নম্বর মেল। গাভ্র ট্রাক্স গোড় পেরে চার নম্বর মেল ছুটে চলে। দু'ধারে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, মাঝে মধ্যে গজা ঝোলাকা। সেখানে বাস থামে, আবার ছুটে চলে। জানালার ধারে বসে পথের দু'পাশ দেখতে জালপারসে পান্ডালী।

এক খসিরা মতো বাস পৌঁছে যায় খানান। বাস থেকে নেমে সোজা ইটাচুনা কলেজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইটাচুনা কলেজের ছাত্র-সংগঠনের খবরাখবর নিয়ে, কিছুটা সময় ওই কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে পাঞ্চালী ফিরে আসবে বাগাটি — নিজের কলেজে। কলেজে ঢোকবার আগে দিদিমার ক্যান্টিনে উঁকি মারবে একবার। দেখে নেবে দ্রোণ আছে কিনা। অধিকাংশ সময়েই দ্রোণ বসে থাকে। উৎসুক চোখে তাকায় পাঞ্চালীর দিকে। হাতে সময় থাকলে পাঞ্চালী দ্রোণের মুখোমুখি বসে পড়ে। জানায় ইটাচুনার খবর। সময় না থাকলে, সে ক্লাসরুটিন দেখিয়ে দ্রোণকে বলে, এই দুটো ক্লাস করে নিয়েই চলে আসছি। দ্রোণ মৃদু হাসে। বলে, ঠিক আছে, আমি আছি। পাঞ্চালী জানে দ্রোণ বসেই থাকবে।

হাতে সময় থাকলে দ্রোণের বাড়িতেও চলে যায় পাঞ্চালী। ওর বাবা-মার সঙ্গে তার সম্পর্কটা এখন খুবই সহজ। সে যেন তাদেরই পরিবারের একজন। দ্রোণের বাবার ইদানীং কালীঠাকুর-কালীঠাকুর বাই জন্মেছে। ঘরের আশপাশে, বাগানে সর্বত্র উনি কালীকে দেখতে পাচ্ছেন। পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জবা ফুল গাছের দিকে আঙুল তুলে নিবারণ জিগগেস্ করেছিলেন, বল তো মা কী দেখছিস? উত্তরটা শিথিয়ে দিয়েছিল দ্রোণ। তবু আস্ত একটা কাল্পনিক কথা বলতে সংকোচ হচ্ছিল পাঞ্চালীর। দ্রোণ চোখ টিপে ইশারা করল। অতএব বলতে হ'ল, কালী-মা, কালী মাতা। নিবারণের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। দ্রোণের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী? বলেছিলাম না, পাঞ্চালী ঠিকই দেখতে পাবে আমার শ্যামা-বেটিকে।

নিবারণ অন্যত্র গেলে দ্রোণ হেসেছিল খুব। পাঞ্চালী, আমাদের বাড়িতে তোমার শেপ্টার একেবারে পাকা। নির্ভয়ে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাও।

ঠাট্টা করে বললেও, দ্রোণের কথায় প্রচুর আরাম পেয়েছে পাঞ্চালী। ‘শেপ্টার পাকা’ এজন্য নয়, তার সংগঠনের কাজকে দ্রোণ মনে রেখেছে বলে। সেই ছোটবেলা থেকে পাঞ্চালী দেখে আসছে মেয়েদের কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। তাদের বাড়িতে ছেলেদের জন্মদিন পালন করা হয় ঘটা করে, মেয়েদের হয় না। ছেলেদের কোচী বানানো হয়, মেয়েদের হয় না। ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের কত আদর যত্ন অথচ বোনদের জন্য কিছু হয় না কেন?

স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে ঢোকার পর পাঞ্চালী দেখে দাদারা, ভাইয়োগা পাড়ার ছেলেরা নকশালবাড়ির কথা বলে। দাদারা নিয়ে আসে ‘দেশব্রতী’। দাদারা মিছিলে যায়। ভাইয়েরা লিফলেট বিলি করে, দেওয়ালে লেখে—নির্বাচন নয়, সশস্ত্র বিপ্লবই মুক্তির পথ। পাঞ্চালীও জুটে যায় ওদের সঙ্গে। এই একটা কাজে কেউ তাকে বারণ করে না। ছেলে-মেয়ে উভয়েই এই কাজটা করতে পারে! এই কাজের সুযোগেই দ্রোণের সঙ্গে আলাপ, এই সমভাবাপন্নতার কারণেই দ্রোণের সঙ্গে তার সখ্য। সেই বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীর হয়েছে। দ্রোণও পাঞ্চালীদের বাড়িতে এসেছে কয়েকবার। দাদাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। দ্রোণকে পছন্দ করে ওরা। শুধু বড়দা একবার বলেছে, সাবধান দ্রোণ কিন্তু দক্ষিণদেশ গ্রুপে আছে, আমাদের দেশব্রতী-তে নেই।

পাঞ্চালী দ্রোণের পক্ষ নিয়েছে। দক্ষিণদেশ করলেও ওতো বিপ্লবের জন্যই করছে। গ্রামে যাতায়াত করছে নিয়মিত। দ্রোণের সম্পর্কে কোনোরকম বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারে না পাঞ্চালী। বড়দার এমন কথা শুনলে, যার ফর্সা মুখে ঘন কালো দাড়ি,

আবেগমগ্ন কথার পরেই যার অব্যাহ হা-হা হাসি দিখিদিকে ছড়িয়ে যায়, সেই ছেলেটির উজ্জ্বল চোখ দুটি যে প্রিয়মাণ হয়ে যাবে।

পাঞ্চালী আগার বলে, দ্রোণ কিন্তু ভালো কবিতা লেখে।

মেজদা হাসে, হ্যাঁ সেজন্যই বোধ হয় দাড়ি রেখেছে।

বড়দা বলে, তোর ওই দ্রোণের দাড়ি রাখার খরচ কিন্তু দাড়ি কামানোর চেয়ে বেশি।

এবার পাঞ্চালীও তেঁসে ফেলেছিল। দ্রোণকে বলাতে সেও হেসেছিল খুব। ওই হৃদয় খোলা হাসি আর মায়ামা চোখ এ দু'য়ের টানে পড়ে গেছে পাঞ্চালী। চোখ বন্ধ করলে দ্রোণের চোখ তেঁসে ওঠে। কথা বন্ধ করলে দ্রোণের স্বর শুনতে পায় পাঞ্চালী।

আমার মৃগির ডাক আকাশে বাতাসে
শ্রমিকের কৃষকের মাঝে শুধু ভাসে,
আমার স্বপ্নের রঙ লাল—
বয়সের শব্দে শুধু শোষণ ছেঁড়ার দিনকাল।

আমার জীবন এই পথে-ঘাটে মাঠের ভিতর
চিরদিন জ্বলে থাকে স্থির,
বয়সে উজ্জ্বল অভিপ্রায়—
ক্রমাঙ্ঘয়ে হৃদয়ের ঘর।
ফেলে দিই অচল বয়স
ফেলে দিই পুরো জীবন—
প্রথম মৃগির দিক ভাসে
মোহন আকাশে-বাতাসে।।

দ্রোণের এই কবিতাটি যেন ওর কণ্ঠস্বর।

একা থাকার সময় পাঞ্চালী দ্রোণকে নানাভাবে আবিষ্কার করে। আশ্রুত হয়। সম্পর্ক এমনই বহুমাত্রিক হীরকখণ্ডের মতো। একটু নাড়াচাড়া করলেই তার থেকে নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে।

দিদিমার ক্যান্টিনে ঢুকতেই পাঞ্চালী দেখলো দ্রোণ বসে আছে। নীল শার্ট, খয়েরি প্যান্ট। কাঁধে খোলা। অন্য কোনো বন্ধু নেই। ও একেবারে একা।

দ্রোণ বলল, আজ আমি বড়লোক, আটটাকা রোজগার করেছে।

কী করে?

প্রেমপত্র লিখে.....চারটে লিখেছি, প্রত্যেকটি চিঠি দুটাকা।

— আঁ, সে কী। কী ব্যাপার?

— বলছি, বলছি ...আগে কিছু খাওয়া যাক প্রেমপত্রের লেখক আপাতত খুবই কুশাগ্র।

কাঁধের খোলা থেকে একতড়া রুটি বের করলো দ্রোণ। শুধু রুটিই। এর আগেও

বেশ কয়েকবার রুটি এনেছে দ্রোণ। সব বন্ধুদের মধ্যে সমান ভাগ করে দেবার পরে উদ্বৃত্ত একটি-দুটি রুটি দিয়েছে পাঞ্চালীকে। দেওয়ামাত্র, অমর কিংবা বসির দুই-দুই মুখ করে দ্রোণের দিকে তাকাবে। গুরু, এটা তো সাম্যবাদ হ'লো না.....তুমি কেন পাঞ্চালীকে বেশি দিলে? দ্রোণের ফর্সা কান লাল। ঠোট তির তির করে। নাকের ডগায় পর্যন্ত লজ্জার আভা।

তবু নিজের কাজের পক্ষে লড়ে যায় দ্রোণ। আরে ও সকাল থেকে বাড়ির বাইরে....এ-কলেজ, সে-কলেজ ঘুরে আসে....ওর তো একটু বেশি খিদে পাবে, নাকি?

কোনওদিন হয়তো একটা তান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে — কমিউনিস্টদের দর্শন হ'ল সাধ্যমতো দেবে, প্রয়োজনমতো নেবে....জানো না তোমরা?

এই কটা রুটি আনতেও বাড়িতে নিশ্চয় নানান বানানো কথা বলতে হয়েছে দ্রোণকে। এমন গুরুতর কিছু কথা যার অভিঘাতে নিজেদের খাবারের গ্রাস ছোট করে ফেলা যায়। ওদের সংসারের দারিদ্র্য তো পাঞ্চালী নিজের চোখে দেখেছে। ওর পক্ষে এই রুটি নিয়ে আসাটাই একটা বিষম কাজ। তরকারির কথা তো ও ভাবতেই পারবে না!

বন্ধুদের খুনসুটির মুহূর্তে দ্রোণের কথা ভেবে মনটা ভিজে উঠেছে পাঞ্চালীর। মানিব্যাগ খুলে সে পয়সা রাখে টেবিলে। এই সবাই চাঁদা দাও, ঘুগনি কেনা যাক। আটআনার ঘুগনিতে দিব্য জমে গেছে খাওয়া-দাওয়া। সেই থেকে অলিখিত নিয়ম — দ্রোণ রুটি আনবে আর ওরা কিনবে ঘুগনি, আলুর দম।

মানিব্যাগ খুলতে যেতেই দ্রোণ হাত তুলে শীমাল। আরে, আমি দাম দেব...বললাম না আজ আমি বড়লোক!

ঘুগনির সঙ্গে আলুর দমও কেনা হল। রুটি-আলুর দম খেতে খেতে প্রেমপত্রের কথায় চলে এল দ্রোণ।

ওর কয়েকজন বন্ধু প্রবল প্রেমিক। কিন্তু তারা নিজেদের মনের কথা গুছিয়ে নিবেদন করতে পারে না। ছেলেগুলির সঙ্গে কথা বলে, প্রেমিকার মনোভঙ্গি আন্দাজ করে সেই অনুযায়ী প্রেমিকের বক্তব্য সুচারুভাবে লিখে ফেলেছে দ্রোণ। শুধু গদ্য নয়, প্রেমপত্রের মধ্যে নিজের কবিতাও যথেষ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কমলা নামের এক মেয়েকে সে তার বন্ধু সমীরের জবানে লিখেছে, 'তোমার বুকের কাছে হাত রাখতে তাড়িয়ে দিলে / আমি কি অন্ত্যজ এতো? ভালোবাসা বিশ্বাস করো না'। বাসন্তী নামের একজনকে অনুপমের নামে লিখেছে, 'খোঁজ করে যাও ফাঁকা ময়দান, খোঁজ করে যাও শেষ — / তবুও বুকেতে অবেলার প্রেমে রয়েছে এখনো রেশ!' অশোকার উদ্দেশে তার প্রেমিক লিখেছে, 'একটা শালিখ তার সর্বস্ব উজাড় করে দিলো : / ঠোটে ঠোট, শরীরে শরীর, / মানুষের গাঢ় ঘন ভীড় / তার দুই বন্ধ চোখ বৃক্ষের আশ্বাদ খুঁজে নিল / রক্তের অমোঘ স্বরে সহজাত মৃত্যুর গভীর'। চতুর্থ জনের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, তোমাকে চেয়েছিলাম, আঙুলে আঙুলে / নতমুখ থেকে জ্যোৎস্না / ভেবেছি তুমিই, শাস্ত্যুদ্যতি অনায়াস / আলোর বিভায়, / পবিত্র গল্পের কাছে তাই তুমি ওষ্ঠের রেখায় / বেঁচে আছে চিরজীবনের ভালোবাসা।'

চিঠি লিখেছে তবু সহ্য করা যায় কিন্তু ও নিজের কবিতা দিল কেন? কবিতা তো

বদল গাগানের পেয়ারা পাতায় চলা শুয়োপোকাকার মতো। তাকে হঠাৎ পাওয়া যায়। একজনের এই 'হঠাৎ পাওয়া'টা অন্যজনের 'পাওয়া'র সঙ্গে মেলে না। এমন অমূল্য, একান্ত নিজস্ব সময়গুলি ও এমন হেলাফেলা করে অন্য মেয়েদের বিলিয়ে দিল কেন? পাঞ্চালীর গলায় গাম্প জমে। ফুসফুস ভারী হয়।

দ্রোণ ডাকায়। পাঞ্চালীর চোখে চোখ রাখে। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটের রেখায়। মন খারাপ করো না, তোমার উদ্দেশ্যে একটা গোটা কবিতা লিখেছি... বুঝেছ?

ও কী করে টের পেল তার অভিমান? পাঞ্চালী চুপ করে থাকে।

দ্রোণ আবার বলে, তোমার ঠোঁট...লাল আঁচিল খচিত তোমার ঠোঁট মনে রেখে লেখা এই কবিতা...তুমিও নাকি?

পাঞ্চালীর উত্তরে অপেক্ষা না করে দ্রোণ ডায়েরি খুলে পড়তে শুরু করে।

'সারাক্ষণ যে গ্রাম আর শহর

বুকের ভিতর

এমন উদ্দাম হয়ে ওঠে,

তাকে তুমি কোন জাদু ঠোঁটে

গড়ে তোলো মৃত্যুহীন আলোর সুমুখে?

আমাদের বুকে

সেই ইচ্ছা বারবার, বারবার

দৃশ্য দিনে সমুদ্রবিলীন।

ওগু এই প্রাণ মৃত্যুহীন

ওগু এই জন্ম মৃত্যুহীন।'

দ্রোণ জানায়, পাঞ্চালীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতাগুলি নিয়ে সে এক কবিতার বই প্রকাশ করবে। আগের আর অভিমান ধরে রাখতে পারে কেউ? পাঞ্চালীর ভেতরেও জোয়ারের ঢেউ ওঠে। উদ্দাম ঢেউ। সমস্ত তলানি দুঃখ ধুয়ে মুছে যায়।

অসাধারণ লিখেছ.....সত্যিই অনবদ্য। দ্রোণের হাত চেপে ধরে পাঞ্চালী। দ্রোণ বলে, চলো না একবার গায়েগড়.....দুদিন থেকে এসো....দেখো ভালো লাগবে। পাঞ্চালী এককণায় রাজি হয়ে যায়। হ্যাঁ চলো....দেখা যাক একবার তোমার কাজের জায়গা।

গাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা বলে পাড়ি দিল পাঞ্চালী। ভোরবেলা প্রথম বাস ধরে জিটি রোড। দিগসুই। কোনো বন্ধুর থেকে সাইকেল জোগাড় করে নিয়ে আসে দ্রোণ। ফিরতি পথে দিয়ে যাবে। সাইকেলের পেছনে চেপে, কিছুটা পথ হেঁটে পাঞ্চালী পৌঁছে যায় গায়েগড়। পাঞ্চালীকে নিয়ে দ্রোণাচার্য সোজা চলে গেল ধীর সোপোনের গাড়ি।

বেড়া খুলে ঢুকতেই পরিষ্কার, মসৃণ উঠান। তিনটি বড় মুরগি আর চার-পাঁচটি ছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঠানের অন্যদিকে, দাওয়ার পাশে মাটির উনুন। দ্রোণ জানাল, ওই উনুনে মাংস সেদ্ধ করা হয়।

দীপক জ্বলছে। চালাটি খুলে নিচ। মাথা বাঁচিয়ে দাওয়ায় উঠে পড়ল ওরা। দ্রোণ হাঁক

পাড়ল, ধীরুদা কই গেলে?... আদুরি বেরিয়ে এল। শ্যামাস্নী মহিলার মুখে হাসি। এমন হাসি দেখলেই মনে হবে মহিলার হৃদয় অতীব নির্মল। সে জানাল ধীরুদা কাছে-পিঠেই গেছে।

তিনদিন আগে এক কাণ্ড ঘটেছে গ্রামে। জোতদারের খাস ম্যানেজারবাবু রতন সাহা আদুরিকে মুখ খারাপ করেছিল। ধীরু বজ্জাত লোকটাকে দিয়েছে দু-চার ঘা লাগিয়ে। গুয়ের ব্যাটা লোকজন এনেছিল হাস্কামা পাকাতে। তাদেরকেও আচ্ছ করে ধস্কে দিয়েছে ধীরু-যাদু-রূপা সবাই। সবাই মিলে একসঙ্গে প্রতিবাদ করাতে জোতদার নীলু কুমার বেশ হকচকিয়ে গেছে। এখন লোক পাঠিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ধীরুকে পুলিশে ধরবে বলে।

আদুরি বলে, মানুষটাকে বেঁধে পুলিশে চালান দিবে না কি গো?

দ্রোণ বলে, যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে এত বকবকম করত না। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে ধীরুদাকে পুলিশে দিতে পারে ওরা। কিন্তু এই ধানকাটার মরশুমে সে সাহস জোতদার পাবে না এখন। গাঁয়ের সব গরীব চাষিই আজ একজোট। এই কৃষকদের সাহায্য নিয়েই তো ওকে ধানকাটার কাজ করতে হবে। নীলু কুমারের প্রাণেও আজ ভয় ঢুকেছে। মাঠের ফসল ও নিজের গোলায় তুলতে পারবে কিনা, সন্দেহ। দ্রোণ রহস্য করে হাসে।

আদুরিও হাসে। ঠিক বলেছ বটে, দাদা।

জোতদার তো গাঁয়ে থাকে না। আদিসপ্তগ্রামে বসে শুকুম চালায়। শু গাণ্ড জানে, বেশি লক্ষ্যবস্প করলে জোতজমিই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তবে, ঢেমনাটা জানবার চেষ্টা করছে এই পাশের মারের খটনাটা হঠাৎ ঘটে গেছে, না এর পেছনে আছে কোনো পাকা মাথা।

দ্রোণের দিকে তাকিয়ে আদুরি জানায়, ফেলের গোদাটিকে বাঁধবার চেষ্টায় আছে ওরা।

— তবে দাদা, তোমার বুদ্ধিটা জব্ব্ব.....আজ তোমার জন্যিই গাঁয়ের মানুষরা সাহস পেয়েছে একটু।

আদুরি হাসে। আনন্দের হাসি। দ্রোণও হাসে। আনন্দের সঙ্গে মেশে উদ্দীপনা।

একদমে অনেকটা কথা বলে নেবার পর আদুরি তাকায় পাঞ্চালীর দিকে। কে গো দাদা, নতুন কমরেট নাকি?

পাঞ্চালী হেসে ফেলল। দ্রোণ বলল, হ্যাঁ কমরেড....কমরেট নয় কমরেড। বলো, বলো.....

দ্রোণাচার্য আদুরিকে সঠিক উচ্চারণ শেখাবার চেষ্টা করে। বলো...বলো... আদুরি হাসে। কমরেট নয় কমরেট।

দ্রোণও হাসে। হলো না...আবার....কমরেড, কমরেড...

এইবার ঠিকঠাক উচ্চারণ করে আদুরি। এবং হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ধীরুদার কুঁড়েঘরটি গ্রামের একপ্রান্তে। দাওয়ায় বসেই দেখা যায় বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। হাওয়ায় দুলছে হলুদ ধানগাছের সারি। এ যদিও সরকারী খাস জমি কিন্তু অলিখিত নিয়ম এই জমির ফসল যাবে নীলু কুমারের গোলায়। খুব শীগগিরই কাটা হবে মাঠের ফসল।

দ্রোণ বলে, ফসল কাটে যে গরীব চাষিরা, তাদের ঘরেও ধান যাবে এবার..এই ধানক্ষেতে এবার উঠবে ডগডগে লাল নিশান।

আদুরি তাকায় ক্ষেতের দিকে। সত্যি দাদা?

দ্রোণ চাষে। দ্যাশোই না, কী কাণ্ড হয় এবার।

পাঞ্চালী তাকিয়ে থাকে ধানক্ষেতের দিকে। ক্ষেতের অপরপ্রান্তে দিগন্তরেখার কাছে সারি সারি উঁচু নিচু গাছ। নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে অসমান উচ্চতার ঘন সবুজ গাছের সারি দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে আসে।

দ্রোণ আঙুল নির্দেশ করে দূরে গ্রামগুলির নাম বলে যায় — গোপালপুর - ঝিলপাড়া - মোড়ো - খালকাটি - বাবলাপাড়া - চর্চীগাছা - শ্রীকান্ত - চাকলই - বাগড়ি - সায়ড়া - উলামপুর। ওটসব গ্রামগুলিতেও দ্রোণের যাতায়াত আছে।

দ্রোণ বলে দু'রকম গ্রামের কথা। সবুজ এলাকা, বিস্তীর্ণ এলাকা।

এই গায়েগড় এ হল সবুজ এলাকা।

পাঞ্চালী জিজ্ঞেস করবার আগেই দ্রোণ ব্যাখ্যা করে। সবুজ এলাকার গ্রামগুলি শহরের কাছেই। শহরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকার জন্য এই এলাকার কৃষকেরা সবাই যে শস্য ক্ষেতের চাষ-আবাদের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে, এমন নয়। এমন অনেক গরীব চাষি দেখা যাবে যারা ক্ষেতের কাজের পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। ধান ফলানোর পাশাপাশি গরুর গাড়ির চাকা বানাচ্ছে বা গরুর গাড়ি ভাড়া খাটাচ্ছে অথবা অন্য কোনো কুটির শিল্পের কাজে যুক্ত। এই ধরনের চাষিরা, কৃষি বিপ্লব শুরু হলে, প্রথম দিকে দোটোনায় থাকতে পারেন। এদের কেউ কেউ ঝালের লাউ অম্বলের কদম্ব দিয়ে সব দিক বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করতে পারেন। অন্যদিকে, বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষক, যারা শহর থেকে দূরে, যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করতে শুধুমাত্র ক্ষেতের কাজের উপর, তারা এই সিঁড়ি দিয়ে অনেক মরিয়া হয়ে যোগ দেবে। কারণ ওদের কাছে চাষের কাজ ছাড়া বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই।

দীর্ঘদিন ক্যাশিটনে আড্ডা মেরে এতদিন বোঝা যায়নি গ্রামে নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে দ্রোণাচার্য কত কিছু জেনে গেছে! এই অভিজ্ঞতার কথা কী করে এতদিন তার থেকে আড়াল রেখেছিল দ্রোণ? এমনকী ফসলকাটার পরিকল্পনাও দ্রোণ তাকে জানায়নি। পাঞ্চালীর অভিমানে হয়, আবার গর্বও হয় একটু। দ্রোণকে নিশ্চয় ভালোবাসে গ্রামের গরীব চাষিরা। ওকে বিশ্বাস করে। না হলে, ওর কথায় এত বড় কাজে মেতে উঠবে কেন তারা? কৃষি বিপ্লব শুরু হলে এইসব গ্রামই তো হয়ে উঠবে ঘাঁটি এলাকা। এইসব জেগে ওঠা গ্রাম দিয়েই ঘিরে ফেলা হবে শহর। দ্রোণ কি ওদের কমান্ডার হবে? রক্তপতাকা তুলে ওর সঙ্গে কৃষকরা এগিয়ে যাবে শহরের দখল নিতে?

লুঙ্গি-জামা পরা একটি আদিবাসী চেহারা বেড়ার সামনে আসতেই দ্রোণ লাফিয়ে ওঠে, ওই তো ধীরুদা। ধীরুদার সঙ্গে আরও দু'জন। ওরা সবাই দ্রোণকে জড়িয়ে ধরে।

খবর শুনেছ তো সব? দ্রোণ ওপর নীচে মাথা নাড়ে।

ধীরুদার সঙ্গে আলোচনা হয় পাঞ্চালীর। ধীরুদার সঙ্গী দুজন — কুন্স সরেন আর প্রীতম মুর্মুর সঙ্গে পরিচয় হয়। ওদেরও ধারণা, ধীরুদাকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ আসতে পারে গ্রামে।

পুলিশের দমন বাড়লে কী করা উচিত এই নিয়ে যুক্তি করা দরকার। আরও কয়েকজনকে খবর দিতে গেল। দ্রোণাচার্য আর ধীরুদা বেরিয়ে যায়।

কুন্স বলে, দ্রোণা আমাদের লোক.....বড় ভালো মানুষটি।

প্রীতম মাথা নেড়ে সায়া দেয়। হই।

পাঞ্চালী বলে, কেন ভালো কেন? ও কী ভালো করেছে আপনাদের?

কুন্সু, প্রীতম দুজনেই বলে, অনেক অনেক কিছু।

একটু চুপ করে থাকার পর কুন্সু কথা বলে। নিজের গানেই বলে।

এখানকার বড়লোকগুলো খুব অত্যাচার করত। অত্যাচারের নমুনা পেশ করে কুন্সু।

এক সের চাল ধার নিলে বাবুদের বাড়ি চারদিন গায়েগতরে খেটে শোধ দিতে হবে।

পাঁচদিনের মাথায় অন্য কোথাও কাজে যেতে চাইলে, বাবু ছাড়তে চাইবে না। ওখানেই কাজ করতে হবে। লুকিয়ে গেলেও উপায় নেই। জানতে পারলে ধাওয়া করবে বাবুর লোকেরা। তুই শালা আমার কাজে যাসনি, তোকে কাজ করতে দেব না। গলায় গামছা দিয়ে টান লাগাবে যেন গরু-ছাগল নিয়ে যাচ্ছে খোঁয়াড়ে। মৃদু প্রতিবাদ করলেও পেছনে লাথি মারবে বাবুর লস্কর।

প্রীতম যোগ দিল কুন্সুর সঙ্গে। ওরা কথায় কথায় চোর বলতো গরীব আদিবাসীদের। গরীবদের বাড়ি একটু বেশি ধান দেখল, কি একটা সতেজ গরু দেখল, অমনি চোখ টাটাবে বড়লোক জোতদারের। বলবে, এই শালা আমাদের গোলা থেকে চুরি করেছিস। বলবে, আরে এ তো আমাদের গরু। ভয় দেখাবে নানারকম — পুলিশে দেবার ভয়, মেরে ফেলবার ভয়। নিজের ধান মাথায় চাপিয়ে, নিজের গরুর রশি ধরে জোতদারের থানে রেখে আসতে হয়েছে। এমন ঘটেছে বহুবার।

প্রীতম বলে, একটা কথা বলতে মন করছিলাম।

পাঞ্চালী বলে, বলুন না, বলুন।

— জানবেন আদিবাসীরা চোর নয়। যদি হয় তাহলে ওরা না বলে নিয়ে যাবে সজনে গাছের পাতা কিংবা ভাঙা, পুঁচকী বেড়া..... এ কি চুরি?

দ্রোণ এইখানে আসবার আগে এমনটাই চলেছিল। গতিক দেখে দ্রোণ বলে, পাশ্টা ভয় দেখাও, ক্যালাও শালাদের।

একদিন হালদারবাবুর লোক যাদু মাড়ির পাছায় লাথি মারল। টেংরাগেটে লোকটাকে যাদু কষাল পাশ্টা লাথি। গাঙ্গেগড়ে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। শয়তানটা হতভম্ব। একটু সামলে থোবনা নেড়ে যাদুকে শাসাতে চেষ্টা করল। যাদু জানাল, আর একটা খারাপ কথা বললে সে আবার পা চালাবে। বজ্জাতটা একেবারে চুপ ধরার মতো লেজ ওটিয়ে পালাল। ঢেমটা তখন গেল ঠিকই কিন্তু পরে এসে পুলিশ ধরল যাদুকে। দ্রোণ যুক্তি দিল, চলো সবাই মিলে থানা ঘেরাও করি। সবার মনে ধরল কথাটা। থানা ঘেরাও এ অঞ্চলে প্রথম। কিন্তু ওষুধ ধরল। যাদুকে বেকসুর খালাস করে দিল দারোগা।

কুন্সু, প্রীতম দুজনেই জানায়, পাশ্টা মার দেবার পরে এখন জোতদারদের অত্যাচার কিছুটা কমেছে। তবে ওরা দ্রোণকে নজরদারিতে রাখবার চেষ্টা করে। এজন্য দ্রোণ সাধারণত দিনের বেলায় গ্রামের মধ্যে বেশি ঘোরাফেরা করে না। ধীর-প্রীতম-কুন্সু-যাদু'র বাড়ির ভেতরে কোথাও চুপচাপ বসে থাকে। রাত্তিরে শুরু হয় কাজকর্ম।

আদুরি জানায়। মানুষটা বড় ভালো গো....একেবারে দাদা যেন.....

রাত্তিরে কুপি জ্বালিয়ে মিটিং শুরু হয়ে যায় ধীরদার ঘরের ভেতর। কুপির আলো পড়ে তামাটে মুখগুলিতে। আদিম ভাস্কর্য যেন। দ্রোণের চোখ জ্বলজ্বল করে।

পাঞ্চালীকে নিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ে আদুরি। গ্রাম চত্বরটি ঘুরে দেখাও হয় আনার একটা নজরদারিও সেরে নেওয়া যায়। বড়লোকগুলোর গতিবিধিও বুঝে নিতে হবে তো। গ্রামে একমাত্র নীলু কুমারের বাড়িটি ইটকাঠের, বাকি সব মাটির ওপর খড়ের চাঙ্গ।

লপা বাউলের কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শিশুদের গলা পাওয়া যায়। যেন গামতা পড়ার সুর।

রাতের ইঞ্চুল নাকি? পাঞ্চালী জিজ্ঞেস করে।

আদুরি জানায়, এ গায়ে কোনো ইঞ্চুল-পাঠশালা নেই। এ হ'ল রূপা বাউলের নিজস্ব পাঠশালা। দিনমাত্রে কেতের কাজ সেরে সন্ধে-রাতির ও শিশুদের পড়ায়। পাঞ্চালীর কৌতুহল বাড়ে। আদুরিকে নিয়ে ও রূপার বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

আট দশটি শিশু অর্ধচন্দ্রাকারে বসে। মাঝখানে কুপি জ্বলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে লপা বর্ণপরিচয় করচ্ছে।

ক কিসাণ মাঠে বুনছে ধান / খ - খেতখামার চাষির প্রাণ / গ - গরীব মা বোন
গাটে দেশে / ঘ - ঘরে জমিদার আছে বসে।

একেনাগে নতুন রকমের বর্ণপরিচয়। পাঞ্চালী বিস্মিত হয়। মজাও লাগে। বিদ্যাসাগর মশাই এই দৃশ্য দেখে কী বলতেন? রূপা জানায়, দ্রোণ তাদের শিখিয়েছে এইসব বর্ণপরিচয় আর ছড়া। পাঞ্চালীর মনে পড়ে, দক্ষিণদেশে বেরিয়েছিল এই নতুন বর্ণপরিচয়।

লপা হাঁক পাড়ে, 'ট'...

শিশুরা বলে, টাকার কুমির সব মহাজন।

১ ঠকিয়ে জমায় গরীবের ধন।

৬ ডাকাত এরাই ধর্ম শোনায়ে

৮ ভাল তলোয়ার পিছে শানায়।

শ্রীতিটি নগের সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত হয় পাঞ্চালী। শিশুরা বলতে থাকে। প -
পুলিশ সেপাই ওদের কেনা। ফ - ফৌজ আদালত মন্ত্রী থানা।

একটি শিশুকে আবৃত্তি করতে বলে রূপা।

শিশুটি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে শুরু করে —

আয়রে আয় টিয়ে

হাজার সাথি নিয়ে

খোকা মারবে দত্তি গুলোয়

বনের মধ্যে গিয়ে

দত্তি রাখে লুকিয়ে

গোলায় খাবার লুকিয়ে

খোকারা তাই মারবে আজ

দত্তিগুলোর মাথায় বাজ।

খুবই ভালো লাগে পাঞ্চালীর। কিছু ছড়ার মধ্যে খোকার সঙ্গে খুকু কোথায়? শুধু খোকারাই
সৈতোর সঙ্গে লড়াই করবে? শিশুরা নয়?

পাড়া বেড়ানোর শেষে ঘরে ফিরে দেখা যায়, মিটিং জমে উঠেছে। অধিকাংশই চাইছে নতুন অভিযান, পাল্টা আক্রমণ। তবেই জোতদার ভয় পাবে, ধীরুদাকে পুলিশে দেবার আগে দু-বার ভাববে। খাস জমির ফসল জোর করে কেটে নেবার সিদ্ধান্তও পাকা হয়ে যায়। ঠিক হয় পরের বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই অভিযান শুরু করতে হবে। আপাতত দিনক্ষণ গোপন রেখে সবাইকে সাহস দিয়ে একজোট করতে হবে। আলোচনার মধ্যে আদুরিও ঢুকে পড়ে। ওর বক্তব্য, এই গাঁয়ে একটাও ইন্সকুল পাঠশালা নেই। অবিলম্বে একটি ইন্সকুল করা দরকার। ফসলকাটার আন্দোলনের এখনও চার-পাঁচদিন দেরি আছে। অতএব ইন্সকুল স্থাপনের দাবিতে আগামীকাল থেকেই অভিযান শুরু করা যায়।

ইন্সকুল, পাঠশালা? কথটা দু'চার মুখে ঘোরে ফেরে। ছানাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা হবে। মন্দ বুদ্ধি নয় গো। ভালো যুক্তি দিয়েছে মেয়ে। সবাই সায় দেয়।

কিন্তু ইন্সকুল বাড়ি গড়বার জমি, টাকা কে দেবে?

কেন....নীলু কুমার? বাবু এত টাকা রোজগার করছে এই গ্রাম থেকে আর সেই গান্ধেগড়ের জন্য কিছু করবে না?

ঠিক কথা....খাঁটি কথা বলেছে মেয়ে।

পাঞ্চালীর ভালো লাগে। এই তো, থোকাদের সঙ্গে খুকুরাও দিব্য জুটে যাচ্ছে।

রাত পোহালে সূর্য ওঠে। সূর্য মাথায় রেখে নীলু জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করে গ্রামের মানুষ। ইন্সকুল গড়বার দাবি জানায়। পাকা বাড়ির মালিকজার ওদের হাঁকিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ধীরু-কুন্-প্রীতমের চোখ মুখ দেখে থমকে যায়। ওরা বাবুর সঙ্গে দেখা করবেই। ইন্সকুল ওদের চাই। নীলু কুমারকে দিতে হবে প্রতিশ্রুতি। ধান চালান করবার জন্য আনা জোতদারবাবুর পাঁচটি ট্রাক আটক করে গরীব চাষিরা। প্রাণ দেয় গান্ধেগড়ে ইন্সকুল চাই। ট্রাকের চাকা খুলে নিল রূপা বাউল। কোরা-যাদু মিলে কেটে দিল গ্রামের ঢোকবার রাস্তা। চট করে পুলিশ ঢুকতে পারবে না গ্রামে। আগামীতে ফসলকাটার অভিযানেও সুবিধে হবে খুব।

সমস্ত খবর বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে যায় আদিসপুগ্রামে। নীলু কুমারের লোক যাতায়াত শুরু করে। পরিস্থিতি গভীর। গাঁয়ের মানুষের মধ্যে ছোটখাটো বিরোধ থাকেই। সেই ফটেল কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা বজায় রেখেছে নীলু কুমারের লোক লঙ্কর। কিন্তু এগার তারা অবাক। কোনো ছিদ্র খুঁজে পায় না। ইন্সকুলের দাবিতে গাঁয়ের সবাই একজোট। মেয়ে-মরদ সবাই।

বিকেলবেলায় খবর আসে নীলু কুমার রাজি হয়েছে। কিন্তু অন্যের মুখের কথায় নড়বে না গ্রামবাসী, নীলু জোতদারকে ওদের সামনে আসতে হবে।

নীলু কুমারকে ধীরু-কুন্-প্রীতমের মুখোমুখি বসতে হয়। কথা দেয় জোতদার। শুধু কথা নয়, চাপে পড়ে ইন্সকুল বাড়ির জমিটাও দেখিয়ে দেয় ওদের। প্রতিশ্রুতি দেয় পাকা বাড়ি বানিয়ে দেবার।

পাকা বাড়ি উঠতে তো কিছু সময় লাগবে। সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। তার আগে, অবিলম্বে কিছু করা দরকার। জমির দখল নেয় গ্রামের মানুষ। ধীরু-কুন্-প্রীতম-কোরা-যাদু-রূপা সবাই মিলে ছোটখাটো একটা আটচালা দাঁড় করাবার চেষ্টা করে।

গান্ধেগড় আনন্দে মাতে। সাফল্যের আনন্দ। কৃতিত্ব মেখে পাঞ্চালী ঘরে ফেরে।

দোশও।

দোশ বলে, আন্দোলনে থাকলে সত্যিই এক বিচিত্র অনুভূতি হয় সেই যে মাও সে তুওয়ে কণিতায় আছে না....হৃদয় যত উদ্বেজিত ততই আরো প্রখর....

উদ্বেজিত? মানে?

ত্যাঁ গো উদ্বেজিত, উত্তেজিত নয় কিন্তুইঁ ইঁ বাবা বিষ্ণু দেবের অনুবাদ। হৃদয়ে উদ্বেগ থাকলে তাকেই বলে উদ্বেজিত অবস্থা। দ্রোণ ব্যাখ্যা করে। মনে উদ্বেগ, আশঙ্কা রয়েছে তবু এগিয়ে চলেছে গরীব মানুষ। আন্দোলনের মধ্যে থেকে কী অসাধারণ সব শিক্ষা নিল গান্ধীগড়ের গরীব চাষিরা। হৃদয় উদ্বেজিত কিন্তু কী প্রখর চেতনা ওদের। দ্রোণ লক্ষ্যে গায়ের মানুষের সাফল্যের জয়গান করে। শুধু একটা দ্বিধা আছে তার মনে। ইচ্ছা না হয় হল। কিন্তু তা চালাবে তো ওই নীলু কুমারের লোকজন। পরবর্তীতে ত্যাঁতো-মাথা গলাবে সরকার। কিন্তু যে বর্ণপরিচয় ওরা চালু করেছিল রূপার বাড়িতে তা তো পড়ানো যাবে না সেখানে?

পাঞ্চালী বলে, গায়ের মানুষ তো এখন স্কুল চালাবার অবস্থায় নেই....অতএব এইটা মোটে নিত হ'বে ... যেটা হ'ল তাও তো কম কিছু নয়.....গ্রামের অধিকাংশ মানুষের চোখে একটা স্বীকৃতি তো পাওয়া গেল।

দোশ বলে, ঠিক কথা বলেছ বটে মেয়ে। ওর বকীর ভঙ্গীতে পাঞ্চালী হেসে ওঠে।

দ্রোণ উদাস্ত গলায় মাও-এর আর একটি কথিত শুরু করে।

একলা ছিলুম হেমন্ত হিমে দাঁড়িয়ে, / সিংহ নদীর স্রোত বয় উত্তরে, / নারংগ দ্বীপে
এখানে মুখ বাড়িয়ে। / চারদিকে দেখি বালু পাহাড়ের সার, / বনে উপবনে সবখানে
নং ভিট; / বিড়ত নদী স্বচ্ছ সুনীল, / স্রোত নৌকা চলেছে পাল্লা দিয়ে। / ক্ষিপ্ত ঈগল
পাখিগণ মাঝে আকাশে, / অগভীর জলে মাছ সাঁতারায়, / লাখে জীব লড়ে তুহিন আলোয়
অসীমতা দেব তাড়িয়ে।

দুর্দিন গায়েগড়ে থেকে অভিজ্ঞতা যেন অনেকটাই বেড়ে গেছে পাঞ্চালীর। দ্রোণকেও নতুনভাবে দেখেছে সে। ওকে ছেড়ে ঘরে ফিরতে ভালো লাগছিল না। কিন্তু ফিরতে তো হ'বেই। অন্তত এখনকার মতো।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর এক নির্জন ঘোড়ানিম গাছের তলায় দ্রোণ দাঁড়ায়। পাঞ্চালীও থামে যায়। কী হ'ল?

দ্রোণ হঠাৎ এগিয়ে এসে পাঞ্চালীকে জড়িয়ে ধরে। ওঠে ডুবিয়ে নেয় পাঞ্চালীর ওষ্ঠ। পাঞ্চালী যেন জ্বলন্ত মোমবাতি। ওর ভেতরটা নরম-গরম হয়ে টুপটুপ করে গলে যায়। পাঞ্চালী অমায়িক। পাঞ্চালীর কপালে দ্রোণ চুষন আঁকে। আবার নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে। পাঞ্চালী অসুস্থ কণ্ঠে বলে উম্ম। দুটি শরীরেই সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। কিছুক্ষণ জড়াকৃত পর আবার হাঁটতে শুরু করে দুজনে।

মগরা, জিটি, গোড, থেকে ব্যাস্কেলগামী বাসে উঠল পাঞ্চালী। দ্রোণও উঠে বসল ওর পাশে। কলেজ থেকে মগরা পথেও দ্রোণ এমনটাই করে। কিছুদূর পাঞ্চালীর সঙ্গে যাবে। তারপর অপেক্ষা করে বাসে চলে, না হলে পায়ে হেঁটে ফিরে যাবে নিজের বাড়ি — জয়পুর।

রাতের বেলায় বাস দ্রুত ছোটে। তার জীবনে আজ এক মনে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে। তার শরীর জেগে উঠেছে। দ্রোণকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় পাঞ্চালীর। সে চুপ করে যায়। হঠাৎ দ্রোণ বলে, আমি চলি।

— কোথায়?

— সায়ড়া ইলামপুর

— সে কী! এখন? কী হ'ল?

দ্রোণ জানায় তার ভীষণ বাঁশি শুনতে হচ্ছে করছে। সায়ড়া ইলামপুরে আছে গুণধর মূর্মু। অসাধারণ বাঁশি বাজায়। রাতে ওর বাঁশির সুর আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই বাঁশি সারারাত ধরে শুনতে চায় দ্রোণ। জ্যোৎস্না রাতে নীল-কম্বুরী আভার চাঁদের আবহে গুণধরের বাঁশির সুর যে কী অপরূপ লাগবে, ভেবেই রোমাঞ্চ হচ্ছে দ্রোণের! ধানক্ষেতের উপর বিছিয়ে থাকা ধব্ধবে চাঁদের আলোর চাদর দেখে জীবনানন্দ দাশের কবিতা মনে আসে দ্রোণের। দ্রোণ বলে শাদা ঘোড়ার উপমা। যে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো!

পাঞ্চালী বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দ্রোণ শুনলো না। না গো যাই। বড় ভালো বাঁশি বাজায় গুণধর।

পাঞ্চালীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল দ্রোণ। দুটি ঘন হল।

— তোমার সৌন্দর্য চোখে.....তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব বাস থেকে নেমে

— কার লেখা? পাঞ্চালী জিজ্ঞাসা চোখে তাকায়।

— জীবনানন্দেরশেষ দুটি শব্দ পাল্টে নিয়েছি!

পরের স্টপে দ্রোণাচার্য বাস থেকে সটান নেমে গেল।



মিছিল চলেছে। মনুমেন্ট ময়দান থেকে চৌরঙ্গী রোড হয়ে, পার্ক স্ট্রিট। তারপর উড স্ট্রিটে সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে আছড়ে পড়বে বিক্ষোভ।

পিছন থেকে কেউ তীব্র গলায় টেনে টেনে উচ্চারণ করল, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। নিপাত যাক, নিপাত যাক। সবার সঙ্গে গলা মেলাল নিরুপম-চিরন্তন।

দুলতে দুলতে চলেছে বিক্ষোভ-মিছিল। পার্ক স্ট্রিট পড়তেই সামনের সারির কেউ গেয়ে উঠল — নভেম্বরের ডাক শোনো...! ভাল করে দেখল নিরুপম। দুটি ছেলে একসঙ্গে ধরেছে। কলেজের ছেলে। তিনটি মেয়েও যোগ দিল। নভেম্বরের ডাক শোনো / কাঁধে নাও রক্তনিশান / এ যুগেতে লেনিন জানায় / মাওয়ার গলায় আহ্বান ...

দাক্ষণ গান। গানটা ওগা ফিরে পরতেই, নিরুপম-চিরন্তন দু'জনেই গলা মেলাল। মিছিলে
ওঁচনান সময় গান পরতে কি যে ভাল লাগে! চোখের সামনে যেন দেখা যায় লড়াই
লেনে নিজস্বী লালফোঁজ রাইফেল হাতে গান গাইতে গাইতে শহরে ঢুকছে — দখল
নিজে শত্ৰুগণ। সেই ফৌজের পুরোভাগে নিরুপম। চিরন্তন। কলেজ স্ট্রিটে হঠাৎ দেখা
সেই মেয়েও ওয়তো থাকবে। নিরুপমের গায়ে কাঁটা দিল।

সময় ১৯৪৫ বৎসর। দীপকরদা বলেছে, বিপ্লবের সময় এমন হয়ে থাকে। প্রত্যেকদিন
নতুন নতুন খবর। একটা ঘটনার বেশ কটিতে না কাটতেই চারটে নতুন ঘটনা চলে আসছে।
দেশব্রতীর একটি কথায় উদ্ধৃত পাঁচটি প্রতিবাদ।

এক ওয়েস্টিল সেই নির্বাচনের সময় থেকে। একবছর রাষ্ট্রপতি শাসনের মাথায় আবার
লক্ষ্যবলে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেল। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভোটের প্রচার।
লটার-বাদাখানেক দল নেমে পড়লেও আসল লড়াই দুই পক্ষে। একদিকে কংগ্রেস,
অন্যদিকে সিপিআই(এম), বাংলা কংগ্রেস, সিপিআই এইসব কংগ্রেস বিরোধী দলের জোট
যুক্তফ্রন্ট।

মশায়ী নির্বাচনের দিন ঘোষণার বেশ কিছু আগে থেকেই দেশব্রতী পত্রিকায় বেরোচ্ছিল
নির্বাচন ব্যয়কট প্রসঙ্গে নানান যুক্তি। ভোটের দিন ঘোষণা হতেই বয়কটপন্থীরা শুরু করল
সভা সমাবেশে নির্বাচন বিরোধী প্রচার। দেওয়ালে লেখা শুরু হল — নির্বাচন ব্যয়কট
ককন। ট্রাম বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। নির্বাচন ব্যয়কট করুন।
সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলুন। নির্বাচন ব্যয়কট প্রসঙ্গে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করল দেশব্রতী।
ভারতের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের আসল চেহারা/৩০ পয়সা। পার্লামেন্টারি পথ অথবা
সশস্ত্র সংগ্রামের পথ/২৫ পয়সা। প্রশ্বেষের নির্বাচন ব্যয়কট/২০ পয়সা। নির্বাচন ব্যয়কট—
লারা নির্বাচিত দুনিয়ার বিপ্লবী জনতার স্লোগান/২৫ পয়সা। মন্ত্রিত্বের লড়াইয়ের দার্শনিক
ডিসি / ১০ পয়সা।

ভোট ব্যয়কট বিষয়ক প্রতিটি লেখাই মন দিয়ে পড়লে নিরুপম। ওর সবচেয়ে ভালো
লেখাও চাক মজুমদারের লেখা — নির্বাচন ব্যয়কটের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। সহজ কথায়
বিতীয়া বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা। জার্মানি, ইতালি আর জাপানের
দাপটে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি স্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। হিটলারের জার্মানির
আগ্রাসনকে থামাতে পারছিল না কেউ। সে সময় স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া
পূর্বে দাঁড়াল। কুখে দিল ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে। ধ্বংস হ'ল ফ্যাসিবাদী শক্তি। শুধু তাই নয়,
এর অনুপ্রেরণায় জেগে উঠল বিভিন্ন পরাধীন জাতি, দেশ। তারাও লড়াই শুরু করল
ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। এই দেশগুলি আজ মুক্তি চায়। স্বনির্ভর জাতি হিসাবে,
রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

ভালোমের রাশিয়ার মতন, মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই-
খাপা জালানেক কণে দিল। বাইরের শত্রুর সঙ্গে পরাজিত করল ঘরের শত্রু চিয়াং কাই-
শেকের দাতক বাওমীকে। চিনে ঘটে গেল নয়গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

ভালোমের যুদ্ধের পর সংশোধনবাদীরা ক্ষমতা দখল করল রাশিয়ায়। ক্রুশ্চেভের জমানায়
এসে গেল নতুন বিপ্লব। তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিল।

ওরা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু কাজটা করে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো।

মাও সে-তুঙ এই চ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। জানালেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধবংস করতে পারলে বিশ্বের সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। মাও-এর নেতৃত্বে চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর সেই দেশ এখন এগিয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রের পথে।

এই যুগটা বিশ্ববিপ্লবের। সমাজতন্ত্রের বিজয়ের লক্ষ্যে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন এগিয়ে চলেছে, দেশে দেশে যখন বিপ্লবের পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদ যখন পরিপূর্ণ ধবংসের মুখে দাঁড়িয়ে, সে সময় আন্দোলনকে বিধানসভা-লোকসভার নির্বাচনে বেঁধে ফেলার অর্থ বিশ্ববিপ্লবের এই অগ্রগতিকে রোধ করা।

‘শত শত শহীদ আজ বিপ্লবীদের আহ্বান জানাচ্ছেন— মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করো, ধবংস করো। পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার দিন আজ এসেছে। জয় এবার সুনিশ্চিত।’ চাক্র মজুমদারের লেখার আবেগ বৃকের ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়। ওঁর লেখার অনেক লাইন মুখস্থ হয়ে গেছে নিরুপমের। ‘আমরা দেখে যাবো স্বাধীন মুক্ত ভারতবর্ষের উজ্জ্বল সূর্যালোক। পূর্ব দিগন্তের সূর্যরশ্মি পশ্চিম দিগন্তকে উদ্ভাসিত করবে। সমস্ত মানি আর অপচয়, ধবংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে পৃথিবী হবে মুক্ত। আমরা সেই মহান যুগে এসে পৌঁছেছি’ মনে মনে আবৃত্তি করে নিরুপম। গায়ে কাঁটা দেয়। আবার একই সঙ্গে উনি সোজা কথার মানুষ। স্পষ্ট জানিয়েছেন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী লেনিনবাদীদের এখন একটি কাজই প্রধান — গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা।

চাক্রাবার অন্যান্য লেখাগুলি পড়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কর্মটির কর্মসূচিটাও খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে নিরুপমের কাছে। নিজের মনে প্রশ্ন-উত্তর সাজিয়ে এই বিপ্লবের রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করে সে। ভারতবর্ষ দেশটা আদতে একটি আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। এমন একটি ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র নিয়ে যেতে গেলে প্রথম ধাপটি হ’ল নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব। উপনিবেশিকামী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশক্তিকে আঘাত আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে ভেঙে ফেলবার উদ্দেশ্যেই এদেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো অতীব জরুরি। কিন্তু রাস্তাটা কী?

চাক্রাবার মতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করবে কৃষকরাজ। শুরু করতে হবে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল। প্রথমে ছোটখাটো এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে ক্ষমতা। ক্রমশ বেড়ে উঠবে সেই বিপ্লবগুলির পরিধি। এইভাবে এক দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের ফলে, কৃষকযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে গণফৌজ। সেই গণফৌজ কালক্রমে দখল করবে রাষ্ট্রক্ষমতা। দেশব্রতীর লেখা পড়লে রাজ্যের অংগাটা বেশ বোঝা যায়। দেশব্রতীর সঙ্গে নিরুপমের পড়ার তালিকায় থাকে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা লিবারেশন এবং বাংলা মাসিক পত্র ঘটনাপ্রবাহ।

এইসব কাগজ পড়েই নিরুপম জেনেছে, দেশে এখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট। এখন আর চাকরি থাকবে কিনা, সে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন, গোটা কাগজানাটাই থাকবে কিনা? অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রতিদানই দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীসভার অদলবদল। রাজ্যে রাজ্যে সেই আদি অনশ্ব কংগ্রেসের পাশাপাশি মাথা চাড়া দিচ্ছে নতুন

নতুন দল। এমনকী কংগ্রেসের মধ্যেও পুরনোপন্থীদের সঙ্গে নবীনদের দ্বন্দ্ব বেধেছে। কংগ্রেসেরও নতুন চেহারা দরকার। পুরনো মুখ দিয়ে আর শাসন-শোষণ চলছে না। খোদ আমেরিকাতেও প্রেসিডেন্ট লিগুন জনসনকে সরিয়ে আনা হয়েছে নতুন মুখ — রিচার্ড নিক্সন। প্রচলিত দমন-পীড়নের আইনকানুন আর নীরবে মেনে নিচ্ছে না মানুষ। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ, বিদ্রোহের খবর।

বিপ্লবী পরিস্থিতি আছে কি না বোঝবার যে ক'টি লক্ষণ চিনিয়েছেন লেনিন, তার প্রতিটিই আছে ভারতবর্ষে। শুধু একটি বস্তুই নেই। তা হ'ল মার্কসবাদে সুশিক্ষিত, সংগঠিত একটি সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী দল। অতএব এখন আশু প্রয়োজন একটি বিপ্লবী পার্টির। যারা সত্যি সত্যিই সশস্ত্র লড়াই করে দখল করবে রাষ্ট্রক্ষমতা। অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অবশ্য তাদের একটি সভায় বিপ্লবী পার্টি গড়বার সংকল্প নিয়েছে। কমিটি জানিয়েছে, পার্টি প্রতিষ্ঠা করবার সময় এসে গেছে।

নির্বাচনের দুদিন আগে খবর এল অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন তাদের অন্ধ্রপ্রদেশ কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদ করেছে। মতানৈক্য হয়েছে অন্ধ্র কমিটির সঙ্গে। অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি বলেছেন নির্বাচন বয়কট একটা কৌশল হিসাবে দেখাই ভালো। অর্থাৎ বয়কটের পাশাপাশি প্রয়োজনে নির্বাচনে যোগ দেবার রাস্তাও খোলা থাকা দরকার। কিন্তু সর্বভারতীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিপ্লবের সমগ্র যুগ জুড়ে নির্বাচনে যোগ দেবার বিরোধী।

বিরোধিতা সত্ত্বেও কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবেই মিটলো ভোটগ্রহণ পর্ব। দেখা গেল শতাংশের হিসাবে ভালোই ভোট পড়েছে। পাঁচদিনের মাত্রায় প্রকাশিত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল। গুণগুণে বিজয়ী। দু'শো আশিটি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে দু'শো আঠারো। কংগ্রেস মাত্র পঞ্চাশ।

কলকাতার রাণ্ডায় উল্লাসের বান ফ্রন্ট-সমর্থকরা লাল সেলোফেন কাগজে মুড়ে দিয়েছে নাস্তান। ৬৩০০০ টি উৎসবের পরিবেশ। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। অনেকের মনে হচ্ছে, তামিল, ভোটার মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি, দুর্বিনীত, অত্যাচারী সরকারকে বদলে ফেলা যায়!

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পুলিশ দপ্তর ওঁর হাতে।

নতুন সরকারের কাছে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের অনেক আশা। এবার বোধহয় খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে। চাকরির ব্যবস্থাও হবে নিশ্চয়। আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চায় একটি মজার পদ্য ছাপা হ'ল—

যাদের এ ঘর ভাড়া দিলাম পাঁচ বছরের তরে
গদীর লোভে তারা যদি গদায়ুদ্ধ করে,
ফের তাড়িয়ে দিতে পারি, দিয়ে কালির ছাপ,
এনগণের রায় মেনে আজ রাজ্য চালাও বাপ!
চলন্তন ঠেলা মারল। কিরে? গলা মেলা...

মিউল গাউন্ডে ভোক্তার স্রোতধারা রুদ্ধ/হোয়াং হো বহে তাই উদ্দাম / ক্রুদ্ধ
বাজের ডালা শুক মাশামায় ঝুলে ভিয়েতনাম...

নিকপম গলা মেলাল। চলন্তন বলল, পশ্চিমি সুর কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছে দুর্গা গান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুপম অত সূরের সা-রে-গা-মা বোঝে না। তার ভাল লাগছে গানের কথাগুলি। সোভিয়েত রাশিয়া বদলে গেছে, সংশোধনবাদের রাস্তা নিয়েছে। সেজন্যই — ভোলগার স্রোতধারা রুদ্ধ! এখন চিনের হাতে বিপ্লবের রক্ত পতাকা। মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাতেই হবে এ যুগের বিপ্লব — হোয়াংহো বহে তাই উদ্দাম।

... লাঙ্গলের ফলা হোক সঙ্গীন / আমরা যে চাই আরো বাঁচতে / নিশানটা খুনে করো রঙ্গীন / সঙ্গীনটা হবে জানি কাস্তে ...।

যারা গাইছে তাদের গলায় বেশ দাপট। নিরুপমের গলায় বাষ্প এসে গেল। আবার নতুন লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। শত্রু পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। তার সঙ্গে দেশের মধ্যকার আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তো আছেই। এখন দেশের মানুষকে লড়াইতে হবে এই চার শত্রুর বিরুদ্ধে। লড়াইতে লড়াইতে এই চার পাহাড়ের বাধা দূর করতে হবে, ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে হবে ওদের। এক মুহূর্ত থামা নয়। আন্দোলন। আন্দোলন। আন্দোলনের চাপেই তো যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। প্রথমে ছাড়া পেলেন কানু সান্যাল। জঙ্গল সাঁওতালের মুক্তির ব্যবস্থাও নেওয়া হল। একে একে নকশালপন্থী নেতাদের জেল থেকে ছাড়া হচ্ছে। সব রাজনৈতিক বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের ন্যায় আন্দোলন পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে দমন করবে না এমন ধারণাও ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় যেসব পুলিশ এগারোজন কৃষককে গুলি করে মেরেছিল তাদের শাস্তির কথা কেউ ভাবল না।

কদিন পরেই দেখা গেল, পুলিশ আদর্শ একইরকম রয়েছে। দেশত্রীতে খবর বেরোল — শ্রমিক-কর্মচারী কিংবা ছাত্ররা ন্যায় দাবির ভিত্তিতে যেখানেই কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করছেন, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা সক্রিয় হয়ে ঘেরাও মুক্ত করতে মালিকদের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। আরও একটি মজার ব্যাপার — নকশালপন্থীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ দাঙ্গা-খুনের কল্লিত অভিযোগ আনছে। তাদের আর রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা দিচ্ছে না। চলাকির ব্যবস্থা। জোরগলায় বলা যাবে রাজ্যে কোনো রাজনৈতিক বন্দি নেই।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর কফি হাউসের আড্ডায় হঠাৎ একদিন কল্যাণের আবির্ভাব। কল্যাণ বলল, কী রে নিরুপম, তোদের স্লোগান তো পাবলিক নিল না.....ভোট বয়কট করেনি তারা.....

সরকার গঠনের পর কল্যাণ-অঞ্জনদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন রাজ্যে একেবারে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে! যেন মার্কসবাদের সব স্বত্ব কিনে নিয়েছে ওরা। ওদেরই অভিভাবকত্বে যা কিছু আন্দোলন করতে হবে। না হলেই আন্দোলনকারীরা হয় কংগ্রেসের অনুচর অথবা আমেরিকার এজেন্ট! যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দেবার চক্রান্ত করছে তারা!

নিরুপমের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। আমরাও আশা করিনি, সবাই ভোট বয়কট করবে....কিন্তু এই স্লোগান তুলে তাদেরকে সশস্ত্র বিপ্লব করবার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে.....

—আরে সে কথা তো আমাদের প্রমোদ দাশগুপ্তও বলেছেন। কল্যাণ জানাল সম্প্রতি

কোন এক সভায় আমোদদায়ক বলেছেন এই নির্বাচনে ওয়টা সামান্য একটা ব্যাপার। আসল কাজ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই লক্ষ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়বে পাটি।

নিরুপম বলল, সরকারে থেকে কেমন করে ওই বিপ্লবটা করবি তোরা?গ্রামের কৃষক যখন এলাকা দখল করবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ পাঠাবি না?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারে না কল্যাণ। তোরা পুলিশ পাঠাবি কৃষকদের ওপর ওলিও চালাবি। শুধু নিজেদের মতো একটা যুক্তি খাড়া করে দিবি....

দেশব্রতী ঠিক চিনিয়েছে এই নয়া সংশোধনবাদীদের চরিত্র। আগের শাসকদল একেবারে নাজি হয়ে পড়েছে অত্যাচার তাকে পান্টাতে হবে। এল নতুন মুখোশধারী। শোষণের ধারা একটুকরম হয়ে গেল। নতুন মুখ এসে ভালো ভালো কথা বলবে। দুয়েকটা সংস্কারমূলক কাজ করবে। হাস। মুখে কোনো তরিতরাত হবে না।

আলোচনার মধ্যেই কফি হাউসে খবর আসে। চিনের সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়া হামলা চালায়েছে। এর প্রতিবাদে উড স্ট্রিটে সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হবে।

সংশোধনবাদীরা বাড়তে বাড়তে কোথায় পৌঁছেছে। কিছুকাল আগে এই সোভিয়েত দেশ চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করেছিল। তখনই প্রকাশ পেয়েছে ওদের আগ্রাসী চরিত্র। চিনের পাটি ওদের নাম দিয়েছে সোশ্যাল ইম্পিরিয়ালিস্ট — সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী। মুখে সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু কাজে নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদী। এখন এই সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ করেছে মাও সে-তুঙের চিন গণপ্রজাতন্ত্র।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনাও চিরন্তন — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঝগসাজসে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক চিনের সীমান্ত আক্রমণের প্রতিবাদে ১৫ই মার্চ '৬৯ শনিবার সোভিয়েত দূতাবাসে বিক্ষোভ ও ঘেরাও আয়োজন। প্রতিটি স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও এলাকা হতে যুব-ছাত্রসহ শ্রমিক-কর্মচারী ও খেটে খাওয়া সংগ্রামী জনতা লাগ লাগা ও ফেস্টুনসহ বেলা ২টায় মনুমেন্ট ময়দানে হাজারে হাজারে জমায়েত হোন। ও জানাল, আগামী সংখ্যার দেশব্রতীতে ছাপা হবে এই বিজ্ঞপ্তি। — কি রে যাবি তো?

নিশ্চয়ই। নিরুপম হাসল।

আজ সেই মিছিল চলেছে। ... দুশমন আসুক না ভয় কি। মাও সে-তুঙের ডাকে পয়োয়ান / নকশাল উঁচু করে তুলছে / রুশিয়ার বিপ্লবী সম্মান...

উডস্ট্রিট পৌঁছতে সময় লেগে গেল প্রায় চল্লিশ মিনিট।

সোভিয়েত দূতাবাসের কাছাকাছি এসে মিছিলের ছাত্রদের গলার জোর বেড়ে গেল। শুধু হ'ল স্লোগানের পর স্লোগান। নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ওপর হামলা হ'লে মুখের মতো জবাব দাও। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদ ধ্বংস হোক। ভিয়েতনাম, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, পাটল্যান্ড, মালয়া ও আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধ জিন্দাবাদ। মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ। চিনের কমিউনিস্ট পাটি জিন্দাবাদ। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত থাক।

কল দূতাবাসের সামনে গথারিং সশস্ত্র পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে গিয়ে

শক্তিক্ষয় করবার কোনো অর্থ হয় না। অতএব স্লোগান চলতে থাকল।

স্লোগানের তীব্রতা একটু কমলেই শুরু হ'ল গান। আবার ওই নভেম্বরের ডাক শোনো। গানটি সত্যিই পালটে যাওয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার পক্ষে উপযুক্ত। আবার গলা ছাড়ল নিরুপম। চিরন্তন।

ওদের দেখাদেখি গলা মেলাল মিছিলের আরও অনেকে। পুরো মিছিলটা একই গান গাইছে — নভেম্বরের ডাক শোনো। গানের সুর আছড়ে পড়ছে সোভিয়েত দূতাবাসের বন্ধ দরজা, জানালায় দেওয়ালে। যেন ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ঢেউ।

মিছিল, সমাবেশে যাবার এই মজা। নতুন স্লোগানের মতো নতুন নতুন গান শোনা যায়। গানের সুরে যেমন, কথাগুলিতেও নতুনত্ব আছে। বেশ কয়েকদিন গানের কথাগুলি নাড়াচাড়া করল নিরুপম। এক একটা গানের কথা এমনই ভালো লেগে যায়। একেবারে খাপে খাপে এঁটে বসে। গানটি যেন একেবারে তার নিজস্ব। তারই সৃষ্টি।

কলেজে যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই এই নতুন গানের দু'কলি গেয়ে শোনায় নিরুপম। সহপাঠীরা তারিফ করলে আনন্দ হয়। কলেজের মতো গিরীশচন্দ্র ছাত্রাবাস, প্রেসিডেন্সির মাঠ, কফি হাউস, রিপন হোস্টেলের বন্ধুদেরও নতুন গানটি শুনিয়ে দিল নিরুপম।

রিপন হোস্টেলের আড্ডায় পাওয়া গেল তিনটি খবর। চিনের পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও-কে মাও-এর উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। লিন বলেছেন, মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাই এ যুগের লেনিনবাদ। এই যুগের যুগ মাও সে-তুঙের। দ্বিতীয় খবর নকশালবাড়ির রাস্তায় মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদের নেতা অসীম চ্যাটার্জী। সবাই একে 'কাকা' বলে ডাকে। দীপঙ্করদার থেকে গোপীবল্লভপুরে যাওয়া ছাত্রদের কথা শুনেছে নিরুপম।

কাকা এবং আরও কয়েকজন সুশীতল রায়চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে চাক্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে। ওদের বাসনা গ্রামে গিয়ে নকশালবাড়ির ধরনে আন্দোলন শুরু করা। নকশালবাড়ির আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। সুশীতলদা সায় দিতে পারলেন না। তাঁর অভিমত, ওরা আগে গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক, তারপর গ্রামে যাক। চাক্র মজুমদার কিন্তু ছাত্রদের পক্ষ নিলেন। বললেন, আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ এই ছেলেরা আমাদের কাঁধে চেপে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। না না ওরা গ্রামে যাক সুশীতলবাবু আপনি বাধা দেবেন না।

চাক্রদার সমর্থন পেয়ে ছাত্ররা প্রবল খুশি। ওরা যেতে চেয়েছিল কোচবিহার এলাকায়। চাক্রদা জানালেন কোচবিহারের কাজের জন্য উত্তরবঙ্গের কমরেডরা আছে। দক্ষিণবঙ্গে কিছু হওয়া দরকার। মুর্শিদাবাদ, সুন্দরবন ইত্যাদি নানান এলাকা নিয়ে ভাবনা চিন্তার পরে বেছে নেওয়া হ'ল গোপীবল্লভপুর। ওই অঞ্চল থেকে বিহার, ওড়িশাও কাছাকাছি। আন্দোলন শুরু করলে তা পশ্চিমবঙ্গে যেমন প্রভাব ফেলবে, তেমনই অভিঘাত পড়বে বিহার, ওড়িশাতেও। প্রয়োজনমত সরে যাওয়া যাবে অন্য রাজ্যে।

সেই গোপীবল্লভপুরে ডোর কদমে শুরু হয়ে গেছে কৃষক সংগ্রাম। এই আন্দোলন খুব শীগগির ছড়িয়ে যাবে অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে — সুরমহি, বহড়াগোড়া, ধলভূমগড়। ইতিমধ্যেই দু'দল ছেলে শহর ছেড়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দীপঙ্করদাও কিছুদিনের

মসোই চলে যান গোপীবন্দুপুর। যথার্থ শিক্ষা হ'ল শ্রমিক, কৃষক মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাধ্য হওয়া। গোপীবন্দুপুরের আন্দোলনকারীরা সম্প্রতি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

তিন নখর খবরটি মনুমেস্ট ময়দানে জনসভার। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কলকাতা কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে পয়লা মে বিকেল পাঁচটায় হবে এই জনসভা। চিরন্তন বলল, দেখা, এই মিটিং পুঁট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বস্ত্র কানু সান্যাল।

মে দিবসের সভার পঞ্জীভুক্ত হাঙ হয়ে পড়ল সবাই। সন্ধ্যা হলেই মিছিল শুরু হয়। পয়লা মে মনুমেস্টের জনসভায় দলে দলে যোগ দিন। যোগ দিন। নকশালবাড়ি লাল সেলাম। লাল সেলাম। শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে, বঙ্গবাসী-সুরেন্দ্রনাথ-সেন্টপল্‌স-সিটি-গোপীভাণ্ডার টাওয়ার মধ্য কলকাতার সমস্ত কলেজের গেটে ছোট ছোট পথসভা করল চিরন্তন নিরুপম।

মনুমেস্ট ময়দানের সভায় বিশাল জনসমাবেশ ঘটাতে হবে। চতুর্দিকে প্রচার চালান দরকার। প্রচার চালানোর জন্য দেশব্রতী অফিস থেকে পাওয়া যাচ্ছে পোস্টার, ইস্তাহার। এক হাজার পোস্টার, দশ টাকা। এক হাজার ইস্তাহারের দামও দশ টাকা। সবাই মিলে চাঁদা তুলে কেনা চল পাঁচ হাজার পোস্টার-ইস্তাহার। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্ররা পৌঁছে দিল সেই পোস্টার। শিয়ালদা স্টেশনে তো একদিনেই বিলি হয়ে গেল দু'হাজার ইস্তাহার। খবরের কাগজের ওপর পোস্টারের কথাগুলি লিখে সাঁটিয়ে দেওয়া হল পাড়ার দেওয়ালে।

মিছিল জমায়েতের স্থান আর সময় দিয়ে বিস্তারিত বেরিয়েছে দেশব্রতীতে। শিয়ালদা স্টেশন, চাণ্ডা বিজা, আত্মদ হিন্দ বাগ, হুজুরা পার্ক আর মাঝেরহাট ব্রিজে জমায়েতের সময় সাড়ে তিনটে। শুধু বেতলা মিউনিসিপ্যালিটির পাশের মাঠে জড়ো হবার সময় দুপুর আড়াইটে।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে শুরু হওয়া মিছিলে যোগ দিল নিরুপম, চিরন্তন, মধ্য কলকাতার ছাত্র কো-অর্ডিনেশন কমিটির সবাই। ধর্মতলা পেরিয়ে চৌরঙ্গীতে পড়তেই পাশাপাশি আর একটি মিছিল এসে গেল। সি পি এম-এর মিছিল। ওরা ব্রিগেড ময়দানে জনসভার ডাক দিয়েছে।

ব্রিগেডগামী মিছিলটি থেকে ছুটে এল বোমা। মারামারি শুরু হয়ে গেল। কো-অর্ডিনেশনের মিছিলেও ডাকবুকো ছেলের অভাব নেই। তারাও ছুঁড়ল বোমা। সাইকেলের চেনা হাতে ধাওয়া করল ব্রিগেডগামী মিছিলটিকে।

পুলিশ নেমে পড়ল। লাঠি চালিয়ে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করল বিশৃঙ্খলা। কিন্তু আন্টগের গ্যাসার, পুলিশের যত আশ্রয় সব কো-অর্ডিনেশনের মিছিলের ওপর। তাদের লক্ষ্য করেই গ্যাস, লাঠি। এমনকী মনুমেস্টের সামনে লাগানো কয়েকটি ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলল তারা। সভাস্থল ছেঁড়তে হতে গেছে। নিরুপম-চিরন্তনরা কার্জন পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে। মেয়াদি সিরোমার সামনে দাঁড়িয়ে একদল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে আটকে একটি মিছিল।

জনসভার পাঁচটা থেকে প্রোগান দিতে শুরু করল কয়েকজন। নকশালবাড়ি লাল সেলাম। পুলিশ জলুম মানাচ্ছিল না মানবে না। শাসকশ্রেণীর দুইটি ফ্রন্ট কংগ্রেস আর গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ যোগাযোগে সাহস দিয়ে আসে সবার। আহ্বাত। ছাত্র জনতা সভার

জায়গায় ফিরে আসে। নির্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পরে শুরু হ'ল জনসভা। তুমুল ভিড় চারদিকে। অন্তত ষাট-সত্তর হাজার মানুষ তো হবেই।

বেশি কিছু ভিনতা না করেই কানু সান্যাল ঘোষণা করলেন নতুন পার্টির জন্মের কথা। তার নাম কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সংক্ষেপে - সি পি আই (এম এল)। পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে আটদিন আগে। মহান লেনিনের শততম জন্মদিনে। মে দিবসের এই জনসভায় সেই পার্টির জন্ম-ঘোষণা।

‘.....আমি জানি আমার দেশের মহান জনগণ এই ঘোষণাকে দু'হাত তুলে অভিনন্দিত করবেন, ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই পার্টি গঠন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে বুঝতে পারবেন। এই পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামকে নতুন স্তরে উন্নীত করতে এগিয়ে যাবেন। আর এও জানি, এই ঘোষণা নামী বেনামী সবারকম শত্রুদের মনে সাংঘাতিক আতঙ্কের সৃষ্টি করবে।.....’

‘..... চেয়ারম্যান বলেছেন, চরম বলিদান সাহসী সংকল্প এনে দেয়, যা নতুন আকাশে সূর্য ও চন্দ্রকে উদ্ভিত করার সাহস দেয়। আমাদের মহান দেশ ভারতের আকাশে নতুন সূর্য ও চন্দ্রকে আমরা উদ্ভিত করতে পারব। আমাদের মহান জনগণ অন্য সমস্ত দেশের জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এগিয়ে যাবেন স্বাধীন শোষণমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনের দিকে।.....’

উপস্থিত জনতা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল কানু সান্যালকে। মাঠে স্লোগান শুরু হয়ে গেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাল সেলাম। লাল সেলাম। লাল সেলাম। সি পি আই(এম-এল) লাল সেলাম। লাল সেলাম। লাল সেলাম।

কানু সান্যাল জানালেন, এ যুগ বিশ্ববিপ্লবের। চিনের পার্টি বলেছে, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই অর্থাৎ দু'হাজার এক সালের মধ্যে পুরা বিশ্বে সর্বহারাদের বিপ্লব হয়ে যাবে। এ কোনো কথার কথা নয়। এ হ'ল আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের নির্দেশ। নবগঠিত দল সি পি আই (এম এল) এই নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে বদ্ধপরিকর। তারা এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করবেই।

জনতার একাংশ মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে স্লোগান দিয়ে উঠল কমরেড কানু সান্যাল লাল সেলাম। নিরুপম গলা মেলাল, লাল সেলাম। লাল সেলাম।

সভা ভেঙে যাবার পরও খণ্ড খণ্ড সভা চলে। ভাঁড়ের চা খেতে খেতে একদল আলোচনা করে চলেছে নতুন পার্টির। তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু লোক। অন্যদিকে, জেলা থেকে আসা মানুষজন এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। ফেস্টুন গুটিয়ে রাখছে কিছু কর্মী। লরি চেপে সবাই একসঙ্গে ফিরে যাবে।

ভিড়ের মধ্যে একা হাঁটতে ভালো লাগে নিরুপমের। সবাইকে বেশ একটু নজর করে দেখা যায়।

মনমুগ্ধ ময়দানের বাস গুমটি ছাড়িয়ে একটু এগোতেই এক জটলা থেকে গান ভেসে এল। মুগ্ধ হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সেদিন সুদূর নয় আর— / দেখ লাল সূর্যের আলোয় লাল পূর্বসমুদ্রের পার। / সে আলো ছড়ায় দিক্‌বিদিকে, কেটে যায় রাতের আঁধার।

এই গান আগে কোনোদিন শোনেনি নিরুপম। চারু মজুমদারের লেখা কিছু কিছু শব্দ গানে ঢুকে পড়েছে। লাল সূর্যের আলোকধারায় করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান / উঠবে গেয়ে মুক্তির গান যুগ-যুগ নিপীড়িত মজুর কিষাণ.....

পুরুষ এবং মহিলা দুই কণ্ঠই শোনা যাচ্ছে। গায়কদের কাছাকাছি গিয়ে একজনকে দেখে চমকে উঠল নিরুপম। আরে এ তো সেই মেয়ে! সেই হলুদ শাড়ি যে আমেরিকান সেন্টারের সামনে টিয়ার গ্যাসের দাপটে কাহিল হয়ে পড়েছিল। ওকেই তো হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল সে। গানের শেষে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল নিরুপম। খুব ভালো গেয়েছেন। মেয়েটি হাসল। ধন্যবাদ।

আমায় চিনতে পারছেন তো? নিরুপম বলল।

মেয়েটি ডুপ ঝুঞ্জে তাকাল। আরে! চিনব না কেন? কী আশ্চর্য! নিরুপম চ্যাটার্জি। হাসি হাসল। কলেজ স্টুডেন্টে আমার বন্ধু! কী ঠিক বললাম তো?

লজ্জা, পেল নিরুপম। কথা ঘোরাবার জন্য গানটির রচয়িতার নাম জানতে চাইল। সুকান্ট না কে?

ওপদ শাড়ি বলল, আমাদের এলাকার এক দাদা লিখেছেনওরই দেওয়া সুর....আপনি চিনেন না তাকে।

দু এক কথার পর নিরুপম বলল, আজ কিন্তু আপনার নাম বলতেই হবে।

ওপদ শাড়ির মুখে উজ্জ্বল হাসি। লাল আঁচিল দীপ্যমান। — ও ভোলেননি দেখছি....। 'আজ্ঞা ঠিক আছে বলছি... পাঞ্চালী.... আমার নাম পাঞ্চালী মিত্র। এবার খুশি তো?

নিরুপম হাসল। — তাহলে আজ আমরা বন্ধু হচ্ছি গোলাম। নিরুপম ঘাড় নাড়ল।

অতএব আজ থেকে আমরা পরস্পরকে আপনি বলব না। তুমি বলব। ঠিক আছে? এবারও ঘাড় নাড়ল নিরুপম। একদম ঠিক।

নিরুপমের ইচ্ছে করছিল পাঞ্চালীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু ভাঁড়ের চা খায়। কিন্তু কিছু বলবার আগেই হঠাৎ একটা মিছিল এসে গেল। সভাশেষে, উৎসাহীরা মিছিল করে ঘরে গিয়েছে। স্লোগানও দিচ্ছে ওরা।

মিছিলের ধাক্কায় পাঞ্চালী চলে গেল দূরে। নিরুপমও সরে এল বাসগুমটির দিকে। ধরমুখী মিছিলটি খরস্রোতা নদীর মতন। ওপারে পাঞ্চালী। এপারে নিরুপম। ওপার থেকে পাঞ্চালী হাত নেড়ে চিৎকার করল। চলি.....ঠিক আছে?.....পরে কথা হবে।

পাঞ্চালী চলে গেল। একা একা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটল নিরুপম। বিষণ্ণ লাগছে। বিষণ্ণতা মাকড়সার জালের মতো। ঝাড়পোঁছ না করার প্রশ্ন দিলে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যায়। সামনে অনেক কাজ। এই বিপ্লবের কালে একা একা রোমান্টিক চিন্তায় মগ্ন থাকা অন্যায্য। দীপঙ্করদার মতো তার বন্ধুরাও গ্রামে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে এ সময় একাকী নিজেকে নিয়ে কাটানো আত্মরতির সামিল।

পাড়ায় ফিরেই নিরুপম সোজা চলে গেল গিরীশচন্দ্র ছাত্রাবাসে। চা-সিঙাড়া খেতে খেতে ওস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা চলল কিছুক্ষণ। খানিক তরতাজা হয়ে উঠল সে।

পরদিন সমস্ত দৈনিকপত্র ছাপা হ'ল নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠার খবর। পরের দেশব্রতীতে পাওয়া গেল পার্টি গঠনের খবর, ময়দানের সভার বিবরণী। জনসভার আগে সি পি এম-এর মিছিলের সঙ্গে সংগঠনের শক্তিশালী কান্ড সান্যাল জানিয়েছেন, হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেব। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, আক্রমণের জবাব চাওয়া নয়, বদলা নেবার সময় এসেছে এখন। নিরুপম উদ্দীপ্ত। এই পার্টিই বিপ্লব করতে পারবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। সশস্ত্র কৃষক

সংগ্রাম যা শুরু হয়েছিল নকশালবাড়িতে, এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীকাকুলাম, মুশাহারি, লখিমপুর খেরী এবং আরও নতুন-নতুন এলাকায়। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের শেষে মুক্তি। ঘুচে যাবে আমীর গরীবের ব্যবধান। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সেও এক অংশীদার। এই দীর্ঘমেয়াদি জনযুদ্ধে সেও এক সৈনিক। নিরুপমের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

পার্টি গঠনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন সিনেমাহলে আর রাজ্যের কয়েকটি জেলায় মুক্তি পেল শতরঞ্জ নামে একটি ছবি। এই ফিল্মে ঠারে-ঠোরে চিন বিরোধী কথাবার্তা বলা হয়েছে। কমিউনিস্টদের বিদ্রূপ করা হয়েছে। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ তাকিয়ে আছে যে দেশটির দিকে তার নাম চিন। যে মানুষটির দিকে, তাঁর নাম মাও সে-তুঙ। এই আঘাত যুব-ছাত্ররা কখনওই মুখ বুজে সহ্য করবে না। এখন আর কোনো দ্বিধা, ভয় নয়। বিপ্লবী পার্টি গঠিত হয়ে গেছে। নতুন নতুন এলাকায় পার্টি ইউনিট খোলা হচ্ছে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির শাখাগুলি এখন পার্টির শাখা। কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছাত্র সংগঠন এখন পার্টির সংগঠন।

ছাত্র সংগঠনের মিটিঙে চিরন্তন বলল, মহান লেনিন সেই দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যখন বিপ্লবী ভারত বিপ্লবী চিনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে — পতন ঘটাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার।

মানিক বলল, ঠিক কথা.....এই জন্যই চিনের মহান জনতার সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হবার সংকল্প নেওয়া উচিত ভারতের বিপ্লবীদের।

সঞ্জীব বলল, আমাদের দু'দেশের অভিন্ন স্বপ্ন হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ.....এই সাম্রাজ্যবাদীরাই চিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে.....শতরঞ্জ হল সেই কুৎসামূলক প্রচারের অঙ্গ.....।

দ্রুত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। শতরঞ্জ সিনেমা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে হবে। শুধু নিরামিশ প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজনে সশস্ত্র বিক্ষোভ। বন্ধ করতে হবে চিন বিরোধী এই কুৎসা।

প্রথম অ্যাকশনটি হল উত্তর কলকাতার মিত্রা সিনেমায়। হাতিবাগানে গ্রে স্ট্রিট - কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের মোড় থেকে শ্যামবাজারের দিকে একটু এগোলেই ডান হাতে মিত্রা সিনেমা। সিনেমা হলের বাইরে শতরঞ্জ-এর বিজ্ঞাপন। বিশাল একটি হোর্ডিং টাঙানো হলের গায়ে। উল্টোদিকের ফুটপাথে চিরন্তন-সজল-দিলীপ-সঞ্জীব পজিশন নিল। টিকিট কাউন্টারের সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল পাঁচজনের আর একটি দল। তিনটি টিকিট কাটা হয়েছিল। নিরুপম, গোবিন্দ, মানিক ঢুকে গেল হলের ভেতর। প্রেক্ষাগৃহে ঢোকবার তিনটি দরজা। প্রত্যেকটির একটি করে পাল্লা খোলা। কালো পর্দা ঝুলছে। হলের ভেতরে মৃদু আলো। হালকা যন্ত্রসংগীত বাজছে। একজন কর্মচারী ওদের টিকিট দেখে আসন তিনটি টর্চের আলোয় চিনিয়ে দিলেন। দর্শকরা বসতে শুরু করেছে। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবে গেল। এইবার সিনেমা শুরু হবে। সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে শোনা গেল শ্লোগান — চিনের কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। চেয়ারম্যান মাও যুগ যুগ জিও। যুগ যুগ জিও। চেয়ারম্যানের চিনের ওপর আক্রমণ মানা হচ্ছে না মানাও না।

শ্লোগানটাই অ্যাকশন শুরু করার সংকেত। শাপ খোলা ছুরি হাতে গোবিন্দ নিরুপম ছুটে গেল মঞ্চের দিকে। ছিড়ে ফেলল সিনেমার পর্দা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো ছেলের

দলটি ছেলের মতো ঢুকে পড়েছে। মানিক চিৎকার করল, চিন বিরোধী চক্রান্ত মানছি না মানবো না। মানিক সাপ্তাহিকবাদের দালালদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ছেলেরা গলা মেলাল।

গাটের থেকে ভেসে এল বোমার আওয়াজ। দর্শকদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বাইরে যাবার তড়োতড়ি। ভিড়ে মিশে নিরুপমরা বেরিয়ে এল সবাই। বোমার অভিঘাতে শতরঞ্জের ত্রোড় টি ভেঙে পড়েছে গাভায়। প্রজেকশন রুমে ঢুকে পড়েছিল চিরন্তনরা। বের করে এলোকে সিঁচোমান গিল। গিল্ম থ্রুপে ট্রাম লাইনের ওপর ফেলে দেওয়া হ'ল। একটি ট্রাম চলে গেল গিল্মের বসণ দিয়ে। ছাঁপের দফারফা। আর ব্যবহার করা যাবে না। শতরঞ্জের সদর্শন এক। কাউন্টার থেকে টিকিটের মূল্য ফেরত নিচ্ছে দর্শকরা। নিরুপমরাও ফেরত নিয়ে নিল টিকিটের দাম। ওই পয়সায় একটা করে লেঙ্গ সিগারেট হয়ে গেল সবার।

অ্যাকশনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে যায়। একটা অ্যাকশন আরও অ্যাকশনের প্ররোচনা দেয়। পরের দিনই বিক্ষোভ হল কাঁচরাপাড়ায়। লক্ষ্মীশ্রী সিনেমা হলের সামনে। শতরঞ্জ প্রদর্শন এক। কয়েকদিন পরেই দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া, মধ্য কলকাতার ওরিয়েন্ট আর ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলেও চলল শতরঞ্জ বিরোধী অভিযান। সিনেমা হল মালিকরা হতচকিত। পুলিশও! অতীতে এমনভাবে সিনেমা হল আক্রান্ত হয়নি।

তিনটি হল আক্রান্ত হবার পর, সুকান্তি সাবধান করলেন নিরুপমকে। পুলিশ নিশ্চিত গুণ্ডা ফিরছে তোমাদের। এখন কদিন বাড়িতে থেকো না। নিরুপম বলল, এই সামান্য বিক্ষোভের জন্য ধরবে?

শেষ মুহূর্তে সুকান্তিদার কথা শুনে সিন্ধু বদল করলো নিরুপম। সেই রাতে চলে গেল রিপন হোস্টেল। জানাচেনা থাকায় একজনের ঘরে থেকে যেতে কোনোই অসুবিধা হল না তার। সকালে খবর পেল বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। সব শুনে দীপঙ্করদা বললেন, ততলে ঠিক জায়গায় যা মেরেছি আমরা। নিরুপম বলল, একেবারে মোক্ষম জায়গায়। সব ঠিক। কিন্তু ধরা পড়ে কোনো লাভ নেই। আর বাড়িতে থাকতে পারল না নিরুপম।



যে স্বপ্ন দেখে না আর অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না সে কোনোদিন বিপ্লবী হতে পারবে না।আমরা এমনই রোমান্টিক। বিরহী যক্ষের রোমান্টিকতা একজন বিপ্লবীর থাকবে না কেন? চন্দ্রদাস গলা কানে আসতেই, প্রফ দেখা থামিয়ে সুকান্তি পাশের ঘরের দিকে তাকালেন। খবর দরজা বন্ধ করে দিলে, ভেতরের আওয়াজ বাইরে আসবার নয়। কিন্তু আজ কপটি এক করা হয়নি। শুধু পর্দাটা ফেলা। সেজন্য পাতলা গলা যার কিংবা যার গলা একটি উচ্চস্বরে উঠে, শুধু তাদের কণ্ঠস্বরই পর্দা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে।

চন্দ্রদাস কাছে গালা এসেছে, তাদের কেউ প্রশ্ন করল, কমরেড আমাদের ভুলও তো হতে পারে

বারবার তার ছিঁড়তে ছিঁড়তে সৃষ্টি করেন অপূর্ব সুর, ঠিক তেমনি গভীর থেকে গভীরতর শেখার প্রচেষ্টা নিয়ে কৃষকের কাছে বারবার গেলেই আমরা খুঁজে পাব সেই শক্তি যা এই সমাজকে ভেঙে, গড়ে তুলতে পারবে নতুন সমাজ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। আবার চন্দ্রদার গলা ভেসে এল। গ্রামাঞ্চলে রেডিও নেয়ার ব্যাপারে জোর দাও.....পিকিং রেডিও প্রতিদিন শোনা একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হিসেবে নিতে হবে.....আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রায় প্রতিদিন নির্দেশ দিচ্ছেন, সে নির্দেশ আমাদের বুঝতে হবে।

সুকান্তি আবার প্রফ দেখায় মন দিলেন। লিবারেশনের এই প্রফগুলি অবিলম্বে সংশোধন করা দরকার। অঙ্ক এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের রিপোর্ট এসেছে। সেই লেখাদুটিও আগামী সংখ্যার লিবারেশনে দেওয়া দরকার। প্রচুর কাজ। কিন্তু মনটা একাগ্র হচ্ছে না। বশে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই।

চন্দ্রদা মানুষটি কিছু অদ্ভুত। ছোটখাটো শীর্ণ চেহারা। একমাথা চুল। নাকটি লম্বা—প্রায় ঠোট ছুঁই ছুঁই। বয়স কত হবে? তিনি সুকান্তির চেয়ে মাস ছয়েকের বড়। অতএব বাহান্ন পরিয়েছে। তবে দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে বয়সের তুলনায় বেশি বৃদ্ধ দেখায়। কিন্তু চন্দ্রদার চোখ দুটি উজ্জ্বল। বিপ্লবের কথা বলতে বলতে বড় বড় চোখ দুটিতে অশ্রু জমে মানুষটির। ওই চোখ আর কথা শুনে বোঝা যায় মানুষটি আসলে চাক্র মজুমদার। যিনি চন্দ্র ছদ্মনামে সুকান্তির বাড়িতে আজ একমাস হুস্ত চলল আত্মগোপন করে আছেন।

পরিচয় গোপন করে থাকার পক্ষে এ বাড়ি সুবিধাজনক। প্রথমত, পাড়াটি নির্জন। দুপুরে বা রাত্তিরে সবার অলক্ষ্যে বাড়িতে ঢোকা এবং বেরনো যায়। দ্বিতীয়ত, অতিথির থাকার জন্য আলাদা একটি ঘর আছে বাড়িতে। এই ঘরেই সুকান্তির মা থাকতেন। ঘরটির সংলগ্ন বাথরুম। তৃতীয় কারণটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গৃহকর্তা তার চন্দ্রদার ওপর অতীব প্রসন্ন।

রেবাকে নিয়েই চিন্তা ছিল সুকান্তির। প্রথম যেদিন চন্দ্রদা এসে, মোড়া টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমি কিন্তু হাঁড়ির খবর রাখতে ভালোবাসি, বুক ধুকপুক করে উঠেছিল। রেবা কী উত্তর দেবে?

রেবা বলল, আর আমি কিন্তু নাড়ির খবর রাখতে ভালোবাসি....যেমন আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি আপনার ঐ বস্তুটি এখন একটু দুর্বল, একটু চা খাবেন নাকি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। চন্দ্রদা হেসে উঠলেন। ক্রমশ জানা গেল ওঁর শরীর এক বছর ধরেই কমবেশি খারাপ চলছে। দু'বার হার্ট অ্যাটাকও হয়েছে। এ বছরের গোড়ায় বেশ একটু জটিল হয়ে উঠেছিল শারীরিক অবস্থা। শিলিগুড়িতে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ওঁকে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানিয়েছে হৃদযন্ত্রের গতিগোল — মায়োকার্ডিয়াল ইস্‌কিমিয়া উইথ অ্যানজাইনা। মোদ্দা কথাটা হ'ল মাঝে মাঝেই ওঁর হৃদপিণ্ডে রক্তের জোগান কমে যায়। এজন্যই ওষুধপত্র খেয়ে, ইন্জেকশন নিয়ে হৃদয়ে রক্ত চলাচলের পথটি সুগম রাখতে হবে। রক্ত চলাচলের পথ অণাশ রাখার চেষ্টা হলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ বৃকে ব্যথা ওঠে। খুব কষ্ট হয় তখন। শরীর অস্থির হয়ে ওঠে। একটার পর একটা ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। ইনজেকশন নিতে হয়। তিন-চার ঘণ্টা পরে শরীরের অস্বস্তি সহ্য করবার মতো অবস্থা আসে। হঠাৎ দমের কন্ঠের কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে

একটি অগ্নিগোপন সিলিন্ডারও এনে রেখেছেন সুকান্তি। রবীন নামে এক ডান্ডার কমরেড রেণাকে শিখিয়ে দিয়েছে অগ্নিজেন দেবার পদ্ধতি। ইনজেকশন দেবার কৌশল।

এমন লোকের পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা খুবই শক্ত কাজ। তবু, তাঁকে লুকিয়ে থাকতেই হবে। কয়েকমাস আগে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, বোঝা গিয়েছিল। সেবার ৭৬ মেয়েকে নিয়ে প্লেনে চেপে এসেছিলেন কলকাতায়। দেখা গেল বিমানবন্দর থেকেই পুলিশ তাঁকে অনুসরণ করছে। কাঁকুড়াগাছির কাছে এক ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখা হ'ল তাঁকে। ঠিক কোন বাড়িতে উনি আছেন বুঝতে না পেরে, গোয়েন্দারা বহুক্ষণ বাইরে থানা গেড়ে ছিল। রাত এগারোটার পরে ওরা চলে যেতে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হল। পরদিন ৭৬ মেয়েকে নিয়ে সুনীতিবাবু চলে গেলেন।

সেবার চন্দ্রদাকে যেখানে সরানো হল দক্ষিণ কলকাতার সেই বাড়িতেও গেছেন সুকান্তি। ওই বাড়িতে চারু মজুমদারকে রায়মশাই বলে ডাকতেন গৃহকর্ত্তী। গৃহকর্ত্তাও বলতেন রায়মশাই। ওঁর সঙ্গে বাইরের লোকদের পরিচয় করাতেন ওই নামেই। এর থেকে শিক্ষা নিয়েছেন সুকান্তি। তিনিও চারুবাবুকে পরিচয় করান চন্দ্রকুমার রায় নামেই। যদিও সুকান্তির বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তেমন একটা আসে না। তবু সাবধানের মার নেই। ওঁকে চন্দ্রদা বলে সম্বোধন করতে করতে আজ এই একমাসে চারু মজুমদার নামটাই বরং অপরিচিত লাগে।

প্রথম আলাপের পরেই রেবার সঙ্গে খুব জড়িয়ে গেল চন্দ্রদার। উত্তরবঙ্গের মানুষটি চা তৈরি করবার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। রেবাকে শেখালেন ভালো চা বানানোর টুকটি। আগে জল ফোটাবেন.....প্রথম ফুটে ওঠে জলে চা পাতা দেবেন। দেখবেন চা ভালো হবেই।

রেবা বলল, আরে, আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? তুমি বলুন। চন্দ্রদা হাসলেন। শুনুন আমি তো সি পি এম-এর বড় নেতা ছিলাম না...মাত্র জেলাস্তরে ছিলাম.....কলকাতার বড় নেতা হ'লে তুমি-তুমি বলে স্ব্ঞান দেওয়া যেত!

এরপর থেকে রেবা তার চন্দ্রদার থেকে নানান সাংসারিক পরামর্শও নিয়ে থাকে।

রেবাকে অনেক পাশ্টে দিয়েছেন চন্দ্রদা। সমস্ত অতীত-বৃত্তান্ত জানিয়ে চন্দ্রদাকে একান্তে বলেছিলেন সুকান্তি, আপনি মশাই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সুকান্তির চোখে চোখ রাখলেন চন্দ্রদা। হঁ, মানুষ বড় অদ্ভুতশুধু বাইরেটা দেখেই মানুষের চরিত্র বিচার করতে বসবেন না। অফিসে দেখা গেল একটা লোক হাড় কিপ্টে। কাউকে এক কাপ চা-ও খাওয়ায় না। হেঁটে বাসের ভাড়া বাঁচায়। বাসের ভাড়া বাড়লে বোধ হয় মনে মনে খুশিই হয়। সেই লোকটাই হয়তো বাড়ি ফেরার পথে ট্রেন ধরবার আগে হাওড়া স্টেশন থেকে মেয়ের জন্য পুতুল কিনে নিয়ে যায়। এবার লোকটিকে কী বলবেন, কিপ্টে? না ত্যাগী? যে মেয়ের জন্য নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে!

সুকান্তি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ঠিক বলেছেন, মানুষ বড় অদ্ভুত....জানেন তো, পুলিশীতে মানুষট একমাত্র প্রাণী যে শত্রুর সঙ্গেও পাশাপাশি বসে খাবার খায়.....। চন্দ্রদা জোরে হেসে উঠলেন। আপনি মশাই খুব দুষ্ট লোক, সুযোগ পেয়ে অমনি একটা গুগলি গুল দিচ্ছে দিলেন। ওঁর গাই বলুন আমরা কি শু শত্রুদের সঙ্গে বসে খাব না।

রেবা তো বটেই, মেয়ে সুরভির সঙ্গেও চন্দ্রদার খুব পটে গেছে। সুরভি সদ্য ডাক্তারি পড়তে চুকেছে। কলেজ থেকে ফিরেই ও চন্দ্রদার সঙ্গে কলেজের গল্প করতে বসে যায়। চন্দ্রদা মন দিয়ে ওর কথা শোনেন। সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করেন এখনকার ছেলেমেয়েদের মন।

চন্দ্রদা বলেছেন, ডাক্তারি যদি শিখতেই হয়, তাহলে শিখতে হবে এই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে রোগ-ব্যাদি থেকে মুক্ত করবার জন্য, কয়েকটি বিশেষ রোগের বিশেষজ্ঞ হবার জন্য নিশ্চয় নয়। সুরভি মাথা নেড়েছে। ঠিক কথা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে চিকিৎসা ব্যবস্থা। চন্দ্রদা ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ মানুষ মানে হ'ল কৃষক। ভারতবর্ষ হ'ল কৃষকের দেশ। সুরভি বলেছে, চন্দ্রদা.....কথাটা ঠিক.....কিন্তু আমার একার পক্ষে এত বড় একটা কাজে হাত দেওয়া খুব শক্ত....। কিছু মানুষ আছে যারা ছোটবড় সবার দাদা হয়ে থাকতে পারে— চন্দ্রদা সেইরকম। এজন্য সুরভিও চন্দ্রকে দাদা বলেই ডাকে। জ্যেষ্ঠ নয়, দাদা। সুরভির কথায় চন্দ্রদা হেসেছেন। ইয়ং লেডি, ভয় পেয়ো না। এগিয়ে যাও ঠিক পারবে। পরিশ্রম করতে পিছপা হয়ো না.....

চন্দ্রদার কথায় দর্শন এসে গেছে। আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা হ'ল সামন্ত শ্রেণীর দান। শ্রমিক শ্রেণীর ধরনধারন শেখায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। কাপুরুষতা — ধনিকশ্রেণীর দান কারণ তারা ব্যক্তিস্বার্থকে সবার উপরে জায়গা দেয়। শ্রমিক শ্রেণী শেখায় মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের অধিকারী হতে।

সুরভি বলে, জানো তো আসল লড়াইটা নিজের সঙ্গে.....

চন্দ্রদা বলেন, একেবারে ঠিক কথা.....ঠিক বলেছ।

শীর্ণ মানুষটির চোখ জ্বলজ্বল করে। তিনি সুরভির দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়। বারবার ব্যক্তিস্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিস্বার্থ শোষণভিত্তিক সমাজের দান। স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের চরিত্র পরিবর্তনের সংগ্রাম.....তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়.....পাস্টে ফেলতে হয় অনেক পুরনো অভ্যাস।

সুরভির দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বললেও, সুকান্তি বুঝেছেন, চন্দ্রদা নিজের সঙ্গেও কথা বলে চলেছেন। এমনভাবে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে যাচাই করেন বলেই তাঁর বলা কথাগুলিতে নিহিত থাকে প্রবল শক্তি।

কথার মতন, মানুষটির প্রাত্যহিক অভ্যাসগুলিও সুন্দর। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে তাঁর। উঠেই হাত মুখ ধুয়ে, স্নান সেরে নেন। একটি বাটিতে জলে ভেজানো থাকে একপাটি বাঁধানো দাত। রাত্তিরে শোবার আগে নিয়মিত সেই দাঁতের পাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার করা হয়। স্নানঘর থেকে বেরিয়েই প্রথম কাজ হ'ল সেই দাঁতের পাটি পরে নেওয়া। মাথা মুছে, গামছা শুকোতে দেবার পরই তিনি চালিয়ে দেন ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও। এই রেডিওটি এক কমরেড নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে। রেডিও চালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে গান শুনবেন তিনি। রেডিও-র আওয়াজ কখনওই উচ্চগ্রামে যায় না। গানের মৃদু আওয়াজ বেশি পছন্দ তাঁর। গানের ফাঁকে চা-পান চলে। চায়ের পরে তিনি ঝোলা থেকে বের করেন টোবাকো মিস্কাচার। বের হয় সিগারেটের কাগজ। কাগজে তামাক

চোপে পাকিয়ে পাকিয়ে বানানো হয় ছোট সিগারেট। প্রথম টানটি মেরে আরাম হয়।
এলে ওঠেন আঃ। সুকান্তি অনেকবার বলেছেন সিগারেট ছেড়ে দেবার কথা। উনিও স্বীকার
করেছেন ছাড়াই উচিত। কিন্তু সেই ছোটবেলাকার অভ্যেস, ছাড়া শক্ত। তবে চেষ্টা
করাছি। কর্মিয়ে দিয়েছি অনেক। চন্দ্রদা হাসেন।

তার ঝোলায় আছে এক জোড়া লুঙ্গি। একজোড়া শার্টপ্যান্ট। আর কিছু বই। দুপুরবেলায়
মানুষটি ঘুমোন না, বই পড়েন। তীব্র তার বই পড়ার ক্ষুধা। কোনো বাহ্যবিচার নেই,
সবসময় এই বই পড়েন তিনি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা থেকে অর্থবিদ্যা সব কিছু। কদিন
আগেই পড়াছিলেন সিমোন দ বুভোয়া-র সেকেন্ড সেক্স। এর আগে তাঁকে জাঁ পল
সার-এ পাঁচিং অ্যান্ড নাথিংনেস-ও পড়তে দেখেছেন সুকান্তি।

দুপুর, বিকেলের দিকে তার কাছে অনেকে দেখা করতে আসে। তিন দস্তা 'স' সুনীতিবাবু-
সরোজাবাবু-সুশীতলবাবু তো আসেনই, শ্রমিক সংগঠন করা যুবক, সদ্য গ্রামফেরত যুবকরাও
আসে। আজ যেমন এসেছে একদল কলেজের ছেলে। ওরা গ্রামে যাবে কৃষকদের মধ্যে
কাজ করতে।

একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, আমরা সঙ্গে কিছু অস্ত্র নিয়ে যাই?... দু-তিনটে পাইপগান?
চন্দ্রদা বললেন, না না একেবারেই না। শহর থেকে কেউ একটা বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে
গ্রামে হাজির হলে প্রথমেই তার চারপাশে জড়ো হলে কিছু লুস্পেন যাদের ধান্দা চুরি,
ছিনতাই এইসব।

ছেলেটি পাল্টা তর্ক জুড়ল। আমরা লুস্পেনদের হাতে দেব না ওইসব অস্ত্র। কৃষকদের
লড়াইয়ের কাজে লাগাব ওই পাইপগান।

— না, না একদম করো না ও কাজ। চন্দ্রদা নিজের বক্তব্যে অনড়। যে কৃষক নিজের
মেহনতের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে, সে যখন শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে মন ঠিক করে লড়াইয়ে
নামবে তার অস্ত্রের অভাব হবে না.....সে লড়বে তার চিরাচরিত অস্ত্র — টাংগি, তীর,
বর্শা এইসব নিয়ে....এই অস্ত্র হাতে সে অনেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়বে কারণ সে
পাইপগান, রিভলবারের ব্যবহার এখন জানে না। পরে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে
সে যখন নিজেকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করবে, তখন শিখে নেবে এর ব্যবহার।

কিছুক্ষণ নীরবতা। আবার চন্দ্রদার গলা ভেসে এল। লুঙ্গি, গামছা আর রেডবুক নিয়ে
গ্রামে চলে যাও। বড় রাস্তা এড়িয়ে আলপথ ধরে হাঁটবে। চা খাবার জন্য গঞ্জের দোকানে
যাবে না। চাষীদের সঙ্গে থাকবে। ওদের কাজে হাত লাগাবে। তারা যা খেতে দেয়, খাবে।
মোদ্দা কথা ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। ছাই গাদায় যেমন কুকুর পড়ে থাকে, তেমনই
গ্রামের গরীব চাষীদের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে তোমাদের। চন্দ্রদার বলার ভঙ্গীতে, ছেলেরা
হেসে উঠল। চন্দ্রদা বললেন, ঠিক আছে তাহলে...।

মাটিং ভাঙবে এবার। লিবারেশনের প্রথম সারিয়ে রেখে, সুকান্তি উঠে দাঁড়ালেন। ঘর
খোঁকে, এগিয়ে এল সবাই। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে ছেলেরা লাল সেলাম জানাল
কমরেড চাফ মজুমদারকে। তারপর একে একে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রদা আবার নিজের
ঘরে ঢুকে গেলেন।

ছেলেটা চোপে গানার মিনিট খানেকের মধ্যেই চলে এলেন সরোজাবাবু। আধময়লা ধূতি।

ধূতির ওপর ফুলহাতা শার্ট, আন্তিন গুটিয়ে পরা। বাঁ হাতে কবজির নীচের দিকে মুখ করে পরা ঘড়ি। পায়ে চামড়ার চটি। একমাথা ঘন কাঁচাপাকা চুল পেছন দিক করে আঁচড়ানো। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পিঠে ছোট্ট একটি কুঁজ মতো আছে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটেন।

সুকান্তি বললেন, দারুণ টাইমিং, এতক্ষণ মিটিং হচ্ছিল। সরোজবাবু মৃদু হাসলেন। টাইমিং তো শিখতেই হবে.....বিয়ে থেকে বিপ্লব সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে ওই ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করার ওপর.....।

সরোজবাবু লোকটি বড় মজার। উনি এলেই আড্ডা জমে ওঠে। চুটকি গল্প বলায় ওঁর জুড়ি মেলা ভার। যে কোনো ঘটনা প্রসঙ্গে উনি ঠিক বলে দেন একটি-দুটি গল্প। একদিন রেবা বলেছিল, পাড়ায় খুব চুরি বেড়েছে। জানালায় জাল লাগাতে হবে। সরোজবাবু গভীরগলায় বললেন, একদম লাগাবেন না, চোররা আজকাল প্রতিবাদ করছে।

— সে আবার কী? — হ্যাঁ সত্যি কথা। গৃহস্থের বাড়ি চোর ঢুকেছে। খালি গা, নিম্নাঙ্গে শুধু লেংটি। সে জানে গৃহস্থের চাল কোথায় থাকে। নিজের লেংটি খুলে মাটিতে পেতে মুঠো মুঠো চাল জড়ো করছে তার ওপর। এদিকে গৃহস্থ জেগে গেছে। চোর এসেছে বুঝতে পেরে লেংটি সরিয়ে নিল গৃহস্থ। চাল জড়ো করে, চোর অন্ধকারে খুঁজে ফিরছে লেংটির কোনা। যখন পেল না, বুঝল ঘরে কেউ আছে। সে বলল — আমার কাপড়টা দিয়ে দেন। তিন চারবার বলল। কোনো সাড়া নেই। এইবার চোর খেপে গেল। আমি ঢের ঢের বাড়ি চুরি করেছি, এরকম ছোটলোক গৃহস্থ দেখিনি। সেই ন্যাংটো অবস্থাতেই চোর চলে গেল।

রেবা সুকান্তি দুজনেই হেসে উঠেছিলেন। আর একদিনের ঘটনা। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি নামল জোরে। সরোজবাবুর বোধহয় কাঁথাও যাবার তাড়া ছিল। কিন্তু সুকান্তি-রেবা দুজনেই বললেন বৃষ্টি একটু কমলে বেরোতে। সময় কাটানোর জন্য ঠিক হ'ল প্রত্যেকে একটি করে কবিতা শোনাবে। রেবা ধরল। হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে.....। সরোজবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সহ্য করা যাচ্ছে না। রেবা অপ্রস্তুত। ওর দিকে তাকিয়ে সরোজবাবু বললেন, না না আপনি তো ভালোই বলছেন, কিন্তু আমার বাবা খিস্রির মতো নাচছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি চললাম। কী ব্যাপার? জানা গেল, ওঁর বাবার নাম হৃদয়। হৃদয়েরঞ্জন দত্ত। সবাই হেসে উঠল। সরোজবাবু ছাতা মাথায় берিয়ে গেলেন।

এসব গল্পের পাশাপাশি অন্য ধরনের গল্পও আছে সরোজবাবুর ভাঁড়ারে। সেগুলো আবার রেবার সামনে বলেন না। সেই আড্ডায় সবাই পুরুষ।

সুকান্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সরোজবাবু চন্দ্রদার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

— কী ব্যাপার ডাক্তার কেমন আছেন আজ?

সুকান্তি হাসলেন। ভালো।

চন্দ্রদাকে মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু বলে থাকেন দুজনেই। চন্দ্রদাকে দেখিয়ে সরোজবাবু ঠাট্টা করে বলেন, চলুন আমরা দুজনেই এই ডাক্তারের কাছ থেকে কম্পাউন্ডারি করে সমস্ত বিদ্যে শিখে নিই। তারপর নিজেরাই একদিন ডাক্তারি করব।

চন্দ্রদা আর সরোজদার মতো আলোচনা জমে গেল। সুকান্তির সঙ্গে রেবাও এসে গেল আড্ডায়। একথা সে কথার পর, চলে এল সাহিত্য প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র। রেবা বলল, আপনারা যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথের কোনো বিকল্প ভারতবর্ষে নেই। সরোজবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রদা থামিয়ে দিলেন।

লেনিনের কাছে টলস্টয় যদি রাশিয়ার আয়না হয়ে থাকেন, শেখরপীর যদি স্তালিনের কাছে সর্বভারতীয় নাট্যকার হ'ল তাহলে কী দোষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব? কোনো সমস্যা নেই প্রত্যাখ্যানের।

চন্দ্রদা সরোজবাবুর তর্ক জমে গেল শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে। চন্দ্রদার মত শরৎচন্দ্রের 'মহাভারত' গল্পই হয়ে ওঠে। সরোজবাবু বলতে লাগলেন ওইটি অসাধারণ গল্প।

তারপর আভ্যন্তরীণ অন্যান্যকে ঘোরানোর উদ্দেশ্যে সুকান্তি বললেন, চন্দ্রদা এখনকার লেখকদের মতো আপনার প্রিয় কে?

তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়।

সরোজবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, সে কী? আপনি জানেন না, তারাক্ষর গান্ধীবাদী কংগ্রেসি?

চন্দ্রদা একবার সুকান্তি-রেবার দিকে তাকিয়ে সরোজবাবুর দিকে ফিরলেন।

আমার তো মনে হয় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য তারাক্ষর সবচেয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন লেখক। 'হাসুলি বাঁকের উপকণ্ঠ'র মতো আর একটা সমাজ সচেতন উল্লেখ্য দেওয়া তো? গান্ধীবাদী হলেও আমরা কিছু যায় আসে না।

কথা শেষ হতেই সরোজবাবুর হাতঘড়ির দিকে নজর গেল চন্দ্রদার।

কটা ঘাড়া?

সাতটা আঠাশ

শীগগির রেডিও চালাও.... শীগগির.....

সরোজবাবু দ্রুত রেডিওটা কাছে নিয়ে এলেন। রেডিও পিকিং ধরতে হবে। দুবার খবর হয় — সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একবার, সাড়ে আটটায় দ্বিতীয়বার।

অন্যদিন পাওয়া যায় কিন্তু আজ শর্ট ওয়েভের উনিশ মিটারে ধরা গেল না রেডিও পিকিং। একত্রিশ দশমিক দুই-পাঁচ মিটারে ঝড়ের মতো আওয়াজ। মাঝে মধ্যে বাংলা খবর পাঠ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু স্পষ্ট নয় একেবারেই। একচল্লিশ মিটারে ঝপ করে পাওয়া গেল পিকিং বেতার। বাংলা খবর শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ খবর চলার পর হঠাৎ সংবাদ পাঠক ঘোষণা করলেন—

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি গত বাইশে এপ্রিল মাও সে তুঙ চিন্তাধারার ভিত্তিতে ভারতের বিপ্লবী পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠন করেছে। এরপরে সি পি আই (এম-এল)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাবটিও পাঠ করা হল।

খবর মতো বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। চন্দ্রদার দুই চোখে অশ্রু। সুকান্তি লাফিয়ে উঠলেন, চন্দ্রদা চিনের পাটি আমাদের স্বীকৃতি দিল।

রেবা বলল, এড গানের গ্যাপার।

সরোজবাবু বললেন আগামী দেশব্রতীর হেড লাইন পেয়ে গেলাম — আমাদের পার্টিকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির

চন্দ্রদা থামিয়ে দিলেন। না না চিনের কমিউনিস্ট পার্টি নয়....আমাদের পার্টিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের স্বীকৃতি দান।

সুকান্তি বললেন, আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। চন্দ্রদার মুখ উদ্ভাসিত। অবশ্যই অনেক দায়িত্ব আমাদের। দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সব কাজ। খুব শীগগির শ্রীকাকুলামে ভারতের প্রথম মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠবেশ্রীকাকুলাম হবে ভারতের ইয়েনান।

চন্দ্রদার আবেগ স্পর্শ করলো রেবাকে। রেবা বলল, দাদা আমি শ্রীকাকুলামে চলে যাব....ওখানে গাছতলায় ইট পেতে বসে বাচ্চাদের পড়াবনতুন যুগের ছেলে মেয়েরা তৈরি হয়ে উঠবে। চন্দ্রদা বললেন, শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান শুরু করতে হবে আমাদের তৈরি হবে গণফৌজ চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চিনা গণমুক্তি ফৌজ তিনশো কুড়িটি রাইফেল নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলআমরা না হয় যাটটি রাইফেল আর দুশোটি পাইপগান নিয়ে আমাদের প্রথম গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করণ। আমি দেখতে পাচ্ছি সেই মুক্ত ভারতবর্ষকে, আলোকোজ্জ্বল.....

চন্দ্রদা হঠাৎ কাশতে শুরু করলেন। ভাল খেয়েও কাশি কমল না। বুকে হাত রেখে কাশতে কাশতে তিনি এগিয়ে গেলেন বেসিনের দিক। তীব্র গমক এল কাশির। এই আওয়াজটা ভালো নয়। শ্লেষ্মা ফেলার শব্দও শোনা গেল। সরোজবাবু আর সুকান্তি ছুটে গেলেন চন্দ্রদার দিকে।

বেসিন রস্টে ভরে গেছে। চন্দ্রদা বসন্ত রোগে ভুগছেন।



সাদা জামা কালো প্যান্ট আর হাওয়াই চপ্পল পরা যে ছেলেটিকে ধরে দুই কনস্টেবল নিয়ে এল, তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কনকেন্দু। ছেলেটিকে চেনা লাগে। কোথায় যেন দেখেছে ওকে। মনুমেন্ট-ময়দানের সভা চত্বরে? নাকি কফি হাউস এলাকায়?

কনস্টেবলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই উত্তর এল, সাধারণ শত্রু কেস.....সিনেমা হলে রায়টিংএটা সাত নম্বর....

ছেলেটির বয়েস আঠারো-উনিশ। লম্বা টানা ভুরু কিছুটা উচু। চোখের কোনো ঈষৎ লালভ। হাত পায়ের গড়নে সুবিন্যস্ত ভাব। মাথার গড়ন উষ্টোনো ঘটের মতো নয়, ঘটমূর্ধা বলা যাবে না এই মাথাকে। তবে মাথায় টিবি না থাকলেও এর গঠনটি সুসম — সমোচ্চ সমতল অথবা সমগোল বলা যেতে পারে। এমন মাথার গড়ন যখন, অন্তঃকরণে মহৎভাব থাকার কথা। সব মিলিয়ে ছেলেটির সারা দেহে এক স্নিগ্ধ লাভণ্য রয়েছে। ওকে টেবিলের উষ্টোদিকের চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করল কনকেন্দু।

— কী নাম?

ছেলেটি গভীর গলায় বলল, নিরুপম। নিরুপম চ্যাটার্জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও সন্দেহ নেই ছেলেটি স্বেচ্ছাপ্রকৃতির। এই প্রকৃতির লোকেরা কষ্টসহিষ্ণু, সদ্ব্যবহার সম্পন্ন হয়। এরা গুরুমান্যকারী এবং বন্ধুবৎসল।

মানুষের মুখ, শরীরের গড়ন দেখে স্বভাব চরিত্র বিচারের যে বিদ্যা, সেই সামুদ্রবিদ্যার নিয়মিত চর্চা করে কনকেন্দু। কালীবর বেদান্তবাগীশের ‘চরিত্রানুমান বিদ্যা’ বইটি সে মন দিয়ে পড়েছে। দেড় বছর আগে যখন পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টরের চাকরি পেয়েছিল, আশঙ্কা ছিল কাজের চাপে ওই বিদ্যার চর্চা বজায় রাখা যাবে কী না? ব্যারাকপুরে ট্রেনিং, নারকেলডাঙা বড়তলা থানা ঘোরার পর তার জায়গা হ’ল হেডকোয়ার্টারস্-এর গোয়েন্দা বিভাগে। গোয়েন্দা বিভাগে আসবার পর পুরনো বিদ্যাটি আবার ঝালিয়ে নেবার সুযোগ লাগল। গোয়েন্দা জীবনও অপরাধী ছাড়াও মাঝে মাঝেই ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনে গিয়ে পুরনো ভাব দেখে বিগত দিনের অপরাধীদের স্বভাব বিচারের চেষ্টা করে কনকেন্দু। রিপোর্টের সঙ্গে অনুমান মিলিয়ে দেখে। অনুমানের সঙ্গে অপরাধীর স্বভাব চরিত্র অনেক সময়েই মিলে যায়। মিলে গেলে খুব মজা। না মিললেও দমে না সে। অনুমান চালিয়ে যায়।

চরিত্রানুমান বিদ্যার মতো ব্রিটিশ আমলের বাঙালি বিপ্লবীদের ইতিহাসও কনকেন্দুর শিখা বসায়। গোয়েন্দা বিভাগের পুরনো নথি ঘেঁটে সে জোগাড় করেছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সংগঠক নানান ছবি, ইস্তাহার। বহু স্বল্পখ্যাত বিপ্লবীর ছবি তার সংগ্রহে। যে কোনো যুগের বঙ্গভঙ্গ, আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে তার কৌতূহল কিছু বেশি।

কনকেন্দু স্থির চোখে তাকাল। তা বাবা নিরুপম, সিনেমাহলে ভাঙুর করতে গেলে কেন?

— আমি যাইনি।

— মিথ্যা কথা।

কোনো উত্তর দিল না নিরুপম।

কনকেন্দু বলল, তুমি শতরঞ্জ সিনেমা দেখেছ?

— না

— দেখবে?

না

কেন?

শতরঞ্জ চিন বিরোধী কথাবার্তা আছে ওতে চিন বিরোধিতা মানা যায় না.....

এই তো বের হ’ল আসল কথাতার মানে তুমি সিনেমাহলে যারা বিক্ষোভ

দেখিয়েছে তাদের সঙ্গে আছ....

না, আমি যাইনি।

কনকেন্দু হাসল। স্বেচ্ছাপ্রকৃতির লোকেরা এমনই — সবসময়েই সাবধান হয়ে কথা বলে। এরা অগণ্য কথা বলবে না। এদের মধ্যে সিংহ, ঘোড়া, হাতি, রাজহাঁস এইসব পশুপাখীর নানান রকম থাকার কথা।

শতরঞ্জ কোস এর আগের যে ছটি ছেলেকে ধরে আনা হয়েছে তাদের কেউই এই ছেলেটির মতো উদ্ভাসমান নয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওদের পাঠানো হয়েছে

বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু লোকটি পিস্ত প্রকৃতির। নখ রক্তবর্ণ। অল্পবয়সে শরীরের মাংস শিথিল হয়ে গেছে। গরম একেবারে ভালোবাসে না, ঠান্ডায় খুব ফুটি। খেতেও ভালোবাসে — ঔদরিক বলা যায়। ঝট করে রেগে যায়, আবার রাগ পড়েও যায় দ্রুত। লোকটির ভুরুর মাঝখানটা বাঁকা এবং নিচু—মধ্যবিনত ভুরু। তার ওপর মাথাটা টিড়ের মত চ্যাপ্টা — চিপীট মস্তক। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী এ ধরনের লোকেরা হিংস্র স্বভাবের। এরা অগম্যাগমনে সংকুচিত হয় না। পিস্তপ্রকৃতির লোকেরা সাপের মতো ক্রুর, পেঁচার মত রাত জাগতে ভালোবাসে, গন্ধর্বের মতো সঙ্গীতপ্রিয়, যক্ষের মত ধনসঞ্চয়ী, বেড়ালের মতো অকৃতজ্ঞ, বান্দরের মতো চঞ্চল, ভালুকের মতো শীতলতাপ্রিয় এবং নকুলের মতো বদমেজাজি হয়ে থাকে।

বড়বাবুর কাছে এই ছেলেটিকে পাঠাতে মন চাইলো না কনকেন্দুর। বেচারার অকারণে চড়-থাপ্পড় খেয়ে যাবে। আর তা ছাড়া ছেলেটি সম্পর্কে কৌতূহলও বাড়ছে। সি পি এম-এর সঙ্গে এই নকশালপন্থী, সি পি আই (এম-এল)-এর সমর্থক ছেলে ছোকরাদের তফাতের জায়গাটাও ঠিকঠাক বোঝা দরকার। এখনও অবধি যা চলছে তাতে সাদা চোখে সি পি এম-এর জঙ্গী ক্যাডারদের সঙ্গে এই নকশালপন্থী ছেলেগুলির বিশেষ কিছু তফাত নেই। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে সিনেমাহল কিংবা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর সি পি এম-এর ছেলেরাও করে। গ্রামে জোতদারদের ওপর অত্যাচার, পেনামী জমি দখলও করে থাকে সি পি এম-এর জঙ্গীরা। অবশ্য নকশালপন্থীদের কাগাজে জঙ্গীভাব অনেক বেশি। ওরা লিখিতভাবে জানায় মারের বদলা পাল্টায়। দেশব্রতী লিখেছে দেশে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের অঙ্গীকার নিয়ে পিকিং রেডিও-র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ওদের পত্রিকায়। সম্প্রতি চারু মজুমদার লিখেছেন তাদের পার্টি দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরনো পদ্ধতি এখন অচল। কিন্তু নতুন রাস্তাটা কী? এই বিষয়ে নিরুপমের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব কনকেন্দুকে ডেকে বলেছেন নকশালপন্থী লিটারেচারগুলি নিয়মিত পড়তে। তবেই এই নতুন পার্টির কাজের ধরণ ওদের ডব্লিয়ার্গ কর্মপন্থা সনট। বোঝা যাবে। পার্টি সাহিত্য পড়া থাকলে, পার্টির সমর্থক-সভ্যদের সঙ্গে আপোচনায় সময় অনেক বেশি খবরাখবর জানা যায়। সেই থেকে দেশব্রতী লিবারেশনের প্রতিটি সংখ্যা কনকেন্দু খুঁটিয়ে পড়ে। দেশব্রতী প্রকাশনীর সমস্ত বইও সে সংগ্রহ করেছে। নিজের পরিচয় গোপন করে নকশালপন্থী ছেলেদের সঙ্গে কফি হাউসে আড্ডাও দিয়েছে। আড্ডা মেরে মস্ত লাভ হয়েছে একটি — নকশালদের পরিভাষাগুলি ভালোমত রপ্ত হয়ে গেছে কনকেন্দুর। ওদের চলতি কথায় চারু মজুমদার হলেন কমরেড সি এম অথবা শুধু সি এম। সরোজ দত্ত — এস ডি। সুশীতল রায়চৌধুরী — এস আর সি। পাইপগান — পি জি। দেশব্রতী — ডি বি। কিন্তু খুব বেশিদিন এভাবে কফি হাউসে বসা যাবে না। ক্রমশ কনকেন্দুকে চিনে ফেলবে অনেকেই। আগামীতে কোনো সোর্স তৈরি করতে হবে। যার মাধ্যমে পাওয়া যাবে নিরুপমদের খবরাখবর।

সোজাসুজি পার্টির কথায় আসবার আগে কনকেন্দু বলল, আচ্ছা, সেদিন সিনেমা হল ভাঙচুরের সময় কালো প্যান্টের ওপর গেরুয়া পাঞ্জাবী পরা একটা ছেলে ওখানে ছিল,

ডাক, চেন নাকি?

না তো।

আগে, ওই তো বলেছে তুমিও ছিলে হলের ভেতরে

নিকপম চুপ করে রইল। দৃশ্যতই অপ্রতিভ লাগছে ওকে।

কনকেন্দু চলে এল রাজনীতির কথায়।

আজ, সি পি এম এর সঙ্গে তোমাদের তফাত কোথায় বল তো.....এক কথায় বল।

সি পি এম এর লোকেরা গাথ না মেরেই বাঘের মুখ থেকে খাবার কেড়ে আনতে বলছে।

উন্নয়ন গাথ। তুই তো বেশ মন দিয়ে ডি বি পড়িস! এই বাঘের উপমা তো কদিন আগেই বেরিয়েছেকী রে দেশব্রতী পড়িস তো?

কনকেন্দু ইচ্ছে করেই 'তুই' বলে সম্বোধন করল। প্রথমত ছেলেটি তার চেয়ে অন্তত পাঁচ সাত বছরের ছোট। আর দ্বিতীয় কথা, তুই বললে ওর অহংকারে একটা ধাক্কা লাগবে। এই শাকাটা দরকার।

ওঁ! দেশব্রতী পড়ি।

নিকপম একটু খতমত খেয়ে গেছে।

লিবারেশন পড়িস না?

হ্যাঁ পড়ি

বেশ বেশ.....তা সি এম-এর লেখা কেন্দ্র লাগেদারুণতাই না?

ছেলেটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

সি এম এর ছাত্র যুবকদের কাছে পোর্টার আহান লিফলেট আকারে বের হবে দেশব্রতীতে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছেকিনিস তো?

ডাউ নাকি? কবে? এই সংখ্যায়?

না রে, এই সংখ্যায় তো হ্যাঁ চি মিনের মৃত্যু সংবাদএটা বেরিয়েছে গত সংখ্যায়প্রতি হাজার লিফলেট ছটাকা.....

মুদ্র হেসে কনকেন্দু বলে, কী রে কিনে বিলি করবি তো লিফলেট?

ছেলেটি আবার চুপ করে যায়।

বেশ বেশ.....খুব ভালো.....তা পার্টির মেম্বারশিপ পেয়ে গেছিস?

না।

একটু পরে নিকপম কথা বলে। যদি পার্টি করি অসুবিধে কোথায়? পার্টি তো নিষিদ্ধ নয়।

না না অসুবিধে নেইপার্টি নিষিদ্ধ নয়তবে লিবারেশনের ছটা সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

ডাউ নাকি? নিকপমের চোখে বিস্ময়।

ওঁ! রে,এই তো কেন্দ্রীয় সরকারের তেইশে জুলাই-এর সার্কুলার।

ডাউর কাছেই বিজ্ঞাপন ছিল। কনকেন্দু পড়ে শোনায়। চারু মজুমদার, অরিন্দম মিত্র, অশীষ সেন, সুশীতল রায়চৌধুরী, মানব মিত্র, কানু সান্যাল সবার একটি করে লেখা

নিষিদ্ধ। ওই লিবারেশনগুলি বাজেয়াপ্ত করা হলে, সে খবর জানাতে হবে ডি সি এস বি-কে। ডি সি এস বি মানে ডেপুটি কমিশনার স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

— কী রে? আছে নাকি লিবারেশনের এই কপি?ভল্যুম টু'র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম সংখ্যা....

— না, না

— তবে কার কাছে আছে জানিস?

নিরুপম নিরুত্তর।

কনকেন্দু হাসল আবার। আচ্ছা ঠিক আছেযে কথা হচ্ছিল.....সি পি এম-এর সঙ্গে তোদের কোন কোন জায়গায় তফাত?

— তিনটি প্রশ্নেআমরা সশস্ত্র লড়াই অর্থাৎ জনযুদ্ধে বিশ্বাসী.....দ্বিতীয়ত এই জনযুদ্ধের কেন্দ্র হচ্ছে গ্রাম, প্রধান শক্তি কৃষক শ্রেণী আর তিন নম্বর কথা হ'ল এই জনযুদ্ধ সফল হবে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায়।

— এ তো দেশব্রতীর কথা বললি..... সোজা বাংলায় বল না গ্রামে তোরা কী করবি?

— গেরিলা লড়াই করে শ্রেণীশত্রু খতম, তারপর কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা।

কনকেন্দু স্বগতোক্তি'র ঢঙে বলল, এ আর এমন কী নতুন কথা?হুম... ড্রয়ার খুলে একটি ছাপা কাগজ বের করল সে। তারপর নিরুপমের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করল সেই লিফলেট।

‘এই সকল মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক যাহারা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মদের দোকান বসাইয়া আমাদের ইহকাল পরকাল উচ্ছন্ন দিতেছে ইহাহারাই কি আমাদের রাজা?’

....‘যাহারা আমাদের ক্ষেত্রের উপেক্ষা দ্রব্য অপহরণ করিয়া আমাদের দুর্তিষ্ক ও ম্যালেরিয়ার ভীষণ কবলে নিষ্ক্ষেপ করিতেছে, তাহাহারাই কি আমাদের রাজা? যাহারা আমাদের দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ধনভাণ্ডার পরিপূরিত করিতেছে, তাহাহারাই কি আমাদের রাজা?’

দম নেবার জন্য একটু থামতেই, নিরুপম বলল, এটা কার লেখা? কনকেন্দু মৃদু হাসল। তোদের এক সিনিয়র কমরেড লিখেছেন। মন দিয়ে শোন।

‘.....এখন আমরা তাহাদের খাদ্য ও সেই শালারা আমাদের খাদক, তবে ভাই আর কেন সহ্য করা? ভাই সকল! যতই সহ্য করিবে এই কাপুরুষগণ ততই তোমাদিগকে নিপীড়ন করিবে। এখন এস, আমরা নিজেদের পায়ে দণ্ডায়মান হইতে শিখি, দেখি আমাদের প্রতিকার হয় কিনা। ভাই! আমরাই তো সব, আমাদেরই অর্থে ইহাদের দেহ পরিপুষ্ট হইতেছে। ইহারা আমাদেরই রক্ত শোষণ করিতেছে, তবে আর কেন সহ্য করিবা।’

নিরুপম বলল, সাধুভাষায় লিখলেও লেখার ধরণটা দেশব্রতীর শশাঙ্কর মতো.....

কে বিলি করেছে এই লিফলেট?

কনকেন্দু ধীর গলায় বলল, ক্ষুদিরাম বসু।

— অ্যাঁ!

— হ্যাঁ রে।

— বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম বিলিয়েছে এই লিফলেটএক পুলিশ

কনস্টেবল তাকে ধরলে তাকে খুঁষি মেয়ে ক্ষুদিরাম পালায়এ হ'ল আলিপুর বোমার
মামলার এপিপিট নাম্বার টু।

নিরুপমের চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব কাটেনি। তবু বলে, লেখাটা দারুণ তবে এতে
শ্রমিক, কৃষকের কথা নেই।

পায়ে কী যে বলিস।আরে এই কথাগুলো তো কৃষকের জবানেই বলা হয়েছে.....।

নির্বাচিত জায়গাটি পড়ে শোনায় কনকেন্দু।

'দেখ ভাই। এই সময়তান পুত্র গিরিসিগণ এই সোনার বাঙ্গলা দ্বিধা করিল ও জমিদারগণ
লক্ষ লক্ষকে ভাঙা স্বীকার করিল, তাহাদের কাহারই কি যষ্টি বল নাই?...ভাই! একদিন
তো মরিগেট হুইল, তা'এ এস এই শালাদের মরিয়া মরি। আবার দেখ আমাদের যন্ত্রণার
জলা ভাঙা পক্ষায়েৎ সৃষ্টি করিতেছে আর বাবু ও জমিদারেরা তাহাদের সাহায্য করিতেছে,
হুইলটাই-কি আমাদের মুক্তি। আবার শুনিতেছি এই শুয়ারের বাচ্ছারা হিন্দু মুসলমানকে
ভাট ভাট দেখিয়া হিন্দুদিগের পুরোহিত, মুসলমানের মৌলবি ও শিখদের সৈন্য সর্দার
নিযুক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। দেখ শালাদের পাজি
দেখ। ভাট চন্দ্রগণ। তোমাদের মা কালী ও দুর্গা, বাবা মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের দোহাই,
ভাট মুসলমানগণ তোমাদের খোদাতায়ার দোহাই, তোমরা গ্রামে গ্রামে এই প্রচার কর
হে, চন্দ্র মুসলমান, ভাইয়ের ন্যায় এক হইয়া আমাদের জমিনী জন্মভূমির চরণপূজা করিবে।
গান গায়া দিগেন তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে। যে মৌলবি বা যে পুরোহিত ধর্মের
দোহাই দিয়া বিবাদ বাধান মানসে গ্রামে প্রবেশ করিবে তাহার মস্তক দেহচ্যুত হইবে।'

কনকেন্দু একবার নিরুপমের দিকে তাকায়। কৃষকেরাই তো বলছে এ কথা... এইবার
ভালো করে শোন....

'ভাই। আমরা আমাদের নিজের পক্ষায়েৎ ও চৌকিদার নিযুক্ত করিব। যাহারা
গভর্ণমেন্টের ঐ সকল কার্য করিবে তাহাদের গৃহ ভস্মীভূত করিব। আমরা আর কর
কি করিতে দিন না, যদি জমিদারেরা অত্যাচার করে তাহাদের জীবন লইব ও নিজেদের
জীবন বলিদান দিব।'

পড়া শেষ করে কনকেন্দু বলে, কেমন লাগল বল?

নিরুপম মাথা নেড়ে ঠোঁটের একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মুগ্ধতা প্রকাশ করে।

লেখাটা দারুণ, সব ঠিক, কিন্তু এতে কৃষি বিপ্লবের ধারণাটা স্পষ্ট নয়.....

কনকেন্দু মাথা নেড়ে সমর্থন করে। তা অবশ্য ঠিকতবে শোন, তাদের এই নতুন
গাভারা খুব মারকাট হবে রে....

তা হয়তো হবে.....কারণ বিপ্লব তো কোনো ভোজসভা নয় বা প্রবন্ধ রচনা বা
ভাণ্ডারী আখ্যায়িকা সূচকর্ম নয়....এটা এত সুমার্জিত, এত ধীরস্থির ও সুশীল, এত নম্র,
দয়ালু, মিতীত, সংযত ও উদার হতে পারে না.....

কনকেন্দু ভাঙ তুলে নিরুপমকে থামাল। হ্যাঁ এ তো মাও সে-তুঙের কথা। বাকিটা আমি
বলছি।

বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ উগ্র প্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে
উৎখাত করে

কথার মাঝে বড়বাবু ঘরে ঢুকে পড়েন। কী? কিছু পেলে?

বলতে বলতে কনকেন্দুর টেবিলের সামনে চলে আসেন। বড়বাবুর ঘামের দুর্গন্ধ পায় কনকেন্দু। পিস্ত প্রকৃতির লোকেদের এমনই ধাত।

কনকেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। না স্যার, এ মক্কেল যায়নি সিনেমাহলে, তবে তাত্ত্বিক খবর পাওয়া যাচ্ছে.....

— ধূস শালা.....এই বোকাচোদার সঙ্গে চুদুরবুদুর করে কী হবে..... সময় নষ্ট করে লাভ নেই.....কাগজপত্র নিয়ে কোর্টে চলে যাও।

কনকেন্দু মাথা নাড়ে। ইয়েস স্যার।

সাতজনকেই আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সাতজনেরই উকিল আসে। নিরুপমের উকিল ওর জন্য জামিন প্রার্থনা করে। পুলিশ জামিনের বিরোধিতা না করায় সহজেই নিরুপমের জামিন মঞ্জুর হয়ে যায়।

জামিন পেয়ে নিরুপম আদালতের বাইরে এলে, ওর দিকে এগিয়ে যায় কনকেন্দু।

— খুব ভালো।

নিরুপমের পিঠি চাপড়ে দেয় কনকেন্দু। তারপর বলে, শোন.... তুই যে সিনেমা হলের ভেতরে ছিলিস, আমি জানি প্রমাণও করা যায়.....তুই ঠিক বলিসনি.....

নিরুপম হাসে। প্রেমে আর রণে মিথ্যাচার পুষ নয়।

— সেজন্যই তো মাপ করলাম। কনকেন্দুও হাসে। নে ঐবার মন দিয়ে বিপ্লব কর। বিদায় নেবার আগে নিরুপমের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে ওর চোখে চোখ রাখে কনকেন্দু।

— সাবধানে থাকিস। অজান্তেই তার চোখে জল চলে আসে।



দেশব্রতী পড়লেই আশা জাগে, উদ্যম জাগে। মনে বল পায় দ্রোণাচার্য।

গ্রামে গ্রামে শ্রেণীশত্রু, জোতদার খতমের আহ্বান রেখেছে পাটি। নকশালবাড়ির আগুন অন্ধ্রের ত্রীকাকুলামের পার্বত্য অঞ্চলে তো বটেই, বিশাখাপত্তনম, পূর্ব ও উত্তর গোদাবরী, কৃষ্ণা, গুন্টুর, নেলোর, অনন্তপুর, ওয়ারাসাল, খাম্মাম জেলার বিস্তৃত সমতলভূমির উনিশটি তালুকে ছড়িয়ে গেছে। ওই এলাকার তিনশো গ্রাম এখন বিপ্লবীদের করায়ত্ত।

পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। এ রাজ্যের ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এলাকায় শুরু হয়ে গেছে নতুন ধাঁচের সশস্ত্র আন্দোলন। হুগলি জেলাতেও সশস্ত্র গেরিলা লড়াই শুরু করা দরকার। লোকাল কমিটির সম্পাদক অজিতদাকে বলেছে দ্রোণাচার্য।

মগরা-বলাগড় থানা এলাকায় মিটিং ডাকলেন অজিতদা। গোপন সভা। সভায় বিজন, তপন, সমীর, দ্রোণ, পাঞ্চালী তো ছিলই, ডেবরায় কাজ করে আসা সিনিয়র কমরেড নগেন ধরও যোগ দিলেন। তিনি বোঝালেন সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলবার কায়দা।

এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা জরুরি। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তদন্ত চালিয়ে জেনে নিতে হবে ওই অঞ্চলের লড়াইয়ের ইতিহাস। কে শত্রু? কে মিত্র? মনে রাখতে হবে এই আঞ্চলিক লড়াইটা একটা বড় লড়াইয়ের অংশ। সি পি আই (এম-এল) একটা নতুন জীবন্ত ভাবধারা নিয়ে এসেছে। মাথা খাটিয়ে এই ভাবধারার একটা জীবন্ত প্রয়োগ করা দরকার। সবার শেষে দরকার, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা। নিজেদের তুলে নোনা দরকার।

অজিতদা বললেন, হ্যাঁ জানি....সশস্ত্র লড়াই করতে এই পাঁচটি নীতি মানা খুবই জরুরি.... সশস্ত্র মাথা মোড় সাধ দিল। তারপর মুখস্থ বলে গেল পাঁচটি সূত্র — শ্রেণী বিশ্লেষণ, তদন্ত, সময়োগ অংশ হিসেবে কাজ করতে শেখা, জীবন্ত ভাবধারার জীবন্ত প্রয়োগ আর সমালোচনা আত্মসমালোচনা।

দ্রোণ-বলল, শ্রেণী বিশ্লেষণ আর তদন্ত হয়ে গেছেআমাদের এখন প্রয়োজন চিহ্নিত শ্রেণীসহ খতম করে গেরিলা লড়াই শুরু করে দেওয়া.....

বিজয় দু দিকে মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাল। মগরাতে এখনই এমন করা ঠিক হবে না। আগে ফসল কাটার আন্দোলন, মজুরি বাড়াবার আন্দোলন এই সবার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের ঐতরি করে নেওয়া দরকার..... এখন উচিত কৃষকসভার মতো সংগঠন গড়ে দাশে দাশে এগনো.....

বিজয়কে শেষ করতে দিল না দ্রোণাচার্য। এ য়োরাপুরি সংশোধনবাদী কথাবার্তা.....এ অর্থনীতিবাদএই চিন্তা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে নাকচ করে.....কৃষকদের নজর ঘোরাবার চেষ্টা করে শুধুমাত্র জমি আর ফসল দখলের লড়াইয়ের দিকে.....

নগেন ধর দ্রোণকে সমর্থন করলেন। তিনি শোনালেন শ্রীকাকুলামের কাহিনী। শ্রীকাকুলামের সোমপেটা তালুকে কোনো কৃষকসভা বা গণসংগঠন ছিল না। গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের একটি গেরিলা ইউনিট ওই অঞ্চলের এক কুখ্যাত জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করে। শ্রেণীসহ খতম করার পর জোতদারের হেপাজতে যা ফসল ছিল, কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েক হাজার টাকার বন্ধকী সোনা ফিরিয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের। কৃষক জনতার সামনেই পুড়িয়ে ফেলা হয় জোতদারের কাছে তাদের ধার নেবার প্রমাণ এক লক্ষ টাকার হ্যাণ্ডনোট। এই ঘটনা এলাকার কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তারা পার্টির ওপর আস্থাশীল হয় এবং সংগঠিত হতে থাকে।

কমরেড নগেন ধর থামতেই দ্রোণ বলে, ঠিক ঠিকএইভাবেই আমাদের এই হুগলি জেলাতেও অবিলম্বে কিছু একটা করতে হবে

অজিতদা হাত তুলে দ্রোণকে থামান। না, না, বিজয়ের পরামর্শটাও উড়িয়ে দেবার নয়.....অর্থনৈতিক দাবির আন্দোলন আমরা করব না, এমন সিদ্ধান্ত তো পার্টি নেয়নি.....তবে সশস্ত্র রাজনৈতিক লড়াইকে প্রাধান্য দিতে হবে এটা ঠিক

দ্রোণ বলল, আমিও সেই রাজনৈতিক লড়াই শুরু করবার কথাই বলছি। নিজের বক্তব্যকে জোর দিতে দ্রোণাচার্য চারু মজুমদারের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিল। কমরেড সি এম বললেন, কোনো অঞ্চলের জোতদারের বিরুদ্ধে এইভাবে যদি গেরিলা ইউনিটগুলি

সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন শ্রেণীশত্রুরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। গ্রাম হবে মুক্ত। তখনই গড়তে হবে বিপ্লবী কৃষক কমিটি। এই কমিটির কাজ হবে চারটি — জোতদার সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের জমি বাজেয়াপ্ত করবার পর তার বিলিবন্টন এবং উৎপাদনের ব্যবস্থা। পুলিশ, গুন্ডা, বদমায়েশদের মোকাবিলা। তাদের শায়েস্তা করবার জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন। চার নম্বর কাজটা হ'ল গণ-আদালত গঠন। গণ-আদালত গ্রামে শান্তিশৃঙ্খলা রাখার উদ্দেশ্যে গুন্ডা-বদমায়েশদের বিচার করবে।

তপন বলল, সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমরা লড়ব কী নিয়ে? সমীর বলল, ঠিক কথা, চেষ্টা করলে আমরা হয়তো বোমা, পাইপগান জোগাড় করতে পারি কিন্তু তা দিয়ে কি জোতদারের মোকাবিলা করা যাবে?

তপন সমীরকে সমর্থন করল। ওরা দু'জনেই আরও কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু নগেন ধর গভীর গলায় বলে উঠলেন, কমরেডস্....। তপন-সমীর চুপ করে গেল। নগেন ধর স্মিত হেসে বলতে শুরু করলেন। প্রথম কথা হল লড়াইটা আমাদের মতো মধ্যবিত্তেরা করব না, লড়বে গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুরআর, তারা লড়বে তীর-ধনুক টাঙ্গ নিয়ে.....

দ্রোণ উত্তেজিত গলায় বলল, একদম ঠিক বলেছেন.....এটাও সি এম-এর কথা.....প্রথমে লড়াই শুরু হবে ওইসব প্রাথমিক অস্ত্র নিয়ে কারণ যারা লড়বে এখানকার সেই গরীব চাষি, ক্ষেতমজুর তীর ছুঁড়তে অভ্যস্ত, বন্দুক ছুঁড়তে নয়.....প্রথম এই তীর-ধনুক-টাঙ্গি হাতেই সে বন্দুকের দখল নেবে.....শিখবে বন্দুকের ব্যবহার.....গড়ে উঠবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত লালফৌজ।

অজিতদা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে কিন্তু অস্ত্রে অস্ত্রে ভেবে চিন্তে এগোতে হবে আমাদের.....।

দ্রোণ ছটফট করে উঠল। না.....অজিতদা আপনি বুঝছেন না.....সি এম বলেছেন চেয়ারম্যানের চিন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর করুন। অজিতদার দিকে তাকালো পাঞ্চালী। গলায় মজা এনে বলল, কে বলবে দ্রোণ কদিন আগেও দক্ষিণদেশ করত?

পাঞ্চালীর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। কমরেড নগেন ধরও হাসতে শুরু করলেন। এটা ঠিকই সি পি আই (এম-এল) গঠনের ঘোষণা হবার পরেও দ্রোণ দক্ষিণদেশ ছাড়েনি। ধান রুইবার মরশুমেও সে দক্ষিণদেশের বার্তা নিয়ে হুগলি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। গ্রামের খবর পৌঁছে দিয়েছে দক্ষিণদেশের সম্পাদকীয় দপ্তরে।

যেভাবে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়েছে, দক্ষিণদেশ গ্রুপ তা সমর্থন করেনি। ওরা বলে অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজের সাফল্য-ব্যর্থতার ঠিকঠাক মূল্যায়ন না করেই-তাড়াছড়ো করে পার্টি গড়ে ফেলা হয়েছে। এর ফলে ওই দলে এমন বহু লোক ঢুকে গেছে যাদের বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন আছে। এমন অনেকেই আছে যাদের নয়। সংশোধনবাদী সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করবার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

দক্ষিণদেশ করলেও মনে মনে পাঞ্চালীকে ভালোবাসবার মতো, চারু মজুমদারের পার্টি সি পি আই (এম-এল)-এর প্রতি অনুরাগ বাড়ছিল দ্রোণচার্যের। দেশব্রতীতে পাওয়া যায় নতুন পার্টির টাটকা নতুন খবর। অত্যাচারী শোষকের রক্তে শ্রীকাকুলামের বিপ্লবী কৃষক

ও বিপ্লবী জনতা মুক্তিমান করছেন.....অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহারের পর আবার পশ্চিমবাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ..... শ্রীকালানামের বীর নেতা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পঞ্চাঙ্গি কৃষ্ণমূর্তিকে অন্ধ্র পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে শহীদ হয়েছেন আরও ছ'জন সহযোগী। যদিও ওরা সি পি আই (এম-এল)-এর কর্মী তবু, খবরটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দ্রোণাচার্যের। কিন্তু বিপ্লবের পথ তো এমনই রক্তঝরা। শহীদদের রক্তচিহ্ন বেয়েই তো এগিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া চিনের পার্টি যখন সমর্থন জানাচ্ছে, নিশ্চয়ই এইসব কাজের সারবস্তা আছে।

দেশব্রতীর লেখা পড়তে পড়তে পাঞ্চালীর কথা মনে পড়ে দ্রোণাচার্যের। লেখাগুলি পড়ে পাঞ্চালীর চোখমুখ কেমন হয়ে ওঠে, জানতে কৌতূহল হয় খুব। গান্ধেগড়ে থাকবার সময় মন পড়ে থাকে পাঞ্চালীর কাছে। সাদা কাগজে লিখে যায় পাঞ্চালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কিছু কথা। কখনও সেই গদ্যে অন্ত্যমিল এসে যায়!

আমি কৃষ্ণর কাছে যাবো / কৃষ্ণর কাছে যাবো— / সারাদিন শুধু কৃষ্ণর মুখ মনে / কৃষ্ণর কথা মনে। / আমি ভালোবাসা কাছে পাবো / ভালোবাসা কাছে পাবো— / কৃষ্ণ আমাকে দেখিয়েছে লাল দিন, / কৃষ্ণ আমার দিন। / আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে কিছু / চাইনি কখনো কিছু / শুধু ভালোবাসি তাকেই একলা আমি / ভালোবাসি তাকে আমি।

কবিতাটি পাঞ্চালীকে পাঠিয়েছিল দ্রোণ। একেবারে শেষে 'পুনশ্চ' যোগ করেছিল — পাঞ্চালী দিয়ে মিল হচ্ছিল না তাই তোমাকে 'কৃষ্ণ' করে দিলাম। চিন্তা ছিল উত্তর আসবে কী না? অতীতের অন্যান্য নারীদের মতো পাঞ্চালীও কি প্রত্যাখ্যান করবে তাকে? কিন্তু উত্তর এসেছিল। দুটি শব্দের ছোট চিহ্নকোট — কমরেড, এসো।

শব্দের অমোঘ ক্ষমতা। দুটি শব্দে মাদল বেজে উঠেছিল — শরীরে, মনে। পাঞ্চালী তাকে কমরেড বলে সম্বোধন করেছে — আগামী বিপ্লবে তার সাথী এই অনন্যা মানবী। সেই অলৌকিক নারী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বলেছে এসো। ও কাছে ডাকছে। এ এমন দুটি মায়াবী শব্দ, নাড়াচাড়া করলেই বুকের গভীরে জলভরা মেঘ জমে ওঠে। তখন আবার কলম হাতে নিতে হয়। সেই কলম এলোমেলো রাস্তায় হাঁটে — কখনও বিপ্লবের পথে। বিপ্লবের পথ আর দয়িতার সিঁথি মিলে যায়। কলম লিখে চলে — কৃষ্ণ কি কোনো সুদূর নক্ষত্রের নাম? না কি এই পৃথিবীর কোনো সজীব মানবী? আমি সবসময় গুলে উঠতে পারি না — এক অদৃশ্য দায়িত্ববোধ আমার কৃষ্ণর জন্য সর্বক্ষণ। ঘুম আসে না, ৭৫ নীরব রাত সরব হয়ে ওঠে তার স্মৃতিতে। কৃষ্ণ কি কোনো সুদূর নক্ষত্রের নাম? নাকি আমার বিপ্লবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হৃদয়ের অপর নাম কৃষ্ণ? রক্তের উষ্ণ স্রোতের মধ্যে সেই প্রশ্নই বারবার উচ্চারিত হয়।

গান্ধেগড়ে এসেই দ্রোণ খবর পেয়েছিল, হুগলির অজিতদা দক্ষিণদেশ গ্রন্থের ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় এসেও চাইছেন। অজিতদা বরাবর দেশব্রতী গ্রন্থে ছিলেন। আলোচনায় এসেও তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। নির্দিষ্ট দিনে দ্রোণাচার্য, তপন, সমীরদের সঙ্গে আলোচনায় এসেও অজিতদা। কলকাতা থেকে বনমালী রায় এলেন ওই আলোচনায়। দ্রোণাচার্য দক্ষিণদেশ গ্রন্থের মতামত প্রকাশ করল। আরও একটু সময় নিয়ে সব কিছু

পর্যালোচনা করে পার্টি গড়া উচিত ছিল।

অজিতদা বললেন, তোমরা পার্টিতে যোগ দিয়ে তোমাদের মতামত রাখো....দুই লাইনের দ্বন্দ্ব চলুকএইভাবেই তো পার্টির বিকাশ হবে.....

কথার পিঠে কথা চলছিল। বেশিরভাগই তাত্ত্বিক কথাবার্তা। এমনটা করলে ভালো হত, এমনটা করলে ভালো হয়.....ইত্যাদি। হঠাৎ বনমালী রায় বলে উঠলেন, আরে তোরা তো মশারি খাটাতেই রাত কাবার করে দিলি, শুবি কখন?

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু বনমালী রায়ের ঠাট্টা যুক্তি হিসাবে অত্যন্ত লাগসই। দ্রোণের মনে ধরে গেল। সত্যিই তো, এমন কূটতর্কে সময় কাটালে, আসল কাজ অর্থাৎ বিপ্লবের কাজটা হবে কখন? যদি মেনেও নেওয়া যায় পার্টি গড়ার প্রক্রিয়ায় ভুল ছিল, তা সংশোধনের রাস্তা এখনও খোলা আছে। দলের মধ্যে থেকেই তা করে নেওয়া যায়। আর সর্বোপরি নতুন পার্টি বিপ্লব করতে উদগ্রীব। সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। রাজ্যে রাজ্যে, জেলায় জেলায়, এলাকায় এলাকায় পার্টির পরিচিতি বাড়ছে, শাখা খুলে যাচ্ছে। অতএব যুক্তি-তর্কের ধোঁয়াজাল বিস্তার না করে কাজটা করে দেখাই যাক না। পাঞ্চালীও আছে দলে। একসঙ্গে কাজ করা যাবে। পাঞ্চালী ডেকেছে তাকে। কমরেড এসো। দ্রোণ রাজি হয়ে গেল নতুন পার্টিতে যোগ দিতে। তপন-সমীরও আপত্তি করল না।

দলে যোগ দেবার পরেই উৎসাহ বেড়ে গেছে দ্রোণের। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়, হুগলি জেলায় দৃষ্টান্তমূলক কিছু একটা করা দরকার। সবাই তখন নকশালবাড়ি শ্রীকান্দামের সঙ্গে হুগলির নামও উচ্চারণ করবে! এই উদ্দেশ্যেই সে অজিতদাকে বারে বারে সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা বলে। পাঞ্চালীর থেকে পুরনো দেশব্রতীর প্রতিটি সংখ্যা মন দিয়ে পড়ে নিয়েছে দ্রোণাচার্য। দেশব্রতীতে প্রকাশিত চারু মজুমদারের প্রতিটি রচনা তার মুখস্থ।

পাঞ্চালী আবার বলল দ্রোণ এখন চারু মজুমদারের বেজায় ভক্ত...কী দ্রোণ ঠিক বলেছি কী না?

পাঞ্চালীর স্বরে সবসময়েই সজীব ছটফটে ভাব থাকে। ওর স্বরের উচ্চাচতায় কখনও ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয় না। ওর কথনে থাকে নির্মল আমোদ। পাঞ্চালীর কথায় দ্রোণও মজা পেল খুব। বিপ্লব তো শুধু জনাকয়েক গম্ভীর লোকের জন্য নয়, এ হ'ল জনতার উৎসব। এই মহোৎসবে তো হাসি ঠাট্টা থাকবেই। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে দ্রোণ বলল, একদম ঠিক বলেছ, আরে আমি তো তোমাদের মত প্রথম থেকেই মানাতা দিয়ে শুরু করিনি....শুরু করেছি অবিশ্বাস দিয়ে। এজন্যই কমরেড সি এম সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন তোমাদের থেকে দামি... বুঝলে হে...

দ্রোণের বক্তব্য, সে যেহেতু দক্ষিণদেশ গ্রুপে থেকে নানান অবিশ্বাস, বিরুদ্ধ যুক্তি পেরিয়ে সি এম-কে আদর্শ বলে মেনেছে, অতএব তার মতামত পাঞ্চালী-বিজন-অজিতদার থেকে অনেক ঝঙ্ক।

দ্রোণ বলল, আজ এজন্যই আমি বর্ষা মাও সে-ভুজের চিন্তাধারার বর্ণপরিচয় হ'ল চারু মজুমদারের রচনা.....আলোচনা আবার গিয়ে এ'ল হুগলি জেলায় সশস্ত্র লড়াইয়ের কথায়।

মিটিঙে সিদ্ধান্ত হ'ল জোতদার গভমে। টাগেট বসন ঘোষ।

গজঘন্টার এসন দোষকে সবাই বাসু ঘোষ বলেই জানে। লোকটি অতি বদ। এলাকার কৃষ্যাত সুদখোর। বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে তার কাছ থেকেই ঋণ নিতে বাধ্য করে দরিদ্র কৃষককে। ওর বাড়িতে গিয়ে বেগার খাটতে বাধ্য হয় অসহায় কৃষক পরিবার। কৃষক গমণীর ইচ্ছত নষ্ট করতেও ব্যাটার জুড়ি নেই। মেয়েরা পুকুরে স্নান করতে নামলে গজঘন্টা ডুব সাঁতার কেটে এসে তাদের শ্রীলতাহানি করে। ওই লোকটিকে খতম করা দরকার। শয়তানটিকে নিকেশ করলে এলাকার জনসমর্থন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

কয়েকদিন গোঁজাণের করবার পর পরিকল্পনা পাকা হয়ে গেল। প্রত্যেকদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে বাসু ঘোষ সাইকেল চেপে গজঘন্টা থেকে বেরিয়ে মগরা স্টেশনের দিকে যায়। যাবার পথে একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাঁক আছে। তীক্ষ্ণ বাঁকটির মুখে দুটি কাঁঠাল, একটি নিম্ন গাছ ছাড়াও রয়েছে তিনটি কামিনী গাছ। কামিনী গাছের ঝোপের পাশেই একটি মাটির বাড়ি। আড়াল নেবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ঠিক হল এইখানেই আক্রমণ করতে হবে।

যে তিনজনের দল বদমাশটিকে খতম করবে সেই দলে রইল দ্রোণ, বিজন আর সহদেব। দলের সদস্যদের শ্রেণীচরিত্র নিয়ে বিজন আপত্তি তুলেছিল। দ্যাখ আমরা কেউই গরীব ক্ষেতমজুর নই, ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সদস্যও নই। দ্রোণকে বলেছিল বিজন। আর তা ছাড়া আমরা তিনজনের কেউই এই এলাকার ছেলেও নই — তোর বাড়ি জয়পুর, আমার গোপালপুর, আর সহদেব তো সেই সায়াড়া-ইলামপুরের ছেলে।

সহদেব হেসেছিল। বিজন তোর কী ভয় করছে?

বিজন রেগে গেল। ভয়ের কথা হচ্ছে না। কথটা হ'ল যে কাজটা দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের দিয়ে ঘটাবার কথা, এলাকার মানুষকে নিয়ে করবার কথা তা আমরা এই তিনজনে করছি কেন?

দ্রোণ বলল, ওই এলাকা থেকে ঠিকঠাক যোগ্য ছেলে পাওয়া গেল না.....। অ্যাকশানটা হবার পর আমরা প্রচার করে দেব যে এলাকার ক্ষেতমজুরের গেরিলা স্কোয়াড এই কাজ করেছে... তাহলেই তো মিটে গেল।

দ্রোণের বক্তব্য, গজঘন্টার গরীব মানুষ বাসু ঘোষের অত্যাচারে জর্জরিত। এই অবস্থায় এই অ্যাকশান তাদের এক ধাক্কায় জাগিয়ে দেবে। আরে আমাদের ভূমিকাটা একটা দেশলাই কাঠির মতো.....ফস করে জ্বলে উঠবে আর ওইসব আপাত শান্ত পেট্রোল-ডিজেলের মতো মানুষগুলো সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব আমরা, বুঝলি...। বিজনের কাঁধে হাত রেখেছিল দ্রোণ।

দ্রোণের কথায় এইবার সায় দিয়েছিল বিজন। হ্যাঁ এইটা ঠিক বলেছিস। চোখের সামনে একটা জীবন্ত উদাহরণ দেখতে পেল গরীব মানুষ হাতে অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াবে।

১৯০৭ প্রথমে তীর চালাবে দ্রোণ। যদিও তীরন্দাজিতে হাতটা এখনও তেমন পোক্ত হয়ে গিয়েনি দ্রোণের তবুও শত্রুকে প্রথম আক্রমণটি করবার গৌরব পেতে চাইল সে। বলল, আমি মসকালে সহদেব তো আছেই। সহদেব মূর্খ চোখ বুজে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। অগাধ ওর নিশানা। দ্রোণ আর সহদেব যেহেতু তীরধনুক ব্যবহার করবে, বিজনের হাতে দেখায়া ০৭ টাঙ্গি।

নির্দিষ্ট দিনে সময়ের একঘন্টা আগেই গজঘন্টা পৌঁছে গেল ওরা তিনজন। তীরধনুক,

টাস্টি লুকিয়ে রাখা হ'ল কামিনী গাছের আড়ালে। এক মাইল দূরে চায়ের দোকান। চট করে এক ভাঁড় করে চা খেয়ে আসা যায়। চা খেয়ে ফেব্রুয়ার সময় বাসু ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে এল ওরা। বিজন দাঁড়িয়ে গেল। শয়তানটা বেরুবার উপক্রম করতেই বিজন দৌড়ে এসে জানান দেবে ওদের।

দ্রোণের উত্তেজনা বাড়ছিল। এর আগে গান্ধেগড়ে ধীরু সোরেনের কাছে যে তীরধনুক চালানো শিখেছে, তা তো অনেকটাই খেলাচ্ছলে শেখা। যদিও এটা ঠিকই দ্রোণ তীরন্দাজি শিখেছিল কৃষকদের লড়াইতে অংশ নেবার জন্য, কিন্তু যা ভেবেই শিখে থাকুক, সেই গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে তীর চালানো আর এক কুখ্যাত জোতদারের উদ্দেশ্যে শরসন্ধান যে নাকি রক্তমাংসের মানুষ, এ দুয়ের অনেক তফাত। অকস্মাৎ তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। মন একাগ্র করবার চেষ্টা করলো দ্রোণাচার্য।

বিজনকে দৌড়ে আসতে দেখেই দ্রোণ আর সহদেব কামিনী গাছের আড়ালে তীরধনুক বাগিয়ে দাঁড়াল। ছিলা টেনে তীর যোজনা করল দ্রোণাচার্য। বিজন দৌড়ে এসে টাস্টিটা হাতে নিয়ে বলল ব্যাটা, একতলায় নেমেছে। এইবার সাইকেলে উঠবে। বিজনের হাতের টাস্টির ইস্পাতের ফলাটি প্রায় দশ ইঞ্চি চওড়া। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ রোদ্দুর এসে পড়তেই টাস্টির ফলা ঝকঝকিয়ে উঠল। যেন বিদ্যুৎ চমকচ্ছে টাস্টির মাথায়!

সাইকেলের ঘন্টি শোনা যেতেই দ্রোণ বাম হাতে তীরধনুকটিকে চেপে ধরে ছিলা টেনে ধরলো কান অবধি। বাসু ঘোষ আসছে। তামাটে বর্ণের কুতকুতে চোখ, কৌকড়া চুল ব্যাকব্রাশ করা। চুলে প্রচুর তেল মাখে লোকটি। রৌদ্রের ওর মাথা চকচক করছে।

কামিনী গাছ পেরোতেই তীর ছুড়ল দ্রোণাচার্য। শেষ মুহূর্তে হাত কঁপে যাওয়ায় তীর লোকটির হুইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল। দ্রুত আরেকটি তীর ছুড়ল দ্রোণ কিন্তু সেটিও শরীর স্পর্শ করল না লোকটির।

আর দেরি না করে সহদেব ছুটে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তীর ছুড়ল সহদেব। বাসু ঘোষের পিঠে বিধল সেই তীর। লোকটি সাইকেল উল্টে পড়ে গেল মাটিতে।

দ্রোণ স্নোগান দিল নকশালবাড়ি লাল সেলাম। সহদেব-বিজন প্রত্যুত্তর করল — লাল সেলাম, লাল সেলাম। বিজন ছুটে গিয়ে টাস্টি চালাল। লোকটির মাথা ফাঁক হয়ে যেত কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাত দিয়ে মাথা আড়াল করবার চেষ্টা করল বাসু ঘোষ। ফলে টাস্টির কোপ পড়লো হাতে। একবার নয়, দু'বার। ভালকে ভালকে রক্ত বেরিয়ে এল। বাসু ঘোষ আর্তনাদ করল, বাঁচাও বাঁচাও।

রক্ত এবং জিজীবিসুর আর্তনাদ এ দু'য়ের অভিঘাতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ওরা তিনজনেই। এই সুযোগে বাসু ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়তে লাগল। সন্নিহিত ফিরে পেয়ে ওরা তিনজনেই দৌড়ল। কিন্তু ততক্ষণে লোকটি সামনের একটি পাকা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। লোকটির চিংকারে এলাকায় লোক জড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

দ্রোণ বলল, চল পালাই। উল্টোদিকের ধানক্ষেতের আলপথ দিয়ে ওরা পালিয়ে গেল। আপাতত ওদের গন্তব্য সহদেবের বাড়ি সায়ড়া ইলামপুর। সেখান থেকে অ্যাকশনের রিপোর্ট পাঠাতে হবে অজিতদাকে। সহদেবের বাড়িতে দু'দিন থেকে দ্রোণ চলে গেল। আশপাশের

খবর সংগ্রহ করে সে আবার সাতদিনের মাথায় ফিরে আসবে। বিজ্ঞান হয়ে গেল সায়াড়া ইলামপুরে। জয়পুর, ব্যান্ডেল, বলাগড়, আগরপাড়া, হালিশহর, সমস্ত থাকার জায়গায় একদিন, দুদিন থেকে দশদিন পরে দেশব্রতী হাতে করে দ্রোণ এল সহদেবের বাড়ি। দ্রোণের মুখ উজ্জ্বল। দেশব্রতীতে খবর বেরিয়েছে।

দ্রোণ উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করল। লেনিন-স্তালিনের হাতের মশাল আজ মাও সে-তুঙের হাতে। হুগলি জেলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম শুরু।

সহদেব বলল, বাঃ দারুণ হেডিং.....

খবর পড়তে থাকলো দ্রোণ। হুগলি জেলায় মগরা-বলাগড় থানায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে মূলত ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষির তিন জনের একটি গেরিলা দল তীর ধনুক ও টান্সিসহ ওই এলাকার সবচেয়ে অত্যাচারী কুখ্যাত জোতদার বাসু ঘোষকে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করে।

বিজ্ঞান হাসল। উরিববাস! আমরা সবাই ক্ষেতমজুর, গরীব চাষি! হাঃ হাঃ দ্রোণ পড়তে থাকল।অভূতপূর্ব জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে ওই এলাকার কৃষক জনতার মধ্যে। তারা বিপ্লবী কর্মীদের শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, তোমরা ওই শয়তানটাকে একেবারে খতম করতে পারলে না?

সহদেব বলল, ধুর! এটা বাড়াবাড়িএসব কিছু হয়নি।

দ্রোণ বলল, এইগুলো লিখতে হয়এমন করলে পাঠকদের উৎসাহ জাগে। ঠিক আছে ঠিক আছে, পড়তে থাক। বলাগড় বিজ্ঞান।

দ্রোণ শুরু করল। ওই ঘটনা থেকে বিপ্লবী কর্মীরা কয়েকটি শিক্ষা পেয়েছেন। প্রথমত, গোঁড়া দলের শ্রেণীশত্রু অভিযানটি আরও নিখুঁত হওয়া দরকার। সামান্যতম সজাগতার অভাব হলে সমগ্র পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত কৃষকদের বিপ্লবী মেজাজকে সংহত করতে হলে তাদের উদ্যোগের দ্বার খুলে দিতে হবে। তৃতীয়ত, তাদের শ্রেণীধূণাকে আরও তীব্রতর করতে হলে শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানকে অব্যাহত রাখতে হবে। দ্রোণ থামল। এই গঠনাত্মক সমালোচনা ছাড়া বাকি সবটাই ওদের কাজের প্রশংসা।

তাদের অ্যাকশনের খবর ছাড়াও দেশব্রতীতে চারু মজুমদারের একটি লেখা বেরিয়েছে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান : চীনের পথ আমাদের পথ। লেখাটির প্রথম লাইন — এই প্রাচীন ও সুবিশাল ভারতবর্ষ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। কমরেড সি এম-এর লেখাটিও সবাইকে পড়ে শোনাতে দ্রোণ। লেখাটির শেষ লাইনে দ্রোণের গলায় আবেগ এসে গেল — 'জয় আমাদের হবেই, কারণ চীনের চেয়ারম্যান আমাদেরও চেয়ারম্যান, চীনের পথই আমাদের পথ। চারু মজুমদারের লেখা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও বারে বারে তাদের তিনজনের চোখ ফিরে আসছিল হুগলি জেলার খবরে।

শান্ত, ভারতের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের এলাকায় হুগলির নামও ঢুকে পড়ল। দ্রোণ বলল। বিজ্ঞান সাই দিল। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কমরেড সি এম নিশ্চয়ই আমাদের কাছাকাছি প্রশংসা করবেন। দ্রোণ মাথা নাড়ল। নিশ্চয়ই। দেশব্রতীতে বেরিয়েছে যখন, সি এম প্রাগতে জানাবেন আমাদের। খবর বিনিময়ের মধ্যে সহদেব জানাল, পুলিশ তাদের

খুঁজছে। মারাত্মক আহত অবস্থায় প্রথমে বাসু ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মগরা হাসপাতালে। সেখান থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে চুঁচুড়ায়। ওর জবানবন্দি অনুযায়ী পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে এলাকার সক্রিয় নকশালপছীদের। সাবধান করে খবর পাঠিয়েছেন অজিতদা।

লড়তে গেলে, এমন তো হবেই, দ্রোণ বলল। সহদেব বলল, ঠিক কথা....তবে সাবধান হওয়া দরকার। বিজন বলল, নিশ্চয়ই। সাবধানতার জন্যই ওরা তিনজনে ছড়িয়ে পড়ল তিনদিকে। এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম ঘুরে বেড়ালে, জনতার মধ্যে মিশে থাকতে পারলে ওদের ধরা সহজ নয়।

কিন্তু শুধু আত্মগোপন করে থাকলেই চলবে না। খতম অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হবে হুগলি জেলায়। গান্ধীগড়কে ঘাঁটি বানানো যায়। ওই এলাকায় চেতনার মান আরও বাড়াতে হবে। দ্রোণাচার্য ফিরে ফিরে চারু মজুমদারের লেখা পড়ে। ওঁর লেখা প্রতিটি অক্ষরের প্রেমে পড়ে যায় সে।

কিছুকালের মধ্যে দেশব্রতীতে বের হল সি এম-এর আরেকটি লেখা — ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করে এগিয়ে চলুন। সি এম বলেছেন চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি আর তাঁর ‘তিনটি লেখা’কে বারে বারে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা উচিত। এ লেখা শুধু যে কৃষক জনতার সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন তাই নয়, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত যারাই বিপ্লবী চিন্তায় চিন্তিত তাদেরই এই লেখা কটি বারবার পড়তে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সি এম-এর লেখা পড়ে আর এক মুহূর্তের দাঁড় করল না দ্রোণাচার্য। চেয়ারম্যানের উদ্ধৃতি সম্বলিত রেডবুক আর তিনটি লেখা হাতে সোজা চলে গেল গান্ধীগড়।

গান্ধীগড় এসে টের পাওয়া যায়, একদিনে এই এলাকায় বাসু ঘোষের ওপর আক্রমণের খবরটা চলে এসেছে। সবাই বেশ টপ্পন করছে। দেখে ভালো লাগে। ধীরুদা, রূপা, কুনু, প্রীতম সবাই দ্রোণকে ঘিরে ধরে। খোঁজখবর নেয়।

সন্ধ্যাবেলায় দ্রোণ ওদের সঙ্গে বসে, মাও সে-তুঙের কথা পাড়ে। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ! রেড বুক দেখায় ওদের। ‘তিনটি লেখা’ বের করে ঝোলা থেকে। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের তিনটি লেখার সারকথাটা হ’ল জনগণের সেবায় ত্যাগ স্বীকার করা, জনগণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা।

প্রথম লেখা ‘জনগণের সেবা কর’। লেখাটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ শুরু করে দ্রোণাচার্য। একটু পরে থেমে সে কথ্যভাষায় লেখার অন্তর্বস্ত ব্যাখ্যা করে।

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু সব মরণ সমান নয়। প্রাচীন চীনে শিমা ছিয়েন নামে একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, মানুষের মরণ হবেই। কিন্তু কোনো মৃত্যুকে মনে হয় থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী আবার কোনো মরণ বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হালকা। মাও সে-তুঙ বলেছেন, জনগণের জন্য যিনি মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী। কিন্তু যে লোক ফ্যাসিস্টদের জন্য খাটে অথবা জনগণের শোষণকারী ও জনগণের অত্যাচারীদের জন্য মরে, তার মৃত্যু বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হালকা।

চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের একজন বীর সদস্য কমরেড চ্যাং-শু-তে। তিনি জনগণের সেবায় একগ্রন্থ ছিলেন। উনিশশো চ্যাম্পিশ সালে উওং শেন্-সি-তে কমরেডদের জন্য রান্নার

প্রয়োজনে গিয়েছিলেন জাপানি কাঠ ভোগাড় করতে। ভ্রমের মধ্যে গাছ চাপা পড়ে মারা যান তিনি। এই মৃত্যু তো জনগণের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে। এ মৃত্যু পাহাড়ের মতো ভারী। কমরেড চ্যাং-এর শোকসভায় বলেছিলেন মাও সে-তুঙ।

ধীরুদা, রূপা, প্রীতম, আদুরি সবার চোখে ভালোলাগার ছাপ স্পষ্ট। ওরা জানতে চাইল পরের লেখাটির কথা। হ্যারিকেনের পলতে একটু উঁচু করা হয়। আলো বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় লেখা — নর্ম্যান বেথুনের স্মরণে। নর্ম্যান বেথুন ছিলেন চিকিৎসক। এবং কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। জাপানি শত্রুদের বিরুদ্ধে চিনের মানুষ যখন মাও সে-তুঙের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লড়াই করছিল, সে সময় ডাক্তার বেথুন কানাডা থেকে চলে আসেন চীন দেশে। লালফৌজের আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতে। আহতদের নিষ্ঠাভরে সারিয়ে তোলাই ছিল যাঁর ব্রত, তিনিই মারা গেলেন আহত হয়ে। চিনের জনগণের জন্য ডাক্তার নর্ম্যান বেথুনের ত্যাগ অসামান্য। একজন বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে চিনের জনগণের মুক্তির কাজকে নিজের বলে মনে করতেন। এটা কি ধরনের মানসিকতা? মাও সে-তুঙ বলেছেন এ হ'ল আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবমানস, কমিউনিজমের ভাবমানস, যা কাঁটাতারের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখায়। তাঁর কাজ থেকে প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

দ্রোণ ভেবেছিল দ্বিতীয় গল্পটি রূপা-প্রীতম ওরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু রূপা বলে উঠল, আরে তুমিও তো আমাদের ডাক্তার বেথুন গো.....। দ্রোণ অবাক। কেন?

তুমি তো থাকো দূরে অন্য কোথাও.....সেখান থেকে এসে তুমি আমাদের মধ্যে থাকছ, আমাদের বিপদে আপদে যুক্তি দিচ্ছ...আমাদের সঙ্গে লড়ছ...তুমিও আমাদের সেই ডাক্তার বেথুন.....। দ্রোণ লজ্জা পেল খুব। মলোও লাগল।

মানুষের ভালোবাসা নেশা ধরায়। কিছু মানুষের স্বীকৃতি বৃহত্তর, ব্যাপক স্বীকৃতির আনন্দকে জাগায়। স্কুলের গণ্ডি না পেরনোয় দ্রোণ একটু হীনম্মন্যতায় ভুগত। নান্দালবাড়ির রাজনীতি তার সেই সংকোচ কাটিয়ে দিয়েছে। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এত মানুষ তাকে চাইছে, সম্মান জানাচ্ছে, দেখলে বুক ভরে ওঠে। গান্ধে গেরিলা যুদ্ধের গাঁটি গড়তেই হবে। মাথার মধ্যে বিপ্লবের ছন্দ ঘুরপাক খায়। এইবার শান দাও হাতিয়ার / কাছাকাছি এসে গেছে বিপ্লব / শোষণের রক্তেই উৎসব / এইবার শান দাও হাতিয়ার। একটি কাগজে দ্রোণ টুকে রাখে হঠাৎ এসে পড়া লাইনগুলি। তার কবিতা কীরকম স্নোগান হয়ে উঠছে!

আরে পরের গল্পটা শুরু কর। রূপার গলা। কাগজ-কলম সরিয়ে দ্রোণচার্য তিন নম্বর লেখায় চলে গেল। বোকাবুড়ো পাহাড় সরিয়ে ছিলেন। রচনার নাম শুনে সবাই নড়ে চড়ে বসল। কে বোকা বুড়ো? প্রীতম জানতে চাইল। পাহাড় সরাবে কী করে? রূপার প্রশ্ন।

কাহিনি শুরু করল দ্রোণ। এ হ'ল চিনা উপকথা। প্রাচীনকালে উত্তর চীনে এক বৃদ্ধ থাকতেন— বোকাবুড়ো। তাঁর বাড়ির দক্ষিণে দুটি উঁচু পাহাড় — থাইহাং আর ওয়াংউ। পাহাড় দুটি তাঁর বাইরে যাবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। বোকাবুড়ো ঠিক করলেন কোদাল দিয়ে পাহাড় দুটিকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলতে হবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কোদাল হাতে

তিনি গেলেন পাহাড় খুঁড়তে। তাদের কাণ্ড দেখে জ্ঞানীবুড়ো উপহাস করে বললেন, তোমরা বোকার হদ্দ। এ পাহাড় উপড়ে ফেলা তোমরা বাবা-ছেলে এই ক'জনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বোকাবুড়ো বললেন, আমি মরলে আমার ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে, তারা যখন মরবে তখন থাকবে আমার নাতিরা আর তারপরে তাদের ছেলেরা ও নাতিরা। এমনই চলবে। পাহাড় দুটি অনেক উঁচু ঠিকই কিন্তু আর তারা উঁচু থাকতে পারবে না। আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব ততটুকুই তারা নিচু হবে। একদিন না একদিন এ পাহাড় সরে যাবেই। জ্ঞানীবুড়োর উপহাস গায়ে না মেখে বোকাবুড়ো প্রতিদিন কোদাল চালাতে থাকলেন। এই অধ্যবসায় দেখে ভগবান মুগ্ধ হলেন। তিনি দুজন দেবদূতকে পাঠালেন ধরাধামে। তারা এসে পিঠে করে নিয়ে চলে গেল পাহাড় দুটিকে। গল্পটির উদাহরণ দিয়ে মাও সে-তুঙ বলেছেন, চিনের জনগণের মাথার ওপরেও এমন দুটো পাহাড় চেপে বসে আছে। একটা সাম্রাজ্যবাদ অন্যটা সামন্ততন্ত্র। আমাদেরকেও ওই বোকাবুড়োর মতো বিরামহীনভাবে এই পাহাড় খুঁড়ে ফেলার কাজটি করে যেতে হবে। আমরা অধ্যবসায় দিয়েই ভগবানের মন গলাতে পারব। আমাদের ভগবান — চিনের জনসাধারণ।

দ্রোণাচার্য বলে চিনের মতো আমাদেরও নৃজির, সুখ-সমৃদ্ধির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় — দুটি নয়, চারটি। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ আর সামন্তবাদ। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মতো আমাদেরকেও এই পাহাড় উপড়ে ফেলবার কাজে লেগে থাকতে হবে।

ধীর-রূপা-প্রীতম সবাই তালি দেয়। খাঁটি কথা বলেছ বটে।

রাজনীতির পাঠের পর সবাই যে-যাকুর মতো চলে যায়। হ্যারিকেনের আলো কমে যায়। দ্রোণের নিঃসঙ্গ লাগে। বাড়ির কথা মনে পড়ে। মা-বাবার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। অ্যাকশনের পর থেকে পাঞ্চালীর সঙ্গেও দেখা করবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। দেশব্রতী পড়ে পাঞ্চালী একটি ছোট চিরকুট পাঠিয়েছিল। দু ইঞ্চি চওড়া এক ইঞ্চি লম্বা কাগজটিতে লেখা ছিল কমরেড, লাল সেলাম। কাগজটি এর আগে কয়েকবার দেখেছে দ্রোণ। আবারও দেখল। এর উত্তরে কিছু লেখা হয়নি এতদিন। কিন্তু কী-ই বা লেখা যায়? একটি কথাই তো পাঞ্চালীকে বারে বারে বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু তা কখনও ওর চোখে চোখ রেখে বলা যায়নি। কোনোদিন বলা যাবে কী না তাও এখনে উঠতে পারে না দ্রোণ। কাগজ নিয়ে উত্তর লিখতে বসে। কিন্তু কবিতা এসে যায়। বার বার যাই বার বার ফিরে আসি / তবুও হ'ল না বলা, আমি ভাপোপাস / শুধুই তোমাকে / অন্য কাউকে নয়; / সন্ধ্যাে দিন কেটে যায় প্রিয় / মনের ভিতর ভয়।

গভীর রাতে খবর আসে। মগরাতে জরুরি সভা। অজিতদা ডেকেছেন। পরদিনই দ্রোণ চলে যায় মগরা। স্টেশনের কাছে হালদার বাড়ির দোতলার ধরে গোপন মিটিং। বিজন, সমীর, তপন সবাই এসেছে। পাঞ্চালী আসতে পারেনে না। কোনো কারণে কলকাতায় গেছে সে।

বিগত অ্যাকশনের ভুলভ্রান্ত নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খতম অভিযান চালানোর কথা হবে। তবেই এলাকার জোতদার-জমিদার-বদবাবুরা চাপে থাকবে।

রাতে মগরার বাড়িটিতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। মিটিঙের শেষে ঘুমে চোখ বুজে আসে দ্রোণের। কুয়াশার মধ্যে একটি ব্রিজ দেখতে পায়। নিশ্চয়ই লুটিন ব্রিজ। হাঁ লুটিনঝুলা। ব্রিজের তলায় খরস্রোতা তাতু নদী। ওপার থেকে শত্রুর গুলি ছুটে আসছে। লুটিনঝুলার দখল নিতে চলেছে লং মার্চে থাকা লালফৌজ। নদীর পশ্চিমপাড় দিয়ে ঢুকছে লালসৈন্য। লুটিন সেতুটি অপূর্ব দেখতে! দুপারে দুই পাহাড়ের মাথায় বাঁধা সেতুটির দুই প্রান্ত। তেরোটি সমান্তরাল শিকল। চারটি রেলিং। সেতুর ওপর হাঁটবার জন্য পাতা কাঠের তক্তা সরিয়ে নিয়েছে শত্রুরা। রাইফেল, গ্রেনেড সম্বল করে বাইশজন গেরিলা ঝুলতে ঝুলতে উঠেছে লুটিন ব্রিজে। পেছনের স্কোয়াড ব্রিজের ওপর দ্রুত পাটাতন বসাচ্ছে। তার ওপর দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোচ্ছে মাও সে-তুঙের লালসৈন্য। হঠাৎ সাঁকোর অন্যপ্রান্তে আগুন ধরে গেল। শত্রুপক্ষ আগুন ধরিয়েছে। আগুনের বলয় ভেদ করে ছুটে গেল লালফৌজের গেরিলা। লুটিন সেতু গণমুক্তি বাহিনীর দখলে! ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন মাও সে-তুঙ।

চেয়ারম্যান বললেন, ভয় করছে?

দ্রোণ বলল, না কমরেড।

— তাহলে কবিতা শোনাও.....।

কোন কবিতা শোনাবে সে চেয়ারম্যানকে?

লালফৌজ নির্ভীক দীর্ঘ দূর যাত্রা বহু বাধার অযুত ধারা হাজার চূড়া কিছুই নয় ভাবার—

— আরে এ তো আমার কবিতা। কী জানলে কী করে?

মাও সে-তুঙ দ্রোণের কাঁধে হাত রাখলেন।

নাশ ধরে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। ঝাঁকানিতে দ্রোণের ঘুম ভেঙে গেল। সমীরের গলা। কমরেড, কমরেডপুলিশ। দ্রোণ লাফিয়ে উঠে পড়ল।

গাঢ় ঘুমে গিয়ে দেখা গেল চতুর্দিকে পুলিশ। বাড়ির সামনের দরজার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। পাশের বাড়ি কিছু দূরে। লাফিয়ে ও বাড়ির ছাদে যাবার কোনো উপায় নেই। একমাত্র উপায়, একতলার বাথরুমের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাঁচিল উপকূলে পালানো। দ্রোণ দ্রুত একতলায় নেমে গেল। পাঁচিল উপকূলে রাস্তায় পড়ল। উঠে দাঁড়াতেই কলার ঢেঁলে শব্দ। দুটো সাদা পোশাকের গাট্টাগোট্টা লোক। বানচোত পালাবি কোথায়? ঘণ্টা তাসছে। দ্রোণের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো ওরা।



কেশব সেন স্ট্রিট ধরে পূবমুখো হাঁটলে আমহাস্ট স্ট্রিটের একটু আগেই বাঁ-দিকের যে গলিপথ তার নাম ঝামাপুকুর লেন। ঝামাপুকুর লেনে ঢুকে নির্দেশমতো ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়াল নিরুপম।

চেকশার্ট পরা একটি ছেলে এগিয়ে এল। ছেলেটির চোখে চশমা, পায়ে মোটা হাওয়াই চটি, হাতে একটা ইয়োইয়ো। সে ইয়োইয়োটি একবার দূরে ছুঁড়ে দিয়েই আঙ্গুলে বাঁধা সুতোর এক ঝটকা টানে ফের হাতের মুঠোয় ভরে নিল খেলনাটি। তারপর নিরুপমের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নিরুপম বলল, বাহাত্তর বাই সাত নম্বর বাড়িটা খুঁজছি।

ছেলেটি মৃদু হাসল। এসো।

আসলে এ রাস্তায় ওই নম্বরের কোনো বাড়ি নেই। নম্বরটি হ'ল সংকেত। ছেলেটি নিরুপমকে নিয়ে যাবে গোপন সভায়।

ঝামাপুকুর লেনের উত্তরপ্রান্তের একটি দোতলা বাড়িতে ঢুকে পড়লো ওরা। চিরন্তন, সুশান্ত, সুবীর, কাজল ছাড়া অচেনা চারটি ছেলেও দেখল নিরুপম। পাঁচ মিনিট পরে আরও একজন এল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন চাকর মজুমদার - কমরেড সি এম। সঙ্গে বনমালী রায়।

প্রারম্ভিক সম্ভাষণের পরেই সভা শুরু হয়ে গেল।

কমরেড সি এম বললেন, পার্টির সেন্ট্রাল লিডারশিপ সরাসরি বা পার্টির মুখপত্র মাধ্যমে যে সব কথা বলেন, সেগুলি আপনারা হুবহু একই ভাষায় বলা শুরু করুন, একই ভাষায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিনচিনের পার্টিতে আমাদের চেয়ারম্যান তাঁর চল্লিশ বছরের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা প্রচারের এই পদ্ধতিই চালু করেছেন.....

চিরন্তন থামিয়ে দিল। কমরেড আপনি আমাদের 'তুমি' বলুন। 'আপনি' শুনতে অস্বস্তি লাগছে.....

সি এম হাসলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...এমনভাবে কথাগুলি হুবহু মনে রাখার অভ্যাস কর তোমরা.....এমনটা করা দরকার.....না হলে পার্টির মধ্যে ক্রমশ বহুকেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা দিতে পারে।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করল বিপ্লবী হিসাবে আমাদের এখন কী ধরনের কাজ করা উচিত?

হ্যাঁ বলছি। সি এম বলতে শুরু করলেন। ওঁর মতে দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই যুবছত্রেরা বিপ্লবী হতে পারবে, তার আগে নয়।

পাড়ায় পাড়ায় টপ্পল কলেজে চার-পাঁচজনের ছোট ছোট স্কোয়াড বানিয়ে চার-পাঁচদিনের ভূটিকৈ গায়ে মাঝার প্রোগ্রাম করা যায়। যথাসম্ভব কম টাকাকড়ি, জামাকাপড় ব্যাগে ভরে যেতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামে। ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের শোনাতে হবে চোয়ারম্যানের কোটেশন। নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দ্যের দিকে না তাকিয়ে ভালোভাবে বুঝতে হবে গরীব ভূমিহীন চাষীদের সমস্যা। তাদের থেকে শিখতে হবে যুবছাত্রদের। উৎসবের মতো এই অভিযানের হাওয়াটা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের পার্টি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে খতম অভিযান শুরু করেছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে।

সি এম এন চোখে নিদ্রা খেলে গেল।

এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে নতুন এক মানুষ যে মৃত্যুকে ভয় করে না, ভয় করে না যে কোনো রকমের আত্মত্যাগ.....।

কাজল বলল, কমরেড শহরে আমরা এখনই কিছু করতে পারি না?

নিচুয়ট অনেক কিছু করার আছে। তবে তা করতে হবে একাত্ত হওয়ার প্রথম পাঠটি শেষ হবার পর। মৃদু হাসলেন সি এম। গ্রাম থেকে ফিরে এসেই রেডগার্ড সংগঠন গড় আর শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ত হও। যুবছাত্র সংগঠন বলতে আমাদের পার্টি বোঝে একমাত্র রেডগার্ড সংগঠন। পাড়ায়-পাড়ায় ইস্কুল-কলেজে যুবছাত্ররা এবার রেডগার্ড স্কোয়াড সংগঠিত কর। প্রত্যেকটি স্কোয়াডের এলাকা আশু কমান্ডার ঠিক করে নাও।

শহরে শ্রমিকরা এখনই কোনো লড়াইয়ে বা সংঘর্ষে নামবেন, রেডগার্ডরা তাদের পাশে গিয়ে জমায়েত হবে। যুবছাত্রদের এই একাত্ত সমর্থন শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। ক্রমশঃ এগিয়ে রেডগার্ডরা শুরু করবে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার। বিপ্লবী কান্ডার তৈরির কাজ। ভবিষ্যতে যখনই শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ হবে, রেডগার্ড আর যুবছাত্ররা জমায়েত হয়ে অবশ্যই সেই সংঘর্ষে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেবে। দু'চার জন রেডগার্ড হলেও ক্ষতি নেই, তারা যোগ দেবে। সুবীর বলল, কমরেড আমার মনে হয় শহরে পার্টির ওপর কোনো আক্রমণ এলে, তাকেও রুখে দেবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে আমাদের.....

একেগারে সঠিক বলছ। ঠিক কথা। সি এম বললেন। শহরাঞ্চলে যেখানেই আমাদের ওপর অন্য পার্টির কোনো হামলা হবে, সেখানেই পাল্টা আঘাত হানবার জন্য রেডগার্ডদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে..... এটা বিশেষ প্রয়োজন।

সি এম একবার বনমালী রায়ের দিকে তাকালেন। তারপর ফিরলেন সুবীরের দিকে। ফার্স্ট স্ট্রাজেজি গার্ডিনী আক্রমণ করলে গেরিলা কায়দায় পাঁচ-ছ'জনের রেডগার্ড কোনো ঠেট ভুলে না করে, ক্ষিপ্ততার সঙ্গে এবং অত্যন্ত কাছ থেকে পাল্টা আক্রমণ চালাবে..... স্ট্রাজেজি গার্ডিনীর মনোবলকে একেবারে ভেঙে দেবে।

সিকলমের ভেতরটা আবেগে দুলে উঠল। কমরেড আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার যে কোনো খুলো পার্টির ওপর আক্রমণ রুখে দেব..... আমাদের হাতে লালঝান্ডা..... নিরুপমের ওই খুলো মধ্যে নিয়ে নিলেন চাক মজুমদার। আমি জানি কমরেড। তবু আবার বলি, কোনোও যদি দেখা পার্টির মর্গাদা অবমানিত হতে যাচ্ছে, যদি দেখা শহীদের রক্তচিহ্ন মাখা

লাল পতাকা লাঞ্ছিত হতে চলেছে, জীবন দিয়েও তার মোকাবিলা ক'রো। সে পতাকা সংশোধনবাদী পার্টির টাঙানো হতে পারে, তবু তা লালঝান্ডা তো!

একটু থেমে সি এম বললেন, শ্রীকাকুলামের তেরো জন বীর শহীদের দৃষ্টান্ত কখনও ভুলো না..... শাসকরা ভেবেছিল ওদের হত্যা করে আন্দোলন থামানো যাবে.... কিন্তু প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার ওখানকার বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেনবীর শহীদের হত্যার বদলা নিচ্ছেন.....

বনমালী রায় মন্তব্য করলেন। বিপ্লবীদের হত্যা করে ওরা ভেবেছিল আন্দোলনে দাঁড়ি পড়ে গেছে.... ওরা যাকে দাঁড়ি ভেবেছিল, আসলে তা কমা.....। সবাই হেসে উঠল। হাসলেন সি এম-ও। আবার ফিরে এলেন আলোচনায়।

এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমনভাবে ছেলেমেয়েদের তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব কৃষক শ্রমিককে হয় করতে শেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সবকিছুর ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়, তাদেরই সেবাদাস অনুচর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া একটা মানুষ আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক আর আদর্শনিষ্ঠ হয়ে থাকে। অথচ আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ঠিক এই বয়সটাতে যুবছাত্রদের জনবিরোধী লেখাপড়া আর পরীক্ষা পাশে বাস্তব রাখা হয়। এজন্যই চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, এই ব্যবস্থায় যে যত বেশি পড়াশুনা করবে, সে তত বেশি মূর্থ হবে।

নিরুপম, সুশান্ত, কাজল, সুবীর সহ উপস্থিত সবার দিকে তাকালেন কমরেড সি এম। আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

একেবারে নতুন কথা বলেছেন সি এম। স্কুল, কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। অর্থাৎ বিপ্লব এসে গেছে সামনেই। এখন সবকিছু ফেলে বিপ্লবের কাজ দ্রুততর করতে হবে।

অচেনা ছেলেদের থেকে একজন প্রশ্ন করল, কমরেড বিপ্লব কবে হবে এদেশে? আপনার কী মনে হয়?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সি এম। তারপর মৃদু গলায় কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, যে কাজ আলোচনা হ'ল তা যদি তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করবে পার, তবে আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের বুকেই এ বছর অর্থাৎ উনিশশো সত্তর সালের মধ্যে বা একাত্তরের শুরুতেই গণফৌজ মার্চ করবে।

সভার শেষে বনমালী রায় চাপাস্বরে বলে উঠলেন, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। নিরুপমরা কণ্ঠ মেলাল, লাল সেলাম। লাল সেলাম। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষায় বসেনি বলে নিরুপমের মাঝে মধ্যে খারাপ লাগত। সি এম-এর কথা শুনে সেই গ্লানি কেটে গেল। এই বিপ্লবের কালে ওই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আটকে থাকা অর্থহীন। চিনের যুবছাত্ররাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দু'বছর পর — সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।

স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে নিরুপমদের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক হয়ে গেল। সুশান্ত বলল, এই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশুনো না করলে এই শিক্ষার অসারতা বোঝা যাবে

না। চিরন্তন হাসল। বাঙ্গের হাসি। কী অপূর্ব যুক্তি! কলেরার যন্ত্রণা বুঝতে হলে, কলেরার জীবন সরা এল যেতে হবে আমাদের। কী যে আনন্দ! কথা বলিস—।

কিন্তু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন তো এই বুর্জোয়া স্কুলেই পড়েছিলেন। সুশাস্ত বোঝাবার চেষ্টা করল। নিকপম বলল, ওঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি কারণ ওই বুর্জোয়া পরিবেশের মধ্যে থেকেই শ্রমীসংগ্রামের তাগিদে তারা প্রত্যেকেই বুর্জোয়া দর্শনকে খণ্ডন করেছিলেন, দিকার জানিয়েছিলেন।

দিক কথা। চিরন্তন নিকপমকে সমর্থন করল। তার মানে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন যে-যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবার পর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন হয়েছেন আমাদেরকেও আবার সেই সেই কাজ করতে হবে। প্রশ্ন করল চিরন্তন।

দুশীল ভোঁস উঠল। মার্কস ছিলেন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অতএব আমাদেরকেও বিদ্যন করবার আগে অন্তত পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হতে হবে?

নিকপম উৎসাহ পেল। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এই সহজ সত্যটি বোঝবার জন্য আমাদের একবার আগুনে হাত দিতে হবে?

কিন্তু যতক্ষণ না একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা আমরা গড়ছি কী করে বলি স্কুল-কলেজ ছেড়ে পাণ্ডা সূশাস্ত জিজ্ঞেস করল। চিরন্তন বলল, বিপ্লবের জন্য এই ত্যাগ আমাদের করতেই হবে। নিকপম বলল, আর মাত্র দুটো বছর, ছাত্রপরেই তো ক্ষমতা দখল করছি আমরা। তখন আবার চাপ হবে পড়াশুনো।

এরপরে সুশাস্ত আর কিছু বলল না।

সি এম এর কথার ঘোর রইল পরের দুইয়েকটা দিন। ওঁর কথামত ছ'জনের একটি দল গঠিয়ে নিকপমরা গেরায়ে পড়লো। ওঁদের উদ্দেশ্যে। ওঁদের এই রেডগার্ড স্কোয়াডের কমান্ডার চিরন্তন।

ভাঙড়া থেকে রাতের ট্রেন পরে ভোরবেলা ওরা পৌঁছল দামোদর। দামোদর স্টেশনের লাগোয়া গ্রামটি বড়। গ্রামে বেশ কয়েকটি টালির চালের বাড়ি। দেখে মনে হয় গ্রামটি সম্পন্ন। এট গ্রাম ছেড়ে ক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটতে শুরু করল নিকপমরা। অঞ্চলটি অসমতল। দু'রে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিহারীনাথ পাহাড়। সেই পাহাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল নিকপম-চিরন্তনদের ছ'জনের দল।

আলপথের পারে একজন বয়স্ক লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল। চিরন্তন ইশারায় থামতে বলল সবাইকে।

লোকটির নাম শম্ভু মাণ্ডি। সামনেই বাঁশপিচালী গ্রামে থাকে। মাটি কোপানোর কাজে সাহায্য করতে চাইল নিকপমরা। কিন্তু লোকটি কুণ্ঠিত। সে কিছুতেই তার কোদাল ছুড়ি দিল না নিকপমদের।

শম্ভু মাণ্ডির সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিকপমরা তার বাড়ি অবধি গেল। লোকটির পরিবারে পাঁচজন সদস্য। নিজের জমি নেই। জমিদারের জমি ভাগে চাষ করে ফসলের চাষি শ্রমিক লাভ। তা দিয়ে সারা বছরের খাওয়া চলে না। নিজস্ব লাভ, বলদ আছে লোকটির। বাঁশপিচালী গ্রামে দু'ঘর মাহাতো, বাকি সব সাঁওতাল। অধিকাংশই গরীব, কেউ কেউ পুরোনো ভাগচাষের ওপর নির্ভর করে। গ্রামটিতে ছড়িয়ে পড়ল নিকপমরা ছ'জন।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলল ওরা। মাও সে-তুঙের রাজনীতি বোঝানোর চেষ্টা করল। নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলামের চাষিদের লড়াইয়ের গল্পও শোনাল।

দুপুরবেলার খাওয়া সারা হল মুড়ি দিয়ে। তারপর খোঁজখবর নিয়ে ওরা গেল ছ-সাত মাইল দূরের সাঁওতাল গ্রাম যুগীডাঙা। গ্রামে পৌঁছানোর রাস্তা দুর্গম। একদিকে খাড়া পাহাড়, জঙ্গল অন্যদিকে গভীর খাদ। যুগীডাঙা গ্রামটি ছোট। কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস। কারুরই নিজের জমি জায়গা নেই। সবাই ভূমিহীন কৃষক। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমি যাদের হাতে সেই ধনী জোতদারেরা থাকে সাত-আট মাইল দূরের গ্রাম তিলুড়িতে। সেই জোতদারদের অনেকের হাতে একশো থেকে একশো কুড়ি বিঘা পর্যন্ত জমি আছে। এই গ্রামের সাঁওতাল কৃষকরা সেইসব জমিতে ভাগ চাষ করে। উৎপন্ন ধানের পঁচিশ থেকে তিরিশ ভাগ পায়। অন্য সময়ে পাথর ভাঙার কারখানায় মজুর খেটে, জঙ্গল থেকে খাবার সংগ্রহ করে কোনোরকমে চলে।

যুগীডাঙার সনাতন হাঁসদা জানাল, তিলুড়ির এক শয়তান জোতদার রোহিনী সাউয়ের কথা। রোহিনী একশো কুড়ি বিঘা জমির মালিক। এছাড়াও তার সুদের কারবার। আবার দুপুরে সে হেলতে দুলতে প্রাথমিক স্কুলে পড়াতেও যায়। অত্যাচার করে সে দশ-বারো ঘর ভূমিহীন কৃষককে গ্রামছাড়া করেছে। তার তিন জন রক্ষিতা।

সব শুনে নিরুপম বলল, শয়তানটাকে খতম করুন সনাতন খুব উৎসাহ দেখাল। সে গেল আশপাশের গ্রামে কয়েকজন বিশ্বস্ত কৃষককে খবর দিতে। এদিকে প্রায় মাইল কুড়ি পঁচিশ হেঁটে নিরুপমরা ক্লাস্ত। ওরা ঘুমিয়ে পড়ল সনাতনের বাড়ির দাওয়ায়।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতে ওরা দেখে সনাতনের সঙ্গে আরও তিন চারজন লোক। ওরা তাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। যদিও নিরুপম-চিরন্তন দুজনেই জানাল ওরা ছাত্র, গ্রামে বেড়াতে এসেছে কিন্তু ওদের সন্দেহ কমল না। একথা সেকথায় নানান প্রশ্ন করতেই থাকল।

চিরন্তন বলল, এফুনি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। লোকগুলি নিরুপমদের পেছনে পেছনে প্রায় ছ-সাত মাইল অবধি এল।

ওরা সন্ধ্যাবেলায় স্টেশনে পৌঁছল। আগে ঠিক করেছিল এক রাস্তির থাকবে এখানে। অবস্থা প্রতিকূল দেখে কলকাতায় ফেরবার ট্রেন ধরল ওরা।

কলকাতায় ফেরবার পরদিনই এক গোপন সভায় গ্রামে যাবার অভিজ্ঞতার বিবরণী পেশ করতে হ'ল নিরুপমকে। আর একটি রেডগার্ড স্কোয়াড গ্রামে যাবে। তাদেরকে ওদের অভিজ্ঞতা জানালে, ভুলত্রুটি চিহ্নিত করলে ওই রেডগার্ড স্কোয়াডটির সুবিধা হবে।

বনমালী রায় বললেন খতমের কথা। জমি দখল না ক্ষমতা দখল? জোতদারের ধান কেটে নিয়ে আসা, না, তার গলা কেটে ফেলে দেওয়া? ভূমিহীন গরীব কৃষককে জমি পাইয়ে দেওয়া, ধান পাইয়ে দেওয়া, না, তার এলাকায় জোতদার মহাজন খতম করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাওয়া? ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে এই দুই লাইনের লড়াই প্রকট আর প্রবল হয়ে উঠেছে পাইয়ে দেওয়াটা হ'ল সংশোধনবাদী লাইন আর খতম হ'ল বিপ্লবী লাইন।

নিরুপম বলল, কমরেড এখন আমাদের ছড়িয়ে প্রচার করে বেড়ানো কাজ নয়। একটা

নির্মিত এলাকা বেছে নিন, বেছে নিন একটা নির্দিষ্ট ইউনিট, বেছে নিন একটি নির্দিষ্ট স্কোয়াড। সেখানে সফলভাবে খতম অভিযান চালান, তারপর নিন আর একটি স্কোয়াড আর একটি ইউনিট। এইভাবে আপনার এলাকার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করুন। এইভাবে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে এলাকার বাকি অংশে সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিন।

গ্যামে শূরে এসে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে নিরুপমের। সে চারু মজুমদারের কথাগুলি তনয় আশ্রিত করতে থাকল। কমরেডস্ এই পদ্ধতিই সঠিক পদ্ধতি। উদ্দেশ্যহীন রাজনৈতিক প্রচার নয়, খতম অভিযানকে সফল করার জন্য রাজনৈতিক প্রচার। এই সঙ্গেই ডি-ক্লাস্ ডেও চলে আমাদের, জড়তে চলে নিজেদের পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা।

কমলালী রায় নিকলমের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

গ্যাম অভিযানের পরবর্তী শেখ করার পর নিজেদের বিচ্যুতির কথাও বলল নিরুপম। ঔষধাণ্ডে নলে ভালো করে খোঁজখবর না করে সনাতন হাঁসদাকে খতমের লাইন দেওয়াটা ঠিক হয়নি। ও হয়তো দালাল শ্রেণীর কোনো লোককে জানিয়ে থাকবে খতমের অভিপ্রায়। সেজন্যই এই ছ সাতজন অত উগ্রভাবে ওদের জেরা শুরু করেছিল।

সব শব্দে কমলালী রায় বললেন মাও সে-তুঙের কথা। লড়াই করো, বিফল হলে আগুন লাড়ো, বার বার লাড়ো, যতদিন না বিজয়ী হওএই হচ্ছে জনগণের যুক্তি এবং তারা কখনোই এর বিরুদ্ধে যাবে না।

মাও সে-তুঙের এই কথা নিয়ে হুগলির সেজদা কমরেড গান বেঁধেছেন। লড়াই কর লড়াই কর লড়াই কর লড়াই / যতদিন না বিজয়ী হও যদি একবার হারো বারবার লড় বারবার লড় বারবার / যতদিন না বিজয়ী হও। সেজদা কমরেড খালি গলায় গান করেন। কোনো গম্ভীরতা লাগে না। গলার বিভিন্ন আবেগ দিয়েই উনি গানের আবহ তৈরি করে নেন।

এই গান শেষ করে পরলেন অন্য গান। আমরা ধানকাটার গান গাই, আমরা লোহাপেটার গান গাই, আমরা গান গাই।

গানটি শেষ হতেই কমলালী রায় বলে উঠলেন, আরে বোকাবুড়ার গানটা হোক। রেডগুপের বোকাবুড়ার গান নিয়েও গান বেঁধেছেন সেজদা কমরেড। ভদ্রলোক স্মিত হাসলেন। চুলের মাথা হাত চালালেন একবার। তারপর শুনশুন করে সুর ভেঁজে নিয়ে গণে ফেললেন— শুন শুন সর্বজন শুন মন দিয়া / মোদের কাছে যাওরে ভাই এক কাঁঠনী গুণিয়া। / অনেকদিন পূর্বের কথা উত্তরের দেশে / যে দেশে পাহাড়ের মাথা আসমানে মেখে। / সেই দেশেতে ছিলরে এক বোকা বুড়ার বাসা / বুড়ার মাথা ভরা পাকা চুল চক্ষু ভাসা ভাসা / বোকা বুড়ার কথা শুন রে।

নিকলমেরা গলা মেলালো। বোকা বুড়ার কথা শুনরে। এই গানটি খুবই প্রিয় সবার। চট করে গলা মেলানো যায়।

গানটি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। নকশালবাড়ি জীকুলাম, ডাউন্ডা মুশাহরি / সামন্তের পাহাড়ে পড়ে শাবলের বাড়ি / পড়ে শাবলের বাড়ি। / ডেবরা গোশীঘরপুত্র লখিমপুর খেরি / ধ্বসিছে সামন্ত পাহাড় আর নাই দেরি / রে ডাউন্ডা আর নাই দেরি / বিচার পথের দিশা দেখরে।

দীর্ঘ গানটি শেষ হয়ে আসে। বোকা বুড়ার কাহিনী যে হইল সমাপন। নিরুপমেরা

চিৎকার করে ওঠে — বল বিপ্লবের হোক জয়, জয় জনগণ।

বনমালী রায় বলেন, জয়, জয় জনগণ।

যে স্কোয়াডটি গ্রামে যাবে তারা চলে যায়। বনমালী রায় ইশারায় নিরুপম, চিরন্তনদের বসতে বলেন।

কমরেডস, শহরেও আমাদের উপস্থিতি বোঝানো দরকার। বললেন বনমালী রায়। গ্রামে গ্রামে জোতদার খতম শুরু হয়ে গেছে। দেশব্রতীতে সেইসব অ্যাকশনের রিপোর্ট বেরোয়। দেশব্রতী ছাড়াও বাজারের পত্র-পত্রিকাগুলিতেও এখন নিয়মিত বের হচ্ছে খতমের খবর। পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষকের লড়াই দেশের উনিশটা রাজ্যের মধ্যে দশটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্টি গঠনের দশমাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জোতদার খতমের সংখ্যা ষাট ছড়িয়ে গেছে।

বনমালী রায়ের গলায় আবেগ এসে গেল। আজ আমরাই নিয়ামক শক্তি। আমরাই ঠিক করছি কখন, কাকে আর কীভাবে খতম করব। শত্রু আমাদের গোপীবল্লভপুরে ঘিরল, খতম হ'ল বহড়াগোড়ায়, খড়গপুরে। ওরা যেই ছুটল বহড়াগোড়া-খড়গপুর, কৃষকের কান্ডে আবার ঝলসে উঠল গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, কেশপুরে।

একটু দম নিলেন বনমালী রায়। আজ আমরাই বেছে নিতে পারি কোথায় আক্রমণ করব— ওদের ছুটে হয় আমাদের পেছন পেছন। পার্টির এই অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে চিন।

কিছুদিন আগেই পিকিং রেডিও থেকে বলা হয়েছে — ভারতের সর্বত্র সশস্ত্র সংগ্রামের লেলিহান অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়েছে। সব ঠিক তবু শহরে আমাদের অ্যাকশন একটু বাড়ান দরকার। আবার বললেন বনমালী রায়। গ্রাম থেকে জোতদার বদবাবুরা শহরে পালিয়ে আসতে থাকবে। ওরা মনে করে শহর ওদের নিরাপদ আশ্রয়। পুলিশ তাদের রক্ষা করবে। সেই ধারণাটা যে ভুল এটাও বোঝানো দরকার।

সঠিক বলেছেন বনমালীদা। নিরুপমরা মানল। শহরের পুলিশকেও সমঝে দেওয়া দরকার। পনেরো দিনের মধ্যে গেরিলা অ্যাকশন শুরু করল নিরুপম-চিরন্তনদের স্কোয়াড। অ্যাকশন মানেই যে সবসময় মারকাট, তা নয়। রাতের গভীরে, পুলিশ গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে দেওয়ালে মাও সে-তুঙের প্রতিকৃতি আঁকতে কিংবা চারু মজুমদারের উদ্ধৃতি লিখতেও যথেষ্ট বুদ্ধি এবং সাহস লাগে। পুলিশের নজর এড়িয়ে লিখতে হয় কারণ পার্টি বেআইনি না হলেও, যে কোনো ছুতোয় পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর খুন জখমের মামলা রুজু করছে।

নিরুপমদ্রবে দেওয়ালে লেখার উপায় বের করল নিরুপমদের স্কোয়াড। মাও সে-তুঙের প্রতিকৃতির স্টেনসিল বানানো হ'ল। যে কথাগুলি দেওয়ালে লেখা হবে সেগুলিও প্রথমে পিচবোর্ডের ওপর লিখে, লিখিত অংশটির সীমানা বরাবর কেটে ফেলে দিল। এইবার দেওয়ালে পিচবোর্ড চেপে ধরতেই কেটে ফেলা অংশ দিয়ে দেওয়াল দেখা যায়। ব্র্যাক-জাপান কালিতে বুরুশ ডুবিয়ে সেই মোটা তুলি ফটাফট দেওয়ালে লেপে যাও। মাও সে-তুঙের নিখুঁত প্রতিকৃতি আঁকবার মতোই দ্রুত শেষ হয়ে যায় এক একটি লিখন — 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ।' 'সত্তরের দশককে

মুক্তির দশকে পরিণত করুন। 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।' 'দুট পাতেও হোন, আত্মবলিদানে নির্ভর্য হোন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করুন, বিজয় অর্জন করুন।'

নিরুপমদের স্কোয়াডে সুবীর খুব ভালো লিখতে পারে। সুবীর যখন দেওয়ালে লেখে, নিরুপম, চিরন্তন আর অনার্য রাস্তার মোড়ে পাহারা দেয়। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই মুখে আঙুল পুরে সিটি দেয়। সতর্ক হবার সংকেত। অচিরেই এলাকার দেওয়ালগুলি ভরে উঠল কালা কালির লিখনে। দেওয়াল লিখন থেকেও চাপা উদ্বেজনা ছড়ায়। কারা লিখছে? কখন লিখছে? এলাকায় পুলিশের চরদের আনাগোনা বাড়ে।

কয়েকটি লেখা হয়ে যাগার পর নিরুপমদের স্কোয়াডের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। ওরা লেখা, ওত্থাকারীকে পাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

একদিন স্কোয়াডে খবর আসে, পার্টির এক বছর পূর্তিতে মিছিল করতে হবে। কিন্তু সেই মিছিলে এমিয়েন্টর আহান কোনোমতেই দেওয়া যাবে না দেওয়াল লিখনে। এ মিছিল সংগঠিত করতে হবে গোপনে। মিছিল করবার জন্য প্রশাসনের কাছে নেওয়া হবে না কোনো আগাম অনুমতি। যে রাষ্ট্রকে আমরা মানিই না তার আবার অনুমতি নেবার কী দরকার? ঠিক কথা।

নিরুপমরা নেচে ওঠে। মুখের কথায় সংগঠিত হচ্ছে থাকে পার্টির বর্ষপূর্তির মিছিল। রাজপথে লোক প্রকাশ্য শোভাযাত্রায় হাঁটবে কিন্তু তার সংগঠন করতে হবে গোপনে। এও তো এক গেরিলা অ্যাকশন!

গাইশে এপ্রিল বিড়লা তারামগুলের সামনে পৌঁছে যায় নিরুপমরা। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় বিভিন্ন কিনারায়। মিছিলের ফেস্টাইল গোটানো আছে ব্যাগের মধ্যে। কয়েকটি লাঠি ফেলে রাখা হয়েছে ময়দানে। সংকেত পেলেই সবাই ছুটে যাবে তারামগুলের সামনে। ওখান থেকেই শুরু হবে শোভাযাত্রা।

বনমালী রায় বাস থেকে নামেন। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেন নকশালবাড়ি লাল সেলাম। ওইটাই সংকেত। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিধ্বনি হয় লাল সেলাম। লাল সেলাম। আধঘন্টার মধ্যে শুরু হয়ে যায় মিছিল। চলার পথে মিছিল ভারী হয়ে ওঠে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় রাজপথের দখল নেয় পঞ্চাশ হাজার মানুষ।

মিছিল অভিযানের পাঁচদিনের মাথায় দেশব্রতী অফিসে তল্লাশি চালান পুলিশ। পত্রিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার করবার পর ছাপাখানা বন্ধ করে দিল তারা।

সে-রাতেই নিরুপমরা পাড়ার দেওয়ালে লিখে ফেলে, পুলিশের দালাল, কুস্তা সাবধান, ভারতের ইয়েনান শ্রীকাকুলাম লাল সেলাম। ৭১-এর শুরুতেই গণমুক্তি ফৌজ মার্চ করবে।

লেখার দুদিনের মধ্যে পুলিশ সুবীরকে ধরল। ওকে নিয়ে গেল থানায়। দমদম এলাকায় ডাকাতি হয়েছে। সুবীর নাকি সেই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত! এমনই অভিযোগ পুলিশের। সুবীরকে থানার লক আপে বেদম পেটান হয়েছে।

শালাগা মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে রাখতে চায় আমাদের। চিরন্তন বলল। সুশান্ত বলল, কিন্তু ওরা সুবীরের নামটা জানল কী করে? কাজল বলল, প্রকাশ্য জায়গায় লিখলে, কেউ না কেউ তো দেখতে পাবেই.....। নিরুপম কাজলকে থামিয়ে দিল। কীভাবে ধরা পড়ল

সেটা বড় কথা নয়। ব্যাপারটা হল সুবীরকে ধরে ওরা আমাদের ভয় দেখাতে চায়, আমরাও ওদের পাল্টা ভয় দেখাব। চিরন্তন সমর্থন করল। হ্যাঁ প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিতে হবে আমাদের।

খোঁজখবর করে জানা গেল থানার রবি সেনশর্মা সাব-ইন্সপেক্টরটি অতি ধুরন্ধর। ওই বজ্জাতটা চায়ের দোকান, পানের দোকানে নজরদারি তৈরি করেছে। সুবীরকে থানায় মারধর করেছে ওই শয়তানটাই। ওই ব্যাটাকে আক্রমণ করা দরকার। চিরন্তন বলল। করতে হবে গেরিলা অ্যাকশন।

গেরিলা অ্যাকশন নিয়ে পড়াশুনো করেছে নিরুপম। চারু মজুমদারের ‘গেরিলা অ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা’ আবারও ভালো করে পড়ে নিল। যদিও সি এম-এর ওই ব্যবহারিক উপদেশগুলি গ্রামাঞ্চলের কমরেডদের জন্য তবু শহরেও এর প্রাসঙ্গিকতা আছে। স্কোয়াডে আলোচনা হ’ল একদিন। সি এম-এর বলা কথার সঙ্গে নিজেদের পদ্ধতি মিলিয়ে নিতে চাইল ওরা।

যেভাবে গোপনে গেরিলা দল গঠন করার কথা বলা হয়েছে, আমরা তা সম্পূর্ণ মেনেছি। জানাল চিরন্তন। নেতা নির্বাচনও হয়ে গেছে। স্টেনগানের মতো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছি না আমরা — বোমা, পাইপগানই আমাদের অস্ত্র। শহরের মধ্যে গেরিলাদের শেলটারের ব্যবস্থাও মোটামুটি করা গেছে। পালিয়ে বেড়ানোর পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করেছে আমরা। এখন এই রবি সেনশর্মা কে ঠিকমতো আক্রমণের পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের।

আক্রমণ প্রসঙ্গে সি এম কী বলেছেন একটা শোনা যাক। নিরুপম কাজলকে পড়তে বলল।

যথাসম্ভব নিরীহ লোকের ভান করে গেরিলারা বিভিন্ন দিক থেকে আসবে। আগে ঠিক করা একটা জায়গায় এসে মিলবে। শত্রুর জন্যে তারা অপেক্ষা করবে এবং যখন সুযোগ আসবে তখনই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ও শত্রুকে খতম করবে। আমরা কখনও অর্ধৈর্ষ্য হব না বা তাড়াহুড়ো করব না, বিশেষ করে প্রথম আক্রমণের ক্ষেত্রে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরুপম মাথা নাড়ল। খুব ঠিক কথা। আমরাও প্রথম আক্রমণ করতে যাচ্ছি অতএব খুব ধৈর্য্য রেখে এগোতে হবে আমাদের।

চিরন্তন বলল, ঠিকইআবার এটাও মনে রাখতে হবে তাড়াহুড়ো না করবার ভাবনায় যেন বজ্জাতটাকে আক্রমণের ইচ্ছাটা বদলে না যায়। তেমন হলে তা হবে সুবিধাবাদ.....

নিরুপম বলল, না না সে তো ঠিকই.....আক্রমণের কর্মসূচি পাল্টাব না আমরা।

সি এম যেমন ধৈর্য্য সহকারে এগোনোর কথা বলেছেন তেমনই এও বলেছেন একটা সময়ে আওয়াজ উঠবে, যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিস্ট নামের উপযুক্তই নয়। চিরন্তন জানাল।

সুশাস্ত্র বলল, আর একটি বিষয়ে সি এম জোর দিয়েছেন। তা হ’ল অনুসন্ধান। লক্ষ্য স্থির করার পর শ্রেণীশত্রুর চলাফেরা খুব নিখুঁতভাবে নজর করতে হবে যাতে আক্রমণের সবচেয়ে ভালো সময় আর জায়গা ঠিক করা যায়।

সুশাস্ত্রের কথায় স্কোয়াডের সবাই একমত হ’ল। রবি সেনশর্মার গতিবিধি ভালো করে জানা দরকার। স্কোয়াডের চারজনই লেগে পড়ল খবর সংগ্রহের কাজে। চিরন্তন জোগাড়

করল থানাসূত্রের খবর। লোকটি কখন আসে, কখন বের হয়। নিরুপম-সুশান্ত লেগে এটল ওর চলাফেরার রাস্তাটি চিহ্নিত করবার কাজে। কাজল জানবার চেষ্টা করল লোকটি কোন কোন দোকানে যায়। বাজারের সজ্জি বিক্রেতা থেকে রাস্তার চায়ের দোকান সব জায়গাতেই ও বন্ধুত্ব পাতাল।

কাজটি শক্ত সম্ভব নেই। তবু অধ্যবসায়ে ফল পাওয়া যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই গোলা, গোল লোকটির দরগ। রবি সেনশর্মা বাজার করে বৈঠকখানা বাজারে। সকাল সাড়ে আটটায়। কাজার বাড়িতে রেখে থানায় বেরোয় দশটা সাড়ে দশটায়। চুল কাটে লাড়ান দেয়। সেখানে। প্রত্যেকদিন রাত নটার সময় লোকটি সেন-বাড়িতে যায় পুজোর আদায় দেখতে। শঙ্খদর্শন, কাসর ঘন্টার আওয়াজ থেমে যাবার অন্তত আঘঘন্টা পরে ও সেন বাড়ির সিঁড়ির দাপ দিয়ে নেমে আসে। সেন-বাড়ির পাঁচটি বাড়ি পরে খোকনের পানের দোকান। সেখান থেকে জর্দা পান কিনবে লোকটি। পান চিবুতে চিবুতে পুলিশের জীপে উঠবে। পুলিশ-গাড়িটি আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে রজনীগুপ্ত রো-তে ঢুকে পড়ে অখিল মিস্ত্রি পেন মের শিয়ালদার দিকে হায়াং খাঁ লেনে চলে যায়। হায়াং খাঁ লেনে লোকটির এক রক্ষতা আছে। সেই বাড়িতে গভীর রাত অবধি থেকে বজ্জাটটি আবার থানায় পুলিশ কোয়ার্টারের দিকে আসে। লোকটির অন্যান্য কর্মসূচিতে সময়ের পরিবর্তন হলেও রাত নটা থেকে দশটার ঘটনাগুলি প্রায় একই সময়ে ঘটে থাকে। প্রত্যেকদিন। স্কোয়াড ঠিক করল রবি সেনশর্মাকে আক্রমণের উপযুক্ত সময় রাত পৌনে দশটা। আক্রমণের জায়গা রজনীগুপ্ত রো আর অখিল মিস্ত্রি লেনের সংযোগস্থল। রাস্তা দুটির সংযোগস্থলে তেঁতলা বাড়ি আছে দু-তিনটি। বাড়ির ছাদ থেকে পুলিশের জীপ লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া যায়।

সুশান্ত প্রস্তাব দিল দু-জন রাস্তায় থেকে লোকটির আসবার খবর জানালে, ছাদে জড়ো হওয়া দু-জন পরপর বোমা চার্জ করতে পারে। চিরন্তন মানল না। ওর মতে, এটার মধ্যে আত্মরক্ষার চিন্তা কাজ করছে। নিরীহভাবে শত্রুর কাছকাছি গিয়ে একেবারে কর্মমর্দন করবার দূরত্ব থেকে তাকে আক্রমণ করতে হবে। এটা শুধু চিরন্তনের কথা নয় কমরেড সি এম-ও এমন কথাই বলেন। শেষপর্যন্ত ঠিক হ'ল ওরা চারজনই রাস্তায় থাকবে।

শনিবার রাতে নিরুপম আর কাজল আলাদা আলাদা দাঁড়াল রজনীগুপ্ত রো আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে। চিরন্তন, সুশান্ত দাঁড়িয়েছে অখিল মিস্ত্রি লেনের মুখটায়। ওইখানটায় রাস্তাটা হঠাৎ একটু সরু হয়ে গেছে। গাড়ির গতি কমাতেই হয়।

পুলিশের জীপটি রজনীগুপ্ত রো-তে ঢুকতেই গাড়ির ভেতরটি ভালো করে দেখে নিল নিরুপম। হ্যাঁ বজ্জাটটা আছে। সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশেই বসেছে। জীপের পেছনের সীটগুলি ফাঁকা। কোনো পুলিশ নেই। সুবর্ণ সুযোগ! মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজাল নিরুপম। গাড়ি পৌঁছে গেছে অখিল মিস্ত্রি লেনের মুখে। গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে গেল নিরুপম। চিরন্তন বোমা ছুড়ল। কড় কড় বু-উ-ম। মেদিনী কাঁপানো আওয়াজ করে বোমাটি গাটল জীপের বনেটের উপর। রবি সেনশর্মা ছিটকে বেরিয়ে এল জীপ থেকে। কোমর থেকে পিঙ্কল বের করল। চিরন্তন দৌড়ছে উন্টোদিকে। সুশান্ত'র হাতে বোমা। কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিরন্তনকে গুলি করবে শয়তানটা। আর সময় নেই ভাববার।

সুশান্তর হাত থেকে বোমা নিয়ে রবি সেনশর্মাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল নিরুপম। লোকটির পিঠের ওপর বোমা ফাটল। রাস্তায় মুখ খুবড়ে পড়ে গেল পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর।



ডামাডোল চলছে। কিছুকাল আগে থেকেই কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কংগ্রেসের বয়স্ক রক্ষণশীল নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মতান্তর চলছিল। রক্ষণশীলদের বলা হয় সিভিকেট আর ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামীরা ইন্ডিকেট। সিভিকেটের নেতারা সব ঢালাও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের পক্ষে। ইন্ডিকেটের বক্তব্য ভারীশিল্প থাকবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে। মতানৈক্য বেড়ে যেতে সিভিকেটের নেতারা ইন্দিরাকে দল থেকে বের করে দিলেন। ইন্দিরাও দমে যাবার পাত্রী নন। জগজীবন রামকে সভাপতি করে তিনি গড়ে ফেললেন পাল্টা কংগ্রেস দল। ওই দলকে নব কংগ্রেস বলে সগাই। পুরনোদের বলা হয় আদি কংগ্রেস। ইন্দিরার নব কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ম্লোগান দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য পাতিয়েছে। কংগ্রেসের মুখে একেবারে নতুন কথা!

রাজ্যেও প্রতিদিনই নতুন কিছু না কিছু হয়ে চলেছে। ডালহৌসী স্কোয়ার নাম বদলে হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ — সংক্ষেপে বিবদী বাগ। ধর্মতলা স্ট্রিট হয়েছে লেনিন সরণি। ইডেন উদ্যানে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্ক্রলয় হটাকার টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড়ের চাপে মারা গেল ছ'জন যুবক। একই ঘটনাও তো রাজ্যে আগে কখনও ঘটেনি। আর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক হানাহানি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত খুনোখুনি চলছে। সি পি এম মারছে সি পি আই, এস ইউ সি, বাংলা কংগ্রেস কর্মীদের। ওরাও প্রত্যাঘাত করছে। মারা যাচ্ছে সি পি এম কর্মী। নকশালপন্থী সি পি আই (এম-এল)কে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়েছে সি পি এম। প্রতিবিপ্লবী হলে খুন করবার পক্ষে যুক্তিটা জোরালো হয়। আবার নকশালরা সি পি এম-কে বলে নয়া সংশোধনবাদী। ওরা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। ওরাও শত্রু। অতএব ওদের খুন করতে বাধা নেই। বামপন্থীরা খুন করছে বামপন্থীদের। লালঝান্ডা হাতে আক্রমণ করা হচ্ছে লালঝান্ডাধারীদের। রাজ্যে এই ঘটনাও তো নতুন! এখন প্রত্যেক দলই খুন করবার স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। প্রত্যেকেই বলে প্রথমে তারাই আক্রান্ত হয়েছে।

হানাহানি থামাতে না পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন। তেরো মাস শাসন চালাবার পর চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। সি পি এম বলল অজয় মুখোপাধ্যায় বিশ্বাসাতক, চক্রান্তকারী। রাজ্যজুড়ে হরতাল ডেকে দিল তারা। সাধারণ ধর্মঘট চলাকালীন বর্ধমানে সি পি এম-এর মিছিল আক্রমণ করল কংগ্রেস সমর্থক সাঁই পরিবারকে। সাঁইবাড়ির মধ্যে খুন হয়ে গেলেন তিনজন। এমন বীভৎস রাজনৈতিক খুনও রাজ্যে আগে ঘটেনি।

পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজ্যে এসে গেল কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ — সি আর পি বাহিনী। দৈনন্দিন খুনোখুনি, বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদী ধর্মঘটের পিঠোপিঠি

নক চর্যা গেল উগ্র দমন নীড়ন। সামান্য কিছু বিস্ফোড ঘটলেই বাধনহারা সি আর পি গাভীরা বেসড়ক লাঠি চালাচ্ছে। গুলি চালাচ্ছে নির্বিচারে। জারি করছে একশো চুম্বাশিশ নারা। সাক্ষা আইন।

চান্দাকের এত হট্টগোলের বিবরণী নিবারণের ডায়েরিতে স্থান পায় না। সন্তান পায়। সন্তান মানে ছোটব্যাটা দ্রোণাচার্য। ডায়েরির পাতা উল্টিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান নিবারণ। শেষ নিকেলের আলো পড়েছে পেয়ারা গাছের পাতায়। পাতার ফাঁকে দুটি টিয়া পাখি খুলসুটি করছে। পাখি উড়ে যেতেই জানালা জুড়ে দ্রোণের মুখ ভেসে ওঠে। একগাল লাড়ি ভরা ফর্সা মুখমণ্ডল কিছুটা মলিন। কিন্তু তার চোখের দীপ্তি এখনও অম্লান। এমন মুখজন্মিত জো দেখোজো নিবারণ শেষ যেদিন গিয়েছিলেন হুগলি জেলে।

এক এক দিন সকাল থেকেই ছোটব্যাটাকে দেখতে যেতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু আদিকালে সময়োই হাতে পয়সা থাকে না। দুটো পয়সা পেলে, ছেলের হাতে একটু কিছু খাবার দেবার মতো ব্যবস্থা হলে, নিবারণ আস্তে আস্তে ট্রেন চেপে চলে যান হুগলি। পৌঁছে যান জেল ফটকে। সেখানে আবেদনপত্র জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। একসময় ডাক পড়ে। তখন ছেলের সঙ্গে দেখা। আগের দিন দেখা মুখটা পাশ্টেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করেন নিবারণ। চোখ জলে ভরে যায়। ছেলে চুপচাপ বসে থাকে। নৈঃশব্দেও কিছু ভাব বিনিময় হয় নিশ্চয়। কিছু না বলেও নিবারণ বোঝাতে পারেন, ছেলের প্রতি তাঁর আস্থা। দশের ভাবনা করতে গিয়ে তার জেলবন্দি থাকাকে সম্মান করেন তিনি। জেলেও তার বড় বড় চোখের মদু কম্পনে প্রকট করে কৃতজ্ঞতা। সে কখনও পাঞ্চালীকে দেবার জন্য চিঠি দেয়। মেয়োটর হাতে সেই চিঠি দিয়ে আসেন নিবারণ। পাঞ্চালী দ্রোণের খবর জেনে নোয়। তারপর হুগলি খবর জানতে চায়। নিবারণ হেসে বলেন, ওই একটুকুম কোনো উত্থান করেন নাই। ঘরে ফিরে ডায়েরির পাতায় ছেলের কথা লিখে রাখেন নিবারণ। পরবর্তীতে, দিনলিপি়র সেই লেখা তাঁকে ছেলের সান্নিধ্য দেয়।

ডায়েরির পিছনের পাতায় চলে গেলেন নিবারণ।

২ জানুয়ারী ১৯৭০।আজ হুগলী যাবার কথা থাকায় ভোর পাঁচটায় উঠে সাড়ে ছটায় মনো পাটকীট সেরে মা-বাবার মাথায় একটু জল চাপিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে নৌরয়ে পড়েছিলাম। প্রথমে গিয়েছিলাম পাঞ্চালীর কাছে। মেয়ে হাতে দশ টাকা দিল। আজ দোণদের কোর্টের দিন আছে জানতে পেরে ওখান থেকে কোর্টে চলে যাই। এখানেটিয় পর ছোকরার সঙ্গে দেখা করে তার হাতে চারটে শাঁকালু, একটা কমলালেবু, খান সাতেরো আলুর বড়া, দুটা সন্দেশ দিয়ে বারোটো পনেরোর লোকাল ধরে দেড়টার সময় গাড়ি চলে আসি। একসঙ্গে অনেকগুলি থাকায় ছোকরা কিছু আনন্দেই, তবে কতকগুলো এমন নৃড়াক সনকার বাহাদুর ধরে এনে আটক করে রেখেছে যারা কোন দলেরই নয়.....

১৬ জানুয়ারী ১৯৭০।বিকাল প্রায় তিনটায় জেল গেটে — সওয়া চারটা পর্যন্ত ওখা দিয়ে ছোটগার সংগে দেখা হল। শ্রীমান ও শ্রীযুতদের জন্য রুটি তরকারী শাঁকালু নারকেল লাড়ু, লাটফণা সাগন, বিড়ি দিয়ে এসেছি। মাত্র কয়েকজন দর্শনার্থী থাকায় ছোট বোটাকে ডালট দেখা চর্যাছে। সংগে অনেকগুলো সহকর্মী একসঙ্গে থাকায় খুব বেশি চিন্তার গাট।

প্রত্যেকদিন এত খাবার নিয়ে যেতে পারেন না নিবারণ। এমনও হয়েছে শুধু পাউরুটি চিনি ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায়নি ছেলেকে। নিবারণ পাতা উল্টোতে থাকলেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০। দ্রোণের আজ কোর্ট হাজরী থাকা সত্ত্বেও সে অসুস্থ থাকায় তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় নাই। মুড়ি কলা কুল হালুয়া এবং তাদের জন্য যা নিয়ে গেছলাম সব ওর বন্ধু চাকান টুডুকে দিয়ে এসেছি। চাকানের কাছে শুনলাম গত বুধবার হতে দ্রোণ এবং আর একজন অনশন শুরু করেছে। এদিকে দ্রোণার অন্য কমরেডরা কোন খবরই রাখে না। সুন্দর পার্টি এবং সুন্দর এদের কার্যক্রম!

দ্রোণ অনশন করছে শুনে নিবারণ সেদিন হুগলি জেলেও যাননি। যদি সে অসুস্থ এই অজুহাতে দেখা না করতে দেয়। আসলে সেদিন অভিমান হয়েছিল দ্রোণার বন্ধুদের ওপর। তারা কেউই জানাল না দ্রোণ অনশন সত্যগ্রহ শুরু করেছে! কোর্টে গিয়ে দ্রোণকে দেখতে না পেয়ে আর এক জেলবন্দি চাকান টুডুকে জিজ্ঞেস করায় পাওয়া গেল এই খবর। অবশ্য, এর ক'দিন পরেই দেশব্রতীতে খবর বেরিয়েছিল — জেলে অনশন ধর্মঘট। গুণা গেল দ্রোণাচার্য ও শীলু অনকা হুগলি জেলে রাজনৈতিক মর্যাদার দাবিতে অনশন ধর্মঘট করছেন।

দেশব্রতী পড়ে ছেলের জন্য একটু গর্ব অনুভব করেছিলেন নিবারণ। ওর হাস্যরস্টাইকে পূর্ণ সমর্থন ছিল তাঁর। ওরা করছে রাজনৈতিক লড়াই, কিন্তু ওদেরকে রাখা হয়েছে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই উচিত।

অনশন ধর্মঘটের পর জামিন নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল দ্রোণাচার্য। নিবারণ ফিরে গেলেন ডায়েরির পাতায়।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।যদি পুষ্টির মত আমার আর্থিক সঙ্গতি থাকতো তাহলে নগদ টাকা ফেলে দিয়ে ছোকরাকে আজই জামিন করিয়ে বাড়ী নিয়ে আসতাম। কিন্তু মা-বাবার দেওয়া শক্তি মা-বাবা নিয়ে নেওয়ায় একেবারে শক্তিশূন্য হয়ে অক্ষম অর্থকরী হয়ে আছি। এ ত হ'ল অক্ষমের দুঃখ। এর পরেও একটা কথা থেকে যায়। এদের পার্টি তাদের একটি অক্লান্ত কর্মীকে তৃতীয় শ্রেণীর জেল আসামী করে হাজতে আটকে রেখে পার্টির তরফে ভাল করছে না মন্দ করছে বোঝা যাচ্ছে না। এটারও চিন্তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নিবারণের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। অর্থকষ্ট বোধহয় সকল কষ্টকে ছাপিয়ে যায়। এই পৃথিবী বড় অদ্ভুত। তার একদিকে কিছু মানুষ বুদ্ধি, মেধা খাটিয়ে, পাহাড় প্রমাণ অর্থ ব্যয় করে এই কিছুকাল আগেই চাঁদে পা রাখল, অন্যদিকের ভূখণ্ডে নিরন্ন, আচ্ছাদনহীন মানুষ রাস্তায় শুয়ে চাঁদের কলঙ্ক দেখতে দেখতে রাত কাটায়। সেখানে গরীব মানুষের অভাব মেটানোর জন্য তেমন কোনো কার্যক্রম নেই, অর্থও নেই। যারা অভাব মেটানোর উদ্যোগ নেয়, জেলে পচতে হয় তাদের। সঙ্গতি না থাকলে নিজেকে অসহায় লাগে। নিজের ওপর রাগও হয় খুব। শৈল আচার্যর হিসাবের খাতা গুছিয়ে লেখা ছাড়াও নতুন প্রতিবেশী নীলুবাবুর তিনটি শিশুকে পড়াবার কাজ পেয়েছেন নিবারণ। প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে হয়। মাস গেলে পাওয়া যায় পনেরো টাকা। খুবই কম। কিন্তু এছাড়া আর কিছু তো জুটল না। মাসের শেষে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এলে, পাঞ্চালী এসে কখনও আট টাকা-

দশ টাকা দিয়ে যায়। আগার ক'দিন চলে। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, ক'দিন এতভাবে জোড়াভাল দিয়ে সংসার চলবে? ভেবে পান না নিবারণ।

দামের কথা মাথায় আসায় আচাযির হিসাবের খাতা খুলে ফেললেন তিনি। চলে গেলেন উনিশশো উনসত্তরে। এ বছরের পুরো ফেব্রুয়ারি মাস আচাযি কাটিয়েছে শিমুলতলায়। ট্রান্সভাড়া অগালা পরিবহন বাড়িভাড়া ভূতা-খাদ্য-জ্বালানি-টুকিটাকি কেনাকাটা মিলে সারা মাসের খরচ ৫৪৮ টাকা ৩২ পয়সা।

আচাযির খাতা পড়তে পড়তে মৃদু হাসলেন নিবারণ। দ্রোণারা সনাতন অভ্যাস, কুআচার লান্টোনার ডাক দিয়েছে। কিন্তু আচাযিগর কিছু কিছু অভ্যাস একই রয়ে গেছে। মাসে একটি লটারির টিকিট ১ টাকা। স্পাটস ক্লাবের চাঁদা — ১ টাকা। সিগারেট এবং দই — লতাত। আর গুটি মাসে দুবার ১ টাকা ৬২ পয়সা। জুলাইয়ের পাঁচ তারিখের হিসাবে অমরকে গেলেন নিবারণ। আচাযির স্ত্রীকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল ফুল অফ ট্রান্সকাল মেডিসিন। তেত্রিশ দিন ছিল হাসপাতালে। দিন প্রতি ৩ টাকা হিসাবে তেত্রিশ দিনে হাসপাতালের চার্জ ৯৯ টাকা। এক্স-রে খরচ ১৫ টাকা, ঔষধ ১১২ টাকা ৪১ পয়সা, খাদ্য ইত্যাদি — ১৩ টাকা ৫২, পরিবহন — ১২ টাকা ৫৬। টুকিটাকি ৪ টাকা ১৫ এবং হাসপাতাল ছাড়বার সময়ে বকশিস — ৬ টাকা ১৫। সব মিলিয়ে খরচ পড়েছে ২৬৩ টাকা ৭৯ পয়সা। হাসপাতালের এই খরচের হিসাব নিজের ডায়েরিতে টুকে রাখলেন নিবারণ। যদি কখনও হৈমকে রাখতে হয়।

মাস ক'দিন আগেই হৈম ছোট ছেলেকে সঙ্গে এসেছে। পাঞ্চালী নিয়ে গিয়েছিল। জেলবন্দি হবার পর এই প্রথম মা-ব্যাটা দেখা। বাড়িতে ফেরার পর হৈমের থেকে বুটিয়ে বুটিয়ে সব পিনপন জোড়াধেনি নিবারণ। হৈমকে তো আর তিনি শিমুলতলায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন না। এর দৌড় ওই হুগলি জেল অবধি। যাতায়াতের ভাড়া জড়াক জোট জেলের জন্য লুঙ্গি কিনতে খরচ হয়েছে। সেলাই সহ লুঙ্গির দাম সাড়ে ৩ টাকা।

আচাযির হিসাবের খাতায় মন দিলেন নিবারণ। খুলে ফেললেন উনিশশো সত্তর। এর মাসিক খরচ এক হাজার ছুঁতে চাইছে। ব্যানার্জিবাবুর মেয়ের বিয়েতে ২০ টাকার উলভান দিয়েছে আচাযি। বাজারে টেরিকটনের প্যান্ট উঠেছে। নিজের জন্য ওইরকম এক পাশা বানাল শৈল আচার্য। কাপড়, মজুরি মিলিয়ে পড়ল ৭০ টাকা। এ বছরের গোড়ায় আগার শিমুলতলা বেড়াতে গেছে আচাযি — এগারো ফেব্রুয়ারি থেকে দশ মার্চ। সঙ্গে নিয়েছে গণেশ মার্কী সর্বের তেলের চার কেজি টিন — ২২ টাকা ৮০ পয়সা। সর্বের তেলের দামটাও নিজের ডায়েরিতে টুকে নিলেন নিবারণ। সর্বের তেলের সঙ্গে বাঙালির অজেন্দা বন্ধ। এই তেল ছাড়া মাছ রান্নার স্বাদ খোলে না একদম। বিশেষত মৌরলা মাজের ঝাল সর্বের তেল ছাড়া অসম্ভব। হৈমর রান্না মাছের ঝাল দ্রোণা খুবই ভালোবাসে। কিন্তু কতদিন তাকে খাওয়ানো যায়নি। কবে যে যাবে কে জানে?

বাটনে সজ্জা নামছে। একটু পরেই বেরিয়ে যেতে হবে ছেলে পড়াতে। কিন্তু কোথাও যেতে উচ্ছ্বস করছে না নিবারণের। দ্রোণার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। নিবারণ ডায়েরির খাতা খুলেছিলেন।

২৬ মার্চ ১৯৭০।সওয়া বারটায় পৌঁছে সওয়া একটা পর্যন্ত কোর্টে থেকে দ্রোণার একটা মকদ্দমার রায় শুনে আসা হল। এ কেসটায় দ্রোণ বেকসুর খালাস সাব্যস্ত হয়েছে। আর ঘন্টা দুই থাকলে দ্রোণার অন্য দুটি কেসের বিচার শুনে আসা যেত।

১০ এপ্রিল ১৯৭০।আজ দ্রোণার কোর্টে হাজরীর দিন আছে। ইচ্ছা ছিল একবার ঘুরে আসব। কিন্তু বাসভাড়ার অভাবে যাওয়া হল না।

নিবারণ মুখ তুললেন। এমন যে কতবার হয়েছে! ইচ্ছা করেছে খুব অথচ ছেলেকে দেখতে যেতে পারছেন না। অন্য কাজের ছুতোয় দমন করতে হয়েছে অপত্যস্নেহ। এমনই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এ বছরও নিবারণচন্দ্রের বিবাহবার্ষিকীর দিন এসে গেল। ১মে ১৯৭০। বিয়াল্লিশতম বিবাহবার্ষিকী। সে দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে নিবারণের।

হৈম বলল, ঘরের চালের অবস্থা তো খুবই খারাপবৃষ্টি হলে ঘর ভাসবে।

নিবারণ ওপরের দিকে তাকালেন। হুঁ তাই তো।

হৈম বলল, এখনও যে তেমন বৃষ্টি নামেনি এ আমাদের ভাগ্য।

নিবারণ মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ এবার মায়ের কাছে অনাবৃষ্টি প্রার্থনা করব ভাবছি। হৈম হেসে উঠল। বাঃ মাথায় তো বুদ্ধি ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঠাট্টা করলেও নিবারণ রাস্তায় বেরোলেন। শৈল আচার্য্যকে বলায় ঘর ছাইবার বিচালি পাওয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাওয়া যায়নি। হুমকি একটাও পয়সা নেই। ওদিকে ছোটছেলের হাতে কিছু না দিয়ে থাকা যায় না। শেষ পর্যন্ত চেয়েচিঙে আনা বিচালি বিক্রি করে দিতে হল। ভিক্ষার অপব্যবহার!

জানালা দিয়ে ঢুকে এল দক্ষিণের বাতাস। দিনলিপির পাতা উল্টে গেল দ্রুত। দু-হাতে ডায়েরি ধরে, লেখার দিকে তাকালেন নিবারণ।

২৬ মে ১৯৭০। জেলখানায় অপেক্ষা মামলার দিন কোর্টে দেখা করাই সুবিধা। অনর্থক হত্যা দিতে হয় না।বিচারক মহাশয় দ্রোণের জামিন নামঞ্জুর করায় এইবার জজকোর্টে আপিল ছাড়া জামিনের উপায় নাই। দ্রোণার চার্জশিট সঙ্গে নিয়ে এসেছি। টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে পারলেই কাজে নামা যায়।

৩১ মে ১৯৭০।ছোকরা জামিনের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে কিন্তু অর্থের অভাবে জামিন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৮ জুন ১৯৭০।আজ মধুবাবু খবর দিলেন দ্রোণার জন্য স্থানীয় জামিন হওয়া তাদের পক্ষে মুশ্কিল আছে। কারণ জামিন থাকা কালে আসামী পালিয়ে গেলে জামিনদারকেই হাজতে পোরা হবে। বলিহারী আমাদের স্বাধীন ভারত। বলিহারী তার বিচার।

১৪ জুন ১৯৭০। ...দৈবাচার্য গোবিন্দবাবুর দৈববাণী মার্চের মধ্যে দ্রোণ ছাড়া না পেলে আবার সেই সেপ্টেম্বরে একটা ছাড়ার আশা আছে, তার মতে। মার্চে বেশ কিছু আশার মধ্যেও হল না। যদি সেপ্টেম্বরে তার নির্দেশ কার্যকর না হয়, তাহলে তার তৈয়ারী ঠিকুজী তারই কাছে ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। ভুল গণনার ভুল ঠিকুজী রেখে অযথা ঘর বোঝাই রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

২২ জুন ১৯৭০। ... দ্রোণার আজ কোর্টের দিন আছে। কোর্টে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাথেয় অভাবে যাওয়া হবে না।

নিবারণ খামলেন। কিন্তু সেদিন শেষ পর্যন্ত কোটে যেতে পারা গিয়েছিল। পাঞ্চালী এসে হাতে দিয়েছিল পাঁচ টাকা। মা-বাবার আশীর্বাদে পাথেয় পেয়ে কোটে গিয়েছিলেন নিবারণ। দ্রোণাচার্যকে কোটে আনা হয়নি। সে অসুস্থ হওয়ায় পাঠান হয়েছে হুগলির ইমামগাড়া হাসপাতালে।

সেদিন আর হাসপাতালে যেতে পারেননি নিবারণ। ছাঁদিন পরে গেলেন। ছেলে এল। ফাকাসে হয়ে গেছে মুখমণ্ডল। চোখের তলায় কালি। জ্বর হয়েছে। এবং জ্বর ছাড়ছে না। জেলের লাটুর মুখটি দেখে নিবারণের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। এ দুর্ভাগা দেশে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গেলেও নিজের সামর্থ্য লাগে। নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় কোনো কাজটিই করা যায় না। শরীর সুস্থ না রাখতে পারলে সাহিত্য সৃষ্টিও করা যাবে না। মানুষের উপকারও করা যাবে না। আগে নিজেকে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ছেলেকে কোনো অভিযোগ করলেন না নিবারণ।

কতদিন হ'ল জ্বর ভোগ চলছে?

এই তো, আজ নিয়ে বারো দিন। দ্রোণের চোখ হেসে উঠল। দুপুরের পর জ্বরটা একটু বাড়িসন্ধ্যার দিকে কমে আসে

ডাক্তার দেখেছে?

হ্যাঁ ...বলছে টাইফয়েড ...ক্যাপসুল দিয়েছে

দ্রোণের নাড়ি টিপে ধরলেন নিবারণ। চোখ বুজে এ'ল তাঁর। দু-মিনিট পরে মাথা নাড়লেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাঁ ...এখন জ্বর একশোর তলায়।

দ্রোণ বলল....চিন্তা করো নাঠিক হয়ে যাবে।

আমি আর চিন্তা করে কী করব। আমার কপায় যা হবার তাই হবে.....

কাদের খোলা থেকে একটি ছোট প্যাকেট বের করলেন নিবারণ। এই নাও ... খেও। কিছুটা ভালমজলী জাড়া আর কিছু আনতে পারি নাই আজ খেও।

দ্রোণ হাত বাড়িয়ে নিল প্যাকেট। মৃদু স্বরে বলল, হাওয়াই চটির ফিতে ছিঁড়ে গেছে ...এখন ক'দিন খালি পায়ে হাঁটিছি ... পরের বার আসার সময় কী একটা ফিতে আনা যায়?

নিবারণ চটিটা দেখলেন। এমনভাবে ছিঁড়েছে ফিতেটা যে সেফটিপিন গোঁথে জোড়াতালি দেগারও উপায় নেই। ঠিক আছে পরের বার এনে পাল্টে দেব। বাড়ি ফিরে হৈমকে জেটি গাটার কথা বলতে গিয়ে নিবারণের চোখ জলে ভরে উঠল। এমন অক্ষম তিনি জেলের চটির ফিতে পাল্টাবার কথায় তাঁকে দু-বার ভাবতে হয়। তার জন্য একটা দশ পয়সার লাটুকটি পাঁচ পয়সার চানাচুর কিনতেও দ্রুত ভেবে নিতে হয় অন্যান্য দায়িত্বের কথা। সব পক্ষে তেম সেতে চাইল দ্রোণাকে দেখতে। পাঞ্চালীও যেতে চায়। ক'দিন আগেই সেই পাঞ্চালী সন্ধ্যা হয়েছে। এখন নাকি হাসপাতালে দ্রোণাকে দুপুরে ভাত দেয়, রাতে দুধ লাটুকটি।

দু মিল আগেই দ্রোণাকে দেখে এসেছেন নিবারণ। এক ঘন্টা ছিলেন ওর কাছে। ওর চরলের ফিতেও পাল্টানো হ'ল। কী নির্মল হাসি ছেলের। নিবারণের বুক ভরে উঠল।

মাথা না? দ্রোণের ভেতর থেকে হৈম'র গলা ভেসে এল। ও জানতে চাইছে নিবারণ

পড়াতে যাবেন কী না। ডায়েরি বন্ধ করে নিবারণ দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। মনের আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে নেই। অযথা পড়ানোয় কামাই দেওয়া ঠিক নয়।

— হ্যাঁ যাই। নিবারণ প্রত্যুত্তর করলেন। দ্রুত পরে নিলেন ধুতি-শার্ট। শার্টের পকেটে ভরে নিলেন ছোট টর্চ খানি।

নীলুবাবুর ছেলেদের পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে থানার সামনে দিয়ে আসার সময় কেউ যেন ডাকল, নিবারণবাবু.....। নিবারণ তাকালেন। থানার সামনে থেকে নন্দলাল এগিয়ে এল। নন্দলাল থানায় কাজ করে।

— দ্রোণাচার্যের খবর কি? নন্দলালের পাশে একটি অচেনা মুখ।

প্রশ্ন শুনে নিবারণ থমকে গেলেন। মৃদু কম্পন হ'ল বুকোর মধ্যে। কোনো খারাপ খবর?

— ঠিকই তো দেখলামজ্বর কমেছে....

— আজ গিয়েছিলেন নাকি? অচেনা মুখটি জিজ্ঞাসা করল।

— না, আজ আর যাওয়া হয়নি.....কেন? কী ব্যাপার?

নন্দলাল একবার অচেনা মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, দ্রোণাচার্য হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে.....

— সে কী? কখন? নিবারণের গলায় উদ্বেগ।

নন্দলাল জানাল, আসামী দুপুর-বিকেলের দিকে পালিয়েছে। বাথরুমে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ সাড়া নেই দেখে দরজা ভাঙা হ'ল। দেখা গেল পাখি উড়ে গেছে। বাথরুমের জানালার গরাদ আলগা করে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে হাওয়া।

— তাই নাকি? আশ্চর্য ব্যাপার। নিবারণ দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

ইতিমধ্যেই পাড়ায় খবর ছড়িয়ে গেছে। বাড়ির সামনে তিন-চারজনের জটলা।

সুকুমার বলল, দাদা খবর শুনেছেন? নিবারণ ওপর-নীচ মাথা নাড়ালেন।

হৈমও খবর পেয়ে গিয়েছে। তার মুখে উদ্বেগের ছাপ। উদ্বেগ হলেও নিবারণের ভেতরে আনন্দও হচ্ছে। ছোঁড়া খেল দেখিয়েছে বটে। মনের জোর থাকলে তাকেই নন্দলাল থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাওয়া যায়। নিবারণ বাড়িতে ঢুকে যাবার পর বাইরের জটলাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

একটু রাতের দিকে বাড়ির বাইরে ভারী বুটের আওয়াজ। নিবারণবাবু আছেন নাকি? কণ্ঠস্বর অচেনা। নিবারণ ঘড়ি দেখলেন। এগারোটা বেজে দশ। বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললেন। ঘরের ভেতর হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পুলিশ। থানার রায়বাবু দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে এসেছেন বাড়ি তল্লাসী করতে।

রায়বাবু বললেন, দ্রোণাচার্য এসেছিল নাকি?

না তো!নিবারণের হাসি পেল। যে পালিয়েছে সে আবার ধরা দিতে খামোকা বাড়ি আসবে কেন?....

রায়বাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। হুঁপালিয়ে যাবে কোথায়? আমরা ঠিক টুটি চেপে ধরব ...মায়ের গর্ভে গিয়ে লুকোলেও আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না....

একবার হৈম'র দিকে তাকিয়ে নিবারণের দিকে ফিরলেন রায়বাবু। ছেলে কখনও বাড়ি

এলে আমাদের আনাগোনে না হলে আপনারাও বিপদে পড়বেন...

নিবারণ হাসলেন। য়েগের হাসি। হুঁ! নিশ্চয়ই ... এতদিন তো তবু আপনাদের জেল, কোটি কিংবা হাসপাতালে গেলে দেখা হ'ত ছেলের সঙ্গে এখন তো আর দেখাই হবে না।

পরদিন সকালে মগরা স্টেশন চত্বরে গেলেন নিবারণ। মন দিয়ে পড়লেন দৈনিক সংবাদপত্রগুলি। এসুযতী পত্রিকায় ছোট্টবাটার জেল পালানোর খবর বেরিয়েছে। এও লেখা হয়েছে, একজন অর্থাৎ কাউকে খেপ্তার করা যায়নি। বেলার দিকে চায়ের দোকানের আত্মাভেদ ছোট্টবাগর পল্লারোগে কথা।

সিকুঞ্জ বলল, এমন ঘটনা ওগাল জেলায় আগে কখনও ঘটেনি....

দেবনাথ বলল, এট ঘটনায় দেখা যাচ্ছে নকশালরা অন্য ধাতেরএরা ম্যাদামারা নয়।

জীবনা বলল, এ বিরাট কৃতিত্বের কাজ....

দোকানের এককোণে বসে ভাঁড়ের চা খেতে খেতে আলোচনার সবটাই শুনলেন নিবারণ। দীর্ঘত্বকে এখনও কিছু মানুষ মান্য করে। ত্যাগকে মর্যাদা দেয়। এ বড় আশার কথা।

বিকেলবেলা থেকে বাড়িতে পড়শীদের আনাগোনে শুরু হল। দুয়েকজন ঘুরে যাবার পর তাদের আচরণ চেনা হয়ে গেল নিবারণের। সন্ধ্যা হৈম'র কাছে আসে। বেশ কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে কাটায়। শেষে আসল কথা পাড়ে। দ্রোণের খবর পেলে নাকি?

প্রতিমবাগর দ্বী পাঠায় এসে উঠলেন শুধু সাতটায়। মুখটা করুণ করে, স্বর খাদে লাগিয়ে, জীক চোখে সেই একই প্রশ্ন খবর কিছু পেলে?

এতদিন লালালাল থেকেও থেকেওরা তাঁদের কোনো খোঁজখবর রাখত না। এখন ওঠাও এত আগ্রহ কেন? নাকি নিচক কোতুহল নাকি পুলিশের জন্য খবর সংগ্রহে লেগে পড়তে ওরা? পুলিশের হয়ে নেমে পড়লেও কোনো চিন্তা নেই নিবারণের। ছোট্টবাবু অত নিবেদন না যে জনসমক্ষে এখানে হাজির হয়ে যাবে।

মগরার নিভরঙ্গ জীবনে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। চায়ের দোকানে সকাল বিকেল সোণের জেল পালানোর খবর নিয়ে চর্চা চলল। সন্ধ্যাবেলায় টহল দিয়ে গেল বন্দুকধারী পুলিশ। তিনদিন পরে মগরা লাইব্রেরীতে বই আনতে গেলেন নিবারণ। বই নেবার ফাঁকে কথা কানে এল।

এককম গার বুদ্ধি এবং ক্ষমতা সে পড়াশুনো করে ঠিক পথে থাকলে দেশের কত উন্নয়ন হত। এক মাগবয়সী তাঁরই সমবয়সী অন্য একজনকে বলছেন। জবাবে অন্য কল্লোলকটি বললেন শুনেছি ছেলেটি ভালো কবিতাও লেখে....। আমার ছোট্টবাই বলছিল লুবদেল, অজিন্দ, অ্যুগব এইসব লিটল ম্যাগাজিনে ওর কবিতা পড়েছে।.....

ঐটি কামড়ে পরলেন নিবারণ। ওরা দ্রোণাচার্যের কথা বলছে। তিনি কান খাড়া করে রইলেন।

লব্ধ কল্লোলক বললেন, সেজন্যই তো বলছিলাম, এইসব ভালো ছেলেরা বিপথে চলে যাচ্ছে ওজন্য আমাদের গুল কলেজগুলি দায়ী...ঠিক শিক্ষা দিতে পারছে না তারা...।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ঠিক বলেছেন মশায়। তবে আমার মনে হয় ওদের বাবা-মাও দায়ী। খেয়াল না রাখলেই এমন বিগড়ে যায় ছেলে ... দেখুন হয়তো বাবা মায়ের মধ্যে অশান্তি আছে...

ওষ্ঠে লবণাক্ত স্বাদ পেলেন নিবারণ। জিভ দিয়ে চেটে নিলেন ঠোট। আবারও নোনতা লাগল। নিশ্চয়ই রক্ত বেরিয়েছে।

ঘরে ফিরে ডায়েরি খুলে বসলেন নিবারণ। কলম লিখে চলল। লাইব্রেরীতে দ্রোণার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা শুনলাম। অনেকের মতে ছেলেটা যদি রাজনীতির পথে না যেত তাহলে তার জীবনে সাধারণ মানুষের মতো বেশ পরিবেশ গড়ত। অর্থাৎ চুরি জোচ্চুরী করে গাড়ী বাড়ী করে বেশ একজন অভিজাত নাগরিক হতে পারত। কিন্তু সে নিজের কথা, নিজেদের বাড়ীর কথা না ভেবে দেশের কথা দেশের কথা ভেবে যে রাস্তা নিয়েছে সেটা তার পক্ষেই সম্ভব। *মা-বাবা সর্বপ্রকার আপদ বিপদে শ্রীমানকে রক্ষা করে তাকে শক্তি সাহায্য দিও। * নম শিব দুর্গায়ৈ নমঃ।



পাঞ্চালীর সকাল সন্ধ্যায় কিছু নতুনত্ব এসেছে। সেমি-সুধ-শুক্র-শনি সপ্তাহের এই চারদিন সকালবেলায় সে ব্যান্ডেল থেকে সোজা ট্রেনে চলে যায় হাওড়া স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরিয়েই কুড়ি নম্বর ট্রামে উঠে পড়ে। কলেজ স্ট্রিটে নেমে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে হাঁটা লাগায়।

কলেজ স্ট্রিটের চেহারা পাল্টে গেছে। দেওয়ালে নতুন নতুন স্লোগান। 'এই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত পড়ে সে তত মুর্থ। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ। চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর করুন।' কখনও হেয়ার স্কুলের মাথায় লাল পতাকা উড়তে দেখা যায়। পুলিশ-সি আর পি নামিয়ে দেয় সেই পতাকা। তবু কদিন পরেই আবার পতাকা ওড়ে। এবার হিন্দু স্কুলের মাথায়।

হাসপাতালের ফটক দিয়ে না ঢুকে প্রথমে পাঞ্চালী চলে যায় রাস্তার উল্টোদিকে ডাক্তারদের হস্টেলে। দোতলার ঘরে গিয়ে নিজের শাড়ি পাল্টে, পরে নেয় নার্সের পোশাক। চলে যায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। পুরো মেডিক্যাল কলেজেই, বিশেষত জরুরি বিভাগে অনেক নকশাল সমর্থক আছে। ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। এজন্যই সরকারি নার্স না হয়েও শিক্ষানবিশী করায় কোনো অসুবিধা হয় না পাঞ্চালীর। ইমার্জেন্সীতে ডাক্তার সুকল্যাণ বস্কীর তত্ত্বাবধানে পাঞ্চালী প্রাথমিক চিকিৎসার পাঠ নেয়। ব্যাগুজ-প্লাস্টার করা, হাতে বা কোমরে ইন্জেকশন দেওয়া তো প্রথম মাসেই শিখে নিয়েছিল। পরবর্তীতে, ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেকশন দেওয়া এবং স্টিচ করাতেও হাত পাকিয়ে নিয়েছে সে। বুলেট বা ছুরির আঘাতে গভীর ক্ষত হ'লে সংক্রমণের

যেকোনো নীলি থাকে। সেক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের চারপাশ পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। অপরদিকে আর্সিবায়েটিক দেওয়া উচিত। যারা ধনুস্তংকার প্রতিষেধক নেন নি তাদের ক্ষত টিটোনাস টকসয়েড ইনজেকশন দেওয়া দরকার। বুলেট যদি কোনোভাবে হাত বা পায়েন চোড়ে আঘাত করে তবে সে হাড় ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। যদি ভেঙে গেছে বলে মনে হয় তবে প্লাস্টার করতে হবে। কিন্তু হাতের কাছে প্লাস্টারের ব্যবস্থা না থাকলে পলিশের বা কাঠ দিয়ে বেঁধে দেওয়া ভালো। কয়েক সপ্তাহ দেহের এই বিশেষ অংশকে বিশ্রাম দিতে হবে। পায়ের পুন্ট ক্ষত গুরুতর হলে তিন-চারটে বালিশের ওপর পা কে লুটিয়ে দিতে হবে। মোম্বা কথাটা হ'ল ক্ষতস্থানটি হৃৎপিণ্ডের তল থেকে উঁচুতে রাখতে হবে।

লাগামিক চাকিসার এইসব খুঁটিনাটি শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সুকল্যাণ প্রায়শই লোকজ চাকিসার সুপকসম্ভানও দিয়ে দেন। গরম জল না পেলে ফণিমনসা বা ক্যাকটাস গাছের রস দিয়েও ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা যায়। এই গাছের কাণ্ডের রস রক্তক্ষরণ বন্ধেও ভালো কাজ দেয়। পরিষ্কার ছুরি দিয়ে কেটে ক্যাকটাস কাণ্ডটি ক্ষতস্থানে জোরে চাপ দিয়ে দেন। রক্তস্রাব এক হয়ে যাবে। জানিয়েছেন সুকল্যাণ।

কথাখাল শুনে ভালো লাগলেও নিজের হাতে কাজটি করতে গিয়ে প্রথম দিকে অসুবিধা করতে। ক্রমশ অভ্যাস হয়ে গেল। ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করতে আর অসুবিধে হয় না। শরীরের বেশি গভীরে না প্রবেশ করে থাকলে বুলেটও বের করে দিতে পারে পাঞ্চালী। এখন হাসপাতালে বুলেট-ক্ষত, বোমা-ছুরিতে ক্ষত রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। একদিন পলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরকে আনা হল ইমার্জেন্সীতে। লোকটির কাঁধে বোমার পলিশের গোঁথে গেছে। খুব রক্তপাত হচ্ছে। সুকল্যাণদা বললেন, পাঞ্চালী চট করে ব্যান্ডেজ করে দাও। আমি একটু অপারেশন থিয়েটার থেকে ঘুরে আসছি।

পাঞ্চালী চপ করে এল। পুলিশকে সেবা করতে তার মন সায় দিচ্ছে না। সুকল্যাণদা বললেন, কী হল? যাও....

পাঞ্চালী শরীরভাষায় অনিচ্ছা প্রকাশ করল। তারপর খোলাখুলি জানিয়ে দিল অনিচ্ছার কথা। লোকটা আমাদের শত্রু.... শত্রুকে সুস্থ করবার দায়িত্ব আমরা নেব কেন?

সুকল্যাণদা চপ করে গেলেন। একটু হেসে বললেন, দেখ ও আমাদের কাছে যুদ্ধবন্দির মতো। যদিও সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে নেই.... এ তো মাও সে-তুঙ শিখিয়েছেন আমাদের.....।

এবার পাঞ্চালী আর কোনো পাল্টা যুক্তি খুঁজে পেল না। তবু তার দ্বিধা কাটছিল না। সুকল্যাণদা আবার বললেন, তোমার কিন্তু যাওয়া উচিতজানবে, একজন ভালো স্বাস্থ্যকর্মীকে অনশাট সং রাজনৈতিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হয়।

ডাক্তার সুকল্যাণের কথায় সারবস্তা আছে। ঠিকই তো লড়াইটা তো কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বাস্তব নয়, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের। সেখানে এমন ক্ষুদ্রতা থাকা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত পাঞ্চালী পলিশটির কাঁধে গোঁথে যাওয়া বোমার টুকরো বের করে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।

শ্রদ্ধাঙ্গন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাসপাতালে আনা হল একটি কিশোরকে। ফুটফুটে

ছেলেটি। কত বয়েস হবে? চোদ্দ, পনেরো। ছেলেটির পা কেটে গেছে ভীষণ ভাবে। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। সুকল্যাণদা বললেন, পাঞ্চালী শীগগির স্টিচ কর। স্টিচ করল পাঞ্চালী। ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করল কী নাম তোমার?

— প্রলয় রাহা।

— কোথায় পড়ো?

— হিন্দু স্কুল...ক্রাস টেন।

স্টিচ করায়, ইন্জেকশন দেওয়ায় ছেলেটির যন্ত্রণা হওয়ার কথা। কিন্তু প্রলয় কোনোরকম কাতরতা প্রকাশ করছে না। অসম্ভব মনের জোর ছেলেটির। কী করে এমন হ'ল? প্রলয়ের সঙ্গীরা জানাল, স্কুলে লাল পতাকা তুলেছিল তারা। সি আর পি উপরে আসছিল পতাকা নামানোর জন্য। সি আর পি-কে আটকাতে ছেলেরা বোমা মারে। ওরা বন্দুক উঁচিয়ে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে এগিয়ে আসে। গ্রেপ্তার এড়াতে ছেলেরা পালাতে শুরু করে। দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রলয়। মাটিতে ছিল পরিত্যক্ত টিনের পাত। ওই টিনের পাত লেগে পা কেটে গেছে।

কী কাণ্ড। তুমি তো মারাও যেতে পারতে?

প্রলয় মৃদু হাসল। হ্যাঁ তা পারতাম।

পাঞ্চালী চুপ করে গেল। ছেলেটিকে টিটেনাস ইন্জেকশন দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। নিয়মমত ওষুধ দিল সে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভুলতে পারছিল না ঘটনার তীব্রতা। যে পতাকা পুরো একদিনও রাখা যাবে না তার জন্য এত বড় মূল্য দিতে হবে কেন? এই ঘটনা পাঞ্চালীর বুকের ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঞ্চালী বলল, দু-ঘণ্টা একটা পতাকা ওড়াবার বিনিময়ে এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নেবার কোনো মানে হয়? প্রলয় বলল, নিশ্চয়ই ...বিজয় অর্জনের পথে এমন আত্মবলিদান দরকার...। ছেলেটি বলে চলল ফ্রান্সের প্যারিস কমিউনের কথা। একশো বছর আগে বসন্তকালে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে প্যারিসের শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সেই প্রথম সরকার প্যারিস কমিউন টিকে ছিল মাত্র দু'মাস। মার্কস-এঙ্গেলস্ দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন এই কমিউন বেশিদিন থাকবে না। তবু তাঁরা দুজনেই ঝগাও ডানিয়েছিলেন সর্বহারার এই প্রথম সরকারকে।

ছেলেটির এই মুখস্থ বলে যাওয়ার ভঙ্গিটা ভালো লাগল না পাঞ্চালীর। একশো বছর আগে ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও প্যারিস কমিউনকে সমর্থন করবার একটা জোরালো যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। কারণ সারা বিশ্বে এই প্রথম সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এত বছর পরে, লড়াইয়ের এত অভিজ্ঞতার পরেও যদি কেউ আবারও সেই ভুল করে তাহলে তাকে অভিনন্দন জানানোর আগে ভর্ৎসনা করা দরকার। কারণ সে মানুষ এতদিনের অভিজ্ঞতায় কিছু শেখেনি!

— দেখ বাবু একটা সোজা কথা বলি ... একটা বাচ্চা, যে হামাগুড়ি দেবার পর সদ্য হাঁটতে শিখেছে তাকে সবাই হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেয় কিন্তু কোনো বয়স্ক লোক যদি অমন টালমাটাল পায়ে হাঁটে, লোকে তার মাথার সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। পাঞ্চালীর কথায় প্রলয় রেগে গেল। আপনি সংশোধনবাদীদের মতো কথা বলছেন।

জেলটিকে উল্লেখও করা ঠিক নয়। পাঞ্চালী চুপ করে গেল। বাথা কমানোর ইনজেকশন মিলে গেল। বাড়ি ফিরেও ছেলেটির মুখ ভুলতে পারছিল না পাঞ্চালী। কোথাও কি ভুল হয়েছিল কিছুর দ্রোণ কাছে থাকলে আলোচনা করা যেত কিন্তু সেও তো জেলবন্দি। রাস্তিরে খবর আসে গেল পাঞ্চালীর। গায়ে ব্যথা। রাত পোহালেও তার অবসাদ কাটল না কিছুতেই। পাঞ্চালী আর কটিনামতো ঘের হল না। শুয়ে রইল চুপচাপ। দ্রোণকে মনে পড়ছে। পাঞ্চালীকে সেই খোড়ানিমগাউটার তলায় দাঁড়িয়ে প্রথম চুমু খাওয়া ভাবলেই শিহরণ জাগে। তারপরও দ্রোণ তাকে আরও কয়েকবার চুম্বন করেছে। কিন্তু প্রথম সন্ধির স্বাদই অন্যরকম। অপরিস্রব। বুকে শুধু আবেগই ঘটে যায়।

দরজায় খুঁট করে করে আঙায়াজ হতেই তাকাল পাঞ্চালী। কী আশ্চর্য! দ্রোণের শরীর জেলের জেলেরে সেখানে। দাঁড় নেই, চোখে চশমা মাথায় টুপি। কিন্তু মানুষটি দ্রোণ। আরও অগাধ কান্ড, সেই অগাধ এগিয়ে এল।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না তো? এই দ্যাখো চিম্টি কেটে আমি আমিই দ্রোণাচার্য
দ্রোণ হ্যাঁ হ্যাঁ

গলায় আঙায়াজ ধড়মড় করে বিছনায় উঠে বসল পাঞ্চালী।

চুমি? এখানে কীভাবে?

পাঞ্চালীকে জড়িয়ে ধরল দ্রোণাচার্য। কপালে চুমু খেল।

হাসপাতাল থেকে পালিয়েস্কুল পাঞ্চালীর অভ্যেস তো ছিলই, দেখলাম হাসপাতাল থেকে পালানো আরও সহজ।

তাঁই নাকি? কীভাবে পালালে? পালিয়ে তো চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিচ্ছে তোমায়?

জায়ে কী? মাথা খাটালে সব পারা যায়। দ্রোণ হাসল।

টাউনহাউসে গিয়ে আঙায়াজ পালানোর সুবিধা হয়েছে। ওর জ্বর দেখে প্রহরা একটু ঢিলেঢালা ছিল। আগে নাকাম চুপে এক মিনিট অন্তর প্রহরী বাইরে থেকে দরজা ঠুকে দ্রোণের গলায় আঙায়াজ শুনতে চাইত। জ্বর হবার পরে সেই আপদ গেল। তখনই মাথায় আসে পালানোর কথা। সেই মতো দলের ছেলেদের খবর পাঠিয়েছিল দ্রোণ। বাথরুমের জানালা দিয়ে খুব বাড়িয়ে দেখা গেল পাশ দিয়ে পাইপ নেমে গেছে। শক্তপোক্ত পাইপ। জানালার শিক আলগা করতে লাগল দু-দিন। ইতিমধ্যে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল এক নার্সের থেকে চেয়ে নিয়েছে কিছু টাকা। তারপরেই সকাল বেলায় বড় বাথরুমের নাম করে ঢুকে পাইপ নিয়ে গিয়ে নেমে হাসপাতালের পেছনের পাঁচিল উপরে সোজা রাস্তায়। জি টি রোড গেরে আঙায়াজ হেঁটে এসে এক সেলুনে ঢুকে দাঁড়ি কামিয়েছে। পাশের জামা কাপড়ের দোকান থেকে টুপি কিনেছে। জিরো পাওয়ারের চশমাও কিনেছে একটা। সব মিলিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই চেহারাটা একটু বদলে নিয়েছে দ্রোণ, যাতে প্রথম দর্শনেই চিনতে অসুবিধা হয়। তারপর চলে এসেছে ব্যান্ডেল-বলাগড় রোডের এই বামুনপাড়ায়।

জেলের লোকজন টাউন টাউন খেলার অভ্যেসটা কাজে লেগে গেল। হা-হা করে হাসল দ্রোণ। লাটল গিয়ে নামা তো খুব সহজ.....দমকলের লোকেরা তো হামেশাই করে থাকে।

মাথায় ঠান্ডা রাখতে পেরেছিল বলেই পালানো সহজ হয়েছে। তবে একটা খুঁত থেকে

গেছে। হাসপাতালের সামনের দিকে তার অপেক্ষায় ছিল দলের চার জনের একটি স্কোয়াড। দ্রোণ সেইদিকে না গিয়ে উল্টোদিক দিয়ে চলে এসেছে। শেষ মুহূর্তে ওর মনে হয়, যদি স্কোয়াডটির ওপর পুলিশের নজরদারি থাকে, তাহলে তো সবাই একসঙ্গে ধরা পড়ে যাবে।

— অবশ্য অন্য একটি কারণও ছিলসেটাই আসল কারণ

— কী? পাঞ্চালী মুখ তুলে তাকাল।

— তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছিল খুবস্কোয়াডের সঙ্গে গেলে তো এখানে আসা হত না.....

কিন্তু এ-বাড়িতেও ঘরের মধ্যে এইভাবে বেশিক্ষণ থাকাটা নিরাপদ নয়। যদি ওর খোঁজে পুলিশ হানা দেয়? পাঞ্চালীর বাড়ির লোকেরা দ্রোণকে ভালোই চেনে। তাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। দাদারা বাড়িতে নেই। ওরা ফিরবে বিকেল বেলা। ততক্ষণ বাড়ির চত্বরেই দ্রোণকে রাখা দরকার।

একটু ভাবতেই উপায় পাওয়া গেল। বাড়ির পেছনে আমবাগান। আমবাগান ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। আমবাগানের মধ্যে সুলতান চাচার বাড়ি। সুলতান চাচার মাংসের দোকান আছে, ব্যাণ্ডেল বাজারে। চাচার বাড়িতেই দ্রোণের থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল পাঞ্চালী।

জলখাবার খেয়েই দ্রোণ বলল, আর সময় নেই সময়। শীগগির পুরনো ডিবি-গুলো দাও, পড়ে নিই। দেশব্রতীর পুরনো সংখ্যাগুলি কোথায় করল পাঞ্চালী। দ্রোণ হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে থাকল।

২৩ এপ্রিল ১৯৭০। দেশব্রতীর শেষ প্রকাশ্য সংখ্যা। শেষ পাতায় ছাপা হয়েছে খতমের খতিয়ান। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র রয়েছে। যেসব জেলায় জোতদার খতম হয়েছে তা লালরঙে চিহ্নিত করা। দ্রোণ মন দিয়ে দেখল খতমের তালিকাটি। অল্প কয়েকমাসের মধ্যে জোতদার, দালাল, পুলিশ, মিলিটারি, মিলিয়ে মোট উনষাট জন খতম হয়েছে। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা এইসব জেলায় লালবিন্দু ছাপা হয়েছে মানচিত্রে। শুধু হুগলিতে সাদা। কোনো লাল ফুটকি পড়েনি হুগলি জেলায়।

— দেখেছ হুগলিতে এখনও অবধি কোনো জোতদার খতম করতে পারিনি আমরা। দ্রোণ নিজের মনেই বলল কথাটা। পাঞ্চালী কোনো উত্তর দিল না।

দ্রোণ জানতে চাইল পাঞ্চালীর খবর। পাঞ্চালী বলল তার নার্সিং শেখার গল্প। খুব ভালো। বলল দ্রোণ। আমারই তো ইচ্ছে করছে একটা বুলেট লাগুক আমার হাতে। তুমি বেশ নিয়মিত ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দেবে আমার।

দ্রোণ হঠাৎ বলল, কলেজের খবর কী? পরীক্ষা দেবে নাকি?

পাঞ্চালী বলল, হ্যাঁ দেব।

— সে কি? পরীক্ষা দেবে? সবাই পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এ অবস্থায় তুমি পরীক্ষা দেবে?

— হ্যাঁ দেব, হয়তো পাশ করতে পারব না কিন্তু দেব

পাঞ্চালী বোঝাল দ্রোণকে। মেয়েরা কেউই এখনই গ্রামে গিয়ে জোতদার-পুলিশের

লোক লড়তে গাচ্ছে না। সে অবস্থায় পার্টির কাজ করেও তার পড়াশুনার সময় আছে কিছুটা। সেজন্যই সে ভাবছে পরীক্ষায় বসবে। দ্রোণ চুপ করে গেল। কিন্তু বোঝা গেল সে খুশি হয়নি বিশেষ।

বিকেলবেলায় দাদারা ফিরতেই মিটিঙ শুরু হয়ে গেল আমবাগানের বাড়িতে। খবর পেয়ে চলে এলেন বনমালী রায়। জেল পালানোর জন্য দ্রোণকে অভিনন্দন জানালেন তিনি।

খুব ভালো সময়ে বেরিয়েছেন কমরেড.....এখন জেলায় জেলায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের আশুপ জ্বলে উঠেছে। অভিনন্দন পেয়ে দ্রোণ আপ্ত। ও চুপ করে রইল।

বড়দা বলল, এই আশুপ জ্বলে উঠতে দেখেই সংশোধনবাদীরা এর বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। মেজদা সায়া দিল। এই তো কদিন আগেই আমাদের প্রবীরকে খুন করেছে সংশোধনবাদী সি পি আই।

ঠিক কথা। দ্রোণ বলল। তবে নকশাল বিরোধিতায় নয়া সংশোধনবাদী সি পি এম আরেক বেশি সক্রিয়।

বনমালী রায় দ্রোণকে সমর্থন করলেন। দৃষ্টিতীরা কিছু করলেই সি পি এম এখন জ্বলে নকশালদেব কাণ্ড বলে চালাচ্ছে। ওরা নেমে পড়েছে নকশাল হত্যায়। এ নিয়ে কেন্দ্রের শাসক দলের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওরা জানে বামপন্থীদের একটা জায়গা দেখা দরকার। সেখানে সি পি এম-কে রাখাই ভাল। ওরা নকশালদের মতো উগ্র হয়ে উঠে ভাঙচুর চালাবে না। বরং জনতা অসুস্থ শুরু করে দিলে তাকে থামাবে, দমন করবে। এমন বিরোধী দল থাকলে শাসকদের লাভ। তারা চাইবেই সি পি এম থাক। মাঝে মধ্যে ওরা লোকদেখানো ঝগড়াও করবে। নিজেদের বিপ্লবী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিয়ম মেনে মিটিং-মিছিল করতে হবে কিন্তু তার বাইরে যাবে না। এমন দল থাকলে নানান সুবিধা। হরেক কিসমের বামপন্থীরা জড়ো হবে ওই একই চেনাজানা জায়গায়। আর সি পি এম কুনকি হাতির মতো তাদেরকে নিয়ে যাবে পার্লামেন্টের কোয়ার্টারে।

বড়দা বলল, এখন আবার এক সি পি এম নেতা বলছে সি আর পি সরিয়ে নিলে তিনটি ন্যাক পাটি ক্যাডার দিয়ে নকশালদের মোকাবিলা করতে পারে কারণ সিআরপি ন্যাক নকশালদেব না মেরে তাদেরকেই মারছে

বনমালী রায়ের মুখ লাল হয়ে গেল। এই দু'কান কাটা বেহায়াদের কথার উত্তর দিতেও খোঁজা করে। এই হারামিদের জিজ্ঞেস করো, ডেবরা গোপীবল্লভপুরে নকশাল দমনে ওরা পাটি ক্যাডার না পাঠিয়ে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ আর সি আর পি পাঠিয়েছিল কেন? জিজ্ঞেস করো এই গুণাগুণ বাচ্চাদের, ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে নকশালবাড়িতে পাটি ক্যাডার না পাঠিয়ে, সি আর পি মোতায়ন করেছিল কেন?

দ্রোণ উত্তেজিত। ঠিক বলেছেন কমরেড। আমাদেরও দেখতে হবে কোনো হত্যা যেন ফিলা বদলায় না যায়। কমরেড প্রবীরকে হত্যার বদলাও আমরা নেব।

দ্রোণ বলে চলল। পাচোড়ের মতো ভারী মৃত্যুর সার্থকতা আর পালকের মতো মৃত্যুর অসারতা তুলে মনতে চলে। আজ শত্রুকে বড় করে দেখার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল।

পাকালী দোণকে দেখাচ্ছিল। ওর গলা অন্যরুণ। ভাষা নিজের নয়, যেন মুখস্থ বলে

যাচ্ছে। শরীরভাষায় কোনো কোমলতা নেই, যন্ত্র যেন। অথচ মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেই ও যখন এল, তখন কত স্বাভাবিক গলায়, সহজ ভাষায় কথা বলছিল। মিটিংয়ে বসলে মানুষ এমন পাশ্টে যায় কেন? সবাই যেন উদ্ধৃতি মুখস্থের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন.... কমরেড চারু মজুমদারকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করাই আজকের ভারতবর্ষে মাও সে-তুঙ চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা.....

গেরিলা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দাওপনেরো কুড়ি মাইল দূর থেকে এসে গেরিলারা অ্যাকশন করে চলে যাচ্ছেঅ্যাকশনের পর সংগঠন করা অনেক সহজ শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করবদরকার যা তা হল জনগণের জন্য মৃত্যুর আদর্শ তুলে ধরা আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েই জন্ম নেবে নতুন মানুষ অ্যাকশন করছে এমন একটি গরীব চাষি দলের অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে বুদ্ধিজীবী কমরেডটি শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাজাবেন... যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাজায়নি সে বিপ্লবীই নয়। এইসব স্লোগান-বাক্যগুলি যেন পিঙপঙ বল। একবার দ্রোণ তাতে সপাটে ব্যাট চালাচ্ছে। পাশ্টা দিচ্ছেন বনমালী রায়। বড়দা, মেজদাও ফাঁক পেলে চালাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বাক্যগুলি এ-মাথা ও-মাথা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। লঠনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই দৌড়ের অভিঘাতে!

মিটিঙের শেষে বনমালী রায় ফিরে গেলেন। বড়দা-মেজদাও বেরিয়ে গেলেন। সুলতান চাচার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দ্রোণ চলে যাবে পাভুমার কাছে নমাজগ্রামে। বসির আলির কাছে। বসির তাদের রাজনীতির সমর্থক হলেও, তাকেই তাকে চেনে না। সেজন্য ওর ওখানেই থাকা আপাতত নিরাপদ। তারপর দ্বিগুণ করা যাবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। তবে যাই হোক না কেন, আত্মগোপন করে থেকেই গুলিতে খতম অভিযান শুরু করতেই হবে। জানাল দ্রোণ।

প্রতিটি আক্রমণের বদলা নাও সংগ্রামকে ডেউয়ের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও.....

দ্রোণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাঞ্চালী থামিয়ে দিল। একটু নিজের ভাষায় নিজের মতো করে বলো না....

— তার মানে? দ্রোণের ফর্সা মুখ লাল। চোখ চঞ্চল। কী বলতে চাও তুমি?

— বলছি, অমন মুখস্থ না বলে, নিজের মতো ভেবে কথা বললে তা অনেক সত্যি লাগে.....

— তোমার মধ্যে আসলে পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা কাজ করছে, এজন্যই তুমি একথা বলছ।

দ্রোণের চোখ বিস্ফারিত। ঠোট কাঁপছে। পাঞ্চালী হতভম্ব।

আসলে তুমি বিপ্লব থেকে সরে যেতে চাইছ...এজন্যই তুমি পরীক্ষায় বসতে চাও.....আর পাঁচটা লোক যেমন মোটা মাইনের চাকরি করার স্বপ্ন দেখে তুমিও তেমনটাই করতে চাও

দ্রোণের অভিযোগের মুখে পাঞ্চালী চূপ করে গেল। অনেক কথা বলে দ্রোণও চূপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সরি....সরি পাঞ্চালী।

এ কথা অভ্যাসে বলা নয়। এমন কাতর আওয়াজ বেরল দ্রোণের গলা দিয়ে, পাঞ্চালীর

চোখে জল এসে গেল। সে বলল, না ঠিক আছে।

অনেকক্ষণ পাঞ্চালীর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বসে রইল দ্রোণ। এক সময়ে পাঞ্চালীর কাছে তার ডায়েরি চাইল। সে কিছু লিখতে চায়। ডায়েরিটা ফেরত পেয়ে পাঞ্চালী দেখল দ্রোণ কবিতা লিখে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ তোমার কাছে বসেছিলাম।

অনেকক্ষণ

তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মোহীন বয়স—

ঠিক যে রকম আমার পাটি,

আমার মুক্তি দিগন্ত বিপ্লব,

তার থেকে অন্য কিছু নও।

তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবো আমি জানি না,

যেমন জানি না

বিপ্লবের শেষ অবধি থাকবো কিনা আমি

কিন্তু এটা স্পষ্ট

শেষকে পাবার আশা নিয়েই আমার শুরু

যেমন শুরু করেছিলাম তোমাকে ভালোবাসা

জানি জ্যা আমাদের হবেই

আমাদের সংগাম কোনো খোয়ালী জনের কল্পনা নয়।

তা কালী পাড়ব।

তাঁই এটাও আজ স্পষ্ট

ভালোবাসা আর বিপ্লব, বিপ্লব আর ভালোবাসা—

কেউ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

বিপ্লবের জন্যই ভালোবাসা

আর

ভালোবাসার জন্যই বিপ্লব।।

প্রেমের কবিতা। একেবারে পার্টির অনুশাসন মেনে লেখা। দ্রোণকে চটাবার লোভ সামলাতে পারল না পাঞ্চালী। বাঃ, খুব ভালো, একেবারে নিয়মনীতি মেনে লেখা মাওবাদী প্রেমের কবিতা....এখনই লিখে ফেললে?

পাঞ্চালীর খোঁচা মুখ বুজে হজম করল দ্রোণাচার্য। নিরুত্তাপ গলায় বলল, না আগেই লিখছিলাম একটা গম্ভীরা, তোমার কথা ভেবেই লেখাএখন আবার লিখে দিলাম.....

গল্প কবিতা গুনসুটিতে রাত কেটে গেল দ্রুত। সকালবেলা বড়দার সঙ্গে দ্রোণ চলে গেল পাণ্ডুয়ায়। ওখানেই এক মিষ্টির দোকানে বসির অপেক্ষা করবে।

দ্রোণ চলে যাবার কিছুকাল পরে দেশব্রতীতে বেরোল গুর জেল পালানোর খবর।

শিরোনাম — বিপ্লবী জনতা বন্দী কমরেডদের ছিনিয়ে আনছেন।

‘হুগলী জেলার কমরেড দ্রোণাচার্য্য ঘোষকে গ্রেপ্তার করে জেলে অকথ্য অত্যাচার করার পর গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তাকে পুলিশ হুগলী জেলার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। অসুস্থ অবস্থাতেও তাকে হাতকড়া দিয়ে রাখত এবং সবসময় সশস্ত্র পুলিশ ও সাদা পোষাকের কুস্তারা তাকে পাহারা দিত। গত ৪ঠা জুলাই বেলা ৯-৩০ মিঃ এর সময় পুলিশ যখন কমরেড দ্রোণকে হাসপাতাল থেকে আবার জেলে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল, তখন পার্টির একটি গেরিলা স্কোয়াড নিখুঁত তদন্ত ও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পুলিশের পাহারা থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। এ্যাকশনটি করতে মাত্র তিন মিনিট সময় লেগেছে।’

লেখাটি পড়ে পাঞ্চালী মজা পেল। দেশব্রতীতে যা লেখা হয়েছে আর দ্রোণের মুখ থেকে সে যা শুনেছে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বৃত্তান্ত! তার মানে মিথ্যে কথা শুধু বুর্জোয়া কাগজেই লেখা হয় না, পার্টির কাগজেও হয়। দ্রোণ সামনে থাকলে পাঞ্চালী ওর পেছনে লাগত। ঝগড়া হত নিশ্চিত। দ্রোণ হয়তো বোকাতে চেষ্টা করত তাকে। নিরপেক্ষ সংবাদপত্র বলে কিছু হয় না। সবাই কারও না কারও স্বার্থ দেখছে। যুদ্ধে এমনটা হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ যেমন ‘আসলে সবাই মৃত’ ইত্যাদি বলে অবসাদগ্রস্ত অর্জুনকে চাপা করেছিল। যদি তার জেল পালানোর ঘটনা কাজে লাগিয়ে পার্টি অন্য কমরেডদের অনুপ্রেরণা জোগাতে চায় ক্ষতি কী? আর রক্ষী-পুলিশদের মধ্যেও তো হতাশা আসবে।

দ্রোণের সঙ্গে মনে মনে কথা বলে ছেলে পাঞ্চালী। কিন্তু এই মিথ্যে ধরা পড়লে পাঠক-কমরেডরা পার্টির আর দেশব্রতী ওপর বিশ্বাস হারাবে কোনোদিন।

দিন কেটে যায় পাঞ্চালীর। একদিন দ্রোণের চিঠি আসে। গান্ধীগড় থেকে লিখেছে। কমরেড, শারদ উৎসবের সময় এখানে চলে এসো। সঙ্গে কিছু এনো না শুধু একটু সিঁদুর এনো।

চিঠি পড়ে চুপ করে বসে থাকে পাঞ্চালী। উন্টে পাল্টে আবার পড়ে চিঠি। বারে বারে পড়ে। হাত বোলায় দ্রোণের লেখার ওপর। শুধু একটু সিঁদুর এনো। এই দ্রোণকে পাঞ্চালী সম্যক চেনে। সিঁদুর তো একটা প্রতীক মাত্র। সত্যি সত্যিই তো আর ওই বস্তুটি সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছে না সে। তাকে সিঁদুর পরাবার কোনো সংস্কার দ্রোণের নেই।

কিন্তু ওই একটি বাক্যে ছেলে বুঝিয়ে দিয়েছে তার ইচ্ছা। হাজারবার ভালোবাসি বলেও তা প্রকাশ করা যেত না। পাঞ্চালীর শরীরে উৎসবের বাজনা বেজে ওঠে। ফুৎপিণ্ডে গাড়ির তীব্র গতিতে ছুটে চলা। তার দ্রোণ তাকে ডেকেছে। তাকে বিবাহ করতে চায়। একসঙ্গে থাকবে তারা। পাঞ্চালী উত্তর পাঠায়। কমরেড, আসছি।



দকালবেলা কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকতেই নিরুপম দেখল বিদ্যাসাগরের মূর্তির মূর্ত লোলটি। কনক মূর্তিটি স্থির বসে আছে।

লভের পুলিন সি আর সি আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু হয়েছে মনীষীদের মূর্তিভাঙা। লভ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গাঙ্গীর মূর্তি ভাঙা হচ্ছিল। দু-এক জায়গায় বিনেয়ালার মূর্তিতে আলকাতরা মাখানো হয়েছে। বিপ্লবের দিন সমাসন্ন। বিপ্লব হ'ল উৎসব। ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য ম্যাসেস। এ সময়ে এমন বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। দেশব্রতীর লভ্য মূর্তিভাঙার সমর্থনে কলম ধরেছেন শশাঙ্ক। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ হ'ল দুই টিঙ্কার লড়াই। বিপ্লব বিরোধী দর্শনের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতির লড়াই। না ভাঙলে গড়া যায় না। ব্রিটিশের সহায়ক গাঙ্গীর মূর্তি ভাঙা হচ্ছে বীর সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডুর মূর্তি গড়বার জন্য। গামে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে শহরের যুবছাত্ররা গড়ে তুলছে এই আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। স্কুল কলেজের ছাত্ররা ক্রাশঘরের দেওয়ালে স্লোগান লিখছে, মাথার প্রতি প্রতি আঁকছে। বুর্জোয়া শিক্ষায়তনের ল্যাবরেটরি ভাঙছে। বই পোড়াচ্ছে। চাক মজুমদার বলেছেন, তিনি খুশি হবেন যদি ছেলেরা উনিয়নমাইট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু কারা এ কাজ করল? কুখ্যাত পুলিস অফিসার রবি সেনশর্মাকে খতম করবার পর থেকে পাটিতে নিরুপম চরণের চক্কর বেড়ে গেছে। ওদের সঙ্গে আলোচনা না করে মগা কলকাতায় কোনো আবেশ হয় না। সেখানে এমন একটা মূর্তিভাঙার ঘটনা ঘটে গেল অচ্যুত নিরুপম জানে না! সে আবার মূর্তিটির দিকে তাকাল। বেশ পরিপাটি করে কাটা হয়েছে গলাটা। অর্থাৎ এ কোনো অপটু হাতের কাজ নয়। যে এ-কাজ করেছে, সে পাখারকাটা অভিজ্ঞ। ছেনি, হাড়ুড়ি, বাটালি চালাতে জানে। মূর্তির সামনে দিয়ে যারাই কেটে গেছে, থমকে দাঁড়াচ্ছে একবার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চূপচাপ চলে যাচ্ছে।

তিনজন বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে গেলেন। একজনের কালো ফ্রেমের চশমা। অন্যজনের হাতে লাঠি। তৃতীয়জনের মাথায় সাদা টুপি।

কালো ফ্রেম বললেন, এ কী? বিদ্যাসাগরের গায়ে হাত দিল কারা? দ্বিতীয় জন লাঠি নাচালেন। চারদিকে যারা মূর্তি ভাঙছে, তারাই বোধহয়। কালো ফ্রেম দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন। গাঙ্গী যে ব্রিটিশের দালাল এমন কথা অনেকেই বলে কিন্তু বিদ্যাসাগরের নামে তেমনটা তো লেগে যায় না.....

সাদা টুপি বললেন, ওঁর প্রথম ভাগ - দ্বিতীয় ভাগ পড়ে আমরা বড় হয়েছি।আর তা ভাঙা সাংস্কৃতিক একচেঁয়া ওঁর উনি বহুবার তেজ দেখিয়েছেন.....

নিরুপমের ভেতরে অপ্রতি হচ্ছিল। ব্যাপারটি বিশদে জানা দরকার। কলেজ স্কোয়ারের

গায়েই গোপালির বইয়ের দোকান। দোকানের ভেতরেই ও রাত কাটায়। কখনও শুয়ে থাকে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যেই। কালী মন্দিরের সামনের চাতালে। নিরুপম গোপালির কাছে গেল।

গোপালির থেকে জানা গেল, তিনটে ষড়্ভাষা চোহারার লোক গভীর রাতে এই কাজ করেছে। ওদের হাতে ছেনি, বাটালি ছাড়াও ছিল করাত আর চটের বস্তা। মূর্তির মুণ্ড ওরা কলেজ স্কোয়ারের জলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

গোপালি বলল, গুরু লোকগুলোকে এলাকায় কখনও দেখিনি.....মুশকো চেহারা খোঁচড় নাকি বলতো?

নিরুপম বলল, খোঁচড়? পুলিশ কেন করবে এ কাজ?

— হয়তো ওরা দুষ্কর্মটা করে, তোমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়। গোপালির কথায় নিরুপম কোনো উত্তর দিল না। ব্যাপারটা জানা দরকার। লোকাল কমিটির মিটিঙ ডাকল নিরুপম।

চিরন্তনও জানে না। দীপঙ্করদার কাছেও কোনো খবর নেই। বনমালী রায় বললেন, যারা এ-কাজ করছে, তারা সবাই আমাদের সভ্য নয়.... পার্টির নির্দেশ মেনে তারা এ-কাজ করছে, এমন নয়.....

নিরুপম বলল, তাহলে কেন এমনটা হতে দিচ্ছি আমরা?

— কেন দেব না? বনমালী রায় নিরুপমের দিকে তাকালেন। নিরুপমের চোখে বিস্ময়। জনগণের আন্দোলনে কেন ছড়ি ঘোরাতে পারি আমরা? বনমালী গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন। পার্টি গুহামুখ থেকে ঠেলে পাথর সরিয়ে দিয়েছে। উন্মুক্ত জলস্রোত যত নীচে নামছে তত প্রবল আর ব্যাপক হচ্ছে। তাঁর সামনে বেত হাতে দাঁড়িয়ে ‘ওদিকে যেও না’, ‘ও ক্ষেত ভাসিও না’, ‘ও গ্রাম জুড়িও না’ বলে মাস্টারি করবার মতো নির্বোধ আমাদের পার্টি নয়। বিপ্লবী যুবছাত্রদের কোন কাজটা বৈঠক, বিচ্যুতি এইসব দেখাও আমাদের পার্টির কাজ নয়। নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে বুড়ো মুদি যেমন নিষ্কিন্তে গরম মশলা ওজন করে তেমনভাবে আমরা এইসব কাজকে বিচার করতে যাব না। বরং এইসব বাড়াবাড়ির জন্য আমরা বিপ্লবী যুবছাত্রদের অভিনন্দন জানাব। চেয়ারম্যানের চিনেও চলছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

বনমালী রায় একটু দম নেবার জন্য থামতেই সুশান্ত বলল, কিছু চিনে তো এমনটা হয়নিওখানে আগে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে পার্টি তারপর এসেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা....

— এখানে দুটোই পাশাপাশি চলছে বিপ্লবী যুবছাত্রদের এই মূর্তিভাঙার লড়াই আসলে দুই মূর্তির লড়াইপ্রতিক্রিয়াশীলদের মূর্তি বনাম বিপ্লবীদের মূর্তিএকে অন্যকে উচ্ছেদ না করে এই লড়াইয়ের ফয়সালা হবে না।

বনমালী রায় এরপরে বললেন বিদ্যাসাগরের কথা। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তো সে সংস্কৃত কলেজকে মিলিটারি ব্যারাক করতে দিয়েছিল। কলেজের পড়াশোনা বন্ধ রেখে, বিদ্রোহ দমনের জন্য কলেজকে মিলিটারি আশ্রয় করে দেওয়া বুঝি দেশপ্রেমিকের কাজ? বনমালী রায় প্রশ্ন ছুঁড়লেন। এ-কথা আপনি কোথায় পেলেন? সুশান্ত বলল। আছে আছে

নেয়ামে এক আয়গায়। বনমালী রায় চোখ নাচিয়ে হাসলেন।

এই বিষয়ে কোনোরকম তথ্য জানা নেই। নিরুপম-সুশান্ত-চিরন্তন চূপ করে রইল।

নাটকসকল চূপ করে গেতে বনমালীর উৎসাহ বেড়ে গেল। কমরেডস্, এই কথা জেনে রানুল, যখনই জনগণ ঐতিহ্য বিরোধী আন্দোলন করেছে, এবং সেই আন্দোলন তুঙ্গে উঠলেই এই গান্ধী, কোমো না কোমো অছিল্য তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সেই গান্ধীর মূর্তি আজ ভেঙে ফেলাতে বিশ্বাসী যুগভাঙ্গনা। পুরনো জমানার মনীষীদের তারা প্রশ্রুতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভাষা দেশপ্রেমিক না দেশপ্রেমিক নও এই যুক্তিতেই আজ তাদের বিচার হবে। গান্ধী বিদ্যাসাগর নীলমণি বসু বনকন্দ-প্রফুল্লচন্দ্র রায়-সুভাষচন্দ্র বসু সবার হিসাব হবে এই মাসকাঠিতে।

দুলাল বলল, গান্ধীর মূর্তি না ভেঙেও তো আমরা মঙ্গল পাণ্ডুর মূর্তি বসাবার আন্দোলন করতে পারতাম.....আমাদের সেই মিছিলে হয়তো গান্ধীবাদীরাও যোগ দিতেন.....

গান্ধীবাদীরা সেই মিছিলে যোগ দিত কী না সংশয় আছে নিরুপমের কিন্তু এমনটা করলে হয়তো বেশ বড়সড় একটা মিছিল করা যেত শহরে। বহু মানুষের সমর্থন পাওয়া যেত। কিন্তু সাক্ষাৎ মিছিল মিটিঙ তো এখন বেশ কিছুদিন হ'ল বন্ধ।

চিরন্তন বলল, তার আগে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো দরকার কারণ তারা কংগ্রেসে আবেদন করেছে.....এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

এখন ওসব সময় নষ্ট করে লাভ নেই.....সামনে বিরাট অভ্যুত্থান। বনমালী রায় জগালেন। আজকের যুগ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুগ। ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণ এখন অগ্নিকণ্ড। লোকসম্মেলন নিয়েদের মধ্যে কামড়াকামড়িতে ক্ষতবিক্ষত। এখন যে কোমো আয়গায় সশস্ত্র লড়াই এক করে দিলেই তা আগুনের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। শুষ্ক জ্বালাতে পারলেই তা দাবানলে পরিণত হবে। সামনে বিরাট অভ্যুত্থান আসছে। এই কথা আদ্যাক করতে পেরেই কমরেড চারু মজুমদার আগেই বলেছিলেন, ১৯৭৭-৭১ সালের মধ্যে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় গণমুক্তি ফৌজ মার্চ করবে। এখন কমরেড সি এম বলেছেন, ১৯৭৫ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষ দেশকে মুক্ত করবেন।

তাঁই নার্সি সি এম এমন বলেছেন? দীপঙ্করদা উত্তেজিত।

তাঁই আমাদের মধ্যে এক গোপন আলোচনায় বলেছেন।পরে কোনদিন দেশবর্তীতে একেবে এ দেখা। বনমালী রায় সি এম-এর কথা বলতে শুরু করলেন। আজকের সশস্ত্র লড়াইয়ের যে চিন্তা, তা ১৯৬৭ সালে দেখা দিয়েছিল ওই একটি মানুষের মতো। সেই মানুষের চিন্তা আজ এই ১৯৭০ সালে প্রাবিত করেছে অন্তত এক কোটি মানুষকে। নকশালবাদীর আগুন ছড়িয়ে গেছে দেশের প্রতিটি কোণায়। শ্রীকাকুলামের বিদ্রোহীরা রক্ত দিয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য রচনা করছেন। অচিরেই শ্রীকাকুলাম হয়ে উঠবে ভারতের টায়োনা। যে ইয়েনান চিনের প্রথম শতক ঘাঁটি। যে ইয়েনান থেকে মাও সে তুংজেন রেডার্মেড চিনের লালফৌজের জয়যাত্রার শুরু। মাত্র তিন বছরের মধ্যে যদি সি এম এর কথা এক কোটি মানুষকে ছুঁতে পারে তাহলে আগামী পাঁচ বছরে সেই এক কোটি মানুষ পক্ষাণ কোটি ভারতবাসীকে বিশ্ববী জনজোয়ারে ডাকিয়ে দিতে পারবে

না? কমরেডস্, আসুন আমরা সবাই মিলে সিএম-এর স্বপ্ন সফল করি।

বনমালী রায়ের বক্তৃতার আবেগ স্পর্শ করল নিরুপম-চিরন্তনকে। দীপঙ্করদা এমনিতৈই কম কথার মানুষ। তিনিও চুপ করে গেলেন। ওঁর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে উঠল।

সুশান্ত বলল, এমন অন্ধ কবে বিপ্লব হয় নাকি? আর তা ছাড়া সি এম কী করে বুঝলেন পঁচাত্তরেই মুক্তি? এখনও গণফৌজ তৈরি হয়নি, কোনো ঘাঁটি এলাকাও নেই আমাদের.....

বনমালী বিরক্ত হলেন এইবার। দ্যাখো সি এম ভারতের বিপ্লবের ক্ষেত্রে একজন অথরিটি। তাঁকে গুরু বলে মানতে হবে আমাদের। যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা মানি মাও সে-তুঙকে। স্বয়ং মাও-এর পার্টি বলেছে ২০০১ সালে সারা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় পালন করবে।

এরপরে এই আলোচনা চালালে তিঙ্কতার সৃষ্টি হবে। নিরুপম খাত পাল্টাবার চেষ্টা করল। তাহলে এখন শহরে কী করা দরকার আমাদের?

— পুলিশ, পুলিশের দালাল ইত্যাদি শ্রেণীশত্রু খতম এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর গেরিলা কায়দায় আঘাত। বনমালী রায়ের মতে, এমনটা করলেই শহরের পুলিশও ভয় পাবে। পুলিশ কিছুকাল আগে মধ্য কলকাতার তালতলায় কাজল ব্যানার্জিকে গুলি করে মেরেছে। তারপরেই উদ্ভরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে কানু সান্যালকে। ওই একইদিনে উদ্ভর কলকাতার শ্যামপুকুর থানার লক আপের মধ্যে পিটিয়ে মেরেছে সতেরো বছরের সমীর ভট্টাচার্যকে। মাত্র ক’দিন আগেই ভোবুগে ভবানী দত্ত লেনে পুলিশ সোজাসুজি গুলি করে মেরেছে অনুপ, শঙ্কু, কেটকে। আগের দিন বিধুকে। পুলিশ চাইছে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে। শ্বেত সন্ত্রাস.....

— এই শ্বেতসন্ত্রাসের মোকাবিলায় আমাদেরও তৈরি করতে হবে পাল্টা সন্ত্রাসের লাল সন্ত্রাস। বনমালী রায় নিজের উরুতে চাপড় মারলেন।

সুশান্তকে সমালোচনায় পেয়েছে। ও বলল মাও সে-তুঙের কথা। গ্রাম দিয়ে শওণ ঘেরবার তত্ত্ব।

— যতদিন না তা হচ্ছে গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শাওণ সদায়া করে শহরে অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।

— এখন আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। কারণ শহরে আর গ্রামে একইরকম বিপ্লবী পরিস্থিতি। কোনো ভেদ নেই। জনযুদ্ধ গ্রামে চলবে আর শহর ঘুমিয়ে থাকবে, এ হয় না। গ্রামে দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করবে, আর শহরের বিপ্লবীরা ওই আত্মদানের যোদ্ধাদের রসদ আর মদত যোগানোর নামে শ্রেণীসংগ্রাম এড়িয়ে আত্মরক্ষা করবেন, এ হয় না।

বনমালী রায় গভীর গলায় জানিয়ে দিলেন। কমরেডস্ বিপ্লব এসে গেছে, এখন নিজেকে বাঁচানো নয় এ যুগ আত্মবলিদানের যুগ। রক্ত ঝরা পথই তো বিপ্লবের একমাত্র পথ। মানুষের মুক্তির জন্য মূল্য দেব না এ তো হতে পারে না। আমাদের প্রতিটি মৃত্যু লক্ষ লক্ষ জীবন সৃষ্টি করবে। প্রতিটি মৃত্যুই নতুন জীবনের জন্ম দেয়। আজ নিজেকে বাঁচানোর নয়, দিন এসে গেছে আগুনের মতো জ্বলে ওঠার।

বনমালী রায়ের আবেগকম্পিত গলা শুনে নিরুপমের ভেতরটা চনমন করে উঠল। কথাগুলি যেন চেনা লাগে। কিছু পরেই মনে পড়ল এমন ধরনের কথা দেশব্রতীর পাতায় সে পড়েছে। মেদিনীপুরের তিনজন বীর বিপ্লবী গুরুদাস, শশী আর সুদেব শত্রুর হাতে নিহত হবার পর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি কমরেড সি এম-কে লেখেন কোথায় ভুল হচ্ছে তা আমি জানতে চাই। ওই কমরেডের চিঠির উত্তরে সি এম লিখেছিলেন — আজ অনুশোচনার দিন নয় আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন। সেই চিঠির কোনো কোনো বাক্য উদ্ধৃত করছেন বনমালী রায়।

ওই বনমালী রায়ের কথা শুনে ভালোই লাগছিল। এটা ঠিকই পুলিশ-সি আর পিকে লাস্টা মার দেওয়া দরকার। তবেই ওরা থমকে যাবে। না হলে আজ কাজল, কাল দমীর, পদশ অন্যপকে ওরা মারতেই থাকবে।

নিরুপমের চিন্তার প্রতিধ্বনি করল চিরন্তন। কমরেড আমরা একমত আরও তীব্রভাবে পুলিশকে আক্রমণ করতে হবে আমাদের....

নিরুপম বলল, হ্যাঁ ঠিকই.... প্রতিটি পুলিশ পিকেট, প্রতিটি পুলিশবাহী জিপ ট্রাকের ওপর হামলা চালাতে হবে।

বনমালী রায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি একবার দীপঙ্করদার দিকে তাকালেন একবার সুশান্তর দিকে। তারপর নিরুপমের চোখে ফোঁস রেখে বললেন, কমরেড মনে করে দ্যাখো রবি সেনশর্মার ওপর আক্রমণকে কে নিখুঁত গেরিলা অ্যাকশন করেছিল তোমরা.... পুলিশ কিছু করতে পারেনি তোমাদের।

প্রশংসা শুনে ভালোই লাগে। ভালোই লাগছিল নিরুপমের। নিশ্চয়ই সি এম-ও লেখছেন তাদের সীমাহীন খবর। একটা লজ্জাও করছিল এমন বন্ধুত্বাধর্মী প্রশংসায়।

কমরেড বনমালীর ভাষণ সংক্ষেপ করবার জন্যই নিরুপম বলে উঠল, হ্যাঁ সব ঠিক আছে। আমাদের আগার অ্যাকশন শুরু করা দরকার।

বনমালী রায় বললেন, হ্যাঁ এইটাই কথা অ্যাকশন শুরু করলেই পুলিশ ভয় পাবে.... আমাদের ডাঁতি কেটে যাবে.... কেটে যাবে অনেক মধ্যবিস্ত দোদুল্যমানতা।

সুশান্তর দিকে একবার তাকিয়ে উঠে পড়লেন বনমালী। কমরেড রায়ের সঙ্গে দীপঙ্করদার গেরিজে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল নিরুপম, চিরন্তন এবং সুশান্ত।

৩১/৭ নিরুপম হালকা গলায় বলল, চল আমরা শ্রীকাকুলাম চলে যাই...ওইখানে গিয়ে লাড়ি...। চিরন্তন হাসল, ভারতের ইয়েনান—। মুখ তুললো সুশান্ত। — শোন ...আমার বড়দা চিমে ভাষণ ৮৬। করে, চিনের ইতিহাস বেশ ভাল জানে, সে-ই বলেছে —। সুশান্তর দিকে তাকাল নিরুপম, চিরন্তন। — আমরা ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী ইয়েনান বলি বটে, কিন্তু ওই জায়গার ঠিক উচ্চারণ ইয়ান-আন, আর কেন লালফোঁজ দক্ষিণ-পূর্ব চিনের কিয়ান্সি প্রদেশ থেকে বারো হাজার পাঁচশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ওই ইয়ান আন গেল সেট খটখাট তো বুঝতে হবে? কোন ভুলের জন্য তাদের এতটা পথ পেরোতে হল, তাও তো জানা দরকার?

কেন? চিরন্তন বলল। ব্যাপারটা কি বলত? নিরুপম বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুশান্ত ব্যাখ্যা করে। তখন জাপান আক্রমণ করেছে চিনকে। মানুষের দাবি, কুয়োমিনটাঙ সরকার রুখে দিক জাপানকে। তা না করে ওরা আক্রমণ করে চলেছে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির লাল ঘাঁটিগুলি। লালফৌজে তখন তিনলক্ষ কমরেড। মুক্ত এলাকাগুলির কৃষকরা নতুন ব্যবস্থার, সুস্থ জীবনযাপনের স্বাদ পেয়েছে। তারা জীবন দিয়ে ওই এলাকা রক্ষা করতে তৈরি।

তদসত্ত্বেও শাসকদের সৈন্য আর জাপানি সেনা একযোগে লালফৌজের কমরেডদের খতম করে চলেছে। মাওয়ের কথা না শুনে, ভুল পথে চলে, বিপুল ক্ষতি হচ্ছে লালফৌজের। কিছুতেই আটকান যাচ্ছে না ক্ষতি। একসময় কিয়াদুসি প্রদেশের লালঘাঁটি ঘিরে ফেলল চিয়াং কাই-শেকের বাহিনী। ওই জায়গাই তখন চিনের লালফৌজের মূল, কেন্দ্রীয় ঘাঁটি।

তখন মাও সে-তুঙ শক্ত হাতে হাল ধরেন। লড়াই করেন ভুল পথের বিরুদ্ধে। ঠিক হয়, কোনো জায়গায় শত্রুর ঘেরাও ভেদ করে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে উত্তর-পশ্চিমে। লালফৌজ পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পৌঁছবে ইয়ান-আন। ওই জায়গা নিরাপদ, পর্বতসঙ্কুল। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছাকাছি। প্রয়োজনে স্টালিনের রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া যাবে।

লালফৌজ চলছে। তাদের যাত্রাপথে যোগ দিচ্ছে অশ্রুপাশের এলাকার সশস্ত্র কমরেডরা। লালফৌজ দলে ভারী হচ্ছে। অনেক পাহাড় পর্বতসমূহ পেরিয়ে, পথিমধ্যে চিয়াং বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে লড়াইতে লালফৌজ পৌঁছে যায় উত্তর পশ্চিমের ইয়ান-আন।

১৯৩৪-এর অক্টোবর তারা হাঁটতে শুরু করেছিল। লংমার্চ শেষ হয় একবছর পরে ১৯৩৫-এর অক্টোবর। তারপর এই দলটি লালঘাঁটি ইয়ান-আন থেকে চিনের লালফৌজ প্রতি-আক্রমণে নামে। এই সময়েই মাও সে-তুঙ পার্টির কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

চিরন্তন বলল, বাঃ ভাল বলেছিস ... এই ইতিহাসটা পড়িনি...

নিরুপম বলল, সত্যিই ... আমি তো ভাবতাম লালফৌজ লড়াইতে লড়াইতে এগিয়ে চলেছে সেইটাই ... এইটা যে আসলে কৌশলগত কারণে ঘাঁটি ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা ব্যাপার, জানতাম না —। সুশান্ত হাসল। আরও একটা কথা বলি তোদের, যুদ্ধের সময় আত্মবলিদানের যুগ, আত্মরক্ষার যুগ বলে কিছু হয় না। সহজবুদ্ধির কথা হল আত্মরক্ষা করে শত্রুর ধ্বংসসাধন। এর জন্য প্রয়োজনে গেরিলা লড়াই, আবার কখনও সোজাসুজি আক্রমণাত্মক লড়াই। কখনও লড়াই এড়িয়েও চলতে হয়। কিছুক্ষণ স্বগতোক্তির মতো বলে নিরুপম-চিরন্তনের দিকে তাকাল সুশান্ত। দ্যাখ, প্রতিটি জীবনই দামী তা খরচ করবার আগে আমরা লাভ ক্ষতির হিসেব কষব না?

নিরুপম বলল, হ্যাঁ তা তো করা উচিত.....

চিরন্তন বলল, কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না চালালে ওরা আমাদের মেরে দেবে।

নিরুপম বলল, অত্যাচারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই আমাদের মৃত্যু। চারমিনার ধরাল নিরুপম। একটা লম্বা টান দিয়ে এগিয়ে দিল সুশান্তকে। এই নে ধর। সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে ধরে সুশান্ত হাসল। শালা, আমরা তিনটে 'চ'-এর ওপর বেঁচে আছি। নিরুপম,

চিরপূন দুজনেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সুশান্ত বলল, তিনটে 'চ' — চেয়ারম্যান, চারক মজুমদার আর চারমিনার। তিনজনেই হেসে উঠল। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সুশান্ত। সে নরম হল এইবার। একথা ঠিক বিষয়র সাপকে লাঠি পেটা করে না মারলে ও ব্যাটাই আমাদের ছেঁবল দেবে। আবার শহরে পুলিশের ক্ষমতা বেশি এটাও বোঝা দরকার.....

চিরন্তন বলল, নারে সুশান্ত ভয় পাস না শত্রু অতকিছু শক্তিশালী নয়.....আর সমস্ত খাতিক্রিয়ালীলরা কাণ্ডজে বাঘ।

সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। আমি ভয় পাচ্ছি না.....সবাইকে সাবধান করছি।

সুশান্ত'র একটা কথা ঠিক। পুলিশের ছেঁবল দেবার ক্ষমতা বেড়ে গেছে। এখন লক্ষ্মণবাবু চালু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা দমন আইন। খাদ্যসেবায় পর এট প্রথম। পুলিশ গুলি চালালে কোনোরকম প্রশাসনিক তদন্ত হয় না। কোনো ঘটনা ছাড়াই যে কোনো এলাকায় পুলিশ ইচ্ছেমতন কারফিউ জারি করে। কোনো একটা রাস্তা বা পাড়া বেছে নিয়েও কারফিউ জারি করে চিকুনি তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

৩য় পুলিশ সি আর পি-কে আক্রমণ করতে হবে। না হলে ওরা আরও বাড়বে। আক্রমণ শুরু করে দিল নিরুপমরা। পুলিশ পিকেটের ওপর দূর থেকে বোমা ছুঁড়ল। সি আর পি বোমাই চলমান ট্রাকের উপর চালান যুগপৎ গুলি এবং বোমা। শুধু মধ্য কলকাতা নয়, শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ। কে ভালো পুলিশ কে খারাপ পাছবিছার না করেই ওদের মারতে শুরু। যুদ্ধের পরিস্থিতি এখন। এ-সময় ভালো খারাপ, বড়-ছোট অত বিচার করা যায় না। রাস্তা-ঘাটে, বাজারে-দোকানে, সিনেমায়-সেখানে যে কোনো পুলিশকে আক্রমণ, অন্যমনস্ক পাওয়া যাবে, মারতে হবে।

পুলিশ খতম অভিযানের বিবরণী মার্কিন দেশব্রতী। 'কলকাতার পুলিশ খতম অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে শহীদ সাথীদের হত্যার বদলা নিচ্ছেন কমরেডরা। লাঠিটি শহীদদের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা জ্বলে উঠছে। সংশোধনবাদী পাটিগুলির বিশেষ করে সি আর পি এম এর সহযোগিতায় পুলিশ এখন কমরেডদের খোলাখুলি ও সরাসরি হত্যা করার পথ নিয়েছে। এরা রোজই কমরেডদের ও অন্যান্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে। কিন্তু তাতে প্রতিরোধের আগুন আরও জ্বলে উঠছে এবং আরও বেশী বেশী শ্রেণীশত্রু পুলিশ ও দালাল খতম করা হচ্ছে।' পুলিশ খতম ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য জেলাতেও।

কয়েকটি আক্রমণের পরেই জড়তা কেটে গেল নিরুপম-চিরন্তন-সুশান্ত বাহিনীর। পুলিশকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পালিয়ে যাবার মজাই অন্যরকম। ওরা যতক্ষণে হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠে তেড়ে আসে, ততক্ষণে গেরিলারা এলাকা ছেড়ে উধাও। আক্রমণ করার পাশাপাশি পুলিশকে নিয়ে দেওয়ালে লেখাও শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ মারো, অস্ত্র কাড়ো। শহরের কয়েকটি জায়গায় পুলিশকে মারার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের আধেয়াস্ত্রটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে এলাকার গেরিলা স্কোয়াড। মজার স্লোগানও লিখেছে কেউ কেউ

পুলিশ ডািম গাউট মারো, মাইনে তোমার একশো বারো। কে যে খবরটা এনেছিল জালা নেই, এলাকা দিকের পুলিশের মাইনে নাকি মাসে একশো বারো টাকা। অতএব খাএ এই কটা টাকার জন্য কেন বাপু নিজের জীবন বিপন্ন করা? আর কেনই বা বিপ্লবীদের লেজের লোভে বেড়ানো? খোঁচ। ইনফরমারদের অবস্থা নাকি আরও খারাপ। জানাজানি

হ'লে অবধারিত মৃত্যু এমন অবস্থায় খোঁচড়গিরি করে পাওয়া যায় মাত্র একশো পাঁচ টাকা। ইনফরমারদের তাই ঠাট্টা করে একশো পাঁচ বলে ডাকে নিরুপমরা।

বেশ কয়েকটা সফল আক্রমণ করবার পর এক সন্ধ্যায় রামকান্ত মিস্ত্রি লেনে পুলিশি ঘেরাও-এ পড়ে গেল নিরুপম, চিরন্তন, সুশান্ত, লান্টু এবং আরও পাঁচজন।

আগামী কয়েকটা অ্যাকশন নিয়ে জরুরি আলোচনার জন্য ওই পাঁচজন এসেছে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকা থেকে। এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট, গলিপথ ভালো করে চেনে না ওরা। এদিকে পুলিশ রাস্তার দুটি প্রান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে। নিশ্চয় রাস্তার শাখাপথগুলিতেও বন্দুকধারী মোতায়েন করেছে তারা। কঠিন পরিস্থিতি। একমাত্র উপায় লাগোয়া দুটি বাড়ির ছাদ টপকে কানাই ধর লেনে পৌঁছনো। ওই রাস্তাতেও পুলিশ থাকবে এখন। তবে সংখ্যায় নিশ্চয় এত নয়। কোনো মতে ওই পুলিশের চোখ এড়িয়ে ছাতার বাঁট তৈরির কারখানার সরু গলিপথ ধরতে পারলে কিছুটা নিশ্চিত। সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, আমহাস্ট স্ট্রিট হয়ে শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছতে পারলে স্বস্তি। স্টেশন থেকে বালিগঞ্জগামী ট্রেনে চড়তে পারলেই ওরা নিরাপদ।

কানাই ধর লেনের পুলিশ পার্টিকে টেনে আনতে হবে এদিকে। যতক্ষণ না ওরা আমহাস্ট স্ট্রিট পার হচ্ছে পুলিশকে আওয়াজ দিয়ে বাস্তব রাখতে হবে।

এই বাড়ির ছাদে একটা পরিত্যক্ত জলের ট্যাঙ্ক আছে। তার মধ্যে বোমা, পাইপগান জমা থাকে। দ্রুত ছাদে উঠে এসে খানকুড়ি বোমা বের করে ফেলল নিরুপম। তার থেকে বেছে বেছে বারোটি নিজের কাছে রাখল চিরন্তন। সুশান্ত পাইপগান নিয়ে তাঁর। লান্টু কসবার পাঁচজনকে নিয়ে ছাদ টপকল। আকাশে পূর্ণচাঁদ। চাঁদের আলোয় নীচের রাস্তাটি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভে গেছে। পুলিশ-সি আর পি প্রতিটি বাড়িতে ঢুকছে। কলার চেপে বের করে আনছে ছেলদের। ঘোলো আঠারোর ছেলে সব। ওদের ধরে তুলে দিচ্ছে কালো গাড়িতে।

যে বাড়িতে মিটিঙ চলছিল তার দুটো বাড়ি পরেই একটা তিনতলা বাড়ি। পুলিশ ওই বাড়িতে ঢুকে পড়ল। ওদের ঠেকানো দরকার।

বোমা ছুঁড়লো নিরুপম। বিকট শব্দে বোমা ফাটল তিনতলা বাড়ির সদর দরজার সামনে। রাস্তায় ভারী বুটের শব্দ। লুকিয়ে কেন?সামনে আয়.....খানকির ছেলে..... বোমা ছুঁড়ছে..... মেরে গাঁট ফাটিয়ে দেব শুয়োরের বাচ্চা.....। পুলিশ গালাগালি দিচ্ছে নিজেদের মনে সাহস আনবার জন্য। গালি দিয়ে নিজেদের ভেতর উত্তেজনা ছড়ানো যায়। জোশ আসে। ওদের গালাগালির মধ্যেই বোমা ছুঁড়ল চিরন্তন। নিরুপম যে দিকে ছুঁড়েছিল তার বিপরীত দিকে। নিরুপম আবার বোমা ছুঁড়ল। এবার সম্পূর্ণ অন্যদিকে। নিরুপমদের উদ্দেশ্য সফল। পুলিশ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে থেকে বোমা আসছে। ওরা বিভ্রান্ত হয়ে গালাগালি দিচ্ছে। এদিক ওদিক ছুটছে।

হঠাৎ দু'জন বন্দুকধারী তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠে এল। ছুটে জলের ট্যাঙ্কের পিছনে আড়াল নেবার আগেই নিরুপমদের দেখতে পেয়ে গেল পুলিশ। পেয়েছি.....পেয়েছি শুয়োরের বাচ্চাদের। চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাইপগান চালাল সুশান্ত। চিরন্তন বোমা ছুঁড়ল। ছুঁড়েই ট্যাঙ্কের আড়ালে। বোমা ছুঁড়ল নিরুপম। পরপর দুটো বোমার ধাক্কা

ও লাগে না। একজনের গোষ্ঠার আওয়াজ পাওয়া গেল — মার ডালা, মার ডালা...
লিফট লেগেছে কোনো একজনের।

সুশান্ত পাঠলগান পোড করে নিয়েছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এক পা এগিয়ে গুলি
চালাল সুশান্ত। এগার ও-দিক থেকেও ভেসে এল বন্দুকের আওয়াজ। বুকের বাঁদিকে
হাত দিয়ে পড়ে গেল সুশান্ত। চিরন্তন চার্জ করল এইবার। একটা...দুটো...তিনটে বোমা
ছুঁড়ল। বন্দুকখারীরা নীচে দৌড়ছে। ওদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নীচে নেমে সদলবলে এই
বাড়ির জমে উঠতে চায়। চিরন্তন তাদের কোণে গিয়ে লক্ষ করছে ওদের গতিবিধি। এ
বাড়ির লদরে ঢোকার মুহুর্তে ওপর থেকে বোমা ছুঁড়ে ঘায়েল করতে হবে ওদের।

জ্বলন্ত অগ্নিকোণায় দাঁড়িয়ে পুলিশের পরিকল্পনা বোঝবার চেষ্টা করছিল নিরুপম। হঠাৎ
লেজের তাকিয়ে দেখে সুশান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে অপার বিস্ময়।
শরীরের ভেতরে কিছু একটা ঘটেছে যা ওকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। কিন্তু
কেন এমন হল? কেন শোবে সে? এমন জিজ্ঞাসায় মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। চাঁদের
আলোয় নিরুপম স্পষ্ট দেখতে পেল সুশান্তের সেই বিস্মিত মুখ। চোখে জল টলটল
করছে। আত্মনির্যাসী ভঙ্গিতে দু-তিন পা এগিয়ে এল সুশান্ত। নিরুপম দৌড়ে গেল ওর
দিকে। সুশান্ত কিছু বলার চেষ্টা করল নিরুপমকে। ওর ঠোট নড়ল দু'বার। কিন্তু কথা
নকল না। আরও এক পা এগোনোর চেষ্টা করল সুশান্ত। ওর চোখ বিস্ময়িত। ঠোট
কাপছে। ওকে দূর দরকার। কিন্তু হাত বাড়ানোর আগেই সুশান্ত পড়ে গেল। এই পড়ে
গাওয়া যে চিরকালের মতো ছেড়ে যাওয়া মুহুর্তে অসুবিধা হয় না নিরুপমের।

পরপর দুটো বোমা ছুঁড়েই চিরন্তন ডাক্তার নিরুপম শীগগির চলে আয়.... পালাতে হবে।

সুশান্ত চলে গেছে রে.....। গলায় ব্লাজা এল নিরুপমের।

চিরন্তন বলল, জানি, কিন্তু এখন আর সময় নেই একদম.....শীগগির চলে আয়....।
সুশান্তের পাঠলগানটা তুলে নিল নিরুপম। এ পাড়ার প্রতিটি বাড়ির ছাদ, কার্নিস ওদের
চোখ। দুজনেই এ বাড়ি ও বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে পালাতে পারল শেষ অবধি।

সুশান্তের কথাটা তুলতে পারছিল না নিরুপম। জীবন দেবার সময় আমরা দলের লাভ
ক্ষতির হিসাব করব না? ও জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল, সুশান্ত ভীতু নয়। নিরুপম
বলল, নীচে থেকে সুশান্ত যা করতে পারেনি, মারা গিয়ে পারল। পার্টির কর্মকাণ্ড নিয়ে
একটা বড় প্রসিদ্ধি তুলে দিয়ে গেল।

চিরন্তন বলল, ঠিক বলেছিস.....খারাপ লাগছে খুব....

তবে এই খুনের বদলা নিতে হবে আমাদের।

নিরুপম বলল, নিতেই হবে।



আলো, ফোটার আগেই উঠে পড়তে হয় এখানে। রাত্রি ও প্রত্যুষের সন্ধিক্ষণে, এমন
ফিকে আধারের কালে উঠতে অভ্যস্ত নয় পাঞ্জালী। অথচ ঘুমের মধ্যেই কোনো অতঙ্গ

প্রহরী তার কর্তব্যবোধটি জাগিয়ে তুলল প্রথমে। তারপর পাঞ্চালীর ঘুম ভাঙল। সে চাদর বালিশ গুটিয়ে ঠেলা দিল দ্রোণকে। অঙ্ককার থাকতেই এখানে প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেলতে হয়। অদূরেই একটি খাল আছে। ডিঙি নৌকা চলে সেখানে। জলপথের পাশে ঝোপঝাড়। সেই লতাগুল্মের মধ্যে একটি আমগাছ খুঁজে পেয়েছে পাঞ্চালী। সেই গাছের দুটি মোটা ডাল খালের দিকে হেলে পড়েছে। একটি শাখা নীচে, অন্যটি সামান্য উপরে। নীচের ডালে বসলে উপরের শাখাটি বেশ আঁকড়ে ধরা যায়। আমগাছের পাতা প্রয়োজনীয় আড়াল রচনা করে। ডালে বসে, আড়ালের মধ্যে নিশ্চিন্তে খোলসা হওয়া যায়।

আর একবার নাড়া দিতেই উঠে পড়ল দ্রোণাচার্য। পাঞ্চালী বলল, আসছি। ঠিক আছে। দ্রোণ সাড়া দিল। দাওয়া থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই পুকুর। পুকুর পেরোলে বাঁশঝাড়। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। সেই পথ ধরে খালের উদ্দেশে হাঁটা লাগাল পাঞ্চালী। দ্রোণ চলে যায় খোলা মাঠের দিকে। ওর পছন্দের জায়গায়। আধঘন্টা পরে ওরা দু'জনেই চলে আসে পুকুরে। এসেই দু-তিনবার ডুব দেয়।

স্নান, কাপড় কাচা সারতে অঙ্ককার পাতলা হয়ে এল। পথে লোক বেরিয়েছে। দালাল ধরনের কেউ দ্রোণকে দেখতে পেলে সমস্যা। গাঙ্গুলি-জোতদারের কাছে খবর চলে যাবে নতুন লোক এসেছে গ্রামে। খবর যাবে পুলিশে। শুরু হবে চরদের আনাগোনা।

চলো চলো, যাওয়া যাক। তাড়া লাগাল পাঞ্চালী। হ্যাঁ, চলোঁ যাই। দ্রোণ সায় দেয়। পা চালিয়ে ওরা ঘরে ফিরে আসে।

ঘর বলতে মাটির ঘর, খড়ের চাল। যেসাঁওতাল পরিবারে দ্রোণ-পাঞ্চালী আশ্রয় নিয়েছে তাদের এই মাথা গোঁজার ঠাইটুকু ছাড়া আর এক বিঘত জমিও নেই কোথাও। পার্টির ভাষায় এরা ভূমিহীন কৃষক। এখানেই এই পরিবারে আশ্রয় নেওয়াটাই সঠিক কাজ।

পরিবারটি মহিলা প্রধান। বাড়ির মরদ বহুদিন নিরুদ্দেশ। তাঁর স্ত্রী, যাকে মা বলে ডাকে পাঞ্চালী, এই পরিবারের কর্তা। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। এই মায়ের চার মেয়ে। বড়দিকে স্বামী ত্যাগ করেছে। সে নিঃসন্তান ফিরে এসেছে মার কাছে। মেজদি বিয়ে করেনি এখনও। ছোড়দি ব্যাঙেলে খ্রীষ্টান মিশনারি স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। হস্টেলে থাকে। মিশনারিদের আনুকূল্যে তার পড়াশুনা এবং থাকা দুটোই নিখরচায়। ক'দিন পরেই ছোড়দির বিয়ে, সেজন্য বাড়ি এসেছে। ছোট মেয়েটি একেবারে বাচ্চা। সে সবার বোন।

সকাল হতেই মা আর তিন মেয়ে বেরিয়ে পড়ে। মেজদি যায় গাঙ্গুলি জোতদারে বাড়ি। চাষের কাজে। ছোড়দি-ও ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। মা আর বড়দি যায় রায়বাড়ি। ওই জোতদারের বাড়িতে ঘরের কাজ অনেক। এছাড়া তাদের গরু-মোষও দেখভাল করতে হয়। মা আর দিদিরা বেরোলেই ছোট বোনও আর ঘরে বসে থাকতে পারে না। সেও বেরিয়ে পড়ে খেলতে। দূরে চলে যায়।

স্নান করার পরেই খিদে পায় পাঞ্চালীর। ছোটবেলাকার অভ্যেস। কিন্তু এ বাড়িতে খাবার নেই। সকালে এই পরিবারের কেউই কিছু খায় না। সঙ্গতি নেই বলেই খায় না। দিন শুরু হয় উপবাস, অনশনে। দ্রোণের মতে 'উপবাস' 'অনশন' শব্দ দুটির মধ্যে একটা সান্ত্বিক ভাব আছে। তার চেয়ে, ভ্রেষ্ট অনাহার বল না বাপু। দ্রোণ হাসে। একটা লঙ্কা চিবোও। তারপর ঝাল কটাতে প্রচুর জল খাও। দেখবে পেট ভরে গেছে। পাঞ্চালী আহত

চোখে তাকালে দ্রোণ আবার হাসে। দ্যাখো আমার তো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকার অভ্যাস আছে, তোমার নেই। সেজন্যই এই বুদ্ধি বের করেছে। এবার পাঞ্চালীও হাসে।

এরা দু'জনেই অপেক্ষা করে থাকে বিকেলের জন্য। মা-মেয়েরা ঘরে ফিরলে হাঁড়িতে ভাত চালানো হয়। খুবই অল্প চাল এবং প্রচুর জল। সাতজনের মধ্যে সেই হাঁড়ির জলভাত ভাগ করা হয়। অল্প মেশানো ফ্যান খাবার শেষে ঠিক দু-মুঠো করে ভাত জোটে সবার। কোনো তরকারি নেই, শুধু দু'মুঠো ভাত। খাবার সময় প্রত্যেকটি খাদ্যকণাকে অমৃত মনে হয় পাঞ্চালীর। অমৃত মাসে একবার ব্যান্ডেলের বাড়িতে গিয়ে আলুসেদ্ধ খেয়ে আসার উচ্ছ্বাস আছে। বাড়ির বাস রুটির জন্য মন কেমন করে।

কখনও দৈনান্দিন না খেয়ে থাকায় ব্যতিক্রম ঘটে। খেলার মাঝে হঠাৎ ছুটে এসে দোণ কাঁচা পেঁপে দিয়ে যায়। ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে সেই পেঁপে খেলে মন লাগে হয়। এটি বেতলা গ্রামে বিকেলের পর দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যা নামলেই ঘরের একদিকে কুপি জ্বালিয়ে পাঞ্চালী পড়াতে বসে। মা-মেয়ে সবাইকে। মাও সে-তুঙের কথা বলে। তিনটি লেখা পড়ে শোনায়। বোকা বুড়োর কথা। গানও করে। 'চেয়ে দেখ আজ / ভারতের গ্রামে গ্রামে মুক্তির সংগ্রামে / লাখো লাখো কিশোর আসছে। / লাড় আসছে লাড় আসছে / কিশোর বিদ্রোহের ঝড় আসছে / শত বাধা দূরে ঠেলে জীর্ণকে ছুড়ে ফেলে / প্রচণ্ড ঘূর্ণি তুফান আসছে। সেজন্য কমরেডের গাওয়া গান চোখ বুজে শাশ দিয়ে গেয়ে যায় পাঞ্চালী। বোন ঘুমিয়ে কান্দে মায়ের হাই ওঠে। বড়দির চোখ বুজে আসে। মেজদি বলে, তুই বরং গান শোনা, তুই উঠতে লেগেছে, নিদ যাই। ছোড়দি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের প্রবল বিরামের পর ওরা আর জেগে থাকতে পারে না। তাতলে কাঁড়ান ওদের রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া হবে? ভেবে যায় পাঞ্চালী। ঘরের অন্য কোনোদিকে বসে দ্রোণ। লম্বা ছোলে পাটির কাগজপত্র পড়ছে। ওই দিকে চলে যায় পাঞ্চালী। দোণ বলে, কমরেড, চেষ্টা করো....চেষ্টা...লড়ে যাও....ঠিক জিতবেই একদিন। দোণ মাও সে তুঙের লেখা পড়ে শোনায়। কখনও দেশব্রতী। চারু মজুমদারের লেখা। পাঞ্চালী দ্রোণের পাশে শুয়ে পড়ে। এ বাড়িতে একটাই ঘর। সেই ঘরে পাশাপাশি শুয়ে থাকে ওরা সাতজন।

গাত ঘন হলে যার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হবে, সেই সাঁওতাল যুবকটি ঘরে ঢোকে। জোড়দিকে ডাকে। ওরা দুজনে উঠে দাঁড়ায় বসে। কখনও যুবকটি এসে ছোড়দির পাশেই শুয়ে পড়ে। নিচু স্বরে কথা বলে। মা হয়তো টের পায়, দিদিরাও বোঝে নিশ্চয়, কিছু বলে না। আসলে এরা সবাই স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ককে খুবই সাধারণ অভ্যাস হিসাবে নেয়। এ যেন ভোররাত্তে উঠে প্রাতঃকৃত্যে যাওয়া, জলপান করা কিংবা পুকুরে অবগাহন করবার মতটই দৈনান্দিন আভাবিক ঘটনা। কৌতূহল জাগাবার মত কোনো নতুনত্ব নেই এতে।

রাতে শয়নও গিদে পায় পাঞ্চালীর। বিকেলে খাওয়া দু'মুঠো ভাত কখন হজম হয়ে গেছে। ঘুম আসতে চায় না। দ্রোণকে বলেও ফেলে বাড়ির আলুসেদ্ধ ও বাসি রুটি মনে পড়ার কথা।

আর তো মাএ কয়েকটা বছর। সি এম বলেছেন উনিশশো পঁচাত্তর সালেই মুক্ত হচ্ছি আমরা। জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ আর দূরে নেই। তখন প্রাণ ভরে আলু খাওয়া

যাবে। দ্রোণ সাধুনা দেয়। — হ্যাঁ বাসি রুটিও। জুড়ে দেয় পাঞ্চালী। দ্রোণ তুরু নাচায়। — শুধু বাসি রুটি কেন? তার সঙ্গে মাখন, চিনি জুড়ে দাও। হাসতে হাসতে বলে, স্বপ্নে পোলাও রাঁধছ যখন, তেল-ঘি-মশলা কম দেবে কেন? প্রবল হাসি পায় পাঞ্চালীর। সে দ্রোণের বুকে মুখ গুঁজে হেসে ওঠে।

একটু খাবার কষ্ট ছাড়া তো আর কোনো সমস্যা নেই এই বেহুলা গ্রামে। সে আর দ্রোণ একসঙ্গে থাকতে পারছে এতটা সময়, দু'জনে পরস্পরকে আনখশির চিনেছে, তার দাম অনেক। একসঙ্গে থাকতে পারায় কত আনন্দ। দ্রোণের কানের পেছনে যে একটা লাল তিল আছে তা এখানে আসার আগে দেখেইনি পাঞ্চালী। তেমনই দ্রোণও পায়নি তার তলপেটের নিম্নভাগে বিমূর্ত ছবির মতো আঁকা বাদামি জুড়ুলের সন্ধান। কিংবা ঠোঁটের মতো তার পিঠেও যে একটা লাল আঁচিল আছে, তা এমন নিরুপদ্রবে না থাকলে জানতেই পারত না দ্রোণ। ছুঁয়ে থাকলেই কত সুখ! দ্রোণকে ছুঁলেই পাঞ্চালী এখন বুঝতে পারে ওর মন খারাপ কী না? চাপা স্বভাবের ছেলে, দুঃখ কষ্টের কথা বলতেই চায় না। পাঞ্চালীকে বুঝে নিতে হয়। প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয় সবকিছু। জেল পালাবার পর দলের সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল দ্রোণের। দলেরও যুক্তি আছে। পার্টির স্কোয়াড যে দিকে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে না গিয়ে দ্রোণ অন্য দিক দিয়ে চলে এসেছিল পাঞ্চালীর বাড়ি। নির্দিষ্ট সময়ে দ্রোণকে না পেয়ে স্কোয়াড চলে যায়। পরে খবর পেয়ে স্কোয়াডের নেতা রেগে গেলেন। দ্রোণের জন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয় ঠিক করলেন না ওঁরা। ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে বসির আলি দ্রোণকে আশ্রয় দিয়েছিল। দ্রোণ ভুল করে থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য তাকে এমন শাস্তি দেওয়াটাও বাড়াবাড়ি। অমানবিক ঠিকটে। সব মিটমাট হয়ে যাবার পর দ্রোণ জানিয়েছিল এসব কথা। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ছেলেটি সেসময় একবারের জন্যও বলেনি তার অস্বস্তির কথা। মুখ বুজে সহ্য করে গেছে অপমান এবং নিরাপত্তাহীনতা। শুধু সহ্য করাই নয়, প্রতিটি চিঠিতে লিখেছে আশার কথা, উদ্দীপনার কথা। ভাবলে অবাক লাগে পাঞ্চালীর।

এমনভাবেই কথায়-কথায় পাঞ্চালী পেয়ে যায় দক্ষিণদেশ গ্রুপের খবর। দ্রোণের মতো আরও কয়েকজন ওই পত্রিকা ছেড়ে দেবার পর তারা এক নতুন কেন্দ্র গড়েছে — মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার। সংক্ষেপে এম সি সি বলা হয় ওদের। কানাই চ্যাটার্জি আর অমূল্য সেন ওদের নেতা। পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি এলাকায় আর বিহারের কিছু অঞ্চলে তারা সক্রিয়। তেমন কিছু বাড়েনি এই সংগঠন। আগে দক্ষিণদেশ করলেও এখন আর সেই দল সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই দ্রোণের। ওই দলের হালফিলের খবর সে রাখতেও চায় না। দ্রোণ এখন মনে প্রাণে চারু মজুমদারের ভক্ত। তার একটাই কাজ — সি এম-এর কথা শুনে হুগলি জেলায় আন্দোলন গড়া।

কোনো-কোনো ভোররাতে দ্রোণ বেরিয়ে যায় পার্টির কাজে। ফিরে আসে নতুন দেশব্রতী, নতুন বই আর নতুন ভাবনা নিয়ে। দ্রোণকে কিছু অচেনা লাগে তখন। স্বর রুক্ষ লাগে, শরীরে কর্তৃত্ব জাগে তার।

একদিন ভোররাতে দ্রোণ ফিরে এল। কাঁধের ঝোলাটা ঘরের কোণে রেখেই বলল, কথা আছে। কথা মানে রাজনীতির কথা, বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঞ্চালীর। দ্রোণের

চোখ লাল। গাশ্বাট গায়ে একটুও দুয়োয়ান। কিন্তু এখন তো কথা বলা মুশকিল। মা-মোয়েরা একসাথে খারট আঙো। সে কথা ইঙ্গিতে বলল পাঞ্চালী। দ্রোণ বুঝতে পারল। কিন্তু এর খণ্ডগলভাণ কমল না।

গল খালি হওঁত পাঞ্চালীর মুখোমুখি বসে পড়ল দ্রোণ। শোনো, এখানে মেয়েদের নিয়ে একটা কোয়াড গন্যও... তাদেরকে জোতদার খতমের কথা বল... দ্রোণের চোখে মুখে উত্তেজনা। সারা রাঙো এই প্রথম মহিলাদের গেরিলা বাহিনী অ্যাকশন করবে। একটা দুস্মাং স্থাপন করব আমরা এই গুলি জেলায়....

পাঞ্চালী প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, আগে তো মেয়েদের মগো সচেতনতা আনতে হবে। তারপর যদি মনে হয় তারাই ঠিক করবে.... আমরা কেন চাপিয়ে দেব?...

দ্রোণ বিরক্ত হল। চাপিয়ে দেওয়ার কথা উঠছে কেন? চাপিয়ে দেওয়ার কথা আসে কোথেকে? শরীর ঝাঁকাল দ্রোণ। আর কী দেখে মনে হল মেয়েরা সচেতন নয়? আমি জানি, এ অঞ্চলে বেশকিছু জঙ্গী মেয়ে আছে....

পাঞ্চালী বলতে গেল, তেজি মানেই যে তার মানুষ খুনের ইচ্ছা জাগবে এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু তাকে কথা বলতে না দিয়েই দ্রোণ বলে উঠল, একটা কথা মাথায় রেখো, নিজের মধ্যবিস্তৃপ্ত আত্মরক্ষার চিন্তাওদের মধ্যে নিয়ে এসো না।

এই দ্রোণকে অচেনা লাগে পাঞ্চালীর। তার দিকে যেভাবে আঙুল তুলে কথা বলছে, গলার স্বরে যেমন নিরুত্তাপ কাঠিন্য প্রকাশ পাচ্ছে, এমনটা এর আগে কখনও ঘটেনি। নিঃশব্দে খুবই ছোট লাগছিল। তবু পাঞ্চালী বলল, তুমি তো আমার ওপরে খতমের চিন্তা জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছ...এটা তো ঠিক নয়....

আমি মোটেই চাপাচ্ছি না....পাটির লাইনটা বোঝাচ্ছি। দ্রোণের মুখ লাল হয়ে উঠছে। চোখ চঞ্চল। তোমার মধ্যে পেটি বুজোয়া মানসিকতা পুরোপুরি রয়েছে....এজন্যই তুমি পরীক্ষায় বসেছ....এজন্যই খতমের লাইনটা তুমি দিতে চাইছ না... তোমার মধ্যে রয়েছে নিজের পিঠ বাঁচানোর চিন্তা.... আত্মত্যাগ করতে তুমি ভয় পাচ্ছ। দ্রোণের প্রতিটি কথা গুলেটের মতো বিঁধছিল। পাঞ্চালী জবাব দিল না। দেখা যাক ও আরও কী বলে। এক সময়ে দ্রোণ থামল। পাঞ্চালী আর পারল না নিজেকে ধরে রাখতে। কোথা থেকে যেন চোখে জল এসে গেল। দ্রোণ এগিয়ে এসে পাঞ্চালীর পিঠে হাত রাখতে, হু হু করে আরও কান্না এসে গেল তার। গলার ভেতরে কষ্ট। কথা বলতে পারছিল না সে। কোনোরকমে বলল, তুমি এমন করে বলতে পারলে আমরা? দ্রোণ কোনো উত্তর দিল না। তার পিঠে হাত বোলাতে থাকল।

গতকের কথায় মনোমালিন্য হলেও দ্রোণের কথাটা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করল পাঞ্চালী। প্রথম কাঙ হল এলাকার মেয়ে, পাশের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা। মায়েল সঙ্গে চাটে গেল কয়েকবার। হাটে গিয়ে মা হাঁড়িয়া খায়। হা-হা করে হাসে। পাঞ্চালীও ঠাড়া। গেল। কিন্তু হাসি পেল না তার। বমি হয়ে গেল। তবু চেষ্টা চালাতে গেল। মাগল গলে দিয়েছে, নিজের শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে এদের একজন হয়ে উঠতে হবে তাকে। বিশজন দিতে চলে মধ্যবিস্তৃপ্ত মূল্যবোধ, চিন্তাধারা।

ছোড়দির বন্ধু সেজে পাঞ্চালী আশপাশের গ্রামে যাওয়া শুরু করল। আলাপ করল সে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে। রাজনীতির কথা তুলল। মেয়েরা অন্যান্য অবিচারের কথা তোলে। রেগেও যায়। শোষণ মুক্তির কথাতেও সায় দেয়। কিন্তু খতমের কথা বলে না কেউ। তবে কি দ্রোণের কথাই ঠিক! পাঞ্চালী কি অজান্তেই তাদের মধ্যে সংক্রামিত করে দিচ্ছে তার আত্মরক্ষার চিন্তা?

একদিন ছোড়দির সঙ্গে পাশের গ্রাম থেকে ফিরছিল পাঞ্চালী। মুখোমুখি পড়ে গেল গাঙ্গুলি-জোতদারের।

ছোড়দি বলল, 'মামা.....এই ভোরবেলায় কোথায় চললে গো?'

গাঙ্গুলি বলল, 'শহরে যাব রে.....'

পাঞ্চালীর দিকে তাকাল গাঙ্গুলি। লোকটি সৌম্যকান্তি। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। সাদা ধূতি পাঞ্জাবি পরেছে। হাতে একটা চটের থলে। আবার ছোড়দির দিকে তাকাল লোকটি, কিরে ভাগ্নি, এই ফর্সা মেয়েকে কোথা থেকে নিয়ে এলি? পাঞ্চালীকে বলল, কি গো মেয়ে তোমার নাম কি?

নিজের নামটা বলতে যাচ্ছিল পাঞ্চালী। কিন্তু তার আগেই ছোড়দি ঠেলা মারল। এক পা এগিয়ে বলল, এর নাম শংকরী.....আমার সঙ্গে পড়েআমাদের হস্টেলেই থাকে....

মিষ্টি করে হাসল ছোড়দি। আমার বিয়েতে এসেছে গো.....। পাঞ্চালীর উদ্দেশ্যে বলল, চল রে..... হাতের কাজগুলো সেরে ফেলি.....। মাঝে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই পাঞ্চালীকে নিয়ে চলে এল ছোড়দি। ছোড়দির মুখকে তারিফ করতেই হয়। গ্রামে যখন সে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন এখানে জাঙ্গার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ তো থাকা চাই। ছোড়দি দারুণ রাস্তা বের করেছে।

ঘটনাটা শুনেই দ্রোণ বলল, এই তো পাওয়া গেছে.....এই জোতদারটাকে খতম করো.....একটা দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে....

দেশব্রতীর সম্ভাব্য হেডলাইনটাও বলে দিল দ্রোণ। হুগলি জেলায় প্রথম মহিলা স্কোয়াড — ঘৃণ্য জোতদার খতম। খতমের ধারাবিবরণী দিতে থাকল দ্রোণ। পাঞ্চালীকে তুলনা করল বীরাস্ত্রনা প্রীতিলতার সঙ্গে। শহীদ নির্মলার কথাও বলল। এটা সত্যিই হুগলী জেলায় একটা কাণ্ড ঘটে যাবে। চারু মজুমদার নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবেন তাদের। পাঞ্চালীর মধ্যেও স্বপ্ন জেগে ওঠে। মহিলা স্কোয়াডটি গড়ে তুলবে সে। রাজ্যের প্রথম মহিলা স্কোয়াড।

অ্যাকশনের পরিকল্পনা করতে থাকে পাঞ্চালী। ক'জন থাকবে স্কোয়াডে? স্কোয়াড লিডার কে হবে? একজন দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে করা দরকার। এ বাড়ির মেজদি খুবই তেজি। ওকে লিডার করলে মন্দ হয় না। লিডারের পরামর্শ অনুযায়ী বেছে নিতে হবে স্কোয়াডের অন্য সদস্যদের। তারপর ঠিক করতে হবে অ্যানিহিলেশনের সময়। অনেক কাজ। উত্তেজনায় রাতে ঘুম এল না পাঞ্চালীর। পরদিন দ্রোণের কাছে পাটির কয়েকজন এল। পাঞ্চালী ভালো করে খেয়াল করল ওদের আলোচনা। দ্রোণ কীভাবে নিজের যুক্তিগুলো সাজাচ্ছে, কেমনভাবে অন্যদের নিজের দিকে নিয়ে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। এই কৌশলটাই প্রয়োগ করা দরকার। এই বাড়ি থেকেই শুরু হতে পারে প্রথম মহিলা

স্কোয়াড। স্কোয়াডে পায় কৃপা জ্বালিয়ে পড়াতে বসল পাঞ্চালী। চাক্ষু মজুমদারের লেখা থেকে পড়ে শোনাল। খতমের কথা বলা দরকার। নতুন গান শোনাল সে। সুখবর শুনিলাম গাথা জ্যোতদার মরিল নাকি। গেরিলা কিষাণের ঘায়ে জ্যোতদার মরিল নাকি, / চাপিয়া মোদের পরাণ ছিল জগদল পাষণ / কিষাণের এক ঘায়ে সে পাষণভার সরিল নাকি।.....

মেজদিকে আলাদা করে বোঝায় পাঞ্চালী। জ্যোতদার খতমেই মুক্তি। এলাকায় স্থাপন করতে হবে লাগ রাজত্ব। তবেই সব শোষণের অবসান। মেজদি সায় দেয়। পরপর কয়েকদিন মেজদিকে গুলিয়ে চলে পাঞ্চালী।

একদিন দ্রোণ ভোরবেলায় বের হল। রাস্তিরে ফিরবে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও স্কোয়াডে পায় কৃপা জ্বালায় পাঞ্চালী। গান শোনায়। গেরিলা কিষাণের গান। গানের শেষে আলোচনা শুরু হয়। দ্রোণ ফিরলে মনে হয় খতমের সিদ্ধান্ত শোনানো যাবে। মেজদি বলে, জ্যোতদারকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি আমরাই.... শহরের মানুষ বেঁচে আছে আমাদের জন্য অথচ আমাদের কপালে জ্যোটে উপোস আর অপমান....। পাঞ্চালী বলে, ঠিক কথা। মেজদি একদম ঠিকঠাক শুরু করেছে। মেজদি বলে যায়। এ সবার জন্য দায়ী যারা তাদের হঠাতে না পারলে আমাদের মুক্তি নেই। বড়দি বলে, কিন্তু হঠাবি কীভাবে?

মেরে। মেজদির গলা কঠিন শোনায়। দ্রোণের স্বরের সঙ্গে যেন মিল পাওয়া যায়। বড়দি চমকে ওঠে। সে কীরে। কাকে মারবি?

গাঙ্গুলি জ্যোতদারকে। শ্রেণীশত্রুর নাম ঘোষণা করে মেজদি। বড়দি বিস্মিত। কাকে মারবি! মামাকে? মামাকে মারতে পারবি তুই? মেজদি চুপ করে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই পাঞ্চালীর। গাঙ্গুলি তো গ্রাম থেকেই মামা। সেই সম্পর্কের ওপরে কি উঠতে পারবে না মেজদি?

মেজদি বলে, এটা তো ঠিক, গাঙ্গুলি জ্যোতদার মাঝে মধ্যেই খুব অত্যাচার চালায়... এ গ্রামের বেশিরভাগ চাষির জমি ওই লোকটা বেনামে হাত করেছে এটাও তো ঠিক?

বড়দি চুপ করে যায়। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। উৎসাহ পেয়ে মেজদি বলে, এই যে আমরা না খেয়ে থাকি, কত দুঃখ কষ্ট সব তো ওর জন্য... এটা তো মিথ্যে নয়? ছোড়দি কথা বলে এইবার। মামাকে মেরে ফেললে মামার ছেলে নেই? সে তো তখন জমিজমার মালিক হবে আর সেই নতুন মালিককে মারলেও কি আমাদের দুর্দশা ঘুচবে? মনে হয় না....

ছোড়দির গলা কঠিন হয়। শোন মেজদি তোর দুঃখ-কষ্টের কারণ তুই নিজেই বুঝবি, তা অন্য কেউই তোকে পড়াশুনো করিয়ে বোঝাতে পারে না....

কথাটা যে পাঞ্চালীকে উদ্দেশ্য করে বলা, বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঞ্চালীর লজ্জা লাগে। ছোড়দি বলে, যারা এসব শেখাচ্ছে তারা তো অ্যাকশনের পরেই অন্য জায়গায় লালায়ে... পুলিশ এসে তো ধরবে আমাদেরই.... পারবি সেই ঝড়-ঝপটা সামলাতে? ঘরের লব্ধি চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ছোড়দি একটু কাশে। পাঞ্চালীর দিকে তাকায়। আমি জানি তুমি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছ.... কিন্তু তুমি তো জানো কয়েকদিন পরেই আমার বিয়ে আকশন বলে কি বিয়েটা হবে? কেন সেটা বন্ধ করতে চাইছ?

পাঞ্চালী চুপ করে কোণা উত্তর দিতে পারে না এ কথার। ছোড়দি বলে, একটা কথা

বলি শোনো..... তোমাদের এই অ্যাকশনে কৃষকদের আরও ক্ষতিই হবেতাদের ওপর আক্রমণ আরও বাড়বে।

আক্রমণ বাড়তে পারে.... প্রতি-আক্রমণ আমরাও বাড়াব। যুক্তি দেবার চেষ্টা করে পাঞ্চালী। ছোড়দি হাসে। এই অবস্থায় কী করে বাড়াবে পাল্টা আক্রমণ? আমাদের যখন মারবে পুলিশ, তখন কারা এগিয়ে আসবে আমাদের সাহায্যে বল? তোমাদের কী কোনো বাহিনী আছে? আমাদের অন্য জায়গায় রাখার ব্যবস্থা আছে? দ্রোণ শিখিয়েছিল, একটা অ্যাকশন হলেই কৃষকরা নিজেই সংগঠিত হয়ে যাবে। অ্যাকশনটা বারুদের স্থূপে দেশলাই জ্বালার কাজ করবে। তেমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না ছোড়দির কথায়। তবে কি পাঞ্চালী ঠিকমতো বোঝাতে পারছে না ওদের?

ছোড়দি বলে, দেখো আমরা মেয়েরা হঠাৎ করে শুধু, শুধু কারওকে মারতে পারি না....

পাঞ্চালী বলে, শুধু শুধু বলছো কেন? লোকটা তো শোষক?

একথার কোনো উত্তর দেয় না ছোড়দি। সে পাঞ্চালীর দিকে তাকায়।

আচ্ছা মেয়ে, তুমি সত্যি করে বলতো..... বুকে হাত দিয়ে বল তুমি নিজে কি ওই গাঙ্গুলিকে মারতে পারবে?

পাঞ্চালী স্তব্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে কিছুতেই 'কুঁ' শব্দটি বেরায় না।

রাত হলে দ্রোণ ফেরে। কুপি জ্বলিয়ে চিঠি লেখে। পার্টির কোনো কমরেডকে লিখছে নিশ্চয়ই। দ্রোণের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে পাঞ্চালী। ঘুম আসে না।

রাত ঘন হলে ছোড়দির প্রেমিক আবেশে ছোড়দির পাশে শুয়ে পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস পতনের শব্দে পাঞ্চালী সেদিকে তাকায়। আজ ছেলেটি কিঞ্চিৎ বেপরোয়া। ছোড়দিও। দুটি উন্মুক্ত শরীর ক্রীড়ায় মেতে ওঠে। কুপির আলোয় দুটি নগ্ন শরীরের ওঠাপড়ার ছায়া পড়ে মাটির দেওয়ালে। ওধার থেকে ভেসে আসে ছোড়দির চাপা শীৎকার। দ্রোণ চিঠি শেষ করে বই নিয়ে বসেছিল। একবার সেদিকে তাকিয়ে বই পড়ায় মন দেয়। পাঞ্চালীর শরীর আনন্দান করে। দ্রোণ কি একবার তার কাছে আসতে পারে না? এই বসন্তোৎসবে তারও যে শরীর জেগে উঠেছে। দ্রোণ বোঝে না সে কথা?

অবশেষে দ্রোণ তাকায়। এগিয়ে আসে। পাঞ্চালী উন্মুখ। উঠে এসে দু'হাতে দ্রোণের কাঁধ শক্ত করে ধরে। দ্রোণ মৃদু হাসে। তারপর পাঞ্চালীকে শুটয়ে দেয়। মাথায় হাত বুলায়। শোনো, একটা দারুণ লেখা, শোনো। দ্রোণ পড়ে শোনায়। 'আমাদের পার্টি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে খতম অভিযান শুরু করেছে তাকে আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান পথে। ছাড়িয়ে দিতে হবে সেই খতম অভিযান প্রতিটি রাজ্যে, সাগর ভাঙতবধি। স্বাধীনতায় দারিদ্র্য ভূমিহীন কৃষক রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠবে, বিকাশ পাবে তার সৃজনী ক্ষমতা গোরালা যুদ্ধের মাধ্যমে। আজকের অসাধ্য কাল সাধ্যায়ও হয়ে আসবে।' দ্রোণ মুখ তুলে বলে, সি এম-এর লেখা। পার্টের কোনো কথা মাথায় ঢোকে না পাঞ্চালীর। দ্রোণ পড়ে যায়। 'নতুন এক মানুষ সৃষ্টি হবে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যে মৃত্যুকে ভয় করে না, ভয় করে না আত্মত্যাগ, কঠিনতম পরিশ্রমে। সে মানুষের সামনে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ খেঁকি কুকুরের

মতো লেজ শুটিয়ে পালাতে বাধ্য। সারা পৃথিবীর মানুষ এদের তখন রাস্তার ইদুরের মতো গাড়া করে খতম করবে, কবর রচিত হবে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার, প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন পৃথিবী।

পাখালীর ভেতরটা জুরে পুড়ে যায়। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে উন্মুখ শরীরে অপেক্ষা করছে তার প্রেমিকের জন্য। সে আসুক। আর কিছু না হোক অন্তত একটা ট্রা চুমু উপহার দিক তাকে। কিন্তু সে আসে না। একাগ্রচিত্তে পড়ে যায় বিপ্লবের ধারাপাত। ঐশ্বর্য কি এমন হৃদয়হীন! ব্রহ্মার্চ্য যাপন! নাকি মানবিক সম্পর্কের কোনো জায়গা নেই যুদ্ধায়েগে সেই ভাষা? পাখালীর শরীর শক্ত হয়ে ওঠে।



আ-আ-আ.....আহ মাগো। পাশের ঘর থেকে যুবাকঠের আর্তনাদ ভেসে আসতে কনকেন্দুর কাজে ছেদ পড়ল। ঘরে বসে স্পষ্ট শোনা গেল পায়ের তলায় লাঠির বাড়ি পড়বার ক্ষীণ অথচ মর্মস্পর্শী ফটফট আওয়াজ। শুরু হয়ে গেছে বড়বাবুর হাতের কাজ। কচুয়া ধোলাই। পাশের ঘরে না গিয়েও ও ঘরের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কনকেন্দু। ছেলেটির পায়ের গোড়ালি দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। বাঁধা হচ্ছে কজি দুটি। তাকে মাটিতে বসিয়ে দু'হাতের ফাঁকে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে জোড়া হাঁটু। হাঁটুর তলায় দেখা দিয়েছে ত্রিভুজের মতো ফাঁক। ত্রিভুজটির ভূমি হল ছেলেটির হাত আর অন্যদুটি ভুজ ছেলেটির পা। সেই ত্রিভুজের মধ্য দিয়ে ঢুকে গেছে লোহার রড। ছেলেটিকে ধরাধরি করে তুলে রডের প্রান্ত দুটিকে রাখা হয়েছে পশ্চিমপাশি দুই টেবিলের ওপর। এবার ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেই, তার মাথা চলে যায় নীচে, পা-জোড়া ওপরে। দ্রুত নিম্নাসের রক্ত পৌঁছে যায় উর্ধ্বাঙ্গে। বিশেষত মাথায়। একবার, দু'বার দোল খাওয়ানোর পর ছেলেটির পায়ের পাতার ওপর পড়তে শুরু করেছে লাঠির বাড়ি। বল্ বল্ তাদের নিরুপম চ্যাটার্জি কোথায়। বড়বাবুর গলা। প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না। চারটে ছেলের মধ্যে যাকে বড়বাবু বুলিয়েছেন, কিছুক্ষণ আগেই তাকে, তাদের দলটিকে দেখে এসেছে কনকেন্দু। ওর চোখের প্রান্ত লাল। হাত পায়ের গড়ন সুখম। দেহে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে। স্বর সুগভীর। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী, এও নিরুপমের মতো, শৈল্পিক প্রকৃতির। এরা বন্ধুত্ব রাখতে জানে। খুবই চাপা স্বভাবের। সহজে মুখ খোলে না। বরং বাকি তিনটিকে নাড়াচাড়া করলে ফল মিলতে পারে। কারণ এদের একটি বায়ু প্রকৃতির। এরা সব কাজে অধৈর্য। অসংলগ্ন কথা বলে। দ্বিতীয়টি বাত-পিস্ত প্রকৃতির। বায়ু আর পিস্ত প্রকৃতির স্বভাব মেশানো। এরা সাহসী কিন্তু আবার বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে থাকে। শক্তের ভক্ত নরমের যম। তৃতীয় ছেলেটিকে আগে দেখেছে কনকেন্দু। বড়বাবুর কাছে মাঝে মধ্যে আসে। ও ব্যাটা এই দলে কেন? কনকেন্দু বুঝতে পারেনি। এ ছেলেটির কপালটা যেন আঠা দিয়ে মাথার সঙ্গে জোড়া হয়েছে। কপালের গড়ন একরকমের, মাথা অন্যরকম। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী একে দ্বিমস্তক বলা হয়। এমন মাথাওয়ালারা ভীষণ কুটিল ধরনের।

যে কোনো নোংরা কাজে এদের জুড়ি নেই।

কীরে বলবি না, নিরুপম কোথায়? আবার বড়বাবুর গলা শোনা গেল। বলবি? না যেখান থেকে বেরিয়েছিলি সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে আসব? কোনো উত্তর এল না এবারও। কিছু বলবি না তো? ...তবে খা....। আবার লাঠির বাড়ি শুরু হল। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে মিশে আছে চাপা আক্রোশ। কনকেন্দুর গা শিরশির করে উঠল। গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করলেও সে এখনও এইসব মারামারি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। বড়বাবু তাকে অনেকবার পীড়ন-প্রক্রিয়ায় সঙ্গী করতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন কচুয়া ধোলাই, বিদ্যুতের শক দেবার পদ্ধতি। কিছুটা দেখবার পরই কনকেন্দুর গা গুলিয়ে উঠেছে। কাজের ছুতো করে সরে পড়েছে সে। বড়বাবু অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু হাল ছাড়েননি। ছুতায়-নাতায় ঠিক ডেকে নেন কনকেন্দুকে। বলেন, আরে তুমি কি মাদী পুলিশ নাকি? মন শক্ত করো। রাফ অ্যান্ড টাফ না হলে এখানে টিকতে পারবে না।

ডেপুটি কমিশনারের কানে গেছে সব কথা। তিনি কনকেন্দুকে দিয়েছেন অন্য একটি কাজ — ক্যালকাটা পুলিশ গেজেট বের করার দায়িত্ব। এই দৈনিক পত্রে পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় খবর থাকে। থাকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপের খবর। সমস্ত বিভাগের সঙ্গে কথা বলে খবর জোগাড় করা, তারপর তা ছপতে পাঠানো। বেশ ঝঞ্ঝির কাজ, কিন্তু কনকেন্দুর ভালো লাগে। পুলিশ গেজেটের সুবাদে অন্যান্য বিভাগের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। যদিও পুলিশের নিজস্ব ছাপাখানাতেই কাজ চলে, তবু দৈনিক গেজেটটি হাতে পেতে পেতে সন্তোষ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয় শহরের সব থানায়। নিয়ম হল, প্রতিটি পুলিশ কর্মচারী এই কাগজ পড়বেন। যে ইংরেজি বোঝে না তাকেও তার ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিতে হবে গেজেটের প্রতিটি খবর, প্রতিটি নির্দেশ। নতুন কমিশনার আসবার পর নির্দেশাবলির সংখ্যাও বেড়ে গেছে। নতুন সাহেব নকশালদের বিরুদ্ধে পুলিশকে তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নকশালদের হাতে পুলিশ খতম হলে মৃতের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ অনুদান — সাব ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা। কনস্টেবল হলে পাঁচ হাজার। কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশ এসেছে, পুলিশ কোনো অ্যাসোসিয়েশনে নাম লেখাতে পারবে না। যদি কেউ কোনো সংগঠনে যোগ দিতে ইচ্ছুক হন, তাকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এইসব কিছু ছাপা হয়েছে পুলিশ গেজেটে। পূজোর বাজার করার সময় এবং পরিবারের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় কর্মীদের সাপধান হতে অনুরোধ জানিয়েছেন কমিশনার সাহেব। ঠিক সময়ে দ্রুত প্রুফ দেখে পুলিশ গেজেটে তা ছাপার ব্যবস্থা করেছিল কনকেন্দু। আবার এক সাবধানবাণী এসেছে। এগারো দফা নির্দেশিকা! ইংরেজির প্রুফ সংশোধন হয়ে গেছে। এবার বাংলা অনুবাদ নিয়ে পড়ল কনকেন্দু। ‘কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের আদেশ।’ তারিখ ২০ অক্টোবর, ১৯৭০। মন দিয়ে লেখাটি পড়া দরকার। ‘ইহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে গত কয়েকমাসে কলিকাতা পুলিশ বাহিনীভুক্ত আমাদের কয়েকজন সহকর্মী কর্তব্যরত অবস্থায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তব্যরত না থাকার সময় প্রাণ হারাইয়াছেন। পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং জীবনের যে সমস্ত অবস্থাকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব সেই সকল অবস্থা এড়াইয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি সময় সময় আমার অফিসার এবং বাহিনীর লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং যাহারা নিজেদের নকশাল নামে পরিচয় দেয় এরূপ

এক শ্রেণীর লোক ও তাহাদের সহিত যুক্ত সমাজবিরোধী এবং দুষ্কৃতিকারীদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের মানসিক এবং শারীরিক তৎপরতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আমি বিশেষভাবে বলিয়াছি।' কনকেন্দু থমকে গেল। 'দুষ্কৃতিকারীদের' শব্দটা তো ভুল — 'দুষ্কৃতিদের' লিখলেই তো হয়। কিন্তু অনুবাদটি হয়ে এসেছে বড়সাহেবের দপ্তর থেকে। তা হলেও, একবার অভিধান দেখে নিয়ে শব্দটিকে শুদ্ধ করল কনকেন্দু। তারপর পনেরে লাইনে চলে গেল।

'কর্ণিকাতা পুলিশবাহিনীভূক্ত সকল পুলিশ কর্মীদেরও ইহা জ্ঞাত থাকা দরকার যে— শ্রেণীশূন্য রূপে লোককে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করিয়া অতিশয় বর্বরোচিত রাজনৈতিক পন্থায় তাঁহাদের খতম করিয়া ফেলাই ঐ শ্রেণীর লোকদের ঘোষিত নীতি। পুলিশ ইহাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামই জীবনের ধর্ম। অন্যায়কে আমাদের বিদূরিত করিতে হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এখন কথা হইল আমরা আজকের দিনে ইহা কিভাবে করিতে পারি? আমরা সকলেই সশস্ত্র নই এবং কর্তব্যরত না থাকার সময় আমরা সঙ্গে অস্ত্র লইয়াও চলি না।

পুলিশগাভীরীভূক্ত সকল লোকের বিবেচনার এবং মনিয়া চলার জন্য আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখিতেছি :—

১। যে সমস্ত অফিসার অন্যান্য অফিসার এবং পুলিশ কর্মীদের কোন কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করেন তাঁহারা কোন স্থানেই দুইজনের কম লোককে পাঠাইবেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন সশস্ত্র থাকিবেন।

২। যে সকল অফিসার এবং পুলিশ কর্মীকে স্থানীয় হটতে অনেক দূরে থাকে তাহাদের আক্রমণের কর্মস্থল হইতে এমন সময়ে ছাড়িয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সক্ষম পূর্বেই তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইতে পারেন। যদি তাঁহাদের রাতে কোন ডিউটি থাকে তাহা হইলে এমন সময়ে তাঁহারা বাড়ীর বাহির হইবেন যাহাতে সক্ষম আগেই ইউনিটে আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন। ইহার ফলে কাহাকেও যদি ডিউটি হইতে দুই ঘণ্টা আগে ছাড়িয়া দিতে হয় কিংবা ডিউটির নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা আগে হাজির হইতে হয় তাহা হইলে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় তজ্জন্য কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না।

৩। কর্তব্যরত না থাকার সময় বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলে, প্রত্যেকে অন্ততপক্ষে একটা 'লাঠি' বা 'ছোরা' জাতীয় কোন প্রকারের অস্ত্র সঙ্গে রাখিবেন। আত্মরক্ষার নিমিত্ত এরূপ অস্ত্র বহন করা অপরাধ নহে।

৪। বাড়ীতে অফিসার এবং পুলিশ কর্মীরা সর্বদাই হাতের কাছে অস্ত্র প্রস্তুত রাখিবেন যাহাতে আক্রান্ত হইলে তাঁহারা আক্রমণকারীদের পাল্টা আক্রমণ করিতে পারেন। এই ব্যাপারে — পুলিশ অফিসারের গৃহ নিরাপদ — এরূপ আত্মসমুষ্টির মনোভাব পরিহার করিতে হইবে।

৫। যদি বাজার করিতে বা অনুরূপ অন্য কোন কাজ করিতে তাঁহারা বাহিরে যান তবে তাঁহারা একা যাইবেন না এবং খালি হাতেও যাইবেন না। কোন বন্ধু কিংবা সহকর্মীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং কাহাকেও যদি না পাওয়া যায়, তবে তাঁহার ব্যক্তি পুত্রকে লইয়া যাইবেন। তাঁহাদের একথা জানা উচিত যে দুই চোখ অপেক্ষা চার

চোখ বা ততোধিক চোখে অনেক বেশী জিনিষ নজরে পড়ে।

৬। কর্তব্যরত না থাকার সময় সন্ধ্যার পর যতটা সম্ভব চলাফেরা বন্ধ করা উচিত। ইহা আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে যে পুলিশ-ইউনিট হইতে সাদা পোষাকে বাহির হইয়া যাইবার সময় ইউনিটের পঞ্চাশ গজের মধ্যে জনৈক পুলিশকে আক্রমণ করা হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে যেহেতু তিনি সতর্ক ছিলেন সেজন্য তিনি আক্রমণকারীদের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৭। সিনেমা, থিয়েটার বা এ ধরণের কোন অনুষ্ঠানে — যেখানে অফিসার এবং পুলিশ কর্মীদের বেশ কিছু সময় কাটাইতে হয় তাঁহাদের সেরূপ অনুষ্ঠান পরিহার করিয়া চলা উচিত। এই ব্যাপারে যদি পরিবারের লোকেরা পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে বর্তমানের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁহাদের এই সাধারণ শখ হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের জন্য নিজেদের উপর আরোপিত এই বাধা-নিষেধগুলি মানিয়া চলিতে হইবে।

৮। তাঁহাদের পরিবারের লোকেরা — বিশেষ করিয়া শিশুরা তাহাদের পিতার পেশা সম্পর্কে যেন কোন কথাবার্তা না বলে। তাহারা পুলিশের কাজের সঙ্গে জড়িত নহে এবং তাহারা যাহাতে সেরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয়, এখন হইতে তাহাদিগকে সেভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় অসতর্কভাবে তাহারাও তাহাদের পিতার অথবা ভ্রাতার কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীর বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

৯। “আমি ইহা করিলে কিছুই হইবে না” এমন মনোভাব কেহ যেন গ্রহণ না করেন। তাহারা অতি অবশ্যই মনে রাখিবেন যে — সর্বকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকাই হইতেছে আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

১০। আমাদের অফিসার এবং কর্মীদের ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, কোন একজন অফিসার বা কর্মীর জীবনহানি কেবল তাঁহার পরিবার অথবা তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষেই নহে — ইহা নানা দিক দিয়া সমগ্র পুলিশ বাহিনীর পক্ষেও এক বিরাট ক্ষতি।

১১। আমরা সকলেই যেন সাবধান ও সতর্ক থাকি এবং দীর, সুস্থির, অণুগোষ্ঠিত, বিচক্ষণ এবং কৌশলী — শুধু নিজেদেরই আত্মরক্ষার জন্য নহে, পরন্তু যে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা বিধান করিতে আমরা প্রতিশ্রুতিপন্ন, তাঁহাদের রক্ষার জন্য আমাদের সমাজবিরোধী এবং নকশালদের মোকাবিলা করিতে হইবে। এই নির্দেশগুলি স্বাভাবিক নির্দেশ নহে। কিন্তু আমি চাই যে, সকলে উপলব্ধি করুন যে আমরা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি এবং সেইজন্যই অসাধারণ এবং দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করুন যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, ডি ডি, এস বি, থানা এবং ট্রাফিক বিভাগ হইতে প্রতিনিয়ত আঘাত হানিতেছে এবং এই আঘাতের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।’

এই অংশের পাঠ শেষ করে মনে হল কিছু একটা ছাড় গেছে। ইংরেজি লেখার শেষটা একবার দেখে নিল কনকেন্দু। যা ভেবেছিল তাই। ইংরেজিতে লেখার শেষে বন্ধনীভুক্ত দুটি লাইন ছিল, বাংলা অনুবাদে তা ভুলক্রমে বাদ পড়েছে। কনকেন্দু জুড়ে দিল — ‘সকল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনুগ্রহপূর্বক পরবর্তী ৭ দিন নাম ডাকার সময় এই

নির্দেশণাল পাঠ করানেন এবং অফিসার ও পুলিশ কর্মীদের বুঝাইয়া দিবেন।' বড়সাহেবের দপ্তরে ফোন করে জানিয়ে দিল একথা।

কাজ শেষে, এক গ্লাস জল খেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল কনকেন্দু। কদিনে সময় কিরকম পাশ্টে গেল। এক বছর আগেও এমন অবস্থা ছিল না। ছ'মাস আগেও না। এখন পরিস্থিতি ঘোরালো। নকশালরা পুলিশ খতমের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। পুলিশ তত্তা এবং রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া। অথবা বোমা ছুঁড়ে পুলিশের দলকে বেসামান্য করে দিয়ে বন্দুক-রাইফেল ছিনিয়ে পালাচ্ছে ওরা। শহরে যুদ্ধের পরিবেশ। প্রায় প্রত্যেকদিনই একজন দু'জন পুলিশের ওপর আক্রমণের খবর আসে। আক্রমণ করতে গিয়ে মারা যাচ্ছে নকশাল ছেলেরাও। তবু যুদ্ধে বিরতি নেই। কারণ ওদের সি এম বলেছেন, বিপ্লব সামনেই। ছেলেরাও ক্রমাগত তাতিয়ে চলেছেন নেতারা। দেশব্রতীতে শশাঙ্ক লিখেছেন, মেয়ের বাপ পুলিশকে জামাই করতে নারাজ। পাকা বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে!

এটাঠিক, অকস্মাৎ এমন মরিয়া হামলার মুখে পুলিশ বাহিনী কিছুটা হতচকিত। নিচুতলার অধিকাংশ কর্মী ত্রস্ত। কিন্তু তাই বলে পুলিশ হেরে যাবে নাকি! কেন যে এইভাবে পুলিশ মেরে চলেছে ওরা। এইভাবে কি বিপ্লব হবে? কনকেন্দু ভেবে পায় না। অবশ্য, তিন-চারটে ভালো কাজ করেছে নকশালরা। ওদের ভয়ে বড় বড় ডাক্তারদের ফি কমে গেছে। তারা এখন রোগীদের সঙ্গে চট করে খারাপ ব্যবহার করে না। সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় মাঙানি-মাতলামি বন্ধ। অনেকগুলি দেশি মদের ঠেক বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার চ্যাংড়ারা কোনো মেয়ের দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দেবার আশেপাশে দু'বার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে — কোনো নকশাল নেই তো? আর এক মজার ব্যাপার, পাড়ায় কাবুলিওয়ালাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু ওদের যুক্তিহীন খুনের ফলে চাপা পড়ে যাচ্ছে এইসব ভালো কাজ। এখন পুলিশের ওপরে অনেক ক্ষমতা। নকশাল দমন বিভাগ খুলেছে পুলিশ। ইচ্ছে হলেই ধরপাকড় করা, কাউকে নকশাল সন্দেহ হলেই তাকে লকআপে ভরে ঠ্যাঙানি দেওয়া এখন জলভাত। কলকাতায় এখনও অবধি একহাজার আটচল্লিশজন-কে নকশাল সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিকানা জেপা থেকে মোট দু'হাজার ন'শোজন। যারা বেশ কিছুদিন ধরে জ্বালাচ্ছে এমন নকশাল দল পড়লে, জেলখানায় ভরবার ঝামেলায় আর যাচ্ছে না কেউ কেউ। পরে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের। কর্মীদের মনোবল বাড়াতে পুলিশের অন্দরমহলে স্লোগান তোলা হয়েছে খুন কা বদলা খুন। গুলি চালালে তদন্ত হবে না। ওপরওলার আশ্বাস পেয়ে গেছে কর্মীরা। যে ছেলেটিকে সিনেমা-হল ভাঙচুরের অভিযোগে আগে একবার পরে আনা হয়েছিল সেই নিকপম চ্যাটার্জি এখন মধ্য কলকাতার নামী নকশাল। এই কদিন আগেও কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গলে নিরুপমের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত কনকেন্দুর। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতো, কি রে তাদের বিপ্লব কেমন চলছে? নিরুপম হাসতো। বলতো, একেবারে সুপারনৈতিক স্টাইল। এই তো আগামী পাঁচাত্তর সালে দেশ মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনাকে আমরা জেলে ভরবে। কনকেন্দু মজার মুখ করে তাকাতো। দেখিস বাবা, মারখোর করবি না তো। এলাক ভঙ্গীতে হেসে উঠতো নিরুপম। শৈল্পিক প্রকৃতির ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে সুখ পাওয়া যায়।

বেশ কয়েক মাস কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যাওয়া হয়নি। একদিন কফি হাউসে গিয়ে, খোঁজ করে জানা গেল, নিরুপম আর আসে না। কেউই সঠিক খবর দিতে পারলো না। পরে, কানাঘুষোয় শোনা গেল সে ছেলে এখন তালেবর। সাব ইন্সপেক্টর রবি সেনশর্মা হত্যায় সন্দেহভাজনদের তালিকায় ওর নাম উঠেছে।

বড়বাবুর হাসির আওয়াজে সম্বিং ফিরল কনকেন্দুর। কাজের খেয়ালে পাশের খরের কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। হঠাৎ হাসির কী হল? দেখা দরকার।

বড়বাবুর ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল কনকেন্দু। যাকে ঝোলানা হয়েছিল সে ছেলেটি নেই। বায়ু, আর বাত-পিস্ত প্রকৃতির ছেলেদুটিকে ঘরে আনা হয়েছে। এবং ওরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এ ঘরে এমন ঘটনা যে এর আগে ঘটেনি, তা নয়। তবু নগ্নতার একটা প্রাথমিক ধাক্কা আছে। বড়বাবু কনকেন্দুর দিকে তাকালেন। আরে। এই যে বাবু...এসো এসো...দেখে যাও কী সাইজ।

উলঙ্গ ছেলেদুটির দিকে ফিরে বললেন, কী রে, সাত ইঞ্চি না আট ইঞ্চি? বায়ু প্রকৃতির ছেলেটি মাথা নিচু করে রইল। তার সঙ্গীটিও একবার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল। ওদের ঠিক উল্টোদিকে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছেন বড়বাবু। টেবিলের বাতিটি নেভানো। ছাদ থেকে ঝোলানো আলো জ্বলছে। সিংিং ফ্যানটিও ঘুরছে নিয়মমতো। এ পাখা গ্রীষ্ম-শীত সব ঋতুতেই ঘোরে। বড়বাবু হুইলিং গ্লাস তুলে নিলেন। এমন বেটপ লম্বা মোটা কাঁচের গ্লাস পুলিশ-দপ্তর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটি টেবিলের ওপর রাখলেন বড়বাবু। ঠক করে আওয়াজ হল। আরে এতে লজ্জা পাবার কী হল? আমাদের সবার হেঁটুই যন্ত্রটি আছে। কী বল? কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে সমর্থন খুঁজলেন সাহেব।

এই কে আছিস.... একটা স্কেল নিয়ে আয়। আওয়াজ দিতেই এক কনস্টেবল কাঠের স্কেল নিয়ে ছুটে এল। বায়ু প্রকৃতির ছেলেটির সঙ্গীকে লক্ষ্য করে হাঁক পাড়লেন বড়বাবু। এই....এই তুই মেপে বল, কত সাইজ। তারপরে ও তোরটা মাপবে।

কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করতেই সে সঙ্গীটির হাতে স্কেল ধরিয়ে দিল। নে মাপ এইবার....মাপ। ছেলেটি ইতস্তত করছিল। বড়বাবু গর্জে উঠলেন। বাধোওনিরুপম চ্যাটার্জির খবর রাখিস না তোরা, ঠিক আছে.... মাপতেও জানিস না শুয়োরের বাচ্চা.... মাপ। ছেলেটি স্কেল হাতে এগিয়ে গেল। মাপ নিতে শুরু করল।

আরে এ তো ছোট হয়ে গেছেলম্বা কর লম্বা কর। বড়বাবু নির্দেশ দিতে থাকলেন। জানিস কী করে করতে হয়? না রামলখন দেখিয়ে দেবে? পেছনে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে একবার দেখে নিল বাত-পিস্ত প্রকৃতির ছেলেটি। তারপর, টোকা দিতে শুরু করল তার সঙ্গীর পুরুষাঙ্গে।

বাঃ শুড....এই তো এই তো। বড়বাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন। কদিন আগেও এমন কাণ্ডে বিবমিষা আসত কনকেন্দুর। কিন্তু আজ, অবাক কাণ্ড, তার গোপন অঙ্গ টিও শক্ত হয়ে উঠেছে।

ছেলে দুটিকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করবার পর লকআপে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দ্বিমস্তক ছেলেটিকে ডাকা হল এবার।

জেলটি বেঁচে যাচ্ছে। এত বেশ ময়লা। কৃতকৃতে চোখ। চামড়া খসখসে। খড়ি ওঠা।
 বদ বদ। বড়বাবুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসল ছেলেটি। বড়বাবুর ঘর ছাড়াও একে অন্য
 কোণায় দেখেছে কনকেন্দু। হঠাৎ মনে পড়ল, এর নাম কাতু। নামকরা সাটোবাজ।
 লেগুতলার পেলিলার। মাস ছয়েক আগে একটা মারামারির ঘটনায় ধরা হয়েছিল
 জেলটাকে। এই এক নতুন জুয়া চালু হয়েছে শহরে—সাটো। অলিগলিতে ছেয়ে গেছে
 পেলিলার। পেলিলারের ওপরে সাব-বুকি। তার ওপরে বুকি। যারা জুয়া খেলে তারা
 পাটো। জুয়াটি আসলে খেলা হয় বোম্বোনে। তিনটি তাস টানা হয় সেখানে। তাস তিনটির
 নম্বরকে বলে পাটো। তাদের যোগফল — ফিগার। পাটো আর ফিগারের সংখ্যাটি অনুমান
 করে বাকি মনে পাটোয়। টাকা নিয়ে পেলিলার লিখে নেয় তাদের অনুমান। যেরকম
 খুশি টাকা লাগানো যায়। এক টাকা থেকে শুরু। দশ, পঞ্চাশ, একশো, তিনশো। তিনরকমের
 বাকি হয়। সিস্টল ডিজিট, ডাবল ডিজিট, ট্রিপল ডিজিট। জিতলে এক ঝটকায় টাকা
 হয়ে যায় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, তিনশো গুণ এমনকী ছাঁশো গুণ। খেলা হয় দু'বার। প্রথম
 খেলার ফল বের হয় সঙ্গে সাড়ে সাতটা-আটটায়। অন্যটি সাড়ে নটা-দশটায়। দেওয়া
 বোম্বোনের ওপর বা স্লেটের ওপর চকখড়ি দিয়ে লেখা হয় ফলাফল। সাটোর নেশায় মজে
 গেছে শহরের নিম্নবিত্ত মানুষ। কিন্তু এইরকম একটা বদ জুয়া-ব্যবসায়ী, সেও নকশাল
 পাটোতে ঢুকে পড়েছে।

বড়বাবু বললেন, কী হল? আসল মালটাই তো হাওয়া.....

ষমতক বলল, না না ও এসেছিল সিনেমার দেখতে কিন্তু হাফটাইমের একটু আগেই
 উঠল ওসি করতে.... বোধহয় টের পেয়েছে কেটে পড়েছে....

বড়বাবু উঠে পাঠাচার করতে শুরু করলেন। কী করে টের পেল? ... কী করে?....
 টুকরো আলোচনা করে কনকেন্দু গুলি গেল পুরো ব্যাপারটা। এই ব্যাটা বড়বাবুর সোর্স।
 পাটোতে আছে কিন্তু দলের কেউ ওর এ পরিচয় জানে না। আজ নিরুপমকে নিয়ে ওরা
 মোটা চানজনে সিনেমা দেখতে এসেছিল। ওর মাধ্যমে অগ্রিম খবর পেয়েছে গোয়েন্দা
 বিভাগ। সিনেমার বেরাতির সময় ওদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবার পরিকল্পনা ছিল পুলিশের।
 কিন্তু তার একটু আগেই নিরুপম বেরিয়ে বাথরুমে যায় এবং সম্ভবত সাদা পোশাকের
 পুলিশের কাউকে চিনতে পেরে পালিয়েছে।

ঠাৎ বড়বাবু রেগে গেলেন। তুই একটা গাভু.....একটা কাজও ভালো করে করতে
 পারিস না। এসে থাকা ছেলেটির তলপেটে সঙ্গে লেগে লাথি কষালেন। চেয়ার উল্টে ছেলেটি
 মাটিতে পড়ল। কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করতেই ওরা লাঠিপেটা করতে শুরু করল। ছেলেটি
 পারাটো চিবকার জুড়ে দিল। বড়বাবু হাত তুলতে লাঠিবৃষ্টি থামল। মাটিতে পড়ে রইল
 জেলটি। কিছুক্ষণ পর দু'জন কনস্টেবলের কাঁধে ভর দিয়ে ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল।
 একে লাঠাটো হল লকআপে।

ওরা ঘর থেকে বেরোতেই কনকেন্দু বলল, আরে, ওকে মারলেন কেন? ওতো
 আমাদের উপকার করার চেষ্টা করছে....নিরুপম পালানোয় তো ওর হাত নেই....

বড়বাবু হাসলেন। তুমি একটি পিওর গণেশ-মার্কী বোকাচোদা.....। বড়বাবু বোঝালেন।
 জেলটিকে না পেটালে ওর সঙ্গীরা ওকে সন্দেহ করবে। এখন ডান্ডা খাবার পর ওর

বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে কোনো সংশয় থাকবে না কারুর।

কনকেন্দু চূপ করে গেল। ক'পয়সা পাওয়া যায় এই চরবৃত্তি করে? তার জন্য এত কষ্ট সহ্য করতে হয়! বড়বাবু যেন ওর মনের কথা পড়তে পারলেন। ও জেলে থাকার সময় ওর বাড়ির দেখভাল আমরাই করি। বিনা পয়সায় এত সার্ভিস কেউ দেয় না কি। সন্ধ্যাবেলা হলেই বড়বাবুর ফুটি বাড়ে। রাস্তির গড়ালে ক্রমশ চড়ে যায় ফুটির মেজাজ। তখন উনি শিকারে বের হন। বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে হানা দেন নকশালদের ডেরায়। কখনও জালে মাছ ওঠে, কখনও পিছলে যায়।

বড়বাবুর প্রাণে ফুটি এলেই কনকেন্দুর ডাক পড়ে — এসো ভায়া দেখে যাও। আগে, জরুরি কাজের দোহাই পেড়ে এড়িয়ে যেত কনকেন্দু। ইদানীং মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে ফেলে।

এক সন্ধ্যায় বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়ল। ঠিক সন্ধ্যা বলা যাবে না, রাত দশটা বেজে গেছে। মাসের শেষ সপ্তাহ। হাতে প্রচুর কাজ। এসময় অন্যান্য কিছুর সঙ্গে নিহত পুলিশ সংক্রান্ত তদন্তের অগ্রগতির বিবরণী লিখতে হয় পুলিশ গেজেটে। কনকেন্দু লিখছিল। সাব-ইন্সপেক্টর প্রশান্ত সেন নিয়োগী হত্যা। সেকশন এস, কেস নম্বর নব্বই। আটজন গ্রেপ্তার পাঁচজন পলাতক। সাব-ইন্সপেক্টর অমিতাভ সিংহ রায় মার্ডার কেস। সেকশন আই, কেস নম্বর তিনশো উনিশ। চারজন গ্রেপ্তার, তিনজন ফেরার। কনস্টেবল রণজিত রায় মার্ডার। সেকশন জে, কেস নম্বর তিনশো একষট্টি। চারজন গ্রেপ্তার। একজন আবাসকভিৎ.....। আটটা লেখা হয়েছে, এখনও পাঁচটা কেস বাকি।

বড়বাবু নিজে ফোন করলেন। চেয়ার থেকে পাছটা তোলো শিগগির.....। হ্যাঁ যাই। লেখা অসমাপ্ত রেখে কনকেন্দু দ্রুত ছুটল। রেডি হও.....কুইক, কুইক.....বেরোতে হবে.....সার্ভিস রিভলবার সঙ্গে রেখে। বড়বাবুর গলা বেশ গম্ভীর। কনকেন্দু বুঝে গেল, শিকারে যেতে হবে।

সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলেন বড়সাহেব। পেছনে কনকেন্দু এবং আরো তিনজন বন্দুকধারী। জিপ ছুটে চলল। ইদানীং রাস্তির কলকাতার রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। শ্যামলাভাপ পৌঁছতে লাগল মাত্র দশ মিনিট। বিটি রোড ধরে গাড়ি ছুটপ উঠে। ডানদিক প্রিজ পার হতেই দেখা গেল কালো পুলিশ ভ্যান। কাপো গাড়ি পেরিয়ে জিপ দাঁড়িয়ে গেল। ভ্যান থেকে সাব ইন্সপেক্টর ছুটে এলেন। মুহূর্তে ঠিক হয়ে গেল, প্রথম বাঁদিকের গলি দিয়ে ঢুকবে জিপ। দ্বিতীয় রাস্তায় ঢুকবে ভ্যান। সমান্তরাল রাস্তা দুটি কিছুদূর গিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে এক জায়গায় মিলেছে। সেখানেই টাগেটি।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে দেরি হল না। একেবারে মাখনের মতো মসৃণ ঘাটে গেল সবকিছু। বিনা ঝামেলায় পাওয়া গেল এগারো জনকে। সব ক'টাকে তোলা হল কালো গাড়িতে। এবার জিপকে অনুসরণ করবে ভ্যান। বড়বাবু ব্যারাকপুরের দিকে গাড়ি চালাতে বললেন। চলো একটু হাওয়া খেয়ে আসি....পবিত্র হাওয়া।

ব্যারাকপুরে গঙ্গার ঘাটে বসা হল। নাও হে, দু-টোক খেয়ে নাও। বড়বাবু বোতল বাড়িয়ে দিলেন কনকেন্দুর দিকে। আজ একেবারে জ্যাকপট মেরেছি আমরা। এই সব ক'টা মাল একেবারে রাখব বোয়াল। জেলা, শহরতলি কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছিল। এইবার

বাজমানদের খেল খাওয়া। নাথ.....এই অনারে দু-টোক মেরে দাও আজ। বড়বাবুর কথায় হুকুমের আদায় কেটে গেল কনকেন্দু। বোতল থেকে এক ঢোক হইস্কি খেয়ে নিল। তারপরে আবার এক ঢোক। এড়ানু বললেন, ওড বয়। একটু আস্তে আস্তে খাও, জমবে ভালো। ঝিনা নিজেও দু তিন ঢোক খেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরও দু-টোক পান করল কনকেন্দু। গঙ্গার হাওয়ায় মন্দ লাগছিল না। শরীর হালকা লাগছে। কাজকর্মের ক্লাস্তি উঠাও। কাজের উৎসাহ যেন বেড়ে গেছে। বড়বাবু হাসছিলেন। বাঃ বাঃ তুমি তো ভালোই বাটি করো.... একেবারে ছুপা রক্তম.....হা হা.....। কালো গাড়ির সাব-ইন্সপেক্টরটিও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাকেও অফার করলেন বড়বাবু। লোকটি কিন্তু কিন্তু করছিল। বড়বাবু খুশি দমক লাগালেন। আরে লজ্জা পাবার কী আছে? এত বড় কাজ করলে, এখন ওদের লকআপে চালান করবার আগে একটু ফুর্তি করো।

বোতল শেষ করতে মধ্যরাত হয়ে গেল। হঠাৎ বড়বাবু গভীর হয়ে গেলেন। চলো যাওয়া যাক। জিপ চলতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল ভ্যান। বড়বাবু চুপচাপ। মিনিটে প্রায় চল্লিশটি করে শব্দ নিঃসরণ করে যে মানুষ, হইস্কি খেলে যা ষাট ছড়িয়ে যায়, সেই লোক একটা কথাও বলছে না। অবাক লাগল কনকেন্দু।

মানুষের গাড়ি থামিয়ে সাব ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন। ছেলেগুলোর হাত-পা শক্ত করে বাঁধা, যেন না পালায়। ওদের হাত-পা বাঁধা, তবু আবাক সব পরীক্ষা করল সাব-ইন্সপেক্টর। সব ঠিক আছে স্যার। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি দুটি। অফিসের পথে না ফিরে, জিপ চলল অন্য রাস্তায়। বোধহয় নতুন কোর্টে খেয়াল চেপেছে বড়বাবুর। গঙ্গার হাওয়া আবার পর মাথা খুলে গেছে।

বাসাসতের ঠাট্টায়ের খলন এসে... গাড়ি থামল। একেবারে শুনশান রাস্তা। চারপাশে বিশেষ দৃশ্যকণ্ড। রাস্তায় একটা গুপ্তচরও নেই। দূরে কোনো ট্রাকও চোখে পড়ে না।

এড়ানু দলদল নক্ষীদেব বললেন, খুন কা বদলা খুন। খতম করো শালাদের। রক্ষীরা তুমি জামল করতে শিখোছে। পুলিশ বাহিনীর নিয়মই এরকম। উর্ধ্বতনের আদেশ বিনা গাকারায় মানা করে অধস্তনের।

ওত পা বাঁধা ছেলেগুলিকে একটি একটি করে নামানো হল বড় রাস্তায়। বড়বাবু খালতকণ্ঠে চিৎকার করলেন, ফায়ার, ফায়ার.....শুট দেম। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল। গুম, গুম.....ওডুম। ছেলেগুলির একজন স্লোগান দিল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। অন্যজন বলল, চান মওয়াদার লাল সেলাম। কেউ বলে উঠল মা...মা...মাগো। তারপর সব নিশ্চুপ। তেমনিই তাকি কুয়াশায় ঢেকে গেল জাতীয় সড়ক।

এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি কনকেন্দু। ওর হাত পা ঠান্ডা। হৃৎপিণ্ডও বোধহয় দাঁড়ল হয়ে লাগড়ন করতে ডুলে গেছে। তলপেটে অস্বস্তি। গা গুলিয়ে উঠল তার। জিপের পাশে দাঁড়িয়েই গাড়ি কাঁপিয়ে উঠে এল বমনের বেগ। বড়বাবু কাঁধে হাত রাখলেন। কনকেন্দু খাড়া দাঁড়িয়ে দেখল, ওর হাতে বোতল। এক ঢোক মেরে দাও, শরীরে বল পাবে। কিছু না বুঝেই আগার খেয়ে নিল কনকেন্দু। জিপে উঠে বসে পড়ল। বারাসতের কমিল লরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বেলঘাটায়। বেলঘাটার পর দমদমে। পরের দু'দার আর বমি পেল না কনকেন্দু।



সুকান্তি চুপচাপ বসেছিলেন। ভেতরে ভেতরে নিরুপমের সঙ্গে চাপানউতোর চলছিল। মূর্তিভাঙা নিয়ে কিছুটা নরম হলেও, পুলিশ খতমের প্রসঙ্গে ও একবর্গা। সুকান্তির কোনো কথা শুনবেই না। — না সুকান্তিদা, আপনার কথা ঠিক নয়। পুলিশ মারতেই হবে। কমরেড সি এম বলেছেন, বীর শহীদদের হত্যার বদলা নি। ওরা সুশাস্তকে মেরেছে, আমরা বদলা নেবই। এদের শেষ না করলে ভারতবর্ষের মুক্তি নেই। সুকান্তি বললেন, এ অসম যুদ্ধ। এই মুহূর্তে শহরে এমনটা করা অর্থহীন। এতে আমাদের ক্ষতি বেশি। সুকান্তি আরও বলতে যাচ্ছিলেন, নিরুপম থামিয়ে দিল। আপনি সংশোধনবাদীদের মতো কথা বলছেন। সি এম বলেছেন, এটা আত্মবলিদানের যুগ।

নিরুপমের কথার তোড়ে সুকান্তি চুপ করে গেলেন। এ ছেলেকে তিনি বড় হতে দেখলেন। সে আজ তাকে সংশোধনবাদী বলছে। একটু অভিমানও হল। নিরুপম তো জানে, উনি পার্টিকে কতভাবে সাহায্য করেন। এ বাড়িতে অন্তত তিনজন বিশিষ্ট নেতা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে থেকে যান। পার্টি থেকে তাঁকে রুলা হয়েছে নিজের রাজনৈতিক মতামত আশপাশের লোকের থেকে গোপন রাখতে। অন্যথায়, এই শেলটার পুলিশের নজরে পড়ে যাবে। সুকান্তি সেই নির্দেশ অনুসরণ করে আসছেন হুহু। এখনও কোনো বিপদ ঘটেনি। নিরুপমকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে এখন। তার শুকনো মুখ দেখে মায়া হয়। ওর নিরাপদ আশ্রয় দরকার। সেজন্যই কয়েকদিন ওকে নিজের কাছে রেখেছিলেন সুকান্তি। তা, সেই ছেলে চলে যাবার মুখে তাকে এমন বলল। মতের অমিল হলেই তাকে ফট করে সংশোধনবাদী বলে গাল পাড়তে হবে।

নিরুপমের কথার কোনো উত্তর দিলেন না সুকান্তি। শুধু বললেন, সাবধানে যেও। যদিও এ বাড়ির ওপর পুলিশের নজর পড়েনি এখনও, তবু সতর্ক থাকারি ভালো। দুপুর গড়ালে বেরোনোই ভালো। নিরুপম বলল, সেটরকমই ভেবেছি। বেরোবার আগে চোখাটা পাল্টে ফেলল নিরুপম। চোখে চলমা, চুল উল্টে আঁচড়ানো। সাদা ট্রাউজার, নীল শার্ট। চকচকে জুতো। সব মিলিয়ে ওকে সত্যিই চোখান উপায় নেই।

নিরুপম চলে যাবার পর থেকে, বরং সপ্তেই কথা বলে চলেছেন সুকান্তি। নিরুপমের যুগ্মের উত্তরে পাণ্টা যুগ্ম দিচ্ছেন। ওর শাসনের বিপরীতে নিজের ধারণা।

রেবা এসে চা দিল। দুধ, চিনি ছাড়া কালো চা। টেবিলের ওপর মোমবাতি রাখল।

— সেই বিকেল থেকে যায় এসে আছ, আজ হাঁটতে বের হবে না?

রেবার দিকে তাকালেন সুকান্তি। অশ্রুটপ্পনে বললেন, হ্যাঁ। রেবা চলে গেল। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আগার সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই ঝুলবারান্দায় বসে নিচের চলমান জীবনকে দেখা যায়। 'আপাতত রাত্রায় আলো নেই। বাড়িগুলি সব অন্ধকার। শুরু হয়ে গেছে লোডশেডিং। শুধু ডাক্তারি হাসপাতালের আলো জ্বলছে। লোডশেডিং

ওলেও কার্দন আগে পর্যন্ত স্কট লেনের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলত। ওদের সঙ্গে হাসপাতালের লাইনের সংযোগ ছিল। কিন্তু আমহাস্ট স্ট্রিটের বাসিন্দারা অনুযোগ করায় ওদের লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ওদের দাবি, বিদ্যুৎ না থাকলে সবাইকে সমানভাবে ভোগতে হবে। কী অপূর্ব যুক্তি বিচ্ছিন্নতাকামীদের। আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি না কেন, তা নিয়ে ট শব্দ নেই, ওরা পাচ্ছে কেন তা নিয়ে বাগাড়স্বর! এইসব ক্ষুদ্রতা দেখলে মনখারাপ লাগে। একা লাগে। টেবিলের মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেন সুকান্তি। সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গইলেন।

সব কিরকম বদলে যাচ্ছে। যা ভাণ্ডা গিয়েছিল, মিলছে না। নিচুতলায় কোনো আলোচনা জড়ায় না। পাটি ওয়াং পাস্টা পাস্টাতে আগ্রস্ত করল। প্রকাশ্য আন্দোলন নয়, গণসংগঠন নয়, চক্রান্তমূলকভাবে গোরলা ক্ষোয়াড বানাও, তারপর খতম শুরু করো। তাহলেই মানুষ জেগে উঠবে। এনার মতো দখল করে নেবে জনপদ গ্রাম। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে বিপ্লব ঘটে যাবে।

দলের বিচ্যুতি দেখে কষ্ট হয় সুকান্তির। আরম্ভটা তো ভালো হয়েছিল। বলা হয়েছিল সমাজের অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে অসমানভাবে। এক এক রাজ্য একেকরকমের। দেশের মুক্তির জন্য চাই দীর্ঘ লড়াই। যা দীর্ঘ ধরে চালাতে হবে। এখন হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো কেন? দেশের চরিত্র তো গুণগতভাবে তেমন বদলায়নি।

কয়েকজন অধ্যাপক বন্ধুও সুকান্তির সঙ্গে একমত। ওরা চারজন মিলে লিখে ফেললেন একটি নিবন্ধ। তা জাপানো হল। পকেটসাইজের পুস্তিকাটি ছড়িয়ে দেওয়া হল কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রায় উঠক। আলোচনা হল নেতাদের মধ্যে। কিন্তু আলোচনা হবার আগেই দেশব্রতীরা জাপা হয়ে গেল। পিয়ারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে বিপ্লব সফল করা যায় না। এ লেখায় আক্রমণ করা হল পুস্তিকাটিকে। সমালোচনার নাম করে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নার্কি আনখাস জড়ানোর চেষ্টা করেছে পুস্তিকাটি। সব কিছুকে সন্দেহ করতে লেখাচ্ছে। এ হল ঠোঁটলাগের দল, ফ্যাসিস্টদের কায়দা। দেশব্রতীর লেখাটি বিচ্ছিন্ন। শুধু লোটারের মতো ব্যক্তিগত ছিলেন বলেই নার্কি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব সফল করতে পেরেছে। চিনের বিপ্লবও সফল হয়েছে মাও-এর মতো মানুষের নেতৃত্ব দেবার ফলে। আমাদের দেশও নকশালবাড়ির পন্থন থেকে পার্টি গড়ে তোলার মধ্যে চার মজুমদারের সক্ষম, সফল নেতৃত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। অতএব আজকের কাজ কমরেড চার মজুমদারের নেতৃত্বের কর্তৃত্বকে দৃঢ়ভাবে পার্টির মধ্যে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করা।... লেখার শেষে নিবন্ধকার আওয়াজ তুলেছেন — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ, ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াওকে মানতে হবে। মান্য করতে হবে নির্ভুল চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে, তাদের মহান সর্গহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষাকে। আর দেশের ক্ষেত্রে মানতে হবে চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারা, লিন পিয়াওয়ের জনযুদ্ধের তত্ত্ব এবং পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে চার মজুমদারের বিপ্লবী কর্তৃত্বকে।

এসব কী অদ্ভুত কথাবার্তা। মার্কস-এঙ্গেলস এমন বলেননি। মার্কসকে প্রশংসা করে, মেনসভিৎসন থেকে বড় চিঠি এসেছে। এঙ্গেলসও পেয়েছেন বড় প্রশস্তি। কিন্তু ওরা দু'জনেই পজাপ ছিলেন, মেন এটগুলি প্রচারিত না হয়। দু'জনেই একমত — তাঁদের ঘিরে যেন ভক্ত

সমাজ গড়ে না ওঠে। আর মাও সে-তুঙ? রেডবুক পড়লেই জানা যায় ওঁর স্পষ্ট মত — ব্যক্তি সংগঠনের অধীন। সংখ্যাগুরু সংখ্যাগুরু অধীন, নীচের স্তর উপরের স্তরের অধীন। আর সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন। মাও আরও বলেছেন, পার্টির কাজকর্ম যাতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কৃষ্টিগত হয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করা পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এই কথাগুলি তো নিবন্ধকারের না জানার কথা নয়। তবু এমন মার্কসবিরোধী মাওবিরোধী কথা দেশব্রতীতে লেখা হল কীভাবে! চার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন সুকান্তি। ইদানীং বেলগাছিয়া ট্রামডিপোর বিপরীতে এক সরকারি আবাসনের একতলায় বন্ধু সলিলের ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে আছেন সি এম। কিন্তু দেখা হলেও নিভূতে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। ওঁকে এখন সবসময় ঘিরে আছে এমন কিছু নেতা যাদের ভেদ করে তার প্রিয় চন্দ্রদার কাছে পৌঁছানো শক্ত।

সেদিনও বিষণ্ণ লেগেছিল। মনটা দমে থাকলে বাড়ির বারান্দায় চূপচাপ বসে থাকেন সুকান্তি। অন্ধকারে বিমর্ষতা বাড়ে। সামনে দিয়ে ঘটনাস্রোত বয়ে যায়। সেদিকে মন থাকে না। নিঃশব্দে চা-পান চলে। নীরব চিন্তার মধ্যে তিন-চার ঘণ্টা সময় দ্রুত চলে যায়।

রেবা আবার এল। আবার চা দিল এককাপ।

— অমন জড়ভরতের মতো বসে বসে কী করছ বল তো? চা খেয়ে ঘুরে এসো রাস্তায়.....।

কোনও উত্তর দেন না সুকান্তি। মন নিরুদ্বেজ থাকলে কোনো অন্যুযোগেই তাপ উত্তাপ হয় না। আগে যখন বাড়িতে ফিরতে রাত হত, তখনও রেবা রাগারাগি করত এ তো বাড়ি নয় হোটেল.... কোনো দায়দায়িহ নেই....এলাম, খেলাম, বেরিয়ে গেলাম। যত দায় আমার....। এখন বাড়িতে চূপচাপ বসে থাকলেও রেবা রেগে ওঠে। আগে, রেগে উঠলেও, তবে মনে হয়, ব্যস্ততা দিয়ে রেবার প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল, নিশ্চিন্ততা ছিল। তাকে কাজের লোক মনে করত। এখন এই চূপচাপ বসে থাকায় বোধহয় ওর উদ্বেগ বাড়ে। ক্রোধে মিশে থাকে দুশ্চিন্তা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ ফিরে এল। আলো জ্বললেই সম্মেলক আ-হা চিংকার শোনা যায়। হর্ষধ্বনি। চেয়ার থেকে উঠে, পাঞ্জাবি গলিয়ে রাস্তায় বেরোলেন সুকান্তি।

প্রতি সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হন সুকান্তি। একা হাঁটতে ভালোই লাগে। কখনও রাস্তার চায়ের দোকান থেকে আড্ডার মন্তব্য উড়ে আসে। তেমন আকর্ষক লাগলে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা খান। কান থাকে আড্ডার আলোচনার দিকে। এভাবে সাধারণের মন বোঝা যায়। কখনও বিবেকানন্দ রোডগামী থ্রি-বি বাসেও উঠে পড়েন। উদ্দেশ্য উড়ো মন্তব্য শোনা। মানিকতলায় নেমে আবার ফেরত পথে হাঁটা লাগান। একা হাঁটার মজা আছে। পা-দুটি নিজস্ব নিয়মে চলতে থাকে। মন চলে তার খেয়ালে।

যন্ত্রের মতো হাঁটতে থাকলেন সুকান্তি। হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে অভ্যাসবশত দু-দিক দেখে নিয়ে রাস্তা পেরোলেন। সেন্টপলস্ কলেজের ফুটপাথ ধরে উত্তরে চললেন তিনি।

কেন এমন করছে পার্টি? হঠাৎ ঘোষণা করল পয়লা মে থেকে রেডিও লিবারেশন চালু হবে। প্রথম দিকে পিকিং-রেডিও থেকে পার্টির কাজকর্মের খবর প্রচারিত হত। ইদানীং

আর ওয়া না। দলের নিজস্ব রোডও স্টেশন থাকলে তো খুব ভালো। লড়াইয়ের খবর লাগামা গানে। সমর্থকদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! শহরের বেশ কিছু পাড়ায় মাইক্রোফোন লাগানো হল। রোডওতে লিবারেশন কেন্দ্র ধরা গেলেই সবাইকে তা শোনানো যাবে। অনেক রাতের অবশিষ্টাংশ পরেও ধরা গেল না রেডিও লিবারেশন। সুকান্তি খোজ নিয়ে জানলেন, রেডিও সম্প্রচার ব্যবস্থা শেষ অবধি করা যায়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেশব্রতী লিখে দিল চালু হয়েছে রেডিও লিবারেশন। কী মিথ্যাচার!

অবশ্য এই সব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়নি যে তা নয়। এলাকার ইউনিটগুলিতে প্রশ্ন উঠেছে। জগাবে এলাকা হয়েছে, বাজারি কাগজও মিথ্যাচার করে, আমরাও বিপ্লবী উত্তেজনা বজায় রাখতে এমন করছি। কিন্তু ঠান্ডা মাথার বিচারে এইসব অজুহাত টেকে না।

সি এম এর কর্তৃত্বের প্রয়োগ বিরুদ্ধমত উঠেছে পার্টি কংগ্রেসে। গার্ডেনরিচে রেলকলোনির এক বাড়িতে হয়েছিল পার্টি কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন সেই আলোচনার সভায়। চারু মজুমদারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা উঠতে, তার বিরোধিতা করেছেন বিহারের সত্যনারায়ণ সিং। সত্যনারায়ণকে সমর্থন করেছেন এ রাজ্যের সুশীতল রায়চৌধুরী। সি এম-এর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

পার্টি কংগ্রেসের কয়েকমাসের মধ্যে দলের কাজকর্ম নিয়ে সত্যনারায়ণ লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, শহর এবং গ্রামের কাজকর্মের ধরন আলাদা হওয়া উচিত। শহরে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে যেতে হবে দলকে। ধনী কৃষক বিপ্লবের বন্ধু না শত্রু, এই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েও তাঁর অভিমত অন্যরকম। তবে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, দলে দাসসুলভ বশ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কোনো প্রথা ভাঙা চারু মজুমদারের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে তার অঙ্গ অঙ্গুগামীরা।

সত্যনারায়ণের অভিযোগের কিছু পরেই জানা গেল, সুশীতলবাবুও একটি লেখার মাধ্যমে তুলেছেন অভিযোগ। তিনি আপত্তি করেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, এইসব মনীষীদের মূর্তিভাঙায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে ল্যাবরেটরি ভাঙার, নথিপত্র পোড়ানোর বিরুদ্ধেও বললেন তিনি। তিনি নিবন্ধটি লিখেছেন পূর্ণ ছদ্মনামে। এজন্যই ওই লেখার নাম হয়ে গেল পূর্ণর দলিল।

দুটি লেখার বিরুদ্ধেই কলম ধরেছেন চারু মজুমদার। তিনি দলের বর্তমান কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছেন। কর্তৃত্বের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন ‘এ জঘন্য’ বলে। তবে সুশীতলবাবুর বিরুদ্ধে লেখার সময় তাঁর লেখনী কিঞ্চিৎ নরম। মূর্তিভাঙা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ সমর্থন করেও তিনি বলেছেন, পার্টির নীতিকে বাস্তবে যখন রূপ দেওয়া হয় তখন বহু বিষয় চোখের সামনে আসে যেগুলো হয়তো তত্ত্বগত আলোচনার সময় নজরে পড়ে না। এইসব মতবিরোধের ওপর রাজনৈতিক আলোচনা করলে দলের সভ্যদের রাজনৈতিক জ্ঞান গভীর থেকে গভীরতর হয়। কোনটি সঠিক, কোনটি ভেটিক তার নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সত্যনারায়ণের অভিযোগ নিয়ে কথাবার্তা চললেও তার সমর্থনে তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু সুশীতলবাবুর বক্তব্যের মধ্যে অনেকেই তাদের মনের কথা খুঁজে পেল।

সুকাণ্ডি পেলেন। কিন্তু সি এম সহনশীলতা দেখালেও তাঁর অনুগামীরা সুশীতলকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না। সুশীতলকে বলা হল সংশোধনবাদী। তাঁকে যারা সমর্থন করেছে তারাও বিপ্লবের পথে বিচ্যুতি আনছে। দেশব্রতীর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে তাঁর নাম কাগজে ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। সুকাণ্ডি খবর পেলেন মাসোহারা বাবদ যে সামান্য দু'শো টাকা তাঁকে দেওয়া হত, সেও বন্ধ হয়ে গেছে। তবু সুশীতল নিজের কথা ফিরিয়ে নেননি। পার্টির পথের পাশাপাশি নিজের সমালোচনাও তুলে ধরেছেন। এমন করতে বুকের পাটা লাগে। স্বয়ং মাও সে-তুঙ এমনভাবে সত্যি বলতে উৎসাহিত করেছেন সভ্যদের— যা বলার আছে মুক্তকণ্ঠে বল। সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত হতে, কাজ থেকে ছাঁটাই হতে, পার্টি থেকে বহিস্কৃত হতে, স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে, রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হতে অথবা ফাঁসির কাঠে ঝুলতে ভয় পেয়ো না। কোনো কিছুকেই ভয় করো না।

সুশীতলবাবু মাওয়ের কথা মেনেছেন। নিজের অপমানের কথা না ভেবে ঠিক সময়ে সতর্ক করেছেন দলকে। ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সুকাণ্ডি। শহরের খতম নিয়েও কথা হয়েছে ওঁর সঙ্গে।

সুশীতলবাবুর কথাগুলিও নিরুপমকে বোঝাতে চেয়েছিলেন সুকাণ্ডি। নিরুপম বলল, এইসব মনীষীরা ইংরেজ তাদানোর কথা বলেনি, এঁদের প্রচার করা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করতেই আমরা স্কুল কলেজে অ্যাকশন করছি। চারু মজুমদারের লেখা কথাগুলি, শশাঙ্কের উদ্ভেজনাভাব কথাগুলিই আবৃত্তি করে গেল নিরুপম। সুকাণ্ডি মন দিয়ে শুনলেন সব কথা। তারপর বললেন, দেখ বাপু স্কুল কলেজে অ্যাকশন মানে তো কিছু মূর্তিভাঙা, বাড়ির মাথায় পতাকা তোলা, চেয়ার টেবিল ল্যাবরেটরি ভাঙা, রেকর্ডস পোড়ানো আর পরীক্ষা ভাঙলএই তো?

নিরুপম মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

এমন অ্যাকশন কিন্তু রুশ বিপ্লবে হয়নি, চীন বিপ্লবেও নয়.....

একটু থেমে সুকাণ্ডি বললেন, বহুকাল আগে ইউরোপের কোনো কোনো জায়গায় শ্রমিকরা কারখানা ভাঙার অভিযান চালাত, তার নাম ছিল লুডাইট আন্দোলন। মার্কসবাদ চলে আসার পর এমনটা হয়নি।

তবে কি আপনি বলতে চান বিপ্লবীযুদ্ধ চলার সময়ে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা যাবে না? নিরুপম উত্তেজিত।

আমি তা বলিনি। সুকাণ্ডি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন। ঝড়ের সময় অনেক কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে ভাঙা পড়ে। ধরা যাক কোনো স্কুলে পড়াশুনা বন্ধ করে তাকে মিলিটারি ছাউনি বানানো হয়েছে। তখন বিপ্লবীরা আক্রমণ করলে তা ধূলিসাৎ হবে, কারণ তখন সেটি আর স্কুল নেই। তার চরিত্র পাল্টে গেছে।

সুকাণ্ডি আরও উদাহরণ দিলেন। গণ বিক্ষোভের সময় লোকে কোনো ব্যক্তির কুশপুতুল পোড়ায় অথবা কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচার অফিস যে ভাঙচুর হয় তা জনতার ক্রোধের প্রকাশ। বিক্ষোভের সময় এক-আধবার ঘটে। কিন্তু এই কাণ্ড কখনও কোনো পার্টির কর্মসূচি হয়ে উঠতে পারে না।

নিরুপম পাল্টা যুক্তি দিল — ধ্বংস ছাড়া গঠন সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে তুচ্ছ কথা। মৃদু হাসলেন সুকান্তি। ঠিকই বলেছেন তিনি। কিন্তু এই ক্ষণে মাঝে পুরনো গানছান ডাবমূর্তি ধ্বংস। নতুন চিন্তা এনে পুরনো অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কারগত প্রশাসন খটানো। এর মানে এই নয় ডিনামাইট দিয়ে ইউনিভার্সিটি উড়িয়ে দেওয়া। সুকান্তি বললেন। পুরনো ব্যবস্থা তার কলেবর বাড়ানোর জন্য কারখানা, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা প্রযুক্তি, ভবন, রেললাইন, সেতু বানায়। বিপ্লবের কালে এইসব ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে নাকি?

নিকপম বলল, সি এম বলেছেন ছাত্ররা বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ঘৃণায় এসব করছে। সুকান্তি উঠে চোখে তাকালেন। অন্য কারুর কথা না শুনে তুমি নিজের বুক হাত দিয়ে নিজেকে জিগোস করো, তোমার কি নিজের স্কুলের ওপর ঘৃণা আছে? নিকপম চুপ করে গেল। তারপরেই কথা উঠল শহরের খতম নিয়ে। সুকান্তি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। শহরে বিপ্লবী পার্টির কাজ প্রসঙ্গে মাও বলেছেন, এখানে দলের প্রলতারিয়ান ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত রকমের ন্যায়সঙ্গত, পার্টির পক্ষে সুবিধাজনক গণআন্দোলনগুলি করতে হবে। সংযতভাবে এইসব আন্দোলন চালিয়ে, শক্তি সঞ্চয় করে অপেক্ষা করতে হবে।

সুকান্তি বললেন, এই কথা মেনে শহরে শ্রমিকদের নিয়ে গণআন্দোলন করে, তাদের সংগঠিত করতে পারতাম আমরা। এদের মধ্যে এগিয়ে থাকা শ্রমিকদের পাঠানো যেত গ্রামে। গাভে দীর্ঘকাল কাজ চালানো যায়, বাছাই শ্রমিক কর্মীদের নিয়ে গোপন সংগঠন গড়া যেত। আমাদের শেলটারের সংখ্যাও বাড়ত যেত।

নিকপম অর্পিত হয়ে উঠল। সুকান্তি দেখেও দেখলেন না। ছেলটাকে বোঝানো দরকার। কিন্তু আমরা নী করলাম? এটা ধারণা ছড়ানো হল, আমাদের আর চিনের মত দীর্ঘকাল পরোক্ষভাবে অপেক্ষার দরকার নেই। এখানেও আমাদের লাল সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে। এক ভয়ে গেল স্কুল কলেজে পুড়াইটদের মত কাজ, শ্রেণীশত্রু খতম। খতমের তালিকা পালিশ তো আছেই তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে অন্যান্যরাও। কারণ তারা পুলিশের চর....

নিকপম ফেটে পড়লো। এতো এস আর সি মানে সুশীতল রায়চৌধুরীর লাইন। এস আর সি এখন পুরোপুরি সংশোধনবাদী। আপনিও ওর মতোই পাল্টে গেছেন। সুকান্তি হতভম্ব হয়ে গেলেন।

অনেকটা হাঁটার পরেও মনের ভার কমলো না। আর হাঁটার ইচ্ছে করছে না। রাতও হয়েছে। সুকান্তি বাড়ি ফিরে এলেন।

পারদীন সকাল থেকেই নিজস্ব নিয়মে ফিরে গেলেন সুকান্তি। খবরের কাগজ, পড়াশুনো, কলেজ। বিকেলে গোপন মিটিং সেরে বাড়ি ফেরা। চা-বিস্কুট খেয়ে হাঁটতে বেরনো। রাস্তায় ঠিটান একটা মাদকতা আছে। সন্ধ্যাবেলায় নেশা চাপে। সন্ধ্যাবেলায় দেশব্রতীর সংখ্যাগুলি হাতে লাওয়া যায়। কেশব সেন স্ট্রিট আর আমহাস্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে পূর্বমুখী যে স্থির লোকান, সেখানেই নরেনের কাছে রাখা থাকে সুকান্তির জন্য নির্দিষ্ট দেশব্রতী। সব সংখ্যা গিগামিত আসে না। নানান বাধাবিপত্তি আছে পত্রিকার প্রচারে। এক সন্ধ্যায় সুকান্তি হাতে নেলেন দেশব্রতীর বিশেষ সংখ্যা। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। স্রুত বাড়ি ফিরে

এলেন সেদিন। কমরেড চারু মজুমদার আহান জানিয়েছেন গণমুক্তি ফৌজ গড়ে এগিয়ে চলুন। উত্তর দিনাজপুরের মাগুরজানে নকশালবাড়ির কৃষক ও শ্রমিক গেরিলারা পুলিশের চৌকির উপর হামলা চালিয়ে ছ'টি রাইফেল আর অনেক বুলেট দখল করেছেন। মাগুরজানের এই ঘটনার ফলে পশ্চিমবাংলায় আজ গণফৌজ গড়ে উঠল।

খুবই ভালো খবর। এসব খবরের আশা জাগে। তাহলে বোধ হয় চারুবাবুই ঠিক। এই গণফৌজই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। যেখানে যত দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াড আছে তারা সবাই আজ এই নবোদিত গণফৌজের অঙ্গ। এই গণফৌজই লড়বে দেশের মুক্তির জন্য। কিন্তু কলকাতাতে বসে একথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। চারদিকে বড় এলোমেলো কান্ড ঘটে চলেছে।

একান্তরের কলকাতায় প্রতিদিন খুনের খবর। বস্তুত, ঘটনা নতুন নয়, নাম নতুন। সুকান্তি হিসাব কষেছেন। এখন যা খুন হয় তার পঁয়ষট্টি শতাংশ করছে পুলিশ। পুলিশের হাতে নিহতরা সবাই নকশালপন্থী। পুলিশ এখন মরিয়া। বন্দি নকশালদের নির্জন রাস্তায় বা মাঠে ছেড়ে দিয়ে বলছে বাড়ি যা। তারা ছুট লাগালেই পিছন থেকে গুলি করছে পুলিশ। খবরে ছাপা হচ্ছে 'সংঘর্ষে নিহত'। জেলের মধ্যেও লাঠিচার্জ করে খতম করা হচ্ছে নকশালপন্থীদের। দেশব্রতীর কথা সত্যি হলে, পরাজয়ের আগে মরণ কামড় দিচ্ছে শোষকশ্রেণী। বদলা হিসাবে পঁচিশ শতাংশ খুনের দায়িত্ব নকশালদের। এই পঁচিশ শতাংশ নিহতের তালিকায় কুড়ি শতাংশ হল পুলিশ এবং তাদের চর। বাকি পাঁচ শতাংশ সি পি এম কর্মী। খুনের রাজনীতিতে সি পি এম-ও সিদ্ধান্ত। ওরা ঠিক করে নিয়েছে রাজ্যে শাসনভার থেকে শুরু করে বামপন্থী রাজনীতির সমস্ত মালিকানা তারা নেবে। অন্যান্য বামপন্থীদের নির্মূল করতে নেমে পড়ছে তারা। মাসে দু'শোটি খুন হলে তার কুড়িটি করে সি পি এম — পনেরো জন নকশাল, পাঁচজন সি পি আই কর্মী।

পঁচিশ মাসের মাথায় অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই অশান্তি বেড়ে গেছে। এবারের ভোটে নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস একদিকে। অন্যদিকে বিরোধীদের মধ্যে ভাঙন। সেই যুক্তফ্রন্ট আর নেই। এখন জোট হয়েছে দুটি অট পাটি আর ছ-পাটি। অট দলের জোটে আছে সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস টিউ সি। ছ পাটির ফ্রন্টের নেতৃত্ব সি পি এম-এর হাতে। সঙ্গে রয়েছে ওয়ার্কার্স পাটি, আর্গানাইজাই এরা।

নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। নব কংগ্রেসের নতুন প্রতীক গাঠি বাছুর। দলের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দু'বার কলকাতায় ঘুরে গেলেন। বিগেড ময়দানের জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী আবারও বললেন সমাজতন্ত্র কায়াম করবার কথা। আমি চাই দারিদ্র্য দূর হোক, অসাম্যের অবসান হোক, গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি চাই। একেবারে বামপন্থীদের মতো কথা। সি পি আই সমর্থন করতে ইন্দিরার কথাবার্তা। সি পি আই-কে ব্যঙ্গ করে সি পি এম দেওয়ালে লিখেছে। দিল্লী থেকে এল গাই সঙ্গে বাছুর সি পি আই। তবে সব কিছুকে জালিয়ে উঠেছে খুনের ঘটনা। এর আগে কোনো নির্বাচনে যা হয়নি, প্রার্থীদের খুন করা হচ্ছে। ভগলী জেলায় চণ্ডীতলায় খুন হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সিউড়িতে নব কংগ্রেসের গাদুগোপাল রায়। উখড়াতে বাংলা কংগ্রেসের দেবদত্ত মন্ডল। এর তিন দিনের মধ্যে খুন হলেন উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নবীমান নেতা হেমন্তকুমার বসু। রাজ্য জুড়ে তোলপাড়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে। সি পি এম বলল আমেরিকার সি আই এর চক্রান্ত।

নবশালপট্টীয়া নির্বাচন একটের সিদ্ধান্তে অবিরল। আবার দেওয়ালে লেখা শুরু হয়েছে। পার্লামেন্ট তুমোনের খোঁজাড়া, নির্বাচন বয়কট করুন। কোনো কোনো জায়গায় লেখা চোখে ভেঁটে দিলে পড়বে লাল।

কিন্তু, গোমা পাউপগান খুন এতদিনে গা-সওয়া। শেষ অবধি ভোট দিল মানুষ। ভোট পড়ল নবশালপট্টীয়া শতাংশ। নির্বাচনের তিনদিনের মাথায় খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল, নবশালপট্টীয়া মারা গেছেন। চাট আটক। আত্মপরিচয় গোপন রেখে নারসিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই মারা গান। পাটির কেউ কি তাঁকে সংশোধনবাদী বলে খতম করে দিল? সতস। এমন কুটিল চিন্তা এল সুকান্তির মনে! কিন্তু ভোটের খবর এখন সর্বগ্রাসী। নবশালপট্টীয়া কে নিয়ে বেশি ভাববার সময় নেই। পরিচিত অধ্যাপকদের মধ্যেও তেমন আলোড়ন দেখাশোনা না সুকান্তি।

ভোটের ফলে দেখা গেল নব কংগ্রেস তাদের শক্তি বাড়িয়েছে। সি পি এম তাদের থেকে মাত্র ৩টি আসন বেশি পেয়েছে। নব কংগ্রেসের সঙ্গে তো বাংলা কংগ্রেস ছিলই, নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাদের সমর্থন জানাল আদি কংগ্রেস এবং সি পি আই। এই দুই দলের সমর্থন পাওয়ায় আর ক্ষমতা দখলে বাধা নেই। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গড়ল নব কংগ্রেস।

গাজো নতুন সরকার বসতে না বসতেই প্রতিবেশী পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তানি সেনারা পূর্ব পাকিস্তানে গাজোপত্রের ক্ষোভ বাড়ছিল। বিক্ষোভ দমাতে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিনাসী সেনাপ্রধান চান্দাওয়ান সেনাবাহিনী নামিয়ে দিল। পরিকল্পিতভাবে গাজো নিধন শুরু করল তারা। পাটির পড়াই শুরু করে দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। তারা পাকিস্তানি সেনাদের থেকে মুক্তি চায়। নতুন রাষ্ট্র খোঁজা করেছেন তাদের নেতা মুজিবর রহমান। গাজো নাম বাংলাদেশ। শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করছেন চান্দাওয়ান গাজো। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছে ভারতীয় সেনা।

বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু হতেই কলকাতায় শরণার্থী আসা শুরু হয়ে গেছে। আসছে ছাত্র, গৃহস্থালীসহ। কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র। সকাল বিকেল শোনা যায় গান। শোনো একটি মুজিবরের থেকে / লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি/ সাতদশান / আকাশে বাতাসে উঠে রণি / বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ.....।

সরকার গড়বার পর থেকেই নব কংগ্রেসীদের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই তাদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। পাড়ার ক্লাবের মাধ্যমে তারা এখন শরণার্থীদের অন্য চান্দা তোলে, ত্রাণ সংগ্রহ করে। চাল ডাল ত্রাণসামগ্রী নিয়ে তারা ট্রেনে চলে চলে যায় নগরী সীমান্তে। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে ত্রাণ বিলি করে আসে তারা। এ কাজে তাদের সঙ্গে ছুটে গেছে ভিন্ন রাজনীতির ছেলে-ছোকরারা। কেউ কেউ আবার গোমা মশলাও দিয়ে আসে সীমান্ত পেরিয়ে।

নব কংগ্রেসের এখন গাড়পাড়। অবস্থা বুঝে ভোটের আগেই ওই দলে ভিড়েছিল পাড়ার দাবী পুষ্টি। ভোটের পরে দলের ছাত্র শাখা, যুব সংগঠন ফলে ফেঁপে উঠেছে।

মধ্য, নিম্ন মেধার ছাত্র-যুবরা ভাবছে যদি দলের দাদাকে ধরে করে একটা চাকরি পাওয়া যায়। চাকরির বাজার তো খুবই খারাপ। অতএব নাম লেখাও!

যে ছেলেগুলি এই সেদিনও খুব সাধারণ ভাবে চলাফেরা করত, তারা হঠাৎ কেমন নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করছে। অবাক লাগে সুকান্তির। স্কট লেনের তিনটি ছেলে — নব, কালাচাঁদ, পঞ্চম — খুব বেড়ে উঠেছে। এরা তিনজনেই নিরুপমের বন্ধু। এখন নব কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছে। সুকান্তি ওদের দেখছেন বহুদিন। ওদের ফুটবল খেলায় রেফারি হয়েছেন। ক্রিকেটে আম্পায়ার। বিশ্বকর্মা পূজোর সময় একসঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। ওদের শিখিয়েছেন কী করে সুতো ছেড়ে ঘুড়ির পাঁচ খেলতে হয়। অন্য ঘুড়ি কাটা পড়লে নব কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়েছে। পঞ্চম মুখে আঙুল পুরে সিটি মেরেছে। কালাচাঁদ চিংকার করে উঠেছে ভো-কাট্টা।

সেদিনের সেই কচিগুলোর এখন স্বর ভেঙেছে। গলার আওয়াজ পাল্টে গেছে। ওরা এখন সারাদিন চাঁপাতলা ফ্রেন্ডস ক্লাবে বসে থাকে। ওদের আশপাশে এখন আর পাঁচটি ছেলে জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায় ক্লাব ঘরটিতেও বেশ চকচকে ভাব এসেছে। ওরা সারাদিন ক্লাবঘরে বসে ক্যারাম খেলে, কিংবা তাস।

একদিন সুকান্তি লক্ষ্য করলেন, ক্লাবঘরের একটি ছেলে রাস্তার সজ্জি বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে হাত পাতছে। বিক্রেতারার কোনো কথা না বলে শুধু হাতে দিচ্ছে চার আনা। কেউ তিরিশ পয়সা। কী ব্যাপার? খোঁজ নিয়ে জানা গেল নব-কালাচাঁদ-পঞ্চম বাহিনীর নির্দেশে ছেলেটি তোলা আদায় করে। এবং কেউ কেউ প্রতিবাদ করে না। কারণ স্কটলেনের রাস্তায় বেআইনি ভাবে বাজার বসাতে ওরা ঝড় দিচ্ছে বিক্রেতাদের। চমৎকার ব্যবস্থা। এই টাকায় নব-কালাচাঁদদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। ওরা তিনজনেই চকচকে নাইলনের গেঞ্জি, চোজা প্যান্ট, খটখটে জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়।

সুকান্তি দেখেছেন মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় ওরা পুলিশের জীপে চেপে কোথাও যায়। তার মানে ওদের এইসব কর্মকাণ্ড পুলিশ জানে। সুকান্তি ভেতরে ভেতরে রেগে ওঠেন। সন্ধ্যায় হাঁটার সময় উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়েন। আশপাশের কেউ বলে, কী হল দাদা! নাটকের সংলাপ মুখস্থ করছেন নাকি? সুকান্তির স্মিৎ ফেরে। লজ্জা পান।

এক সন্ধ্যায়, ফেরত পথে, স্কটলেনের মুখে আসতেই চিংকার শোনা গেল মার মার শুয়োরের বাচ্চাকে। প্রথমে গোমা, তারপরেই গালিগ শব্দ। একটি ছেলে রাঙায়া তমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্য দুজন দ্রুত পালাল। মুহূর্তে রাঙায়া ফাঁকা। যে ছেলেটি রাঙায়া পড়ে গেছে, তাকে দেখতে একটা এগায়ে গোলেন সুকান্তি। কাছে যেতেই দমবন্ধ হয়ে এল। এতো চিরন্তন। নিরুপমের গল্প।

এই বান্ধোতাকে ঠিক গাঁসিয়াড়। অন্য দুটোকেও মারব একদিন। সুকান্তি মুখ তুলে দেখলেন, নব। আর কালাচাঁদ। চোজাপ্যান্ট, গেঞ্জি, কজিতে মিটলের বাল। ওরা হাঁপাচ্ছিল। কালাচাঁদ বলল, শালারা ন্যাপতগাগান গাঙতে মিটিঙ করছিল। কালাচাঁদের চোখ দুটো ধূর্ত শেয়ালের মতো। চোখ সঙ্গ করে সুকান্তির দিকে তাকাল সে। নব বলল, কী সাহস খানকির ছেলেদের। আমাদের নাকের ডগায়া এসে আমাদের খতমের মিটিঙ। পানের ছোপ লাগা দাঁত বের করে নব হাসল।

দুয়ো কথায় সুকান্তির উদ্দেশে বলা। তাদের এই বীরত্বের জন্য সমর্থন আশা করছে ওরা। সুকান্তি ছুঁত হয়ে গেলেন। আশপাশের কয়েকটা জানালা খুলে গেছে। অনেকেই দেখতে লাগতে ছেলেটিকে। কিন্তু কেউ রা কাড়ছে না। হঠাৎ কালাচাঁদ চিংকার করে উঠল, আরে জানলা বন্ধ কর.... বন্ধ কর। জানলা লক্ষ্য করে হাতের অস্ত্র তুলল। দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

নব বলল, মাস্টারদা আপনি চলে যান....ব্রাড দেখে মাথা ঘুরবে.....

জল...একটু জল। চিরন্তনের গলা। তার মানে ও বেঁচে আছে তখনও। রাস্তার পাশেই চাপাকল। জল পড়তে কলের মুখ থেকে। সুকান্তি সেইদিকে এগোতেই কালাচাঁদ বলল, আরে এই ঢাঘলা সিঁদে গাড়ি যা।

কী স্পর্শ। সুকান্তির মাথা দলদল করে উঠল। অথচ মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। ওদের আগ্রাসনের সামনে অসহায় লাগে, আবার রাগও হয়। নব বলল, বললাম না বাড়ি যান। রাস্তার ওপাশেই সুকান্তির বাড়ি। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দিকে...ওই দিকে।

যোনের মধ্যে রাস্তা পার হলেন সুকান্তি। শুনতে পেলেন কালাচাঁদ বলছে, শুয়ারের পাচার। তো জল খায় না, হিসি খায়এই নে হিসি খা.....। সিঁড়ির ধাপে উঠে সুকান্তি দাঁড়িয়ে গেলেন। এদের বিরুদ্ধে গিয়ে চিরন্তনের পক্ষে দাঁড়ালে তাঁর পরিচয়টা প্রকাশ পাবে। তাঁর বাড়ির ওপরে নজরদারি বাড়বে। দলের একটা নিরাপদ আশ্রয় বিপন্ন হবে। সব ঠিক। কিন্তু এই অবস্থায় চিরন্তনকে ফেলে তিনি কোথায় থাকবেন? তিনি তো কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরা নিজের ক্রিয়াজীব গোপন রাখতে ঘৃণা করে। তিনি ভেঙাপা লড়াইতে ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন একদিন। তাঁর মা কমিউনিস্ট। সেই মায়ের সন্তান হয়ে তিনি কী করে এই অনাচার মেনে নেবেন? কোনো মানুষ পারে এ সময় চপচাপ থাকা থাকতে?

সুকান্তি ফিরে এলেন চিরন্তনের কাছে। নব-কালাচাঁদের চোখে বিস্ময়। এই শীর্ণদীর্ণ মাস্টারদের এত বড় ওয়ান তাদের নির্দেশ অমান্য করেছে! ওরা কিছু বলবার আগেই চাপাকল লোকের আঁজলা ভরা জল নিয়ে চিরন্তনের ওঠে দিলেন সুকান্তি। ওর চোখ খোলাটে হয়ে এসেছে। আবার এক আঁজলা জল আনলেন সুকান্তি। শুনতে পেলেন কালাচাঁদ বলছে, এ শুয়ারের পাচা বড্ড বেড়েছে...নামিয়ে দি।

সুকান্তি তাকাগেল। হ্যাঁ আমাকেও নামিয়ে দাও। কারণ যতদিন বেঁচে থাকব কোনো মৃত্যুপথযাত্রী জল চাইলে দেব।

ওরা চপ করে গেল। সুকান্তি ডাকলেন, চিরন্তন, চিরন্তন। কোনো সাড়া মিলল না।



'ভগলী' জেলা। হরিপাল গ্রামে কুখ্যাত বাঘা জোতদার পঞ্চানন মিত্রকে গত তেইশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কৃষক গেরিলারা খতম করেছেন। চণ্ডীতলা থানার কলাছারা গ্রামের বদবাবু ও পুলিশের দালাল টাকু ভট্টাচার্যকে কৃষক গেরিলারা গত আট-ই জানুয়ারি খতম করেছেন। গত বছর একটি যুবককে সে তার মায়ের সামনেই গুলি করে হত্যা করে। গত চৌঠা

জানুয়ারি বিকালে গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রামের কুখ্যাত জোতদার ও সুদখোর মহাজন কিশোরী দত্তকে একটি কৃষক গেরিলা স্কোয়াড খতম করেছেন।’

এক নিঃশ্বাসে পড়বার পর থামল দ্রোণাচার্য। একটু দম নিয়েই চলে গেল অন্যান্য জেলার শ্রেণীশত্রু খতমের বিবরণীতে। দেশব্রতীর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে গেছে। এ-হাত ও-হাত ঘুরে বেহুলা গ্রামে কাগজ পৌঁছতে সময় লাগে। একান্তরের ফেব্রুয়ারির দুটি আর মার্চের একটি সংখ্যা একসঙ্গে পাওয়া গেছে।

পনেরো ফেব্রুয়ারির দেশব্রতী পড়ে শোনাচ্ছে দ্রোণাচার্য। সামনে কুপি জ্বলছে। কুপির ওদিকে বসেছে তিনজন — পাঞ্চালী, কৃষ্ণ বাউরি আর মনা সেন। বাড়ির মেয়েরা গেছে গাঙ্গুলি জোতদারের বাড়ির সত্যনারায়ণ পুজোর অনুষ্ঠানে। সেখানে কাজকর্ম করবে সবাই। খেতেও পাবে। ফিরতে রাত কেটে যাবে ওদের।

কুপির তলায় কাগজ ধরে সামনে ঝুঁকে বসল দ্রোণাচার্য। এবার হাওড়া জেলার খবর। ‘গত একত্রিশ নভেম্বর রাতে সুহাগড়া গ্রামের কুখ্যাত জোতদার ও সুদখোর হারু দাসকে পাঁচজনের একটি গেরিলা স্কোয়াড খতম করেছেন।’

হঠাৎ পাঞ্চালী বলল, কমরেড সি এম বলেছেন, এই সময় শুধু শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা ঠিক রাস্তা নয়....। দ্রোণ চুপ করে গেল। — কেউ ধার নিয়েছে শোধ করতে পারছে না, মহাজনকে খতম করো, মজুরি কম দিচ্ছে, জোতদারকে মেরে দাও, এটাও কিন্তু একধরনের অর্থনীতিবাদ।

দ্রোণ বলল, হ্যাঁ ঠিক, সি এম এমন বলেছেন বটে কিন্তু কখনওই শ্রেণীশত্রু খতম বন্ধ করতে বলেননি। শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে সশস্ত্র রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে গণফৌজ গড়ে তুলতে বলছেন। কারণ গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।

কিন্তু খতম চালানো সত্ত্বেও ডেরা, গোপীবল্লভপুরের আন্দোলন তো এখন ঝিমিয়ে এসেছে। পাঞ্চালী বলল।

তার কারণ ডেবরা গোপীবল্লভপুরের নেতৃত্বে আছে পেটি বুর্জোয়ারা। স্কোয়াডের নেতৃত্বের ভার দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কাঁধে দিলে এমনটা হতো না। সি এম বলেছেন। একথা।

পাঞ্চালী কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। দ্রোণের নজর এড়াল না। বলো না, কী বলতে চাইছ?

না, মানে, ভাবছি... তাহলে শ্রমিক নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে? আচ্ছা যাক, এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

কৃষ্ণ বাউরি বলল, দিদিমণি, কথটা কিন্তু ঠিক। জোতদার সম্পর্কে আমাদের যেমন ঘৃণা, ওদেরকে আমরা যেমন হাড়ে হাড়ে চিনি, তেমনটা মধ্যবিত্তরা চিনবে কেমন করে?

কৃষ্ণর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। পোড় খাওয়া চেহারা। খালি গা, নীল লুঙ্গি। কুপির আলোয় মাঝে মাঝে ওর চোখ চিকচিক করছে।

আমরা তো ছোটবেলা থেকে দেখছি গ্রামে কোনো চুরি হলেই ওই জোতদার ভদ্রলোকেরা আমাদের কাউকে তুলে নিয়ে গিয়ে পেটাতে। ওদের কাছে বাউরি, বাগদি মানেই চোর চামার। ছোটবেলায় দেখেছি আমার মা যে বাড়িতে কাজ করে সেই জোতদার

সুলীম দাসকে কারণে অকারণে মুখখারাপ করতে। গালি খেয়ে শুকিয়ে যেত আমার মায়ের মুখ। কৃষ্ণ বাউরি সোজা হয়ে বসল। কুপির আলো ওর থুতনি বেয়ে কপালে উঠেছে। সোমনাথ হোরের কাঠখোদাই ছবির মতো লাগছে ওকে।

অনেকবার ভেবেছি শুভা বদমাশদের দলে নাম লেখাই। এর প্রতিশোধ নেব। জোতদার বাজে কথা বললে আর্মিও চোখ গরম করতাম। ওরা সমঝে চলত আমায়। প্রথমে ফরওয়ার্ড ব্লকে নাম লেখাই। ওদের হয়ে খাটিতাম। সাতান সালের নির্বাচন মিটে গেলে ওরা আমায় ডুলে গেল। তারপর গোলাম সি পি আই। নকশাল পার্টি হবার পর বুঝে গোলাম রাজা পেয়ে গেছি।

কৃষ্ণ বাউরি হাসল। দ্বিধামণি, কমরেড সি এম ঠিক বলেছেন, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে নেতৃত্ব দিতে হবে। আর্মি বাড়ি বেঁধে খাই। মাটির ঘরটুকু ছাড়া নিজের বলতে কিছু নাই। আমার মতো আরও কুড়ি পঁচিশ ঘর বাউরি, বাগদি আছে আমাদের নতুনগ্রামে। আমরা যেমন মরিয়া হয়ে লড়ব, অন্য কেউ কি এমন পারে?

দ্রোণ বলল, ঠিক আছে এবার কিছু অন্য খবর পড়া যাক। 'মাগুরজানের পর রূপসীকুণ্ডী, রাইফেলধারী কৃষক ফৌজ'। ঘোষণার মতো লাগল দ্রোণের গলার আওয়াজ। বিশে মার্চের দেশব্রতী থেকে পড়ে শোনাল দ্রোণাচার্য। 'গত নয়ই মার্চ সোমবার বেলা বারোটার সময় আমাদের পার্টির বাংলা বিহার উড়িষ্যা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে একটি কৃষক গেরিলা দল বনম, জোরা, জুরি ও টাম্বুর মতো সাবেকি অস্ত্র নিয়েই ওই সীমান্ত এলাকায় বিহারের বহড়াগড়া থানার রূপসীকুণ্ডী গ্রামে একটি মিলিটারি পুলিশের ক্যাম্প আক্রমণ করে নটি রাইফেল ও কলশো পাঁচ রাউন্ড গুলি সহ আরও অনেক জিনিস দখল করে নেন এবং ওই মিলিটারি পুলিশের তিনজনকে খতম ও তিনজনকে গুরুতর রূপে জখম করেন। গেরিলাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

দ্রোণ মুখ ডুলল। একই সঙ্গে খতম এবং গঠনের খবর। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। লড়াইয়ের আরও খবর আছে। ফেব্রুয়ারির দেশব্রতী আবার টেনে নিল দ্রোণাচার্য। জেলের লড়াই এগিয়ে চলেছে। অভ্যুত্থান, আত্মদান, জেল পালানো, বন্দি ছিনিয়ে আনা চলছে চলবে।

কৃষ্ণ বলল, আরে, পড়ো পড়ো....এই তো আসল খবর জেলের মধ্যে গ্রামের মতো বিপ্লবী লড়াই চালানো সহজ কাজ নাকি? পড়ো পড়ো শোনা যাক।

দ্রোণ লড়ল। 'গত দোসরা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি জেল থেকে পাঁচিল উপকূলে পালিয়েছেন আটজন বন্দী। গত সাত-ই ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে গোলাপ ওয়ালা চাকার প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা দুঃসাহসিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। গত গোলাপ ই ডিসেম্বর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন প্রায় এক হাজার কৃষক বন্দি, লড়াইয়ে জাল দিয়েছেন ন'জন বিপ্লবী কৃষক কমরেড। নদীয়ার নেতৃত্বস্থানীয় কমরেড নিতাই সরকার নিপুণ গেরিলা কৌশলে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন। পুলিশ তাঁকে ধরে লড় করে দিয়েছিল কিন্তু তাঁর পালানো ঠেকাতে পারেনি।দক্ষিণ বাংলার দক্ষিণ কোমের ওপর পুলিশ ভ্যান থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাহারার মধ্যে, হাতকড়া পরা অবস্থাতেই পালিয়ে এসেছেন তমজন যুবক কমরেড। তাদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে

বারাসত কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সকলেই এখন জনতার নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন।' দ্রোণ আবার মুখ তুলল। শুধু জেলে নয়, শহরাঞ্চলেও লড়াই ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। আমাদের কমরেডরা পুলিশের থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের কমরেডদের খুনের বদলা নিতে গেরিলা স্কোয়াডগুলি একের পর এক শ্রেণীশত্রু খতম করে চলেছেন।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে মনা সেন একমনে দ্রোণের পাঠ শুনছিল। তার চেহারা শহরের কিছু ছাপ রয়ে গেছে। পরনের পাজামা, পাঞ্জাবি একেবারে ধবধবে না হলেও পরিষ্কার। কাঁধের হলুদ ঝোলাও কাঁধেই রয়ে গেছে।

মনা বলল, শহরের পরিস্থিতি কিন্তু সত্যিই খুব ভয়াবহ। পুলিশ আমাদের কমরেডদের খুন করেই চলেছে। বিচারের প্রহসনটুকুও করতে চাইছে না তারা। পরশু আমি যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে এখানে আসার জন্য স্টেশনে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি রাস্তায় মিলিটারি বোম্বাই ট্রাক চলেছে। রাজ্যে সশস্ত্র পুলিশ ছিলই, তারপর এসেছে আধা মিলিটারি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ, সি আর পি, এবার এল পুরো মিলিটারি.....।

দ্রোণ বলল, হ্যাঁ জানি সব কটা ভোটের পার্টি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ধুরো তুলে মিলিটারি ডেকে নিয়ে এল। এখন ওরা শেষ অস্ত্র তুলে নিয়েছে। নকশালদের দেখা মাত্র গুলি করো।

কৃষ্ণ বাউরি বলে, শুধু শহর কেন এই হুগলী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সি আর পি নানান জায়গায় ক্যাম্প বসিয়েছে। এবার মিলিটারিও ছাউনি বসাবে। চিন্তা কীসের, এই মিলিটারির মোকাবেলায় দাঁড়াব আমরা....

মনা বলল, একটু ভেবে চিন্তে সবদিকই পর্যালোচনা করে এগোতে হবে.... কমরেড, বাঘের সঙ্গে লড়াইতে যাচ্ছি আমরা....

দ্রোণ থামিয়ে দিল। মনা তোমার ওই শহরে স্কুল মাস্টারের মতো কথা বলা ছাড়ো তো..... ওরা বাঘ হতে পারে, তবে রক্ত মাংসের নয় খড়ের বাঘ....

কৃষ্ণ হাসল। এই.....এই...ঠিক বলেছে....

দ্রোণ তেতে গেল। শুয়োরের বাচ্চারা ভাবছে গুলি করে আমাদের মনোবল ভাঙবে, আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে। ওরা ভুলে গেছে বাবুলাল রোষ্ট্রম পদ্মাদ্রি পানিগাঠী শশী সুদেব-কাজল-সমীরের রক্ত দিয়ে এ পার্টি তৈরি হয়েছে। ওরা ভুলে গেছে ম্যায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে 'চোয়ারমান মাও জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে আমাদের কমরেডরা মরতে জানে। একথা ভুলে গেছে বলেই ওরা আমাদের নিকেশ করবার রাস্তায় নেমেছে। তবে মনা মাস্টার একটা কথা ভেনে রাখো, কমরেডদের মৃত্যুর শোককে আমরা ঘৃণায় পরিণত করবই। প্রতিটি হত্যার বদলা নেবই আমরা।

কৃষ্ণ বলল, এতটাই তো আমরা আওয়াজ তুলেছি, ওয়ান ম্যান ওয়ান অ্যাকশন। দ্রোণ মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। আমি আর কৃষ্ণ এর আগে করেছি বলেই জানি, অ্যাকশন করলে অনেক জড়তা কেটে যায়। মনাও দিকে তাকিয়ে বোঝাবার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল দ্রোণাচার্য। তুমি এতদিন স্কুলে পড়িয়ে আমাদের রাজনীতি সম্পর্কে ছাত্রদের যা শেখাতে পারোনি, একটা খতম অভিযানে থাকলেই দেখবে অনেক সহজ ভাষায় তা বোঝাতে পারছ। দ্রোণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাঞ্জাবী থামিয়ে দিল। আরে মনাদা তা জানে। সেজন্যই

তো তুলে ছুটি নিয়ে গ্রামে থাকতে এসেছে। দ্রোণ বলল, সেজন্য আগেই আমি ওকে অভিনন্দন জানিয়েছি, আগারও জানাপাম। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে নিক্ষেপ করল দ্রোণাচার্য। লাল সেলাম কমরেড। কৃষ্ণ জানাল, তাদের নতুনগ্রামের অদূরেই এক গ্রামে এক ভূমিহীন কৃষকের বাড়ি আপাতত মনার থাকার ব্যবস্থা করা যাবে। সেই গ্রামে থেকে সংগঠন গড়ে তোলবার পর মনা মাস্টার চলে যাবে তার পছন্দের অন্য কোনো গ্রামে। অন্য কোনো শেলটারে। মনা বলল, ভালো ব্যবস্থা। এমন সংগঠন আর অ্যাকশন ঠিকমতো করতে পারলে, আমিও দ্রোণের মতো জেলার নেতা হয়ে উঠতে পারব একদিন...বলো?

সিন্ডিকেট ওনে। দ্রোণ হাসল হা...হা.. করে। পাঞ্চালী আর কৃষ্ণ চুপ করে রইল।

কথায় কথায় রাত বাড়ছিল। মনা বলল, যাই ঘাড়ে মাথায় একটু জল দিয়ে আসি। কৃষ্ণও উঠে পড়ল। চলো আমিও যাব। দুজনে বেরিয়ে গেলে দ্রোণ পাঞ্চালীর দিকে তাকাল। এট, আমার জামাটা একটু কেচে দেবে? রাস্তিরে ধুয়ে মেলে দিলে সকালে বেরোবার আগে শুকিয়ে যাবে।

তুমি ওদের সঙ্গে যাবে?

হ্যাঁ।

পাঞ্চালী গভীর চোখে দ্রোণকে দেখল। কবে ফিরবে?

একটু দেরি হবে এবার। মনার পোস্টিং ঠিক করে কদিন ওর সঙ্গে থাকতে ওনে। তারপর কয়েকটা গ্রামের মিটিং আছে। সব সেরে ফিরতে দিন দশেক লাগবে।

পাঞ্চালী চুপ করে যায়। কিছু পরে বলে, গ্রামে আসার পর আমরা একটানা এতদিন আলাদা থাকিনি। খুব কষ্ট হবে। এখনই ফিরে আসা লাগছে। তোমায় ছেড়ে থাকতে যে কষ্ট হয়।

দ্রোণ খুদু হাসল। অখণ্ডোষের গুঁড়টাও পড়েছে? পাঞ্চালী উত্তর দেবার আগেই বলল, পড়েছিল। নোনা যাচ্ছে...পড়লে এত কষ্ট পেতে না। পাঞ্চালীর চোখ কৌতুহলী।

হ্যাঁ গো সত্যি কথা। দ্রোণ বলে চলল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়ে লোকালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাকে ছাড়তে এসেছেন সারথি ছন্দক। ছন্দকও তোমার মতো বলেছিল, কষ্ট হচ্ছে। সিদ্ধার্থ বললেন, এইসময়ে আমার যা ছোটখাটো দোষ, সেই গুণহীনতাকে বড় করে দেখো, সেগুলির কথা ভাবো। দেখবে গুণ ছাপিয়ে তা অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর কষ্ট হবে না। গুণহীনতাহেতু স্নেহ চলিয়া যায় এবং স্নেহ চলিয়া গেলে শোকও থাকে না।

পাঞ্চালীর চোখে জল চলে এল। দ্রোণ সাফুনা দেবার চেষ্টা করল। আরে দূর পাগলি। এট তো কদিনের ফিরে আসব। জামাটা সাবান-কাচা করে দিবি কিনা বল? পাঞ্চালী হাসল এবার। ও জামা হাজার ধুয়েও আর সাফ হবে না, ময়লা বসে গেছে। দ্রোণ মাথা লাড়ল। না না তুমি শূয়ে দাও। কাল সকালে পরে যাই। জামায় বেশ তোমার গন্ধ লেগে থাকবে। পাঞ্চালীর চোখে আবার অশ্রু ভরে এল। কুপির আলোয় মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল সেট অশ্রুবিন্দু।

কৃষ্ণ আর মনা ফিরতেই পাঞ্চালী বেরিয়ে গেল পুকুরঘাটের দিকে। দ্রোণও সঙ্গে গেল। জামা ধুয়ে ফেরবার পথে পাঞ্চালীকে নিবিড় আলিঙ্গন করল দ্রোণ। কষ্ট পেয়ে

না। এই তো যাব আর আসব। চলে যাবার কথা ভেবো না, ফিরে আসার কথা ভাবো। ফেরার পর আমরা কোথায় যাব, কি করব ভাবো, দেখবে কষ্ট কমে গেছে।

পরদিন ভোর হতেই দ্রোণ, কৃষ্ণ আর মনা বেরিয়ে পড়ল। বাউল-বৈরাগীর ভেক ধরে নিয়েছে দ্রোণ। কৃষ্ণ আর মনার থেকে কিছুটা তফাতে হাঁটছিল সে। যাবার পথে মগরার রামগোপাল ঘোষ উচ্চবিদ্যালয় দেখবার ইচ্ছা দ্রোণের। কৃষ্ণ, মনা আপত্তি করল না।

যে মাঠে ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছে দ্রোণ সেই মাঠে অন্য বাচ্চারা খেলছে তখন। দেখে মন ভরে যায়। ছোটদের খেলা যেন কুস্তী নদীর মতো। চলছে, চলবে। চিরকাল। এই প্রবহমানতা দেখে বড় সুখ হয়। দূর থেকে একবার নিজেদের বাড়িটাও দেখে নিল দ্রোণ। পেয়ারাগাছে দু-তিনটি কাঠবেড়ালিও চোখে পড়ল। মা'র সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল খুব।

দ্রোণ এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু কৃষ্ণ বাধা দিল। না, কমরেড আর নয়। জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের সবার বিপদ হবে তখন। দ্রোণ মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। বিপ্লবের কালে এমনভাবে একান্ত ব্যক্তিগত ভালোলাগাকে প্রশয় দেওয়া ঠিক নয়। এ হল পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা। দ্রোণ লজ্জা পেল। কমরেড কৃষ্ণ ঠিকই বলেছে। চলো যাওয়া যাক।

নতুনগ্রাম পৌছতে বেলা হয়ে গেল। কৃষ্ণের বাড়ি খালি। বাচ্চাকে নিয়ে বউ গেছে বাপের বাড়ি। দ্রোণ, মনাকে বাড়িতে রেখেই কৃষ্ণ ফিরিয়ে গেল। মনাকে অন্য গ্রামে রাখার খোঁজখবর করে ফিরে আসবে। খাবারও আসবে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এল কৃষ্ণ। অদূরেই দ্বারবাসিনীতে মনাকে রাখার ব্যবস্থা হতে গেছে। পরদিন সকাল দশটায় বের হলেই চলবে। ভালো খবর। বিড়ি বাঁধতে বসে পড়ে কৃষ্ণ। গুনগুন করে সুর ভাঁজল। ও নকশাল, নকশাল, নকশালবাড়ির মা / ও মা ময়ূর বৃগোৎ অঙ্ক ঝরে / তর খুনোৎ আঙ্গা নিশান লম্বা / বাংলার চাষী জয়র ধ্বনি করে।... দ্রোণ বলল, আরে এতো রাজবংশীদের ভাষায় লেখা, তুমি কোথা থেকে শিখলে?

কৃষ্ণ হাসল। লজ্জার হাসি। হ্যাঁ, কমরেড দিলীপ বাগচির কাছে শিখেছি... ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

ও আচ্ছা, দিলীপদা মাঠে-ঘাটে-মিছিলে অনেক গান গেয়েছেন। নিভোর লেখা, সুপ
দেওয়া গান। এই গানও ওর লেখাই মনে হয়। দ্রোণের কথায় কৃষ্ণ সায় দিল। ঠিক
এ গান ওঁরই, রাজবংশীদের মোখাল গানের সুরের ধরণে লেখা। দ্রোণও গান শোনাল।
তার নিজের লেখা গান। শিকাগোর সেই রস্টে ভেজা / শ্রমিকের সেই ছিন্ন পোশাক
/ জন্ম দিল এই লাল পতাকার / সর্বহারা তোরা জাগ, তোরা জাগ।... মনা মাস্টার
দু'আঙুলে তুড়ি মেরে মেরে তাল দিল। গানে, গল্পে রাত হয়ে গেল অনেক।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হ'ল। রোদ্দুর চড়ে গেছে। মনা হাতঘড়ি দেখে জানাল পৌনে দশটা। দ্রোণ, মনা দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। কৃষ্ণ তৈরি হয়ে নিলেই বেরনো যায়।

হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ বলল, ওই ওই দ্যাখো শালা সুধীর দাস চলেছে। মাঝারি উচ্চতা পরিষ্কার চেহারার লোকটি এমনিতে মোটাসোটা নয়। কিন্তু মাঝখান থেকে অকস্মাৎ একটা ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। স্ফীত উদরের সঙ্গে শরীরের বাকি প্রত্যঙ্গের কোনো মিল নেই। লোকটির কাঁধে নেমে এসেছে বাবরি চুল। ঠোঁটের ওপর ঝলছে মোটা গোঁফ।

কম্বোয়াল গাভা পাড়া নেড়োতে বেরিয়েছে। কৃষ্ণ বলল। দ্রোণ বলল, এই সেই জোহাদার মে জোহাদার মা'কে খিন্তি করত?

হী, দেখলেই মনে হয় বান্চোতকে কেটে ফেলি। কৃষ্ণের মুখ লাল।

মনা, কৃষ্ণচলো আজই আকশন হয়ে যাক। দ্রোণের গলায় আদেশের সুর। জাড়াতাড়ি, গোড়ি ওত.....জাড়াতাড়ি। মনা মাস্টারের দিকে তাকাল দ্রোণ। আজ কমরেড মনা চালাবে, আমরা পালশে থাকব। কমরেড এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যায়? চলো চলো যাই।

জিলাজিলাই গাকমুখ ঢেকে গামছা বেঁধে নিল। মুখ ঢাকা তিনজনের চেহারা একই রকমের মনে হয়। মনার হাতে দেখা হল একটি আলিগড়ের ছুরি। ছুরির ফলা প্রায় তুটুকি। রোদুদ পড়ে চকচক করতে ইস্পাতের ফলা। দ্রোণ আর কৃষ্ণ নিল দুটো বড় চাঁচকটি। কমরেড সি এম বলেছেন শত্রুকে হাতের নাগালে নিয়ে খতম করতে হবে। সি এম এর কথা তুলো না, বলল দ্রোণ। কৃষ্ণ জবাব দিল, না কমরেড, তুলিনি, তুলব না। কমরেড চাক মজুমদার জিন্দাবাদ। মৃদুস্বরে স্লোগান দিল দ্রোণ। মনা, কৃষ্ণ প্রত্যুত্তর করল, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তিনজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সুধীর দাসের বাড়ির সামনে চার্লিশ পঞ্চাশ হাত ফাঁকা জমি। তার উত্তরে জিটি রোড গ্যান্ড ট্রাক রোড। জিটি রোড পার হয়ে দূরে ধানক্ষেত। ক্ষেতে পৌঁছতে হলে হোগলার নদীর পাশের মাটির পথ দিয়ে যেতে হয়। এলাকাটিকে বৃত্তাকারে ঘিরেছে পিচের রাস্তা।

হোগলার নদীর পাশের মাটির পথে সুধীর দাসের পাওয়া গেল। আকশনের উল্লসিত আমরা। কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই। চোখের উজ্জ্বল মনকে আকশন শুরু করতে বলল মোনাচার্য। কিন্তু মনা চুপ। এর মুখ সাধারণত কানছে। আর ঘেরি না করে চাঁচকটির চালান কৃষ্ণ বাউরি। কোল বাড়ল সুধীর দাসের ঘাড়। আর্টনাল করে উঠল লোকটি। ফির্কি দিয়ে বন্ধ বেরিয়ে এল। হানামির বন্ধ, বন্ধ অত্যাচার করেছিল। আমার মা'কে বান্ধি বলে মাল দিয়েছিল। এবার পান্টা দে। সিংকার করে উঠল কৃষ্ণ।

মনা মালীর সাহস পেল এবার। সে ছুরি চালান সুধীরের পিঠে। কিন্তু ছুরি ভালো করে বিনল না শরীরে। কৃষ্ণ বলে উঠল, আরে শত্রু মুলোয় নরো ছুরিটা। না হলে গাঁথবে কি করে? আগার ছুরি চালান মনা। কিন্তু ওর আঘাতগুলো এলোমেলো। দ্রোণ ওকে টোয়ে সুধীরের সামনে নিয়ে এল। মাস্টার, এ মান্য নয়, এ অত্যাচারী শ্রেনীশত্রু, খতম করো শত্রু। মনা ছুরি চালান লোকটির তলপেট লক্ষ্য করে। সুধীর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হাতের ঝল লগাল ছুরির আঘাত। এবার চাঁচকটির চালান দ্রোণ। নিমেবে লাগ হয়ে উঠল লোকটির কান। শ্রেনীশত্রু খতম চলছে, চলবে। স্লোগান দিল দ্রোণ। সুধীরের পেছনে কৃষ্ণ, সামনে দ্রোণ। ওরা চাঁচকটির চালান বেশ কয়েকবার। গলা, পেট, পিঠ, ঘাড় কোনো জায়গাও বাদ গেল না। লোকটি হমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। এরপরে আর সুধীর দাসের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই।

সুধীর দাসের দেহ ছেড়ে মুখ তুলতেই দ্রোণ দেখল ডানদিকের পিচের রাস্তায় কয়েকটি লোক জড়ো হয়েছে। ওরা গামেরট লোক। একটি ছোট ছেলে চিংকার করছে, আমার কাকাকে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে...। ওর ডাক শুনে আরও লোক জড়ো হচ্ছে।

কৃষ্ণ বলল, কমরেড, পালোতে ওবে...শীগগির। এসো এসো। কৃষ্ণ দৌড়ল। দ্রোণ,

মনা ওর পিছু নিল। হোগলার বন পেরিয়ে বাম দিকের পিচ রাস্তায় এসে উঠলো ওরা। এ অঞ্চলের অক্সিসন্ধি কৃষকের জানা। সহজেই পৌঁছন গেল কুন্তী নদী। দূর থেকে ভেসে আসছিল সম্মেলক চিৎকার। গ্রামের লোক পিছু নিয়েছে। নদী পেরিয়ে ডেমরা গ্রামে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন। এখান থেকে কোনোরকমে গান্ধেগড় পৌঁছতে পারলে চিন্তা নেই। নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকা যাবে।

গান্ধেগড় যাবার জন্য গ্রাম ছেড়ে বেরোতেই দেখা গেল নদীর বাঁধের কাছে পুলিশ। সঙ্গে সি আর পি জওয়ানরাও আছে। পুলিশ ওদের দেখতে পেয়েছে। বড়বাবু হুইসিল বাজিয়ে দিল। ওদের লক্ষ্য করে ছুটে আসছে পুলিশ। দ্রোণ, কৃষ্ণ, মনা তিনজন তিনদিকে দৌড়ল। দ্রোণ ছুটল এক বাড়ির গোয়ালঘর লক্ষ্য করে। কৃষ্ণ সোজা একজনের ঘরের ভেতর। মনা কিছুটা দৌড়ের পর দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে ভেবে পেল না সে! মনা সেনকে ধরতে কোনোই অসুবিধে হল না পুলিশের। কৃষ্ণ আর দ্রোণের খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করল তারা।

যে বাড়িতে কৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছিল তার সদর দরজা খুলতে দেরি হচ্ছিল একটু। পুলিশ বাহিনী অধৈর্য। তারা দরজায় দমাদম লাথি মারতে শুরু করল। দরজা খুলতেই সামনের লোকটিকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ল বন্ধুকধারীরা। ঘাড় ধরে বের করে আনল কৃষ্ণ বাড়িরিকে। মনা, কৃষ্ণকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল গ্রামের ভেতর একটা খোলা জায়গায়।

ডেমরা গ্রামে এমন নাটকে ব্যাপার আগে কখনও ঘটেনি। বিনা পয়সায় যাত্রাপালা দেখতে গ্রামের লোকেরা সবাই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দ্রোণকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সরু চোখে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ-সি আর পি সবাই। কোথায় পালাবে? এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে... ভাবের মধ্যে থেকে খোঁজ। বাহিনীর বড়বাবু হাঁক পাড়ল। বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের ভেতর। গ্রামের তিন চারটি কিশোরকেও খোঁজার কাজে লাগানো হল।

এক কিশোরের চোখেই ধরা পড়ল অদ্ভুত ব্যাপারটা। সে চিৎকার করে উঠল। দেখ দেখ..... দেখে যাও। দুজন বন্ধুকধারী ছুটে গেল। কি হয়েছে? কিশোরটি খাড়ের গাদার দিকে আঙুল দেখাল। খাড়ের গাদার ফাঁকে একজনের পা দেখা যাচ্ছে। পা ধরে হাঁচকা টান দিতেই পুরো শরীর গেরিয়ে এল।

এই তো দ্রোণাচার্য ঘোষ! বড়বাবুর উল্লসিত চিৎকার। শুয়োরের বাচ্চা বহুত ভুগিয়েছে। এক সি আর পি জওয়ান দাঁত বের করে হাসল। দ্রোণাচার্য ম্লোগান দিল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। 'মার বানচোতকে' বলেই অন্য জওয়ানটি সপাটে থান্ড মারল দ্রোণের গালে। ছিটকে পড়ল দ্রোণ। তার ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল ভারী বুট পরা দুই সি আর পি। দ্রোণের পেটে পিঠে যথেষ্ট লাথি চালান তারা। তিন বন্দির হাত বেঁধে, কোমরে দড়ি পরিয়ে তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল পুলিশ-সিআরপি-র যৌথবাহিনী। মগরা থানায় পৌঁছে তিনজনকে পৃথক করে দেওয়া হল। তিনজনকে আলাদাভাবে জেরা করবে পুলিশ।

জেরার মুখে দ্রোণ চূপ করে গেল। বলাগড়ের দায়িত্বে এখন কে? হুগলী লোকাল কমিটির দীপক কোথায়? বাঁশবেড়িয়ার ভবেশের কাছে যে তিনটে রিভলবার একটা রাইফেল ছিল সেগুলো কোথায় লুকিয়েছিস? দ্রোণ নিরুত্তর। পুলিশ খেপে গেল। টেবিলের ওপর

হালকা জলুড় করে ফেলে লাঠিপেটা শুরু করল তারা। জামা ছিড়ে ফেলল। মোটা, লাল মাথা ঘুটে উঠল দ্রোণের পিঠে। পিঠে মদ ঢেলে দিল এক কনস্টেবল। দাখ কেমন জলুনি। দোখ আওনা করে উঠল। পুলিশ থামছে না। বল, শুয়োরের বাচ্চা, রাইফেল কোথায়? বল্ বল্।

বলব না। দ্রোণের উত্তর শুনে বড়বাবুর মুখ চোখ লাল।

যে হাত দিয়ে সুধীর দাসকে মেরেছিল, সে হাত ভেঙে দেব..... ধর শালাকে। এক কনস্টেবল দ্রোণের ডান হাত চেপে ধরল। কনস্টেবলের হাতে লোহার রড।

নিজের ভালো চাস্ তো বলে দে.... নাহলে হাত ভেঙে যাবে.... আমি দশ গুনছি, তার মধ্যে বল্। গড়গড় শব্দে শুরু করল। এক। বল্, রাইফেল কোথায়? দুই। বল্, মীনক কোথায়? তিন। বল্, ভবেশ কোথায়? চার। বল্, খানকির ছেলে বল্.. নয় গোনার লেগে গড়গড় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আরও দ্রুত। একটু দম নেবার পর উচ্চারিত হল, দশ। দোখ তবু নিরুত্তর।

ভাঙ, ভাঙ গান্ধোতকে। নির্দেশ পেয়েই কনস্টেবল লোহার রডের বাড়ি বসিয়ে দিল দ্রোণের হাতে। উহ....মাগো....। যন্ত্রণা পাবার আওয়াজে ঘর ভরে উঠল। দ্রোণের শরীর ধিক, গোল। হাত ফুলে উঠল নিমেষে। কাঁধের তলায় হাত ঝুলতে থাকল দড়ির মতো। গোন খটখট সঙ্গে দেহের বাকি অংশের কোনো সম্বন্ধ নেই। বাম হাতটিও একই পদ্ধতিতে ভেঙে দেবার পর মনাকে সে ঘরে আনা হল।

টোপেলের ওপর দ্রোণ চিত শুয়ে আছে। পুরানো শুধু জাডিয়া। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। ঠোটে ফুলে গেছে। কল গেরো রক্ত গড়িয়ে পড়বার চিহ্ন স্পষ্ট। ওর চেতনা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মনা বলে উঠল, কী করেছেন?

না না জানা আছে তবে পাওনিটে একটু কম, ডিম লাইটের মতো। বড়বাবু হাসল। কীরে একটু খেলিয়ে দেখা না....।

গড়গড় ঠাক শব্দে দ্রোণের চুলের মুঠি ধরে হাঁচকা টান মারল কনস্টেবল। চিত হয়ে লাড় খাকা, মানুষটার দু চোখের একটি সামান্য উন্মীলিত হল। বোঝানো গেল, এখনও প্রাণ আছে শরীরে।

তা, ওকে বোঝাও না, নামগুলো বলে দিতে...তাহলেই আর ওকে কিছু করা হবে না। বোঝাও, বোঝাও....

মনা চপ করে রইল। বড়বাবুও চপ।

আজ্ঞা ঠিক আছে, ওকে কারুর খবর দিতে হবে না...

গড়গড় চোখ জোড়া মনাকে বিদ্ধ করছিল।

একে বলতে বল, মাও সে তুঙ শুয়োরের বাচ্চা..... বল, বল....

মনা মাগটান উত্তর করছিল।

আজ্ঞা ঠিক আছে, বুঝেছি। বিদেশের কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বলাতে সমস্যা হতে পারে। তারদের সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা....অবিকল খবরের কাগজের আদা, লোনা গেল গড়গড় গলায়।

ঠিক আছে, বলতে হবে না। তাহলে বলুক, চারু মজুমদার শুয়োরের বাচ্চা। বললেই

নিশ্চিত.....আর মারধোর হবে না।বলতে বল। মনা মাস্টারকে দ্রোণের মুখের কাছে নিয়ে গেল বড়বাবু। আবার দ্রোণের চূলে টান মারল কনস্টেবল।

— নে, এইবার বল্ চারু মজুমদার শুয়োরের বাচ্চা। বল্ বল্। বল্ চারু মজুমদার..... মনার দিকে তাকিয়ে বড়বাবু হাঁপছিল। বলতে বল্। দ্রোণের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল মনা মাস্টার। বলে দাও একবার.....টেক ইট অ্যাজ আ স্ট্রাটেজি.....কৌশল.....

গভীর শ্বাস নিল দ্রোণ। তার ঠোঁট নড়ে উঠল। বড়বাবুর চোখে উল্লাস। এই তো ছেলে খুলছে। নে, বলে ফেল....

দ্রোণের ঠোঁট নড়ল আবার। চা-আ-রু.....ম-জু-ম-দা-র।

এই তো এই তো। বড়বাবুর উল্লাস বাড়ছিল। বাকিটা বল্, তাহলেই ছুটি। বল্, শুয়োরের বাচ্চা।

আবার শ্বাস নিল দ্রোণ। টেনে টেনে বলল, লাল সেলাম।



এ বাড়িটা জমি থেকে কিছু উচুতে। একতলার ঘরে ঢুকতে হলে সিঁড়ির দশটি ধাপ উঠতে হয়। সিঁড়ি ভাঙতে আপনার কষ্ট হবে না তো? এই প্রশ্ন তুলে বাড়িটা ভাড়া নিতে ইতস্তত করছিলেন সুনীতিবাবু। কিন্তু তিনিই জোর করছিলেন। নিজের শরীরকে অত গুরুত্ব দেবার মানে হয় না। আসল ব্যাপারটা হল নিরাপত্তা। আত্মগোপন করে থাকার পক্ষে এ জায়গা উপযুক্ত কিনা? সেই বিচারে এ বাড়ি একই নয়। দেওঘর শহরে প্রচুর বাঙালি থাকলেও এ বাড়ির চারপাশে কোনো বাঙালি পরিবার নেই। ফলে, তাঁকে চট করে চেনার সম্ভাবনা কম। বাড়িটি স্টেশন থেকে দূরে নয়। দীনবন্ধু স্কুল, রাজনারায়ণ বসু পাবলিক লাইব্রেরি পার হয়ে কিছুটা হাঁটলেই চলে আসা যায়। কমরেডদের আসা যাওয়ার সুবিধা। তাঁকেও হঠাৎ ট্রেনে চাপতে হলে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া বাড়ির কাছেই একাধিক ওষুধের দোকান। যদিও তাঁর ওষুধপত্র, ইনজেকশন, অস্মিজেন সিলিন্ডার সবই, যে ডাক্তার কমরেড তাঁর সঙ্গে থাকে, সেই রবি গুহ-ই নানান দোকান থেকে জোগাড় করে। ওষুধ বাড়ির কাছে ওষুধের দোকান থাকলে আপৎকালীন অবস্থায় হয়তো রবির সুবিধা হবে। বাড়িটি ভালোলাগার আর এক কারণ, এর সামনে একটি ছোট পুকুর এবং গাছপালা আছে। গাছ আর জলাশয় থাকলেই পাখি আসবে।

থাকতে শুরু করার পর দেখা গেল অনুমান সঠিক। প্রচুর পাখি আসে এখানে। অধিকাংশই শালিক, টিয়া আর চড়াই। তবে মাঝে মধ্যে নতুন অতিথির আগমন ঘটে। যেমন, কদিন আগেই ভোরবেলায় পাখির শিস্ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখা গেল খেজুর গাছে বসে দুটি বুলবুল পাখি মহানন্দে শিস্ দিয়ে চলেছে। এ-ডালে ও-ডালে লাফাচ্ছে। যেন একাদোকাদো খেলছে দুজনে। দুজনেই চঞ্চল। কিছুক্ষণ পরে উড়ে গেল তারা।

আজ দুপুরে এক পশলা বৃষ্টির পর আর এক অতিথির আবির্ভাব। ইনিও খেজুর গাছের

জালেই নেসেজে। ল্যাজ দেখেই পাখিটাকে চিনতে পারলেন চারু মজুমদার। এ তো ল্যাজঝোলা। কিন্তু পাখি, তুই একা কেন রে? তোর দোসর কোথায়? জানালা দিয়ে এ দিক ও দিক তাকালেন চারু। দ্বিতীয় কোনো ল্যাজঝোলা চোখে পড়ল না। পাখিটি কিছুক্ষণ এসে, খাড়া ঘুরিয়ে চারপাশে দেখে হঠাৎ উড়ে গেল। বোধহয় দোসরের সন্ধান করতে। পাখিদের রকমসকম নজর করতে মজা লাগে। এক এক পাখির মাথানাড়া, চলাফেরা, উড়ানোর ভঙ্গি একেক রকম। ছোটবেলায় চড়াইয়ের ভঙ্গি নকল করে বন্ধুদের দেখাতেন। বন্ধুরা প্রকৃত মজা পেত। ডুমার্সের বক্সা জেলে থাকার সময় সহবন্দীদের দেখিয়েছিলেন, সেই চড়াই সংলাপ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো হেসে কুটিপাটি। সুভাষ বলেছিল, দেখো, কোমোদিন লিখে দেব তোমার এই গুণপনার কথা। কতদিন আগের কথা, সেইসব। উলনশো একা সাপ। কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন। দিন দ্রুত চলে গায়।

আকাশের দিকে তাকালেন চারু। বৃষ্টি হবার পর সাদা মেঘের ফাঁকে ঝকঝকে নীল আকাশ। সেই নীলিমার প্রেক্ষাপটে একঝাঁক পাখি উড়ে চলেছে। ওরা দূরের যাত্রী। এই জীব দেখে মন ভরে ওঠবার কথা। কিন্তু আজ তা হল না। ল্যাজঝোলা পাখির একলা এসে থাকে, তার নিঃসঙ্গ উড়ানের কথাই মনে আসছে বারংবার। ল্যাজঝোলা পাখিটি যেমন পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল। সেই সূত্রে, থেকে থেকে বিষাদ স্মৃতিও জাগছে। বিশাদ কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেন চারু।

অন্য সন্ধ্যা ফুলে গেলেও একটি কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বিগত সাত আট ঘাস ধরে অভিযানয় সেই কথার সঙ্গে ঝটক চলছে তাঁর। পক্ষ-বিপক্ষের চাপানউতোর চলছে। খটনা চল, টিমের কমিউনিস্ট পক্ষ তাঁদের কাজকর্মের সমালোচনা করেছে। হঠাৎ একদিন, লিখে রেডিও থেকে ভারতবর্ষে তাদের পাটির কাজকর্মের প্রচার একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কেন চল এমন? এখানকার খবর কি ঠিকঠাক পাচ্ছেন না ওরা? সৌরেন বসুকে লাঠাঠো চল চিন পাটির সঙ্গে কথা বলতে। ওর মাধ্যমে চিনের পাটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল একটা রেডিও সম্প্রচার ব্যবস্থা পাঠানোর।

দেশে ফিরে এসেই দেখা করল সৌরেন। সস্তর সালের শেষ দিক। চারু তখন বেলগাভিয়ায় বাড়িতে। ওর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে চৌ এন-লাই আর কাঙ শেঙের। তাদের সামনেই আলোচনার বিষয়বস্তু লিখতে আরম্ভ করেছিল সৌরেন। চৌ আর কাঙ পাশা দেয়। বলেন, এখন কিছু লিখো না। সীমান্ত পেরিয়ে যাবার পর যা লেখার লিখো। তবু, আলোচনা সেরে হোটেলে ফিরেই ওদের মতামতের মূল সূত্রগুলি লিখে রেখেছিল সৌরেন। সেগুলির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বানাতে দু-তিন দিন সময় লাগবে। চারু জিজ্ঞাসা করলেন, কী বলল সাহেবরা?

ভালো নয় চাকদা....

...কেল, কী চল? কতটা খারাপ, শুনি....

জানি কেল, এদের মতে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগানটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। এটা ওরা মানে না। তার থেকেও বড় কথা, ওরা শ্রেণীশত্রু খতমের পথটিকেও অনুমোদন করেননি। ওরা বলেছে, এটা ভুল রাস্তা। বিপ্লবের কালে ওরাও একসময়ে

এই আন্টির শিকার হয়েছিলেন। এরপরে যদিও বলেছেন সি পি আই (এম-এল)-এর মূল দিশা ঠিক আছে, কিন্তু এইসব ভুল সংশোধন করা দরকার।

চারুর মুখ লাল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত।

আশ্চর্য কথা। কদিন আগে ওরাই এই শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন সমর্থন করে পিকিং রিভিউতে লিখেছে লিন পিয়াও তত্ত্বের প্রয়োগে ভারতের জনযুদ্ধের বিকাশ। আর আজ ওরাই বলছে এ পথ ভুল!

— ভুলটা তাহলে ওদেরও হয়েছিল?

সৌরেন বলল, ওরা বলেছে, আমরা আগে ঠিক বুঝতে পারিনি।

— কিন্তু লিন পিয়াও? লিন পিয়াওয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার? সৌরেন মাথা নাড়ল। না হয়নি।

ওদের রেডিওতে লিন পিয়াওয়ের কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কি লিনের ক্ষমতা কমে গেছে? চারু চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, সাহেবরা রেডিও স্টেশনের কথায় কী বলল? চারুদা ওরা দিল না....অবশ্য ওদের কথায় যুক্তি আছে। কোথাও কোনো মুক্তাঞ্চল নেই, কিছু নেই, একদিনও নিজেদের দখলে রাখতে পারবে না ওই স্টেশনসম্প্রচার হওয়া মাত্রই পুলিশ-মিলিটারি বাজেয়াপ্ত করে নেবে...

চারু কাতর গলায় বললেন, আমরা জাহাজ ভাড়া করে বঙ্গোপসাগরে ঘুরে ঘুরে রেডিও স্টেশন চালাতাম....ওরা দিল না?

এরপরেই বুকে ব্যথা উঠেছিল তাঁর।

সেদিনের কথা মনে পড়ায় আজও চারুর জল এল। কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়শই বুকে ব্যথা হতো। ডাক্তার কমরেডরা বলল, শহর ছেড়ে দূষণ যেখানে কম এমন জায়গায় থাকতে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? তাঁর কমরেডরা সারা দেশ জুড়ে শহরে-গ্রামে লড়াই করছে। তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখার পক্ষে কলকাতাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। উনসত্তরে পার্টি গঠিত হওয়ার পর থেকে সত্তর সালের নভেম্বর অবধি আন্দোলনের সেই তুঙ্গ অবস্থায় যখন পুলিশ-সি আর পি-র সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ চলছে, তখনও তিনি কলকাতা ছেড়ে যাননি। তাঁর মতো সর্বোচ্চাঙ্গ, সুশীল, সহ আরও অনেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কলকাতা বা শহরতলির বিভিন্ন শেলটারে আত্মগোপন করে থেকেছেন। যেন জলের মধ্যে মাছ। পুলিশ টের পায়নি একদম। কলকাতার দক্ষিণ পূর্বে, গার্ডেনরিচ রেল কলোনিতে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছে পার্টি কংগ্রেস। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন সেই সম্মেলনে। গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে সেই অনুষ্ঠান। পার্টি কংগ্রেসের আগে, কলকাতার থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরায় চেপে তিনি ঘুরে এসেছেন ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। উপস্থিত থেকেছেন পার্টির প্রতিটি রাজ্য সম্মেলনে। যে শহর তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছে, সংযোগের এত সুবিধা দিয়েছে সেই কলকাতা ছাড়তে হবে? হ্যাঁ কমরেড ছাড়তে হবে। কারণ শেলটারের সংখ্যা কমে আসছে। শহর আগের মতো নিরাপদ নয় আর। দ্বিতীয় কথা, আপনার শরীর খুবই খারাপ। বেলগাছিয়ার এই আলোবাতাসহীন, স্যাঁতসেতে ঘরে থাকলে শরীর আরও খারাপ হবে। পার্টির স্বার্থে আপনার নিরাপদ থাকা, সুস্থ থাকা

দরকার। কখনোভাবের চাপে সেই কলকাতা ছেড়ে বেরনো। সত্তরের ডিসেম্বর মাসটা কাটল লুপ্ত। চাকরিটা রোডে এক প্রাচীন বাড়ির তিনটে ঘর পাওয়া গিয়েছিল। একাত্তর সালের শুরুতে আগার কলকাতা। একমাস থেকেই আবার পুরী। এইবারের পুরীযাত্রায় সঙ্গী হল লীলা। বহুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে পাওয়া গেল। একত্রে কাটানো গেল কয়েকটা দিন। পুরনো গল্প হল কিছু। চাকরি সংসার দেখার সময় পান না। নিজের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে ছাপিয়ে তাঁর সংসার আরও অনেক বড়। সুতরাং লীলাকেই নিজস্ব গৃহকোণটুকুর দায়িত্ব নিতে হয়। জীবনবিদ্যার এজেন্সি করে লীলার উপার্জন। তার নিজস্ব ডায়েরিতে লেখা আছে সব গ্রাহকের খুঁটিমাটি। তারই এজেন্সি চাকরি লেখা পুরনো চিঠি এনেছিল লীলা। চারটি চিঠি। সবই জেল থেকে কিংবা হাসপাতালের বিজ্ঞানী এসে লেখা। স্ত্রীকে লেখা সংসার-ছুট স্বামীর চিঠি।

কবেকার লেখা এটসব, তুমি রেখে দিয়েছ!

রাখতেই হ'ল, জেলবন্দীর চিঠি বলে কথা। লীলা হাসল। ওর হাসি স্নিগ্ধতা বিকিরণ করে। এখনও লীলা হাসলে ওর সারা শরীর হেসে ওঠে।

চিঠিগুলি একবার হাতে নিয়েই ফেরত দিয়েছিলেন চাকর। বস্তুত, একটু লজ্জা করছিল। পুর...পুর...এসব চিঠি রাখার কোনো মানে হয়!

লীলা কোনো উত্তর দিল না। চিঠিগুলি পড়তে শুরু করল। নিচুগলায় পড়লেও ওর উচ্চারণ স্পষ্ট। এজন্য প্রতিটি শব্দ বোঝা যায়।

প্রথম চিঠির তারিখ, পনেরো মে উনিশশো পঁচাত্তর। দমদম সেট্রাল জেল থেকে লেখা প্রিজনার্স লেটার। চিঠির প্রথম অংশ দ্রুত পড়ে নিয়েই উপসংহারে চলে এল লীলা। '.....হতাশ হইয়া না। তোমার ওপর চাপ পড়িয়াছে খুবই। আর এরকম চাপ আমি বেয়োগেই কখনো মনে হয় না। কাজেই চালিয়ে যেতে হবে।..... তোমাদের ওখানে বৃষ্টি কেমন হচ্ছে? এখানে এবার গরমটা খুব বেশি নেই। সকালে প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। ভালোই আছি। ভালোবাসা নিয়ে।' চিঠি চাকর মজুমদার।

লীলা তাকাল। আমি কিন্তু হতাশ হইনি। সেই থেকে একাই চালিয়ে যাচ্ছি সংসার। অনিত্যতা, মৃণ্মিত্য, অর্ধজিৎ ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।

আমি জানি, আমি জানি। গভীর আবেগে লীলার করতল স্পর্শ করলেন চাকর। এরপরের চিঠি, ঠিক দশদিন পরে, পঁচিশ মে লেখা।

'লীলা, তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ফ্যামিলি অ্যালাউন্স-এর টাকা ফেরত দিয়ে ভালো কাজট করেছ। ও টাকা নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। সরকারের ফ্যামিলি অ্যালাউন্স ব্যাপারে কোনো নীতি আছে বলে মনে হচ্ছে না।.....'

লীলা পড়তে থাকল। ওর স্বর কানে বাজছে কিন্তু শব্দগুলি মাথায় ঢুকছিল না। চাকর ভাবছিলেন, এই মর্মেলায় তেজের কথা। তখন একশো-দেড়শো টাকাও অনেক। তিনি জেলবন্দী থাকায়, পারিবারিক ভাতা বাবদ সরকার থেকে ওই অঙ্কের টাকাই নিশ্চয় লীলা পেয়েছিল। কিন্তু ও প্রত্যাখ্যান করেছে সেই টাকা। দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের দেওয়া কোনো লাভাভাও দেখায় ঠিক হ'ল না। তিনি লড়াই করছেন মানুষের জন্য, কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য নয়। লীলা বুঝেছে তাঁর মনের কথা।

তিন নম্বর চিঠির তারিখ অক্টোবর নভেম্বর উনিশশো পঁয়ষট্টি। স্থান- এস এস

কে এম হাসপাতাল।

‘লীলা, তোমার ষোলো তারিখে লেখা চিঠি কুড়ি তারিখে পেয়েছি। এরপর আর কোনো খবর পাইনি। বোধ হয় আজ কাল পাব। আমার তৃতীয় ই সি জি-র রিপোর্টও একই দেখলাম। গতকাল সরকারি দপ্তর থেকে আমার অবস্থার রিপোর্ট ডাক্তারবাবুদের কাছে চেয়েছিল এবং ওঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন।...’

সেবার খুবই অবনতি হয়েছিল স্বাস্থ্যের। মাঝে মধ্যেই বুকে ব্যথা ওঠে। ডাক্তারদের ভাষায় অ্যানজাইনার জন্য হয় এমন। পরীক্ষায় জানা গেল হৃদযন্ত্র কিছু খারাপ হয়েছে। বিশ্রামে থাকতে হবে।

— এই যে, এই যে....এই জায়গাটা ভালো করে শুনুন কমরেড সি এম। লীলার হাসিতে সস্থির ফিরল চাকর।

‘আমি বিছনায় শুয়ে শুয়ে তোমাদের স্বপ্ন দেখি। তোমাদের ওখানে অ্যানুলার একক্লিপস দেখা গিয়েছে। অনিতা, মিতুকে বোলো চিঠি দিতে। অভি-কে আর অনিতা, মিতুকে আমার আদর দিয়ো। ভালোবাসা নিয়ো। ইতি-চারু মজুমদার।’ লীলা থামতেই, চারু বললেন, তোমরা সেবার অ্যানুলার একক্লিপস দ্যাখো নি, না?

— না, খেয়াল ছিল না....

— খুব মিস্ করছে, আকাশের আলো মরে আসে। আর এমন সুন্দর আলোর বলয় তৈরি হয় সূর্যের পরিধি বরাবর, অনবদ্য লাগে। এমন দৃশ্য দেখতে পেলো না....

চতুর্থ চিঠিটি পড়তে শুরু করেছিল লীলা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর ছাপ মারা চিঠির তারিখ সতেরো ফেব্রুয়ারি। ছেষটি সাল। এস এস কে এম হাসপাতাল।

লীলা পড়ে চলল। চাকর চোখ বোজা। মুদিত চোখে সূর্যের বলয় গ্রাস দেখছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে লীলার উচ্চারণ কানে আসছিল।

‘আমি এখন অনেক সুস্থ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রোজ দু-বেলা বারান্দায় বেড়াচ্ছি। আমাকে বোধহয় শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়লে বোধহয়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই রাখবে।...’

সূর্যের আলো এমন এক বস্তু তাকে কিছুতেই বেশিক্ষণ চাপা দেওয়া যায় না। ঢাকা দিতে চাইলে, চারপাশ থেকে ঠিকরে বেরোতে চায় তার রশ্মি। এ মানুষের আন্দোলনের মতো। তাকে দমন পীড়ন করে যতই রুখে দেবার চেষ্টা কর না, সে নিজস্ব নিয়মে ঠিক ছড়িয়ে পড়বেই। হাত দিয়ে বলো, সূর্যের আলো / রুধিতে পারে কি কেউ? / আমাদের মেরে ঠেকানো কি যায় / জনজোয়ারের ঢেউ....আমরা কমিউনিস্ট। ওঠে সুস্বারাও পাণিগ্রাহীর কবিতার চরণ এসে গেল।

‘...অনিতা মিতুকে আমার কাছে চিঠি লিখতে বলবে।...অনিতা, মিতু ও অভিকে ভালোবাসা জানিয়ো। অভি-কে বোলো আমি ওর চিঠি চাই। ভালোবাসা নিয়ো। ইতি — চারু মজুমদার।’ চিঠি শেষ করে লীলা বলল, আসলে তুমি ঘোর সংসারী....সবার জন্য তোমার এত দরদ, ভালোবাসা....

— আরে কে বলেছে আমি সংসারী নই....বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়। লভিব মুক্তির স্বাদ.....

লীলার সঙ্গে বেশ কটল কয়েকটা দিন। যত গোপন আশ্রয়ে চাকু থেকেছেন, তার মধ্যে পুরীর এই বাড়িই সবচেয়ে নিরাপদ। এমন নিরুদ্ভিগ্ন পরিবেশে লীলার সঙ্গ গভীরভাবে গ্রহণ করলেন চাক। এর মধ্যে পাটি নিয়ে চিন্তার বিরাম নেই। সমস্যায় পড়লে রেডবুক খুঁজে উত্তর পাবার চেষ্টা করেন চাক। মাও-এর রেডবুক আর তিনটি লেখা ছাড়া অন্য কারুর এই এখন কাজে লাগে না তখন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এই মুহূর্তে পড়ে কোনো লাভ নেই। একমাত্র রেডবুকের কথাই এখন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অন্য যে সব জিনিস লক্ষ্যে রাখা যাচ্ছে না, তা নিছক পাঠ হিসাবেই থেকে যাবে। অধ্যয়ন হয়ে উঠবে না এখন। অতএব শুধু রেডবুক। সন্ধ্যাবেলায় ট্রানজিস্টর খুলে পিকিং রেডিও শোনা পছন্দ করেন অভ্যাস। সে নিয়মেও ছেদ পড়েনি।

লীলা পুরীতে থাকাকালীন একদিন সৌরেন এল। চিনাপাটির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পূর্ণাঙ্গ বয়ান তাঁর হয়ে গেছে। ওঁদের পরামর্শ নিয়ে আলোচনায় বসা দরকার। পরদিন সরোজবাণু, সুনীতিবাণু এসে গেলেন। সৌরেন পড়ে শোনাল, আলোচনার বিবরণী।

চাক বললেন, সাহেবরা ভুল ধরেছেন....এই বিচ্যুতি সংশোধন হওয়া দরকার....সত্যি কথা চর্চা নিয়ে ঠিকের ওপর ঠিক বেড়ে গেছে আমাদের....

সরোজবাণু মাথা নাড়লেন। তাড়াহড়ো করে কাজকর্ম পাল্টাতে গেলে মুশকিল....। জোরের ছুটে চলা গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষতে গেলে উল্টে যেতে পারে.....

সৌরেন বলল, খাদের দিকে ছুটে চলা গাড়ির থামাতে গেলে ব্রেক কষতেই হবে.....

সে উল্টে থামার সম্ভাবনা থাকলেও গাড়ি থামাবার চেষ্টা করতেই হয়.....। সরোজের মুখ লাল হয়ে উঠল। এটা কী বলল।

সরোজের জামিন না নিয়ে জেল থেকে পালিয়েছে তারা স্লোগান তুলেছে নো বেল, ডায়ে, জেল..... তারা সমস্ত শক্তি সংহত করেছে শহীদদের রক্তের স্বর্ণ শোধ করতে, গাতিটি ওড়ান বদলা নিয়ে তারা, তখন রক্তের রশিতে উল্টো টান মারা সহজ নাকি!.....

সুনীতি দীর্ঘ লম্বা কথা বললেন। তিনি বললেন, এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পেশ করা দরকার। সবাই মিলে মাথা ধামালে ঠিক রাস্তা বেড়িয়ে আসবে।

সুনীতিবাণুর মত পছন্দ হল সবাই। ঠিক হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ডাকতে হবে। আগ্রা বা দিল্লিতে হতে পারে সেই বৈঠক। ওই আলোচনার পরে চিনাপাটির পরামর্শ জানাতে হবে রাজ্য স্তরের কর্মীদের। ওঁদের মতামত জানাও জরুরি।

আলোচনার শেষে সরোজবাণু, সুনীতিবাণু কলকাতা চলে গেলেন। সৌরেন গেল লরেন্স। সৌরেন চলে যাবার কদিন পরে চলে গেল লীলাও। লীলা চলে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধ্যাবেলায় সুনীতিবাণু উপস্থিত। কী ব্যাপার? সৌরেন গ্রেপ্তার হয়েছে। বেলেঘাটার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। কোনোভাবে চক্রতীর্থ রোডের এই বাড়ির সন্ধান জানতে পারলে পুলিশ এটা বাড়িতে হানা দেবে।

এক লাগার সাহায্য নিয়ে ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে একটি বাড়ির বন্দোবস্ত করে ফেললেন সুনীতিবাণু। চাককে নিয়ে যাওয়া হল ভুবনেশ্বর। কিন্তু ভুবনেশ্বরের বাড়ি

থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অসুবিধা। তার ওপর বাড়িওয়ালা হঠাৎ বাড়ি খালি করে দেবার অনুরোধ করল।

এক সন্ধ্যায় চারু আর সুনীতি ভুবনেশ্বর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আবার পুরীতেই এলেন তাঁরা। চক্রতীর্থ রোডের বাড়ি গিয়ে জানলেন আগের দিন পুলিশ এসেছিল। কোনোক্রমে রাত কাটিয়ে পরদিন সোজা কলকাতা।

কলকাতায় কয়েকদিন থাকার পর সুনীতিবাবু জানালেন আবার কলকাতা ছাড়তে হবে। গাড়ি চেপে চলে এলেন দেওঘর। কলকাতার পালবাড়ির এক ছেলের সহযোগিতায় ক্যাস্টেয়ার্স টাউনে শেলটারের ব্যবস্থা করেছেন সুনীতি।

বাড়িতে ঢুকেই সুনীতির আশঙ্কা জাগল, কলকাতার ছেলেটি যদি হঠাৎ গল্পচ্ছলে কাউকে এ বাড়ির কথা বলে দেয়? কোনোক্রমে রাত কাটিয়ে সুনীতিবাবু চলে গেলেন জসিডি। ওখানে বাড়ির ব্যবস্থা করেই তিনি নিয়ে গেলেন চারুকে। প্রায় তিনমাস জসিডিতে কাটিয়ে তিনি আবার ফিরে এসেছেন দেওঘর। এবার নতুন আশ্রয়স্থল! সেই থেকে এই বাড়িতেই আছেন চারু মজুমদার।

এই বাড়ির মস্ত সুবিধা, অনেকটা সময় পাখি দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ল্যাজঝোলা পাখিটা আর একবারও এদিকে এল না কেন? নাকি এসেছে, তিনি অন্যমনস্ক থাকায় নজর করেননি? জানালা দিয়ে একবার বাইরের জগৎটিকে ভালো করে দেখে নিলেন চারু। বিকেলের আলো ভ্রিমিত হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে পোড়া ইটের রঙ। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠছে একটা। সেই হাওয়ায় কখনও ভেসে আসছে ভেজা মাটির গন্ধ। ঘরে ফেরার একতান জুড়েছে পাখিরবু কুলায়গামী পাখিদের মিছিলে ল্যাজঝোলাটিকে খোঁজবার চেষ্টা করলেন চারু। দেখতে পেলেন না। ও কি একা একা কোথাও মনথারাপ করে বসে আছে?

সন্ধ্যা হতেই ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল রবি। জিঙ্কস করল, শরীর ঠিকঠাক? কোনো অস্বস্তি নেই তো? প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে লাইট জ্বালাবার পর এই প্রশ্নটা রবি করত। একেবারে নিয়ম করে। মানুষ যে কত কথা অভ্যাসে বলে যায়। এইসব পোশাকি কথাও সংগ্রহ করতে পারলে মন্দ হয় না। চারু হাসলেন। না, না সব ঠিক। এর পরের প্রশ্নটাও চারুর জানা। চা খাবেন নাকি? চারু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিওঁই দরজায় সুকান্তির মুখ। চারু স্মিত হাসলেন।

— আরে প্রফেসর, আসুন আসুন.....রেবা, সুরভি সব ভালো তো?

এই বাক্যটিও চারু অভ্যাসবশত উচ্চারণ করলেন। সুকান্তি এখন নিয়মিতই তাঁর কাছে আসেন। দু-সপ্তাহে অন্তত একদিন। বেলগাছিয়াতে থাকার সময় ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হয়ে যায়। ফলে ওর মনে অনেক অভিমান জমা ছিল। পার্টি লাইন নিয়ে হতাশাও ছিল। এখন দেওঘরে আসার পর আবার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। অভিমান হতাশা দুই-ই কেটেছে মনে হয়। সুকান্তি নানান এলাকার খবর নিয়ে আসেন। কখনও দলের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও এনেছেন। ওঁর মাধ্যমে চারুও পাঠিয়েছেন তাঁর একাধিক প্রবন্ধ, চিঠি। লেখাগুলি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছে গন্তব্যে।

সুকান্তির মতো সুনীতিবাবুও নিয়মিত আসেন দেওঘর। উনি এলে হয় দু'দিন কিংবা

চালাদা থেকে যান। পাঁচ-ছদিন পর আবার আসেন। ওঁর মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। সরোজবাবুও এসেছেন বেশ কয়েকবার। এখন তো সরোজবাবু আর দুশীতলাগু ছাড়া ভরসা করবার মতো কোনো অভিজ্ঞ কমরেড নেই হাতের কাছে। স্বাধীনতার অধিকাংশ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হয় নিহত নয় জেলবন্দী। পশ্চিমবঙ্গের কালু সান্যাল, সৌরেন দত্তও জেলবন্দী। সুশীতলাবাবু আগেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন তারপর তো মারা গেলেন। বিহারের সত্যনারায়ণ সিং অন্যপথে চলেছে। উত্তরপ্রদেশের শিউকুমারও লগ্নে গেছে। এখন থেকে মানে অসীম চট্টোপাধ্যায়ও ভিন্ন সুরে কথা বলছে। মনে হয় পেরে পেরে মনে মনে। তিনিও কি ওই লাজখোলা পাখির মতো একলা হয়ে পড়ছেন কখনো? ঠোট দুটি লত করে চেপে ধরলেন চাকু। মাথার চুলে হাত চালানেন।

লগ্ন ভালো। মোড়া টেনে চাকুর মুখোমুখি বসলেন সুকান্তি।

ওঁর কাছে এলেই সুকান্তি নানারকমের প্রশ্ন তোলেন। যত দ্বিধা, যত সংশয় মনে আসে সব উজাড় করে দেন একান্ত আলোচনায়। খারাপ লাগে না চাকুর। এমন আলোচনায় দুজনের গোলাপডাটাও ক্রমশ গভীর হয়ে ওঠে।

কি আজকেও প্রশ্ন আছে নাকি?

ঠিক তাই, মাথা নাড়লেন সুকান্তি।

তাহলে বগেই ফেলুন। স্মিত হাসলেন চাকু।

আজ্ঞা, আমার অনেকদিন মনে হয়েছে আমার রাস্তার সঙ্গে তেভাগার লড়াইয়ের খুব কিছু তফাৎ নেই। তাই কী?

জান শুনে চাকু মৃদু মাথা নেড়ে চূপচাপিয়ে হ্যাঁ, 'না' বোঝা গেল না। তারপর বললেন, তেভাগার ওই জং গানটা মনে আছে আপনার? সেই যে পশ্চিম দিনাজপুরে খাপুর গ্রামের কৃষকদের লড়াইয়ের কথা আছে গানে?

ওঁর নীচে মাথা দোলালেন সুকান্তি। হ্যাঁ। ওই লড়াইয়ের এক নেতা কালী সরকার পটনার দু বছর পরে, ১৯৪৯ সালে গানটা লিখেছিলেন কালীবাবু তখন রাজশাহী জেলে। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এই জং গান। স্থানীয় মুসলমানরা মহরমের সময় খোল করতাল বাজিয়ে গাইতেন।

চাকুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিজের ঘোরেই বললেন, তখন চিনের লালফৌজ এাকের পর এক শহর দখল করছে। নানকিং দখল করল। তারই বিজয় উৎসবের সময় কালীবাবু গান লিখলেন...। সুকান্তির দিকে তাকালেন চাকু। আপনার মনে আছে গানের কথাগুলো? শোনানেন একবার?

সবটা ভগ্ন মনে নেই হয়তো...তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দেখুন না, যদি মনে পড়ে।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সুকান্তি শুরু করলেন।

একে একে গলে যাই শোনের বন্ধুগণ

খাপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন

১৯৪৩ সন মাখ মাসের শেষে

তেভাগার রণে কৃষক কুদিল সাহসে।।

চারু তালি দিলেন। এই তো...এই তো। তারপর ওরা কী করল?

— ওরা ভালকা বাঁশের ধনুক হাতে নিল। পিঠে বাঁধল ধারাল ফলার তীর। ঘুটঘুটি আঁকার রাতে ম্যাঘের ঝরে পানি... জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দূশমনি। তীর ধনুকধারী কৃষক ভলান্টিয়ার পাতিরােমের মোড়ে পাহারা দিচ্ছে, হঠাৎ দেখে মিলিটারি গাড়ি। মোটর গাড়ির বাতি মিটিমিটি জ্বলছে। সুকান্তি একটু থামলেন।

— তারপর...তারপর? চারুর উদ্বেজনা বাড়ছে।

মিলিটারির গাড়ি আসে ভ্যালান্টি ভাবিল
ইশিয়ার বলি মর্দ চোঙে ফুক দিল।
ডিং ডিং শব্দে নাগরা উঠিল বাজিয়া
ইনক্রাব শব্দে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া।।

— সৈন্যরা মুখোমুখি সংঘর্ষে গেল না তখন। মোটর গাড়ি চেপে ঘুরপথে, সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে তারা পৌঁছে গেল গোপেশ ডাঙ্গারের বাড়ি। ডাঙ্গারের সঙ্গে আরও পাঁচজনকে ধরল তারা। কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতকড়ি লাগিয়ে, কিলচড় মারতে মারতে টেনে নিয়ে চলল তাদের। গ্রামের মহিলারা খেপে উঠেছে।

গ্রামের মহিলা যতো ফেপিয়া উঠিল
কাঁটা-বারণ হস্তে মোটর ধরিল।।
নারীগণ সৈন্যে কয় পদে গোলাম
সবারে ছাড়িয়া দাও করিয়া সেলাম
কাঁটার বাড়িতে নহে হাঁশ খতম হবে
বাপদায় দিয়া ঘরে ফিরে যাও সবে।।

— নারীদের সঙ্গে যোগ দিল গায়ের মদদরা। পিঠে ধনুগাণ। হাতে মোটা পাঠি। এক ফাঁকে মিলিটারির ট্রাকের পেছনের রাস্তা কেটে দিল কয়েকজন। সামনে আগুয়ান বিক্ষুব্ধ জনতা দেখে সৈন্যরা ভয় পেয়েছে। ট্রাক পিছতে ওড় করল। পিছু হটতেই ট্রাকের চাকা পড়ল কাটা গর্তে।

প্রমাদ গণিল সৈন্য জান বুঝি গেল
সম্মুখে তীরের ফালা পিছনেতে খাল
ফায়ার ফায়ার বলি কাপ্তান ডুকুরিয়া উঠিল।
অঙ্গো কাঁপে ঘন মুতে প্যান্ট ভিজ়ে গেল।।
বত্রিশটা বন্দুকের গুলি ছোট্ট কাঁকে কাঁক
প্রলয়ের আগুন যেন ছাইল ব্যারাক।।

শাপুনের কৃষক যোদ্ধারা মাগকোঁচা বেঁধে, তীর-ধনুক-লাঠি হাতে লড়তে শুরু করল। ঝাকঝাক তীর ছুটছে। তীব্রবেগে লাঠি ঘুরছে। মরণপন লড়াই। অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে নীর যোদ্ধারা। সুকান্তির গলায় আবেগ এসে গেল।

নিজানায় জোরে চাপড় মারলেন চারু। ঠিক বলেছেন...এই আমাদের কৃষক...কী সাহস...ওদের নেতা চিয়ারসাই শেখ...বলুন বলুন, খুব ভাল হচ্ছে...

ছুটল চিয়ারসাই হেঁচ মোটা লাঠি
জোয়ান মর্দ বাপের ব্যাটা আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি
দোহাতিয়া বারি মারে সৈন্যের মাথায়
গাল ডাক ছাড়ি সৈন্য টলে পড়ে যায়।
হঠাৎ লাগিল গুলি বাম বাঁহার পরে
ক্রোধ ভরে বাপের ব্যাটা যায় নিজ ঘরে
ঘর হতে চিয়ারসাই শাবল এক আনিল
সবলে ট্রাকের চাকা কাটিতে লাগিল
আর এক গুলি চিয়ারসায়ের বুকে এসে ফোটে
আন্ধার হৈল দুনিয়াদারি চেতন গেল ঝুট
ক্ষণে অচেতন মর্দ ক্ষণেতে চেতন
লাফ দিয়া ট্রাকে ওঠে সিংহের মতন
দুশমনের গুলি ফের কপাল লাগিল
বেইশ হৈল মর্দ, কহ ছোঁড়ে দিল
অভিমনে মায়ের বুকে আছাড়ি পড়িল।

তারপর? চারুর গলা থমথমে। কষ্টের ছাপ সুকান্তির মুখেও। এই গান বছবার শুনেছেন চারু, তবু লড়াইয়ের গল্প পুরনো হয় না। শুরু করলেন সুকান্তি। চিয়ারসাই মারা যেতে গ্রামের লোকেরা উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে একটাই কথা — মার, মার, মার, মার।

মটোরের চাকা কেহ দুহাত দিয়া টানে
কেহ আঁচড়ায় কেহ কামড়ায় হাঁশ নাহি মানে
তীর ধনুক শাবল লাঠি হাসিয়া কুঠার
মর্দরাছে সবাই দেখ যা ছিল যাহার
কেহ ছোঁড়ে দিল এক অন্ধ ছিটায় বালি
মার মার মার খালি মার মার বুলি।।
শাপুনের গুলির মুখে টিকিতে না পারে
একে একে বীরগণ ঢলে ঢলে পড়ে
জিআখান ট্রাকের মধ্যে অচল করলো দুই
শীতের রক্তে রাজা হয়ে গেল ভুঁই।।

একে একে একুশ বীর জান ছেড়ে দিল
 শহীদের রক্তে রাজা লাল ঝাণ্ডা হলো
 যুগ যুগের রুদ্ধ রাগ এই মতো করে
 ফাটিয়া পড়িল ভাই ওই না খাঁপুরে
 এইখানেতে আমার জং গান সাজ হয়ে গেল
 ইনক্লাব জিন্দাবাদ সবাই মুখে বলো।

চারু শুদ্ধ। কান্না রোধ করবার চেষ্টা করছেন। কিছু পরে স্বাভাবিক হলেন। ধরা গলায় বললেন, দেখুন উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ কৃষক তার হাতে যা আছে তা-ই দিয়ে লড়ে গেলেন...একুশ, বাইশজন শহীদ হলেন...কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আমরা তাদের লড়াইয়ের কৌশলটি শেখাই নি সেদিন...

— কী কৌশল? সুকান্তি বললেন। চারু ব্যাখ্যা করলেন। আমরা সেদিন ওদের বলিনি বন্দুকধারীদের সঙ্গে এমন মুখোমুখি লড়াই নয়, এতে আমাদের ক্ষতি। তার চেয়ে চল সৈন্যদের দু-চারজনকে অতর্কিত আক্রমণ করে খতম করি, বন্দুক ছিনিয়ে নিই...ওই বন্দুক দিয়েই ওদের বিরুদ্ধে লড়ি, যেমন লড়েছে চিনের কৃষক গেরিলারা। সুকান্তি বললেন, তা অবশ্য কেউ শেখায় নি...

আমি সেই কথাটাই বলতে চাইছি। চারুর কথাদুটি আবার বড় বড় হয়ে উঠল। সেদিনকার ওই লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের একশকার লড়াইয়ের এইখানেই তফাৎ। এক মুহূর্ত বিরতির পর চারু বললেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য কলকাতা থেকে ছুটে আসা? সুকান্তির মুখ লজ্জায় আরক্ত। না না চন্দ্রদা, অনেক দরকারি কথা আছে...এইটি ছিল সর্বশেষ প্রশ্ন, আগেগোলে সামনে এসে গেল...

চারু তাকালেন। চোখে জিজ্ঞাসা। সুকান্তি একবার ওর ডায়েরির পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন।

— সৌরেন জেলের মধ্যে নানান গুজব ছড়াচ্ছে।

— সে কী ভদ্র, মানে সৌরেন?... কী করলো সে?...

সুকান্তি জানালেন জেলের ভেতরকার খবর। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সমালোচনার বিষয়টি নিয়ে সৌরেন জেলের মধ্যে অনেক কমরেডের সঙ্গে আলোচনা করেছে। এর ফলে বেশ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। ও নাকি বলেছে, পার্টির লড়াইয়ের সমস্ত কৌশলগত পথই ভুল। পার্টি বিপ্লবের সহজ রাস্তা বের করবার চেষ্টায় মেতে ভুল রাস্তায় চলেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে তো তেমন কোনো সংযোগই ছিল না, এবার কৃষকদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দল। সৌরেন আরও বলেছে, চিনের নেতাদের সমালোচনা পার্টির মধ্যে অবিলম্বে প্রচার করা উচিত। এইসঙ্গে দু'বছর আগে সিংহলের পার্টি আমাদের যে সমালোচনা করেছিলেন, তাও পার্টির ভেতরে আলোচনা করা প্রয়োজন।

চারু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আপনি কালকেই কলকাতা চলে যান.....সরোজবাবু, সুনীতিবাবুকে একবার তাড়াতাড়ি আসতে বলুন।

সুকান্তি মাথা নাড়লেন। ঠিক আছে চন্দ্রদা.....আমি কাল সকালের ট্রেনেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

এবার দ্বিতীয় কথা। খোকন আর তার সঙ্গীরা দলের মধ্যে ভিন্নমত প্রচার করছে। পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই প্রসঙ্গে ওদের মতামত আমাদের পার্টির বক্তব্যের বিরোধী। ওদের মতে, ভারত সরকার যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে, অশান্তীজনক কাজকর্ম করছে, পূর্ব পাকিস্তানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মহম্মদ জোভার উচিত ইয়াহিয়া খাঁ'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করা। চাক বললেন, কী হাস্যকর কথা.....ওঁরা ভারতীয় হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করলেন কিন্তু ইয়াহিয়ার স্বত্বাধীনতা চরিত্র দেখলেন না, তার অত্যাচার দেখলেন না।

একটু থেমে দম্বা নিলেন চাক। আমার মতে মহম্মদ জোভাদের দু-মুখো লড়াই চালাতে হবে। একটি লড়াই বিদেশী হস্তক্ষেপ, আক্রমণ এইসবের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে মোকাবিলা করতে হবে ইয়াহিয়া খাঁ'র আক্রমণের.....

কিন্তু চাকদা....। চাককে খামিয়ে দিলেন সুকান্তি। কিন্তু চিন তো ইয়াহিয়া, মানে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে....

অবশ্যই করবে, কোনো দেশ, সে বুর্জোয়া রাষ্ট্র হলেও বিদেশী আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে যদি লড়াই করে, তাহলে চিনা পার্টি আর চিন সরকার অবশ্যই তাকে সমর্থন করবে। কিন্তু চিন পার্টির সমর্থনের অর্থ এই নয় যে দেশের ভেতরের কমিউনিস্ট পার্টিকে সেই গুজোয়ার লেজুড়গুটি করতে হবে।

সুকান্তি চপচাপ শুনেলেন কিন্তু তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ একমত হননি। চাক উদাহরণ দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিনা পার্টিতে কাই শেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন চেয়েছিল এবং সেই সমর্থনের কারণেই দিয়ে তারা বড়বার চেষ্টা করেছে চিনের পার্টিকে চিনা কাই-শেকের সঙ্গে জুড়িয়ে দেওয়া। যাতে সে তুচ্ছ তা হতে দেখানি। তিনি চিনা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই আরি রেখেছিলেন। সুকান্তি বললেন, উদ্ভাসের এসব ঘটনা খোকন যে জানে না কেমন নয়, তবু কেন সে ওরা এমন করতে।

চাক কোনো স্বত্বাধীনতা জানালেন না। সুকান্তিও নীরব। তারপর তিনিই কথা শুরু করলেন। আমার মনে হয় যেহেতু চিন সমর্থন করছে ইয়াহিয়াকে, তাই ওকে প্রগতিশীল না দেখালে চিনের সমর্থনের যুক্তিটা সবার মনে ধরবে না। এই চিন্তা থেকেই ভুলের সূত্রপাত। চাক মৃদু হাসলেন। খোকনের এই মতামত চারু'র জানা। তিনি ওকে বলেছিলেন, পার্টির যে সব কাজ ওর পছন্দ হচ্ছে না, বিশদে লিখিতভাবে জানানো। খোকনের বক্তব্য নিয়ে দলের ভেতর আলোচনা হবার কথা। যেখানে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি জানা যাবে। সেই লক্ষ্যে শুরু হবার মুখে এমনভাবে গুজবের মতো নিজেদের মতামত ছড়িয়ে দিলে, দলের লুপ্তলা ভেঙে যায়।

চাকদা আরও একটি কথা বলেছে ওরা....

এই পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গেই?

.. না না, ...স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা.....

চাক হির চোখে তাকালেন। সুকান্তি একবার তার ডায়েরিতে লেখা সূত্রগুলিতে চোখ বুজিয়ে নিলেন। আপনি নাকি অনাবশ্যক শর্ত আরোপ করে বাহিনী গড়ার কাজ পিছিয়ে দিয়েছেন?

— দ্যাখো, কৃষিবিপ্লব সফল করতে হলে সংগ্রামের নেতৃত্বে দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষককে আনতে হবে। তাই আমরা বলেছি, গণমুক্তি ফৌজের কমান্ডার নির্বাচন করবার সময় দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকের ওপর জোর দিতে হবে। এটাকে যদি পূর্বশর্ত বলা হয় তাহলে এই শর্ত দ্বিধাহীনভাবে মানতে হবে, না হলে শ্রেণীসংগ্রামকেই অস্বীকার করা হয়। খাটের ওপর জোরে একটি ঘুঁষি মারলেন চারু। এই শর্ত অনাবশ্যক? ওরা কী করে বলে এমন আশ্চর্য কথা.....

— ওরা একথাও বলছে যে, ঘাঁটি এলাকা গড়া নিয়ে পার্টি নেতৃত্বের কোনো পরিকল্পনা নেই.....

ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা বললেই ঘাঁটি গড়ে ওঠে না। চারু তেতে উঠলেন। ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চাই একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং চাই রাজনীতি সচেতন জনতা.....

সুকান্তি বললেন, আপনি এ নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু একটা লিখুন, আমরা দেশব্রতীতে ছাপি আপনার বক্তব্য। চারু মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ লিখতে হবে.....লিখব শিগগির.....। লেখার কথায় মনে পড়ল, অন্ধ্রের কমরেডদের অভিনন্দন জানাতে হবে। ওঁরা নানান বিপর্যয় কাটিয়ে আবার সংগ্রাম গড়ে তুলছেন। অবিলম্বে ওদের একটা চিঠি পাঠানো দরকার। কিন্তু ইদানীং লিখতে গেলে হাত কাঁপে খুব। তাঁর কথায় শুনে কেউ লিখে নিলে ভালো হয়।

সুকান্তিকে অনুরোধ করায় উনি রাজি হয়ে গেলেন। অন্ধ্রের চিঠিতেও চলে এল দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের কথা। — কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে আমি আপনাদের একান্তভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ওপর নির্ভর করার অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ কেবল তাঁরাই পারেন আমাদের দেশের কৃষি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে এবং তাঁরাই অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যের বাহক।

সুকান্তি বলে উঠলেন, চন্দ্রদা এখানে শ্রমিকদের কোনো ভূমিকা নেই? একটানা বলে যাওয়ায় বাধা পেলে নিজস্ব যুক্তির পরম্পরা এলোমেলো হয়ে যায়। চারু বিরক্ত হলেন। — এ নিয়ে পরে কথা হবে। আবার চিঠির কথায় ফিরে গেলেন তিনি।

ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করুন, প্রতিটি স্কোয়াডের জন্য একটি কাজের এলাকা নির্দিষ্ট করুন এবং সংগ্রামের বিকাশের জন্য তাদের উদ্যোগের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করুন। কেবল এই উপায়েই স্কোয়াডগুলি রাইফেল ও বন্দুক ছিনিয়ে নিতে পারে এবং দৃঢ়তার সাথে সেই রাইফেল হাতে নিয়ে আমরা জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করতে পারি।.....

চিঠি বলা শেষ করে চারু জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতার কী খবর?

ভালো না চন্দ্রদা। আমাদের ছেলেরা শহীদ হচ্ছে রোজ। পুলিশ-মিলিটারি-নব কংগ্রেস সবাই মিলে খুন করছে নকশালদের। সি পি এম মজা দেখছে। ওরা ধরিয়ে দিচ্ছে আমাদের কমরেডদের।

এই খবর নতুন নয়। অন্যান্য সূত্রেও একই রকম খবর পেয়েছেন চারু। বোঝা যাচ্ছে উনিশশো একাত্তরের দ্বিতীয়ভাগে এসে আন্দোলন ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী

হয়ে উঠেছে। গাননি ওঠায় যোগান দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে কংগ্রেসের শক্তি বাড়িয়ে দিল। ভারতেরই চালু করে দিল মিসা মেনটিনাস অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। কিনা বিচারে জেলে পুড়ে রাখার নয়া দমন ব্যবস্থা। তিনমাস সরকার চালানোর পর রাজ্যে অজয় মুখোপাধ্যায় নিজস্ব সিং নাহােরের ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেল। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন। ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসী সিদ্ধার্থস্কর রায়কে করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডানসাল মন্ত্রী। শোকটির হাবভাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতো।

রাজ্যের এখন এক গড়গড়ে অবস্থান সুযোগ নেওয়া যাচ্ছে না। দলের আন্দোলনে জড়ি। জেলের মধ্যে কমরেডদের খতম করেছে পুলিশ। কমরেডরাও মরণগণ লড়াই করে কখনও মারিভেন, কখনও মরণে। ডুমো সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই নিহত হচ্ছেন চোখের মণির মতো কমরেডরা। চাকর চোখে জল চলে আসে। বুকে কষ্ট হয়। নিঃশ্বাসের কষ্ট। নুকে বাথা। বাথার তীব্রতা বাড়ে। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে বাম বাহুতে। চাকর কোনোক্রমে বলে ওঠে, টনজেকশন। এবি ছুটে আসে। দুমিনিটের মধ্যে পেথিডিন ইনজেকশন দিতে শুরু করে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। খাটের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বলে থাকে চাকর। দ্রুত লাগে খুব। ঘুম পায়। বিছনায় শুয়ে পড়েন তিনি।

পরদিন দুম ডাক্তার চাকর দেখলেন সুনীতিবাবু। সঙ্গে কালু ডাক্তার।

এঁরা খনন পেলেন কী করে? কোনো খবর পেয়ে নন্দা এমনিই, তাঁকে একবার দেখানোর জন্য শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কালু ডাক্তারকে। গাড়ির ইঞ্জিনটা একবার পুরনো মিলিকে দিয়ে দেখিয়ে ওঠে আর কী। কালু ডাক্তার হাসেন। বহুদিন পর কালুবাবুকে দেখে আনন্দ লাগে। হ্যাঁ, ডেডমিগ্র একদমই দেখে গেলে তো ভালোই। হাসতে হাসতে হঠক বাড়িয়ে যেন চাকর। বাড়ানো ওঠে পুরনো কালু ডাক্তার। চাকর কাঁধ স্পর্শ করেন। ভারতের বাড়ি টিলে লম্বা এক করে দেন।

সুনীতিবাবু চলে আসায় সুনিগা হল কিছা। মৌরেনের কথা, খোকনের কথা নিয়ে দ্রুত আলোচনা করে ফেলা ফেল। ওদের নামানো দরকার। ঠিক হল সুনীতিবাবু ফিরে গিয়েই পরোজগণের সঙ্গে এসে। আলোচনা করে ঠিক করবেন কী করা উচিত। সুকান্তির দায়িত্ব এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত চাকর কাছে পৌঁছে দেবার।

কথাবার্তা হয়ে যেতেই চাকর সুকান্তিকে তাড়া দেন। আর দেরি নয়, এবার বেরিয়ে পড়ুন। কালুগুণকে নিরাপদে শিলিগুড়ি পৌঁছতে হবে। সাবধানে যাবেন। কালু ডাক্তারকে নিয়ে সুকান্তি পৌঁছে পড়েন। পরদিন সুনীতিবাবুও চলে যান। যাবার আগে পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই আর গণমুক্তি গাঠনী, গাটি এলাকা নিয়ে লেখাটি দ্রুত শেষ করবার তাগাদা দেন একবার।

দু দিনদিন আদার পর একদিন এসেই লেখাটা হয়ে গেল। লেখাটি একবার পড়লেন। বার বার পড়লেন। চারটি লম্বা পদল করলেন। আবারও একদিন সকালে লেখাটি নিয়ে পড়লেন চাকর। দু দিনটি বাকি পড়তেই আওয়াজ এল, চন্দ্রদা। চাকর মুখ তুললেন। সুকান্তি। চলে এসেছেন, দুখ গাঠনী। চোখে রাত আগার ছাপ।

কী হয়েছে? সুকান্তি পয়স পোয়া যেত না এই সেদিনও। এখন হঠাৎ যেন পয়স বেড়ে গেছে। চাকর আবার পেলেন, কী হল?

সুকান্তির ঠোট কাঁপছিল। নিশ্চয় কোনো খারাপ খবর। হয়তো জেলের মধ্যে কমরেডরা লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। বিপ্লবের পথ তো এমনই রক্ত রাজানো।

— চন্দ্রদা, সরোজবাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে..... তারপর থেকে ওঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না.....

— সে কী! কোথা থেকে ধরল?

সুকান্তি জানাল বসন্ত রায় রোডের শেলটার থেকে ধরা হয়েছে ওকে। ধরা পড়ার সময় উনি নিজের নাম বলেছেন বীরেন রায়। পুলিশ জানিয়েছে সরোজবাবুকে ওরা গ্রেপ্তার করেনি। আর বীরেন রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চারু বুঝে গেলেন। এ জিনিস অস্বস্তি ওরা বহুবার করেছে। যাকে ধরল তার নাম ধাম খাতায় তুললই না পুলিশ। তারপর ধৃত লোকটিকে সোজা গুলি করে মেরে দিল। গ্রেপ্তারের তালিকায় লোকটির নামই নেই, অতএব লোকটির মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ জড়িত নয়। পাকা ব্যবস্থা। এখানেও নিশ্চয় সেইরকমই ঘটেছে।

— মনে হচ্ছে ওরা সরোজবাবুকে মেরে দিয়েছে। চারু আতঁনাদ করে উঠলেন। খারাপ খবরের এখানেই শেষ নয়। দু-তিন দিন আগেই কাশীপুর, বরানগরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে নব কংগ্রেসী গুন্ডারা নকশাল সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে এনে খুন করেছে। খুন করে নিহতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। একরাতে প্রায় শ'দেড়েক ছেলেকে মেরেছে ওরা। ঠেলাগাড়ি, রিক্সা চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই লাশ। পুলিশের ভূমিকা নীরব দর্শকের। সেই রাতে এলাকায় তোলকিইনি পুলিশ। আর সি পি এম? কোনো কোনো উৎসাহী সি পি এম সমর্থক তো নকশালদের বাড়ি চিনিয়ে দিতে ব্যস্ত। পরদিন গর্ব করে কংগ্রেসীরা বলেছে এতদিনে নকশাল মুক্ত করা গেল কাশীপুর-বরানগরকে। এতদিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হল শহরতলীতে।

চারু আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। তবে কি সব শেষ হয়ে যাবে? বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা শেষ হবে এমনই কিছু মর্মস্পন্দ মৃত্যুতে? এমন শোকের আবহে চিন্তাভাবনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সুনীতিবাবুর নাম করে লেখা চাইল সুকান্তি। যে লেখাটি তিনি পরিমার্জনা করেছেন সেই 'গণমুক্তি বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকার প্রশ্ন' লেখাটি দিয়ে দিলেন। ভেঙে পড়লে চলবে না। সরোজবাবুকে নিয়ে, কাশীপুর-বরানগরের শহীদদের নিয়েও কিছু লেখা দরকার। সরোজবাবু সারাটা জীবন দিলেন বিপ্লবের কাজে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে ভয় করত না এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নেই। গদ্যের মতো ওঁর কবিতাতেও কী তীব্রতা! প্যাট্রিস লুমুম্বার আফ্রিকা নিয়ে লেখা কবিতার অনুবাদ করেছিলেন সরোজবাবু। '... সকাল হয়েছে বন্ধু / চেয়ে দেখ আমাদের মুখের দিকে, / জ্বলজ্বল করছে এক নতুন শপথ / চেয়ে দেখ, পুরানো আফ্রিকার বুকের উপর/ ভেসে পড়েছে এক নতুন সকাল।' কবিতাটির শেষ অংশ চারু মনে মনে উচ্চারণ করলেন। '... শেকল ছেঁড়ো বন্ধু শেকল ছেঁড়ো! / শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মতো সঙ্গ হবে তোমার / দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দিন! / কালো মাটির বুক চিরে মাথা তুলে দাঁড়াবে / এক স্বাধীন নির্ভীক কঙ্গো! / কালো মাটির অঙ্ককারে কালো বীজের ভেতর থেকে / কালো মুকুলে মঞ্জুরিত হয়ে/ আলোর

আকাশে মাঝা তুলে দাঁড়ায়ে/কঙ্গে আমার কঙ্গো।' কবিতা বলতে বলতে আবেগ উদ্দীপনায় কবিরাজবাবুর চোখে জল চলে আসতো। কেউ কেউ কাঁপতো থরথর করে। এমনই শক্তি সরোজবাবুর। তাঁর পুলিশবাহিনী বিচারের প্রহসনটুকু করবারও সাহস পেল না। ধরবার পরই রাতে তাঁকে হত্যা করল। হত্যা করবার সময় অঙ্ককারকেই বেছে নেয় অঙ্ককারের জীবন। এমনভাবে রাতিয়েই ওরা হত্যালীলা চালান কানীপুর-বরানগরে।

শ্রীহরির স্মরণ করে প্রায় চারশো শব্দ লিখে ফেললেন চারু। সে লেখা ছাপা হল দেশব্রতীতে। সরোজবাবু চলে যাবার পর দেশব্রতীর দায়িত্ব দেওয়া হল সুনীতিবাবুকে। তিনি দেশব্রতী, লিবারেশন দুটোই সামলাবেন। সুকান্তি সাহায্য করবে। একটা মানুষ চলে গেলে শূন্যতা হয়। আগার মানুষই সেই শূন্যতা ভরিয়ে দেয়। সরোজবাবুর শূন্যতা ভরাবার চেষ্টা করলেন সুকান্তি। এবং সুনীতিবাবু। আস্তে আস্তে সব কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা চলল।

একদিন সুকান্তিকে সঙ্গে নিয়ে সুনীতিবাবু এলেন। কী খবর? দেওঘরে গোয়েন্দাদের আনাগোনা বেড়েছে। দলের এক সমর্থক পুলিশ কর্মচারীর সূত্রে সুকান্তি পেয়েছেন এই খবর। অতএব আগার ঠাই নাড়া হতে হবে। দেওঘরের পাট গুটিয়ে অবিলম্বে যেতে হবে খড়িশার চৌদুয়ার। ওইখানে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া গেছে। কোনো বাড়ি ভাড়া লাগবে না। চৌদুয়ার খড়িশার বিখ্যাত মহানদীর একপারে। অন্য পারে কটক। কিন্তু কীভাবে যাওয়া হবে? পুরোটা রাস্তা যাওয়া হবে গাড়িতে। গাড়ির ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছেন সুনীতিবাবু। এবং সেই গাড়ি দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে। চারু বললেন, ভিয়েররি গুড। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান থেকে শুরু করে যে কোনো রকম যাতায়াতের পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে সুনীতিবাবুর মাথা পরিষ্কার। এই সব বিষয়ে চারু খুবই নির্ভর করেন ওঁর উপর।

জান খাত্তা। সেরে সমস্ত ওষুধপত্র গুছিয়ে বেরোতে দুপুর গড়িয়ে গেল। চারু, রবি আর সুকান্তির বরাদ্দ হল গাড়ির পিছনের আসন। সামনে, চালকের পাশে বসলেন সুনীতিবাবু। ওঁর কাছে রাস্তার ম্যাপ আছে। মাঝে মাঝে ম্যাপ খুলে রাস্তা মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি।

রাস্তা ভালো নয়। ঠিকানি বাঁচাতে গাড়ি আস্তে চলছিল। পুরুলিয়া পৌঁছতে শেষ বিকেল। বলরামপুরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। অদূরেই হাট বসেছে। হাট-ফেরত লোকজনকে কাটিয়ে কিছুদূর এগোতেই একজনকে দেখে চারু চমকে উঠলেন। লোকটির পরনে খাদময়লা দুটি, পাঞ্জাবি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। একটু বৃকে হাটছেন মানুষটি। তিনি তো অবিকল সরোজ দত্ত।

লোকটির পাশ দিয়ে গাড়ি চলে গেল। এইবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন চারু। এর সঙ্গে সরোজবাবুর চেহারা তেমন কিছু মিল নেই। শুধু হাঁটার ভঙ্গিতে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। সেজন্যই এমন বিভ্রম হয়েছিল।

দুশপট থেকে লোকটি সরে গেলেও সরোজবাবুর স্মৃতি মন অধিকার করে রইল। অমন জ্ঞানবন্ত মানুষটি পুলিশের ওলিতে মারা গেলেন। অদম্য সাহস সরোজবাবুর। বলভেন, লড়াইয়ে শুধু বাঁচানো মরণে তা কী করে হয়? সেনাপতিদেরও দু-চারজনকে মরতে হবে। আরো পাঁচজন লম্বা লম্বা তাঁর সোঁটে পেগে ছিল পুলিশের প্রতি অবজ্ঞা। হয়তো উপহাসও

করেছেন— এই যে মাইনেখোর মানুষকে কোরা, ঠিকঠাক গুলি চালিও.....ফসকালেই বিপদ.... তোমাদের মালিক মাইনে থেকে গুলির দাম কেটে নেবে।

দুর্বলের মৃত্যু অনিবার্য ও প্রাত্যহিক। যাবতীয় দুর্বলচিত্ত, যারা কর্মণ্য কেবল স্বার্থপরতায়, তাদের মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি হয় না ধরিত্রীর। প্রত্যেকদিন মরতে মরতে তাদের মরণকে আর আলাদা করে চেনানো হয় না। কিন্তু সরোজবাবুর মতো মানুষ? ওই রকম দৃঢ় স্ফুলিঙ্গ! ওই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট! ওই বীর!

হঠাৎ তীর ব্যথা শুরু হল বুকে। কথা বলতে পারছিলেন না চারু। কোনোক্রমে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন রবিকে। রবি হাত ধরল। তারপরেই উত্তেজিত গলায় বলল শীগগির গাড়ি থামাও। হার্ট অ্যাটাক।

সম্পূর্ণভাবে চেতনা হারাননি চারু। তিনি বুঝতে পারলেন, গাড়ির পেছনের আসনেই তাঁকে শোয়ানো হয়েছে। রবি ইনজেকশন দিচ্ছে। একের পর এক। গাড়ির জানালায় দেখলেন সুকান্তির মুখ। মুখে উদ্বেগের ছাপ।

একটু পরে তাঁকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া হল কাছাকাছি একটি বাড়িতে। বাড়িতে ঢোকবার সময় চারু বুঝতে পারলেন এইটি কোনো সরকারি বাংলো। বাড়িটি এখন অব্যবহৃত। নিশ্চয় বাড়ির দারোয়ানকে বুঝিয়ে সৃজিয়ে রাস্তিরে থাকবার বন্দোবস্ত করা গেছে।

একতলা বাড়িটির হলঘরে চারুকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হল। শোবার পরেই সারা শরীর শিথিল হয়ে এল চারুর। আর চোখ বুজে রাখতে পারলেন না।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই চারু দেখলেন রবি ভোর হচ্ছে। দিনের সেই প্রথম আলো স্পর্শ করছে শরীর। শরীরের অস্বস্তি উধাও। চারু উঠে বসলেন। সঙ্গীরা সবাই ঘুমে অচেতন। সারারাত নিশ্চয় ওদের দুর্ভাগ্যই কেটেছে। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন চারু। পূর্বের আকাশ বর্ণময় হয়ে উঠেছে। আবার একটা নতুন দিন। সমস্ত হতাশা ভুলে নতুনভাবে বাঁচতে হবে। উনিশশো পঁচাত্তর সালের মধ্যেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ মুক্তির মহাকাব্য রচনা করবেন। এ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে হবে। শিথিল করলে চলবে না। বাক্য তিনটি মাথায় আসতেই চারু দ্রুত ফিরে গেলেন সঙ্গীদের কাছে। সুকান্তিকে ডাকলেন, উঠুন, উঠুন, ...উঠে পড়ুন। চলুন চলুন, চৌদুয়ার যাই। সুকান্তি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। চারু বলতে লাগলেন, হতাশা নয়, হতাশার ছবি তুলে ধরারই হচ্ছে সংশোধনবাদ।চলুন, চলুন বেরিয়ে পড়ি। চলুন, চলুন।



গভীর অন্ধকার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। তিনটে গ্রুপ ছিল আমাদের। কথা ছিল সামনের দল মিলিটারি, পুলিশের ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে সিগনাল দিলেই, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল ক্যাম্প দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ সবসময় পাহারায় থাকে। তার ওপর আশপাশে ঘোরাঘুরি করে তিন-

চারটি কুকুর। রাজের বেলায় দেশ কুকুরও পাঠারাদার হয়ে যায়। সেজন্য কুকুরগুলোকে আমলি দান নিয়ে অন্য জায়গায় ছেড়ে এসেছি। গাছপালা, জমির আল এগুলো খুব ভাল আড়ালের কাজ করছিল। আমাদের চারজনের দলের হাতে দুটি বন্দুক, একটা বড় টর্চ, একটা তীর মলুক আর একটা টাঙ্গি। সিগন্যাল পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের দেখেই লাভানাদান দুজন ছাওয়া। ওদের কমান্ডার স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ও কিছু করার আশেই আমরা গুলি চালালাম। প্রথম গুলি লাগল স্টেনগানের ওপর। ওর হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি গুলে। কমান্ডার পড়ে গেল। এক ব্যাটা ক্যাম্পের ভেতর বাড়ির ডালার টুক বন্দুক লোড করে চালাবার চেষ্টা করছিল। অন্যরাও বাড়ির ভেতরে অস্ত্র ত্যাগ তৈরি। আমরা থেড়ের ছাউনিতে আশ্রয় লাগিয়ে দিলাম। ওরা বেরিয়ে এলেই গুলি করল। দুখণ্ডে পেয়ে সবাই আত্মসমর্পণ করল।

বাড়িবার খোঁজদারীতে মিলটারি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের বিবরণ শোনাচ্ছিল কমরেড রথীন সেন। কমরেড রথীন অসীম চ্যাটার্জীদের সঙ্গে আছে। এর আগেও ওরা রূপসকুন্ডী, দ্বাশ্রী, সামন্তা ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। কমরেড রথীন আর তার দুই সহযোগীর সঙ্গে আলোচনায় এসেছে নিকপম। ওদের বক্তব্য না শুনেই অসীমদের কাজকর্ম নিয়ে অপবাদ দেওয়া ঠিক নয়।

রথীন বলল, গত দেড় বছর ধরে সি এম-এর লক্ষ্যে আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি।

চাক মজুমদার মনে করেন, শ্রেণীশত্রু খতমের সংগ্রামকে বিস্তৃত করে দেশজুড়ে অসংখ্য 'বিন্দু' তৈরি করলেই আজকের দুর্ভাগ্য সার্বভৌম কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখলে রেখে, বাকি জায়গা আমাদের ছেড়ে দেবে।

বাক্যে, তা ঠিক। জালাল কমরেড রথীন। ভারতবর্ষের এগারোটি রাজ্যে, লক্ষ্মণনগর সব জেলায় আমাদের সংগ্রাম ছড়িয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে, মেদিনীপুরে ছত্রিশটি থানার ছেতর বাড়িঘর খানায় আমরা শ্রেণীশত্রু খতমের লড়াই ছড়িয়ে দিয়েছি। এছাড়া পাশের রাজ্য বিহারের সিংভূম জেলার দুটি থানায়, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার তিনটি থানায় খতম অভিযান চলেছে। ঝাড়ুড়া জেলার কয়েকটি থানাতেও আমাদের নেতৃত্বে খতম হয়েছে। এ পাশে একশো কুড়িজন শ্রেণীশত্রু খতম করেছে আমরা। কিন্তু, কোনো বিশেষ এলাকায় খাঁটি গোড়ে বসে, বাকি এলাকা ছেড়ে পালাবার বিন্দুমাত্র কোনো লক্ষণ নেই লাক্ষ্মণাশীলদের।এমনকী কোনো প্রবণতাও নজরে আসেনি আমাদের। রথীন একটু খামল।

নিকপমও চুপ। এম উত্তরে সেই বা কি বলবে। রথীন তো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছে। এই অভিজ্ঞতা লক্ষ সত্য সমস্ত তাত্ত্বিক কথাকে এক সেকেন্ডে নাকচ করে দেয়।

রথীনের ভাল লাগে নস। জেলাটি বলল, আমরা আরও একশো কুড়িটি খতম, প্রয়োজনে আরও বেশি করতে রাজি, কিন্তু প্রতিটি হত্যার সঙ্গে সি এম লাইনের ভুল আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

রথীন লাগ দিল। লাক্ষ্মণাশীল খতম নিখরাস বোঝা হয়ে চেপে বসছে। রথীনের বাম পাশের

ছেলে বলল, একসময়ে ওই অঞ্চলের পাটিতে প্রায় চল্লিশ হাজার কৃষক যোগ দিয়েছিলেন....
হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া এখন বাকিরা সবাই নিষ্ক্রিয় সমর্থক.....

রথীন মাথা নাড়ল। আসলে ব্যাপারটা এইরকম, নিরুপমের দিকে তাকাল রথীন।
জোতদারকে জনগণ কী করতে পারেন জনগণ বুঝেছেন। পুলিশ আমাদের কী করতে
পারে দেখেছেন। ওঁরা জানতে চান, পুলিশকে আমরা কী করতে পারি?

রথীনের ডানপাশের সহযোগী বলল, যতক্ষণ না এই উত্তর দেওয়া যাচ্ছে, অধিকাংশ
কৃষক এমন নিষ্ক্রিয় সমর্থকই থেকে যাবেন.... পরের দিকে কেউ কেউ বসে যেতেও
পারেন। গ্রামের বিষয় নিরুপম ভাল বোঝে না। শহর বা শহরতলির আন্দোলন নিয়ে
কথা হলে, সেই আলোচনায় নিজের মতামত জানাতে পারত। যেন তার মনোভাব বুঝেই
কমরেড রথীন বলল, কলকাতায় যে অজস্র বীর ছাত্র-যুবক জীবনদান করলেন, তার সবগুলি
প্রয়োজনীয় কি না, ভাবা দরকার....

নিরুপম বলল, কমরেড, সংগ্রামে জীবনদান অনিবার্য.....বিপ্লবের পথ তো রক্ত ঝরা
পথ.....

রথীন থামাল নিরুপমকে। ঠিক কথা, একদম ঠিক। কিন্তু এটাও বোঝা দরকার প্রতিটি
প্রাণের মূল্য আছে.... তা খরচ করবার আগে দু'বার ভাবতে হয়, এর বিনিময়ে কতটা
লাভ হবে আমাদের সবার....তা ছাড়া শহরে শত্রুরা অনেক বেশি শক্তিশালী।

তবে কি শহরে সশস্ত্র লড়াই হবে না? কথাটা শুনেই নিরুপম তাকাল রথীনের চোখে।

— আমরা একবারও বলছি না শহরে সশস্ত্র সংগ্রাম হবে না....এ চিন্তা দক্ষিণপন্থী
বিচ্যুতি, সি পি এম-এর লাইন....আবার শুধু আকর্ষণ করলেই শহরের সব সমস্যার সমাধান
হবে এই চিন্তাও ভুল....এটা বামপন্থী বিচ্যুতি....

— তবে, শহরে তোমরা কীভাবে এগোতে চাও?

— এখানে আমরা গেরিলা কায়দায় শ্রেণীশত্রু খতম করব, আবার তার পাশাপাশি
ধর্মঘট, বন্ধ জাতীয় গণ-আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে আমাদের.....পুলিশের অত্যাচারের
বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে তুলব আমরা....

এই কথাটা সুকান্তিদাও বহুবার বলেছেন। মনে মনে যুক্তি মেনে নিলেও, শরীরভাষায়
নিজের মতানৈক্য জানিয়েছে নিরুপম। সুকান্তিদা আহত হয়েছেন। কিন্তু আত্ম এইসব
কৃষকদের-মধ্যে-থেকে আন্দোলন-গড়া মানুষ যখন তেমন কথা বলে, ভাবতে হয়। কোথাও
একটা ভুল হচ্ছে।

শহরে, গ্রামে সব জায়গাতেই গোপন সংগঠন, গেরিলা অ্যাকশনের পাশাপাশি
গণআন্দোলন, গণসংগঠন গড়ে তোলবার পক্ষে মতামত জানাল রথীন।

অনেকেই আছে যারা গণআন্দোলন, গণসংগঠনের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইয়ের কোনো
সংস্পর্শ রাখতে চায় না। এমনকী তারা সশস্ত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এ যেমন
ভুল চিন্তা, তেমন আবার গণআন্দোলন, সংগঠনের যুক্ত হলেই সে সশস্ত্র লড়াই থেকে
সরে যাবে এমন কথাও মারাত্মক ভুল। এদের ভাবখানা এমন প্রকাশ্য গণসংগঠন গড়লেই
জনগণ পাল্টি খাবে। জনগণ যে বিপ্লব করতে আগ্রহী, সে কারণেই তারা অত্যাচারী,
শ্রেণীশত্রুদের খতম করছেন, এই কথা ওরা ভাবে না। ওদের পন্ডিতরা ফতোয়া দিচ্ছেন,

‘জব্বার’ না ‘বোটার’ মৃত্যু জনগণ ঠিক রাস্তায় চলছে! রথীদের গলায় বিদ্রূপ। এটা জনগণের ওপর অমানুষ্য, তাদের অপমান করা....। নিরুপমের কান মুখ লাল হয়ে গেল। বোকাই যাচ্ছে এটা বিদ্রূপের তীর চারু মজুমদারের অঙ্ক ভক্তদের দিকে। কিন্তু এ কথারও কোনো জবাব হয় না। সত্যিই তো এই দেড় বছরে শহরে গ্রামে কোনো গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়নি।

রথীন আগার বলল, আমরা শহরে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তেমন কোনো কাজই করিনি এতদিন। ওদের মধ্যে সংগঠন গড়বার জন্য পার্টিকে অবশ্যই ভাবতে হবে। এ কথাও পূর্বাভাস দেওয়া, একাধিকবার।

নিকপম বলল, কিন্তু তোমরা দলের মধ্যে এই প্রশ্ন তুলছ না কেন? এই কথাগুলো তো রাজা কমিটি, সেম্ভাল কমিটির শোনা দরকার....সি এম-এর কানে যাওয়া দরকার....।

রথীন হাসল। পার্টি কমিটিগুলো সব অকেজো। কেউ কোনো প্রশ্ন তুললেই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, চারু মজুমদার বলেছেন, মানতে হবে

এই কথাটাও রথীন ভুল বলেনি। নিরুপমের শহরের অভিজ্ঞতাও সেইরকম। তা ছাড়া পূর্বাভাসের মুখেও ওনেছে এই বিপ্লবী কর্তৃত্বের কথা।

নিকপম বলল, দেখ বিপ্লব করতে গেলে হয়তো এমন সর্বজনগ্রাহ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। সংকেটের সময় গোপনে দ্রুত কাজকর্ম করবার জন্য কর্তৃত্বেরও প্রয়োজন আছে। এমন এক কর্তৃত্ব যার কথা কেউ অমান্য করবে না। এমন না-হলে সৈন্যবাহিনী চালান যায় না। কিন্তু কর্তৃত্ব মানে তো কোনো একজন লোকের ইচ্ছা, অনিচ্ছা নয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটি থাকা উচিত একাধিক নেতার নেতৃত্বের হাতে।

রথীন বলল, এখন সে সব নোট...। সি এম-এর নাম করে সবকিছু চলছে.... এইসব নিয়ে আলোচনার জন্য, বিচারে সভানারায়ণ সিং, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ডেকেছিলেন। সেট সভায় চারু মজুমদার, সুনীতি ঘোষ যোগ দেননি। ওই মিটিঙে নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়েছেন সভানারায়ণ। চারু এবং সুনীতিকে বহিস্কার করা হয়েছে। সেট সভাতে যোগ দিতে যাবার পথেই দেওঘর থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন অসীম চ্যাটার্জী।

রথীনদের সঙ্গে আলোচনা শেষ হতে সন্ধে হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর স্ট্রিট দিয়ে সোজা এসে সুকিয়া স্ট্রিটে পড়ে ডানদিকে ঘুরতেই লোহার ফটকওয়ালা বাড়ি। বাড়ির পাশেই ছোট্ট চায়ের দোকান। চায়ের দোকান পেরোতেই খটকা লাগল নিরুপমের। দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে থাকা দুটি লোক যেন ওকে দেখে সচকিত হয়ে উঠল। ওনে ওনে কুড়ি পা হেঁটে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নিরুপম। ডান পা থেকে চটি খুলে দেখবার ভান করে আড়চোখে দেখে নিল চায়ের দোকান। যা ভেবেছিল তাই। লোকদুটি খোঁচড়। তার মানে এরপরে যেখানে মিটিং হবার কথা সেই রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটের দিকে আর যাওয়া চলবে না। নিরুপম উল্টো পথে হাঁটা লাগল। খোঁচড় দুটোর পাশ দিয়ে সোজা চলল আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে। অতর্কিতে পালাতে হবে।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়ে, বাঁ দিকে ঘুরতেই বুঝতে পারা গেল লোক দুটি পিছু নিয়েছে। কী করে খবর পেল গোয়েন্দারা? এই আলোচনাতে যোগ দেবার কথা তো তার ইউনিটের শঙ্করদা ছাড়া আর কাউকে বলেনি নিরুপম। রথীনদের থেকেও খবর পেরেনো শঙ্করদা। তবে

কী সর্ব্বের মধ্যেই ভূত? কিন্তু সে সব ভাবার সময় নেই। এই জাল কেটে বেরোতেই হবে। রাস্তায় হেলতে-দুলতে চলল নিরুপম। ওদের বুঝতে দিলে চলবে না যে সে সতর্ক। ব্যাটারা ভাবছে, নিরুপম কোনো মিটিঙে চলেছে। সেইখানে পৌঁছলে সবাইকে একসঙ্গে ধরবে। অর্থাৎ আজকের মিটিং হবার খবর ওরা পেয়েছে। সুকিয়া স্টিট এলাকায়, তাও জানে। শুধু সঠিক জায়গা আর সময়টা ওদের জানা নেই। এই দুটিই ঠিক হয়েছে মিটিঙের আধঘন্টা আগে। সেই জন্যই আর কাউকে বলতে পারেনি নিরুপম।

হাষীকেশ পার্ক পার হতেই বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল নিরুপম। থ্রি-বি। সোজা বউবাজার ধর্মতলা হয়ে চলে যাবে আলিপুর। পালানোর একটা চেষ্টা করে দেখা যাক। বাসটা কাছাকাছি আসতেই লাফিয়ে প্রথম দরজায় উঠে পড়ল নিরুপম। জানালা দিয়ে একবার দেখে নিল পিছু-নেওয়া লোক দুটিকে। ওরা দৌড়ছে। হাত দেখিয়ে থামতে বলছে বাসটিকে। পেছনের দরজার কন্ডাকটর ওদের দেখতে পেয়ে বাস থামানোর ঘন্টি মারল। দরজায় চাপড় মেরে হাঁক পাড়ল, প্যাসেঞ্জার...প্যাসেঞ্জার। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকদুটি উঠে এল পেছনের দরজা দিয়ে। এখন নেমে পালানো যায়। কিন্তু লাভ হবে না। ওরাও নামবে। সামনেই আমহাস্ট স্টিট থানা। খুব সহজেই ওরা ধরে ফেলবে নিরুপমকে।

মাথায় একটা বুদ্ধি আসতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নেমে পড়ল নিরুপম। নেমেই রাস্তার বিপরীত ফুটপাতে চলে গেল। দ্রুত হাঁটা লাগাল। সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের দিকে। নিজের এলাকায় এলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনে একটা খুব সরু গলিপথ আছে। সে পথে পাশাপাশি দুজনে হাঁটা যায় না। সেই রাস্তায় প্রেমচাঁদ বড়াল স্টিটে ঢুকে পড়া যায়। অত সরুগলিতে ঢুকে খোঁচড় দুটা নির্ঘাত দিশেহারা হয়ে যাবে। সেই সুযোগে পালানোর পথ পরিষ্কার।

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের মুখে সুকান্তিদাকে দেখতে পাওয়া গেল। উনি এগিয়ে আসছিলেন। এখন কথা বলতে গেলে সুকান্তিদাও বিপদে পড়বেন। চোখ মটকে দ্রুত পাশ কাটাল নিরুপম। তীক্ষ্ণ মৃদুস্বরে বলল, পুলিশ। ছুট লাগাল গলিপথের উদ্দেশে।

অনুসরণকারীরা বিকট চিৎকার করে উঠল। ধর ধর...শালাকে...ছিনতাইগাও...পালাও... গলিতে ঢোকার মুখে মাঝবয়সী একজন পথ আটকাল। ঘৃণি চালাল নিরুপম। কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগল না। পিছনের লোকদুটি ছুটে এল, কলার চেপে ধরল নিরুপমের। গুয়োরের বাচ্চা, পালানো হচ্ছে...। ওর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল।

চার পাঁচজন পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে নিরুপম বলল, আমি ছিনতাইবাজ নই, আমি রাজনৈতিক কর্মী। আমাকে এরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। স্লোগান দিল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম।

একটা খোঁচড় গালে সজোরে থাপ্পড় মারল। পাশ্টা কিছু করার উপায় নেই নিরুপমের। দু-হাত বাঁধা। পথচারীরাও কোনো কথা বলল না।

একটা ট্যান্ডি থামিয়ে তোলা হল নিরুপমকে। তার দু-পাশে দুই পুলিশ। সোজা লালবাজার যাবার নির্দেশ দেওয়া হল ড্রাইভারকে।

লালবাজারে ঢোকবার মুখে দুজন সান্ধি গাড়ি থামাল। দু'জনেরই কোমরের ডানদিকে

বেস্টের সঙ্গে প্রায় তিন চার ফুট লম্বা, দু-তিন ইঞ্চি চওড়া ক্যান্ডিস জাতীয় ফিভের সঙ্গে বন্দুক মাটিকানো। বন্দুক-রাইফেল ছিলতাই ঠেকাতে বছরের গোড়ার দিকে চালু হয়েছে এটি গানধা।

নিকপমের ডানপাশের খোঁচড়টি ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাসল। বলল, এড়ানোর কেস। ধারণক্ষী পুলিশটি একবার ভালো করে দেখে নিল নিকপমকে। তারপর তেতনের দাবার অনুমতি দিল।

জিরিন ফুট এগিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে। দোতলায় উঠে ডান দিকে কিছুটা এগোলেই এড়ানোর দপ্তর। বড়বাবুর ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর। আলো জ্বলছে। তখন তার তেজ কম। কোনো অব্যব স্পষ্ট দেখা যায় না। একটি সিলিং ফ্যান ঘুরে চলেছে কিন্তু তার হাওয়া ভূমি স্পর্শ করে না। একটি হাতলবিহীন চেয়ারে বসানো হল নিকপমকে। উল্টো দিকে খালি টেবিল। একটা কালো, বেঁটে, মোটা লোক ঢুকল।

কোথেকে ডুপলি মালটাকে? টেবিলের ওপর বসে পড়ল লোকটি। সাতকাহন করে নিকপমের গোপ্তারের বিবরণী জানাল খোঁচড় দুটো। — স্যার, মালটা পালাবার চেষ্টা করছিল।

ওম। সিগারেট দরাল বেঁটে। নিকপম লক্ষ্য করল, বিদেশি সিগারেট। লোকটার চলনে, এলো খুঁট গাশভাঙ্গী ভাব আনবার চেষ্টা। ওর পাশে এই খোঁচড় দুটি ছাড়া আর কেউ নেই। এমন আধা খোঁচড়া লোক কী বড়বাবু? মনে হয় না।

গাম কী তোর? নিকপমের দিকে তাকাল বেঁটে। এমন বানানো লোককে নিয়ে রগড় করতে খজা। ফোলাল, বেলুনো পিন ফোটাবার মতোই এক সেকেণ্ডে চুপসে দেওয়া যায় এই ভয় দেখান মুখ। পরিশ্রমে কী মনে? মারবে...মেরে ফেলবে। বিপ্লবের রাস্তায় যে কোনো সময়ে তার মৃত্যু হতে পারবে সে কথা জেনেই এ পথে পাড়ি দেওয়া। কোনো ভয় দেখানোর আয়োজনকেই আর ভয় করে না নিকপম।

বাগচোত কামো কি বাঁচ পুরে এসে আচিস? নাম জানতে চাইলাম না?

না জেনেই কী মনেছেন? নিকপমের ঘাড় শক্ত হয়ে গেল। সজোরে থান্ড মারল বেঁটে।

গা জানতে চাইছি বল।

গাল খালা করছিল। ঠোঁট চাটতে নোনতা লাগল। নিশ্চয়ই রক্ত। মাথা গরম হয়ে গেল নিকপমের।

গাম বল? কলম হাতে কাগজে চোখ রাখল বেঁটে।

হরিন্দাস পাল...

আম। কী?

নিকপম গুণে গেল, তার সঠিক পরিচয় এখনও জানে না পুলিশ। আমোদের ইচ্ছা পেয়ে বলল তাকে।

আজ্ঞে, হরিন্দাস পাল...

দাবার নাম?

গাচরির পাল...

— বাবা কী করে?

— ভাজে...

— কী!

— ভ্যারেণ্ডা ভাজে। ধীর লয়ে উচ্চারণ করল নিরুপম। লাফিয়ে টেবিল থেকে নামল বেঁটে। শুয়োরের বাচ্চা ... মাজাকি হচ্ছে ... পেটা শালাকে। অবিরাম লাথি, ঘুঁষি চালাতে থাকল তিন পুলিশ। কত আর মারবি তোরা? নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইম্পাত' পড়ে যে বড় হয়েছে, জুলিয়াস ফুচিকের পথে যে পা বাড়িয়ে, তাকে তোরা কত মারবি মেরে নে। কিছুক্ষণ পরে ধারাবর্ষণ থামে। — বড়বাবুকে খবর দে। বেঁটে বেরিয়ে যায়। তার অনুমান সঠিক। এ বড়বাবু নয়। লোকটির পরাজয় দেখে শরীরের এত কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল নিরুপমের। আধঘন্টা পরে যে লোকটি ঘরে ঢুকলেন, তাকে না চিনলেও বোঝা গেল, এই চলমান বস্তুটিই বড়বাবু।

— কী রে তোর দীপঙ্করদা কোথায়?

নিরুপম চুপ করে রইল। বড়বাবু ভুরু নাচালেন। চন্দন?

দুটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর নিরুপমের জানা। কিন্তু বলে দেবার কথাই ওঠে না।

লাস্টু কোথায়? লাস্টু?

নিরুপম আবারও নিশ্চুপ।

লাস্টু কোথায়? জানিস না তো? বড়বাবু ঠোঁট বঁকিয়ে হাসলেন। তাকে বলতে হবে না। আমিই বলে দেব। বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন।

আঙুলে পিন ফোটানো নয়, পেছনে বুক ঢোকানো নয়, গাঁটে গাঁটে লাঠির বাড়ি নয়, বারে বারে জেরা নয় — সাদামাঠা তিনটি প্রশ্ন শুধু। উত্তর না পেয়ে, দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন। খুবই আশ্চর্য কাণ্ড! উনি কি অহিংসা পালন করছেন আজকাল?

সময় গড়াল। রাত ঘন হল। একবার কেউ যেন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকল না। নিরুপম একা বসে কোনো কুলকিনারা পায় না এমনত গিচা ঘটনাক্রমের।

রাত সাড়ে বারোটার সময় সেই কালো, বেঁটে, মোটা এসে ডাকল, চল।

— কোথায়?

— বানচোত, ডাকা হচ্ছে চল....অত প্রশ্ন করবি না।

নিরুপমকে তোলা হল এক জিপগাড়ির পেছনে। ওর দুই পাশে বসেছে দুই বন্দুকধারী। গাড়ির মাথার আচ্ছাদনটি পুরনো। বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। দু-এক জায়গায় বেশ বড় ফাঁক। আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। এখন কলকাতায় প্রায় সব পুলিশ জীপের মাথা জাল দিয়ে ঘেরা। তার কপালেই এমন লজঝড় জীপ !

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপগাড়ি চালু হল। জিপের সামনে চলেছে এক ট্রাক সি আর পি। পেছনে আর একটি বড় জিপ। সেই জিপের পেছনে কালো কুচকুচে প্রিজন ভ্যান। বিরাট কনভয়! নিরুপমের মজা লাগল। তাকে পুলিশ বড় মাপের নেতা ভাবছে।

গাড়ি চলল বউবাজার স্ট্রিট ধরে পূবদিকে। জিপ-ড্রাইভারের পাশে বসেছেন যে অফিসার

তাকে চেনা চেনা পাগাছি। ওকে কোথায় যেন দেখেছে নিরুপম।

আগসার একবার পেছনে ঘাড় ঘোরালেন। কীরে, তোর নাম নাকি হরিদাস পাণ্ডা? আর ডুট নাকি লাস্ট কোথায় জানিস না? আজ তো তোরও ওখানে যাবার কথা ছিল?

একবার চিনতে পারল নিরুপম। এতো সেই কনকেন্দু সান্যাল। মিত্রা সিনেমায় আকর্ষণের সময় টিনই তো জেরা করেছিলেন। এই দেড়-দু বছরে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে অসলোকে। মুখমণ্ডল ভরাট। চোখের তলা ফোলা। চুল উঠে গেছে অনেক। নোকা গায় গাঢ় মদ্যপান করেন ভদ্রলোক। তাহলে উনিই শনাক্ত করেছেন তাকে। দরজার দিক দিয়ে উনিই দেখে গেছেন।

কীরে বান্ধো, বোকাচোদা হয়ে গেলি নাকি? লাস্টদের সঙ্গে মিটিঙ ছিল না তো? নিরুপম নির্বাক। গতকাল যে মানুষটি ভদ্রলোক ছিলেন, পুলিশে কাজ করতে গিয়ে তিনি আজ ভাড়াটে গুন্ডা হয়ে গেছেন। উনি বিলক্ষণ চিনেছেন নিরুপমকে। তা সত্ত্বেও এখন এমন বাক্য ব্যবহার করছেন, হয় তা ইচ্ছাকৃত নতুবা এ তার নিজের মনে জোর আনবার চেষ্টা। নিরুপম বলল, আমি তো বড়বাবুকে বলেই-ছি আমি জানি না....

তাতে বড়বাবু কী বললেন?

বলেছেন, তোকে বলতে হবে না, আমিই বুঝে দেব....

আগসার হেসে উঠলেন। বড়বাবু মাইরি রসিক লোক। তবে তুই বলে দিলে ভালো করাস....

কনকেন্দুটি আমহাস্ট স্ট্রিটে ঢুকে স্কট লেন সামনে দাঁড়াল। স্কট লেন অঙ্কার। ট্রাক থেকে নামল সি আর পি। হইচই করে ছুটে গেল অঙ্কার রাস্তায়। দূর থেকে বোমার আগসার ভেসে এল। কিছু পরে দুটি ছেলেকে ধরে নিয়ে এল সি আর পি। ছেলে দুটির মুখ দেখতে পেল না নিরুপম। তবে ওদের পোশাক এবং পায়ে হাওয়াই চপ্পল দেখে মনে হল গার্লচন্দ্র ছাত্রাবাসের আবাসিক। ওদের তোলা হল প্রিজন ভ্যানে।

কনকেন্দু চপ্পল আমহাস্ট স্ট্রিট ধরে উত্তর দিকে। ডানদিকে সুকিয়া স্ট্রিট। সুকিয়া স্ট্রিট ধরে আগসার সার্কুলার রোড পেরিয়ে সব ক'টি গাড়ি এসে থামল রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে। যুগীপাড়ার দিকে ছুটল সি আর পি। তাহলে কি এই অঞ্চলের সভাঙ্কলটিকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ? কী করে সমস্ত গোপন খবর পুলিশের কাছে চলে যাচ্ছে? নিরুপমের ভয় করল একবার। পেছনের জিপ থেকে দুই বন্দুকধারী পুলিশও ছুটল সি আর পি-র পিছু পিছু। কনকেন্দু সান্যালও উদ্যত রিভলবার হাতে ছুটলেন সেই দিকে।

কিছু পরেই একটি ছেলেকে কলার ধরে টেনে নিয়ে এলেন কনকেন্দু। এবং সেই ছেলে লাস্টু। অর্থাৎ পুলিশ সব জেনে গেছে। কনকেন্দু ওকে ধাক্কা দিয়ে জিপের পেছনে তুলে দিলেন। নিরুপমের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাস্টু। তারপর উঠে বসল নিরুপমের পাশে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একবার বাইরে তাকিয়ে দেখে নিল নিরুপম। কোনো চেনা মুখ নেই রাস্তায়। সি আর পি ট্রাক আর প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে রইল যুগীপাড়ার মুখে। ওয়তো আরও কাউকে ধরবার অপেক্ষায়। এখন চলছে দুটি জিপগাড়ি। নিরুপমদের অনুসরণ

করছে পিছনের জিপটি।

কনকেন্দু বললেন, থ্যাংক ইউ নিরুপম.....লাস্টুর হৃদিশ দেবার জন্য ধন্যবাদ... লাস্টু অবাক। ওর চোখে ঘৃণা। সে ছিটকে চলে গেল বিপরীত আসনে। নিরুপমের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে এল। কী মারাত্মক কাণ্ড। ওদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ লাগানোর পরিকল্পনা। নিরুপম বলল, ভালই ছক করেছেন, কিন্তু জেনে রাখুন এমন করে আমাদের দু'জনের মধ্যে কাটাকাটি লাগানো যাবে না....

কনকেন্দু হাসলেন। আরে লজ্জা পাবার কী আছে? সংকোচেরও ব্যাপার নয়....তুই যেমন খুলে বলেছিস সব, লাস্টুও খুলবে ...তারপর দুজনকেই খালাস করে দেব আমরা....

নিরুপম বলল, শা-লা-, শুয়োরের বাচ্চা....রাবড়ি খচ্চর....

হো হো করে হেসে উঠলেন কনকেন্দু। বাঃ বেড়ে বলেছিস.....রাবড়ি খচ্চর....তলায় কয়লার আগুন, ওপরে পাখার বাতাস.....রাবড়ি খচ্চর....হাঃ হাঃ.....

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পেরিয়ে গাড়ি চলল বিটি রোডের দিকে। টালা ব্রিজ পেরিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। এই রাস্তা চেনে না নিরুপম। রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গুদাম। কোনো বসতবাড়ি চোখে পড়ল না। বসতবাড়ি থাকলে অনেক সময় তার গায়ে রাস্তার নামের ফলক গাঁথা থাকে। তা থেকে জানা যেত রাস্তার নাম। রাস্তার একটি বাতিও জ্বলছে না। চারদিকে ঘন অন্ধকার। গুদামের কাঠামোগুলি অন্ধকারে নিষ্প্রাণ কোনো ঐতিহাসিক সৌধের মতো দাঁড়িয়ে। নিশ্চিন্ত মতো একটিও পথচারী নেই। অতএব স্লোগান দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানাবার পথও খুঁজল না। অন্ধকার রাস্তার প্রান্তে গাড়ি দাঁড়াল। পেছনের জিপ থেকে একজন বৃদ্ধ নিরুপমের জিপের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটির পরনে ওভারকোট, মাথায় টুপি। ভূত নাকি?

অবয়বটি কাছে আসতেই বোঝা গেল, ইনি সেই বড়বাবু। জিপের মধ্যে টুপি পরা মাথা ঢুকে এল। কীরে তোরা নাকি আমার মুন্ডু চাস? বড়বাবুর মুখে মদের গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠল নিরুপমের। মাতাল হলেও, কথটা কিন্তু উনি ঠিক বলেছেন। আজকে দিনেত্র স্ট্রিটের মিটিঙে চূড়ান্ত হবার কথা ছিল এই পরিকল্পনা।

আমায় মারবি?এই নে মার....। বড়বাবুর হাতের তালুতে ছোট গিঁড়লগার। দেখেই বোঝা যায় পয়েন্ট টু-টু বোরের।

মারবি না আমায়? নিরুপম চুপ। বড়বাবু এক পা, দু পা করে পাঁচ সাত ফুট পিছিয়ে গেলেন। আবার বললেন, মারবি না? মার।..... এ কথার কোনো উত্তর হয় না। তবে তুই মর। বাক্যটি শেষ হওয়ামাত্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় নিরুপম আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। বড়বাবু গুলি চালালেন। নিরুপমের দম বন্ধ হয়ে গেল। আচমকা তলপেটে যেন কেউ ঘুষি চালিয়েছে। বুকের ডানদিকে তীব্র কষ্ট। নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় বড় হাঁ করল, কিন্তু হাওয়া ঢুকছে না যে। বুকের ডানদিকে হাত রেখে তীব্র আর্তনাদ করল নিরুপম। দু-পায়ে ভর দিয়ে ছিটকে উঠল। উপরের আচ্ছাদন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল মাথা। তারপরেই জিপের মেঝেতে পড়ে গেল নিরুপম। কাটা গাছের মতো। লাস্টুর চিংকার কানে এল, এ কী... এ কী.....।

হঠাৎ ঠান্ডা লাগতে শুরু করল খুব। একটু ঘুম-ঘুম পেল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

গাড়ির কাঁকানিতে মাঝে মধ্যে চেতনা ফিরে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। এর মধ্যেও বেশ গোপা যায় একটি পুলিশ পা দিয়ে চেপে রেখেছে তার শরীর। মৃত্যু পথযাত্রীর গাঢ়াচড়া কমানোর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে লাশটুর গলা শোনা যাচ্ছে। এ কী করলেনএ কী করলেন আপনারা...

কিছুদূর যাবার পর আবার গাড়ি থেমে গেল। বন্ধ চোখের পাতার ভেতরের অন্ধকার চোখে হ্রস্ব হয়ে যেতে নিরুপম বুঝল কেউ একটা টর্চের আলো ফেলছে তার মুখে। দ্যাখ্ তোমার কমরেডের কী অবস্থা। বড়বাবুর গলা।

লাশটুর আর্দ্রনাদ। তোমরা আমায় মেরো না....মেরো না....।

লাশটুকে টেনে হিঁচড়ে নামানো হল জীপ থেকে। লাস্টুর অনুন্নয় শোনা গেল। আমায় মেরো না...আমার মা পাগল হয়ে যাবে....পাগল হয়ে যাবে...মেরো না আমায়....যা চাইবে তাই করবে.... মেরো না আমায়। লাস্টু হাউহাউ করে কাঁদছে। কিছুপরেই গুলির শব্দ। দুর্মানিটের নিস্তকতা। জলের মধ্যে কোনো ভারী বস্তু পড়বার আওয়াজ। কোনো অর্ধচেতন মানুষেরও এই দুটি শব্দের তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

আবার চলতে শুরু করল জিপ গাড়ি। খুবই ঘুম পাচ্ছিল নিরুপমের। চোখ দুটিকে কেউ যেন আঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। জেগে থাকার চেষ্টা করতে পারা যাচ্ছিল না আর। কিন্তু মাথাটি সজাগ রাখা দরকার। যতক্ষণ সম্ভব চেষ্টাও আছে, যুক্তিবোধ পরিসর দিয়ে চলবে না।

কোথাও একটা গাড়ি থামল। বড়বাবুর গলা শোনা গেল। রায়লখন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এলাকায় লাইট নেভানোর ব্যবস্থা করবে... দেখিস হাসপাতালের ভেতরের আলোও যেন নোভে ... কোথায় শালা কোন কান্ড গুলিওয়ালা বসে আসে ঠিক নেই ... কেউ একটা উত্তর দিল, হ্যাঁ করছি ... ছেলে ফিট করা আছে ... বড়বাবু বললেন, ওড ... । শিউকুমার তুই না, এডিটাকে চূপচাপ ইমার্জেন্সিতে ফেলে আয়। বড়বাবুর আদেশ। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, এলাকা স্কট লেনে রেইড করার সময় ওরা গুলি চালায়। আমরাও চালাই। সেই সংঘর্ষে ...।

গোপা গেল জায়গাটি হাসপাতাল। এবং যেহেতু স্কটলেনের কথা বলা হল, অতএব হাসপাতালটি হয় মেডিক্যাল, নয় নীলরতন। মেডিক্যাল কলেজ হবার সম্ভাবনাই বেশি। গাড়ি নিয়ে সহজে চলে আসা যায়। যে লোকটি নিরুপমকে পা দিয়ে চেপে রেখেছিল, সে পা তুলে নিল। অর্থাৎ এই লোকটি শিউকুমার। শিউকুমার বলল, মালটা বেঁচে নেই তো সাগর....আপনি তো একটু দূর থেকে মারলেন.... এ শালাকেও গঙ্গায় ফেলে দিলে হতো....

না না আমার নিশানা অব্যর্থ। বড়বাবুর আত্মবিশ্বাসী গলা। দূর থেকে না মারলে এককাতার ডেথ গোপানো যাবে কী করে?... আর পাবলিককে জানানো দরকার নিরুপম চাটখাড়ি খতম, সেজন্যই এনেছি এখানে... যা যা রেখে দিয়ে আয়....।

পুলিশটি বলল, তা অবশ্য ঠিক, তবু....

নিরুপমের নাজের, পদ্মের খোঁচা মারল পুলিশটি। ক্ষীয়মাণ অবস্থাতেও ব্যথা পেল নিরুপম। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

— না স্যার, আপনি ঠিকমাল পটকেছে....

— আরে বানচোত গেঁড়েমো বন্ধ করে তাড়াতাড়ি রেখে আয়.... শালা চুতিয়া.... দেহটিকে একটি টুলিতে তোলা হল। বড়বাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো পুলিশটি।

ঠান্ডা চেপে বসছিল সর্বাস্থে। কুঁকড়ে শোবার ইচ্ছে হল খুব। কিন্তু হাত পা নাড়লেই যে ধরা পড়ে যাবে। মনের জোরে সমস্ত ইচ্ছা দমন করল নিরুপম।

হঠাৎ এক নারীকণ্ঠ শোনা গেল। আহা রে, এমন সুন্দর ছেলেটা চলে গেল... কার ছেলে কে জানে....পুলিশগুলো সব শয়তান....।

পুলিশের গাড়ি নিশ্চয়ই চলে গেছে। না হলে মহিলাটি এমন করে বলতে পারতেন না। সমস্ত শক্তি সংহত করে চোখ খোলার চেষ্টা করল নিরুপম। মহিলাটিকে দেখতে পেল সে। ওর মাথায় সাদা টুপি, ক্রিপ দিয়ে আটকানো। অর্থাৎ ইনি হাসপাতালের নার্স। সেই নার্সের মুখ তার মুখে ঝুঁকে আছে। যেন কতকালের চেনা এই মুখ। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রথম প্রেমের মতোই তীব্র। সেই তীব্রতায় ঠোট নড়ে উঠল নিরুপমের।



অস্পষ্ট মুদু আওয়াজ শুনেই পাঞ্চালী এগিয়ে গেল। কী? ব্যথা করছে? যার উদ্দেশে বলা সে বিছানায় শুয়ে নিঃশব্দ। পাঞ্চালী শুকল, নিরুপম....। ছেলে চোখ মেলল। ব্যথা করছে? নিরুপম দু-দিকে মাথা নাড়ল না....। এ ছেলে এমনই। শারীরিক ব্যথার কথা চট করে জানাতেই চায় না। প্রথম ধাপে সহ্য করবে। দ্বিতীয় ধাপেও সহ্য করবে। ক্রমশ ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে শরীর। সংকোচের প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে। তখন নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসবে দু'টি শব্দ — উঁ উঁ। যে আওয়াজ শুনে পাঞ্চালী এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে।

নিরুপমের কপালে হাত রাখল পাঞ্চালী। ছাঁকছে থেকে ভাব। মাথা কমানোর ব্যর্থ খাওয়ানো দরকার, তাহলে ব্যথা এবং গরমভাব দুটোই কমায়ে। ডান হাতে এক চামচ অ্যান্টাসিড নিয়ে, বাম হাতে নিরুপমের মাথায় নেড় দিয়ে একটি তুলে সরল পাঞ্চালী। হাঁ করো.....হাঁ করো.....। নিরুপম মুখ ঝুলল। দু চামচ তরল ওষুধ খাওয়ানোর পরে, ওর মুখের মধ্যে ভাল সহযোগে চালান করা হল যেদনাহর বাড়ি। নিরুপমের পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল পাঞ্চালী। ছেলের মুখে ঐশ্য হাসি। হাসিতে হাল্কা কুয়াশার মতো বিষাদ জড়িয়ে আছে। এমন সময়ে শুধু এক নড় নির্মল দেখায়। মনেই হয় না শরীরে কোনো দংশন আছে।

পাঞ্চালী বলল, কী? একটু ভালো লাগছে?

আবার হাসল নিরুপম। আমার তো কখনওই খারাপ লাগেনি।

— ধুস্তেরি! সত্যি বল না.....

কী করে খারাপ লাগবে? এমন নার্স পাশে থাকলে এমনভাবেই অর্ধেক কষ্ট কমে

দাদা, বাকি কষ্ট কমানোর দায়িত্ব শুধুদের.... তাও ঠিকমতো পড়ছে....। নিরুপম চোখ বুজলো।

৷ লক্ষণ পাখালীর চেনা হয়ে গেছে। বাথা বাড়লেই ও চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে পড়া করবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে আর কথা নয়, ঘুমোনের চেষ্টা করো এইবার। নিরুপমের চলে আঙুল গুলোতে থাকল পাখালী। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল নিরুপম। ওর গায়ে একটি চামর ঢাকা দিয়ে পাখালী উঠে জানালায় দাঁড়াল। তিনটি সাইকেল রিক্সা স্টেশনের দিকে ছুটছে। বিপ্লবীত দিক থেকে আসছে একটি রিক্সা। সামনের পুকুরে পাঁচটি পাতিহাঁস ভেসে চলেছে। ঘর থেকে একে একে গিল দিয়ে ঘেরা এক ফালি সরু বারান্দা। বারান্দার দিল লাল লতাগায়ে ঘেরা। ভালোই আড়াল তৈরি করেছে। বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। বারান্দায় শেষে সদর দরজা। সেটিও লোহার গ্রিলের। দরজায় বড় তালি লাগানো। বারান্দায় নেমে দু-পা হাঁটলেই ডানদিকে ঘনশ্যামদার কামরা। সে ঘরেও তালি লাগছে।

নিরুপমকে নিয়ে পাখালী এখানে তিনদিন হল এসেছে কিন্তু এর মধ্যেই বাড়ির প্রতিটি আনাচকানাচ তার চেনা হয়ে গেছে। সদর দরজা এবং ঘনশ্যামদার ঘরের দু-টি তলাই একবার টেনে দেখে নিল পাখালী। সব ঠিক আছে। নিশ্চিত। তারপর, নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিরুপমকে খাওয়ানো হয়ে গেছে। এরপরে একটাই কাজ। রান্নাঘরে মাটিতে বসে দ্রুত দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া। পাঁচ মিনিট খাওয়া শেষ। ঘনশ্যামদার থালা আর নিজেদের খালাবাটি দুয়ে নিরুপমের পাশে দিয়ে পড়ল পাখালী। পাশ ফিরে নিরুপমকে দেখল একবার। মাঝে মাঝে ওর ঠোঁট ঝিকপে উঠে। গালের চামড়াতেও কুঞ্চন। অর্থাৎ শুধুর মতো ওর বাখান অখণ্ড চলেছে। সবে দশদিন হল অপারেশন হয়েছে, এখন তো বাথা থাকবেই। চিব তল পাখালী। নাম দিকে জানালা। জানালা দিয়ে কাঠ বাদামের পাছ দেখা যায়। এখন গাজল পাতা ফলে গাণার সময়। কিন্তু ঝরেনি। হিসাব অনুযায়ী এখন ঠান্ডা পড়বার কথা, কিন্তু তেমনটা পড়েনি। অনেক কিছুর হিসাব ওলটপালট হয়ে গেছে আজকাল। এট যে নিরুপমকে বাচানো গেছে, সেটাই তো হিসাব উল্টে দেওয়া আশ্বাস। ঘটনা। এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার, নিরুপমের পরিচর্যার ভার পাখালীর হাতে আসে। বিগত ন দশ দিনের কথা ভাবলেই পাখালীর মনে হয় সে কোনো রহস্য-রোমাঞ্চ সিনেমা জেন ভাব দেখছে। একতু তার বিগত পাঁচ-ছ মাসের জীবনযাপনেও যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে।

সোণ গোপাল ওগার পর বেতলা গ্রামের আশ্রয় ছাড়তে হল। পুলিশ আসার সত্তাবনা। পাখালী চলে গেল গামগাড়। গামগাড় দিন পনেরো থেকে আবার বেরিয়ে পড়। উত্তরলাড়া মিলড়া। কোমগাড় আসানসোল-বর্ধমান-বারাসাত এমনকী কলকাতার উপকণ্ঠে মিলজলক জায়গা বরাবরও বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে কটাল পাখালী। দলের কর্মীদের জন্য লড়ন সিরালম আশ্রয়ণ সংস্থা তেমন হারে বাড়ছে না। বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের স্বেচ্ছায় করতে পুলিশ ধরিয়ে। ওরা নানান পাঁচ কয়ছে। কখনও পাটি সমর্থক সেজে ওরটি লজল মিছে আশ্রয়ণ। সেট বাড়ি ব্যবহার করা শুরু হবার কিছু দিনের মধ্যেই

পুলিশ পৌঁছে যাচ্ছে সেইখানে। এমন অবস্থায় ধরা পড়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। কোনো জায়গাতেই একটানা দু-তিন দিনের বেশি থাকতে অসম্ভব হয় পাঞ্চালীর। হঠাৎ মনে পড়ল বসির আলির কথা। নমাজগ্রামের বসির যেমন দ্রোণের বন্ধু, পাঞ্চালীকেও কম ভালোবাসে না। দ্রোণের সঙ্গে দেখা করতে বেহুলা গ্রামে সে এসেছে একাধিকবার। বসির নিশ্চয় পাঞ্চালীকে নমাজগ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

পাঞ্চালীকে দেখে বসির অবাক। খুশি হল খুব। ওর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল পাঞ্চালীর। ইতিমধ্যে ও দ্রোণের খবর পেয়ে গেছে। পাঞ্চালী বুঝল দলের মধ্যে তেমন পরিচিতি না থাকলেও বসির পার্টির যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। হুগলী জেলার সাতটি ইউনিটের সঙ্গে রাজ্যের পাঁচজন ছোট-বড়-মাঝারি নেতার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব বসিরের। পার্টি ইউনিটের চিঠিগুলি নিয়ে বসির পৌঁছে দেয় উত্তরপাড়ার সুবিমলদার বাড়ি। সুবিমলদার বাড়ি হল পোস্টবক্স। নেতাদের কুরিয়র সুবিমলদার বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে তাদের চিঠি। নেতারা ইউনিটকে চিঠি দিতে চাইলে উল্টো ব্যবস্থা। তখন তাদের লেখা চিঠি জমা পড়ে পোস্টবক্সে। বসির সংগ্রহ করে সেইসব চিঠি। উদ্ভিষ্ট অনুযায়ী বিলি করে। বসির বললেও পাঞ্চালী জানে, ওর বলা এলাকার নাম একদম ঠিক কিন্তু ব্যক্তির নাম সঠিক নয়। ‘টেক’ নাম। ছদ্মনাম। বসির ঠিকই করেছে। কোনো অবস্থাতেই পার্টি সংগঠনের গোপনীয়তা ভাঙা উচিত নয়। পাঞ্চালী নিজেকে যেমন শ্রীরামপুরের সাধনদার পোস্টবক্স ব্যবহার করে। কিন্তু বসিরকে বলেছে সুবিমলদার নাম! কমল দাস হল সাধন ব্যানার্জির টেক নাম। নিজের কথা একেবারেই বলতে চায় না বসির। তবে ওর টুকরো-টুকরা কথা থেকে অনুমান করা যায় পার্টির সঙ্গে বেশ গুরুত্ব দেয়। পনেরো দিনে একবার চিঠি আদান-প্রদানের কাজে বসির তিন-চার দিনের জন্য বাড়ির বাইরে থাকে। পাঞ্চালীও তখন অন্যান্য এলাকায় ঘুরে আসে একবার।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় ছটি মাস। হঠাৎ একদিন বসির খবর আনল। দ্রোণ, কৃষ্ণ বাউরি আর মনা মাস্টারের বিচার শুরু হয়েছে। দ্রোণের জন্য বুকের ভেতরটা কেমন উত্থালপাতাল করে পাঞ্চালীর! বসিরকে বলল, কী যাবে নাকি একদিন? বসির হাসল। মাথা নেড়ে বলল, প্রস্তাব মন্দ নয়....।

পাঞ্চালী আর বসির হাজির হল চুঁচুড়া আদালতে। যদিও তার মুখ পুলিশ চেনে না তবু পরিচয় লুকোতে পাঞ্চালীকে কালো রঙের বোরখা পরিয়ে দিয়েছে বসির। নিজে পরেছে কুর্তা, পায়জামা। মাথায় ফেজ টুপি। বোরখা পরে হাঁটতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল পাঞ্চালীর। কিছু পরে রপ্ত হয়ে গেল।

দর্শকাসনে বসে পাঞ্চালী দেখল, আরও অনেকেই এই বিচার দেখতে হাজির। অধিকাংশই নিহত সুধীর দাসের পরিবারের লোক। একেবারে পেছনের সারিতে বসে আছেন দ্রোণের বাবা। মন দিয়ে লক্ষ্য করছেন বিচারের সমস্ত আয়োজন। একমাত্র এই বৃদ্ধটি ছাড়া পাঞ্চালীর পরিচিত আর কেউ নেই দর্শকদের মধ্যে।

বিচার শুরু হল। হাতের কাগজ দেখে সরকারি উকিল বলে গেলেন কীভাবে সুধীর দাসকে খুন করেছে এরা তিনজন। কিছু প্রমাণও জমা পড়ল বিচারকের এজলাসে। কৃষ্ণ বাউরি আর মনা মাস্টারের আইনজীবী বোঝাতে চাইলেন তাঁর মক্কেলরা নিরাপরাধ। জানা

গেল, মাথাচাড়া দিয়ে অন্য কোনো উকিল নিয়োগ করা হয়নি।

আইনজীবীদের নানা শোখ হয়ে যাবার পর বিচারক কৃষ্ণ বাউরিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কিছু নতুন আছে কী না? কৃষ্ণ বলল, সে নির্দোষ। একই জবাব দিল মনা মাস্টার। 'দ্রোণকে কাঠগড়ায় তোলা হল। ও খুব রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটি তেমনই উজ্জ্বল। এর কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করল পাঞ্চালীর। একবার দ্রোণ বলে ডাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু উপায় নেই। জজসাহেব দ্রোণকে বললেন, আপনার সামনে এই মামলার পাকীর কথা তাদের কথা বলে গেছে, আইনজীবী তাঁর কথা বলেছেন....এবার আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। ইচ্ছে করলে উত্তর দিতে পারেন, আবার নাও পারেন.....

দ্রোণাচার্য জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কোনো অধিকার নেই আপনার....

আদালত নিঃশব্দ। কী সব বলছে দ্রোণ! এমন করলে তো ওর মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য।

দ্রোণ বলল, তুমি কোনো অধিকার নেই আপনার....আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল লড়াইয়ের, কারণ আপনি আমার একজন চিহ্নিত শ্রেণীশত্রু সুধীর দাসের দালাল....

বিচারকের মুখ গভীর। কৃষ্ণ বাউরি আর মনা মাস্টার এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

দালাল হিসাবে আপনি প্রমাণ করবেন আর আমি জবাব দেব তা তো হতে পারে না....

আমি জবাব দিচ্ছি না। দ্রোণ থামল। তারপর গান শুরু করে দিল। যারা খেটে খায় 'আমরা তাদের / আমরা কমিউনিস্ট / আমাদের মত মানুষ বা না মানো / আমরা রবো সেই 'হিস'।

পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে বসির ঠোঁট টিপে হাসল। চাপা গলায় বলল, পাগলটা একটিনকম আছে। দ্রোণ গোয়ে চলল। ন্যায়ে পতাকা তুলেছি আমরা / অন্যায়েরই যম / দালাল লাঠি ডিঙিয়ে লকে / চলেছে জোনাকদম / ... আমরা কমিউনিস্ট।

জজসাহেব আমাদের দ্রোণকে আদালতের কাজ মূলতুই হল। আবার অন্য তারিখে লক হবে বিচারের কাজ।

আদালত তাতল। অজমুতা তিাজাকে নিয়ে চলে গেল সশস্ত্র পুলিশ। দ্রোণের বাবা দীর্ঘ সায়ে চলেছেন। পাঞ্চালীর খুবই ইচ্ছা হল একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলবার। কিন্তু নানা গেল না। যদি ওদ্রোণকে অবাক হয়ে, আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বসেন? জানাজানি হয়ে যাবে।

এতদিন পরে দ্রোণের দেখা পেয়ে ভাল লাগল পাঞ্চালীর। আবার ওর কথা শুনে পথ্য জোগাড়ল। এমনভাবে বিচারককে অপমান করে লাভটা কী? দ্রোণ যে সাহসী, বিচলনাপন্থা মানে না, তা না হয় মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সামনে প্রমাণ করা গেল। কিন্তু আটনি বাবস্থান সুযোগ নিয়ে আমিনে মুক্তি নিতে পারলে তো দলেরই ভালো হত? সে বিজ্ঞানের কাজ, লাটির কাজে নিজেই আবার লাগাতে পারত। এর আগের বার ও যখন জেলে ছিল তখন তো উৎসাহী ছিল জামিন পেতে। সুব্যবস্থার দাবিতে জেলের মধ্যে অলসতা করেছিল। এই দেড় দু'শতকে কত পাশ্টে গেল সব। মনটা দমিয়ে দেয়। আবার সে যে নিজেকে লাটির লাটন অনুসরণ করেছে, তা ভাবলে ওর জন্য গর্বে বুকেটা ভরে ওঠে। কিন্তু দ্রোণের এইসব বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার। ওর সঙ্গে দেখা হলে বোঝাতে চেষ্টা করত পাঞ্চালী। ঠিক রাতারাি চলেছে না সব কিছু। আবার দ্রোণকে দেখবার পর

পাঞ্চালী বেশ একটা কাজের তাগিদও অনুভব করে। এমন কিছু কাজ যা করলে পার্টি কর্মীদের সরাসরি উপকার হবে। দ্রোণ গ্রেপ্তার হবার পর থেকে যা করে আসছে পাঞ্চালী তা হল গোপন মিটিঙ। সভার বিবরণী হাতে কপি করে বিভিন্ন ইউনিটে পাঠানো। আর মাঝেমধ্যে দেওয়ালে লেখা, আঁকা মাও সে-তুঙের মুখ। বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। সম্ভরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। লং লিভ চেয়ারম্যান মাও। শত্রু যখন এগোয়, আমরা তখন পিছোই, শত্রু যখন পিছোয় আমরা তখন এগোই, শত্রু যখন বিশ্রাম করে আমরা তখন আক্রমণ করি এবং সুযোগ বুঝে সরে পড়ি — লিন পিয়াও....।

এইসব কাজে কিছু একঘেয়েমি আছে। জেলার নেতা অজিতদাকে জানিয়ে নমাজগ্রাম ছাড়বার সিদ্ধান্ত নিল পাঞ্চালী। সে কলকাতায় চলে যাবে। ওখানে গিয়ে সে আবার ডাক্তার সুকল্যাণ বস্কীর তত্ত্বাবধানে শুরু করে দেবে সেবা-শুশ্রূষার কাজ। কলকাতা তো এখন রণাঙ্গন! যুদ্ধে আহতদের সেবা করবার জন্য নিশ্চয় ভালো নার্সের দরকার। এতদিন ধরে সে ব্যাভেজ বাঁধা, ক্ষত সেলাই করা, ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেওয়া শিখেছে। সেই অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারলে মনে হয় কিছু একটা করা গেল। আত্মবিশ্বাসও বাড়ি। আর তা ছাড়া বসিরও বেশ কিছুদিনের জন্য বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে থাকবে। সেখানে সদাইপুর থানা এলাকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

যে বিকেলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এসে পাঞ্চালী, সে রাতেই নাটকীয় ঘটনা। রাত তখন দুটো কি আড়াইটে। হাসপাতালের চৌতলায় ক্যাজুয়ালটি অপারেশন থিয়েটারের সামনে একটি ছোট কামরা। সেই ঘরে সুকল্যাণদার মুখোমুখি বসে পাঞ্চালী। তার ডানপাশে সমীর মণ্ডল — অ্যানাসথেটিস্ট। সুকল্যাণদার কথায়, অজ্ঞান ডাক্তার। বিকেল থেকে নানান কাজকর্ম মেটাবার পর সুকল্যাণদার হাত খালি। বসে গল্প হচ্ছিল। হাসপাতালের সংগঠনের কথা। গত একবছরে মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক কর্মীদের মধ্যে নকশাল রাজনীতি বেশ ভালোই প্রভাব ফেলেছে।

প্রত্যেকদিন আমাদের শক্তি কিছু কিছু বাড়ছে...এই যেমন আজ তুমি এলে...আমাদের শক্তি আরও কিছু বাড়ল। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন সুকল্যাণ ডাক্তার। সমীর বললেন, ওয়ার্ডবয়রা আমাদের দারুণ সহযোগিতা করে। সমীর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হঠাৎ আলো নিভে গেল।

পাঞ্চালী ঘর ছেড়ে বাইরে এল। অপারেশন থিয়েটারের আলো জ্বলছে কিন্তু হাসপাতাল চত্বর এবং আরও কয়েকটি বিভাগ বিদ্যুৎহীন। কলকাতা শহরে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া নিত্যদিনের ঘটনা। এজন্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার এইসব জায়গায়, যেখানে ঘড়ি ধরে কাজ করতে হয়, ব্যাটারি চালিত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে তো সচরাচর আলো চলে যায় না!

পাঞ্চালী দ্রুত একতলায় চলে এল। ইমার্জেন্সি বিভাগের কাছাকাছি আসতেই, হাঙ্কা আলোতেও পাঞ্চালী স্পষ্ট দেখতে পেল এক পুলিশ কনস্টেবল টুলিতে শায়িত একটি যুবককে রেখে দ্রুত চলে গেল।

ব্যাটারা নিশ্চয় অন্যায়ভাবে মেরেছে ছেলেটিকে। তারপর হাসপাতালের ইমার্জেন্সির

পাখালী রেখে দিয়ে পালাচ্ছে। এত রাতে জরুরি বিভাগের কেউ জেগে আছে কী না কে জানে, জেগে থাকলেও, পুলিশটা নির্যাত্ত ওদের কিছু ভুজুং-ভাজুং দিয়েছে।

অপরাধীকে চোখে নাড়তে ধরবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় পাখালী দৌড়ল পুলিশ জীপের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে ইমার্জেন্সির দরজা পার হবার আগেই পুলিশ গাড়ি হাসপাতাল গেট ভেঙে বেরিয়ে গেল।

পাখালী ঘিরে তাকাল ট্রলিতে শায়িত যুবকটির দিকে। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালাল। ঘর চোখ বোজা। মাথা ঘাম দিকে হেলানো। নিঃস্পন্দ, নিথর দেহ। পেটের উল্লস অকথক করছে নতুন। নিচের পেটে গুলি করেছে শয়তানেরা। কত বয়স হবে জেলটির? কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-এমন একটি তরতাজা যুবককে পুলিশ খুন করেছে! হাসপাতালের মেটের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসা করে উঠলো পাখালী, ব্যাটারা শয়তান। ছেলটির ডান হাত পুলাঙল ট্রলির বাইরে। হাত ধরে শরীরের ওপর রাখল পাখালী। হাত ঠান্ডা, শিথিল। কিন্তু তার আঙুল যেন মৃতদেহের নয়। কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেখা গেল, কপাল ঠান্ডা, কিন্তু মাথার মাঝখানে কিছু উষ্ণভাব!

চোখে ছেলেটির ঠোঁট নাড়তে উঠল একবার। এ কী বিস্ময়? পাখালী বুকো পড়ল ট্রলিতে শায়িত দেহটির মুখের ওপর। আবার ঠোঁট নড়ল। একবার-দু'বার-তিনবার। না ভুল নয়। ভুল নয়। ছেলেটি বেঁচে আছে। ও চোখ খোলবার চেষ্টা করল একবার। চোখ খুললো অর্ধেক। ঠোঁট নড়ল। স্বপ্ন শোনা গেল। জড়িত মুখ। আমার নাম নিরুপম....চ্যাটার্জি। ঠোট লেগে। সুকল্যাণকে খবর দিতে হবে....। ছেলেটিরই যুবকটি নিশ্চুপ। ঠোঁট, মুখ কিছুই নড়তে লা।

পাখালীর মাথায় নিরুপম চমক। নিরুপম।নিরুপম। অর্থাৎ এ সেই ছেলে যে তাকে কলেজ ছিটে চ্যাটার্জির দিন হাওড়া স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়েছিল। যার সঙ্গে মনুমেন্ট ময়দানের সজায়া দেখা হয়েছিল। তারপরেও তো কলকাতায় কয়েকটি গোপন মিটিঙে এই যুবককে দেখেছে পাখালী। ভেঁজ, টানটান চেহারা। সবাই ওকে মান্য করে। এ সেই নিরুপম? পাখালী আর একবার ভালো করে দেখে নিল। হ্যাঁ এ সেই ছেলে। সেই গৌরবর্ণ ছেলের মুখ এখন পান্ডুর। শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ম্লান। সমস্ত দার্য গ্রাস করেছে শিথিলতা। পিঙ্কল-বন্দুকের গুলি এবং রক্তক্ষয় মানুষের চেহারাকে এতটা পাল্টে দিতে পারে। এতদূরই নিরুপমকে প্রথমটায় চিনতে পারেনি পাখালী।

নাটকীয় ঘটনা কোনো মানুষকে হতভম্ব করে আবার কাউকে দ্রুত কর্তব্য নির্ধারণ করতে প্রাণিত করে। পাখালীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি ঘটল। সে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে হাঁক পাড়ল, রমেশ.....নিখ-নাথ.....জলদি। দুই ওয়ার্ডবয় দৌড়ে এল, হাঁ, দিদি। ইতিমধ্যে সুকল্যাণদা, সমীরাদাও একতলায় নেমে এসেছেন। দ্রুত সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পাখালী বলল, সুকল্যাণদা, নিরুপমকে বাঁচাতেই হবে।

ওর খবর একটু চড়ে গিয়ে থাকবে। সুকল্যাণদা ঠোটের ওপর আঙুল রেখে বললেন, চল। জলজানি বলে সমস্যা বাড়বে। নিরুপমের দিকে তাকিয়ে সুকল্যাণদাও বললেন, ওঁী, লেটে গুলি লেগেছে....চল চেষ্টা করে দেখা যাক।

সবাই মিলে নিরুপমকে পাঁজা-কোপা করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তোলা হল। উপরে

উঠতেই বিদ্যুৎও ফিরে এল। দ্রুত দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন সুকল্যাণদা। বিশ্বনাথ জলদি তিন-চার বোতল রক্তের ব্যবস্থা কর। রমেশ তুমি অ্যান্ডুলেস তৈরি রেখে, ওইখানেই থেকে। পাঞ্চালী তুমি আমাদের মানে ডাক্তারদের ঘরে বসো। তারপর সমীরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আয় আয়...। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে পড়লেন সুকল্যাণদা, সমীরদা দু'জনে। ওদের সাহায্যকারী নার্স ভেতরেই আছে। পাঞ্চালী বসে রইল সুকল্যাণদার ঘরে।

প্রায় একঘণ্টা পরে অপারেশন থিয়েটার থেকে দুই ডাক্তার ঘরে এলেন। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে ডান হাত তুলে সুকল্যাণদা বললেন, সব হল, এখন দেখা যাক। নিরুপমের পাকস্থলী থেকে গুলি বের করা হয়েছে। একটাই গুলি আটকে ছিল। পয়েন্ট টু-টু'র বুলেট। একটু দূর থেকে গুলি করেছে মনে হয়, সেজন্য বেঁচে গেল। যাইহোক, আগামী বাহাত্তর ঘণ্টা ওকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। কিন্তু একটা সমস্যা। এইসব ক্ষেত্রে এখন রোগী হাসপাতালে রাখতে হলে নিয়ম অনুযায়ী পুলিশকে জানাতে হয়।

পুলিশকে জানালেই তো নিরুপমকে গ্রেপ্তার করবে ওরা। পাঞ্চালী বলল।

সুকল্যাণদা বললেন, একদম ঠিক।

আবার না জানিয়ে এমন কেস হাসপাতালে রাখলে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমীরদা বললেন।

সুকল্যাণদা হাসলেন। একটা উপায় আগেই ভেবে রেখেছি। পরিকল্পনাটি বোঝালেন সুকল্যাণদা। কয়েক ঘণ্টা অগ্নিজেন দেবার পর সন্ধ্যাবেলায় নিরুপমকে অ্যান্ডুলেস চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মেডিক্যাল কলেজের ইন্টেনসিভিউর দিকে সুকল্যাণদার আরপুলি লেনের বাড়িতে। তাহলে আর হাসপাতালের পাতায় রোগীর নাম না তুললে খুব কিছু অসুবিধা হবে না। সমীর তুই বরং একবার ওই বাড়ির অবস্থাটা দেখে আয়। কথাটা বলেই পাঞ্চালীর দিকে ফিরলেন সুকল্যাণদা। তুমিও সমীরের সঙ্গে যাও....আর ওইখানেই থাকো।

এতক্ষণে রমেশকে অ্যান্ডুলেস ব্যবস্থা করবার কারণ বুঝতে পারল পাঞ্চালী। নিরুপমকে দেখেই সুকল্যাণদা ঠিক করে ফেলেছিলেন কর্তব্য। এজন্যই উনি পাঞ্চালীকে জোরে কথা বলতে বারণ করছিলেন।

আরপুলি লেনে আনবার পরেও আরও কিছুক্ষণ অগ্নিজেন দেওয়া হল। অগ্নিজেন বন্ধ হবার পর নিরুপমের প্লান, ফ্যাকাশে চেহারা দেখে একটু দমে গেল পাঞ্চালী। ওর হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে নলের মাধ্যমে স্যালাইন চালু করা হয়েছে। বিছানার পাশেই স্যালাইন-স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ড থেকে ঝুলছে স্যালাইন বোতল। নাকে নল লাগানো। তা দিয়ে পেটের জলীয় বর্জ্য নির্গমনের ব্যবস্থা। নাকে নল লাগিয়ে খাওয়াতেও হবে। নিয়ম মতো দিতে হবে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন। এই শুক্রবার জন্যই তার আসা। নিজের দক্ষতা নিয়েও কোনো সংশয় নেই। এক বিরাট রণক্ষেত্রে ঢুকে পড়া যোদ্ধা সে নিজেও। অথচ নিরুপমকে দেখে তার অসম্ভব মন্থারাপ হয়ে যাচ্ছে। তরতাজা মানুষের এই ছায়ার মতো হয়ে যাওয়ার দুঃখ সে এড়াতে পারছে না।

সুকল্যাণদা বললেন, পাঞ্চালী এবার ওকে সূস্থ করে তোলার দায়িত্ব তোমার। পাঞ্চালী অবাক চোখে তাকাল। সুকল্যাণদা মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ এ দায়িত্ব তোমার। আমরা শিখিয়ে

দেব কীভাবে সেবা শুশ্রূষা করতে হবে। এসে দেখেও যাব। কিন্তু এখন কদিন তুমি ঘর পাশে পাশে থাকো।

পাঞ্চালী সংগীত জানাল। সে থাকবে। একদিন এই ছেলে পাঞ্চালীর পাশে দাঁড়িয়েছে, আজ ওর পাশে তার থাকা উচিত। নিরুপমকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। আরপুলি লেনে থেকে গেল পাঞ্চালী।

চারদিন পরে সালাটের বন্ধ করা হল। সরিয়ে নেওয়া হল বর্জ্য নির্গমনকারী নলটিও। দুটি নল আর একটি গোটালের বিদায়।

নাকে নল দিয়ে খাওয়ানোর সময় একদিন পাঞ্চালী নিরুপমকে বলল, কী? চিনতে পারো? নিরুপম নীরবে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর ধীর গলায় বলল, হলুদ শাড়ি, লাল আঁচিল। পাঞ্চালী চমকুত। একসময়ে হলুদ শাড়ি পরতে পাঞ্চালীর খুব ভালো লাগতো। হলুদ শাড়ি, লাল ব্লাউজ। প্রায় ইউনিফর্মের মতো হয়ে গিয়েছিল, এই পরিধেয়। নিরুপম তা নজর করেছে। হলুদ শাড়ির সঙ্গে লাল আঁচিলটিও। অবশ্য দ্রোণও খেয়াল করত এটিসব খুটিয়াটি। 'হলুদ শাড়ি লাল আঁচিল' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করবে বলেছিল দ্রোণ। দ্রোণের সঙ্গে বিছানায় শায়িত ছেলেটির একটি বড় মিল — দু'জনেই চান্দা স্বভাবের।

সাতদিনের মাথায় নাকে নল লাগিয়ে খাওয়ানো শুরু হল। তৃতীয় নলটিরও বিদায়। সাতদিনের নিরুপমের মুখটা আগের চেহারা ফিরেছে। যদিও দাড়িতে ভরে উঠেছে ওর মুখমণ্ডল, তবু মুখটা মুখের মতো দেখায়।

নাকের নলকে বিদায় জানানোর সঙ্গে আরপুলি লেনকেও বিদায় জানাতে হল। কারণ ঘরা লড়ে ঘানার সমুদ্র স্রাবণা। কোম্পানি খাওয়া চেনে সে ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্চালীকে বোঝালেন সুকলাগদা। শ্রীরামপুরে এক ওয়ান কোম্পানির কাছেই পাটি সমর্থক ঘনশ্যাম দলের বাড়ি। ঘনশ্যামবাবু অকৃতদার। একলাই থাকে। ওর বাড়িতে একটি ঘর খালি আছে। নিরুপমকে নিয়ে সেখানে যেতে চেনে। ওদের নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্সও তৈরি। খুটিয়াটির দিকে সুকলাগদার খুব নজর। ব্যাগ ভর্তি প্রয়োজনীয় ওষুধ তো আছেই। আগামীতে প্রাতঃকৃত্য করতে নিরুপমের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য একটি কাঠের ক্রমোড়ত ভোলা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে।

সুকলাগদা এসলেন, সব ব্যবস্থা করা আছে.... তোমাদের শুধু স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে চেনে এটি একটা মাস। ঘনশ্যামবাবুকে তেমনটাই বলেছি আমরা।

গ্যাপারটি নটকীয় এবং রোমাঞ্চকর। এবং এমত অবস্থায় পিছিয়ে গেলে এক পরিচিত কমনোরের জীবন বিপর হতে পারে। না বলার প্রস্নই ওঠে না। অতএব সেই দিনই অ্যাম্বুলেন্স চেনে বাড়ি দেওয়া হল শ্রীরামপুর।

সুকলাগদার নির্দেশমতো পাঞ্চালী নিরুপমকে নিয়ম করে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ায়। লাইজল, স্পিরিট দিয়ে পেটের ক্ষত-সেলাই পরিষ্কার করে। অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগায়। তারপর লুপল পজ ব্যাভেজ দিয়ে ঢেকে দেয় ক্ষত। কখনও বাথা বাড়লে তা কমানোর কথুর দেয় পাঞ্চালী।

এখন একমাসের পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তারপর নিরুপম আগের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে

পারবে। সেরে উঠলে নিরুপম নিশ্চয়ই অন্যত্র চলে যাবে। পাঞ্চালীকেও অন্য কিছুতে মন দিতে হবে তখন। যতদিন তা না ঘটছে নিরুপমের চিন্তাই মন অধিকার করে থাকে। এই ছেলেটির হাসিতে সব সময় কেমন এক বিষাদ মিশে থাকে। ভালো হয়ে উঠলেও কী বিষয়তা কাটবে? পাঞ্চালীর হাই ওঠে।

পাঞ্চালী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নিরুপমের ধাক্কায়। ওর চোখ বিস্ফারিত। পাঞ্চালী ধড়মড় করে উঠে বসে। কী হ'ল? কষ্ট হচ্ছে? নিরুপম জবাব দেবার আগেই শোনা গেল বাইরের গ্রিলের দরজায় তাল খটখট করবার আওয়াজ। এ সময় তো কেউ আসে না! একবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিরুপমের দিকে ফিরল পাঞ্চালী। নিরুপম বলল, পুলিশ। ও উঠতে গেল। নিরুপমকে জোর করে শুইয়ে দিল পাঞ্চালী। একদম উঠবে না। নিজের ব্যাগ থেকে ঝট করে রিভলবার বের করে শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে নিল। পুলিশ এলে বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। তারপর জানালায় মুখ বাড়িয়ে গলায় তন্দ্রা জড়ানো ভাব এনে বলল, কে? কাকে চাই?...

ওপার থেকে ভেসে এল চাপা সুরেলা কণ্ঠ, আমি..... আমি সুকান্তিদা....

সুকান্তিদা? হ্যাঁ, এই নামটাই তো সেদিন মেডিক্যাল কলেজের ট্রলিতে শুয়ে থাকা ওই মৃতপ্রায় ছেলেটি বলেছিল। নিরুপমের দিকে তাকাতেই পাঞ্চালী দেখল, ওর চোখে স্বস্তি এবং মুখে হাসি। ও মাথা নেড়ে চোখের ইশারায় আগন্তুককে ঘূঁড়তে আনতে বলছে। রিভলবারটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দরজা খোলে পাঞ্চালী। গ্রিলের দরজার চাবি নিয়ে এগিয়ে যায়।

দরজা দিয়ে ঢুকেই সুকান্তিদা চাপা গলায় বলেন, তুমি পাঞ্চালী তো?

পাঞ্চালী মাথা নাড়ে। দরজায় তাল দেয় সুকান্তিদা হাসেন। দেখেই বুঝেছি..... সুকল্যাণ এত ভালো বর্ণনা দিয়েছে তোমার। কী বলতে বলতে ঘরে ঢোকে সুকান্তিদা। এই তো কমরেড নিরুপম। লাল সেলিমি। হাত মুঠো করে উপরে ছুঁড়ে দেন সুকান্তিদা। নিরুপমও হাত তোলে। মুষ্টিবদ্ধ হাত। দু'জনেই কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থাকে। তারপর কাঁধের ঝোলা মাটিতে রেখে তা থেকে একটি ছোট বাস্ক বের করে পাঞ্চালীর দিকে এগিয়ে দেন সুকান্তিদা।

— কী আছে? পাঞ্চালী অবাক চোখে তাকাল।

— আমি তো জানি না, সুকল্যাণ পাঠাল।

বাস্ক খোলা হয়। দুটি নতুন ব্রেড। এক শিশি লাইডল। এক শিশি স্পিরিট। তুলো। একটি ছোট চিমটে। আর একটি ছোট চিরকুট — তোমার ব্যাগে এইগুলো আছে জানি, তবু পাঠালাম। আজকে স্ট্রিচ কাটতে হবে। কেটে দিও। একটি অতিরিক্ত ব্রেড পাঠালাম তোমার 'বরের' দাড়ি কামানোর জন্য। ওই কর্মের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিশ্চয় দাদার কাছে আছে। সু.ব.।

স্ট্রিচ কাটার কথা এর মধ্যে দু-একবার যে মাথায় আসেনি, তা নয়। এই নিয়ে সুকল্যাণদার সঙ্গে যোগাযোগের কথাও ভেবেছে। কিন্তু আজ সত্যিই খেয়াল ছিল না পাঞ্চালীর। ব্রেড হাতে পাঞ্চালী একবার সুকান্তির দিকে তাকায়। তারপর নিরুপমের দিকে। এই যে কমরেড, কাটতে হবে। নিরুপমের চোখে জিজ্ঞাসা। আরে! দাড়ি কাটবে নাকি? গালে হাত বুলিয়ে বলল, না না আমি দাড়ি কাটব না।

লাঞ্চালী বলল, কাটতে হবে, তবে দাড়ি নয়...নাড়ি.....মানে নাড়ির কাছাকাছি।
সুকান্তিদার চোখে আমোদ। নির্দেশমতো কাজ শুরু হয়ে যায়। লাইজল, স্পিরিট দিয়ে ব্রোড
জীবাণুমুক্ত করে স্টচ কাটে পাঞ্চালী। চিমটে দিয়ে টেনে নেয় সেলাই করা নাইলন সুতো।
কত জুড়েছে। যদিও কতস্থান এখনও কিঞ্চিৎ লালভ। সেলাইয়ের অংশটি ফুলে আছে।
কিন্তু কত জুড়ে গেছে।

কমরেড নিকপম, আপনার পেট জুড়ে গেছে। অভিবাদন। হাত মুঠো করে ওপরে
তোলে পাঞ্চালী। সুকান্তিদা হেসে ওঠেন। তুমি তো বড় মজার মেয়ে।

শুধু মজার নয়, মজাতেও পারে। নিকপম টিপ্সনি কাটে। ওর দিকে তাকিয়ে হাত তোলেন
সুকান্তিদা। আই, আই আর নয়.....সীমানা পেরোলেই সীমান্ত-যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা। খুব
সাবধান।

ওরে আমার গোমড়ামুখে ছেলের মুখে কথা ফুটেছে। দাঁড়াও হচ্ছে তোমার। নিকপমের
দিকে তাকিয়ে কপট রাগের ভঙ্গিতে ঘুঁষি পাকায় পাঞ্চালী। সবাই হেসে ওঠে।

৩১৫ মেন কিছু মনে পড়ে সুকান্তিদার। ঝুলির ভেতর হাত ঢোকান। পর্যায়ক্রমে বের
হয় দুটি বেগুন, এক ফালি কুমড়ো। এবং ছোট্ট এক থলি চাল — পাঁচশো গ্রাম হবে।
এখানে আসবার পথে পেয়ে গেলাম। সৌম্যদর্শন মানুষটির মুখে চোখে নির্মল হাসি।
পাঞ্চালী অবাক। মানুষটি কি জানতেন আজ তাদের কৌশলে কোনো কিছু নেই! বস্ত্রত,
চালও নেই আজ। খনশ্যামদা রাতে ফেরবার সময় কিছু আনলে, রান্না চাপবে। এই বাড়ির
বাজারের দায়িত্বও ওই আশ্রয়দাতার।

নিকপম বলে, আরে। এ তো পি পি সরকারের মাজিক বাস্তব.... ব্রোড থেকে বেগুন
কিছু না কিছু বেগোচ্ছে। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সুকান্তিদা আনাজপত্র হাতে রান্নাঘরের
দিকে এগিয়ে যান।

এমন নিকপম মানুষকে সজ্ঞা না করে পারা যায় না। ইতিহাসের পাতায় এঁদের নাম
থাকে না। নাকোর মাঝে গতিচেষ্টার মতো প্রয়োজনীয় কিন্তু অনুপস্থিত হয়ে থেকে যান।
সাহিত্যবিদরা নাকোর মহিমা, শব্দের কাক্সকাজ নিয়ে মাথা ঘামান কিন্তু এইসব কমা-
সোমাকোলন হাইফেনকুল অঙ্ককারে হারিয়ে যায়। সেই আদিকাল থেকে এমন হয়ে আসছে।
কেন এমন হয়? কেন এমন হবে? নকশালবাড়ির আন্দোলনের ইতিহাস যেদিন লেখা
হবে, তখন এমন চরিত্রের উপস্থিতি অবশ্যই থাকা দরকার। পাঞ্চালীর ভেতরটা আবেগে
দুলে ওঠে।

গাণাখর থেকে ফিরে সুকান্তিদা মৃদু হাসেন। তা, কমরেড নিকপমের সেরে ওঠা এবং
স্বাস্থ্য কামনায় ভদ্রকা পান করব না আমরা?

অবশ্যই, নিকপম ভাল চোকে।আর তার সঙ্গে বেগুনপোড়া, ভাত....। পাঞ্চালী
লাঞ্চা খায়। সুকান্তিদার দিকে তাকিয়ে বলে, অ্যাঁ, ভদ্রকা? আপনি মদ খান নাকি?

সিঁড়িট, না তলে প্লম্ব হবে কী করে? ভদ্রকা ছিল বলেই তো রাশিয়ায় বিপ্লব
হয়েছে, জাপানে না? পাঞ্চালীর দিকে কিছুক্ষণ ভুরু কঁচকে তাকিয়ে নিকপমের দিকে একবার
ভোখ টোলেন সুকান্তিদা। গাণাখরের উদ্দেশ্যে আবার হাঁটা লাগান। পাঞ্চালী বুঝতে পারে
এইবার। না বলতে হবে। সুকান্তিদা হাসেন। একেবারে ঠিক। সেকালে রাশিয়ার গম্বীষ

মানুষের পানীয় ছিল ভদ্রা। আমাদের হল চা। কিন্তু বাবা পাঞ্চালী, আমি মদ খেলেই কি প্রতিবিপ্লবী হয়ে যেতাম?

— না তা নয়, তবু কীরকম যেন.....

— বুঝেছি। পাঞ্চালীকে কথা শেষ করতে দেন না সুকান্তিদা। বুঝেছি। মনের দিক থেকে বাধা আছে। পাঞ্চালী ওপর নীচে মাথা নাড়ে। একটু হাসে। লজ্জার হাসি।

সুকান্তিদা বলেন, তাহলে লেনিন থেকে মাও সে-তুঙ সবাই প্রতিবিপ্লবী। পাঞ্চালী চূপ করে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে এই নিয়ে পরে একদিন আলোচনা হবে। আপাতত চা বানানো যাক। সুকান্তিদা কেটলিতে জল ভরেন। পাঞ্চালী জনতা স্টোভের পলতেয় আগুন লাগায়। জল ফুটলে পাঞ্চালী কেটলিতে দেড় চামচ চা পাতা দেয়। রঙ ধরলে সুকান্তিদা গেলাসে চা ঢালেন। চায়ের গেলাস হাতে খাটের ওপর গুছিয়ে বসা হয়। নিরুপম শুয়েই থাকে।

সুকান্তিদা ঝোলা থেকে একটি বই বের করেন।

— কি বই? নিরুপম বলে।

— সামন্ত জমিদারের অত্যাচারের আর তাকে প্রতিরোধের ছবি আছে এতে ... সদ্য চিন থেকে এসেছে।

পাঞ্চালী বইটি নিয়ে নামপত্র পড়ে শোনাল — শাজনা আদায়ের কাচারি, অত্যাচার এবং বিদ্রোহের ভাস্কর্য। বিদেশী ভাষা প্রকাশনা, পিকিং ১৯৭০।

নিরুপম বলল, অদ্ভুত চেহারা তো বইটার। এরকম বর্গাকার ধরনের চিনে বই আগে দেখিনি। সুকান্তিদা হাসলেন। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, জানি নিরুপমবাবু এই খুঁটিনাটি জানতে চাইবে, সেজন্য আশেপাশেই মাপ নিয়ে এসেছি ... দশ ইঞ্চি - নয় ইঞ্চি।

নিরুপমের ঠোঁটে হাসির রেখা। কিন্তু আরও একটু বলুন না বইটা নিয়ে, তারপর ইচ্ছে করলে দেখব। সুকান্তিদা ভূমিকা শুরু করেন। পুরনো চিনের সিছুয়ান প্রদেশের তায়ী জেলার এক অত্যাচারী বদ-জমিদার লিউ ওয়েন-ছাইয়ের ছিল আঠাশটি খামার বাড়ি। এর মধ্যে দুটি খামার বাড়ি ছিল ওই তায়ী জেলার আনরেন গ্রামে। তিরিশ পিচাগও বেশি জায়গা জুড়ে এই দুই বাড়ি। শতাধিক গরিব কৃষক পরিবারের শাস্ত্রজ্ঞান, বাড়ি কেড়ে নিয়ে লিউ বানিয়েছিল এই সম্পত্তি। মুক্তির পর বাড়ি দুটিকে যাদুখান বানানো হয়েছে। অতীতের অত্যাচারের স্মৃতি হিসাবে মাটির ভাস্কর্য গড়ে পুরনো খামার বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণের বারান্দায় বসান হয়েছে। এই কাছারি বারান্দার দেয়াল প্রায় একশো মিটার। এখানেই ভুখা কৃষকরা এসে শাজনা দিতে।

পাঞ্চালী বলল, বাঃ দারুণ তো ... এশনাকার চিনের নতুন ছেলেমেয়েরা যেন আগের জমানার সামন্ত জমিদারের অত্যাচার না ভুলে যায়, শ্রেণীসংগ্রাম না ভোলে... মনে হয় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। সুকান্তিদা বললেন, ঠিক তাই, এই উদ্দেশ্যের কথা লেখা আছে বইতেও ... মোট ত্রিযাশটি সাদা কালো ভাঁব রয়েছে এতে। ছটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ছবিগুলি। দেখতে দেখতে আমার মৃগস্থ হয়ে গেছে পর্বগুলোর নাম। সুকান্তিদা গড় গড় করে বলে যান ... জমিদারের শাজনা শোষণ করা, শাসনের মাচাই, রাস্তাসে পরিমাপ পাত্র, দেউলে বানাবার হিসেব যন্ত্র, জংলি মাটিন, রাতেরাতক দফতর।

কি দেখলে তো নিরুপম? সুকান্তিদা ডুক তুলে তাকান।

না তো দেখতেই হবে। নিরুপম হেসে মাথা নাড়ে।

নুকাখুদা হাত বাড়িয়ে দেন। ওঠ উঠে বস ... উই সোজা উঠতে যেও না, পাশ ফিরে বস, পেটে কম চাপ লাগবে। পাঞ্চালী হাত রাখে নিরুপমের পিঠে। উঠতে সাহায্য করে। নিরুপমকে বসান হয়। শুরু হয় বইয়ের পাতা উলটোনো।

একটি ছবি দেখে পাঞ্চালী বলে ওঠে, দেখ দেখ এই যে বুদ্ধ পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছেন তাঁর ছেঁড়া জামা আর চোখটা দেখ ... দেখলে কষ্ট হয় ...

ছবির তলায় লেখা লাইনগুলি জোরে জোরে পড়ে নিরুপম — মেরুদণ্ড ভাঙা খাজনার গোন্ধার ভারের মাধ্যমে দেখান হয়েছে মানুষকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রথার অভিশাপ।

সুকান্তিদা বলেন, সত্যি কষ্ট হবারই কথা ... রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসলের থেকে একটি বড় অংশ বড়ায় ভরে পিঠে চাপিয়ে জমিদারের ঘরে তুলে দিয়ে আসছেন বুদ্ধটি, ক্ষোভে দুঃখে চোয়াল শক্ত, বোঝার ভারে নুয়ে গেছে পিঠ ... এ সমস্ত কিছু কেমন গুমিয়ে দিয়েছেন শিল্পী, বুদ্ধের দৃষ্টিতে, শরীরের বঁকে যাওয়া গঠনে ... তারিফ করতে হয় ... এমন না করলে বস্তা যে কত ভারি বোঝান যেত না ... কষ্টটাকেও বিশ্বাসযোগ্য করা যেত না ... তাই নয় ... বল?

পাঞ্চালী, নিরুপম দুজনেই মাথা নাড়ে। ঠিকই।

পাতা উলটোতে থাকে নিরুপম। খাজনা না দিলে পারলে, অত্যাচার জেল। সব ওই খামানবাড়ির মতোই। একটি ছবিতে — মা-কে জেলে পুরে রাখা, শিশুরা গরাদের বাইরে বসে কাঁদছে। লিউটির অসহায় চোখ, ছেঁড়ার দুঃখমাথা ভঙ্গি...। পাঞ্চালী বলল, আহা রে। বাচ্চটাকে দেখে নুকের তেতনটা উল্লসপাখাল করতে থাকে ... আবার রাগও হচ্ছে বুঝ, মনে হচ্ছে জমিদারটাকে এখনই মেরে আসি...

আর কয়েকটি পাতা উলটোতে নতুন ছবি। অত্যাচারের নির্মমতায় মানুষ ফুঁসছে। তার চোখের ভাষা বদলে গেছে। অসহায়তা কেটে গিয়ে আশ্রন ঠিকরোচ্ছে। কুড়ুল, লাঠি হাতে তারা ভাঙছে এ শোষণের রাজ্য লাঠির এক খায়ে ভেঙে ফেলতে হবে। ক্রমশ ধনীদেব হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে নিজেদের শাণ্ড পাড়াতে থাকে তারা।

কামউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পুরনো দুনিয়াকে চূর্ণবিচূর্ণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

একটি ছবির পাতায় কিছুক্ষণ থমকে থাকল নিরুপম, তারপর পাঞ্চালীর দিকে তাকাল, দেখ, এখন লাঠিধারী মেয়েটির চোখের ভাষা কেমন বদলে গেছে ...

সুকান্তিদা বলেন, বাঃ নিরুপমবাবু ভাল নজর করেছে। পাঞ্চালী হাসে, আমাকে শেখানোর ব্যাপারে নিরুপম সবসময় সজাগ।

আরও তিনটি পাতা উলটোতে — 'লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দাবি করল জমিদার লিউ ওয়েন-ছাইকে।'

লিউ থেকে লিউয়ের জামা টেনে ধরে আছে দুই সশস্ত্র পুরুষ কমরেড। অত্যাচারী জমিদারের খঁড় মুণ্ড, দু'হাতে আত্মসমর্পণ করবার ভঙ্গি, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তার পাবার কাগল, এক মহিলা কমরেড তার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে।

পাঞ্চালী বলল, সত্যি সুকান্তিদা, শিল্পীকে প্রশংসা করতেই হবে ... ছবি দেখেই কেমন বোঝা যাচ্ছে এ-মেয়ের তীব্র চোখে গনুগনে রাগ, ঠোটে কঠিন প্রতিজ্ঞা।

সুকান্তিদা বলেন, বাঃ! তোমার নজরও তো দেখি খুব ভাল।

নিরুপম বলল, কিন্তু দেখুন এত অত্যাচার সহ্য করবার পরেও এরা বন্দি করছে জমিদারকে, গলা কেটে দিচ্ছে না ... খতম করছে না ওরা...

সুকান্তিদা বললেন, সত্যিই তো এইটা ভেবে দেখিনি...

শেষ পাতায় পৌঁছে গেল ওরা। ছবির উপরের দিকে মাও সে-তুঙ সূর্যের মতো রশ্মি ছড়াচ্ছেন। তলায় তিনজন দাঁড়িয়ে। দু'জন মাওয়ের একটি বই মেলে ধরেছে। তৃতীয়জনের হাতে রাইফেল। ছবির তলায় — 'বিশাল সাগর পাড়ি দিতে হলে নির্ভর করতে হয় কর্ণধারের উপর, বিপ্লব করতে হলে মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার উপর।'

— এইটা লিন পিয়াওয়ের কথা না? পাঞ্চালী বলল।

নিরুপম বলল, তেমনই তো বলে দাদারা। ও শুয়ে পড়লো।

সুকান্তিদা বলেন, জান তো অটোয়া থেকে রয়টার খবর পাঠিয়েছে চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও সম্ভবত অসুস্থ অথবা মৃত। লিন পিয়াওয়ের জায়গায় এসেছেন চৌ এন-লাই। এরপরেই রাশিয়ায় সংবাদসংস্থা তাস জানিয়েছে লিন পিয়াও মৃত। নিরুপম, পাঞ্চালী একযোগে বলে, তাই নাকি? ঘরের পরিবেশ গভীর হয়ে যায়। সুকান্তিদা বলতে থাকেন এই ষড়যন্ত্রেই অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের খবর।

সব মিলিয়ে বোঝা যায় মাও সে-তুঙকে চীনের মধ্যে খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন লিন। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই খবর পেলে মাও-কে ট্রেন থেকে নামিয়ে গাড়িতে করে বিপদসীমা পার করে দেন। ধরা পড়ে গিয়েছেন বুঝতে পেরে লিন পিয়াও বিমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই বিমান মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভেঙে পড়ে। লিন মারা যান।

পাঞ্চালী বলল, উনিশশো সাতাশ সাল থেকে যিনি এত ভালো কাজ করেছেন, চিনের বিপ্লবে যার এত অবদান...সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও যিনি একদম সামনের সারিতে, তিনি মাও কে খুন করতে যাবেন কেন?

নিরুপম বলল চেয়ারম্যান হবে বলে.....

— কিন্তু ওদের নবম কংগ্রেসে তো লিন মাওয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাকৃতি পেয়েছেন?

— ক্ষমতার লালসায় শৈথিল্য থাকে না....

— এত বছর পরে এই অশঙ্ক্য ষড়যন্ত্র লাগছে... কোনো গন্ডগোল আছে মনে হয়.... নিরুপম কোনো উত্তর দেবার আগেই সুকান্তিদা বলেন, তোমাদের দুজনের কথাতেই কিছু যুক্তি আছে। কিন্তু আবার লিনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যে হলে বলতে হয় চৌ এন-লাই মিথ্যাবাদী। উনি লিনকে হঠাৎ করে জন্য এই গল্প ফেঁদেছেন.....

নিরুপম বলল, এমন হতেই পারে লিন পিয়াও ষড়যন্ত্রকারী। ওর লাইন ভুল। আমরা আগে যা করেছি ঠিক-ভুল সহ চিন পাটি তাকে সমর্থন করেছে... ওদের রেডিওতে, কাগজে আমাদের অনেক বাজে আ্যাকশনের খবর প্রচার করেছে.....তখন লিনের জমানা, আর ওরা

একল আলাদা পমালোচনা করেছে আমাদের কাজ নিয়ে। চৌ এন পাই - কাঙ শেঙের
বিকল্প মত তো আলাদা জানেন... আমাদের কাজের ভুল এখন বুঝতে পেরেছে ওরা।

৩১০ মোগের মুখ মনে পড়ে পাঞ্চালীর। এমন কথায় সে উত্তেজিত হবেই। মোগের
মহাকবিরা জন করে পাঞ্চালীর কাছে। — এমনও হতে পারে চিন পার্টি আগে ঠিক ছিল,
দেখানো আমাদের জেদীলক খাতমের লাইনকে ওরা সমর্থন করেছে এখনই বরং পার্টি
থেকেছে ওরা... চৌ এন লাই সংশোধনবাদীদের শব্দে পড়েছেন। নিরুপম বলল, আগামীতে
নিরুপম আরও ওরা হাতে আসবে, তখন ভালোমতো বিচার করা যাবে সব।

কিন্তুকল শুদ্ধতার পর সুকাশিতা হলো, এখন জেলভাঙার ওপর জোর দিচ্ছে পার্টি।
আওয়ার উঠেছে জেলকে জেল না ভেঙে গ্রাম ভাবো। আলোচনা চলে আসে রাজ্যভরে।
দেখানো মোগের পর রাজ্য সম্পাদক হয়েছেন সাধন সরকার। সম্প্রতি দীপক বিশ্বাস আর
দিলীপ পান্ডা নামে দুটি মজার চরিত্র এসেছে রাজ্য কমিটিতে।

কেন, মজার কেন? নিরুপম জিজ্ঞাসা করে।

আর হলো না... ওরা প্রতি কথায় চন্দ্রদার নামের আগে শ্রদ্ধেয় নেতা বিশেষণটি
গোপন করবেই। শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চাক মজুমদার.....। একটু থামেন সুকান্তিদা। তারপর
বলেন, ওরা আশা করে সবাই এইভাবেই কমরেড সি এম-কে সম্বোধন করবে। সুকান্তিদা
হাসেন। কারণ আমার অবস্থা। আমি তো চন্দ্রদাকে কমরেড সি এম-ই বলতে শিখলাম
না, তারপর পরে আবার এই বাগাড়ম্বর....।

নিরুপম উঠে বসল এইবার। চায়ের গোল্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিল। আর কেউ
কথা বলবার আগেই বলল, এটা সবাই ঘোষণা পাঠাচ্ছে দলকে, আর ভালো লাগে না।

পাঞ্চালী নিরুপমের দিকে তাকায়। কদিনে এমন বিবাদের কথা একবারও তাকে
বলেনি এই ঘরে। নিরুপম বলল, জা সুকান্তিদা, পুলিশের বুলেট থেকে বেঁচে আমার
তো দ্বিতীয় জন্ম হল। তারপর অনেক ভাবলাম। ভেবে দেখলাম আমাদের সুশাস্ত্র বলে
নাথানা অনেক কথাই ঠিক। প্রথম এলাকায় কোমো সংগঠন নেই পার্টির। এত কমরেড
পটীদ তেজেন কিন্তু সাধারণ মানুষ অভাবানো ফেটে পড়ছে না কেন?

নিরুপমের মতে দলের গোপন সংগঠনের পরিপূরক হিসাবে প্রকাশ্য সংগঠন থাকা
দরকার। যারা দলের গোপন কাজের সমর্থনে শহরতলিতে গণ আন্দোলন গড়ে তুলবে।
পুলিশ পরবর্তী বিক্রমে প্রতিবাদ করবে।

সুকান্তিদা, কমরেড সি এম এন এইসব নিয়ে ভাবা উচিত। চিন পার্টির মতামতকেও
লুকিয়ে না রেখে তা পার্টির সভ্যদের জানানো দরকার... তাতে যদি পার্টির কাজের ধারা
কিছু বদলাতে ওয়া, হবে।

নিরুপমকে সমর্থন করেন সুকান্তিদা। হ্যাঁ চন্দ্রদার কাছে নীচের মহলের এইসব খবর
পৌঁছানো দরকার... আসলে কিছু অজুতক্ত তাকে সবসময় এমন ঘিরে রাখে....

... সুকান্তিদা, চট্টাকারেরা প্রায় পায় বলেই এমন হয়....

আমি কিন্তু চট্টাকার কথাটা ব্যবহার করিনি। সুকান্তিদা বলেন এবং চুপ করে যান।
পাঞ্চালী বলেন উনি ভালোবাসা আহত হয়েছেন। নিরুপমের এমন কঠোরভাবে বলা
ঠিক হয়নি।

পাঞ্চালী বলল, দেশের মুক্তিটা যে লড়াই করে আনতে হবে তা কিন্তু সি এম-ই বুঝিয়েছেন আমাদের। — আরও একটি কথা। সুকান্তিদা যোগ দেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের মধ্যে যেমনটা ছিল, দেশের জন্য সেই আত্মবলিদানের মনোভাব, ত্যাগের মেজাজ কিন্তু উনিই সংক্রামিত করতে পেরেছেন আমাদের মধ্যে.....

— অস্বীকার করছি না কমরেড সি এম-এর অবদান। কিন্তু সুকান্তিদা আমরা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছি আমাদের কথা কেউ নিল না... সব শেষ হয়ে যাবে এইবার। নিরুপমের গলায় অতলাস্ত বিষাদ।

সবাই চুপ করে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে সুকান্তিদা বললেন, আমারও এমন অনুভব হয়েছিল কিছুকাল আগেচন্দ্রদার সঙ্গে কথা বলবার পর তা কেটে গেছে...ওই মানুষটি কিন্তু সাদা। নিরুপম তবু স্তব্ধ বসে থাকে। সেই পাথরপ্রতিম বিষাদ মূর্তির সামনে পাঞ্চালী কোনো কথা খুঁজে পায় না আর।

নিরুপম, নিরুপম শোনো....কোনও কথার মৃত্যু হয় না। একটু থামেন সুকান্তিদা। তারপর ধীর লয়ে বলেন, হয়তো আমাদের কিছু ভুল হচ্ছে এখন কিন্তু আমাদের চিন্তায় আর বলে যাওয়া কথাগুলিতে সত্য আছে এবং এই সত্য মানুষের মধ্যে থেকে যাচ্ছে.....। সুকান্তিদা বলে যান। বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, স্বরের উচ্চাবচতা, মাঝে মাঝে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নেওয়া সব মিলিয়ে সুকান্তিদা কোনো একদী নাটকের নায়ক হয়ে ওঠেন। পাঞ্চালী চুপ করে শোনে।

শেষে নিরুপম বলল, একাত্তর সাল শেষ হতে আর মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা বাকি কিন্তু একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে যে দাবানল জ্বলবে সেটা ছিল তা তো জ্বলছে না....

সুকান্তিদা পেটে হাত রাখেন। জ্বলছে পেটে দুবার চাপড় মেরে বলেন, এইটির ভেতরে আপাতত খিদের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছে, নির্বাণের ব্যবস্থা না হলে, অচিরেই তা দাবানলে পরিণত হবে। পাঞ্চালী উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। নিরুপমের মুখেও হাসি। পাঞ্চালী স্টোভ জ্বালে। সুকান্তিদা সাহায্য করেন। বেগুন পোড়া হতে বেশি সময় লাগে না। ভাত হতেও তাই। ঘনশ্যামদার জন্য তুলে রেখে ওরা তিনজনে খেয়ে নেয়।

রাত দশটা নাগাদ গ্রিলের দরজায় খটখট শব্দ হয়। তিনবার। পরিচিত আওয়াজ। ঘনশ্যামদা ফিরেছেন। পাঞ্চালী সদর দরজার চাবি হাতে বেরোয়। দরজা খুলে চাবিটি ঘনশ্যামদার হাতে দেয়। উনি বাজারের থলি দেন। ঢেকে রাখা খাবার পাতের ঘরে পৌঁছে দেয় পাঞ্চালী। আবার আড্ডায় বসা হয়। তিনজনেই কথা বলে। নানান না-বলা কথা। নিরুপম সারাক্ষণ জোর দেয় পার্টির কর্মকাণ্ড বদলানোর ওপর। ওর কথায় যুক্তি আছে। অকাটা অভিমত সব। পাঞ্চালীর বুদ্ধি তাতে সায় দেয়, হৃদয় দেয় না। দ্রোণের মুখোমুখি হলে এমন যুক্তির অবতারণা করেই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করত পাঞ্চালী, এ নিশ্চিত। কিন্তু আজ দ্রোণের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ নিয়েই তর্ক চালিয়ে যায়। এ কী তার কোনো সংস্কার? হবেও বা। ভালোবাসা বোধহয় এমনই কিছু সংস্কারের জন্ম দেয়। দয়িতের প্রতি প্রগাতিত মান্যতা আনে। সব কথার শেষে জানা যায় সুকান্তিদাকেও বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছে। উনি এখন কদিন শশীভূষণ দে স্ট্রিটের কাছে ক্রাউচ লেনের একটি বাড়ীতে থাকছেন।

সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা একটু দেরি হয়। উঠেই রান্নাঘরে ঢোকে পাঞ্চালী। ঘনশ্যামদা অফিস গিয়ে। দত্ত রান্না শেষ করে। আলুসেদ্ধ, ডাল, ভাত। সাড়ে আটটায় রান্না শেষ। খাবার খাওয়া বেড়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়ায় পাঞ্চালী। ডাকল, ঘনশ্যামদা। দরজা খুলে দেখা দিল মধ্যবয়স্কের অবয়ব হাসিমুখ। লুঙ্গি, গেঞ্জি, সোয়েটার। দাঁত বের করা। কপালের ডান দিকে ছোট আঁচ। মুখটি নিয়ামত বলল বাঃ। তারপর হাত এগিয়ে এল। সেই হাতে খালা তুলে দিয়ে পাঞ্চালী ফিরে এল নিজের ঘরে। ঘরটি আসলে রান্নাঘর সংলগ্ন ভাড়া খর। খাবার খরও এলা যেতে পারে। তাদের থাকবার জন্য ঘরটিকে শোবার ঘরে পরিণত করতে হয়েছে। রান্নাঘরে ঢুকে সবকিছু গুছোতে থাকল পাঞ্চালী। যথারীতি সুকাণ্ডিতা হাত লাগালেন। অন্যান্য দিনের মতোই সকাল সাড়ে নটায় ঘনশ্যামদার ডাক এল, খাম এগোচ্ছ... পাঞ্চালী ঘর থেকে বেরিয়ে ঘনশ্যামদাকে অনুসরণ করে। উনি সদরের তালু খুলে চারিটি পাঞ্চালীর হাতে দেন। — বর কেমন? পাঞ্চালী হাসল। ভালো।

কে এসেছেন? দাদা নাকি? পাঞ্চালী আবার হাসল। হ্যাঁ। ঘনশ্যামদা বেরিয়ে যান। রান্নাঘর ফটকের তালু বন্ধ করে পাঞ্চালী ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দেয়। শুরু হয় নিকপমের পরিচর্যা। স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে ক্ষত-সেলাইয়ের জায়গাটি সাবধানে পরিষ্কার করেন সুকাণ্ডিতা। পাঞ্চালী অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগায়।

এই তো, সেরে উঠছে নিকপম... আর পনেরো-দুই দিন পরে একটু একটু করে বাঁটের যেতে পারবে... সুকাণ্ডিতা উৎসাহ দেন। পাঞ্চালী সমর্থন করে। তাই তো। খুব ভালো শুকোচ্ছে কাটা জায়গাটা। নিকপম চুলক করে থাকে। কিছু পরে বলে, কী হবে আর বোরোয়া কী টা বা হেং? পাঞ্চালী সুকাণ্ডিতার দিকে তাকায়। ওঁর মুখ গভীর। নিজের মনেই মাথা নাড়েন দু'একবার।

দুপুরবেলায় সুকাণ্ডিতা চলে যান। চোখের মেন পুরো বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়। পরের দিনেই একটু পরাম্পরায় চলে। মাঝে একদিন এসে আসে। চলে যায়। নিকপমের শরীর একটু একটু করে ভালো হয়। এখন আর ব্যথাম যেনেও ওর পা টলমল করে না। পাঞ্চালীর সাহায্য ছাড়াই যেতে পারে। ওর ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চালী নিজের শরীরে পরিবর্তন লক্ষ্য করে। নিকপমের স্পর্শে শরীর কুসুম কুসুম জাগছে। ছেলেটি জাগছে কি? মনে হয় না। এই ছেলে অতীত সুন্দর। অসাধারণ ওর সৌজন্যবোধ। শোয়াবসার ক্ষেত্রে কখনও সীমানা অতিক্রম করে না। ওর পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনা যায়।

নিকপম একটু ভালো হতেই পাঞ্চালী আবার যাওয়া-আসা শুরু করল তার নিজস্ব পোস্ট বক্স সামান্যদার বাড়ি। শ্রীরামপুর জিটি রোডের ওপর এই বাড়িতে গেলে পাওয়া যায় লাটিন নির্দেশ, দেশপ্রতী, তার নামে আসা দ্রোণের গোপন চিঠি সব কিছু।

লাটিন নির্দেশ পাঠিয়েছে আরও একমাস ঘনশ্যামদার বাড়িতে থাকবার। তারপর ওরা নিকপমের পোস্ট বক্সে গেল। এবং তারও। কোনো অসুবিধে নেই। আরও কিছুদিন নিকপমের কাছে থাকা দরকার। নিকপমের শরীরের উন্নতি ঠিক পথে চললেও, মন চলছে না। সব সময় নিরাশ, বিষমভাবের মধ্যে থাকে। ওকে জাগিয়ে তোলা দরকার। পাঞ্চালী বলে মাঝে নিজেই কথা। ঘটনাস্থান শৈশব থেকে ঘটনাবল বর্তমান। নিকপমও বলে। শৈশবের সামান্য ঘটনার অসামান্য অণুভবের গল্প। সদা ফেলে আসা দুল ভাঁবের

স্মৃতির হীরকখণ্ডটি নাড়াচাড়া করে। প্রতিটি বর্ণনাই নতুন রকমের আলো ফেলে। বর্তমানে এসে নিরুপম ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে যায়। হঠাৎ একসময় চূপ করে যায়। পাঞ্চালীর কোনো প্ররোচনাতেই মুখ খোলে না। ক্রমশ ভাবলেশহীন হয়ে যায় ওর মুখাবয়ব। এ অবস্থায় স্বয়ং সোফিয়া লোরেন নগ্ন নৃত্য প্রদর্শন করলেও যেন ওর অঙ্গ উত্তিত হবে না। রুণু ওহ নিয়োগী তার সদ্য উদ্ভাবিত কোনো পাশবিক অত্যাচার চালালেও ওর কোনো হেলদোল হবে না। বিষাদ ওকে গ্রাস করেছে। তার কবল থেকে সে কীভাবে বের করে আনবে নিরুপমকে? জলের মাছকে যে জলে ফিরিয়ে দিতে হবেই। সুকল্যাণদা দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে। পাঞ্চালী গল্প করে। দ্রোণের গল্প। দ্রোণের নাক-চোখ-কথা-কবিতা-থেকে তার ফুটবল খেলতে গিয়ে পাওয়া গোড়ালির ক্ষতচিহ্নটিকেও মেলে ধরে নিরুপমের সামনে। নিরুপম হাসে। উপভোগ করে। কিছু সময়ের জন্য ওর বিষণ্ণতা কেটে যায়।

একদিন কবিতা শোনাল নিরুপম। ছেলের বলার ধরণটি অনবদ্য। ওর উচ্চারণের সঙ্গে কবিতার প্রতিটি শব্দ যেন ছবি হয়ে ভেসে উঠছে! ‘হে বিষাদ, / তুমি আমার হাতের কাছ থেকে সরে যাও / জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে। / হে বিষাদ, / হাতের কাছ থেকে সরে যাও / আগাছাগুলো নিড়েতে হবে।’

এক মুহূর্ত থেমে পাঞ্চালীর দিকে তাকাল নিরুপম। মাথা নাড়ল। ‘যায় না, / বিষাদ তবু যায় না। / সারাক্ষণ আমার পায়ে পায়ে / সারাক্ষণ / পায়ে পায়ে / ঘুরঘুর করে।’ নিরুপম থামল।

— এখানেই শেষ নাকি?

— না না

— বাকিটা বল

দু-দিকে মাথা নাড়ল নিরুপম। শেষ অংশটি বলবে না।

পাঞ্চালী বলল, খুব ভালো কবিতা, তোমার লেখা?

নিরুপম চোখ বন্ধ করে হাসল। না গো হলুদ শাড়ি, আমার নয়.....এ লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। পাঞ্চালীর দিকে তাকাল ছেলে। আমি লিখতে টিকতে পারি না। শেষ বাক্যটি কি দ্রোণের কথা ভেবে বলা? এ কী প্রজ্ঞা ঈশ্বর তাঁদ্রত? না কি আত্মকল্পণা? পাঞ্চালী ভাববার চেষ্টা করে। দ্রোণ এবং নিরুপম। দু’জনের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক আবার তফাতও কম নয়। সবচেয়ে বড় অমিল দুঃখ পাবার প্রতিক্রিয়ায়। দ্রোণ বিষণ্ণ হলে নিজের ওপর অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলে। যে কাজের প্রতি পদে আরও দুঃখ পাবার সম্ভাবনা। তবু সে আরও আঘাত পাবার জন্য এগিয়ে যাবে। ওর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে দায়িত্ববান মানুষের মতো গভীর। ভাষা উপদেশমূলক। যেন পৃথিবীর সারসত্যটিকে বুঝে নিয়েছে সে। সে তখন আরও বেশি করে পাঞ্চালীর ভার নিতে চাইবে। আর নিরুপম দুঃখ পেলে একা, ক্রমশ একা হয়ে পড়ে। এমন এক জগতে চলে যেতে চায় যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না। সে পাঞ্চালীর সাহচর্য চাইবে তখন। কিন্তু মুখ ফুটে বলবে না সে কথা। সে সময় দ্রোণকে যদি মনে হয় বাবার মতো, নিরুপমকে তার ছেলের মতো লাগে পাঞ্চালীর। দুঃখ পেলে নাকি? নিরুপমের ঠোটে মৃদু হাসি। পাঞ্চালী দু-দিকে মাথা নাড়ে। না। তোমার কবিতার খুব শক্তি, কত কথা মনে পড়িয়ে দিল...। তাই নাকি?

ভাঙলে বাকিটাও নষ্টে নাও। শেষ অংশটিও শুনিয়ে দেয় নিরুপম। '...তারপর কখন / কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না / চেয়ে দেখি / দূরে বসে সেই আমার বিবাহ / আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে / আমার অপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে / হাপাতে হাসতে আমি তাকে / দূরন্ত শিশুর মত / কোলে তুলে নিই।' পাঞ্চালী শুদ্ধ। এর চোখে যুক্ততা স্পষ্ট। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি তো খুব ভালো আবৃত্তি কর। নিরুপম হাসে। ছেলের কান লাল হয়ে ওঠে।

পরদিন সাপলদার বাড়িতে গেলে দ্রোণের চিঠি পাওয়া যায়। চার লাইনের চিরকুট পর। একটি সম্পূর্ণ চিঠি। চিঠিটি ওপর ওপর পড়ে মন খারাপ হয়ে যায়। দ্রুত ঘরে ফেরে পাঞ্চালী।

ঘরে ঢুকতে পাঞ্চালী কাঁধের ঝোলা নামায়। ঝোলা থেকে দেশব্রতী বের করে নিকলমের দিকে এগিয়ে দেয়। দ্রোণের চিঠিটাও বের করে। আবার ভালো করে পড়তে বসে। পাঞ্চালী খাটে বসে।

নিকলম বলল, কি গো হলুদ শাড়ি মন খারাপ কেন?

কী করে গুলল ও? পাঞ্চালী বলল, জানো দ্রোণের যাবজ্জীবন হয়ে গেছে। ওর লম্বী দুই কমনেড কক্ষ বাড়ির আর মনা মাস্টার — তাদেরও একই সাজ। পাঞ্চালী চুপ করে যায়। নিরুপমও।

কিছুক্ষণ পর নিরুপম শুদ্ধতা ভাঙে। এর বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে না?

হ্যাঁ মাঝে, নিশ্চয়ই মাঝে, কিন্তু দ্রোণ করবে বলে তো মনে হয় না...

জা সিক, আর এখন আমাদের যা করাও তাতে পারি থেকেও তো আইনি লড়াই চালানোর কোনো সম্ভাবনা নেই...

সিকিট, আর হোণ তো এতদূর পারি পারি পাইনের কটুর সমর্থক...নো বেল, ভাঙে। আবার দু'জনেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

পাঞ্চালী বলল, চিঠিটা শুনেই নিরুপমের মুখে চোখে অস্বস্তি। তোমার ব্যক্তিগত চিঠি আমায় পড়ে শোনাবে?

শোনোই না কেন ব্যক্তিগত।

ওগু ছেলের সংকেচ কাটে না।

আচ্ছা সিক আছে, যেটুকু ব্যক্তিগত তা বাদ দিয়ে পড়ে শোনাই? নিরুপমের সম্মতির অপেক্ষা না করে পড়তে শুরু করে পাঞ্চালী।

প্রথম কমনেড। সংবাদপত্রের পরেই একটু থামল পাঞ্চালী। পরের কয়েকটি লাইনে দ্রোণ আর তার সঙ্গীদের সাজার খবর। দুঃসংবাদের পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয় না। সে খুঁজতে শুরু করে আরও করণার মত অংশ। পেয়েও যায়।

আগে জোয়ার পারবার চিঠি দেবার কথা বলে বিরক্ত করতাম, এখন আর বিরক্ত করব না। মন খারাপ করে না। দুঃ হও, কোনো আত্মত্যাগে ভীত হয়ো না, সমস্ত বাধা বিস্মৃত অতিক্রম করে নিজস্ব অর্জন কর — এটাই হল আমাদের মূলমন্ত্র। বিপ্লবের জন্য আমাদের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং মন খারাপ করবার কিছুই নেই, বরং নিজস্ব উপায়ে জোয়ার দায়িত্ব হল আশুনের মতো জ্বলে ওঠার। আরও বেশি কাজ করার।

বিপ্লবের জন্য নিজের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করার। আশা করি তুমি তা করবে। তোমায় বলেছিলাম সংগ্রামের খবর শোনাও, কিন্তু হুগলি জেলে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে সংগ্রামের খবর শোনাতে না পারার জন্য আমি লজ্জিত। ক্ষমা করো এর জন্য। তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, সংগ্রাম হুগলি জেলে উঠবেই। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যেই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ভালোবাসা। বিপ্লবের শপথ আমাদের দু'জনকে আরও কাছাকাছি করেছে। আমি আশা করব তুমি চিরকাল বিপ্লবী থাকবে। তোমার কাছে দাবি আমার এটাই — চিরকাল বিপ্লবী থেকে। চিরকাল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা এবং মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার বর্ণপরিচয় চারু মজুমদারের চিন্তাধারার সঠিকপথে দৃঢ় থেকে। চিরকাল ব্যাপক জনসাধারণ, যুবক ও বিপ্লবের জন্য হিতকর হয়ো। এছাড়া আর কোনো দাবি তোমার কাছে আমার নেই।’

পরের লাইনটি আরম্ভ করবার আগেই পাঞ্চালী থেমে যায়। এই তিন-চারটি লাইন নিরুপমের সামনে উচ্চারণ করা যাবে না। নিরুপম বলল, কী? চিঠি এখানেই শেষ? দ্রুত নিজেকে সামলে নিল পাঞ্চালী। না গো ছেলে। শোনো। পাঞ্চালী আবার পড়তে শুরু করে।

‘প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যদি জেলের মধ্যে আমাকে মেরে দিতে না পারে তাহলে দেখা অবশ্যই হবে। এবং তা হবে ১৯৭৫ সালের মধ্যেই। তবে মুক্তির প্রশ্নে দুটি সম্ভাবনা। হয় নিজেরা মুক্ত হবো, নইলে জনগণ মুক্ত করবে। নিজেরা মুক্ত হলে ভারতীয় বিপ্লব সফল হবার আগেই দেখা হবে। লাল সেলামা ভালোবাসা নিও। বিপ্লবী অভিনন্দন সহ তোমার ডি জি।’

নিরুপম বলল, অসাধারণ, এ তো চিঠি নয় যেন পার্টির ইস্তাহার! কী মনের জোর। এমন একটি প্রাণবন্ত মানুষ জেলের বাইরে থাকলে দলের কত লাভ হত....

পাঞ্চালী বলল, তোমায় বলেছিলাম না, আমাদের এখনকার লাইন নিয়ে ওর কোনো প্রশ্ন নেই....

নিরুপম মাথা নাড়ে। ঠিকই। এমন প্রতর্কহীন মেনে নিতে জানলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না.....

আবার স্তব্ধতা নেমে আসে। পাঞ্চালীর ভেতরে ঘুরপাক খায় চিঠির কিছু বাক্য। নিরুপমের সামনে না-বলা সেই বাক্যগুলি ‘যদি কোনোদিন তোমার মনে হয় আর আমাকে ভালোবাসতে পারছ না. বা অন্য কাউকে ভালোবেসেছ — তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে তা করতে পারো। আমি তাতে কিছু মনে করব না। সে কষ্ট সহ্য করার মতন মানসিক দৃঢ়তা আমার আছে। শুধু একটাই অনুরোধ, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়িও না।’

দ্রোণ তাকে লিখতে পারল এমন কথা! ও নিশ্চয়ই নিরুপমের কথা জেনে এইসব লিখেছে। নিরুপমের সঙ্গে সম্পর্ক হলে তা সহ্য করার মতন শক্তি তোমার আছে। ভালো কথা। কিন্তু এই ঘটনায় কী করে মনে হল আমি প্রজাপতি ধরনের মেয়ে?

ও হলুদ শাড়ি, অমন মাথা নাড়ছ কেন? নিরুপমের গলা। পাঞ্চালী ধাতস্থ হয়। না, ওই আর কী...। নিরুপম বলল, দেখো, আমরা তো ঠিক লড়াইয়ের মধ্যে নেই এখন, তাই হয়তো বুঝতে পারছি না...হয়তো সত্যিই ১৯৭৫-এ দেশে বিপ্লব হবে, তখন মুক্তি

পাখালী হাসল। পাখালী হাসল। হ্যাঁ সেই আশা করা থাক।

কয়েকটি দিন চলে গেল দ্রোণের কথায়। নিরুপম জানতে চায় দ্রোণের কথা। পাখালী বলল। বলতে বলতে কখনও চোখে জল আসে পাখালীর। নিরুপম অপলক তাকিয়ে থাকে। সেট দৃষ্টিতে সহমর্মিতা অনুভব করে পাখালী। সান্নিধ্য দেবার ব্যাপারে ও অনবদ্য। কিন্তু নিজের সম্পর্কে ওর নীড়নের ডাব কমে না। এদিকে দিনগুলি দ্রুত চলে যাচ্ছে।

অগাধা দিনের মতোই একদিন বেরোবার সময় ঘনশ্যামদা ডাকলেন, আমি এখানেই, পাখালী বাটরে গেল। প্রৌঢ় নিয়ামত বললেন, বর কেমন? পাখালী যথারীতি উত্তর দিল। ভাল।

অন্ধ চিন্তা করে যা, দেখো তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। উনি পাখালীর পিঠে হাত বুলায়, দেন। আগে তো এমন করতেন না ভদ্রলোক? হঠাৎ স্নেহ বেড়ে গেছে! পরদিনও একটু খাওয়া গ্যে। পরদিনও।

একদিন পিঠে হাত রাখার পরেই হঠাৎ পাখালীর গণ্ডদেশ চুষন করে বসেন ভদ্রলোক। পাখালী ছটকে সরে যায়। ভদ্রলোকও দ্রুত নিক্রান্ত হন। প্রৌঢ়ের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে বাকি থাকে না। অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকে পাখালী, তারপর ঘরে যায়।

নিকলম আত্মসমীক্ষা করে, কোথায়? পুকুরের হাঁস দেখছিলে? পাখালী জোর করে হাসে। হাঁ। দাঁড়িয়ে নিয়ামত শব্দ হয় দরজায়। পাখালী সর্দক খুলে দেয়। প্রৌঢ় বলেন, রাগ করলে? পাখালী উত্তর দেয় না। রাগ করে না। আমি তো তোমায় স্নেহ করি। কত পুষ্প মেয়ে ডাম, আমার ছোট বোনের মতো। পিঠেই পাখালীর পিঠে হাত রাখেন প্রৌঢ়। অনেক দিকে লা নাড়ানার উদ্যোগ করতেই প্রৌঢ় বলেন, এখানে যতদিন খুশি থেকে যাও, নিকলমকে থাকতে পারবে... এ তো কপালে গোলে তোমাদেরই বাড়ি....

লোকটি বাঁটি পরোয়নের বাচ্চা সন্দেহ নেই কিন্তু নিরুপমের কথা ভেবে পাখালী এই পরামর্শটিকে খাওয়া না। সে মাথা নিচু করে ঘরে ফেরে। থালায় খাবার সাজিয়ে দিয়ে আসে লাগলেন ঘরে।

এখন নিরাপদ শেলটার পাওয়া মুশকিল। পুলিশ জেনে যাচ্ছে গোপন আবাসগুলির ঠিকানা। সেট বিচারে সাঁতাই এই বাড়ি নিরাপদ। এখনই অন্য কোথাও সরতে হলে নিরুপম নিশ্চয় পড়ে যাবে। ও এখনও ভালো করে হাঁটতে পারছে না। দৌড়নো তো অসম্ভব। খাল্যামদার কীভাবে নিরুপমকে বলা যাবে না। ছেলেটি আবেগপ্রবণ। উদ্বেজিত হয়ে কী করে এসে ঠিক নেই। দুপুরবেলায় বের হয় পাখালী। সাধনদার বাড়ি থেকে ফেরবার পথে গাশের দরজার ডায়ালেক্ট চাবি বানাবার চেষ্টা করে। তাহলে আর প্রৌঢ়ের বের করার সঙ্গে সঙ্গে একে যেতে হয় না। দূরত্ব রাখা যায়। যাতায়াতের রাস্তায় তেমন কোনো চাবির দোকান নেই। শ্রীরামপুর বাজার এলাকায় ঢুকতে গিয়েও ঢোকে না পাখালী। এই অঞ্চলের অনেকটাই তার চেনা। কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

প্রতিদিন বেরোবার সময় পাখালীর গণ্ডদেশ চুষন করেন প্রৌঢ়। পাখালী মুখ বুজে লজ্জা করে থাকে। যে কোনো মূল্যে নিরুপমকে ভালো করে তোলা দরকার। মানা দরকার দলের নির্দেশ। একমাস পরে নিশ্চয় অন্য কোথাও কাজ করার ব্যবস্থা করবে পাটি। তার মধ্যে নিকলম পছন্দ হয়ে উঠলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু ছেলেটির শরীরের কিছু উন্নতি

হলেও, মন ভালো হবার কোনো লক্ষণ নেই। কেমন হালভাঙা নাবিকের মতো বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে। ওর কাছে যেন জীবন মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচে গেছে। তবু তারই মধ্যে ও পাঞ্চালীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। এ ছেলেটিকে ভাল করতেই হবে। আরও কিছুদিন এ বাড়িতে থাকতে পারলে, পাঞ্চালীর কাছে থাকলে, ঠিক হয়ে যাবে ছেলে। সেইজন্য মূল্য দিতে রাজি পাঞ্চালী। নিজের গালে প্রত্যহ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত চুম্বন গ্রহণ এমন কী কষ্টকর! ভিয়েতনামের মা-বোনেরা এর চেয়ে কত বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন। চিনের মেয়েরা কত অপমান সহ্য করেছেন। এই বিন্দু বিন্দু কষ্টের মধ্যে দিয়েই তো সমস্ত শক্তি সংহত হবে। তারপর ফেটে পড়বে একদিন। মন শক্ত করে পাঞ্চালী। সকালে ওঠে। দিনের পরম্পরা বজায় রাখে।

একদিন সকাল সাড়ে নটার ডাক পেয়ে পাঞ্চালী দরজা খুলে এগিয়ে গেল। প্রৌঢ় চুম্বন করলেন। একবার, দু-বার, তিনবার। হঠাৎ তার স্তনে হাত রাখলেন প্রৌঢ়। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পাঞ্চালী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নোংরা হাত। গলা থেকে বেরিয়ে এল, আহ.... জানোয়ার.....। প্রৌঢ় দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাঞ্চালীর ভেতরে মছন। আর কত? কত নীচে নামবে এই পার্টি সমর্থক? আর কতদিন তাকে সহ্য করতে হবে এই অপমান? কত দিন? হে কমরেড সি এম! হে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ! বল, বল তোমরা বল....কতকাল পরে শুদ্ধ হবে আমাদের এইসব লোভী পুরুষ, পার্টির এই কমরেডরা?....

শরীরের কাঁপুনি একটু কমলে পাঞ্চালী টুক পায়ের ঘরে ঢোকে। নিরুপম তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী হল তোমার? পাঞ্চালী চুপ করে থাকে। কিছু পরে বলল, এই একটু পা-হড়কে গিয়েছিল। নিরুপম পানির চোখ বন্ধ করে দু-দিকে মাথা নাড়ে। তুমি ঠিক বলছ না....।

আর পারে না পাঞ্চালী। সমস্ত অবরোধ ভেঙে যায়। নিরুপমের বুক মাথা রেখে হাহাকার করে। নিরুপম সেরে ওঠো... জেগে ওঠো...। কমরেড নিরুপম, তুমি ঘুরে দাঁড়ালেই পালাবে হায়নার দল....এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা। ঘোরের মধ্যে পাঞ্চালী বলে যায়....। তুমি কী জানো প্রতিদিন কী অপমান সহ্য করতে হয়? পাঞ্চালীর অশ্রুতে নিরুপমের বুক ভিজে যায়।

নিরুপমের হাত উঠে আসে পাঞ্চালীর মাথায়, পিঠে। সে হাত উষ্ণ। সংবেদী। জানতাম না। আজ জানলাম। আমার কমরেড।



মাস্টারমশায়ের কথা খুব মনে পড়ে আজকাল। উজ্জ্বল চোখ। শীর্ণ দেহ। কিন্তু শরীরের ঝুজুতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই অমূল্য সেনের মুখের কথাই হল — হাল ছেড়ো না, জয় নিশ্চিত। একটা দরজা বন্ধ হলে চারটে জানালা খুলে যায়। স্বচ্ছদৃষ্টির এই মানুষটি ‘দক্ষিণদেশ’ না করে, কানাই চ্যাটার্জির সঙ্গে মাওয়িস্ট কমুনিস্ট সেন্টার না গড়ে, চারু মজুমদারের দলে থাকলে

একটা অথবা দুটো দল এক হয়ে লড়তে পারলে তো কথাই নেই। যুক্তি-তর্কের সঙ্গে মিশে মোত আবেগ, আত্মত্যাগ। মাস্টারমশায় দেখতেন ওঁর ক্যাডারও লড়তে জানে! একটা দলটা এক হলে, চারটে জানালা খুলে যায়। এই কথা থেকে শক্তি পায় দ্রোণাচার্য। দু-দবার ঝোলের প্রধান ফটকের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দু-বারই শেষ মুহুর্তে কী করে যেন খবর পেয়ে গেল জেল কর্তৃপক্ষ। নিশ্চয় দলের কারও অসতর্কতা। এর ফলে মূল্য দিতে হ'ল অনেক। সদর দরজার প্রহরা তো আঁটোসাঁটো হলই, জারি হল বাঁধা। বিনামায়েগ উপরেও কঠোর নজরদারি। যাবজ্জীবন দণ্ডের পর জেলে দ্রোণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো মা, বাবা আর ভায়া। কাউকেই কথা বলতে দেওয়া হ'ল না ওর লক্ষে। গামি কোনো কথা চালাচালি শুরু হয়। দ্রোণ চাইলে কোনো সহবন্দিকে পাঠাতে পারে। সে এর মা বাপার সঙ্গে দেখা করে এসে কথোপকথনের সারাংশ জানাবে। সহবন্দীদের কেউ তার বাবা মাকে সম্যক চেনে না। কী বলতে কী বলবে, ওদের কষ্ট আরও বাড়বে। চিরকুট পাঠানো মোত, সে রাস্তা বন্ধ। অবশ্য খবর পাচার করবার অন্য উপায় বের করে নিয়েছে দ্রোণ। তিন নম্বর ওয়ার্ডের স্বপন, কৃষ্ণ আদালতে গেলে, তার চিঠি সঙ্গে নিয়ে যায়। আদালত চত্বরে বাড়ির লোক, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। ওরা কেউ খাবার নিয়ে আসে। ওঁর হাতের স্পর্শ পাওয়া সহজ। স্বপনের চিঠি হাতবদল হয়ে চলে যায় ওর ভাই। তখনো কাছে কৃষ্ণ দিয়ে দেয় ভাইপো নকুলকে। এরপর তুহিন আর নকুলের দায়িত্ব ওই চিঠি নিবারণের কাছে পৌঁছন। নিবারণ দিয়ে আসেন শ্রীরামপুরের ঠিকানায়। ওইখানেই চিঠির বিলি বন্দোবস্ত। একটু ঘুরপথে হলেও দ্রোণ ঠিক ভেতরের খবর বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পাণ্ডালীকে লেখা চিঠিও। কিন্তু মোক্ষ কথা হল দু'বারের জেলভাঙার চেষ্টার ফলে দ্রোণ প্রশাসন নড়ে বসেছে। শোনা যাচ্ছে, দ্রোণকে পাঠানো হবে দমদম সেন্ট্রাল জেল। অন্য রাজ্যেও পাঠানো হতে পারে। অতএব এখান থেকে সরাবার আগেই আবার ঝাপাতে হবে। শৃঙ্খলে হবে নতুন উপায়। জেল ভেঙে বেরোতেই হবে। মনা সেন জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে। কৃষ্ণের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়নি। দ্রোণাচার্য আবেদনই করেনি। জামিনে মুক্ত ভিক্ষা নয়। রক্তের মূল্যে, জীবনের দামে মুক্তি ছিনিয়ে নেওয়া। শাসককে হতবুদ্ধি করে দমদম জেল থেকে চব্বিশ জন কমরেড বেরিয়ে গেছেন। জেলের মধ্যে সংগ্রাম করে মুক্তি আনিয়ে নিয়েছেন ওঁরা। কিছুকাল আগে পুরুলিয়া জেল ভাঙার খবর এসেছে। পার্টির নির্দেশ জেলের মধ্যে নিয়ম মেনে বসে থাকা নয়। জেল-এস্কেপের চেষ্টা করতে হবে। পার্গাসোশীল শাসকগোষ্ঠী আর নয়া-সংশোধনবাদী সি পি এম-কে বুঝিয়ে দিতে হবে কোনো কানাগারেই নকশাল-বিপ্লবীদের বন্ধ রাখা যায় না। তারা যে কোনো অবস্থায় লড়তে জানে। ঝোলের মধ্যেও চলুক গেরিলা লড়াই। নির্দেশ মেনে হুগলি জেলের মধ্যেও পার্টি কমিটি গঠন হয়ে গেছে। দ্রোণাচার্য ঘোষ, কমরেডদের ডিজি, সেই কমিটির সম্পাদক।

মাস্টারমশায় তাকে এক-দুই-তিন করে ভাবতে শিখিয়েছেন। সেই যুক্তির পরম্পরায় আবার পরিকল্পনা শুরু করে দ্রোণ। প্রথম কথা, রাজকারের ছদ্মটিকে বোঝা। সকাল তখন জেলদারদের 'গান্ধি' শুরু হবে। জেলকর্মীরা কারাকুঠুরির তালা খুলে ভেতরে এসে ঘরে গায় গান সংখ্যা। পর্যভ্রমশ মিনিটে গোনা শেষ। আসবে সকালের খাবার

শোকাবদা মটরসেদ্ধ কিংবা ছোলাসেদ্ধ। তারপর স্নান। কিছু সময়ের জন্য খোলা

জায়গায় আনা হয় বন্দিদের। তখনই অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা। সবার স্নানের সময় হব্ব এক নয়। নিজের ইচ্ছেমতো আধঘন্টা এদিক-ওদিক করে নেওয়া যায়। হুগলি জেলের নকশালবন্দির সি পি এম কর্মীদের মত জেলে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা নিতে চায়নি, তারা সাধারণ আসামী, চোর-ডাকাতের সঙ্গেই থাকে। কোনো চোর-ডাকাত খারাপ ব্যবহার করলে ওই স্নান করবার সময়ে ধমকে দেওয়া হয় তাদের। ওরা মুখ বুজে বকুনি খায়। নকশালদের মান্য করে ওরা। একসঙ্গে থাকলে, ভবিষ্যতে ওদের দলে টানার অবকাশ থাকছে। দ্রোণ ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। ভাল ব্যবহার পেয়ে ওরাও সম্মান জানিয়ে কথা বলে। সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চোর-ছিনতাইবাজদের মধ্যে জংলা আর সেন্টুর দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি। ডাকাতদের মধ্যে দুলুর দারুণ সাহস। ওরা তিনজনে জেলের অঙ্কি-সঙ্কি ভাল জানে। তিনজনেরই জেলের মধ্যে চেনাজানার পরিধি বহুদূর ছড়ান। ওরা দ্রোণের ভক্ত হয়ে উঠেছে। এইসব লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লবের সাথী করে নেওয়া যায়।

দুপুরের খাওয়া কারাক্ষেত্রের মধ্যে। বারোটা থেকে চারটে আবার বন্ধ অবস্থায়। চারটে থেকে ছটা একটু হাঁটাচলার পর কুঠুরিতে ঢুকে পড়তে হয়। সন্ধ্যাবেলা জেল জুড়ে স্লোগান চলে। নকশালবাড়ি লাল সেলাম। চারু মজুমদার লাল সেলাম। প্রতিটি আক্রমণের বদলা নাও, সংগ্রামকে চেউয়ের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। গান শুরু হয়। ভাগীরথী তুমি মেকণ্ড নদীর সীমানা ভাঙে / খবর আনো, খবর আনো / যেখানে নিদ্রাহীন মায়েরা ভিয়েতকণ্ড / যেখানে ক্লান্তিহীন বোনেরা ভিয়েতকণ্ড / শত্রুকে শেষ আঘাত হানো, আঘাত হানো.....। গানটি দ্রোণের অতীব প্রিয়। তার গলায় তেমন সুর খেলে না তবু প্রতি সন্ধ্যায় সে এই গান শুরু করে। অন্যান্য কুঠুরিতেও সহবন্দির গলা মেলায়। ওদের চালু কথায়, এ হ'ল দ্রোণের গান। পাশের কারাক্ষেত্র বাসু টিনের কৌটো ব্যবহার করে একতারা বানিয়েছে। সে যন্ত্রটি বাজিয়ে গান ধরে। মাও সে-তুঙ যার কর্ণধারে / লিন পিয়াও তার বৈঠা মারে / আরে চারু মজুমদার জ্বালছেন অগ্নি ভারতবর্ষের প্রতি কোণে / যত বিপ্লবীর আসর বসেছে আজ মহাচীনে।

এতো গেল জেলের রুটিনের কথা। কিন্তু এর অভ্যস্তরের চেহারাটি কেমন? কারাগারের বড় ঘর বারোটি। একটি ওয়ার্ডে পঁচিশ-তিরিশ জন বন্দি। ছোটো সেল পাঁচটি। কনডেম্ন্ড সেলের সংখ্যা তিন। কনডেম্ন্ড সেলের চারপাশে আবার আট ফুট উচ্চতার পঁচিল। কারাবন্দিদের মল মূত্র ত্যাগ করতে হয় কুঠুরিস্থিত একটি গামলার মধ্যে। সকালবেলায় জমাদার এসে নিয়ে যায়। যাবজ্জীবন দণ্ড হবার পর দ্রোণের ঠাই হয়েছে কনডেম্ন্ড সেলে। সেলে ঢুকেই মনে হয় এতো জেলের ভেতর জেল। জেলের ভেতর জেল, তারে কয় সেল। পাঞ্চালীর চিঠির উত্তরে লিখেছে দ্রোণাচার্য। পাঞ্চালীর কথা ভাবলেই ভেতরটা উদ্দাম হয়ে ওঠে। দু'বছর আগে লেখা কবিতার লাইন মনে পড়ে। সেই মুখটা — তার কাছাকাছি আমার উজ্জ্বল বয়স। আমার দৃপ্ত জীবন। জেল থেকে বেরিয়ে, আগের বারের মতো এবারও, ওর কাছে ছুটে যাবে দ্রোণ। ওকে জড়িয়ে চুম্বন করবে। কিছুটা দুঃস্থিও। বলবে আমায় এমন একলা রেখে তুমি কেমন করে আছ? পার্টির নির্দেশ ছাড়াও মনের গভীরে পাঞ্চালীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষাও দ্রোণকে জেলভাঙার নকশা বানাতে

জারাজিলা দেখা। কখন মন ফিরে আসে যুগ্মের পরম্পরায়।

তিন বছর কথা হল জেলের ভিতরের মানচিত্র। কারাগারের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলে কিছুটা উদ্ভূত জামা খাসমাটিতে কুড়ি ফুট হাঁটিতে হবে। তারপর ডানদিকের কোনায় কলাতর পেল। বাঁ দিকে হাসপাতাল। হাসপাতালের দিকেই বন্দিদের স্নানের ব্যবস্থা। বড় বড় চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চা পেরিয়ে একটু এগোলেই প্রভাবাগার। জেলের পাঁচিল প্রায় ত্রিংশ ফুট লম্বা, পাঁচিল ত্রিংশ ফুট উঁচু। দেওয়ালে গর্ত করে বের হওয়া শক্ত। পাঁচিল টলকালাতর সজ্জা নয়। একনাট প্রধান ফটক দিয়ে বেরনোটাই সঠিক কৌশল। কিন্তু সে দরজা তো আলাতর এক। অতঃপর জানালার সন্ধান করতে থাকে দ্রোণ।

একদিন প্রাণের জায়গায় গিয়ে মাথায় ওল ঢালতেই কেউ ডাকল। কমরেড ডিজি। ফিরে ডাকল দ্রোণ। বাসন দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে।

কবে গেল?

এই তো গতকাল সন্ধ্যায়.....

কোথা থেকে তুলল?

দুর্গাজপুরচায়ের দোকান

কত নম্বরে আছিস?

তিন নম্বর ওয়ার্ড

এমন প্রাণবিক গলায় প্রশ্ন তিনটি বের হল, যেন বসিরের আসার কথাই ছিল এইখানে। যেন এই কারাগারই তাদের ঘর। নিজের গলায় আওয়াজে দ্রোণ নিজেই অবাক। অবশ্য অবাক হবারই বা কী আছে? কারুর ভাবনাই নকশালদের মতো ঠেকলেই যখন তাকে উলটোপালটা অভিযোগ দিয়ে জেলের দেওয়া হচ্ছে, সে-অবস্থায় জেলের ভেতর আর বাইরের ব্যবধান খুঁচে যায়। যার ভাবনাচিন্তা করে তাদের জেলে আসাটাই স্বাভাবিক। ডাক্তার, নানান দমন পীড়নের ঠেলায় পুরো দেশটাই তো এখন কারাগার। ব্যান্ডেলের একটা খুরের খাটায় বাসিরের নাম জড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। বসির হাত তুলে বলল, পুলিশ মানান অভিযোগ দিলে ওয় কিছু ইজ্জত পাওয়া যেতশালারা দিয়েছে খোঁচড় খতমের কেস।

বাসির হাসল। দ্রোণও মজা পেল খুব। ভালো করে বসিরকে দেখল একবার। একই রকম আছে। শীর্ণকায়, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, স্বজ্ঞ। এমন মুখ দেখলেই ভরসা পাওয়া যায়।

এক ডান হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ। এখনও টাটকা ভাব যায়নি। দ্রোণ বলল, কী পুলিশের কাঁড়ি? বাসির মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ওই আর কি!....

কী করেছে?

আঙুলগুলো খেঁচলে দিয়েছে.... তারপর ওরাই হাসপাতালে নিয়ে গেলএখানে আসতে আসতে সঙ্গে.....

বসিরের লম্বা, সচ আঙুলগুলোর ওপর পুলিশ - সি আর পি বুট পরে নৃত্য করছে। লোহা লাগানো জুতার চাপে পাটকাঠির মতো ভেঙে যাচ্ছে বসিরের আঙুল। দ্রোণের শরীরের ভেতর কঁঠের অসুস্থতি। গুরুতর মাংস ওঠাপড়া। যন্ত্রণার কল্পনাও নিশ্চয় চোখ মুখের রেখাটাই এর কিছু পরিবর্তন ঘটায়। এমনই স্পষ্ট সেই ছবি, যাকে মাথার চুল থেকে নাক মুখ

বেয়ে ঝরে পড়া জলবিন্দু ঝাপসা করে দিতে পারে না। দ্রোণের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল বসির। আরে দূর তেমন কিছু নয়.....মাত্র চারটে আঙুল ভেঙেছে..... তোর তো দুটো হাতই ভেঙে দিয়েছিল..... হাসপাতালে প্রায় একমাস রাখার পর তো তাকে এখানে এনেছে.....তাই না? কাঁধে হাত রাখল বসির। দ্রোণের মুখে হাসির রেখা। হাঁ। তুই খবর পেয়েছিস।

জল্দি, জল্দি.....। সেপাইয়ের গলা। দুটি মানুষের অন্তরঙ্গ আলাপ ওদের পছন্দ নয়। ব্যবধান গড়াতেই তৃপ্তি এইসব মনুষ্যতরদের। বসির মাথায় জল ঢালল। আরও দু-বালতি জল গায়ে ঢেলে নিল দ্রোণ। স্নানের সময় একজন কি দু'জনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ। না হলে চিরকুটে সাংকেতিক ভাষায় নিজেদের মধ্যে খবর আদানপ্রদান। এর বাইরে কোন রাস্তা নেই মত বিনিময়ের। সেপাইটি অন্যদিকে চলে গেছে। ফিরে আসতে অন্তত পাঁচ মিনিট। এখন নিশ্চিন্তে কথা বলা যায়। গা মুছতে মুছতে দ্রোণ বললো, তুই এলি, ভালোই হল.....এবার এখানেও কিছু একটা করতে হবে.....একটা দৃষ্টান্ত.....

দ্রোণের স্বর চাপা পড়ে গেল তীব্র ঘড় ঘড় আওয়াজে। জেলের মধ্যেই রেল লাইন পাতা। ময়লা বোঝাই ট্রলি চলেছে সেই পথ বেয়ে। লাইনের দু-ধারে ফুট দুয়েক সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ট্রলি যেখানে থামল তাকে জেলের ভাষায় বলা হয় লালগাড়ি, আদতে সেটি লালরঙের দরজা। লোহার দরজার তাল খোলা হল। ওধারে আর একটি কপাট। সেই নির্গমন পথ আগেই খুলে রেখেছে কেউ। বর্জ্য জেলার এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলের। এখনও চালু রেখেছে জেল-কর্তৃপক্ষ।

ট্রলি বের হচ্ছে। একটি-দুটি-তিনটি। চার দশ ট্রলিটি বেরোবার মুখেই মাথায় বিদ্যুৎ চমক। একটি অস্পষ্ট ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লালগাড়ি ঘেঁষে পাঁচজন বৃত্তাকারে হাতে হাতে রেখে দাঁড়িয়ে। তাদের পিছনে ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে চারজন। ওরাও বৃত্তাকার। তাদের ওপর তিনজন। একই ভঙ্গিমায়ে। তিনজনের কাঁধে দু-জন। দু-জনের দুটি কাঁধে পা একজনের। মানুষের পিরামিড যেন। সেই মানবসৌধের চূড়ার ছেলটি জেলে পাঁচিল টপকে ওপারে নামল। ভেঙে ফেলল লালগাড়ির বাইরের দরজার তাল। কতক্ষণ লাগবে? বড়জোর দু-মিনিট। এদিকের তাল হাতের নাগালে। দরজা খুলে গেল। প্রথমেই বেরোবে পিরামিড সৃষ্টিকারী কমরেডরা। তাল ভাঙার আওয়াজ পেলে নিশ্চয় জেল-রক্ষীরা ছুটে আসবে। ওদের আসবার দুটি পথ। সেই দুটি পথের মুখে থাকবে কমরেডদের প্রতিরোধ বাহিনী। সেই রেজিস্টার্স স্কোয়াড আমৃত্যু লড়বে। সম্ভব হলে তারাও বের হবে। ছবিটি পুরোপুরি দেখতে পেয়ে দ্রোণ উত্তেজিত। এই তো জানালা খুলে গেল। একটা দরজা বন্ধ হলে চারটে জানালা খুলে যায়। মাস্টারমশাইয়ের কথাটি হুবহু আবৃত্তি করলো দ্রোণ। বসির দ্রুত ফিরে তাকাল। ওর চোখে জিজ্ঞাসা। পরিকল্পনাটি একটু বলতেই বাকিটা বুঝে নিল বসির। ও, হিউম্যান ল্যাডার.....ঠিক আছে.....ভাল বুদ্ধি। দ্রোণ বলল, সাবধান, ল্যাডার কথাটা চিরকুটে ব্যবহার করিস না.....লিখবি পিরামিড.....অ্যাকশনের সাংকেতিক নাম মিশরের পিরামিড.....

আবে, এই ল্যাভাচোদা আর কতক্ষণ? বসিরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লো সেপাই। — হয়ে গেছে। দ্রুত গা মুছে নিয়ে বসির অন্যদিকে চলে গেল। দ্রোণ ফিরে চলল নিজের কুঠুরির দিকে। বসিরকে হাবলা ক্যাবলা ভেবেছে সেপাইটা। ও তো আর জানে না ছেলোটা

মাথা নাথায় পুরো তালি তেল উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে! তবে বসিরের এই ভাবমূর্তির ফলে এর মূল নজরদারি কম থাকবে। অপারেশন পিরামিডের পক্ষে তা খুবই কাজের। এই পুরোপুরি নাসন ঠিক করে ফেলতে পারবে হিউম্যান ল্যাডারের শক্ত কাঁধের কমরেড। জিজ্ঞাসা নাওনীর মোক্ষাসের। কে কখন বের হবে তাও ঠিক করা যাবে। ঠান্ডা মাথায় ঠিক করতে হবে অস্ত্রের ব্যবস্থা, খাবারের জোগাড়, এমন প্রতিটি খুঁটিনাটি। বসির একটু লালার মতো থাকলে সবটাই সম্ভব।

জেলের ভেতর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। পাঁচদিনের মাথায় বসির জানাল, তিন নম্বর ওয়ার্ডের জীবনশব্দই আকশনে নামবে। ইতিমধ্যে, হিউম্যান ল্যাডারের মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

সে কী রে? কোথায়? দ্রোণ অবাক।

নাসন হাসল। ওয়ার্ডের মধ্যেই।

ওয়ার্ডের মধ্যে? কীভাবে?

শতাব্দীর নজর এড়াতে গভীর রাতে চলে পিরামিড গড়ার প্রস্তুতি। যদিও ওরা সবাই মতভায়ে অংশ নিচ্ছে কিন্তু আকশনের দিন পিরামিডে থাকছে পনেরোজন। বাকি এখানোজনের থাকবে অন্যান্য কাজ। পরিকল্পনাটি বিশদে বোঝাল বসির।

নাগীদের থেকে আট ন'জনকে নিয়ে রেজিস্ট্রার স্কোয়াড বানানো যায়। — ঠিক ঠিক। নাসনের কথায় সায় দেয়া দ্রোণ। — কিন্তু স্বাক্ষরের প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে কটা অস্ত্র থাকবে?

— কিছু লাঠি জোগাড় করার চেষ্টা করাও আমরা।

— না রে বসির, দুই লাঠিতে তিনজন, জেলের মধ্যে রিভলবার পিস্তল আশা করছি না কিছু কিছু বোমা চাই অস্ত্র নিক্ষেপে ভ'সাতটা বোমা পেতেই হবে....

জেলের মধ্যে বোমা কী করে আনা যাবে এল তে? বসির ভুরু কুঁচকে তাকায়।

দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি। বোমা আমদানি করার দায়িত্ব নিয়ে নেয় দ্রোণ।

বালনেড়িয়ান কমরেডদের চিত্রকূট পাঠিয়ে দিল সে। এইবার কমরেডদের পাঠান খাম জেলের ভেতর নিয়ে আসতে চলে। স্বপন, কৃষ্ণ আর বসির তিনজনেই প্যান্টের পায়ের দিকের জীয়ে মুড়ে খাম আনাতে শুরু করল। কিন্তু নকশালবন্দিদের দিকে পুলিশের নজরদারি বেশ। খবর চোর ডাকাতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। অতএব জংলা, সেন্টু আর দুই টিমাজনের সাচোগোষ্ট খামগুলি আনা যায়। ওরা এইসব কাজে ওস্তাদ। এবং ওরা রাজি হয়ে গেল। দুই এলল, একেছি পাটির কাগজপত্র আসবে। দ্রোণ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, ঠাঁ ডাউ। কমরেডরা মুগ্ধ হাম পৌছে দেয় আদালতে অপেক্ষারত জংলা, সেন্টু বা দুইজন। এরা নাথকমে গিয়ে গাভিয়ার ভেতর ঢুকিয়ে নেয় আমদানি হওয়া খামটি। রেখে দেয় শরীরের নিষ্কৃত কোণায়। নিয়ম করে পৌছে দেয় দ্রোণকে। খামের মধ্যে দলের কাগজপত্র চিঠি থাকে ঠিকট, কিন্তু যে কথটা ওদের বলেনি দ্রোণ তা হল, ওই কাগজপত্রের ভেতর ভেতর আছে কলেরা পটাশ আর মোমছল — বোমার মশলা। জালকাঠি আর লাঠির জড়ি জেল হাসপাতালের জমাদার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। স্বপন আর কৃষ্ণও জোগাড় করেছে কিছুটা।

জেল ভাঙার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি স্কেয়াডের অ্যাকশনের সময়সীমা হিসাব করা হল। কতক্ষণ লাগবে পিরামিড গড়তে? সংকেত পাবার পর কনডেমন্ড সেল থেকে ওখানে পৌঁছতে ক'মিনিট? প্রতিরোধ বাহিনীকে কতক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে? সব মিলিয়ে সাত-আট মিনিটের মধ্যে জেল-মুক্তি সম্ভব! তার হিসাব বসিরকে জানানো দ্রোণ। বসির কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ স্বপনকে। চারজনের এই কেন্দ্রীয় দলটি প্রথমে মত বিনিময় করে। চারজনের একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনার কোনো উপায় নেই। ওই স্নানের সময় একটা দুটো বাক্যের মধ্যেই আলোচনা এগোতে হয়। তারপর সিদ্ধান্ত। ক্রমশ তা জানানো হয় নির্দিষ্ট কাজটির জন্য নির্বাচিত কমরেডদের। কমরেডরা কোনো মতামত জানালে তা আলোচনা হয় কেন্দ্রীয় দলে। বসিরের মত, যারা পিরামিডে থাকবে তাদের কাউকে ভেতরের দরজার তালা ভাঙার দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। একজন বা দু-জন বা যারা এই কাজ করবে তাদের একমাত্র কাজ হবে ভেতরের দরজা খোলা। আর দু-নম্বর কথা হল, পাঁচিল ডিঙিয়ে প্রথম বেরিয়ে যাক দ্রোণ। হুগলির স্কেয়াডকে খবর পাঠানো হয়েছে। তারা ডিজি-কে নিয়ে চলে যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে। ডিজি-র পরে যে কমরেড বের হবে তার দায়িত্ব বাইরের তালা ভাঙা। যতক্ষণ দরজা খোলার প্রক্রিয়া চলবে, সেই সময়ের মধ্যে আরও একজন-দু-জন পিরামিডের মাথায় উঠে ওপারে চলে যেতে পারে।

নিজের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজি নয় দ্রোণ।

কৃষ্ণ জানাল, এখন পেটিবুর্জোয়া ভদ্রতা কিংবা আবেগ দেখানোর সময় নয়। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমরেডদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যা জানাবে, তা মানতে বাধ্য ডিজি।

স্বপনের অভিমত, ডিজি-কে কনডেমন্ড সেল থেকে পিরামিড অবধি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে কাউকে। সে প্রস্তাব করল, বসিরের নাম। অন্যরা সায় দিল। বসির রাজি।

কৃষ্ণ বলা সত্ত্বেও দ্রোণের বাসনা প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধা হবার। শোন বসির, যতক্ষণ তুই আত্মগোপন করে থাকবি কিংবা জেলে আর পাঁচজনের মতো বন্দি হিসাবে থাকবি তোকে কেউ চেনে না.....। কথাটি ঠিক ধরতে পারল না বসির। না বুঝেই মাথা নাড়লো। দ্রোণ হাসল। যেদিন তুই শহীদ হবি, সবাই তোকে জানবে.....সেইদিন থেকে তোর ভীষণ লেখা শুরু হবে। অন্যদেরকে জানানো হ'ল দ্রোণের ইচ্ছা। মতামতের এই আদানপ্রদান চলল প্রতিদিন।

নবম দিনে অ্যাকশনের তারিখ ঠিক হয়ে গেল — সোমবার, ৭ ফেব্রুয়ারি। পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি বিচার করে দেখা গেল সকালের খাবার আর স্নান এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময় অ্যাকশনের উপযুক্ত। প্রহরীদের একটু ঢিলেঢালা ভাব থাকে তখন। ওদের অনেকেই চা-জলখাবার খেতে চলে যায় হাসপাতালের দিকে। একটি ছাড়া দ্রোণাচার্যের বাকি সমস্ত প্রস্তাব মেনেছে কমরেডরা। যেটি অনুমোদন পায়নি, তা হ'ল ওর প্রতিরোধ বাহিনীতে থাকবার ইচ্ছা। অ্যাকশনে অংশগ্রহণকারী সব কমরেড জানিয়েছে যদি একজনও জেল থেকে নিরাপদে বেরোবার সুযোগ পায়, তা দিতে হবে দ্রোণাচার্য ঘোষ — তাদের প্রিয় কমরেড ডিজি-কে কারণ, এ কথা নিশ্চিত, অপারেশন ব্যর্থ হলে যদি একজন কমরেডের প্রাণ যায়, যাবে ডিজি-র। এরপরে আর কোনো কথা চলে না। এত মানুষ তাকে

ভালোবাসা। তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত! এই জীবনদান কোনো ধূসর কল্পনা নয়। তা পোষা চিত্রে, পোষাট চালাবার মতোই অনায়াস। বুক ফুঁড়ে গুলি যাবার মতোই বাস্তব। বক্তৃৎসর ভালোবাসায় বারে বারে চৌট কেঁপে ওঠে। চোখ ভেসে যায়। এত কমরেডের দায়িত্ব তার, তাকে দৃষ্টান্ত হতেই হবে। চারু মজুমদারকে আঁকড়ে থাকতে হবে। দু-দিন পরেই পাটরোর জগতের সঙ্গে জেলের পাঁচিলের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবে তারা। বুঝিয়ে দেবে কারাগারও আরেকটি গ্রাম। সেখানেও গেরিলা লড়াই চালাবে যায়। এতকাল সি এম কে গুকের মধ্যে ধরে রেখেছে সে। কোনো সংশোধনবাদী পথ নেয়নি। কোনো চেষ্টা করেনি জামিন নেবার। কিংবা আপীলের। তার কাছে মুক্তির প্রশ্নে মাত্র দুটি উত্তর — হয় জেল ভেঙে মুক্তি, নয় গণযোজের হাতে মুক্তি। উত্তর দুটি সে জানিয়েছে পাঞ্চালীকে। পাঞ্চালী, পাঞ্চালী। একমাত্র ওই নারীর কথা মনে পড়লে, দুর্বল লাগে। বসিরের থেকে ঘর খবর পেয়েছে দ্রোণ। কমরেড নিরুপম সুস্থ হয়ে উঠলে পাঞ্চালী নিশ্চয় তার কাছেই ফিরে আসবে। সে কি অপেক্ষা করবে না দ্রোণের জন্য? নিরুপমের সঙ্গেই থেকে যাবে? ঐক্য অভিযানে পাঞ্চালীকে জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেয় দ্রোণ — আমার শরীরে আর তাপ নেই, মাথা নেই কোনো? বছর দুয়েক আগে এমন একটি লাইন লিখেছিল সে। পাঞ্চালী চলে গেছে। লাইন লিখে কবিতা তাকে ছেড়ে যায় নি এখনও। গোড়ালির কাটা দাগটির মতো পুরোনো চরিত্র থেকে গেছে। নিরুপম কীসে তার থেকে ভাল? দেখতে ভাল? বসির খা বলেছে, তা তো নয়। তার মতো কবিতা লিখতে পারে? তাও নয়। তার মতো সাহসী? জোড়বার খতম করেছে? ঘরে হয় না। অংশের কলকাতায় পুলিশ খতম করেছে। খবর এসেছে বসির। অর্থাৎ লাগল অংশট আঁকড়ে কিস্তি ও কী তার মতো সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে পাঞ্চালীকে? তাকে পারে না। তবে পাঞ্চালী কেন নিরুপমের কাছে থাকবে? তবে কী ওই মেয়ের মধ্যে পূজনীয় জীবিত জীবিত জীবিত আঁকড়ে চলে ওঠে। দু মিনিট পরেই লজ্জায় সিজেক থেকে জেট লাগে বুন। এ তো অভিযানের প্রকাশ নয়। সত্যিকারের অভিমান তো একটা অসামান্য সম্পদ। লাগের বক্তৃৎসর। তা সর্বকম লোভ লাগসা দ্রোণ থেকে মনকে রক্ষা করে। অতল গভীর মতো। সে পরশ্রীতে কাগজ হতে দেবে না। অভিমানী কখনওই কাপুরুষের মতো চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে না তার প্রিয়তমকে। পাঞ্চালী যদি সত্যিই নিরুপমের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় তাকে ত্যাগও করে, সে বীরের মতো মরবে কিন্তু ওই পুরুষের গাভীর দীপ্তি তিস্যে দাঁড়াবে না। কোনোদিন না। দ্রোণ নিজের মনে বলে, পাঞ্চালী ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। ভেতরটা সুস্থ হয়। সুস্থির লাগে। বস্তুত, এইসব দুর্বলতাও পরোক্ষভাবে চিন্তা। এখন মনকে করতে হবে ইস্পাতের মতো। রাখতে হবে আত্মবলিদানের লাগ। তাকে তৈরি উঠতে চলে চারু মজুমদারের স্বপ্নের নতুন মানুষ। নতুন মানুষ কথাটা সত্যিভাবে উচ্চারণ করে দ্রোণ। শব্দটিকে নিয়ে খেলা করে। নির্জন কুঠুরির মধ্যে তা উড়ে বেড়ায়।

পাঞ্চালীর কথা শুনে, সি এম এর কথা আবৃত্তি করতে করতে ৬ ফেব্রুয়ারী রাত এসে পেল। আর কমরেডটা শব্দ পড়েই তো অ্যাকশন — অপারেশন পিরামিড। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো দ্রোণ যেখানে উঠলো, যেখানে সূর্য ওঠার আর এক নাম ভিগোতাম / কথিতা ওজস্বীর খবর আগে শ্রীকান্তলাল। চেনা গানের মানখান থেকে পরেছে দ্রোণ।

তীব্র আবেগে গানের কথাগুলি উচ্চারণ করে। যেখানে লক্ষ শৃঙ্খল বারুদের স্তূপে জ্বলছে / সেখানে নতুন আক্রমণের দিন আনো।

এক মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য কুঠুরি থেকে কমরেডদের মিলিত কণ্ঠ ভেসে আসে। ভাগীরথী তুমি মেকঙ নদীর সীমানা ভাঙো / খবর আনো খবর আনো....

যথারীতি একটি গানের সূত্রে আরও গান চলে আসে। রাত গড়ায়। সম্মেলক সুর চলতেই থাকে। বেশি উচ্ছ্বাস জেলারের মনে সন্দেহ জাগাবে না তো? দ্রোণ শিস্ দেয়। কমরেডরা বোঝে সতর্কবার্তা। ক্রমশ গান থেমে যায়। গান থামলেও কবিতা আসে। অনেক দিনের অনেক অত্যাচার / এবার আমরা ভাঙবো কুঠারাঘাতে, / তাই তো জনতা জেগেছে এমন রাতে / কাস্তে হাতুড়ি হাতে লাল ঝান্ডায়। বহুকাল আগে লেখা কবিতার লাইন বলে যায় দ্রোণাচার্য। মানুষের মাঝখানে বেঁচে থাকা বড়ো বেশি সুখ / মানুষের মাঝখানে মৃত্যু মানে শেষ গল্প বলা....। নির্জন কক্ষে ছন্দ ঘুরপাক খায়।

অ্যাকশনের ছন্দটিকে আর একবার ঝালিয়ে নেয় দ্রোণ। সকালের খাবার আসবে। কুঠুরির দরজা খোলা রেখে ওয়ার্ডার চলে যাবে। যাবার সময় বন্ধ করে যাবে বাইরের প্রাচীরের দরজা। সেল আর পাঁচিলের মধ্যবর্তী নাবাল জমিতে অন্যান্য দিনের মতোই একটু হাঁটাচলা করবে দ্রোণ। অন্যান্য দিনের থেকে অবশ্য একটু বেশি সজাগ থাকতে হবে। বন্ধ দরজার ওধার থেকে বসির যেই বলবে পিরামিড, দ্রোণ একটু দূর থেকে ছুটে এসে লাফিয়ে ধরে নেবে কুঠুরিকে ঘিরে রাখা আটফুট পাঁচিলের মাথা। শরীরের সামান্য মোচড়ে উঠে যাবে প্রাচীরের মাথায়। লাফিয়ে নামবে ওধারে। জেলের ভেতর জেল। ভেতরের জেলের এই প্রথম বাধাটি অতিক্রম করেই বসিরের সঙ্গে দ্রোণ ছুট লাফিয়ে লালগাড়ির দিকে। যেখানে খাড়া হতে চলেছে হিউম্যান ল্যাডার। পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক। এই মানব সৌধকে রক্ষা করবার জন্য বোমা হাতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ বাহিনী। বোমার কন্ট্রায় বাঁশবেড়িয়ার কমরেডদের ভুললে চলবে না। ওরা অসামান্য। দ্রোণের ছোট্ট চিঠি পেয়েই ওরা জেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে বোমার মশলা। বানাবার সরঞ্জাম। তিনি নম্বর ওয়ার্ডের কমরেডরা বেঁধে ফেলেছে বোমা। একটি করে বোমা তৈরি, আর তা রেখে আসা লালগাড়ির নিকটবর্তী পরিত্যক্ত বাথরুমে। এমন প্রক্রিয়ায় কমরেডরা বানিয়ে নিয়েছে সাতটি বোমা। লাঠি ছাড়াও এই অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে জেলের রেডগার্ড স্কোয়াড। বাধা এলে ওরা লড়াবে। ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী। নতুন মানুষ।

উদ্ভেজনা যুগ আসে না দ্রোণাচার্যের। নিকরদেশ ভ্রমণের আগে এমন হয়। প্রথমবার ট্রেনে চেপে বারাগসী যাবার আগের রাতে এমন হয়েছিল। পরবর্তীতে খেয়ালের ঘোরে ট্রেনে, বাসে চেপে আতপুর, বিষ্ণুপুর, বনগ্রাম ঘুরে এসেছে দ্রোণ। শুধু নামটি ভালো লেগেছিল বলে চলে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুরে। প্রত্যেকবারই গন্তব্যহীন ভ্রমণের আগের রাতে একই উদ্ভেজনা। এবারও তো আরেকরকমের নিকরদেশ যাত্রা। যেখানে, যাবার ইচ্ছেটাই প্রবল। কারাগারের দেওয়াল অতিক্রম করে কোন ঠিকানায় যে পৌঁছনো যাবে, তা তো জানা নেই। যেন হঠাৎ কোনো স্টেশনে নেমে পড়েছে সে। প্ল্যাটফর্মে মানুষের মুখ। প্রতিটি মুখচ্ছবিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া। কুকুর, ভিথিরি, ভদ্রলোক, ক্ষীণ আলোর তলায় অপেক্ষারতদের দিকে তাকিয়ে কোনো চেনামুখের সন্ধান তো পাওয়া গেল না। কেউ তো দূর থেকে এগিয়ে আসতে আসতে বলছে না — এই যে আমি!

ভারপ্রাপ্ত দিকে তাকা এসে গেল। খুম এমনই। জানালার ফাঁকে জ্যোৎস্নার মতন। না বল করে। নিঃশব্দে আসে।

লোকনাটে লম্বা হেঁটেই আচ্ছন্নভাবে উঠাও। কিন্তু এ আওয়াজ পাশের ওয়ার্ডের দরজার। সকালের খাদ্য এসেছে। শব্দের তারতম্যে দ্রোণ ঠিক বুঝে নিতে পারে কোথায় কী ঘটছে। একটুখানি ঘুমিয়েই তেঁতেরটা শান্ত হয়ে গেছে। অ্যাকশনের সময় মাথাটা যেন নিজে নিজেই ঝাঁকি দিয়ে যায়। বিচারবুদ্ধিও বেড়ে যায়। ধৈর্যও।

বাইরের জ্বালা খোলার লম্বা হল। এক মিনিটের মধ্যেই খুলে গেল কুঠুরির দরজা। ভয়ানক ঘরে ঢোকার মুহূর্তে লম্বা হাট তুললো দ্রোণ। যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া নকশাল-বন্দির আশাব্যবসায় একবার দেখে নিল লোকটি। তারপর চটাওঠা কলাইয়ের বাটি রেখে চলে গেল। গেমল অগাধিও যায়।

পাঁচিলের দরজা এক হেঁটেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্রোণ। ছোলাসেদ্ধ মুখে পুরে দিল। চিনোতে চিনোতে দ্রুত গেরিয়ে এল কুঠুরি থেকে। শরীরকে একটু তাতিয়ে নেওয়া দরকার। এক আমগাছ পাড়িয়ে দৌড়ল কিছুক্ষণ। ফুটবল ম্যাচ শুরুর আগের প্রস্তুতি। ঠিক সময়েই বসির পকেট পাঠাল। এক থেকে একশো গোনার মধ্যেই দ্রোণ বেরিয়ে এল বসিরের সামনে।

গায় দাকনা। দ্রোণের পিঠে হাত রাখল বসির। কমরেড এবার চল....। — হ্যাঁ, চল চল। মৌদিক দিয়ে যাবার কথা ছিল সেই প্রধান ফটকের দিকের প্রহরী এখনও তার স্থান ছাড়ে নি। অতএব ওরা জেলের পিছন দিক দিয়ে পৌঁছে গেল লাগগাড়ি।

পিরামিড গাড়া শুরু হয়ে গেছে! দু-তলা সুশীর্ষ হবার মুহূর্তে ভেঙে গেল মানবসৌন্দর্য। আবার এক গাড়া নিল ওরা। দু-তলা। তিন-তলা। চারতলা আরও হতেই আবার গড়মুড় করে ভেঙে পড়লো সব। বোমাই যাচ্ছে ওরা চাপে আছে। উত্তেজনায় নষ্ট হচ্ছে ছন্দ। দ্রোণ বললো, কমরেডসু, গাড়াগাড়া দরকার নেই.....ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে চলুন.....আমরা সবাই দেখিয়ে দেব মাথা খাটিয়ে কত কী করে ফেলা যায়.....কমরেড সি এম আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আবার শুরু হয়ে গেল নির্মাণ। পিরামিড সম্পূর্ণ। অটুট দাঁড়িয়ে হিউম্যান ল্যাডার। এক মুহূর্তের মধ্যে দ্রোণ উঠে পড়ল প্রথম সোপানে। লঘু পায়ের। ক্ষিপ্ত কিন্তু লঘু পায়ের। গায়েল ডালে কাঠিগড়াল। চলবে, কিন্তু শাখাপ্রশাখা ভেঙে পড়বে না। তিন থেকে চারতলায় উঠতে হেঁটেই শেফা থেকে চিংকার। ঘাড় ফেরালেই সময় নষ্ট। শরীরের ছন্দ বিঘ্নিত হবে। দ্রোণ তাকাল না। আর একটি ধাপ পেরোলেই লক্ষ্যপূরণ। মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। একটি কদম তুলতেই হঠাৎল বোঝে উঠল। পরমুহূর্তেই বোমা ফটার আওয়াজ। একটা-দুটো তিনটে। লাগের নিচের কাঁধটি দুপে উঠল খুব। ভারসাম্য রাখা গেল না। ভেঙে পড়ল সবাই।

জেলের লাগলা খাণ্ডি বেজে উঠেছে। এসময় কুঠুরির বাইরে থাকাটা আইন মোতাবেক অপরাধ। শুরু হয়ে গেল লাঠিচার্জ। সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ। এলোমেলো দৌড়ছে সবাই। ঘিরে ধরে লাঠি চালান্ধে জেল পুলিশ। খাতকদের আশ্রয়লন আর আক্রান্তদের যত্নগার শব্দে ব্যাভাস জ্বলল। মাথায় হাত দিয়ে ভটকে পড়লো বসির। দ্রোণ উঠে পাড়ানার চেষ্টা করলো। পুলিশের লাঠি ঠোঁটের কাঠি, জমা করে না ছাড়াপাটি। পুলিশের লাঠি চালনার খবর পড়লে

নিবারণ নিজের মনে ছড়া কাটতেন। অকস্মাৎ বাবার মুখে শোনা এই ছড়া কেন যে মনে এল! কিন্তু মনে আসায় জোর পাওয়া গেল খুব। ওঠো, উঠে দাঁড়াও দ্রোণাচার্য।

ওঠবার মুহূর্তে পেটে লাথি কষাল কেউ। উপুড় হয়ে পড়ে গেল দ্রোণ। গুরু হয়ে গেল লাঠিবৃষ্টি। পুলিশের লাঠি এর আগে খেয়েছে দ্রোণ। যন্ত্রণায় পিঠ বেঁকে যায়। সেই তীব্রতায় শরীরের ভেতরে নিশ্চয় কিছু জৈব পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে অনুভূতি কমে যায়। তখন মার খেলেও আর লাগে না তেমন। আর জ্ঞান লোপ পেয়ে গেলে তো সব চুকে গেল। কিন্তু আজ এরকম যন্ত্রণা কেন হচ্ছে তার? নাঃ লাঠি নয়, কোনো ভোঁতা ধাতব অস্ত্র দিয়ে মারা হচ্ছে তাকে।

একতরফা মার খেতে খেতে মরিয়া ভাব আসে। চিৎকার করে ঘুরে দাঁড়িয়েই ডানদিকের প্রহরীর মুখ লক্ষ্য করে ঘূষি চালাল দ্রোণ। হঠাৎ পিছন থেকে পায়ের গোড়ায় লাঠির বাড়ি। এবার চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। পাশেই বসির শুয়ে। আহা, বেচারার সারা মুখমণ্ডলে রক্ত! নিজের শরীর দিয়ে বসিরকে আড়াল করবার চেষ্টা করল দ্রোণ। কে যেন হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিল। দ্রোণের উন্মুক্ত পেটের ওপর লাফাতে গুরু করে দিল দু-টি প্রহরী। বুক ফেটে গেল যেন। আর্তনাদ বের হতেই গলায় পা রেখে দাঁড়িয়ে গেল লোহার নাল লাগান বুট। দমের কষ্ট ভীষণ। বাতাস না পেয়ে দ্রোণের শরীর আন্দোলিত। আঙুলগুলি মাটি খিমচে ধরল। ডান হাতের মুঠোয় ঝুঁট এল কিছু দলা পাকানো মাটি। একবার বমি হ'ল। রক্ত...রক্ত শুধু। আর কোনো যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পেল না দ্রোণ।

কিছু পরে, আবার শোনা গেল শব্দ। গোড়ার আওয়াজ। মানুষের। ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করল দ্রোণাচার্য। ঘুরল না। দৃষ্টি ঝুঁকল। বকের ভেতরের হাপর দুটি আর বাতাস টানতে পারছে না। অথচ কী আশ্চর্য! এমন কিছু বেদনাবোধ নেই! কোথায় যেন যাবার ছিল তার? কোন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে? এখন কী উষাকাল? খুব শীত করছে তার। কেউ কী উষ্ণতা দেবে?

একটি মুখ তার মুখে ঝুঁকে এল। পাঞ্চালী? না না....বসির। ওর থুতনি বেয়ে রক্ত-অশ্রুর মতো বরছে দ্রোণের মুখে। তবু বসির কথা বলল। পুলিশ চলে গেছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখন।

অনেক চেষ্টায় ঠোট নাড়াল দ্রোণ। ওই গানটাশোনার্ণব, বসির....

কোন গান বলতে পারল না। কিন্তু বসির এবার ঠিক। মেকডোর কূলে ডাকুক রক্তের বান / ভাগীরথী তুমি সাথী হয়ে গাও / জীবনের জয়গান / যেখানে বিশ্বশত্রু কবরের মাটি ঝুঁড়ে / সেখানে নতুন সৃষ্টির দিন আনো / আনো আনো দ্রোণের ডান হাত দু-মুঠোয় চেপে ধরল বসির। দ্রোণের মুঠোভরা মাটি চলে গেল বসিরের মুঠোয়। এমনভাবেই তো ওরা চিরকুট দেওয়া নেওয়া করেছে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় নিজের মুঠো বন্ধ করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল বসির।

আবার ঠোট নড়ল দ্রোণের। কিন্তু এবার ওর কথা বোঝা গেল না। বসির ডাকল, দ্রোণ..... দ্রোণা.....। কোনো প্রত্যুত্তর এল না। দ্রোণের হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল হঠাৎ। প্রবল রক্তক্ষরণের মধ্যেও বসির বুঝে গেল দ্রোণের শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে সাড় চলে যাচ্ছে। চিরকালের মতো।



রবিবার দুপুরের কলকাতা যেন এক জাদুনগরী। কী এক ভোজবাজিতে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া, মালমজদার কথ। আকাশে হাঙ্গা মেঘ। আলো বাড়ছে, কমছে। বৈশাখ মাস পড়েছে কিন্তু মোম্বরের ভেজ সেই তেমন। মাঝে মাঝে গিনা নোটিশে হাওয়া খেলা করে যাচ্ছে রাস্তায়, মলিনমে। মোড়ের মাঝায় লেখের দুপাশে নাতিদীর্ঘ তোরণের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছ দুটি বা-বাড়ি দিচ্ছে সেই তাতয়াম। গাছের নীচে তিনটি রিকশা। হাতল নামান। রিক্সার সবিকে মালিশ করে ডিনজন রিকশাওয়ালাই ধুম দিচ্ছে। সামনের রাস্তায় একটিও পথচারী নেই। লেখের জাতিটি দাগ, প্রতিটি খন্দ-খোদল স্পষ্ট দেখা যায়। হঠাৎ ধাতব আওয়াজ। একটি ভায় খালি ট্রাম ডানদিক থেকে বাম দিকে, ওয়েলিংটন স্ট্রিট ধরে ধর্মতলার উদ্দেশে চলে গেল।

জানালার খড়খড়ি এক করে নিজের খাটে বসে পড়লেন সুকান্তি। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। তৎসংবৃত্ত ঠাকমোকর দিয়ে আলো ঢুকছে। ঘরের দেওয়ালে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র নকশা। কখনও উজ্জ্বল, কখনও ধূসর। মাথার উপরে ঘুরতে থাকা পাখার ব্রেডে আলো পড়ে বিশ্রম তৈরি হয়েছে। যেন উৎসব প্রাক্কণের যিকিমিকি আলো। দেওয়াল-ঘেঁষা খাটে অতুল গুমিয়ে। ওর খালি গায়েও আলো অন্ধকার চ্যুতান ছবি একে চলছে। নিয়ত পরিবর্তনশীল সেই আলপনা। পাশের ঘর থেকে তেঁতি আসছে রেডিও নাটকের সংলাপ। রবিবারের এই সময়টি কান খাড়া করে রেডিও শোনা মধ্যবিত্ত বাঙালির অবশ্যকরণীয় আলিঙ্গন। ঢুকে পড়েছে। শুরু হবে অনুবাদে আসর দিয়ে। তারপর নাটক। নাটকের পরে খবর। খবর শেষ হতে হতেই অধিবাসীদের কেউ পাশবালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ রেডিওর বোতাম ঘুরিয়ে বর্ণিত ভারতীর বিচিত্র অনুষ্ঠান শোনে। গিমিদের অনেকে চায়ের জল বসায় এই সময়। এক কাপ চা খেয়েই ছুটেবে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে। এ সময় পুলিশের চরোরও বোতাম টিপেচালা, ধুমোতে যায়।

গাটিক মাঝামাঝি জায়গায় দৌততেই, উঠলেন সুকান্তি। তাঁর আর অতুলের খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্রুত প্যান্ট-শার্ট পরে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। হাতঘড়িটি কাজের কিছু ওপরে শত করে বীধা। কাঁধে বাদামী কাপড়ের ঝোলা। এই ব্যাগের ভেতর পুকাগির সংসার। সেখানে পায়জামা, পাজ্জাবী, দাঁতমাজা-দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, টর্চ, মোটা ক্রেমের বোদ চশমা, যেমন আছে, তেমন পাওয়া যাবে দুয়েকটি বইও। ইদানীং একটি পুস্তির চাদরও ঝাঁট পেয়েছে ঝুলিতে। হঠাৎ করে রাস্তিরে অন্য কোথাও থেকে যেতে হলে চাদরটি কাজে লাগে। এই চাদর পাতাও যায় আবার গায়েও দেওয়া যায়। কয়েক ভাঁজ করে এ দিগে মাথার বালিশের কাজও চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

স্বাভাবিক একবার তাত গুলিয়ে নিয়ে গলা খাঁকারি দিলেন সুকান্তি। আচ্ছা, আমি তাহলে বেরোচ্ছি... অতুল পড়মড় করে উঠে বসল। কটা বাজে? ঘড়ি দেখল একবার। একটা কড়ি। ঠিক আছে, লাবধানে গায়েন। আজ আমি ঘরেই আছি...

সুকান্তি কোনো উত্তর না দিয়ে দরজার ছিকিনি খুললেন। চৌকাঠ পেরিয়ে ফিরে তাকালেন একবার। অতুলের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লেন। — ঠিক আছে। অতুল দরজা বন্ধ করে দিল।

ধীরপায়ে তিনতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন সুকান্তি। সপ্তাহ দুয়েক হল চৈতন সেন লেনের এই মেস বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সুকান্তির পরিচয় এ বাড়ির পুরনো বাসিন্দা অতুল সেনের জ্যাঠামশাই অতুল বর্ধমানের ছেলে, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এম এস সি পড়ছে। পার্টির গোপন সমর্থক। অতুলের বাবা পারিবারিক ব্যবসার কাজে মাঝে মধ্যে এখানে এসে ছেলের কাছে থাকেন। এখন বাবার পা ভেঙেছে, আগামী দু-মাস আসবেন না। সেই দু-মাস জ্যাঠামশাই থাকবেন তার এখানে। শোবেন, বাবার জন্য নির্দিষ্ট তার পাশের খাটটিতে। অতুল দেশের বাড়ি যাওয়া আসা করবে। ছেলেটির বানানো গল্পের মধ্যে শুধু তার বাবার পা-ভেঙে যাওয়াটুকুই সত্যি। কিন্তু এতে বড় সুন্দরভাবে জুড়ে গেছে জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্র। সবদিক খতিয়ে দেখে ক্রাউচ লেনের আশ্রয় ছেড়ে সুকান্তি এখানে চলে এসেছেন। তার থাকা নিয়ে মেসবাড়ির অন্য আবাসিকদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

রাস্তায় নেমে অভ্যাসবশত ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কালো চশমা বের করলেন সুকান্তি। কিছুদিন আগে চোখ উঠেছিল তাঁর। চোখ লাল, কবকব করছে, চোখের কোণে পিচুটি। সে এক বিশ্রী অবস্থা। ভাইরাসের সংক্রমণে হওয়া চোখের এই অসুখের নাম ডাক্তারদের পরিভাষায় কনজাংটিভাইটিস হলেও आमजनता থেকে ‘জয়বাংলা’ বলে থাকে। বিগত বছরে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়কালে এই রোগের খুবই প্রকোপ ছিল কলকাতায়। তারপর থেকেই বোধহয় এই ডাকনাম। সেই রক্তচক্ষু অসুখের সময় থেকেই মোটা ফ্রেমের রোদ-চশমা পরা শুরু। অসুখ সেরে গেলেও চশমা পরার অভ্যাসটা থেকে গেছে। এতে মুখের চেহারাটা কিছু বদলে যায়। চট করে চেনা যায় না। চশমা লাগিয়ে সোজা ওয়েলিংটন স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে গেলেন সুকান্তি। ট্রামরাস্তায় পড়ে বাঁদিকে একটু এগোলেই দেখা যায় বাস-ট্রাম দাঁড়বার নির্দিষ্ট জায়গা। দূরে কোনো যানবাহন দেখা গেল না। গণেশ অ্যাডভান্ট লক্ষ্য করে হাঁটাই ভাল। ট্রাম বা বাস যেটি আগে আসবে, হাত দেখিয়ে উঠে পড়লে হবে। বয়স্ক মানুষ হাত দেখালে যে কোনো জায়গাতেই বাস, ট্রাম থেমে যায় এখনও। রাস্তার ডানদিকে চোখ গেল। বাড়ির দেওয়ালে লেখা ইন্দিরা গান্ধী যুগযুগ জিও। নির্বাচনী দেওয়াল লিখন এখনও জ্বলজ্বল করছে।

প্রায় আটমাস রাষ্ট্রপতি শাসনের পর একমাস হল রাজ্যের নির্বাচন হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আর সি পি আই জোট বেঁধে লড়েছে। অন্যদিকে সি পি এম-এর সঙ্গে জোট বেঁধেছে আর এস পি, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক এইসব বামপন্থী পার্টি। নির্বাচনের কিছুকাল আগেই শুরু হয়েছিল খুনোখুনি। কংগ্রেস শুরু করল এলাকা দখলের লড়াই। গুন্ডারা ভয় দেখাতে শুরু করল এলাকার মানুষকে। সি পি এম অনুযোগ করছিল তাদের প্রচারে সুযোগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সভা করবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তখনও তেমনভাবে বোঝা যায়নি কী হতে চলেছে নির্বাচনের দিন এবং ভোটের ফলাফলে। নির্বাচনের দিন বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস। অনেকেই নিজের ভোট নিজে দিতে

বাবার নাম। যেটি কেবল গিয়ে জানলেন ইতিমধ্যেই তার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।
কল বাবাবল দেখা গেল কংগ্রেস সিপিআই জোট জিতে গেছে। ২৮০ আসনের মধ্যে
কংগ্রেস পেয়েছে ১১৬, সি পি আই ৩৬, কোনোরকমে ১৪ আসন পেয়েছে সিপিএম।
বিধানসভার নির্বাচনে না দাঁড়িয়েও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
সিদ্ধার্থনাথন রায়া। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদ পদ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। নিয়মমত, ছ-
মাসের মধ্যে বিধানসভার কোনো নির্বাচনী এলাকা থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে তাকে জিতে
আনতে হবে।

সরাসরি ভোটার পর বামপন্থী জোট হই চই শুরু করে দিল। রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেস
জালিয়াতি করে জিতেছে আভিযোগ তুলে বিবৃতি দেওয়া হ'ল বামফ্রন্টের পক্ষে —
বিধানসভায় যোগ দেবে না তারা। বামফ্রন্টের কোনো সদস্য শপথও নেবে না। মজার
খাবার, ভারতের সি পি এম-এর বাঘা নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত তড়িঘড়ি জানিয়েছেন

বিধানসভায় যোগ দেবে না মানে এই নয় যে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র পরিত্যাগ করেছি।
সুকান্তি হাতি পায়া। সংসদীয় গণতন্ত্রের এমন নিষ্ঠাবান পুজারিরা কীভাবে এই ব্যবস্থা
কেও পর্বতানার একনায়কত্ব স্থাপন করবে? ব্যাটারা একনায়কের ভণ্ড। নির্বাচনের আগে
কংগ্রেসের কংগ্রেসি মাদ বামফ্রন্টের হেরে যাবার একটি কারণ হয়, অন্য কারণটি নিশ্চয়
বামপন্থীদের ভেতরের অনৈক্য। কংগ্রেসিরা যখন নকশাবাদের খুন করছিল তখন তো সি
পি এম কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেনি। বরং মুখশিই হয়েছিল। ওরাও কংগ্রেসিদের
সঙ্গে ওত খিলিয়ে নকশাবাদের মেরেছে, এলাকা ছাড়া করেছে। নিজের আধিপত্য বাড়ানোর
নেশায় শুধু নকশাবাদ সি পি আই কমিটিরও মেরেছে সি পি এম। ফরওয়ার্ড ব্লক,
এস ইউ সি এর জেলারাম দাদ পড়েছিল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার আশায় তোরা দিনের
পর দিন কংগ্রেসি গভাদেন হায়া দিয়েছিল। এখন তাদের হাতে তাদের মার খাবার সময়
নাশে কেউ নেই। ভোটার নেতৃত্ববাদ দৈত্যকে মুক্ত করেছে, এবার ঠালা সামলা।

এই ভো কামিন আগুইট সি পি এম এর কলকাতা লোকাল কমিটির অফিসে কলকাতা
পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তানা দিয়েছে। কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। কেউ সি পি এম-
এর ওয়েব সাইটে যায়নি। এত মারধোর খাবার পরও সি পি এম-এর এখন পাশ্চাৎ প্রতিরোধ
পড়বার সাহস নেই। ওরা যেমন বলে থাকে তেমন কিছু সাজানো, গালভরা কথা বলে
চলেছে। অসংগত কঠিন অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জাল, অবৈধ নির্বাচন
বাড়িল হোক। ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ধ্বংস হোক। বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ। কমিউনিস্ট
পার্টি (মার্কসবাদী) জিন্দাবাদ।

১৬ ১৬ আত্মজা নেয়া গিরে তাকালেন সুকান্তি। ট্রাম এসে গেছে। ধর্মতলার ট্রাম।
ধর্মতলায় মেয়ে অবাগীশুর গানার অনেক বাস পাওয়া যাবে। ট্রামে উঠে পড়লেন সুকান্তি।
নবমিলেটি মনে মনে খালিয়ে নিলেন। যদুবাবুর বাজারের একটু আগে নেমে রাস্তা পেরিয়ে
বৌদল্লার দিট ধরে ওরিশ মার্কার রোডের মুখে আসতেই যে হলুদ বাড়ি, সেখানেই
আজকের মিটিং। বিকেল চিনাটেয়া। একবার ঘড়ি দেখলেন সুকান্তি। সময়মতো পৌছে
গাওয়া যাবে।

জিটিভের আলোচনটি খুব দরকার। সাধন সরকার গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। এখন দীপক

বিশ্বাস রাজ্য সম্পাদক। ও তো চারু মজুমদারকে একেবারে দেবতা বানিয়ে পূজাপাঠ শুরু করে দিয়েছে। এমন লোকদের মাথার সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। এরা আজ একজনকে দেবতা বানায়, কাল তাকে অসুর বানাতে দ্বিধা করে না। সংসদীয় রাজনীতিতে এমন তো প্রতিনিয়ত ঘটছে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম যাদের অস্থিষ্ট, তারা এমত হবে কেন? এছাড়া এমন করলে তো সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে চন্দ্রদার একটা দূরত্ব তৈরি হবে। তারা দূর থেকে ফুল ছুঁড়বে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করবে না। যে কোনো অতিরঞ্জনই ক্ষতিকারক। সম্ভবত এইসব দেখেই সুনীতি কুমার ঘোষও কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য চারু মজুমদারের একটি অবদানের কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। উনিই কৃষকদের সমস্যাটিকে সবার নজরে এনেছেন। নকশালবাড়িতে আন্দোলনটা হয়েছিল বলেই এখন সব দলই ভূমিসংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে। কিছুদিন আগে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দেশ পাঠিয়েছে ভূমি সংস্কারের। পাঁচজন লোকের একটি পরিবারের জমির সর্বোচ্চ সীমা হবে ১৮ একর। যুব কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার জন্য যুব কংগ্রেস কর্মীরা জোতদারদের বাধ্য করবে। ক'দিন আগেই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্দেশ দিয়েছেন নির্ধারিত সীমার বাড়তি জমি খুঁজে বের করতে। বলেছেন, বাড়তি জমির খবর না জানলে জোতদারকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হবে। দশমাস হয়ে গেল, এই মেনোনিয়াস অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন চালু হয়েছে। সংক্ষেপে সবাই একে মিসা বলে। সিদ্ধার্থশঙ্কর বোধহয় খুবই পছন্দ করেন এই আইনটি। দিনে অন্তত দশবার এই আইন প্রয়োগের কথা বলে থাকেন। মিসা চালু হওয়ার পর থেকে ক'টি চোরাকারবারী ধরা পড়েছে জানা নেই। তবে এই আইনের বলে সেই নকশাল সমর্থককে বিনাবিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। এখন সেই আইনের বলে নাকি বদমাস জোতদারদের গ্রেপ্তার করা হবে। যত হাস্যকর কথা। এই লোকটির আসলে পল্লবগ্রাহিতার অভ্যাস। নিষ্ঠুর মনোভাবও প্রকাশিত তার কথাবার্তায়। কাশীপুর-বরানগরের বীভৎস গণহত্যার পর সিদ্ধার্থশঙ্করকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করল, সারারাত ধরে ওই অঞ্চলে ঠান্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড চালান হয়েছে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা কী তাহলে আত্মান্ত হলে পুলিশ প্রোটেকশন পাবে না? সাংঘাতিক জবাব দিলেন এই সিদ্ধার্থশঙ্কর। আগে দেখতে হবে, যারা মারা গেছে তারা শান্তিপ্রিয় ছিল কি না? এমনভাবে দলের যাবতীয় গুণ্ডামিকে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন যিনি, সেই মুখ্যমন্ত্রী আইনভঙ্গকারী জোতদারদের মিসায় ধরবেন! উনি কি জানেন না গ্রামের ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সব জোতদার? এমন করলে তো গ্রামাঞ্চলের কংগ্রেসের সব মাথারা জেলে ঢুকে যাবে। সিদ্ধার্থের বাগাড়ম্বর মনে পড়ায় আবার হাসি পেল সুকান্তির।

ধর্মতলায় নেমেই পাওয়া গেল হাজরাগামী একটি দোতলা বাস। দ্রুত চৌরঙ্গী-লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে পৌঁছনো গেল। হাতে কিছুটা সময় আছে। আরও কিছুক্ষণ বাসের মাথায় বসে থাকা যায়। যদুবাবুর বাজার পার করে বাস থেকে নামলেন সুকান্তি। বিপরীত ফুটপাথ ধরে উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করলেন। বেনীনন্দন স্ট্রিটে ঢোকবার মুখে একটি সাদা বাড়ির দেওয়ালে নজর পড়ল। ক্যান ক্যালকাটা বি লিবারেটেড? ইয়েস ইন টু ইয়ার্স।

সি।লি.আই. (এম.এল)। কী করে সম্ভব? সুকান্তি মাথা নড়লেন। রাষ্ট্র ভয়ংকরভাবে আক্রমণে নেমে পড়েছে। উচিত কথা বললেই দমন পীড়ন নেমে আসছে। আমেরিকা তো ছিলই এখন রাশিয়ার সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে ভারত। মুখে সমাজতন্ত্রের কথা, কাজে লাখালাখী এই দেশটির সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। দুই শক্তিধরের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চোখরাঙানি, ক্ষমতার দণ্ড বেড়ে গেছে। অন্যদিকে দলের অবস্থা খুবই নড়বড়ে। অনেকটা দূর পড়ে যাচ্ছে। কমরেডদের মধ্যে অবিশ্বাস চরমে। নিজস্বের মধ্যে আলোচনায় দলের ভুলত্রুটি উল্লেখ করে কথা বললেই সে হয়ে যাচ্ছে চাক মজুমদার বিরোধী। সংশোধনবাদী এবং পুলিশের চর। চন্দ্রদাকে সবটা জানান দরকার। মনে হয় নিজস্বের ভুল পদ্ধতি পেলে চাক মজুমদার নতুন পথের সন্ধান করছেন। শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে সংশোধন পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন শহরাস্থলের ছাত্র যুবকদের। আগে যে আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেননি, সেই ফসলকাটার আন্দোলনকেও সমর্থন জানাচ্ছেন। এমনকী কমিল আগে ঐশ্বর্যর কমরেডদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছেন। অর্থাৎ এখন গণসংগঠন আর গণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন তিনি।

সামসেই চন্দ্র দাড়া। চারপাশ ভাল করে দেখে নিলেন সুকান্তি। না, সন্দেহজনক কেউ নেই। সমস্ত দরজা ভেজানো। দরজা খুলতেই সামনে সিঁড়ির ধাপ। নির্দেশমত দোতলায় উঠে ডানদিকে খুবোতট কানে এল পরিচিত কণ্ঠ। অসুস্থ কমরেড। বিমলের গলা। মুঠো ওড়ানোর তুলনায় গমল। সুকান্তিও অভিগাদন জ্ঞানলেন। বিমল ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

স্বপ্নম ঘরের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, শ্যামল আর প্রদীপ বসে আছে। হালীল অনুভব করে কোমো কাঁপতে লাগল। সুকান্তিকে দেখে প্রদীপ হাসল। হাত মুঠো করে কীনের উচ্চস্বাস

সাল সেলাম কমরেড। শ্যামলও বলল, লাল সেলাম।

লাল সেলাম। সুকান্তি লাড়ান করলেন। কী গো দেশবাসী নাকি? হালীল মাথা লাড়ল। ওী, পুরনো ডিবি কিন্তু আজকে তাতে সেলাম..... কোন সংখ্যা, লেখা? সুকান্তি তাতে নিলেন লিখিকাটি। গঠ বর্গ, গঠ সংখ্যা। ১৫ মার্চ ১৯৭২। মূল্য ১৫ পয়সা। না, এই সংখ্যাটি সুকান্তিও দেখেননি। এ বছরের চতুর্থ সংখ্যা, যাতে 'পূর্ণিয়ার কৃষকদের ত্যাগাতীরা রেচাই পানে না' আছে, তারপর থেকে আর কোনো সংখ্যাই হাতে আসেন নি। এমন তাগেই কারণ পুলিশের নজর পাঁচাতে বিভিন্ন জায়গায় লেখা জড়ো করার কাজ, জাশান কাজ চলছে। কাগজ বিলি করতে হচ্ছে খুবই সাবধান হয়ে। বিতরণ করবার সময় একাধিক কমরেড ধরা পড়ে গেছেন। দেশব্রতীটি প্রদীপকে ফেরত দিলেন সুকান্তি। নাও লাড়ো।

হালীল ইচ্ছাকৃত করল। সুকান্তি বললেন, আরে পড়োই না.....তুমি পড়লে শুধু তোমার নয় আমাদের এই ভিলজন জ্বাভারও পড়া হয়ে যাবে..... বিমল বলল, ঠিক....সময় কম...একটু পরেই মিটিং আরম্ভ হয়ে যাবে.... তাড়াতাড়ি পড়....

দেশব্রতী হাতে নিল হালীল। দুপে দুপে পড়তে শুরু করল। 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানক সমর্থনো ভারতীয়া সংস্কারগবাদী দস্যুরা পূর্ব পাকিস্তান দখল করে

সেখানে 'এক পুতুল সরকার খাড়া করার পর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা ও তাদের পুতুল সরকার পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের উপর নির্মম লুণ্ঠন চালাচ্ছে ও জনগণকে হত্যা করছে। পাট হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল উৎপাদন। ভারতবর্ষের নড়বড়ে পাটশিল্পকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য ভারত সরকার অবাধে পাট লুণ্ঠন করছে। ভারতীয় সৈন্যরা সেখানে কারখানা অফিস ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করছে, এমন কি অফিসের টাইপরাইটার পর্যন্ত লুণ্ঠন করে আনা হয়েছে...' সুকান্তি মাথা নাড়লেন। এ কথা সত্যি হতেও পারে। কারণ সেনাবাহিনী তো বটেই এমনকী মধ্য কলকাতার বহু ডাকাবুকো ছেলেকে দেখা গেছে ডামাডোলের মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে এপারে নিয়ে আসতে। এখন তো ওপারে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে এপারের কিছু ব্যবসায়ী। এপারের বিড়ি-সিগারেট-দাঁতের মাজন-সাবান সব তিনচার গুণ বেশি দামে বিক্রি করে চলেছে তারা। এক-একটি যুদ্ধ এমন কিছু মানুষমারা দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীর সুযোগ করে দেয়।

কমরেডস্ লাল সেলাম। সুপর্ণ আর জয়শ্রী এসেছে। বাস্ এইবার কমরেড দীপক এলেই মিটিঙ শুরু করা যায়। প্রদীপ বলল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে.....তুই পড়। শ্যামল তাড়া লাগাল। আবার শুরু করল প্রদীপ। 'কমরেড দ্রোণাচার্য্য ঘোষকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ' সুকান্তি সচকিত। দ্রোণাচার্য্যের নিহত হবার খবর ঘটনার পরদিনই দু-একটি দৈনিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এখন সেই প্রসঙ্গ দেশব্রতীতে স্থান পেয়েছে।

'গত ৭ ফেব্রুয়ারী খুনী ইন্দিরার ঘাতকবাহিনী হুগলী জেলে আমাদের প্রিয় কমরেড দ্রোণাচার্য্য ঘোষকে কাপুরুষের ন্যায় হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড জেলায় তথা সারা পশ্চিমবাংলায় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং ফ্যাসিবাদী নির্যাতনকে উপেক্ষা করে তাঁরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ঘটনাটি শোনার পর হুগলী জেলার বিভিন্ন শহরে স্কুল কলেজের ছাত্রা ও কারখানার শ্রমিকেরা বেরিয়ে আসেন এবং স্কুল কলেজ ও কারখানা বন্ধ করে দেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী চুঁচুড়ায় কয়েকটি স্কুল কলেজে ও কারখানায় ধর্মঘট পালিত হয়। উত্তরপাড়ায় বিপ্লবী জনগণের দুটি বিক্ষোভ মিছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী স্লোগান দিয়ে ও সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবী করে শহর পরিক্রমা করে। নব-কংগ্রেসী গুন্ডারা মিছিলের উপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে কিন্তু জনগণের দৃপ্ত মেজাজে ভয় পেয়ে যায়।'

একটানা পড়ে একবার দম নিল প্রদীপ। গলা ঝেড়ে নিয়েই শুরু করল। 'এই ঘটনাকে ভিত্তি করে স্থানীয় পার্টি ইউনিট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর ইন্দিরার চরিত্র উদ্ঘাটিত করে লিফ্লেট বিলি করেন এবং সি পি আই (এম-এল)-এর নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে জনগণকে আহ্বান জানান।'

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। শ্যামল বলল, কমরেড দ্রোণাচার্য্যকে আমি চিনতাম.... অসাধারণ সাহস...ওর আত্মবলিদান হুগলী জেলার কমরেডদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল...

বিমল সমর্থন করল। আমিও চিন ওকে...ও প্রকৃত বীর...

জয়শ্রী বলল, দুর্ভাগা সেই দেশ, যে দেশে গালি বীরের দরকার হয়...

আরে। এতো ব্রেকটের গ্যালিলিও নাটকের সংলাপ। সুপর্ণ বলল। তোর হঠাৎ এই

কথা মাথায় এল কেনা?

মাথা এল এলে দিপাক...অত ভেবে দেখিনি...

এটিপন বেঁড়া সেলায়ের মধ্যে সুকান্তি ধীরলয়ে মাথা দোলাচ্ছিলেন। ওই মজার মেয়েটা...সেই পাঞ্চালী কেমন আছে? শেষ য়েবার দেখা হয়, ও দ্রোণের গল্প করেছিল অপ্রাক্কল। প্রযাণ্যুগ বিবাহ না হলেও পাঞ্চালী দ্রোণের বউ। এদের সবাই সে-কথা জানে। এরা দ্রোণের কথা বলছে...কিন্তু কেউ তো একবারও পাঞ্চালীর কথা বলল না। এমন কী জয়শ্রীও না। বেদনাওত মেয়েটির কথা ভেবে সুকান্তির বুক ভারী। কোনোরকমে বললেন, তোমরা ডিগির একটি কপি পাঞ্চালীকে পাঠিও। প্রদীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কমরেড দীপক ঘরে ঢুকল। সম্মেলক কষ্ট বলল, লাল সেলাম কমরেড...

দীপক বলল, মাঝেয় নোতা কমরেড চাকু মজুমদার লাল সেলাম....

দু ডিগির প্রতিদান করল। লাল সেলাম। লাল সেলাম।

সবটাকে দ্রুত দেখে নিল দীপক। ভালো আছেন কমরেড সুকান্তি? দীপক হাসল। সুকান্তি মাথা নোড়ে হ্যাঁ বললেন। কিছুদিন আগেও ও তাকে সুকান্তিদা বলে সম্বোধন করত। এখন রাজ্য সম্পাদক হবার পরে এই নিয়মমাফিক সম্ভাষণ। সভার কাজ শুরু হল। দীপক জামাল কোন জেলায় আন্দোলনের চেহারা কেমন। আন্দোলন বলতে কমরেডদের হত্যার বদলা। ও বাড়িয়ে বলছে সন্দেহ নেই, তবু দেখা দ্রোণ খতমের সংখ্যা কমেছে। একের পর এক আশ্রয়স্থল পুলিশের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে যাচ্ছে।

কেনা সুকান্তি জিজ্ঞেস করলেন।

আমাদের মধ্যে পুলিশের চর ঢুকছে। দীপক কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের চিহ্নিত করতে হবে... তারপরে খতম...

দীপক আরও কিছু বলল, সুকান্তির মাথায় ঢুকল না সেসব।

তুমি কী করে একশোভাগ নিশ্চিত হ'লে কোন কমরেড পুলিশের চর?

আমাদের সে সব গোপন পদ্ধতি আছে। দীপক ঠান্ডা গলায় বলল। সুকান্তি একবার মাথা নোড়ে চুপ করে গেলেন। যেন মাফিয়া সংগঠনের নেতার গলায় কথা বলছে দীপক।

কমরেডস্ আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে একটি কথা, তা হ'ল কর্তৃত্ব... বিপ্লবের কালে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের কথা যেমন আমরা মানব, তেমন মানতে হবে জাতীয় কর্তৃত্বের নির্দেশ।

দীপক প্রতিটি শ্রোতার দিকে একবার তাকাল। আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব হলেন চেয়ারম্যান মাথা। আর আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্তৃত্ব শ্রদ্ধেয় নেতা চাকু মজুমদার....ওঁর প্রতিটি কথা আমাদের প্রগাঠীভাবে মানতে হবে....

নিম্নলিখিত দীপককে। এ প্রসঙ্গে তর্ক দু-বছর আগেও হয়েছে, তখন মীমাংসা হয়নি। এখন আবার কেনা?

এখন আবার আলোচনা করতে হবে আমাদের। যেন নির্দেশ দিল দীপক। কারণ, এই নিয়ে লড়াই হচ্ছে...

এর সেলসাক্ষাৎ সুকান্তির জানা। সুমতিবাবু দেশব্রতী এবং লিবারেশনে বিপ্লবী কর্তৃত্ব বা রিকলেক্টারি অর্থাৎ এই এমন কথা ব্যবহার করেন না কেন প্রশ্ন তুলেছিল দীপক এবং

তার সঙ্গী দিলীপ। বিপ্লবী নেতৃত্ব না লিখে কর্তৃত্ব লিখব কেন বুঝিয়ে দাও, বললেন সুনীতি। প্রশ্ন করা চলবে না, মানতে হবে। বলেছিল ওরা।

মাও সে-তুঙ বলেছেন কমিউনিস্টরা সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেবার মতো ক্রীতদাস নয় তারা পরিস্থিতি বুঝতে কী এবং কেন জিজ্ঞাসা করবেই। শ্যামল বলল।

সুকান্তির মুখে হাসি। ঠিক এমনই উত্তর দিয়েছিলেন সুনীতিবাবু। বিমল-শ্যামল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দীপক থামিয়ে দিল ওদের। এ সমস্তটাই সংশোধনবাদী, পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারা। লেনিন বলশেভিক পার্টি নির্মাণ করেছিলেন, মাও সে-তুঙ চিনের পার্টি গড়ে তুলেছিলেন....ভারতের ইতিহাস শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদারের ওপর এদেশে পার্টি গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দিয়েছে...। সবাইকে একবার দেখে নিল দীপক। একটু শ্বাসবায়ু গ্রহণ করল। এজন্যই ভারতের বর্তমান অবস্থায় শ্রদ্ধেয় নেতাই সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিওঁর লাইনকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হল প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী লাইনকে ধ্বংস করা। উরুতে চাপড় মারল দীপক। উত্তরবঙ্গ-বিহার আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে আলোচনায় এই কথা বলে গেছেন অমর শহীদ সরোজ দত্ত। দুয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর আবার শুরু করল দীপক। সেই আলোচনায় কমরেড সরোজ দত্ত এমন কথাও বলেছিলেন যে আমাদের ধারণা যদি আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সঙ্গে না মেলে তাহলে নিজেদের ধ্যানধারণা অনুযায়ীই চলতে হবে। চেয়ারম্যান মাও আন্তর্জাতিক নেতা কিন্তু চিনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব নয়। মাও আর চিনের পার্টি এক নয়।

এমন মন্তব্য সত্যিই সরোজবাবু করেছিলেন। কী না সন্দেহ! কিন্তু আজ তা জানার উপায় নেই। দীপকরা তো এইসব কথাতে সরোজ দত্তের বক্তব্য বলে চালাচ্ছে। মৃদু হাসলেন সুকান্তি — হ্যাঁ এইসব কথা তো দেশবাসীতে আগে বেরিয়েছে....যতদূর মনে পড়ছে সে লেখার শিরোনাম ছিল বিপ্লবী নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়।

আবার উরুতে চাপড় মারল দীপক। ঠিক, ঠিক বলেছেন....আমরা আবার ওই লেখা ছাপব তবে নাম দেব বিপ্লবী কর্তৃত্ব ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়.... নেতৃত্ব নয় কর্তৃত্ব....

সুকান্তি চুপ করে গেলেন। এরা পার্টিটাকে শেষ করে দেবে।

সুকান্তির দিকে তাকাল দীপক। কমরেড, আমাদের ইচ্ছা আপনি এখন থেকে দেশব্রতী আর লিবারেশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিন....

কেন? সুনীতিবাবু?

উনি থাকবেন....তবে সম্পাদক হিসাবে নয়....

সুকান্তি কোনো উত্তর দেবার আগেই দীপক বলল, এটা ওঁরই ইচ্ছা....উনি আর সম্পাদক থাকতে চাইছেন না....অবশ্য পদত্যাগ করেননি এখনও....

এর ভেতরের খবরটিও সুকান্তি জানেন। ওরা সুনীতিবাবুকে জানিয়েছিল পার্টির মধ্যে পুলিশের চর ঢুকেছে। পুলিশ নাকি পরিকল্পনা করেছে আগে সুনীতি ঘোষকে ধরে তারপর চারুবাবুকে গ্রেপ্তার করবার। নিহিতার্থ হ'ল, যেহেতু সুনীতিবাবুই চারুবাবুর আশ্রয় ব্যবস্থা করেন, ওঁকে ধরলে চাপচুপ দিয়ে সি এম-এর সন্ধান পেয়ে যাবে পুলিশ। এই কথায় আহত-অপমানিত সুনীতিবাবু জানিয়েছেন পুলিশের এই চাল ব্যর্থ করা যায় যদি দীপক-দিলীপ চারু মজুমদারের দায়িত্ব নেয়। সেক্ষেত্রে পুলিশ তাঁকে ধরে দমন-পীড়ন করলেও সি এম-এর খোঁজ

লাগে না। মিল লগোনা কৃষ্ণ তল দীপক দিলীপ এই দায়িত্ব নিয়েছে। এই ঘটনার পিঠে এল দীপকের লজ্জা। সুনীতিবাণু এখনও পদত্যাগ করেননি, সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র। ওঁকে থেকে গানার অনুরোধ না জানিয়ে পরিবর্তন হিসাবে তাঁর নাম ওঠায় সংকোচ হচ্ছিল সুকান্তির।

না মানে,সুনীতিবাণুর কাছে তো কাজ শিখেছি সেজন্য....

কমরেড সুকান্তি এইসব পেটিবুর্জোয়া আবেগের দাস হবেন না। মনে রাখবেন দেশ স্বাধীনতা চায়, জাতিসমূহ মুক্তি চায় এবং জনগণ চান বিপ্লব করতেএটা ইতিহাসের অভিজ্ঞরোমা সাধারণ গান...আমরা সেই বিপ্লবের কালে আছিএখন পেটিবুর্জোয়া আবেগে আত্মজ্ঞান হবার সময় নয়....

গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল দীপক। সুকান্তি ওকে থামালেন। ঠিক আছে ঠিক আছে...আগে সুনীতিবাণু স্পষ্ট করে বলুন থাকবেন না...তারপর...। দীপকের মুখে হাসি। আনুগত্য পোলে মুখে এমনই আত্মপ্রসাদের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

লিবারেশন দেশব্রতী নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল।

সুপর্ণ বলল, ভীষণ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে লিবারেশন-দেশব্রতী দুটোই....

দীপক একমত। হ্যাঁ ঠিকই, তবে নিত্য নতুন ছাপাখানা পাওয়া মুশকিল....। প্রদীপ জানাল, সে চেষ্টা করে দেখবে...।

সুপর্ণ বলল, কী করে খবরে বৈচিত্র্য আনা যায়? ডাবতে হবে আমাদের....

দীপক পরামর্শ দিল, শ্রদ্ধেয় নেতার রচনার কিছু কিছু অংশ বারংবার আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত....

খবরের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সুকান্তির কথায় সবাই ফিরে তাকাল। লিবারেশন আর দেশব্রতীতে ছাপার জন্য আন্দোলন-অ্যাকশনের যেসব খবর আসে, তা কিছু অতিপ্রসিদ্ধ....

তার মানে? দীপকের চোখে বিস্ময়।

পলিটিক্সটির দুটো দিক আছে....ইতিবাচকের সঙ্গে নেতিবাচক দিকটাও বলা দরকার....

দীপক মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যা খবর আসছে তাকে সন্দেহ করা ঠিক নয়। এমন করলে খবর প্রেরক কমরেডেরা আঘাত পাবেন।

কিন্তু এমন চপতে থাকলে দলের ক্ষতি। সুকান্তি ব্যাখ্যা করলেন। ওই এলাকার কোনো কমরেড যখন দেখবেন তাদের সম্পর্কে যা লেখা হচ্ছে তা অনেক বাড়িয়ে বলা, তার বিশ্বাস ভেঙে যাবে....তিনিও আঘাত পাবেন। তিনি প্রশ্ন তুলতেই পারেন, এতই যদি সব ভালো চলছে তাহলে বাড়ি না কেন আমরা? সব জায়গায় তো আমাদের সংগঠন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে....। কথার মাঝখান থেকে ঢুকে পড়ল দীপক। ভেঙে পড়ছে তার কারণ আমরা শ্রদ্ধেয় নেতার বিপ্লবী কর্তৃত্বকে স্বীকার করিনি, প্রশ্ন তুলেছি...সত্যনারায়ণ সিং, সুনীতিবাণু, অসীম চ্যাটার্জী এরা সবাই দলের ক্ষতি করেছে....

দীপক বলতেই চলল। আপনার এই বিশ্লেষণ ঠিক নয়। কমরেডদের মধ্যে বিপ্লবী আবেগ জাগিয়ে রাখতেই হবে....। দীপকের গলায় উত্তেজনা। তার জন্য বাড়িয়ে বলতে হলে হবে। লগোনা দত্তও এমন করতেন।....

এটা কিন্তু একেবারে ঠিক কথা। সুপর্ণ, জয়ন্তী, প্রদীপ, দীপককে সমর্থন করল। পুলিশ

কিংবা জোতদার খতমের কথা পড়লে, কিংবা জেল ভেঙে কমরেডরা বেরিয়ে যাবার খবর শুনলে কেমন উদ্দীপনা জাগে বলুন? সুকান্তির দিকে তাকিয়ে রইল সুপর্ণ। অন্য সবাই সায় দিল সুপর্ণকে। শুধু বিমল, শ্যামল কোনো মন্তব্য করল না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন সুকান্তি। তারপর বললেন, ঠিক আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ যা চাইছে তাই হবে....তেমনই হবে।

দীপকের চোঁটে হাসির রেখা। বিজয়ীর হাসি। ঠিক আছে তাহলে.....আজকে এই পর্যন্ত। দেশব্রতী লিবারেশনের ভাবী সম্পাদককে অভিনন্দন। দীপক লাল সেলাম জানায়। সুকান্তিও প্রত্যাভিষাদনে মুঠোহাত ওপরে তুললেন।

সুকান্তির সঙ্গে অন্যরাও বেরোবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। চোখের ইস্তিতে ওদের বসতে বলল দীপক। বিমল, শ্যামলের সঙ্গে একটি জরুরি আলোচনা সেরে ফেলতে হবে। সুকান্তিও ফিরে তাকালেন। না না আপনি বেরিয়ে পড়ুন.....সাবধানে যাবেন। দীপকের গলা অতীব পরিশীলিত। ওর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল আগামী এই কথোপকথনে সুকান্তির উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত নয়। দীপক রাজ্য কমিটির সম্পাদক হতে পারে কিন্তু তিনিও ওই কমিটির পুরনো সদস্য। তুলনায় নবীন এইসব কমরেডদের সঙ্গে কী এমন কথাবার্তা বলবে দীপক যা শোনায় অধিকার নেই তাঁর। ভেতরটা তেতো লাগল।

রাস্তায় নেমে অভ্যাসবশত দু-পাশ দেখে নিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলেন সুকান্তি। অপমানবোধের সঙ্গে নিজের ওপরেও রাগ হচ্ছিল। কেন অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উচিত কথাটা বলা গেল না? কেন বলা গেল না, দেশব্রতীর খবরে আমাদের আন্দোলনের ত্রুটিগুলিকেও দেখানো দরকার। চিনের নেতাদের সমালোচনা মেনে সি এম যে নতুনভাবে ভাবনা-চিন্তা করছেন তার ইস্তিতও রাখা দরকার। তবেই দলের অবস্থানটিকে সঠিক বোঝা যাবে। ক্রমশ নতুন পথে হাঁটাও অনায়াস হবে। কেন বলা গেল না এইসব কথা? তাঁর কী সাহস কম? নাকি তার ভেতরে ভেতরে সম্পাদক পদে বসবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে? সেজন্যই এই সমঝোতা?

ভারতী সিনেমার কাছে এসে সন্ধিৎ ফিরল সুকান্তির। তিনি বিপরীত রাস্তায় চলে এসেছেন। একটু এগোলেই ভবানীপুর থানা। আর হাঁটা নয় এবার খবর নিয়ে হাটতে হবে। পত্রিকা সম্পাদনার কাজটা করবেন কিনা ভাবা দরকার।

হিদারাম ব্যানার্জি লেনে ঢুকতেই দেখা গেল রাস্তা এবং আশপাশের বাড়ি সব অন্ধকার। নিশ্চয় লোডশেডিং। বাম দিকের জানালায় পর্দার ফাঁকে হ্যারিকেনের আলো। রাস্তায় লোকজন কম। অন্ধকার হলে গোপনীয় আগুও কমে যায়। চৈতন্য সেন পেনও অন্ধকারে। এই নাতিদীর্ঘ গলিপথের মাঝামাঝি জায়গায় পাথরাড়ি পথের মতো দুয়েকটি বাঁক আছে। মেসবাড়ির কাছাকাছি আসতেই একটি চিংকার.....ভাগছে...ভাগছে...।

এরপরেই গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। সামনে নয়, পিছনে, সম্ভবত হিদারাম ব্যানার্জি লেনের দিক থেকে আসছে। খাড় পুরিয়ে গোলাবার চেপ্টা করতেই পাশ দিয়ে একটি ছেলে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেল। ছেলেটিকে মেসবাড়িতে ঢুকতে দেখলেন সুকান্তি। এক মিনিটের মধ্যে সম্মেলক চিংকার কাছে এসে গেল। দুটি পূর্ণিশ। হাতে উদ্যত রিভলবার। হাঁপাচ্ছে। একটা ছেলেকে দেখেছেন? কোথায় ভাগল?....

একটা এটপময় মাগোয়ায় চলেও পুলিশ কোনো যুবককে তাড়া করেছে —এর অর্থ হল, জেলটি নিখোঁজ ফেরারী নকশাল, না-হলে কোনো দুরন্ত সি পি এম। সে যে-ই হোক একে বাচাতেই হবে।

সুকাণ্ডি বললেন, হ্যাঁ এই তো দৌড়ে গেল...। পুলিশ দুটি লাফিয়ে উঠল, কোন্ দিকে? কোন্ দিকে? কোনো বাড়িতে ঢুকেছে নাকি?....

না, না....ওই তো ডানদিকে... ওয়েলিংটন স্ট্রিটের ট্রাম লাইনের দিকে....। কথা সম্পূর্ণ ওয়ার আগেই ওরা ছুটেতে শুরু করল। পালিয়ে যাবে কোথায় শালা...। পুলিশ চলে যেতেই সুকাণ্ডি মেসবাড়িতে ঢুকলেন। ছেলেটি সিঁড়ির তলায় ইলেকট্রিক মিটার বক্সের পাশে একেবারে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে। সুকাণ্ডি ওর কাছে গেলেন। ভয় পেয়ে না, আমি তোমার বন্ধু...শীগির আমার সঙ্গে ওপরে এস। ছেলেটি চুপচাপ অনুসরণ করল। দু'বার টোকা দিতেই অতুল দরজা খুলে দিল। ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন সুকাণ্ডি।

খটখট পদসঙ্গী দ্রুত বুঝে গেল অতুল। বাহ....দারুণ বাঁচিয়েছেন ওকে।

আপাতত সামলেছি... কিন্তু সাবধান আজ এ পাড়ায় নিশ্চয় তল্লাশী চালাবে পুলিশ। হঠাৎ ছেলেটির দিকে ফিরলেন সুকাণ্ডি। কিন্তু কী নাম তোমার?কী কর?

ছেলেটি ইতস্তত করছিল। সুকাণ্ডি মৃদু হাসলেন। অতুল যে পুলিশ নই তা তো বুঝতে পারবে....তুমি সহজ না হলে আমরাই বা কী করে মন খুলব?....

অতুল বলল, তুমি চোর ডাকাত না রাজনীতির স্টাও তো বোঝা দরকার। ছেলেটি মাথা নাড়ল। না না, আমি সমাজবিরোধী নই... রাজনৈতিক কর্মী....। নাম? সামন্তল আলম।

গাড়ি কোথায়? সুকাণ্ডির দিকে ফিরল ছেলে। ডাঙড়ের ফুলবাড়ি গ্রাম, চন্দ্রিশ পরগণা। জেলার কোনো রিপোর্টে কী এই নামটা পেয়েছেন? নামটা যেন চেনা চেনা লাগে।

ফুলবাড়ি....সামন্তল। নিজের মনে দু-একবার উচ্চারণ করলেন সুকাণ্ডি। হঠাৎ মনে পড়ল। তোমার টেক নাম কি শোভান আলি?

ছেলেটি স্থির। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তার মানে তুমিই সেই চব্বিশ জন নকশাল-বন্দি, যারা একবছর আগে দমদম সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালিয়েছিল, তাদের একজন?

এবারও উপরে নিচে মাথা নাড়ল ছেলেটি।

অতুল বলল, উরিবাস একে তো পুলিশ ধরলেই গুলি করে দেবে.....

মাথা নাড়লেন সুকাণ্ডি। হ্যাঁ ঠিকই। এর এখনই অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। শহরের মে এলাকায় ওর চেনাজানা আশ্রয় আছে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসা যাবে।

কলকাতায় কোমো শেলটার চেনা আছে তো?

ছেলেটি জানাল, না....। সুকাণ্ডি অবাক। সে কী? তাহলে কী করবে?....

সামন্তল নিশ্চল। ওর চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

জানা গেল ছেলেটি গোসায়া এলাকা থেকে এসেছিল হিদারাম ব্যানার্জি লেনে এক কমরেডের সঙ্গে কথা বলতে। আজ ওর ওখানেই থাকার কথা। কিছু করে খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। একে ধরবে ফেলোড়ল। কিন্তু কনস্টেবলের হাত ছাড়িয়ে দৌড় মেরেছে সামন্তল।

পুলিশ গুলি চালিয়েছিল ওর গায়ে লাগেনি।

সব শুনে সুকান্তি বললেন, তাহলে তো তোমার খোঁজে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আজ হানা দেবে পুলিশ.....তাড়াতাড়ি বাইরে কোথাও যাওয়া যায় কিনা দেখি....

বেরোবার আগে ছেলেটির চেহারায় কিছু পরিবর্তন দরকার। অতুল একটি টুপি দিল। সেটি পরাতেই সামান্য পালটে গেল মুখের চেহারা। চটির বদলে ওকে পরানো হ'ল অতুলের কেডুস্। দৌড়তে কাজে লাগবে। আর বেশি কিছু করার সময় নেই। সামগুলকে নিয়ে ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন সুকান্তি।

যেদিক দিয়ে পুলিশ এসেছিল সেই হিদারাম ব্যানার্জী লেনের দিকেই যাওয়া ভাল। কারণ পুলিশ নিশ্চয় ট্রাম লাইনের ওপারে শ্রীনাথ দাস লেনের দিকে চলে গেছে। সুকান্তির অনুমান সঠিক। ওই রাস্তায় সহজেই বউবাজার মোড় পৌঁছে যাওয়া গেল। একটি খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। হাত দেখাতেই থামল। হাওড়া স্টেশন? ট্যাক্সিচালক গাড়িতে উঠতে ইঙ্গিত করল। সামগুলের কাঁধে হাত রাখলেন সুকান্তি, ওঠো....উঠে পড়ো....।

হাওড়া স্টেশন যাবার সিদ্ধান্তটা চট করে ঠোটের ডগায় এসে গেল কারণ ওইখান থেকে ট্রেন বিভিন্ন প্রান্তে যায়। কিন্তু কোন দিকে যাওয়া হবে, কোথায় শেল্টার পাওয়া যাবে দ্রুত ভেবে নেওয়া দরকার। উত্তরপাড়া....শ্রীরামপুর....চন্দননগর....নাকি ব্যান্ডেল? পার্টির ঠিক করা শেল্টারে হঠাৎ এই অপরিচিত ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যারা ওখানে আছেন তাদের বিপদ হতে পারে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল নিরঞ্জন মিস্ত্রির কথা। নিরঞ্জন রিষড়ায় থাকে। ওখানকার এক ইম্পাত কারখানায় কাজ করে। পার্টির সমর্থক। নীরবে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছে। নিরঞ্জন দশকপি করে দেশব্রতী কেনে ওরা। ওর বাড়িতে সুকান্তি দুয়েকবার থেকেছেন। জি.টি রোডের কাছে ছোট একতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটি সরু টাটাল, তার পাশেই দুটি ঘর। একটি ঘরে থাকে নিরঞ্জন, তার বউ মালতী আর দুই বাচ্চা। পাশের ঘরে এক বিহারী পরিবার। দুই পরিবারকেই রান্না করতে হয় বাড়ির পিছন দিকের একটি ঘরে। কোনো আলাদা রান্নাঘর নেই। দুই পরিবারের কলঘরও একটি।

নিরঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে জানা গেল, সে নেই। তার নাইট ডিউটি। মালতী ৭৭৭, দাদা অনেকদিন পর এলেন....ও বোধহয় আপনার আসবার কথা জানে না....তাঁহলে ডিউটি পালটে নিয়ে ঘরে থাকত....

সুকান্তি বললেন, না না নিরঞ্জন জানে না.....হঠাৎই কাজে এসেছিলাম..... ডাবলাম দেখা করে যাই....

নিরঞ্জন নেই এজন্যই সংকোচবশত থাকার কথা বলা গেল না। সামগুলের মুখ শুকিয়ে ছোট। সম্ভবত আবার ধরা পড়ে যাবার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে।

রাস্তায় নেমে সুকান্তি বললেন, অত ভেঙে পড়ো না....এ অঞ্চলে আরও একটি চেনা জায়গা আছে....

বস্তুত নিরঞ্জনের বাড়ি আসবার পথেই মনে এসেছিল অধ্যাপক অপূর্ব গোস্বামীর কথা। অপূর্ব চন্দননগর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। রিষড়াতেই থাকে। সে বছর দেশব্রতীর অনেক লেখা লিবারেশনের জন্য অনুবাদ করে দিয়েছে। সেই অনুবাদ সুকান্তি পৌঁছে

দিয়েছেন সুনীতিবানকে। ওর কাছে সামন্তলকে রাখা যায় কয়েকটি দিন। পরে ওকে গোসাবা পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

অধ্যাপক অনূর্ব সুকান্তিকে পেয়ে খুবই খুশি। রাজনীতির আলোচনা শুরু করলেন। রাত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ মুখে হাসি টেনে রেখে, কথা চালিয়ে অবশেষে সামন্তলকে রাখার কথা পাড়লেন সুকান্তি। অধ্যাপক অপ্রস্তুত।

ঠিক আছে, অন্তত আজকের রাতটা যদি রাখা যায়....

না... মানে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না....অস্বস্তি হচ্ছে....

সুকান্তি উঠে পড়লেন। নী করা যায়? রাত দশটা বাজতে দু-মিনিট....

তবে কি কলকাতায় ফিরে যাওয়া হবে? কিন্তু এত রাতে শহরে ঢুকলেই ধরা পড়ে বাবার সমুদ্র সন্ধাননা। এইবার বিগত বোধ করলেন সুকান্তি। জেদও চেপে গেল। কিছু ব্যবস্থা করা গানে না? ছেলেটিকে অনায়াসে পুলিশ হাতে পেয়ে যাবে? এবং তারপরেই একটি তাজা হাণ শেষ। তিনি থাকতে এমনটা ঘটতে দেবেন কী করে?

সামন্তল আশে আশে বলল, আজকের রাতটা স্টেশনে কাটালে কেমন হয়?

লাগল নাকি? দমক লাগালেন সুকান্তি। ওখানে তোমার আমার মতো দুটো চেহারা দেখলেই পুলিশের সন্দেহ হবে....

ইটতে ইটতে কিছুটা ভেবে নিলেন সুকান্তি। মুণ্ডারায়ের বাড়ি যাওয়া যায়। মুণ্ডাল বাবু কাজ করে। দুয়েকজনকে শেল্টার দিয়েছে। সন্ধ্যায় আবার উল্টোদিকে জি টি রোড গিয়ে বাস ধরতে হবে। বাস না পেলে প্লাক।

— চলো যাওয়া থাক....

কোথায়?

ভয়েশ্বর....

সামন্তল নিঃশব্দে মাথা লাড়ল। সুকান্তি বললেন, খানড়ো গেল না। মাড সে তুড়ের কথা মনে কর....একবার ভারলে গারগার লাড়তে হবে....গারগার....গতদিন না জিতছি আমরা....

সামন্তল হাসল। না না ঠিক আছে চলুন।

জি টি রোডের একটি দাবার দিকে নজর গেল সুকান্তির। তিনজন ট্রাক ড্রাইভার খাটিয়াতে বসে তড়কা রুটি খাচ্ছে। গরম রুটি দেখে খিদে পেয়ে গেল। ছেলেটাও অস্বস্তিকর না খেয়ে আছে।

সামন্তল সংকোচ বোধ করছিল। আবার খরচা তো?....

তা ঠিক...কিন্তু কিছু খেতে তো হবে....মধ্যবিস্ত পেট যে। সুকান্তি হাসলেন। এইবার সামন্তলের মুখে চড়কা হাসি। ঠিক বলেছেন। পেটে দু-বার চাপড় মারল সামন্তল। এইটাকে কিছুতেই সর্গভাণাদেয় মতো বানানো গেল না।

একটা তড়কা নেওয়া হল। এবং চারটি রুটি। দুজনের খাবার। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত।

খেতে খেতেই সুকান্তির আবার মনে এল নিরঞ্জনর কথা। লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে মালতীকে সব বললে হয় না? কিন্তু সমাজ তো অনারকম। ওর

আশপাশের কেউ যদি দেখতে পেয়ে কুণ্ঠিতকর কথা বলে এর গেছে কাজে আর সেই সুযোগে রাতের বেলা মেয়েটি দুটি পুরুষকে ঘরে ঢোকাচ্ছে। এ ঘটনার কদর্থ করতেই পারে তারা। মেয়েটিকে তো সেই অন্যায্য অপবাদ সহ্য করতে হবে। এইসব উটকো ঝামেলার কথা ভেবে মালতী 'না' বলে দিতে পারে। ওর রাজি না-হবার সজ্ঞাবনাই বেশি। তাহলে ওকে শুধু শুধু বলা কেন? আবার ভদ্রেশ্বর গিয়ে যদি আশ্রয় না পাওয়া যায়। আকাশে মেঘও জমেছে। বজ্রগর্ভ মেঘ। যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। সেক্ষেত্রে অসুবিধা বাড়বে। নিরঞ্জনের বাড়ি যাওয়া না-যাওয়ার দ্বন্দ্বে দুলতে থাকলেন সুকান্তি।

সামন্তল ডাকল, বাস আসছে, চলুন....। খাটিয়া ছেড়ে উঠলেন সুকান্তি। চল, আর একবার নিরঞ্জনের বাড়ি যাওয়া যাক...এখান থেকে কাছেই....। সামন্তল অবাক চোখে তাকাল। সুকান্তি বললেন, চল চল....।

নিরঞ্জনের পাড়া অন্ধকার। রাস্তিরে প্রায়শই এই শ্রমিক পাড়ায় বিদ্যুৎ থাকে না। শিকল নাড়ার শব্দে মালতী দরজা খুলে দিল। ওর বাম হাতে লণ্ঠন। কি খবর দাদা? কাজ হয়ে গেল?....

উপরে নীচে মাথা নাড়ালেন সুকান্তি। কষ্ট দিয়ে কোনো স্বপ্ন বের হ'ল না। দাদা আপনার মুখ শুকনো....কোনও বিপদ হয়নি তো? মালতী একবার সামন্তলের দিকে তাকাল, তারপর বলল, ভিতরে আসুন....

সুকান্তি সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। এমনকী তার সূক্ষ্মকণ্ঠের কারণগুলিও বাদ দিলেন না। মালতীর মুখের চেহারা পালটে গেল। যতদিন অন্য ব্যবস্থা হয় সামন্তলতাই এইখানেই থাকবে।আর দাদা এত রাতে আমি আপনাকে কোথাও যেতে দেব না। শীর্ণ মেয়েটির কণ্ঠস্বরের দাড়া মুগ্ধ করল সুকান্তিকে। তিনি মাথা নেড়ে ওর প্রস্তাবে সম্মতি জানানলেন। — বুঝতে পারছি আপনারা দুজনেই খুব ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়া তো হয়েছে, এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন।

সামন্তল আর সুকান্তির শোবার ব্যবস্থা তত্ত্বাপোশে। মালতী তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে শোবে মাটিতে। সুকান্তির খরাপ লাগল। আরে আমরা দুজনে নীচে শুয়ে পড়ি....আগামে শোয়া যাবে....। শরীরভাষায় মালতী বুঝিয়ে দিল, সে কিছুতেই রাজি নয়। হ্যারিকেনের পলতে কমিয়ে ঘরের কোণে রাখতে রাখতে বলল, না না আমার মেঝেতে শুতে ভাল লাগে।

সামন্তল ঘুমিয়ে পড়ল শোওয়া মাত্রই। সুকান্তি জেগে এঠপেন। ঘরের মধ্যে বেশ গুমোট। কিন্তু এর মধ্যেই মালতী আর বাচ্চা দুটিও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

মাঝরাতে জোর এক পশলা বৃষ্টি। একটু ঠান্ডা ভাণ ঢুকল ঘরের মধ্যে। ঘুমের মধ্যেই বাচ্চা দুটি কঁকড়ে গেল। মালতী যেন টের পেলে ঠিক। ওদের জড়িয়ে ধরল।

সুকান্তি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ওদের ঘুম ভাঙল না। ঝোলা থেকে চাদর বের করে মালতী আর বাচ্চাদের ঢেকে দিলেন। ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইল। ঘরের কোনায় রাখা হ্যারিকেনটি হাতে নিলেন সুকান্তি। রাতের বেলায় বাথরুম যেতে হলে এইটি নিয়ে যেতে হয়। ওইখানে কোনো আলোও বাতাস নেই। কিন্তু আপাতত বাথরুম যাবার প্রয়োজন নেই। হ্যারিকেনের পলতে সামান্য উসকে দিয়ে ডায়েরি খুলে বসলেন সুকান্তি।

এই মেয়ের জন্য আত্ম জেল পালন এক নকশাল-বন্দি পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গেল। বেঁচে গেল রাজ্যকমিটির এক সদস্য। এখন যদি পুলিশ ওর বাড়িতে হানা দেয়, কেউ রেহাই পাবে না। সামন্তল প্রাণে বেঁচে গেলেও ওর দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড নিশ্চিত। সুকান্তিরও নিশ্চয় তাই। নিরঞ্জনকেও জেলে ঢুকতে হবে। মালতী এই দুই বালককে নিয়ে তখন অকূল দরিয়ায়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সুকান্তি ছোটখাট হলেও কোনো একটি কাজ পাবেন। সামন্তলও নিশ্চয় তাই। কিন্তু নিরঞ্জন পাবে না। কেউ চট করে মেরে না ওকে। তার পরিবার শেষ হয়ে যাবে। এই বিপদ মাথায় করেও মালতী আজ তাদের আশা দিল। এ বড় কম ত্যাগ নয়। কিন্তু এই নিরঞ্জন-মালতীদের কথা কেউ লিখবে না। গোপনীয়তা রক্ষার কারণে দেশব্রতী লিবারেশনেও স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না সামান্য মানুষের এমন অসামান্য ত্যাগের কাহিনী। কোথাও না-ছাপা হলেও নিজের ডায়েরিতে তো নিজের মনের কথা লেখা যায়! কলমের ডগায় লেখা এসে গেল।

আঁখিপল্লবে মুক্ত নীলিমা নিশ্চিত বরাভয়

সংকুল পথে বাঘিনীর পদসঞ্চারণ—

যৌনতা নয় জননীর কথা, মালতী নাম্নী রমণী।

গদ্যে লিখতে চাওয়া কথাগুলি কেমন করে যে কবিতার মাত্রা পেয়ে গেল! কে জানে!



সদর দরজার হুকো খোলার শব্দ পেতেই চারু উৎকর্ণ। রবি মেঝেতে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কে এল? আত্মগোপন করে থাকলে শ্রবণেন্দ্রিয় বোধহয় এমনই দশা পায়। যে কোনো আওয়াজ, তা সে কলঘরে জলের টিপটিপ্ হোক অথবা বারান্দার কার্গিসে দুই শালিকের কিচ্‌মিচ্‌, ভেতরে কৌতূহল জাগায়। তাকে যাচাই করতে ইচ্ছে করে। কে এল এই সকালবেলায়? গৃহকর্তা যেভাবে অভ্যর্থনা করলেন অতিথিকে, দোতলার ভেতরের বারান্দায় বসেও বোঝা গেল, চেনা মানুষ। কমরেড। এরপরেই, পা ঘষটে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আওয়াজ। সেই সঙ্গে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, উঃ। এ শব্দ চারুর পরিচিত। আত্মাইটিসে কষ্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক। উনি আজ আবার এলেন কেন? চারু ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। ২৩ এপ্রিল। ১৯৭২। তাহলে আজকেই ভদ্রলোক কলকাতায় ফিরে যাবেন।

চৌদুয়ার থেকে কিছুদিন পুরী। তারপর কটক স্টেশনের নিকটবর্তী এই বাড়িতে চলে আসা সবই ওই ভদ্রলোকের ব্যবস্থাপনায়। বস্তুত বিগত দু-বছর উনিই চারুর আশ্রয় ঠিক করেন। এ বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে যাবার ব্যবস্থাও। কিন্তু ইদানীং কী যে হয়েছে, ওর কাছে ঠিক সত্য কথা যাচ্ছে না। দীপক-দিলীপরা বলে উনি নাকি শ্রদ্ধেয় সি এম-কে জাপানে উঠতে চান। ঠিক বারোদিন আগে এসেছিলেন ভদ্রলোক। দুদিন ছিলেন এখানে। তখন চারুর শরীর ভাল নয়। রাত্রি দমের কষ্ট বাড়ে। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, চারুবাণ নকশালবাড়ি সংগ্রামের পর তো পাঁচবছর কেটে গেল। চারু তাকালেন। চোখে প্রশ্ন।

এই পাঁচবছর আমরা অনেক শিগেছি...ভুলও করেছি অনেক...এইসব নিয়ে একটা

সার-সংকলন যদি করেন তাহলে ভুলগুলো শোধরানো যায়....

চারু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ভুল? কী ভুল? কোন কোন কাজ ঠিক নয় বলে মনে হয় আপনার?.....

— আমাদের ওই শ্রেণীশত্রু খতমের পথটা বোধহয় ঠিক নয়....

বিস্তারে গেলেন ভদ্রলোক। বলা হয়েছিল শ্রেণীশত্রু খতম করলেই সব সমস্যার সমাধান। গ্রামাঞ্চল মুক্ত হবে। সারাভারতের বিভিন্ন কোনায় মুক্তাঞ্চলের নতুন নতুন লালবিন্দু ফুটে উঠবে। এর ফলে ঘটে যাবে দেশজোড়া গণঅভ্যুত্থান। আমাদের কমরেডরা এই পথে হাঁটলেন। কিছুদিন আমরা এলাকাটিতে নিজেদের প্রভাব খাটালাম। তারপর শত্রুর আক্রমণ নামল। পুলিশ, সি আর পি, মিলিটারিতে ছেয়ে গেল গ্রামাঞ্চল। নামল অকথ্য অত্যাচার। ওই সশস্ত্র বাহিনীকে মোকাবিলা করবার সঠিক কার্যক্রম নেই আমাদের। ওই পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে গেলে যে প্রকাশ্য গণসংগঠনের দরকার, তাও নেই। কারণ গণআন্দোলনকে আমরা গেরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতির পক্ষে বাধা মনে করেছি এতকাল। একটা সময়ের পর কৃষকরা পাটিকে বোঝা মনে করতে শুরু করল— তোমরা বাবু হিঁদিকে আর লড়াই কোর না, অন্যদিকে কর...। একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। একমাত্র শ্রেণীশত্রু খতমই শ্রেণীসংগ্রাম, এ পথ আসলে সত্বাসবাদী পথ....

ওকে মাঝপথে থামালেন চারু। এমন কথা তেমন থাকেন মানে অসীম চ্যাটার্জীরাও বলেছিল কিছুকাল আগে...নতুন কী বললেন? চারুর প্রশ্নায় স্নেহ। বলেই দ্রুত সংযত হলেন। আর তাছাড়া কেবলমাত্র শ্রেণীশত্রু খতমকে তেমন কিছুদিন আগে আমি নিন্দা করেছি। কোনো জোতদারের উপর ব্যক্তিগত রাগ আছে তবে মেরে দিলাম কিংবা মজুরি বাড়াতে বলেছি, ভয় দেখিয়েছি তবু বাড়ায়নি ...ওকে খতম করো....এ ঠিক নয়....

— হ্যাঁ ঠিকই, আপনি বলেছেন কেবলমাত্র শ্রেণীশত্রু খতম হ'ল জঙ্গি অর্থনীতিবাদ ...কিন্তু চারুবাবু, আগের লাইনের ফলে যে বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল তার কোনো বিশ্লেষণ না করে, দায়িত্ব না রেখে, আত্মসমালোচনা না করে তাকে এমনভাবে বদলানো যায় না....আপনি ভালোই বুঝবেন....ওই পথের সমালোচনা না করলে ভুল দর্শন থেকেই যাবে... আগামীতে এর পুনরাবৃত্তি হবেই...

চারুর চোখ চঞ্চল। ঠোট, চোয়াল শক্ত। ভদ্রলোক থামলেন না। আমরা আগে বলেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সমাজ, আর্থিক অবস্থা অসমানভাবে বিকশিত হয়েছে। এই বিচারে শত্রুর পক্ষে দুর্বল কোনো এলাকায় আমরা শক্তিশালী। আমরা শত্রুর দুর্বল জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে থাকতে পারতাম। এইভাবে আশে পাশে এলাকা বাড়ত। কিন্তু আমরা হঠাৎ বলে দিলাম দেশের প্রাতিটি গ্রামে শত্রু আত্মশাসনের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালান যায়। অতএব যত বেশি সংখ্যায় পার সশস্ত্র সংগ্রামের বিন্দু সৃষ্টি করএক জায়গায় কামড়ে পড়ে থাকার আর দরকার নেই, সব জায়গায় ছাড়িয়ে যাও...

ভদ্রলোক পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। এট কণতে গিয়ে প্রাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নামবে...নামল....আমরা জয়যাত্রা হয়ে গেলাম।

চারু মাথা নাড়লেন। আর কিছু?

— এই অবস্থাতে কর্দন আগেই আমরা আহান রেখোঁচ....জনযুদ্ধের মাধ্যমে জনগণের

রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

- হ্যাঁ, আমি লিখেছি সেকথা, বলেছি মিলিটারিকে ভয় না পেতে... ওরা সব সময় দু পাঁচশোজন একসঙ্গে থাকে না, দু-চার জনও ঘোরাফেরা করেতখন ছোটখাট স্কোয়াড করে তাদের খতম করা যায়, ওদের হাতিয়ার দখল করা যায়.....ভিয়েতনামের কৃষকরাও এমনভাবে লড়াই শুরু করেছিলেন....

চাক্ষুণ্যআমি পড়েছি সে লেখা....আপনি বলেছেন চলমান শত্রুকে আক্রমণের পরিকল্পনা করতে.... শত্রুকে ধ্বংস করতে ল্যান্ডমাইনের ব্যাপক ব্যবহার করা হবে এবং সুড়ঙ্গ যুদ্ধের প্রকৃতি নেব আমরা। চারু সায় দিলেন। হ্যাঁ বলেছি....এমনটা হলেই পুলিশ-মিলিটারির মনোবল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, ওদের কাণ্ডজে বাঘ চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন মানুষ।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে-শরীরে অসম্মতি। উনি মাথা নাড়লেন। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে আমাদের সংগঠনের তেমন জোর আর নেই। আর দ্বিতীয় কথা হল, এমনটা হলেই কৃষকরা অভ্যুত্থানে নেমে পড়বেন, মিলিটারি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, তেমন নিশ্চয়তাও নেই.... আমাদের অভিজ্ঞতা বরং এর বিপরীত....

থামুন থামুন। ভদ্রলোক খতমত খেয়ে গেলেন। গলা দিয়ে কেন যে এমন কর্কশ শব্দ বের হ'ল! নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভেতরে পবিত্র সমুদ্রের ঢেউ। জিভটা বিস্বাদ। আপনি যখন এতশত ভুলের খবর রাখেন, আপনি বরং গত পাঁচবছরের ওঠাপড়া নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখুন নাতারপর আলোচনা করা যাবে...

ভদ্রলোক চুপ করে গিয়েছিলেন। মুদুড়ীলায় বললেন, বেশ লিখব...।

আলোচনার শেষে দু'জনে নীরবে বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। মামুলি কথা হল কিছু। আলাপ জমাখপ না তেমন। ১৯৭৬ ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। উনি চলে যাবেন মহানদীর ওপারে চৌদুয়ার। ওইখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক বেরোবার মুখেই দীপক-দিলীপ এসে গেল। ওরা বীরভূমের লড়াইয়ের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির রিপোর্ট নিয়ে এসেছে। এইটি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট। কিছুদিন আগে বীরভূমের লড়াই তুঙ্গে উঠেছিল। একান্তরের মার্চ থেকে জুন ওই চারমাসে পশ্চিমবাংলায় যত রাইফেল ছিনতাই হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ করেছে বীরভূম। প্রতিদিন গড়ে ছয় থেকে দশটি রাইফেল ছিনিয়ে নিয়েছেন এই জেলার কমরেডরা। ওইখানে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের গণআদালত বিচার করেছে কুখ্যাত শ্রেণীশত্রুদের। বিচারের রায়ে কাউকে খতম করা হয়েছে, কাউকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুলতানপুরের অত্যাচারী জোতদার পঞ্চানন চ্যাটার্জী খতম হয়েছে। আবার ইটান্ডার জোতদার জিতেন হালদারকে প্রাণে মারা হয়নি। সব মিলিয়ে দু'শো শ্রেণীশত্রু খতম করেছিল ওরা। ওদের ভয়ে অত্যাচারীরা জমি জায়গা ছেড়ে পালায়ে গেছে। এই পড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। ভরপুর সমর্থন ছিল গণীক কৃষকের। সংগাম ভড়িয়ে গিয়েছিল বাংলা-বিহার সীমান্তের বিত্তীর্ণ এলাকায়। রামশূন্যটি, মধ্যরেল, আমেদপুর থেকে একেবারে সেই রাজনগর। আন্দোলন দমন করতে প্রথমে নামল পুলিশ। পুলিশ ব্যর্থ। তারপরে এল আধা সামরিক বাহিনী। তারও এঁটে উঠতে পারল না বীরভূমের গণগণা স্কোয়াডের সঙ্গে। সবশেষে নামান হ'ল পুরোদস্তুর

মিলিটারি। সেই আক্রমণের মুখেও কিছুদিন ঠিকঠাক ছিল সব। তারপর সংগ্রামে ভাটা এসেছে। কেন? সেই কারণ অনুসন্ধান করে বিবৃতি পাঠিয়েছেন এলাকার কমরেডরা। এই রিপোর্ট এখনই শোনা দরকার।

ভদ্রলোক থেকে যেতে চাইলেন পাঠ শোনবার জন্য। দীপকের শরীর ভাষায় অনিচ্ছা। দিলীপেরও তাই। চারু বললেন, আপনি যখন বেরোবার জন্য তৈরি হয়েই গেছেন চলে যান, পরে এর কপি এরা দিয়ে দেবে। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। ঠিক আছে। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

রিপোর্টটি পুরো শোনবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন চারু। ওরা বর্তমান পথের কঠোর সমালোচনা করেছে। যে সাতটি প্রশ্ন ওরা তুলেছে তাকে তর্ক করে, চোখা চোখা শব্দ ব্যবহার করে হয়তো দমিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সংগ্রামের এলাকা থেকে যখন এমন প্রশ্ন ওঠে, ভাবতে হয় কোথাও কী গন্ডগোল হচ্ছে? দীপক-দিলীপের অবশ্য এই সমালোচনার যুক্তি পছন্দ হয়নি। ওদের বক্তব্য এইসব জায়গায় মধ্যবিত্তরা দল চালিয়েছে, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে নেতৃত্বে আনেনি, সেজন্যই এই শীঘ্রপতনের সমস্যা। এসবই পেটিবুর্জোয়া হতাশা। ওরা বলেছিল।

চলে যাবার ছদিনের মাথায় আবার এসেছিলেন ভদ্রলোক। দেখামাত্র ভেতরে তরঙ্গ খেলে গেল। ওর বলা কিছু কথার সঙ্গে বীরভূম-ব্রিটিশার্টের খুব মিল। এমন তো নয় উনি গোপনে ওই কমিটির মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপাদা কোনো উপদল গড়বার চেষ্টা করছেন? চারু তাঁর দৃষ্টিতে তাকালেন।

— কী হল আপনি লেখাটা এনেছেন?

— না এখনও শেষ হয়নি....আমি কলকাতা ফিরে যাবার আগে দিয়ে যাব....

এরপরেও দুয়েকটি কথা হয়েছিল। কোনো কথা না থাকলে যা হয়, শরীর স্বাস্থ্যের কথা, আবহাওয়ার কথা....

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, চারুস্বামী আমি গত পাঁচবছর ধরে এই আন্দোলনে আছি...আপনি আমাকে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি মনে করেন?

চারু সহসা কোনো কথা খুঁজে পেলেন না।

— আমি অন্যান্যটা কী করেছি? আমি আপনার অনুরাগীদের মাঝে সে তুণ্ড উদ্ধৃত করে এইটা বোঝাতে চেয়েছি যৌথ নেতৃত্বের কথা.... আপনি কেন্দ্রীয় কর্মটির নেতা কিন্তু আপনি সর্বময় কর্তৃত্ব নন....আপনাকেও কেন্দ্রীয় কর্মটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। ভদ্রলোক থামলেন। একটু হাঁপাচ্ছিলেন।

চারু বুঝলেন অনুরাগী বলতে দীপক দিলীপের কথা বলেছেন ভদ্রলোক। এটা ঠিকই ওই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল দীপক দিলীপ। ওদের কথায় প্রভাবিত হয়ে চারু লিখেছিলেন — ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে। যাদের সাথে মতপার্থক্য হচ্ছে তাদের সাথে কাজ করা যেতে পারে কিন্তু আপোষ করা যেতে পারে না....যিনি অনেক বই পড়েছেন তার সাথে শুধু রেডবুক পড়েই আলোচনা করা যেতে পারে....বুর্জোয়ারা কেন এবং কীসের জন্য বলে শোরগোল তোলে। তাদের উদ্দেশ্য সর্বস্বার্থের কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া। বুর্জোয়া

প্রভাণ পাটিতে আছে এবং একটা সময় পর্যন্ত থাকবে.....।

চাক্ষুণ্য জেনে রাখবেন আপনাকে সরিয়ে দিয়ে ওই জায়গায় বসা আমার উদ্দেশ্য নয়....আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো পাটির ভুলকে দেখাতে চেয়েছি মাত্র।...

ভদ্রলোকের গলা রুদ্ধপ্রায়। কণ্ঠস্বরে কম্পন। জানবেন, আমি যা বলেছি....সংগ্রামের এলাকার কমরেডদের মনের কথা। আজকে কমরেডরা যখন জিজ্ঞাসা করেন সন্তরের পাটি কংগ্রেসের ঠিক পরেই একবার কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিঙ হয়েছে, তারপর দু-বছর ওতে চলল একটিও মিটিঙ হয়নি কেন? আমরা নিরাপত্তার দোহাই দিই। কিন্তু কমরেডরা বলেন চীনের পাটি নানান সংকট-সমস্যাসের মধ্যেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙ চালিয়েছে, আমরা পারি না কেন? কোনো সদুত্তর থাকে না আমাদের। তার ওপর আজকাল সরোজ দত্তের লিগাও বলে একটা কথা খুব চালান হচ্ছে....

চাক অথাক। সে আবার কী?

হ্যাঁ, বলা হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় আপনিই, অর্জুনের সি এম-ই হচ্ছেন সি পি আই (এম এল) এর কেন্দ্রীয় কমিটি....এ তো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুরাগীরা যেমন বলে থাকে চাঁদমা ইন্ডিয়া, তেমনই শোনায.....

চাক মাথা নিচু করলেন।

— এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে বলা হবে বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি.....

পা ঘষটানোর শব্দ কাছাকাছি আসতেই, চাক বললেন, আসুন আসুন সুনীতিবাবু..... আঙে আঙে বারান্দায় এলেন ভদ্রলোক। শান্ত, সৌম্য চেহারা। রবি একটা মোড়া এগিয়ে দিল, গুন। ভদ্রলোক স্মিতমুখে বললেন, ধন্যবাদ।

চাক বললেন, আপনার হাঁটুর ক্ষথা বেড়েছে মনে হয়।

— একটু বেড়েছে.....কিন্তু আপনি কেমন আছেন? শেষ যেদিন দেখলাম ভালো লাগেন....রঙচাপ বেড়েছিল নিশ্চয়?

— হ্যাঁ ঠিকইতার সঙ্গে দমের কষ্ট, হার্টের ব্যথা। চাক হাসলেন। শরশয্যায় শুয়েও লড়ে যেতে হবে আমাদের.....

একেবারে ঠিক বলেছেন। চাকের হাত ধরলেন সুনীতি। ঠিক বলেছেন। ভুল হবে, ব্যর্থ হবে, আবার লড়ব.....

চাক হাসলেন। এইএই তো আমাদের কথা। তারপর....আপনার লেখাটা এনেছেন?

— হ্যাঁ। খোলা থেকে লেখাটি বের করলেন সুনীতি। এইটা আপনাকে দিয়ে কলকাতা ফিরে যাব।

আজকেই?

হ্যাঁ আজই.....

ও আজ..... লেখাটা পড়ে শোনাবার সময় আছে?

হ্যাঁ নিশ্চয়। সুনীতি পড়তে শুরু করলেন।

যে কথাগুলি বিগত কয়েকদিনে বলেছেন সেই ধরনের কথাই লিখেছেন ভদ্রলোক। শুধু গোপনে গোঁরলা লড়াই নয়, গণসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অসীম। গণসংগ্রামের মধ্য

দিয়ে ছাড়া জনগণের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে উঠতে পারে না....

চারু হঠাৎ থামিয়ে দিলেন। আচ্ছা সুনীতিবাবু আপনিও তো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য....আপনি মনে করেন আমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে?

সুনীতি দু-বার মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ চারুবাবু ভুল হয়েছে....আমাদের বর্তমান পার্টি লাইন বাম হঠকারিতায় ভুগছে....

— আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?

সুনীতি স্থির চোখে তাকালেন। হ্যাঁ, চারুবাবু আমি তাই মনে করি। একই সঙ্গে এও মনে করি, আপনার অবদান আর ভূমিকাকে অস্বীকার করাটা অসংগত.... পার্লামেন্টারি পথ বর্জন করে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আপনি শুরু করেছেন, নিয়ে এসেছেন সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি....এই লড়াইয়ে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের ভূমিকার গুরুত্বকে আপনিই আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন...

সুনীতিবাবুকে আজ বলায় পেয়েছে।

চারুবাবু, আপনি তেভাগার আন্দোলনে ছিলেন....দরিদ্র কৃষকের ঘরে থেকেছেন, ওদেরকে আপনি জানেন চেনেন ...মানুষের জন্য আত্মত্যাগের দর্শন আপনি আমাদের অনুভব করিয়েছেন....ভদ্রলোকের গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা। আপনাকে সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি ভুললে চলবে না....এই প্রসঙ্গে আপনাকে অভিযাদন জানাতেই হবে....

সুনীতিবাবুর কণ্ঠের আবেগ স্পর্শ করল চারুবাবু। উনি এতদিনের সঙ্গী। উনি যখন বলছেন, ভাবতে হবে। নিজের ঠিক করা পথ ভুল প্রমাণিত হলে রাগ হয়। কিন্তু অহংকারে লাগলেও ভাবতে হবে।

— আর একটি কথা চারুবাবু। মাথা ঝষৎ নিচু করলেন সুনীতিবাবু।

— হ্যাঁ, বলুন কী কথা?

— আমাকে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন....

— সে কী?

— আমি শুধু লিবারেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই....তবে সম্পাদক হিসাবে নয়, সাধারণ কর্মী হিসাবে....

— আপনি সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে, আমি চালাব কেমন করে?

সুনীতিবাবু কিছুক্ষণ নীরব। তারপর চোখ তুললেন। চারুবাবু, আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে দীপক এবং দিনীপ...

চারু থামিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, আমি শুনলাম....কিন্তু কেন?

এই কথাটাও আমার জানান দরকার। সুনীতিবাবু ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন তাঁর ওপর আস্থা হারানোর কথা।

— নেতাদের কেউ যদি আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে, যদি মনে করে যে আমার তত্ত্বাবধানে থাকলে আপনার দণ্ড পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তখন আমি কেমন করে এ দায়িত্ব রাখি?

— কে আপনাকে এমন বলেছে?

সুনীতিবাবু দু-দিকে মাথা নাড়লেন। এটি ভ্রান্ত চারণা। উনি আর কিছু বলবেন

না।

দু'জনেই শুক এসে রইলেন কিছুক্ষণ। চারু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তবুআপনি আমার দায়িত্বটা রাখলে পারতেন...

সুনীতি বললেন, আমাদের মধ্যে যেখানে এত অবিশ্বাস, আমার পক্ষে তখন এই বিরাট দায়িত্ব কেমন করে রাখা সম্ভব?

চাক চুপ করে গেলেন। একটু অভিমানও হল।

এইবার যেতে হয়। গোলা শুছিয়ে সুনীতি উঠে পড়লেন। ট্রেন ছাড়বার হইশিল শোনা গেল। খেঁচ এক পরমাখীয়া বতদূর চলে যাচ্ছে। চারু চললেন সুনীতির সঙ্গে।

সুনীতিগণ্য, এটসব মতান্তর, সমস্যা মেটানোর জন্য শীগগির একটা সভা ডাকুন। মৃদু হাসলেন সুনীতি। চারুবাবু, আমি তা পারি না। আপনি দলের সাধারণ সম্পাদক, আপনি পারেন।

ঠিক আছে, আমি সভা ডাকব, আপনি আসবেন তো?

চাকগণ্যর হাত ধরলেন সুনীতি। আপনি ডাকলে আমি নিশ্চয় আসব।

সদর দপ্তার বাইরেই একটি রোয়াক। রোয়াকের মাঝখানে সিঁড়ির ধাপ রাস্তায় মিশেছে। রোয়াকের ওপর দাঁড়ালেন চারু। সুনীতি নেমে গেলেন রাস্তায়। চলি কমরেড। চারুর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল — সাবধানে যাবেন। সুনীতি ফিরে তাকিয়ে হাসলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন। রাস্তার বাঁকের মুখে একটু দাঁড়িয়ে আবার একবার ফিরে তাকালেন সুনীতি।

চাক তখনও বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে।



বাঙালি আগো। স্টুডেন্টস হেলথ হোম-কে বাম হাতে রেখে একটু এগোতেই আপার সাকুলার আর সি আই টি রোডের স্পর্শবিন্দুতে যে ভবন তার সাদা দেওয়ালের গায়ে কালো অক্ষরে ঝল-ঝল করছে এই দুটি শব্দ। সি আই টি রোড ধরে পূর্বদিকে কয়েক কদম বাড়ালেই পাশাপাশি আরও তিনটি স্লোগান — ‘বাঙালী গর্জে ওঠো। বাঙালী ব্যবসা ধরো। ৯০ শতাংশ বাঙালী চাকরি চাই।’ প্রতিটি স্লোগানের তলায় দলের নাম — ‘আমরা বাঙালী’। ইদানীং শতাব্দীর বিভিন্ন অঞ্চলে পথচলতে হঠাৎ নজরে আসে আমরা বাঙালীর দেওয়াল-লিখন।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই কলকাতায় বেশ একটা বাঙালি-বাঙালি ভাব জেগেছে। ক’দিন আগেও চায়ের আড্ডায় অনেককেই বলতে শোনা গেছে ও-পার বাংলা এ-পার বাংলা আবার জুড়ে গিয়ে গড়ে উঠবে সোনার বাংলা। কিছু মানুষ এখনও বিশ্বাস করে সেই কথা। এমন কথা দেখার কারণ অবশ্য আছে। নিজেদেরই রাজ্যে বাঙালি ক্রমশ অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। চাকরি শিল্প ব্যবসা সব কিছুতেই। শহরে বিপুলভাবে বেড়ে গেছে অন্যজাতি জনসংখ্যা। ১৯৬১ তে কলকাতার ছিল ৪২ শতাংশ অবাঙালি, ১৯৭১ এ তা ৪৫ শতাংশ। এরই পাশাপাশি রাজ্যে ২৮ লাখ যুবক বেকার। নিজের রাজ্যে বাঙালি কোনো সুযোগ পাচ্ছে না, অর্থিক খেলা রাজ্য থেকে কারা সব এখানে এসে দিবি করে-কপে খাচ্ছে এমন

ভাবনা ছড়াতে পারলে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে স্বন্দেহ বাতাবরণ যেমন তৈরি হয়, তেমন একটি গোষ্ঠীর কাছে তৎক্ষণাৎ তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো না কোনো ছুতোয় সংসদীয় রাজনীতিকদের দ্রুত লোকপ্রিয় হয়ে উঠতেই হয়। অতএব বাঙালি বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও! রাজ্যের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর দাবিতে সম্প্রতি কার্জনপার্ক থেকে পদযাত্রা করেছেন অমদ্যাক্ষর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, গোপাল হালদার, আশাপূর্ণা দেবীর মতো নামী লেখক। মজার ব্যাপার, ওইদিনই মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গের নামবদলের ব্যাপারে আলোচনা — বাংলাদেশ হয়ে যাবার পর এই রাজ্যের নামের আগে আর 'পশ্চিম' রাখা কেন? এর মাস দুয়েকের মধ্যেই রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ বলেছেন সরকার এমন আইন চালু করবার কথা ভাবছে যাতে সমস্ত সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রকল্পে একহাজার টাকা পর্যন্ত বেতনের চাকরিতে এই রাজ্যের সন্তানদের নিয়োগ বাধ্যতামূলক। এরই সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘন ঘন পশ্চিমবঙ্গ সফর। দেশের মধ্যে প্রথম পাতাল রেল চালু হবে কলকাতায়। সেই প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী যে তীব্র উচ্ছ্বাস জেগেছিল তরুণ যুবকদের মধ্যে, আবেগের সেই বিপুল তরঙ্গকে কচুরিপানা ভরা সোঁতা বানাবার কি অনবদ্য আয়োজন! কি করে সব মানুষের জন্য দু-বেলা দু-মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করা যায় সেই মূল প্রশ্ন সমাধানের উদ্যোগ নেই, শুধু ফাঁকা আওয়াজ — বাংলার উন্নয়ন হবে, বাঙালি যুবকের চাকরি হবে। গড়ে উঠবে সোনার বাংলা। অতএব বাঙালি জাগো।

আমরা বাঙালী দল সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ নেই সুকান্তির। দ্রুত পা চালালেন তিনি। উন্টোদিকের রাস্তায় একটা ডান কাঁধে ওয়া তেত্রিশ নম্বর ডাবল ডেকার। কণ্ডাকটর ঠিঙ-ঠিঙ করে ঘন্টি বাজাতেই বাঘমাঝি যানটি গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। এই বাসটা অদ্ভুত। সব সময়েই ভিড়ে ঠাসা! আর কয়েক পা হাঁটলেই সুকান্তি পৌঁছে যাবেন ১০৭-এ মিডল রোড। চন্দ্রদা আছেন সেখানে। চার-পাঁচ মাস দেখা হয়নি ওঁর সঙ্গে। এর মধ্যেই কত পট পরিবর্তন! দল বেশ ভারী ধাক্কা খেয়েছে। দেশব্রতী-লিবারেশন প্রকাশ অনিয়মিত। বিজ্ঞান কলেজের কয়েকজন কমরেড পার্টির একটি নিজস্ব রেডিও সম্প্রচার ব্যবস্থা প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ওরা ধরা পড়ে গেলেন কাজ সম্পূর্ণ শেষ করবার আগেই। সম্প্রচারের যন্ত্রপাতি সব বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। গোপন আশ্রয় আর গোপন থাকছে না। ধরা পড়ে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পার্টিকর্মীরা। পার্টি শেলটার এড়িয়ে চলছেন অনেক কমরেড। যারা পারছে নিজস্ব উদ্যোগে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে। এভাবে দলের শৃঙ্খলা, সাযুজ্য থাকে না। এর ওপরে দীপক-দিলীপের কর্তৃত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কেউ সি এম লাইনের বিরোধিতা করলেই সে রহস্যজনক ভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে পুলিশের হাতে। দক্ষিণ কলকাতার অগ্নি রায় আর কমল সান্যালের ভিন্নমত ছিল। আপোচনার নামে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হল ওদের। বলা হল ওরা প্রতিক্রিয়াশীল। জানান হল, এমন আরও খুন হবে। এ সবই ঘটেছে দীপক-দিলীপের পরিকল্পনায়। প্রমাণ তুলেছিল শ্যামল আর বিমল। ওদেরও কোনো হুঁশিয়ারি পাননি সুকান্তি। অগ্নি-কমলের ব্যাপারটি পছন্দ হয়নি চারু মজুমদারের। উনি দীপক-দিলীপকে আত্মসমালোচনা করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল কারণে দু'জন

কমরেডকে তো খুন হতে হল। গ্রীষ্ম সম্পর্কে কী কোনো কোনো ভালোবাসা নেই ওদের? ওরা তো পার্টির গলায় ফাঁস লাগিয়েছে। ওদের আটকাতে না পারলে এই ফাঁস ক্রমশ আঁট হয়ে এসবে। এতো সেই আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের কমিউনিস্ট পার্টিতে এমন হত। বি টি রণদিভে ক্ষমতায় এলে ভিন্নমতের পি সি যোশীর সমর্থকদের ব্যঙ্গ করা হত গোশীআইট বলে। আবার রণদিভে হটে যাবার পরে তার সমর্থকদের বলা হত টুটস্কাইট। কাকতালি ভেভাগার পার্টি নেতা অশোক বসুকে এমনই টুটস্কিপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। জীবনশ একেবারে যুগটিতে একদিকে পুলিশ হান্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অন্যদিকে পার্টি বলতে তুমি মত পাল্টাও, আত্মসমর্পণ কর। না-হলে আশ্রয় পাবে না। পাশ থেকে সরে গেল দল। অসলোক নিজেই নাম বদলিয়ে করলেন প্রকাশ রায়। স্ত্রীর নাম মাধবী রায়। দুজনে চলে গেলেন মধ্যপ্রদেশের রাজনন্দগাঁও। সেখানেই আজও রয়ে গেছেন গোপনে। পার্টিতে কী এমন দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে চিরকাল? সমস্ত ব্যাপারটা চন্দ্রদার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে দল। এর থেকে বেরোতেই হবে। চন্দ্রদাকে খবর পাঠিয়েছেন সুকান্তি। উনি আজ দুপুরে সময় দিয়েছেন।

গিগত দু-তিন মাসে চারু মজুমদারকেও অনেকবার বাড়ি বদল করতে হয়েছে। কটক থেকে মোর প্রথম সপ্তাহে ওকে আনা হল বজবজ লাইনের সন্তোষপুর। তারপর যোধপুর পার্ক, ভবানীপুর, মধ্য কলকাতার দুয়েকটি জায়গা ঘুরে অবশেষে এন্টালি এলাকায় এই মিডল রোডের ঠিকানায়।

বাড়িটা রাস্তার একদম প্রান্তে। তিনতলা। বস — দণ্ডকুটির। পিছন দিয়ে রেললাইন। বাড়িতে ঢুকতেই এক চিলতে টানা বারান্দার মুখে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ছিপছিপে, ধূসর ট্রাউজার, নীল হাওয়াই শার্ট, পায়ে কেডস্। সুকান্তিকে দেখেই ছেলেটির দৃষ্টিতে সতর্কতা, হাত চলে গেছে কোমরে। নিশ্চয় রিডলবার গাঁজা আছে।

— কাকে চাই?

— চন্দ্রদা

— কী নাম?

— সুকান্তি রায়.... শুধু সুকান্তি বললেই হবে....

নাম শুনেই ছেলেটির মুখচোখ স্বাভাবিক। আসুন আসুন কমরেড। কোমর থেকে হাত নামিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। চন্দ্রদা তার নাম বলে রেখেছেন। একতলার বারান্দার একদম কিনারায় একটি একানে ঘরের দরজায় দু-বার টোকা মারল ছেলে। ভেতরের খিল খোলবার শব্দ পেতেই চারপাশ দ্রুত দেখে নিয়ে বলল, যান ভেতরে যান....

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতেই রবির মুখোমুখি। রবি হাসল। রবির কাঁধ পেরিয়ে ডানকাতে খাটের ওপর দেখা গেল চন্দ্রদাকে। বুশ শার্ট, পায়জামা। পাশেই মাটিতে দাঁড় করা গোটা অগ্নিজন সিলিন্ডার। সিলিন্ডারের লালচে সরু নল চন্দ্রদার নাকে ঢুকে গেছে। উনি আগুন রোগা হয়ে গেছেন। মুখে ফ্যাকাশে ভাব কিন্তু চোখের ঔজ্জ্বল্য একটুও কমেনি। রোগা হবার কারণে চোখ আরও বড় দেখাচ্ছে। ওর বাম দিকে যে ছেলেটি বসে আছে তাকে চন্দ্রদা সুকান্তি। সুনীল মিএ। বীরভূমের কমরেড।

চন্দ্রদা হাত নোড়ে সুকান্তিকে এসতে বললেন। একটু অগ্নিজন নিয়ে নিই। চন্দ্রদা

হাসলেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। খাটের সামনের মোড়ায় বসলেন সুকান্তি। খাটের ওপর রেডিও। আওয়াজ কমানো। কিন্তু প্রতিটি কথা শোনা যায়। রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে। এবার আমায় ডাকলে দূরে....। কে গাইছেন? মনে হয় মঞ্জু গুপ্তের গলা। খাটের পাশেই পান্না খোলা দেওয়াল আলমারি। উপরের দুটি তাক ভর্তি ওষুধের শিশি-বোতল। নীচের তাকের একটি বোতলে অল্প কিছু কিশমিশ। অন্যটিতে তিনটি ডিম। মাথার উপর কড়িকাঠ। খাটের উপরে কড়িকাঠ থেকে পাখা ঝুলছে। চলমান পাখা থেকে মাঝে মাঝে ঝুল পড়ছে মাটিতে। সব মিলিয়ে ঘরের বেশ হতমান অবস্থা।

রবির দিকে তাকালেন সুকান্তি। চন্দ্রদাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যথা বেড়ে গেছে খুব?

— হ্যাঁ ব্যথা, দমের কষ্ট দুটোই। রবি সমস্তটা বিশদে জানাল। সারাদিন মনের জোরে সহ্য করেন। চোখ বড় বড় হয়ে যায়চোখের শিরা লাল হয়ে ওঠে...। যখন আর পারেন না, পেথিডিন দিতে হয়। এই ওষুধ বেশি না দিতে পারলেই ভাল কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। ওই ব্যথা চোখে দেখা যায় না। এখন তো মাত্র আরও বেড়ে গেছে। আগের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ লাগে।

— ও তাই নাকি। মন খারাপ হয়ে গেল সুকান্তির।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রদা নল সরাবার ইশারা করলেন। রবি এগিয়ে গেল। নল খোলা চন্দ্রদার মুখ হাসিতে ভরে উঠল। তারপর সুকান্তির দিকে....বাড়ির খবর কী? রেবা, সুগতি ভালো তো? চন্দ্রদা উঠে বসলেন।

— হ্যাঁ শেষ চিঠি যা পেয়েছি, ঠিকঠিকই তো মনে হচ্ছেআপনার বাড়ি কেমন?

— অনেকদিন দেখা হয় না...কলকাতায় আসতে লিখেছি ওদের...এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা একটু ভাল...চিঠি লিখলে একমাসের মধ্যেই পেয়ে যাব...

প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পরেই সুনীলের সঙ্গে কথা শুরু করলেন চন্দ্রদা।

— যে কথা হচ্ছিল...এতসব কালাকানুন জারি করেও কী আমাদের মনোবল ভাঙতে পেরেছে ইন্দিরা-সরকার?এত কিছু মধ্যও এই কিছুদিন আগেই শান্তিপূরের চার কমরেড অজয় ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ দালাল, মধুসূদন চ্যাটার্জী আর শত্ৰুনাথ প্রামাণিক যেভাবে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন তার তুলনা হয় না....ওদেরকে আমি চিনতাম....

মাত্র সাতদিন আগে ওদের শহীদ হবার খবর পেয়েছেন সুকান্তি। দু-মাস আগের ঘটনা। ছোট রাণাঘাট গ্রামের এক বাগানে পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল ওদের চারজনকে। চোঙ্গা ফুঁকে আত্মসমর্পনের নির্দেশও দিয়েছিল। কিন্তু কমরেডরা তা করেননি। রাইফেল চালিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন ওই ঘৃণ্য প্রস্তাবের। দু-পক্ষের অসম লড়াই চলল কিছুক্ষণ। শেষকালে চারজনই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। যতক্ষণ শক্তি ছিল প্রাণে দিয়ে গেছেন নকশালবাড়ি লাল সেলাম। কমরেড চারু মজুমদার সাপ সেলাম। যদিও কমরেড অজয় নিকটজনদের কাছে বলতেন, চারু মজুমদারকে কিছু আজে-বাজে লোক ঘিরে রেখেছে, যার ফলে বাস্তব অবস্থাটা ওঁকে বোঝানো যাচ্ছে না। সুকান্তিকে বহুবার এই মর্মে অভিযোগ করেছেন তিনি। যতদিনে চন্দ্রদার কাছে পৌঁছন গেল, অজয় আর নেই। তবু ওই কথা বলতে হবে।

শেষ বিচারে ওরা কিন্তু জিতে গেল। চন্দ্রদা এলপেন। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে

লাড়টি চালিয়ে যাবার অর্থই তাদের ভয়।

কথাটির প্রতিটি অক্ষর খাটি। শত্রু প্রাণ কেড়ে নেবার ভয় দেখায়। যে মানুষ জীবন দিতে প্রস্তুত, তার আর কাকে ভয়? বাংলার মানুষ এইসব প্রাণ তুচ্ছ করা বীরদের কোনোদিন ভুলবেন না বলেই মনে হয়।

চন্দ্রদা হাঁ করে গভীর শ্বাস টানলেন চার পাঁচবার। আধশ্বাস জল খেলেন। জানালার দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবে মাথা নাড়লেন।

তাদের এই আক্রমণ আর আত্মত্যাগ মানুষকে তার বানানো ছোট ছোট গণ্ডির বাইরে পৌঁছে আসতে সাহায্য করে...সবাইকে মিলিয়ে দেয়...ব্যাপক জনতা একই বিপ্লবী আদর্শে ঐক্য হয়ে ওঠে...এই গাণ্ডি ভাঙা জনতার বিপ্লবী জোয়ার রোধ করবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শাওন নেই। সুশীল বলল, কিন্তু কমরেড এটা তো আপনি স্বীকার করবেন আমাদের আন্দোলনে সে জোয়ার আর নেই...এখন ভাটা এসেছে...

আমি অস্বীকার করছি না...আমরা ধাক্কা খেয়েছি ঠিকই কিন্তু আমাদের হতোদ্যম হলে তো চলবে না...পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, শ্রমিক-কৃষক জনগণের মধ্যে পার্টিকে আবার গঠন করতে হবে। সুকান্তির দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন চন্দ্রদা। তাই না?

অশক্ত শরীরেও উৎসাহে কোনো ঘাটতি নেই মানুষটির। শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তোলায় সুকান্তির সুবিধে হল।

— হ্যাঁ একেবারে ঠিক...শ্রমিকদের মধ্যে আমরা যেমন কিছু করিনি, আমরা শুধু দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কথাই বলে গেছি বারবার, এটা বড় ভুল...। চন্দ্রদা তাকিয়ে রইলেন। যে কথা অনেকদিন ভেতরে ছিল, প্রকাশ্যে ফুটলেন সুকান্তি।

পার্টি প্রতিষ্ঠার তিন বছর পরেও আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে কোনো বড় ধরনের সংগ্রামে নামাতে পারলাম না। কৃষিবিপ্লবের সমর্থনেও নয়, জেলের মধ্যে নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেও নয়। ওদের সমর্থন বঞ্চিত হয়ে আমরা লড়েছি। শহরাঞ্চলে যে কয়েকটি জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে আমরা ঢুকলাম সেখানেও দেওয়া হল ব্যবসাদার, সুদখোর, কালোবাজারি খতমের রাজনীতি। পাশাপাশি, শহরে এই খতমের রাজনীতি এমন জায়গায় চলে গেল যার কোনো সীমারেখা নেই। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাকে অবধি খুন করা হল। এমন কী সাধারণ ভোটদাতাদের ভয় দেখান হল — ভোট দিলে পড়বে লাশ। শ্রমিকদের মধ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার চেষ্টা করিনি আমরা। অথচ চিনির কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তি আন্দোলনের শেষ দুটি দশক গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন চালাবার নজির রেখেছেন। আমরা মুখে শ্রমিকদের কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককেই একমাত্র বিপ্লবী শক্তি হিসাবে দেখিয়েছি। চন্দ্রদা ধৈর্য ধরে শুনলেন সব। শান্ত গলায় বললেন, এটা ঠিকঠিক, ভুল তো হয়েছিল...কমরেডরা ধরেছেন...এবার তা সংশোধনও করতে হবে। ফ্যাকাশে মুখে একটু হাসি ফুটল। আগামী বিশেষ জুলাই ভিয়েতনাম ডে পালন করছি আমরা...সেখানে শ্রমিকদের আনবার চেষ্টা করা হচ্ছেআপনি তো জানেন?

সুকান্তি মাথা নাড়লেন। তিনি জানেন। বহুদিন পর আবার প্রকাশ্যে মিছিল। কিন্তু গেরিলা কায়দায়। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যাওয়া।

চন্দ্রদা আপনাকে ঠিকঠিক বলেছেন, ভুল শোধরাতেই হবে আমাদের....তবে এইসঙ্গে

আগে যে ভুল হয়েছিল তা পার্টির কর্মীদের কাছে সরাসরি স্বীকার করা দরকার....ভুলের দায়িত্ব নিতেই হবে....

চন্দ্রদা থামিয়ে দিলেন। আপনি জানেন না বোধহয়, আমি দায়িত্ব স্বীকার করে আত্মসমালোচনা করতে চেয়েছিলাম....অঙ্কু, পাঞ্জাবের কমরেডরা বারণ করলেন...। সুকান্তির পছন্দ হল না এই যুক্তি। ইচ্ছের জোর থাকলে কে আর কবে এইসব ছোটখাট বাধাকে মান্য করেছে। — চন্দ্রদা, কাজটি করা অবশ্যই উচিত ছিল...যেমন উচিত ছিল চিনের পার্টির পরামর্শগুলিও সবাইকে জানান। বিশাখাপত্তনম জেলে থাকা কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, তেজেশ্বর, নাগভূষণ, ভেক্কাইয়া, পট্টনায়ক, এরা ছ-জন সহ করে এই মর্মে খোলা চিঠি লিখেছে।

চন্দ্রদা চুপ করে রইলেন। — এই নিয়ে কমরেডদের মধ্যে কত যে ভুল বোঝাবুঝি, পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়তে বাড়তে কোন পর্যায়ে চলে গেছে আপনি জানেন না। সুকান্তির গলায় তীব্রতা কিছু বেড়ে গেল।

তাই নাকি? চন্দ্রদা তাকালেন।

হ্যাঁ কমরেড সি এম, উনি ঠিকই বলেছেন। সুকান্তিকে সমর্থন করল সুনীল। সুনীলের সমর্থন পেয়ে সুকান্তি উজিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ চন্দ্রদা আপনার চারপাশে যারা এখন রয়েছে ঠিক খবর দিচ্ছে না...আমাদের আন্দোলনের যে বিবরণী ওরা আপনাকে শোনাচ্ছে তা অনেক বাড়িয়ে বলা...বিশ্বাস করুন....তার ভিত্তিতে এক পা-ও এগোন উচিত নয়... যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদেরকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না আপনার সঙ্গে....। সুকান্তি থামলেন। চন্দ্রদার শরীর ভালো নয়। এর মধ্যে বললে আবেগপ্রবণ মানুষটি উত্তেজিত হয়ে পড়বেন।

একটুও রাগলেন না মানুষটি। আপনি যা বললেন, সুনীল যা বলল, আমি অবিশ্বাস করছি না। কদিন আগে হঠাৎ শিম্ভিগুড়ি থেকে খোকন মজুমদার এসে হাজির। সে-ও এমন কথাই বলল। সুনীতিবাবুও এমন বলেছেন। চন্দ্রদা জানালায় বাইরে তাকালেন। দেখা যাক কী করা যায়।তবে জেনে রাখবেন ভিয়েতনাম যদি মুক্ত হয়, ওদের আন্দোলন অন্যদের প্রেরণা জোগাবে, সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আগুন জ্বলে উঠবে.... সেই আগুনের তাপ লাগবে ভারতবর্ষেও....

ট্রেনের ভাঁ শোনা গেল। এই অঞ্চলে ট্রেন শ্রথগতিতে যায়। মাঝখানে থামে আবার ভাঁ বাজায়।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে সুকান্তির দিকে তাকালেন চারু মজুমদার। — দেশের মানুষ আজ শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত। বিশেষ করে আদিবাসীদের ওপর শোষণের সীমা নেই। অল্পকালের মধ্যেই এইসব মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়বেন আর তারপরই দ্রুত হয়ে উঠবে জাতীয় অভ্যুত্থান।

এইবার সুনীলের দিকে ফিরলেন সি এম। বুঝলেন কমরেড, অভ্যুত্থান আসছে দেশজোড়া অভ্যুত্থান.....এই অভ্যুত্থানের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তবেই আত্মবিশ্বাস আসবে.....। শীর্ণ-দীর্ণ মানুষটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুনীল বলল, কিন্তু আমাদের পার্টি তো আড়ে-বহরে তেমন বাড়েনি....অভ্যুত্থান এলে কি আমরা সব জায়গায়

১৯৭৫ দি. ১৫ পা. ৭৮

নিশ্চাই নয়....যেখানে আমরা থাকব, আমাদের লড়াই একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্য এলাকার মানুষকে সংগ্রাম করতে সাহস জোগাবে, প্রেরণা দেবে...।

চন্দ্রদাও বড় বড় দাঁড়িমান চোখ দুটি বুকের ভেতরটা একেবারে নাড়িয়ে দেয়। সুকান্তির গায়ে কীটা দিল। সুনীলও চুপ।

আমি আগরও গেলি ১৯৭৫ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনতা মুক্তির মহাকাব্য রচনা করবেন....

একটু দম নিলেন চন্দ্রদা। গণি বলল, অস্বিজেন?

না। সুনীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা দেখে নিও, আগামীতে এক-একটি এলাকায় অত্যাচার প্রতিরোধে ঝড়ের গতিতে সংগ্রাম বেড়ে উঠবেএকথা আজ প্রতিজ্ঞাশীল ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বুঝতে পেরেছে....

সুকান্তির চোখে চোখ রাখলেন চন্দ্রদা। — বুঝতে পেরেছে বলেই ইন্দিরা নানারকম ছলছুতোয় কালাকানুন জারি করে শক্তিশালী কেন্দ্র গড়তে চাইছে, কেউ একটু বেচাল করলেই তাকে মিসায় থ্রেপ্তার করছে, আগামীতে ওদের দমনপীড়ন আরও বাড়বে....

সুকান্তি বললেন, ঠিক কথা....কিন্তু তা আটকবার মতো শক্তি তো আমাদের দলের নেই.... সংগঠনের অবস্থা তেমন ভালো নয়....

— আমি জানি কমরেড.....এজন্যই আমাদের প্রজন্মের প্রধান কাজ হল ব্যাপক মূল জনগণের মধ্যে পার্টি গঠন করবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া....লড়াইয়ের এমন একটা মোর্চা গঠন করা যার পেছনে থাকবেন জনগণের একটা বড় অংশ..... মোর্চা গড়তে হবে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে, শত্রু বিরোধী মোর্চা গঠন....ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্রন্ট গড়া....

এমন কথা এর আগে কোনোদিন বলেননি চন্দ্রদা। একেবারে নতুন কথা। সুকান্তি মন দিয়ে শুনতে থাকলেন।

— আজ সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে কংগ্রেস সরকার তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্ব তেমনভাবে উৎসাহ দিচ্ছে না....এজন্য নেতৃত্বের ওপর দলের সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের ক্ষোভ রয়েছে.....লড়াই করতে করতে আমরা ওদেরকেও কাছে ডেকে নেব....

আবেগের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর কঁপে উঠল। সুকান্তি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। সুনীলও।

এমনকী যারা এক সময় আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, পরিস্থিতির চাপে তারাও আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে আসবে। দু-বার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন চন্দ্রদা।

এটসন শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবার মতো মনের প্রসার রাখতে হবে আমাদের....মনের প্রসার কামিউনিস্টদের গুণ....মনে রাখতে হবে জনগণ, জনগণের স্বার্থই আজ সমস্ত বামপন্থী শক্তির একমাত্র সংগামের দাবি জানাচ্ছে। একবার সুনীলকে দেখে নিয়ে সুকান্তির দিকে ফিরলেন চন্দ্রদা। কমরেড জেনে রাখুনআর কিছুই নয়....জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন চন্দ্রদা কিন্তু তার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। সুনীল দরজার একপাশে। কোমরে হাত। অন্যপাশে রবি। ওরও হাত প্যাণ্টের পকেটে।

সুকাশি সরে গেলেন ঘরের এককোনায়ে।

আবার টোকা। আন্তে আন্তে দু-বার। রবি বলল, কে? হালকা খসখসে গলায় শোনা গেল, বিহারের কমরেডরা....চন্দ্রদা ঘড়ি দেখলেন। ভুরু কঁচকে গেল। রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, আসতে বল।

বিহার থেকে তিনজন কমরেড এসেছেন — অভয়, প্রমোদ আর রঞ্জন। ওরা আসবার আগে খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু উপযুক্ত বার্তাবাহক পাওয়া যায়নি। সেজন্য ঝুঁকি নিয়ে নিজেরাই চলে এসেছে কমরেড সি এম-এর সঙ্গে আলোচনা করতে। আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছেন বিহারের কমরেডরা। এ সময়ে সাধারণ সম্পাদকের মতামত জানা জরুরি।

আলোচনা শুরুর মুখে সুনীল উঠে দাঁড়াল। ওকে চলে যেতে হবে। সি এম বললেন, হ্যাঁ ভাই তুমি এগিয়ে পড়.... সাবধানে যেও....।

অন্য এলাকার আলোচনার মধ্যে না থাকাটাই শ্রেয়। সুকাশিও উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু বসবার ইঙ্গিত করলেন চন্দ্রদা। পরিচয় করিয়ে দিলেন বিহারের কমরেডদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ওদের লড়াইয়ের এলাকায় ঘুরে আসুন। তারপর রিপোর্ট বানাতে হবে লিবারেশন দেশব্রতীর জন্য। কমরেড প্রমোদ মাথা ঝাঁকালেন। একদম ঠিক বাত। ঘুরে যান। জোশ বেড়ে যাবে।

অভয়-প্রমোদ-রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে চললেন চন্দ্রদা। তাঁর চোখে কখনও স্বজন হারানোর বেদনা। কখনও প্রতি-আক্রমণের উত্তেজনা উজ্জ্বল। স্বরের উত্থান পতন কখনও আবিষ্ট করে। কখনও সজাগ করে। আবার কোনো বাক্যবন্ধ নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে। পাটনায় পুনপুনে ভূমিহীন কৃষকের হরতাল কোম্পানী সাধারণ ঘটনা নয় এ এক গণ-অভ্যুত্থান, একথা বুঝতে হবে আপনাদের। সত্যনারায়ণ সিং কিংবা অসীম চ্যাটার্জি আজ আমাদের দলে না থাকতে পারেন কিন্তু তবু ওদের ক্যাডারদের সঙ্গে সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্য সম্ভব....

কিন্তু সত্যনারায়ণ-পন্থীরা তো ওদের কাগজে নিয়মিত আপনাকে আক্রমণ করছে? কমরেড অভয় প্রশ্ন তুললেন।

ওর কথাটা ঠিক। সত্যনারায়ণ সিং আর অসীম চ্যাটার্জীর সহযোগীরা বেশ কয়েক দেশব্রতী। এই অন্য দেশব্রতীতে ওরা ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করছে চার মজুমদারকে। ওদের মতে চার মজুমদার এবং তার সহযোগীরা নয়া টুটকিবাদী। চার মজুমদার পাঁচ দেশব্রতী থেকে সরিয়ে দেবার পর এখন ওদের পুনর্গঠিত সি পি আই (এম এল) ঠিক পথে চলেছে।

চার বললেন, আরে....এই নিয়ে এত ভাববার কী আছে? আমরাও তো একসময় অসীমদের ভাঙ্গে ও ক্রুশ্চেভের বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের দল বেলে গালি দিয়েছি...কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের সবার সঙ্গে সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্য সম্ভব... বলেছি না, সব বামপন্থীদের সঙ্গে চলবার মতো মনের প্রসার রাখতে হবে। সুকাশির দিকে ফিরে চন্দ্রদা সমর্থন খুঁজলেন। সুকাশি দু-বার মাথা ঝাঁকালেন। অশ্রুতে উজ্জ্বল করলেন, ঠিক কথা।

চন্দ্রদার আলোচনা চলল। --- আসল কথা, সংগ্রাম করতে, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হতে হবে আপনাদের....মাইন-গুন্ড সম্পর্কে প্রচারণা করতে পারে কিন্তু সবসময় সংগ্রামের স্তরকে বুঝতে হবে....পাটির মধ্যকার সংগ্রাম শূন্য করে, শূন্য মৈত্র্য ধরে চালাতে হয়....

চন্দ্রদার কথা কখনও কানে আসছিল। আবারও নতুন ভাবনার কথা বলেছেন চন্দ্রদা। মুকামিতাকে অবিলম্বে পুনপুনের হরতাল নিয়ে একটি বড় লেখা তৈরি করতে হবে। পাটনার ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গঙ্গার শাখানদী পুনপুন। এই নদীর পাড়ে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকরা হরতাল করেছে। একদা এই হরতালকে প্রায় বাতিল করা হয়েছিল। আজ তাকে আবার সংগ্রামের ত্যাগীয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন চন্দ্রদা। উনি হেরে যাবার মানুষ নন। অধ্যয়ন করে চলেছেন নতুন পথের। কোন পথে অনিবার্যভাবে এই রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে নতুন সমাজ গড়া যায়? এজন্যই তো মানুষটিকে এত ভালো লাগে সুকান্তির।

কথা বলতে বলতে আগেরত্যাগীও হয়ে উঠলেন চন্দ্রদা। — কমরেড মনে রাখবেন দলদল লড়াই ছাড়া ভারতীয় জনতার মুক্তির আর অন্য কোনো পথ নেই। পার্টি থাকলে সংগ্রাম তীব্র, সংগ্রাম উন্নত পর্যায়ে উঠবেই। সংগ্রামী জোয়ার আসছে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কমরেডস্ জানবেন এ যুগ চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের যুগ, এ যুগ বিপ্লবের যুগ, বিপ্লবের বিজয়ের যুগ.... আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিচ্ছেন, রক্ত দিচ্ছেন দেশের মুক্তির জন্য, বিশ্বের মুক্তির জন্য....কমরেডস্ আক্রমণে দৃঢ় হোন, সংগ্রামের বিজয়ের দিন আসন্ন।

সমস্ত হিসাবের যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে ওই স্বপ্নযোদ্ধার উচ্ছ্বাস। তাঁর ডাকে পথে না নেমে উপায় নেই। অন্যসব কথাকে ছাপিয়ে সুকান্তি মন অধিকার করে নিল একটি সাদামাঠা স্লোগান — জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ। চন্দ্রদার সঙ্গে কমরেডদের আলোচনাটির সারাংশ লিখে রাখা দরকার।

পরের দিন অনেকটা সময় কেটে গেছে। টিঙের বিবরণী লেখার কাজে। তার পরের দিনও মাথার ভেতর গুনগুন করতে থাকল চন্দ্রদার কথা। চতুর্থ সকালবেলায় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পড়ে সুকান্তি হতভম্ব। চার্লস মজুমদার মৃত। কী করে এমন ঘটল? খোঁজা করে জানা গেল দীপক-সহ নাজনকে ধরেছিল পুলিশ। মিডল্ রোডের অদূরে দেব পেনের বাড়ি থেকে। দীপক বলে দিয়েছে চন্দ্রদার ঠিকানা! সুকান্তির মুখের ভেতরটা তেতো। যত চাপই থাক, যত অত্যাচারই হোক তুই বলে দিতে পারলি? পীড়নকে জয় করতে পারলি না কমরেড সি এম-এর জন্য? বলে দিলি তোর নেতার নাম? যাকে তুই-ই বলেছিস বিপ্লবী কর্তৃত্ব!হায়রে তোর মানসিক শক্তি!....

একদিন পরে রেডিও খবরচার্লস মজুমদার মৃত। সুকান্তির কণ্ঠ থেকে ছিটকে বের হল, চন্দ্রদা একী....কী হল চন্দ্রদা!



শোক পৃথিবী ভালোয় দেয়। দ্রোণের মৃত্যুসংবাদ পাবার পর দৃশ্যমান সব কিছুকে অর্থহীন লাগতে লাগলো। গাভলা মনে ওত শ্রুতিগোচর প্রতিটি শব্দ। দ্রোণ নেই তো আর কোনো কিছুতে কিছু আসে যায় না পাগলো। সকাল থেকে রাতের অধিকাংশ সময় কেটে যায় বিজ্ঞানায় পড়ে। একমাত্র মনোমোহন না একটি সচল বাকি সব প্রত্যঙ্গ অনড়। শোক বস্ত্রত

স্মৃতির আরাধনা। দ্রোণের সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত পরম যত্নে উপাসনা করে পাঞ্চালী। প্রতিদিন সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয় উৎসর্গ করে।

এরপরেই এল চারু মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ। দ্রোণের নিহত হবার খবরে যত কষ্টই হোক চোখে জল আসেনি পাঞ্চালীর। সি এম-এর মৃত্যুসংবাদে এল। নিরুপমের কাঁধে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল সমস্ত অবরোধ। মানুষটা খারাপ শরীর নিয়ে আন্তারগাউন্ডে ছিলেন এতদিন, কিছু হয়নি.....এখন পুলিশের হাতে পড়ে মাত্র বারো দিনের মাথায়.....ওরা অসুস্থ মানুষটিকে রাতদিন জেরা করে, ঠিকমতো চিকিৎসা না করে শেষ করে দিল...পাঞ্চালীর স্বর বুজে আসে। ওর মাথায় হাত রাখল নিরুপম।

পৃথিবী শোক ভুলিয়ে দেয়। এই চলমান নাটমঞ্চে নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের কোনোটি আত্মমগ্নের প্রাচীর ভাঙে, কোনো সম্প্রচার আচ্ছন্নকে উদ্ভিত করে। চারু মজুমদারের মৃত্যু তেমনই এক সংবাদ যা নিরুপমকে জাগিয়ে দিয়েছে। অবশ্য, পাঞ্চালীর সঙ্গে ঘনশ্যামদার কুরুচিকর ব্যবহারের খবর জানবার পরেই নিরুপম উঠে দাঁড়িয়েছিল। ‘শুয়োরের বাচ্চাকে গুলি করে মারা উচিত’। হয়ত মেরেই দিত। পাঞ্চালী বহুকষ্টে নিবৃত্ত করেছে। — এখন মাথা গরম ক’রো না....ঠান্ডা মাথায় অন্য শেলটারের খোঁজ করো। মাথা নেড়ে সহমত জানিয়েছে নিরুপম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে ভদ্রেশ্বরে স্কুলবন্ধু কন্মোলের বাড়ি। ওর সহায়তায় পশুওয়া গেছে চুঁচুড়ার রূপালি সিনেমা হলে বুকিং ক্লার্কের চাকরি। থাকার ব্যবস্থা হল দুই — ব্যান্ডেলের সাহাগঞ্জে বলরামদার কাছে। বলরামদা আগে স্কট লেনে থাকতেন। এখন ডানলপ কারখানার শ্রমিক। পার্টি সমর্থক। অবিবাহিত। মানুষটি সজ্জন। নিরুপমকে খুবই স্নেহ করেন। ঠিকানা জোগাড় করে নিরুপম দেখা করেছিল। সব শুনে বলরামদা রাজি হয়ে গেলেন। — দু’জনেই চলে এস। সাবধানে থেকো....যাকে তাকে এই ঠিকানা দিও না.....তাহলে আর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই। হেসেছিলেন বলরামদা। কোনো মলিনতা নেই মুখাবয়বে। পাঞ্চালীকে নিয়ে নিরুপম চলে এসেছিল বলরামদার শ্রমিক আবাসনে। এই বাড়িতেই খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল সি এম আর নেই।

পাঞ্চালীর কপালে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নিরুপম বলল, এই রোগা, রুগ্ন মানুষটিকেও এত ভয় পুলিশের যে সরিয়ে দিতেই হল। নিরুপমের চোখেও জল ভরে আসে। সি এম-এর কথা মনে পড়ে। চারু মজুমদারের নাম ভুলিয়ে দিতে পারবে না কেউ। পাঞ্চালীর চোখের জলে নিরুপমের বুক ভিজে যায়। এই কান্নাকে ঘৃণায় পরিণত করতে বলেছেন সি এম। প্রতিটি হত্যাকাণ্ড যে রক্তের ঋণ জমা করেছে সেই ঋণ প্রতিক্রিয়াশীলদের শোধ করতে হবে রক্ত দিয়েই। সি এম-কে যেভাবে অবমাননা করেছে রাষ্ট্র, তাকে পরিণত করতে হবে প্রতিহিংসায়। করবেই করবে নিরুপম। না হলে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য থাকাটা অর্থহীন হয়ে যাবে। চারু মজুমদার মারা যাবার পাঁচদিনের মাথায় ছ-জনের এক গেরিলা স্কোয়াডের সঙ্গে অ্যাকশনে যোগ দিল নিরুপম। মানকুছুতে পুলিশ খতম। রাইফেল দখল। কাজ শেষে চুপচাপ ফিরে এল সাহাগঞ্জে।

দিন কাটে। কিন্তু পাঞ্চালীর মুখ স্রিয়মাণ। তার দুই চোখে দ্রোণের স্মৃতি, কমরেড সি এম-এর উদ্দেশ্যে নিবেদন লীন হয়ে আছে। এ সময় শোক ভোলাবার কথা অর্থহীন।

শোকমগ্নকে যারা সংসারের চাল-ডালের হিসেবি তুচ্ছ কথা বলে মন ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা হৃদয়হীন। আর যারা জগতের অনিত্যতার দার্শনিক কথা তুলে জ্ঞান দেবার উদ্যোগ নেয়, তারা বুদ্ধিহীন। শোকের সময় প্রিয়জনের পাশে হৃদয় মেলে দাঁড়াতে হবে। নিকলমের সেই প্রসারিত হৃদয়ের ওপর ভর করে শোকাহত যদি প্রতিনির্ভরে প্রাণবল না পায় তাতলে আর সে কীসের সহযোগী?

নিকলম বলল, মন খাণাপ করে বসে থাকা নয়, বদলা নিতে হবে....

পাঞ্চালী মুখ তুলে তাকাল।

হ্যাঁ হ্যাঁ বদলা.....কমরেড দ্রোণ, কমরেড সি এম হত্যার বদলা.....সমস্ত শহীদ আজ ডাক দিয়েছেন.....কমরেডস থেমো না.....লড়াই জারি রাখ.....দিন বদলাবেই.....

নিকলম জানায় শহীদ কমরেড দ্রোণাচার্য ঘোষের স্মৃতিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙেলে রেল শ্রমিক কমরেডরা আর চুঁইড়া-হুগলি-কাপাসডাঙার কমরেডরা সশস্ত্র মিছিল করেছেন। পাঞ্চালীর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা। গভীর প্রেমের নীরব সংগীত। পাঞ্চালীর মাথায় হাত রেখে নীরবে বসে থাকে নিকলম। একসময় তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে পাঞ্চালী। এত খনিষ্ঠ অবস্থাতেও শরীর উখিত হয় না দুইজনার। প্রতিরাতে ঘরে ফিরে নিকলম পাঞ্চালীকে শোনায় পার্টির খবর। সি এম চলে যাবার পর দল ছত্রভঙ্গ.....এই সুযোগে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সি এম বিরোধী সতানারায়ণ সিং-এর সি পি আই (এম-এল) প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ওরা এখনও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেনি। বিহারে চারু মজুমদার-পন্থীদের যে ছোটখাট সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন সুকান্তিলা। উনি নিয়মিত বিহারে যান। এখন বর্ষদিন ওখানেই আছেন। ওখানে থেকেও নিকলম-পাঞ্চালীকে ডোলেন নি তিনি। মাঝে মধ্যে চিরকুট পাঠান নিকলমকে। 'কি গো তোমাদের এলাকায় দলের জানু কিরকম? আর আমাদের সেই মদাপান-বিরোধী কমরেড কমরেড পাঞ্চালী কেমন আছেন?' পাঞ্চালীর মুখে এক চিপতে হাসি ফুটে ওঠে। শোকের ধাক্কা সামলিয়ে সি এম-পন্থীরা আবার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। আসানসোল-বর্ধমানের মহাদেব মুখার্জি সবকটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। উত্তরবঙ্গে একইরকম উদ্যোগ নিয়েছেন শান্তি পাল। আবার চেষ্টা চলছে জোট বাঁধবার। চারু মজুমদারের সমর্থকদের মধ্যেও দুটি দালা আছে। একদল মনে করে চিনের পার্টি যা পরামর্শ দিয়েছে, সেই অনুযায়ী ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে এগোন উচিত। অন্যরা বিরোধী। তাদের মতে আগের পথই একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে হবে।

আপাতত দুই পক্ষই এক দলের মধ্যে। চারু মজুমদার মারা যাবার ছ-মাসের মাথায় দুটিও মোদকের ব্যবস্থাপনায় আবার প্রকাশিত দেশব্রতী। চন্দননগরে ছাপার ব্যবস্থা হয়েছে। একদিন দুটি দেশব্রতী হাতে ঘরে ফিরল নিকলম। পাঞ্চালীর হাতে দিল।

এই দাতা দেখ।

পাঞ্চালী হাত বাড়িয়ে নিল। উলটে-পালটে দেখতে গিয়ে বিস্মিত।

এ কী।একই তারিখের দুটি আলাদা চেহারার দেশব্রতী।দুটির-ই তারিখ ১৪ জুন ১৯৭৩জাপার ডল নাকি?

— না না একই দেশব্রতীবিষয়বস্তু দুটিতেই এক.....

পত্রিকা দুটির বিষয় মিলিয়ে দেখল পাঞ্চালী।

— হ্যাঁ তাই তো..... শুধু একটির প্রথম পাতায় লাল কালিতে চারু মজুমদার আর মাও সে-তুঙের ছবি আর উদ্ধৃতি, অন্যটিতে উদ্ধৃতি আছে ছবি নেই.....

তা ছাড়া দুটির হরফ আলাদা রকমের। রহস্যটির ব্যাখ্যা করল নিরুপম। ছাপার ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু রাজ্য জুড়ে কাগজ ছড়িয়ে দেবার অসুবিধে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। ঠিক হয়েছে প্রতিটি খবর, সম্পাদকীয় সব কিছু পরম্পরা অনুযায়ী হাতে লিখে সেই প্রেসকপি পাঠিয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। এলাকার কমরেডরা সেই দেশব্রতী ছাপার ব্যবস্থা করবেন এবং বিলি করবেন সেই অঞ্চলে।

— ভালো ব্যবস্থা.....রাজনীতি কেন্দ্রীভূত কিন্তু এলাকার কাজকর্মের সিদ্ধান্ত নেবে ওই এলাকার পার্টি কমিটি। নিরুপম হাসল। এমন চিন্তাভাবনা আগেও ছিল। তবে এখন জোরদার করা হচ্ছে। ছদ্মনাম নিয়েও নতুন এক পদ্ধতি। এখন কোনো নামের শেষে পদবী নেই। রুবি-জয়শ্রী-শ্রীলেখা, সুদেব-অলোক-পুলক, মুক্তিদা-বিভূতিদা-কানাইদা এইসব ‘টেক নেম’।

খুব ঘুলিয়ে দেওয়া ব্যাপার। নাম শুনে পুলিশ তো নয়ই, তুমিও চট করে বুঝে উঠতে পারবে না আসল লোকটি কে। বলতে বলতে নিরুপম মাথা নাড়ল।

পাঞ্চালী চোখ বড় বড় করে বলল, তাই নাকি তুমি তোমার নাম কী? নিরুপম গম্ভীর হয়ে গেল। কানে কানে গুরু জপমন্ত্র দিয়েছে। খেলা বারণ। পাঞ্চালী এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। নিরুপমের চোখ ততক্ষণে কান্না দিয়ে উঠেছে। দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠল।

হৃগলির দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নেতা ভোলানাথ উঠে পড়ে লেগেছেন জেলার সংগঠনকে আবার সজীব করে তুলতে। উনি অনেকবার পাঞ্চালীর সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পাঞ্চালী উৎসাহ দেখায়নি। সে জন্য নিরুপম একথা সে কথা বলে এড়িয়ে গেছে ভোলানাথকে।

একদিন ভোলানাথ সোজা চলে এলেন পাঞ্চালীর সঙ্গে দেখা করতে। দীর্ঘকাল, গৌরবর্ণ লোকটির চোখ দুটি বড় বড়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরিয়ে, একটি পাল চৌল পরিয়ে দিলেই ওকে কাপালিক বলে ভ্রম হবে।

চন্দননগর-বৈদ্যবাটি আঞ্চলিক কমিটির মিটিঙে পাঞ্চালীকে উপস্থিত থাকবার কথা বললেন ভোলানাথ। ভোলানাথের অনুরোধ আনাতে পারে না। এরা কথা আরম্ভ করলে, বলেই যায়। অন্যদের বাধা হয়ে শুনতে হয়।

কমরেডরা একজন শহীদ কমরেডের স্মৃতিতে দেশেলে উদ্দীপ্ত হবে। অতএব পাঞ্চালীর উচিত শহীদ কমরেড দ্রোণাচার্যের আদর্শের দিকে এই সভায় যাওয়া.....। প্রত্যাবর্তনের পোশাক না পরলেও কমরেড ভোলানাথ কাপালিকের মতোই কাচোকর্মা। আগধন্টা বন্ধুতার শেষে পাঞ্চালীর উপস্থিত থাকবার শর্তসম্মত আদায় করে নিলেন।

প্রথম মিটিঙ লিচুবাগান। মানকণ্ডু স্টেশনের কাছে। চটকল শ্রমিক এলাকা। মিটিঙ হবে রাণ্ডির আটটার এক শ্রমিক কমরেডের বাড়ি। ভজন বাড়ালি, পাঁচজন বিহারি ছাড়াও

ভোলাভাণ্ডা (ভোলভাণ্ডা) কমরেড থাকবেন।

তাতে অসুবিধে নেই, ওই অঞ্চলের অবাঙালিরা ভালোই বাংলা বোঝেন। নিরুপম ভগসি দিল।

তাছাড়া ওরা শহীদ কমরেড দ্রোণাচার্যের স্ত্রী-কে দেখতে আসছে....আবেগে উদ্বেল সবাই....কথার সবটা বুঝতে না পারলেও কিছু এসে যায় না। ভোলানাথ হাসলেন।

আরে এমন সুন্দর মুখ দেখলেই, শালা, ওদের পিলে হড়কে যাবে.....। লোকটি বেশ মুখতলসা। বয়স্কদের মুখে অশৈল বাক্য ভাল লাগে না। পাঞ্চালী গভীর হয়ে গেল। কিন্তু দ্রোণার কথা ভেবে সে রাঙা হয়েছে। এখন পিছিয়ে যাওয়া চলবে না।

কমরেডস্। উচ্চারণ করা মাই শরীরে কাঁটা দিল পাঞ্চালীর। নিজের বলা কথার আড়ম্বরণে নিজেরই শরীরে এমন আন্দোলন! ঘরের সবাইকে বলতে হবে শ্রদ্ধেয় নেতা চাক মজুমদারের কথা, কমরেডদের আত্মদানের কথা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কী করে যেন কথা এসে গেল।

কমরেডস্ আজ অনুশোচনার দিন নয়। যিনি আমাদের এই কথা শিখিয়েছেন সেই শ্রদ্ধেয় নেতা এক বছর হতে চলল শহীদ হয়েছেন। ভারতবর্ষের কোনো দলের সাধারণ সম্পাদক এইভাবে নিজের জীবন দিয়ে আদর্শের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরতে পারেননি। আজকে যখন শত্রু শিবিরে দ্বন্দ্ব প্রকট, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছেন, সেই আবহাওয়ায় অমর শহীদ শ্রদ্ধেয় নেতা, অমর শহীদ সরোজদা, অমর শহীদ বাবুলাল, পঞ্চাঙ্গি-নির্মলা-ভেম্পটাপু সত্যনারায়ণ - আদি বাতলা কৈলাসম, অমর শহীদ দয়া সিং - ভুজা সিং - হরি সিং, অমর শহীদ অগ্নি টম্বো - রামায়ণ রাম - জগদীশ প্রসাদ সুদেব শশী-গুরুদাস, অমর শহীদ বিপ্লব ভট্টাচার্য - দ্রোণাচার্য ঘোষ....

শহীদদের নাম উচ্চারণ করবার সময়ই ভেতরে আলোড়ন হচ্ছিল। দ্রোণাচার্যের নাম বলবার পর আর চোখের জল সামলান গেল না। সবাই পাথরমূর্তির মতো তাকিয়ে। নিরুপম পাঞ্চালীর পিঠে হাত রাখল। ভোলানাথ বলে উঠলেন, শহীদ কমরেডদের স্ত্রী-র এই চোখের জলকে আমাদের আঙনের ফুলকি করতেই হবে।

পাঞ্চালী আবার বলতে শুরু করল। রাত্রিবেলা শিশির পড়ে ফুল ফোটেয়, গন্ধ ছড়ায়। তেমনই, ওই শিশিরের মতোই শহীদদের পবিত্র রক্ত ঝরেছে ভারতবর্ষের মাটিতে। জনতার মুখ ফুটেছে। বুক ভরে উঠেছে আত্মদানের সৌরভে।

ভাষণ দিতে গেলেই মুখের ভাষা কেমন পালটে যায়। নিজের শব্দ চয়নে অবাক পাঞ্চালী। এ কী তার ভাষা? না দ্রোণার? — হ্যাঁ কমরেডস্, ওই শহীদদের মতোই আমরাও ভেঙে দেব সমস্ত আত্মরক্ষার চিন্তা, তীব্রতম ঘৃণা নিয়ে আঘাত করব, ধবংস করব, মুছে দেব শত্রুকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে। শ্রদ্ধেয় নেতার এবং সমস্ত শহীদদের রক্তে রাজ্য পতাকাকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান দেবই। কমরেডদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। কমরেড ভোলানাথ চাপা করে বলে উঠলেন, ভারতীয় বিপ্লবের অমর শহীদরা লাল সেলাম। সবার মুঠো করা হাত উপরে। লাল সেলাম, লাল সেলাম। ভোলানাথ বললেন, শ্রদ্ধেয় নেতার নিজ হাতে পড়া দিলি। আট এম এল জিন্দাবাদ। প্রত্যুত্তর হল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সম্মেলক ঘর খামল।

আসুন কমরেডস্ আমরা শ্রদ্ধেয় নেতার শহীদ হবার এক বছর পূর্ণ হবার মুহূর্তে শপথ নিই। তোমার অমর বিপ্লবী কর্তৃত্বের মহান ঋণ্ডাকে আমরা উর্ধ্বে তুলে ধরবই.....

নিরুপম চাপা গলায় বলল, ভোলানাথও সি এম-এর কর্তৃত্ব বলছেন নেতৃত্ব নয়। পাঞ্চালী চিমটি কাটল নিরুপমকে। সামান্য মাথা নাড়িয়ে চোখের ইশারায় চূপ করতে বলল।

ভোলানাথের কণ্ঠ হঠাৎ উচ্চগ্রামে।১৯৭৫ সালের মধ্যে তোমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, পৃথিবীর মানুষের আশা ভরসার ভারতবর্ষ গড়ে তোলার শপথে এই বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করব। গৌরবময় ও নির্ভুল চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব। সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনতার সঙ্গে কাঁধ মেলাব। সার্থক করে তুলব চেয়ারম্যানের মহান স্বপ্ন — ২০০১ সালের মধ্যে পৃথিবী মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

বক্তৃতার শেষে ভোলানাথ স্লোগান দিলেন, চেয়ারম্যান মাও লাল সেলাম। আবার লাল সেলামের প্রতিধ্বনি। কমরেড লিন পিয়াও লাল সেলাম। নিরুপম হাত নামিয়ে চূপ করে রইল এইবার। লিন পিয়াও বহু ভুল করেছে। মাও-কে বিভিন্ন সময়ে এই দু-মুখো লোকটির বিরুদ্ধে মতাদর্শের লড়াই চালাতে হয়েছে। একসময় সে নিজের অহং বিসর্জন দিয়ে কিছু ভাল কাজ করেছিল। এই সুবাদে মাওয়ের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। কিন্তু লোকটির আসল উদ্দেশ্য ছিল মাও-কে সরিয়ে ক্ষমতা দখল। এই উদ্দেশ্যে যড়যন্ত্র শুরু করেছিল। চালাকি করে মাওয়ের উত্তরসূরী বনেছিল লিন। বিষয়টিকে বৈধতা দিতে পার্টির গঠনতন্ত্রে ঘটিয়েছিল রদবদল। এ-দুর্ভাগ্যে দলের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ লিন পিয়াওয়ের ভুল রাজনীতি। কোনো সুধারণ আন্দোলনকে অনাবশ্যক অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছে রেডিও পিকিং। সে-ও নির্ঘাৎ লিনের প্রভাবাধীনে ছিল বলেই। সর্বোপরি মাও-কে হঠাতে চেয়েছিল লিন। তার কোনো ক্ষমা নেই।

নিরুপমের হাতের মুঠোয় চিরকুট গুঁজে দিল পাঞ্চালী। সোনা, আমি জানি তোমার মনোভাব। কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে এখন ক'দিন চূপ করে থাকতে হবে। লাল আঁচিল। নিরুপম হাসল। পাঞ্চালির দিকে না তাকিয়েই দ্রুত ওই কাগজেই লিখে দিল — ভালো লাগছে, তুমি আবার কাজকর্ম নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছ। ঠিক আছে, তাই হবে, এখন ক'দিন মুখে কুলুপ। পেট-কাটা নিরুপম!

প্রথম বক্তৃতার পরেই পাঞ্চালীর নাম ছড়িয়ে গেল। জেলার পাঁচটি ইউনিট থেকে ইতিমধ্যেই অনুরোধ এসেছে শহীদ কমরেডের স্ত্রী কে চাই। কলকাতা থেকেও মাঝে মাঝেই দু'টি, একটি করে অনুরোধ আসছে। পার্টির কাজ। যেতে হয় পাঞ্চালীকে। বলতেও হয়। কথা বলা খুবই কষ্টের। দোষাচার্যের কথা বলতেই অশ্রু ভরে আসে। হাতের তালুতে নরম চাপড় দেয় নিরুপম। শরীরা ভায়ায় সমবেদনা পাও করে। চোখের ইঙ্গিতে কথা এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা। ও পাশে থাকলে জোর পায় পাঞ্চালী। আবার বলতে শুরু করে। লড়াইয়ের কথা। আত্মদানের কথা।

তিনটি বক্তৃতার পরেই খারাপ লাগে পাঞ্চালীর। তার চোখের জল, ব্যক্তিগত অনুভূতি বি. হাটের মাঝে মেলে মগা হচ্ছে না। কমরেডের উদ্ভুদ্ধ করতে চাও তো যুক্তি দিয়ে

কর, 'হু' দিয়ে কণ, নিখাদ আবেগ কেন? ভেতরে বাধা জন্মায়।

একদিন আবার দুপুরবেলায় ভোলানাথ এলেন।

নিকপম কোথায়?

উত্তরে। পাঞ্চালী বলল। ইডনিং শো শেষ হলে আসবে।

ভোলানাথ কাধের ঝোলা মাটিতে রাখেন।

একটু জল।

পাঞ্চালী এক ঘাস জল এনে দিল। আধঘাস জল খেলেন ভোলানাথ।

বেকজিলে?

হ্যাঁ। মাথা নাড়ল পাঞ্চালী। এই সময় সে দুই রিকশাচালকের পাঁচটি বাচ্চাকে অঙ্ক লেগাতে যায়।

ও আচ্ছা। ভোলানাথ ঝোলা থেকে দশ কপি দেশব্রতী বের করলেন। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। প্রথম পাতায় চারটি ছবি — মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন, মাও-লিন আর চার মজুমদার সরোজ দত্ত। সঙ্গে চার-পাঁচটি স্লোগান। চেয়ারম্যান মাও লাল সেলাম। মতান, গৌরবময় ও নির্ভুল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি লাল সেলাম। দশম কংগ্রেস লাল সেলাম। মতান টানা জনগণ লাল সেলাম। পাতার তলায় — চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের পথ আমাদের পথ।

ভোলানাথ গলা খাঁকারি দেন। নিকপমকে বোলে আমাদের মিটিঙের আগেই এইগুলি কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে। লায়নপুত্র। ওর কান্না আছে

সিঁপে দু'বার মাথা দোলল পাঞ্চালী। সে বেঁকে জোরে ভোলানাথ উঠলেন না। ...তারপর ওপলি, জেলার অবস্থা, কেমন পুখুড়?

লুরো জেলার অবস্থা জো জোটে পাঞ্চালীর। একদিন কাজকর্ম থেকে দু'রে ছিল সে। নিকপম উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, ও জামো।

আমার জো তেমনভাবে জানা নেই। তবে যা শুনেছি, আবার সবাই একজোট হচ্ছে। পাঞ্চালী বলে। অবশ্যই। আবার বিভিন্ন জায়গায় লাল পতাকা তোলা হচ্ছে। ভোলানাথের চোখে মুখে কথা। জেলার বিভিন্ন এলাকার খবর দিতে শুরু করলেন ভোলানাথ। তাকে এইসব কথা বলছেন কেন? পাঞ্চালীর অবাক লাগল। অনেক আশ-কথা পাশ কথার পর ভোলানাথ জানালেন, নিকপমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে অনেক কমরেড ভালো চোখে দেখছে না।

তার মানে? পাঞ্চালী বিস্মিত। তাদের ভালো না লাগার কারণ? না, মানে, ওরা তোমার পাশে দ্রোণাচার্যকেই বসিয়ে রেখেছে তো, সেইজন্য....। ভোলানাথ আমতা আমতা করেন।

পাঞ্চালীর কান গরম হয়ে যায়। বাঃ খুব ভাল, শহীদ কমরেডের স্ত্রী মানে বিধবা, অতএব তার বিনিয়োগ খেয়ে থাকাই উচিত। মুখে রক্ত জমে পাঞ্চালীর। অন্য কারও সঙ্গে জেয় খেরিলী ওবার নামান্তর....তাই তো?

কথার জীবনায় ভোলানাথ খেঁট হারান।
আমি শুধু চোখের জল ফেলবার মেশিন, তাই না? অঙ্ক দিয়ে অনোর মতো আবেগ

সংক্রামিত করে যেতে হবেএই আমার কাজ? পাঞ্চালী বলল।

ভোলানাথ জিভ বের করেন। পান খাওয়া লাল জিহ্বা। না, না আমিও সেই কথা ওদের বুঝিয়েছি। দিনের পর দিন এভাবে চোখের জল ফেলা যায় নাকি!তুমি কি শালা যাত্রাপার্টির ঘুস্কি মাগী যে মুখে রঙ মেখে প্রতি সন্ধ্যায় চোখের জল ঝরাবে। ভোলানাথ খ্যা-খ্যা করে হাসেন। অশ্লীল কথায় ভেতরটা সংকুচিত হয়ে যায় পাঞ্চালীর। মুখের ভেতরটা তেতো।

আমি বুঝিয়েছি ওদের। মাটিতে রাখা প্লাসটি হাতে নিলেন ভোলানাথ। জল শেষ করে আবার বললেন, আমি বুঝিয়েছি ওদের....তুমি ভেব না। নিরুপমের সঙ্গে পাঞ্চালীর সম্পর্ক নিয়ে আর একটি কথাও বলেন না তিনি।

ঘরে ফিরে সব শোনে নিরুপম। ওর ধারণা, এই অভিযোগ আসলে ভোলানাথের। সে অন্যের দোহাই পাড়ছে।

— আমাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে ওর ভেতরে ঈর্ষা হচ্ছে। নির্ঘাৎ কোনোদিন প্রেম করতে গিয়ে ল্যাঙ খেয়েছিল। নিরুপম রেগে ওঠে। পাঞ্চালী একেবারে ফেলে দিতে পারে না এইকথা। তাকে-নিরুপমকে মানুষজন বেশ পছন্দ করে। তাদের নামে দলের বন্ধুদের এমন বলাটা সত্যিই অস্বাভাবিক।

— অথচ দেখ, ভদ্রলোক জায়গায় জায়গায় ঘুরে আমার দলকে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন। পাঞ্চালী বলে। এতে ওর তো কোনো ক্ষতিকর লাভ নেই। সবটাই দলের জন্য, মুক্তির জন্য। মানুষের মন যে কত দ্রুত পথে চলে —

ঠিকই। নিরুপম মাথা নেড়ে সায়ে দেখে কিছু বিরক্তি কমে না। স্তব্ধ বসে আপনমনে মাথা নাড়ে। স্বগতোক্তি করে। কে জানে...হতেও পারে দলের কেউ কেউ বলেছে। এরা মুখে মার্কস-লেনিন-মাও বললেও ভেতরে ভেতরে সামন্ততান্ত্রিক। পুরনো-পচা মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকতে চায়।

মিটিঙে প্রশ্ন তুলল নিরুপম। দেশব্রতীর লেখা নিয়ে। ওর মতে চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি লিন পিয়াও-কে প্রশংসা করা যায় না। কারণ দশম কংগ্রেসে লিনের পথ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। লিন চিহ্নিত হয়েছে চক্রান্তকারী হিসাবে। আবার চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে লাল সেলাম জানালে ‘চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’ স্লোগান লেখা উচিত নয়। কারণ ওই পার্টির কাঙশেঙ-টৌ এন লাই এই স্লোগানের নিন্দা করেছেন।

দ্রোণ লিন পিয়াওয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। চারু মজুমদারের পাশাপাশি কথায় কথায় লিন পিয়াওয়ের উদ্ধৃতিও দিত — জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক...। দ্রোণের কথা ভাবলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে। নিরুপমের যুক্তি সঠিক লাগলেও দ্রোণের কথা ভেবে কিছু বলতেই হয় পাঞ্চালীকে।

— আহা তা কেন, চিনের পার্টি তো আমাদের বন্ধুর মতন। লিন পিয়াও সম্পর্কে আমাদের ধারণা অটুট রেখেও তো আমরা ওদের কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাতেই পারি—

নিরুপম থামিয়ে দেয়। অর্থাৎ দশম কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানানো শুধু একটা ভদ্রতা,

মার্কসীজ্ঞান কোনো বাল্যই নেই! একই যুগিতে আমরা চিনের পার্টিকে লাল সেলাম জানাওছি, তাদের পরামর্শ না মেনেই, তাই তো?

মোকম কখা! পাখালী চুপ করে যায়।

ভোলানাথ বলে, এটা ভাগ্যই কোনো কারণ নেই ওই পার্টির সবাই লিনের বিরুদ্ধে। একদল সংশোধনবাদী যারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, হানাত লিগের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। চৌ এন লাই - কাঙ শেঙ সংশোধনবাদী। মাও সে তুঙ তো এখানে অর্থাৎ লিগের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও বলেননি—

নিকলম বলে, হ্যাঁ, কে বলেছে বলেন নি? একটি নয়, তিনটি বাক্য বলেছেন — সংশোধনবাদীরা, মার্কসবাদ অনুশীলন করুন। একাবদ্ধ হোন, বিচ্ছিন্ন হবেন না। প্রাণখোলা ও যুক্তমূল্য চোনা, চোনাও ও যড়যন্ত্র করবেন না....এ সবই লিনের মতাদর্শের বিরুদ্ধে। আর জানেনা চিনকে রাশিয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই আমেরিকাকে পাস্তা দিতে হচ্ছে। ভোলানাথ চুপ। নিকলম বিশদে গেল। পার্টি তৈরি হবার পর থেকে গত পঞ্চাশ বছরে মাও সে তুঙকে অন্তত ন-দশটি লোকের ভুল পথের বিরুদ্ধে লড়াইতে হয়েছে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস এই দুই মতাদর্শের লড়াইয়ের ইতিহাস। লিন ভুল পথে চলে গেল ন-দশজনের মতই বাতিল হয়ে গেছে।

পাখালী বলল, ঠিক আছে লিন পিয়াও না হয় ক্ষমাসুকারী কিন্তু আমাদের এখানে সে তো কোনো কুর্কর্ম করেনি?

নিকলম যেন তৈরি ছিল। ওদেশে লিন যখন মাও-কে মহাশয় অবতার বানাতে গিয়েছিল আমরাও এখানে কমরেড সি এম-কে নিয়ে তেমনভাবেই প্রগতিশীল ব্যক্তিপূজা শুরু করেছি। তলে তলে মার্কসবাদের সংশোধন হয়ে তা দাঁড়িয়েছে বিচ্যুতি। যার ফলে এত ক্ষতি.....

পাখালী মতসা কোনো উত্তর দিতে পারল না। ভোলানাথ বলল, তুমি কি বলতে চাও এট যে সি এম-কে আমরা শ্রদ্ধেয় নেতা বলছি, তা ঠিক নয়?

মাঝে মাঝে তার পর তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য বলা তবু একরকম কিন্তু তাঁর ঐগত্যপন্থায় যেভাবে তাকে ভারতের বিপ্লবের সর্বময় কর্তৃত্ব, কেন্দ্রীয় কমিটি বলা হয়েছে, পায় অনৈতিককৃত্ত আরোপ করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। এ একধরনের গুরুবাদ এবং এইসব গোয়েন্দা লিগের চিন্তাধারার প্রভাবেই.....

এ কাঁ পরনের কথাবার্তা! এ তো সি এম-এর অপমান। ভোলানাথ বিরক্ত। শ্রদ্ধেয় নেতা গিডান, শ্রদ্ধেয় নেতা কর্তৃত্ব, শ্রদ্ধেয় নেতা বিশ্বাস, শ্রদ্ধেয় নেতা বিপ্লব। চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তাধারা ভারতের এখনকার পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতার চিন্তাধারা.....

ডক চলল। পাখালী লড়াইয়ে চেপ্টা করল দ্রোণের পক্ষ নিয়ে। প্রতিবারই পরাজিত হল। তার রাগ হানাত। ভোলানাথও খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি রেগে পেলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এট নিয়ে পরে আরও তর্ক চালাতে হবে, তখন দেখব কার কত লজ্জাতি।

নিকলম রাগল না। লগ সঠিক ওশে ভয় পাবার কী আছে? সঠিক ভাবনাকে তো দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতুপুতু করে রাখবার দরকার নেই। তার সঙ্গে অন্য লাইনের দ্বন্দ্ব চলুক না ক্ষতি কি? বরং যুক্তি, পাস্টা যুক্তির লড়াইয়ের সঠিক মতটি পোড় খেয়ে আরও সত্যি হয়ে ওঠে। একটু থেমে ভোলানাথের দিকে তাকাল নিরুপম। আমি ভুল বলতেই পারি, কিন্তু আমাকে ভুলটা দেখিয়ে দিন। ভুল বুঝতে পারলে আমি আত্মসমালোচনা করে ঠিক পথে চলব।

ভোলানাথ উত্তর দিলেন না।

জেলার বিভিন্ন এলাকার লড়াইয়ের রিপোর্ট পেশ শুরু হয়।

কমরেড পল্টু জানাল, তারা এলাকার শ্রমিকদের সংগঠিত করে শেওড়াফুলি স্টেশনের ওভারব্রিজের মাথায় লাল পতাকা তুলেছে। নেতাজী বিদ্যামন্দিরেও লাল পতাকা তোলা হয়। পতাকা তোলার পর স্লোগান দেওয়া হয় — শ্রদ্ধেয় নেতাকে হত্যার বদলা আমরা নেবই, ১৯৭৫-এ ভারতবর্ষকে মুক্ত করবই। জি টি রোডের পাশে চাতরায় জলের ট্যাকের মাথায় লাল পতাকা তোলে শেওড়াফুলি ইউনিট। দিনের বেলা সেই পতাকা নামাতে সাহস হয়নি পুলিশের। রাতের বেলায় ওরা চোরের মতো এসে পতাকা নামায়।

বাঁশবেড়িয়া এলাকার কমরেড স্বপন জানায়, তারা এলাকায় আবার দেওয়ালে লিখতে শুরু করেছে। শ্রদ্ধেয় নেতার শহীদ বেদী স্থাপন করবে তারা। হুগলি কমিটির কমরেড রুবি বলল, শ্রদ্ধেয় নেতার শহীদ দিবসে তারা শত্রুর প্রহরাকে ব্যর্থ করে বলাগড়ে মশাল মিছিল বের করেছে। মিছিলের পরেই কমরেডরা যার মতো আবার আত্মগোপন করেছেন।

ভোলানাথ তারিফ করেন। এই তো চাই। আমরা এইবার শ্রদ্ধেয় নেতার স্বপ্ন সফল করব। ভোলানাথের গলায় বক্তৃতার সুর এসে যায়। কমরেডস্ আমাদের আরও এগোতে হবে। নদীয়া জেলার সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরেও আবার শুরু হয়েছে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। কলকাতায় পুলিশের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে আবার লালপতাকা তুলেছেন কমরেডরা। ঢাকুরিয়া-হালভুতে আবার পুলিশ খতম, রাইফেল দখল। সর্বশেষ খবর, বিহারের পুনপুনে ভূমিহীন কৃষকদের গণমুক্তি ফৌজ গেরিলা কায়দায় প্রতিহত করেছে, পরাজিত করেছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে। এই ধারাবাহিকতা রাখতে হবে আমাদের।

বক্তৃতার শেষে ভোলানাথ বললেন, জেলার শহীদ কমরেডদের হত্যার বদলা নিতেই হবে। তাহলেই জেলার মানুষের মন থেকে পুলিশ সন্ত্রাসের আতঙ্ক মুছে যাবে। কৃষকরা ভরসা পাবেন। অভ্যুত্থানে ফেটে পড়বেন তারা।কী করা যায়? ভোলানাথের মত, বৈদ্যবাটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ। ভোলানাথ বললেন, এই অ্যাকশনের কম্যান্ডার আমাদের কমরেড নিরুপম।

পাঞ্চালী দমে যায়। গঙ্গার অদূরেই এই ফাঁড়ি। ওখানে বেশ কিছু পুলিশ আছে। প্রত্যেকে সশস্ত্র। ফাঁড়ির চারপাশের রাস্তা তেমন চওড়া নয়। তার ওপর সাইকেল রিক্সার ভিড়। ওইখানে অ্যাকশন করা বেশ শক্ত। বেছে বেছে দায়িত্বটা নিরুপমকেই কেন দিলেন ভোলানাথ? উনি খুব ভালো করেই জানেন পেটে গুলি লাগবার পর সেরে উঠলেও নিরুপম খুব জোরে দৌড়তে পারে না। তবুও ওকে কেন দিলেন দায়িত্বটা? ঈর্ষায়?

— কী কমরেড নিরুপম? রাজি তো? ভোলানাথের চোখে জিজ্ঞাসা।

— রাজি হলে হয় শত্রু খতম, না হয় আমরা। আর রাজি না হলে আমি ভিত্ত,

লালোদারাদী। প্রথম পথে দেশপ্রতীতে নাম উঠবে। সম্ভবত ছবিও ছাপা হবে। এমন সুযোগ কেউ জাড়ে? আমি নাও, এক নম্বর রাস্তায় চলি। নিরুপম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হাসি সংগঠন করে এলে, খুব ভালো, কমরেড ভোলানাথদা। আমাদের জেলার শহীদ কমরেড, কনি দ্রোণাচার্যকে হত্যার জবাব দেবার এমন সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। পাঞ্চালীর দিকে তাকায় নিরুপম। পল্টুর দিকে। স্বপনের দিকে। — কমরেডস্। প্রতিটি কমরেডের দিকে চোখ ফেরায় নিরুপম। আমাদের স্কোয়াডে থাকবেন মোট ষোলোজন। কে কে থাকতে চান বলুন?

পল্টু হাত তোলো। পপনও। হাত তোলে পাঞ্চালী।

ভোলানাথের চোখ এড় হয়ে যায়। সে কী?

অসুবিধা কোথায়? নিরুপম বলে।

না, মানে মেয়ে থাকলে অ্যাকশনে টেকনিক্যাল সমস্যা—

আমি তো কম্যান্ডার, এখানে আমার কথাই শেষ কথা হওয়া উচিত, তাই না কমরেড? ভোলানাথ চুপ। নিরুপম মৃদু হাসে। অন্য কমরেডদের দিকে তাকায়। আর কে কে থাকবেন?

বিভিন্ন শ্রান্ত থেকে হাত উঠতে থাকে। যে যাই বলুক সি এম কিন্তু সব কমরেডদের মতো এই ত্যাগ করবার মানসিকতা চারিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখা গেল, ষোলোজনের স্কোয়াডে চারজন শ্রমিক, আটজন ভূমিহীন কৃষক আর চারজন বুদ্ধিজীবী।

নিরুপম বলল, নাঃ খুব ভাল, শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী সবাই এসে গেল অ্যাকশনে। পাঞ্চালী হাসে। ভাল দেয়। ওঁা, একেবারে শ্রমিক নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব!

নিরুপম গোঁজাখণ্ড শুরু করে। কখন পুলিশ ফাঁড়িতে একটু ঢিলেঢালা ভাব? কখন ডিউটি বদল? কোন সময়ে চারপাশে পোকচলাচল কম? পরিকল্পনা শুরু হয়। কারা প্রথমে আক্রমণ করবে? কীভাবে? অন্য কমরেডরা তখন কী করবেন? পুলিশ গুলি ছোঁড়বার সুযোগ পেলে, আমরা কী করব? রাইফেল দখল করে তা অবিলম্বে নৌকো বা মোটরবোটে ওপারে পাঠান সুবিধাজনক? রাইফেল দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হবে কীভাবে? অ্যাকশনের পর স্কোয়াড সদস্যদের নিরাপদ-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে?

সাতদিনের মধ্যে পরিকল্পনা চূড়ান্ত। পাঞ্চালীকে বোঝায় নিরুপম। সময় দুপুর আড়াইটে। প্রথম পাহারাদারকে দুজন অতর্কিতে লোহার রড দিয়ে মারল। একবারে না কাজ হলে, দু গার। সেম্টি মাটিতে। তৎক্ষণাৎ আড়ালে থাকা চারজন ছুটে এসে ওকে জাপটে ধরে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। এবং খতম করল। একই সঙ্গে অন্য দুজনের দল হাসুয়া দিয়ে আক্রমণ করেছে দ্বিতীয় হাবিলদারকে। একই কায়দায় লুকিয়ে থাকা অন্য চারজন দখল নিল। তৃতীয় হাবিলদারের।

দুপুরে পাহারা পাঞ্চালী বুঝতে পারে। নাটকের মতন। হাতে রয়েছে চারজন। তারাও সেখানে ছিল। দুজন মাটি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ফাঁড়ির ঘর লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছেঁতে গেল। ইত্যবসরে বাইরের বারোজনের কাজ শেষ। তাদের ছ-জন থাকল নাকীদ ফায়াকায়। অন্য ছ জন যোগ দিল বোমার দলটির সঙ্গে। ওরা এখন দলজন। এই দলজন এতদূর রাইফেল দখল করবে।

নিরুপম বলল, থানায় অন্তত আট-দশটা রাইফেল আছে। টর্চ পেলে তাও নিয়ে নিতে হবে। লুঠ করা রাইফেল গাড়িতে করে পাঠান হবে লিচুবাগান। ওইখানে থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে গ্রামে।

নিরুপম বলল, তুমি ট্রাউজার শার্ট পরে নিও। — হ্যাঁ, আমি তাই ভেবেছি। পাঞ্চালী মাথা নাড়ে।

নিখুঁত অ্যাকশন ঘটে যায়। দু-জন পুলিশ খতম। বাকি পুলিশ ফাঁড়ি ছেড়ে গঙ্গার দিকে পালাল। আটটি রাইফেল পাওয়া গেল। দু'টি টর্চ। নিরুপম স্লোগান দিল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। পনেরজন প্রত্যুত্তর করল, লাল সেলাম। স্লোগান দিতে দিতে দশ-পনের কদম হাঁটল সবাই।

রাইফেল চলে গেল গন্তব্যে। কমরেডরা চলে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। পাঞ্চালী-নিরুপম ফিরে এল সাহাগঞ্জে। নিরাপদ আশ্রয়ে। ওদের ঠিকানা ভোলানাথ ছাড়া আর কেউ জানে না।

উত্তেজনার শেষে শরীরে অন্যরকম উত্তেজনা বোধ করে পাঞ্চালী। নিরুপমকে জড়িয়ে ধরতেই সেও যেন কী করে পেয়ে গেল শরীরের সেই রহস্যময় সংকেত। নিরুপম উন্মুক্ত করল পাঞ্চালীকে। ধীর লয়ে শুরু হল আলোপ। বিস্তার সইছিল না পাঞ্চালীর। তার যমজ পাহাড়, গোলাপী চূড়া কম্পমান। নিরুপমের স্পর্শে তার দ্রুত কঠিন হয়ে গেল। ভেতরে অগ্নুৎপাত! পাঞ্চালীর উপত্যকায় নিরুপমের ওষ্ঠ। ঘেঁষে করতেই গভীর অরণ্যানী বাঙময়। এবং শুদ্ধ ঋণপথে ফল্গুধারা। আর যে বিস্তার সয় না। বন্ধু এবার তীব্র ঝালার কাজ শুরু কর। আমার অধীশ্বর হয়ে ওঠ, কমরেড। আর যে পারা যায় না। এসো, এসো, এসো।

নিরুপম কথা শোনে। কথা রাখে। ধোরাপ্রপাতে ভেসে যায় পাঞ্চালী। সাদা ব্লটিং পেপারে হলুদ রঙের বিন্দু ছড়িয়ে পড়ার মত প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে যায় অভিগমনের সুখ।

পরদিন ভোলানাথের সঙ্গে মিটিঙ। আরও দু-জন কমরেড থাকবেন। বিষয় অ্যাকশনের বিবরণী।

পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে যায় নিরুপম। দুটি রেড বুকও নেয়।

আমি পাঞ্চালীকে বিয়ে করব। আপনারা সবাই সাক্ষী। ঘোষণা করে নিরুপম।

কমরেড ভোলানাথ নির্বাক। হতবুদ্ধি।

পাঞ্চালীর হাতে রেডবুক তুলে দিল নিরুপম।

পাঞ্চালী বলল, নিরুপম তুমি সজীব, প্রাণশক্তিভরে উচ্ছল, সকালবেলার আটটা-নটার সূর্যের মত.....তোমার উপরেই ভরসা রাখি...

নিরুপম বলল, পাঞ্চালী, আমার হলুদ শাড়ি লাল আঁচিল, তুমিই আমার অর্ধেক আকাশ.....ওই আকাশেই আমার ডানার বিস্তার।



প্রকৃত গৃহ হলো যিদে কমে যায়। নিবারণের কমে গেছে। দিনমানে একবার বাধ্য হয়ে খেতে হয়। ছোটমেয়ে কমলা ভাত-ডাল-তরকারি কিছু একটা নিয়ে আসে। জোর করে। কিন্তু সে খাওয়ার মধ্যে আকাক্ষা নেই। ভাল লাগাও নয়। পরমাস্বীয়রা একে একে সব চলে গেল। প্রথম দ্রোণ। তারপর ধনঞ্জয়। সব শেষে, এই মাস তিনেক আগে এক সপ্তাহের ভোগ করে চলে গেল হৈম। এরপরে আর ক্ষুধা থাকে? আসক্তি? সংসার চালাবার জন্য বাগাটি কপোড়ে কাজ নিয়েছিলেন। মুদির দোকানের কাজও সেজন্যই নেওয়া। সংসারটাই রইল না, চাকরি করে কী হবে? কর্মস্থলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন নিবারণ। গীর্নগীর ছেলে তিনটিকে পড়ানোও ছেড়ে দিয়েছেন। ক্ষুধাহীন, আসক্তিহীন বৃদ্ধের জীবনযাপন ক্রমশ এলোমেলো, খেয়াল খুশির। ভোররাতে উঠে বাগানে সদ্যফোটা ফুলের পাপড়ির বিভার দেখতে ভালো লাগে। দ্রোণের উন্মীলিত চোখ ভেসে ওঠে। ফুল তোলেন না নিবারণ। যে ফুল বস্তুচ্যুত হয়নি তা তুলতে নেই। সে রয়েছে পরাগমিলনের অপেক্ষায়। তাকে যে কেন উপড়ে ফেলে মানুষ! যে পুষ্প মাটিতে পড়ে সেই ঝরে পড়া উপহার গুড়িয়ে নেন তিনি। কুড়োতে-কুড়োতে বৃদ্ধের কোঁচড় ভরে ওঠে। ফুলের সেই সংগ্রহ তিনি একটু একটু করে রেখে আসেন এলাকার পাঁচ ছোট দেবতার থানে। বিগ্রহের সামনে। সবার অলক্ষ্যে। এদাপ্তি নিবারণের মাথায় এই খেয়াল চেপেছে। বাড়িতে পূজো-পাঠ বন্ধ হয়েছে হৈম চলে যাবার পরেই। বাগানে গুলো ওদের তিনজনকেই অনুভব করা যায়। পেয়ারা গাছে দ্রোণ, লেগুন পাড়ার ধনঞ্জয় আর আমলকিতে হৈমের স্মৃতি।

এত দুর্নিপাকের পরেও প্রায়শই সন্ধ্যা দাড়ওয়ালা বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়। নিবারণের স্নাত্তি। কৃষ্ণী নদীর পাড়ে ঘুরতে গেলে দেখা হবেনই।

একদিন হাঁটিতে হাঁটিতে নিবারণ বললেন, আর কী! সবকিছুই তো জ্বলে পুড়ে থাকে হয়ে গেল। এবার আমাদের নিলেই মিটে যায়...

গৃহ উপর নীচে মাথা দেলান। সব বুঝলাম, তবু আশা রেখসূর্য অস্ত যায়নি এখনওস্বপ্ন কখনও ঝরে না।

- বলছ? কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখে যাব? নিবারণ জোরে জোরে মাথা নাড়েন। তাঁর বুক-ছোঁয়া শাশ্রু নিমেষে শরতের কাশফুল। হাওয়ায় দুধারে মাথা নাড়ে। আয়না-বৃদ্ধের দাড়িতেও হাওয়া খেলে যায়। হ্যাঁ গো নিবারণ, স্বপ্ন দেখা ছেড় না। যতদিন বাইরের জগতে ঘুরে ফিরে নেড়াচ্ছ স্বপ্ন দেখতেই হবে। লেবুগাছ যেমন লেবুফুলের স্বপ্ন দেখে, পেয়ারাগাছ ফলের স্বপ্ন।

নিবারণ চুপ করে থাকেন। ওপারের বৃদ্ধ আবার বলেন। কত ফুল তো কুড়িতেই গুণে যায়, কত ফল তো সম্ভাবনা দেখিয়েই নষ্ট হয়। তবু কি লেবুগাছ ফলের স্বপ্ন দেখা ছাড়বে, কিংবা পেয়ারাগাছ তার জীবদ্দশায় ফলের মুহূর্তকে ত্যাগ করে? এল!

নিবারণ হেসে ওঠেন এইবার। তুমি বড় তর্কিক হে, ঠিক জায়গায় যা মেরেছ। আলাপ

জমে উঠলেই, কী করে জানি খবর পেয়ে, কমলা হাজির হয়। কী একা একা বক্বক্ব করছেন! বাড়ি চলুন। বাধ্য ছাত্রের মতো ফিরে যেতে হয় বৃদ্ধকে।

অন্য সব কিছুতে নিরাসক্তি এলেও হিসাব লেখায় আগ্রহ কমে নিবারণের। শৈল আচার্যের হিসাবের খাতা লেখায় নেশা জমে ওঠে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই ১৯৭৩ সালে মাসে হাজার টাকায় সংসার চালান শক্ত। মাসিক খরচ এখন মাঝে মাঝেই দেড় হাজার ছুঁয়ে যাচ্ছে। অক্টোবর মাসের খরচা লিখতে গিয়ে বিগত দুই-আড়াই বছরের দিকে ফিরে তাকালেন নিবারণ। সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ মাসিক খরচ হাজার ছাড়িয়েছিল। ১২২২ টাকা ৯৯ পয়সা। কিন্তু এর মধ্যে পূজোবাজার ছিল ৫৫৩ টাকা ৮৪ পয়সা। ওই সেপ্টেম্বরেই একটা মজার খরচে চোখ আটকে গেল। লোকুলা আই ড্রপ — ১ টাকা ৬০ পয়সা। সেবার বাড়ির অনেকের চোখ লাল, করকর। জয়বাংলা হয়েছিল। একান্তর থেকে ভোজ্যতালিকায় কফি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এরই সঙ্গে ঘুঁটে কেনা অব্যাহত। ৭ অগস্ট ১৯৭১। প্রতিবেশী বাড়ির বিয়ের নিমন্ত্রণে উপহার দেওয়া হয়েছে — আমি মুজিবর বলছি। দাম ৭ টাকা। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে আটদিনের জন্য পুরী বেড়াতে যাওয়া। মোট খরচ ৫৬০ টাকা ৯০ পয়সা। সেপ্টেম্বরে পূজোবাজার ৮১০ টাকা ৪৫ পয়সা। ১৯৭২ থেকেই গড় খরচ এক হাজার ছাড়া। ২৫ ফেব্রুয়ারি বউয়ের জন্য একটা 'ফল্‌স্‌ খোঁপা'। দাম ৩ টাকা ২৫ পয়সা। ১১ এপ্রিল ২ টাকা ৭৫ পয়সার কয়লার গুঁড়ো। কয়লার গুঁড়ো দিয়ে বাথরুমের মেঝে পরিষ্কার হবে। তবে অন্যসব কিছু দাম বাড়লেও জুতো পালিশ এখনও ১০ পয়সা।

একদিন হিসাবের খাতা লেখার সময়ে পাঞ্চালী এল। সঙ্গে একটি ছেলে। পাঞ্চালী বলল, এ নিরুপম....। নিবারণ মুখ তুললেন। পাঞ্চালী আবার বলল, এর নাম নিরুপম চ্যাটার্জী.....ওকে আমি বিয়ে করেছি....

নিবারণ হাসলেন। দূর, ও নিরুপম কেন হবে? ও তো আমার দ্রোণা....। বৃদ্ধের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। চোখ ঘোলাটে। নিবারণের কথা পাঞ্চালী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। নিরুপমও হতচকিত।

শোন, শোন আমার হিসাবের খাতা থেকে পড়ছি, শোন। নিবারণ হাত নেড়ে তাদের বসতে বলেন। ওরা আস্তে-আস্তে ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে। জানিস তো এ বছরের গোড়ায়, ৯ ফেব্রুয়ারি, একটা দারুণ রেডিও কিনেছি। দাম পড়ল ৭৬২ টাকা ৯ পয়সা। হৈম খুব খুশি। ধনঞ্জয়ও। দ্রোণা তো হাততালি দিয়ে উঠেছিল। নিবারণ বলে যান। পাঞ্চালী নিরুপমের দিকে তাকায়। নিরুপম অবাক চোখে মাথা নাড়ে। মাথায় দু-বার আঙুলের টোকা মেঝে বোঝায় নিবারণ অপ্রকৃতিস্থ। নিবারণ আয়তভাবে ধারাবিবরণী দিয়ে যান। সেপ্টেম্বরে, বাড়ির সবাইকে নিয়ে একমাসের জন্য উত্তরভারত ঘুরে এলাম। হরিদ্বার-হাথীকেশ-লছমনঝোলা-দেবাদুন-মসুরি-দিল্লী-আগ্রা-সেকেন্দ্রা-ফতেপুর সিক্রি-মথুরা-বৃন্দাবন। যাতায়াত, খাইখরচ আর ১৮৬ টাকা ৯০ পয়সার কেনাকাটা নিয়ে মোট খরচ ২০১৫ টাকা ১৮ পয়সা।

পাঞ্চালীর চোখে মুখে বেদনা স্পষ্ট। নিরুপমকে উঠতে বলে। আমরা এখন যাই? নিবারণের দিকে তাকিয়ে উঠে পাড়ান পাঞ্চালী।

নিবারণগে উঠে দাঁড়ান। সে কী রে মেয়ে এখনই চলে যাবি?

‘আমাদের একটু’ অন্য জায়গায় যাবার আছে। পাঞ্চালীর মুখে ক্রিষ্ট হাসি। নিবারণ নাগালে গিয়ে পাঞ্চালীর কাঁধে হাত রাখেন। — সবাই ভাবে আমার মাথার ব্যামো হয়েছে..... জেড়ে চলে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ। পাঞ্চালী ঘুরে তাকায়। — নারে মা, তা হয়নি। পাঞ্চালী কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে। নিবারণ থামিয়ে দেন। — আমি জানি এ হিসাব শেল আচার্য্যার, আমার নয়। আমি জানি এ নিরুপম, দ্রোণাচার্য্য নয়। মাথা নাড়িয়ে হাসেন নিবারণ। ঠোঁট নাড়বার সঙ্গে দৃষ্টি স্বাভাবিক। চোখের তারা বিক্মিক করে ওঠে।

কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি রে মেয়ে! একটু আলুসেন্দ্র ফ্যানাভাত খেয়ে পট্ট জেলমেয়ে নিয়ে সংসার করবার স্বপ্ন। আমার এই স্বপ্ন দেখার রোগটা পেয়েছিল দোণা। গৃহ লখা খাস নেন। একবার-দু’বার-তিনবার। ও নিশ্চয় আর একটি দ্রোণার দেখা পেয়েছিল। নিশ্চয় তার সঙ্গে একা একা কথা বলত। সেই টাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও টাদের দেশে চলে গেছে। বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। আমি সব জানি। চোখে জল ভরে ওঠে।

নিরুপমের হাত ধরেন নিবারণ। এর মধ্যেই আমি দ্রোণকে দেখতে চাই। দেখতেও পাচ্ছি। সেই টানা টানা হরিণ চোখ। এমনই দাড়ি রাখত। সবাইকে ভালো রাখার স্বপ্ন দেখত। বৃদ্ধ বলে যান স্বপ্নের কথা।

২১৫ সন্ধিৎ ফেরে। — তা হ্যাঁরে, বলছিল তোদের বিয়ে হয়ে গেছে। কীভাবে করলি? পাঞ্চালী হাসে। আমাদের বিয়েতে তো মাও সে-তুও পুরোহিত। রেডবুক মস্ত্র। কমরেডরা সাক্ষী। খুঁটিনাটি সহ বিয়ের ঘটনা জানায় পাঞ্চালী।

গৃহ বললেন, না রে তোদের ওইসব কেরেন্দাজি চলবে না.....

কেন চলবে না? পাঞ্চালীর ডুক কুচকে যায়। নিরুপম ওর হাতে আলতো চাপ দিয়ে উত্তোজিত ভাবে নিবেশ করে। কিন্তু পাঞ্চালী শোনে না। — বাবা, তুমি তো জান আমরা ওইসব পমীয়া সংস্কার মানি না.....দ্রোণও মানত না।

নিবারণ বললেন, ঠিকই। ঠিক কথা। কিন্তু তোরা তো অন্যের ধর্মাচরণে বাধাও দিতে পারিস না বাপু। নিরুপমের দিকে তাকান বৃদ্ধ। — ঠিক কী না? ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকেন নিবারণ। নিরুপম বলল, ঠিক কথা.....একদম ঠিক।

— অতএব আমি যা করব, বাধা দেওয়া চলবে না। পাঞ্চালীকে টেনে নিরুপমের হামদিকে দাঁড় করান নিবারণ। এইবার দু’জনে একসঙ্গে পা ফেল।

প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে মস্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করলেন বৃদ্ধ।

ঐর্গ্যতোদ্যাপনদান যজ্ঞান্

ময়া সহ ত্বং যদি কান্ত কুর্যাঃ।

নামাজম্যামি তদা ভদীয়ং

ভাষেত নাক্যং প্রথমং কুমারী।।

পঞ্চালীর মস্ত্র। নিবারণ বললেন, তোকে কী এর অর্থ বাংলায় বলে দিলে সুবিধে? আত্মীয়তাবীতে মাথা নেড়ে পাঞ্চালী বলল, হ্যাঁ।

ঐর্গ্যদ্বাভা, ব্রতপালন, দান বা যজ্ঞের উৎসব — এই সবকিছু যদি তুমি আমার সঙ্গে পড়ে কর আমাকে পাদ না দিয়ে কর, অথবা আমাকে একা করতে দিয়ে নিজে দূরে

রইলে, এমনটা না হতে দাও — তাহলে আমি তোমার বামদিকে এসে বসতে পারি।

নিরুপম বলল, আরে! এতো ভাল কথা, আমাদের ভাবনার সঙ্গে খুবই একরকম। নিবারণ পাঞ্চালীর হাত ধরলেন। নে, এইবার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। পাঞ্চালী হাসে।

দেবতাদের ঘি দিয়ে, পিতৃপুরুষদেরকে পিণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তর্পণ করবার সময়ে আমাকে যদি অংশগ্রহণ করতে দাও, তাহলে তোমার বাঁদিকে বসতে রাজি আছি। পাঞ্চালী গলা মেলায়। নিবারণ হাততালি দেন। বাঃ খুব ভাল। এইবার তিন নম্বর।

যদি তুমি আমার ও তোমার দিক্কার আত্মীয় কুটুম্বদের ভরণপোষণ তথা গৃহপালিত ও চাষবাসের পশুদের পরিপালন করবার প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে তোমার বাঁ-দিকে এসে বসতে রাজি আছি।

কপট ভয় পাবার ভঙ্গী করে নিরুপম। উরিঃ বাবাঃ এত পয়সা নেই আমাদের। নিবারণ আমল দেন না। চার নম্বর মন্ত্রের সারার্থ বলেন।

ধান, চাল, টাকা পয়সার আয় ব্যয় আমাদের গৃহে যা কিছু করবে, যদি আমাকে জিগ্গেস করে যা উচিত তাই করতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহলে তোমার বাঁদিকে বসতে রাজি।

দেখেছি তো নারী পুরুষ একেবারে সমান সমান। নিবারণ হাসেন। পাঞ্চালী মাথা নাড়ে। — সত্যি কথা, এ তো আমাদের জানাই ছিল না। বৃদ্ধ চোখ বড় করলেন। তাহলে এবার গড় গড় করে পাঁচ নম্বরটি বলে ফেল। আমাকে অনেক কষ্ট করে মা-বাবা আত্মীয়রা মানুষ করেছেন। একসঙ্গে অনেকদিন বসবাস করলে দু'জন মানুষের মধ্যে একটু-আধটু ঝগড়া হবেই। কিন্তু তুমি কখনও বলতে পারবে না — কী ভুল দিয়েছে তোমার আত্মীয়স্বজনরা?

এই ছেলে। নিরুপম ফিরে তাকাল। নিবারণের চোখে মুখে কৌতুক। এমন কথা কখনওই বলবি না আমার মেয়েকে। নিরুপম হাসল। মাথা খারাপ। প্রাণের মায়া আছে না আমার। প্রতিক্রিয়াশীল বলে খুঁচ করে দেবে!

— ছ'নম্বরটা খুব মজার। জোরে জোরে বল।

পাঞ্চালী বলতে থাকে নিবারণের সঙ্গে। হোমে, যজ্ঞে, বিবাহে, কন্যাদান কালে, ব্রত উদ্‌যাপনে আমি আঁচলে গাঁটছাড়া বেঁধে তোমার বাঁ-পাশে এসে বসেছি — তোমার পুণ্যের অর্ধেক নেব বলে। কিন্তু তোমার পাপ আমি একটুও গ্রহণ করব না। আমার পাপের অর্ধভাগ তোমায় নিতে হবে। যদি রাজি থাক তাহলে এই ষষ্ঠ পদক্ষেপ কর।

নিরুপম বলল, এ কী! মামার বাড়ির আবদার। পুণ্যের সময় আছি, পাপের সময় নেই!

নিবারণ বললেন, বাপু হে হয় আমাদের শর্ত মানো, নাহলে আমাদের মেয়েকে নিয়ে চলে যাব। একা-একা কাঁদতে হবে!

সাত নম্বরে এসে আবার মূল সংস্কৃত মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন নিবারণ।

ন সেবনীয়া পরপূর্বিকা স্যাৎ

ত্বয়া ভবোদ্ভাবিনী ভামিনীতি।

বামাঙ্গমায়ামি তদা ত্বদীয়ং

ভাষেতসা সপ্তমবাক্যমেতৎ॥

অন্য কোনো রমণীকে তুমি আমার থেকে বেশি সেবা বা কামনা করতে পারবে না

গাংগা, সে সুন্দরী বা কামাতরা হোক না কেন! যদি এই কথা দিতে পার, তাহলে তোমার পামদিকে আসব।

নিরুপম বলল, কথা দিচ্ছি! কথা দিলাম।

তেম'র সিঁদুরের কৌটো এনে নিরুপমের হাতে দেন নিবারণ। ওর মাথায় পরিয়ে দে। নিরুপমের চোখে মুখে ঘোর আপত্তি। সে মাথা নাড়ে। — এটা কিন্তু ঠিক নয়, আমরা মানি না এইসব। পাঞ্চালীও বিরক্ত। — আরে! এটা কি বাংলা সিনেমা হচ্ছে নাকি? নিবারণ ডান হাত তোলেন। ভালো কথা, তোরা এইসব মানিস না। সিঁদুর পরবার সংস্কার যেমন তোদের নেই এইটি একদিনের জন্য পরলে বিপ্লবীর জাত চলে যাবে এমন ভাবনাও থাকা উচিত নয়। এরপরে রাখতে চাস রাখবি, নাহলে মুছে দিবি। কিন্তু পরতে পাগা কোথায়?

নিরুপম চট করে কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। বাধ্য ছেলের মতো পাঞ্চালীর কপালে সিঁদুর পরাতে হয়। পাঞ্চালীও চূপ করে থাকে। — বাঃ বেশ লাগছে। নিবারণ হাততালি দেন। নিরুপম, পাঞ্চালী চূপচাপ। বৃদ্ধ অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। তা, হ্যাঁরে তোরা বলেছিলি পঁচাত্তরে দেশ মুক্ত হবে। হবে তো?

পাঞ্চালী বলল, বাবা, একটা কথা জানবেন আমাদের নেতা কমরেড চারু মজুমদার শহীদ হবার পরে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। আমরা থাকি খেয়েছিলাম কিন্তু আবার আমরা খুঁজে পাঁড়িয়েছি,পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

নিরুপম বলল, হ্যাঁ বাবা, হবে পঁচাত্তরে দেশ মুক্ত হবে.....

গৃহ ত্যাগেন। তার পাড়িও হেলে দুলে গেল। হ্যাঁরে, দ্রোণও এমনটা বলত। তোরাও আমার জেলেমেয়ে। আমার সন্তান কখনোই লড়াই থেকে সরে আসে না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। ঘরা লড়াই চালায়।

পাঞ্চালী মাথায় হাত রাখেন গৃহ। কী রে মেয়ে! তখন তুই আমার ছেলেকে নিয়ে আসবি? আসবি তো?

পাঞ্চালী বলল, হ্যাঁ বাবা আসব। নিবারণের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল পাঞ্চালী।

গৃহের দৃষ্টি আবার অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘোরাফেরা করে। চোখ উজ্জ্বলতা হারায়। নিবারণ হাত তোলেন। আঙুল কম্পমান। তার ঠোঁট নড়ে। আসবি? আসবি তো? আসবি তো? আসবি তো?.....



ট্রেনের আগালায় দাঁড়ে এসলে এগিয়ে চলাটা বেশ বোঝা যায়। অজান্তেই, চলমান লোকজনদের গাভ শরীরে, মনে সংক্রামিত হয়। ট্রেন একটু ধীরগতি হলেই বিরক্ত। শৌনলে শৌনলে লক্ষ্য খুঁজে যায় পরবর্তী স্টেশনের দিকে।

শেওড়ারুল থেকে মগরা অবধি প্রতিটি স্টেশনের নাম মুখস্থ নিরুপমের। এমনকী ট্রেনের চলারটিও জানে। দলের কাজে সাহায্য থেকে শেওড়ারুল হয়ে মগরা গাতায়াত

করতে গিয়ে সব কিছু মাথায় ঢুকে গেছে। মগরার পরে আরও দু'জায়গায় থামতে হবে — তালান্ডু আর খন্যান। তারপর পান্ডুয়া। দ্বিতীয় স্টেশন ছাড়লেই সজাগ থাকতে হবে। পান্ডুয়া স্টেশনে নেমে একটু এগোলেই রিক্সার সারি। ওইখানে একজন সবুজ জামা পরা কমরেড অপেক্ষা করবেন। ওদের এলাকার মিটিঙ, কিছু জরুরি। নিরুপমকে যেতে হবে। পাঞ্চালীকেও। ও অবশ্য শেওড়াফুলি থেকে ওঠেনি। চুঁচুড়ায় উঠবে।

পাঞ্চালীর কথা শুনে বেশ কিছুকাল মুখ বুজে আছে নিরুপম। দলের ভেতরে লিন পিয়াও-পন্থী আর তার বিরোধীদের দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠেছে। দ্বন্দ্বের ফাটল দিয়ে উঁকি মারে বিদ্রোহ। বিদ্রোহের হাত ধরে অসহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণুতার প্রশ্রয়ে শারীরিক আক্রমণ। আর একসঙ্গে থাকতে পারল না দুটি মত। আঞ্চলিক-প্রাদেশিক সব স্তরের সম্মেলনে লিন বিরোধীরা দল ছেড়ে চলে গেছে। বর্ধমানের বিনোদ মিশ্র তথা ভি এম আর ভোজপুরের সূরত দত্ত ওরফে জহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন সংগঠন। ওরা প্রো-সি এম মানে চারু মজুমদার পন্থী কিন্তু অ্যান্টি-লিন। সুকান্তিদা ইতিমধ্যেই ভি এম-দের সঙ্গে। কমরেড ভি এম আর কমরেড জহর দুজনেই ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে।

জেলার সম্মেলনের সময়ে নিরুপমও দল ছেড়ে জহরদের দিকে যেতে চেয়েছিল। কারণ ছড়ানো ছোটন কমরেডদের ফিরিয়ে এনে মহাদেব মুখার্জি যে দল গড়েছেন, চারু মজুমদারপন্থী সেই মূল দলটি লিন পিয়াওয়ের পক্ষপন্থী প্রো-লিন হয়েই রয়ে গেল। তাদের কথায় চারু মজুমদার শ্রদ্ধেয় নেতা, সরোজ দেব পাট্টির নেতা আর মহাদেব মুখার্জি ওরফে ছোড়দা অন্তরের নেতা। এই দল শ্রদ্ধেয় নেতার নিজের হাতে গড়া পার্টি। লিনপন্থীদের কাজকর্ম সমর্থন করা যায় না। এতকিছুর পরেও ওদের লক্ষ্য সেই পুরনো, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া পথ। একমুঠে গেরিলাযুদ্ধই জনগণকে সংগঠিত করতে আর জনযুদ্ধে शामिल করতে পারে। লিন পিয়াওয়ের এই কথা তারা বারে বারে আউড়ে যাবে। গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি যদি মানুষকে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে নামাবার আরও উপায় পাওয়া যায় এখনকার এই ভারতবর্ষে তাহলে কী সেই সুযোগ কাজে লাগান হবে না? পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বন্দিমুক্তির পক্ষে রাস্তায় মিটিঙ মিছিল করলে এখনও শহরের সাধারণ শিক্ষক, অফিস কর্মচারীদের পাশে পাওয়া যায়। তাহলে কী সেই আন্দোলন করা হবে না? পাঞ্চালীকে বিস্তারে বুঝিয়েছে নিরুপম। প্রকাশ্য আন্দোলনেরও দাম আছে। কিন্তু দলের মধ্যে এইসব কথা বলা মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে বলা হবে তুমি সংশোধনবাদী। অমুকের দালাল, তমুকের দালাল। ইদানীং বলা হচ্ছে পুলিশের চর। লিন পিয়াওঁর কথা বললে পার্টির শেলটার পাওয়া যাবে না। তোমার সম্পর্কে সবাই মতো সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। গতকাল যারা বন্ধু ছিল তারা আজ থেকে তোমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করবে।

— দলের মধ্যে কিছু উলোর পাগল জুটেছে। তার সঙ্গে গুপ্তপাড়ার বাঁদর আর হালিশহরের তেঁদড়। পাঞ্চালী হেসে ফেলল। সে আগার কী?

নিরুপম বোঝাল। উলো, গুপ্তপাড়া আর হালিশহর এই তিনটি জায়গার এই তিন বৈশিষ্ট্য।

— পাগল আর বাঁদর না হয় গোপা গেল, কিন্তু তেঁদড়?

— জান না? হালিশহরে পাচুর মৃগন্দর লোকজন, তার ওপর মদ্যপওরাই তো

উপকামি করে। এই বজ্রাত লোকগুলোই বিরুদ্ধ-মত সহ্য করতে পারে না। ভিন্নমতাবলম্বীদের নামে তারা কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। অথচ তাদের উচিত ভিন্ন মতের কমনসেন্স আপন করে নিয়ে কথা বলা। একবারে না বুঝলে বারে বারে বোঝানো, বারংবার বোঝানোর চেষ্টা করা। সামনে তো মাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। নিরুপম বলে যায়। একজনকে মিছেদের মত পথ বোঝাতে না পেরে মাও সে-ভুঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টিলের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

কমরেড, একে অনেক বোঝালুম কিন্তু সে কিছুতেই মানতে চাইছে না আমাদের কথা। মাও বললেন, আগার বোঝাও....

যদি না মাও?

আগার বোঝাও

তারপরেও যদি না বোঝে?

তারপরেও বোঝাও

তারপরেও যদি.....

তারপরেও.....

পাক্ষালীল দিকে তাকাল নিরুপম। বোঝাবার পথে না হেঁটে ভিন্নমতাবলম্বীকে পুলিশের দালাল বলা কি ঠিক? পাক্ষালী দুদিকে মাথা নাড়ল। না, একেবারেই উচিত নয়।

তাৎলে তুমিও দল জড়, চল দুজনেই ডি.এম. জহরদের দলে যোগ দিই.....

হ্যাঁ-সিএম.... হ্যাঁ-ডিএম।

পাক্ষালী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নিরুপম আমি অনেকবার ভেবেছি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। মনস্থির করবার ক্ষমতা যদি থাকত তবে হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আটকেছ দ্রোণের স্মৃতি। ও এক অস্বাভাবিক লিন পিয়ার আর তাকে মধ্যমাগের কথা বলত। লিনকে অস্বীকার করা মানে সি.এম.কে অস্বীকার করা। পাক্ষালী একটু খামে। ঠোঁট কঁপে ওঠে। আবার নিরুপম বিশ্বাস কর দ্রোণের স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাকলে..... আমি গৃহি, তুমি একা হয়ে থাক, খুব একা। তখন জীর্ণ কর হয় যে..... খুব কষ্ট। পাক্ষালীল চোখ অশ্রুময়। আমি যেন একই জ্বলন্ত তলায় দুই শূন্যের সঙ্গে এসবাস করছি... দুজনকেই যে আমি ভালোবাসি..... একজনকেও ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। গভর্নমেন্ট বেয়ে ধারা নামে হলুদ পাড়ার নিরুপম আর দল ছাড়তে পারল না তখন।

ট্রেনটা একটু ঝাঁকনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বেশিক্ষণ নয়। দু-মিনিট। হুঁচুড়া স্টেশন যোকবার আগে কখনও এমন হয়। স্টেশনে ঢুকতেই পাক্ষালীকে দেখতে পেল নিরুপম। ডাকল না। ডাকটা নিরাপদ নয়। দু-চারটে লোকের নজরে ঠিক পড়ে যাবে। পাক্ষালী মনুটি খুঁট মিটানো। দ্রোণকে ভালোবেসে লিন-পক্ষে আছে এবং দলের প্রতিটি কর্মসূচিতে ধোঁগ দেয়। এজন্য ওর ওপর গভীর শ্রদ্ধা নিরুপমের। কমরেড ছোড়দা পাক্ষালীকে ঘেঁষ করেন খুব। ছোড়দার উদ্যোগেই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হয়ে গেল। ৬ নভেম্বর ১৯৭৩। জেলা প্রশাসন। থানা জামালপুর। গ্রাম কামালপুর। এই গ্রামে নিয়মিত এসেছে নিরুপম। থেকেওছে তিন চারদিন করে। পাণ্ডুয়া থেকে বাসে চেপে কিছুটা। তারপর কোকিল আলপথ ধরে টাটা। অন্য সহজ রাস্তাওতেও যাওয়া যায় কিন্তু আলপথ ধরে যাওয়া

নিরাপদ। নজর এড়ান যায়। পার্টি কংগ্রেস নিরাপদে, মসৃণভাবে উৎরে গেল। সে সময় প্রায় একশোজন সদস্য ওই গ্রামে। এক সম্পন্ন কৃষকের মাটির বাড়ির দোতলায় আলোচনা চলছে, স্লোগান দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পুলিশের কানে পৌঁছচ্ছে না সে খবর। বড় রাস্তায় সি আর পি টহল দিচ্ছে কিন্তু কারও মনে সন্দেহ জাগেনি। যদিও বাড়িটা আরও কয়েকটি বাড়ি দিয়ে ঘেরা কিন্তু গ্রামের মানুষের সাহায্য ছাড়া এ সম্ভবই হত না। অত লোকের খাবারের ব্যবস্থা, চালের জোগানে তো ওই মানুষের সক্রিয় সমর্থন ছিল। এক জোতদারের ধানের গোলা দখল করা হল। হয়ে গেল চালের ব্যবস্থা। আদিবাসী কমরেডরা মহিষ বলি দিলেন। মোষের মাংস আর ভাত। একেবারে খোশখোরাক। সবাই আনন্দ করে খেয়েছিল। সবাই প্রশংসা করেছেন এই নিরাপদ ব্যবস্থার। বিহারের কমরেড সুরজ বলল, আরে এবার তো এখানে গণফৌজও গড়ে উঠবে। অস্ত্রের রামান্না সমর্থন করেছিল ওকে। এতো সস্তরের শ্রীকাকুলাম বানিয়ে ফেলেছ! নিরুপম শ্লাঘা বোধ করেছে। এলাকাটিতে সংগঠন গড়েছে মূলত দুজন — নিরুপম আর বাচ্চু।

পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করল সবাই। কমরেড ছোড়দার ভাষায় — বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের রিপোর্ট এবং অভিজ্ঞতার সার সংকলন। কাজের অভিজ্ঞতা, লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনা চলল কিছুক্ষণ। ছোড়দা বললেন, কমরেডস্ আমাদের গণমুক্তি ফৌজ আজকে আর এক জায়গায় বসে থাকবে না। তাদের ক্রমাগত চলমান থাকতে হবে এবং ওই অবস্থাতেই বারবার আক্রমণ করে যেতে হবে চলমান শত্রুকে। সভার মূল বক্তব্য — শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চন্ডি মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি, কৌশল, পথ সব একেবারে ঠিক। কোনো ক্রমাগত আলোচনা নয় আগামীতে ওই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। লিন পিয়াও বিরোধীরা সমাধিবাদী। এদের বিরুদ্ধে লড়াই না করলে বিপ্লব এক কদমও এগোবে না। ভোলানাথ মন্তব্য করলেন, ছোড়দা, শুধু তাত্ত্বিক লড়াই নয়, যে ক'জন এখনও দলে আছে, ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে। ছোড়দা হাসলেন। প্রশ্নের হাসি। নিরুপম বলে ফেলল, মতের সঙ্গে মতের দ্বন্দ্ব চলতে পারে, চলা উচিত, কিন্তু গায়ের জোর কেন? আবার একটা মারামারির জায়গা হয়ে গেল। ছোড়দা চোখ বড় করে তাকালেন। সে চোখে যুগপৎ বিস্ময় এবং ভর্ৎসনা। বললেন, এ ক্ষেত্রে লড়াই না করাটা উদারতাবাদ। এর উত্তরও নিরুপম দিতে পারত কিন্তু চাপ করে গেল। ওই যে, পাঞ্চালীর নিষেধ! ছোড়দাও খুশি। মূল বক্তব্য ফিরে গেলেন। সেই এক, পুরনো কথা। নিরুপমের ভাল লাগছিল না। কিন্তু তার ওপর বিবরণী লেখার দায়িত্ব। শুনতেই হবে।

কাজের দায়িত্ব ভাগ শুরু হল। আসাম, ত্রিপুরার দায়িত্বে — কমরেড নবীন, কমরেড সুদেবদা। অন্ধ্র — কমরেড রামান্না, কমরেড অলক। বিহার — কমরেড বাবুলাল। উত্তরপ্রদেশ — কম সুরজ। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লি — কম ছোট্টা, কম সুদেবদা। নিরুপম একটু থমকে গেল। প্রথা অনুযায়ী সবার নামের আগেই 'কমরেড' বা 'কম' লিখলে চলে যায়। কিন্তু ছোড়দা আবার তাঁর নামের আগে শ্রদ্ধেয় না লিখলে ক্ষুণ্ণ হন। তার ওপর উনি আবার দলের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। 'কম'-এর আগে তিনটি অক্ষর ধরাবার মতো জায়গা নেই কাগজে। কি করা যায়? মুহূর্তে সমাধান করে ফেলল নিরুপম। নতুন সম্বোধনটির একটু বিচিত্র চেহারা — শ্র/কম! তাতে ক্ষতি নেই। কাজ চলে যাবে।

উজ্জলপদ্মের দায়িত্বে কম, সলিল আর কম, অচিন। এদের দুজনকে সাহায্য করবার তার দেখাও তল নিরুপমকে। কোনো প্রতিক্রিয়া জানাল না নিরুপম। তার কিছু বলার নেই। 'অতএব মাথা নিচু করে পাতায় আঁচড় কাটা। ছোড়দার মুখের ওপর কথা বলার মল। পাঞ্চালীর থেকে তাকে যথাসম্ভব আলাদা রাখার ছক।

ছোড়দা ঘোষণা করে যেতে থাকলেন। সম্পূর্ণ বাংলার দায়িত্ব — কম অনিলদা, বিনয়দা আর কম অলকের। কেরল কম রামাম্মা। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় কমরেড ছোড়দার। ওর সাভাষাকারী হিসাবে — কম সলিলদা, কম সুরজ আর কম বাবুলাল। দেশব্রতী, লিবারেশন, লোকস্বাক্ষর আর রেড ফ্ল্যাগ — এই চারটি পত্রিকার দায়িত্বে কম বিজুতিদা, কম সুদেবদা আর কম অলক। এদের তত্ত্বাবধান করবেন — রেসপেক্টেড কমরেড ছোড়দা। ছোড়দা মাথা নেড়ে বললেন, রাজনৈতিক মান আরও বাড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ুটি অচিন হারুদা-মুন্সিন্দার মধ্যে সংক্রামিত হল। ওরা মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল ছোড়দাকে। নিরুপম লিখে চলল — 'কম সুরজের উপর দায়িত্ব, তিনি বিহারের সশস্ত্র সংগ্রামের রিপোর্ট পাঠাবেন এবং তা অবশ্য পার্টির মুখপত্রে ছাপতে হবে। লিবারেশনের ইংরেজি লেখা তেলুগুতে অনুবাদ করে রেড ফ্ল্যাগ-এ ছাপানো হবে। এই কাগজটি ছাপান, রিপোর্ট পাঠান, সব কিছুর দায়িত্বে কমরেড রামাম্মা। উর্দু আওয়ামী জং প্রকাশ করবার দায়িত্ব নোবেল কম সুরজ।'

পাটি কংগ্রেসের পরেই সলিল আর অচিনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যেতে হল। নকশালবাড়ির লক্ষ্মীজোতে কম গজেন সিং এর বাড়িতে গোপন সভা। এই অঞ্চল নিরুপমের মোটামুটি চেনা। দুপুরবেলা গজেনের ছোট ছেলে বৃষ্টি আরল গত রাতে বীর সিং জোতে পুলিশ চারদিক ঘিরে ডাকাণী চালিয়েছে। লক্ষ্মীজোতের আলপাশেও পুলিশ জমছে। খবর দিয়েই জেনেটা দৌড়ে লাগিয়ে গেল ট্রান্সিক ওল পালাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে গজেনের যাওয়া অসম্ভব। একে রাস্তা অনুসন্ধান দেখলে পুলিশের সঙ্গেও গাড়েন। আলো থাকতে নেই ওল দল লড়বার সম্ভাবনা। রাষ্ট্রের চপচাপ অগাধ চলে যেতে হবে।

অন্ধকার গা ওল নিরুপমরা বোরিয়ে লড়ল। কিছুটা হেঁটে লিঙ্কেন তাকাতই নজরে এল দু দ্বারে বেশ কিছু টর্চের আলো। বাম দিকের আলো দৌড়ছে। ডান দিকেও দৌড় চক ওল। সলিল অবাক হয়ে গেল, এ আবার কী? অচিন বলল, ওদের ঠান্ডা লাগছে, সেজনা গা গরম করছে মনে হয়। নিরুপম মুহূর্তে বুঝে গেল ব্যাপারটা। ওরা আসলে পুলিশ। দু দিকে দুটি দল। পরস্পরকে টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত দিয়ে দৌড়ছে। গ্রাম ঘেরাও করবার পরিকল্পনা। কিছু পরেই ডান এবং বাম দিকের পুলিশ বাহিনী জুড়ে যাবে। গড়ে উঠবে নিখুঁত বৃত্ত। বুঝিয়ে বলতেই সলিল, অচিন দুজনেই ঘাবড়ে গেল। কী হবে এখন? আমাদের সঙ্গে তো বন্দুক-পিঙ্কল কিছু নেই। তা ছাড়া রাস্তাও ভালো চেনা নেই এখানে। নিরুপম বলল, শীগগির দৌড়ও...ডান আর বাঁ মেলবার আগেই এদের ফাঁক দিয়ে বেগোতে হবে। রাস্তা নিয়ে ভেব না। আমি যে দিকে যাচ্ছি, সেই দিকে এস। দৌড় আরম্ভ করতেই দেখা গেল ডান আর বাম দলের প্রথম পুলিশটি মশাল জ্বালিয়েছে।

সক আলপথ, মাটির রাস্তা ধরে দ্রুত দৌড়নো শুরু। কিছুটা দৌড়ে লিঙ্কেন তাকাল নিরুপম। ওরা লিঙ্কিয়ে পড়েছে। নীচু কিন্তু তীব্র গলায় ডাকল নিরুপম। জোরে, জোরে।

ওই দুই মশালের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে বেরোতে হবে। সরু রাস্তায় পাশাপাশি তিনজন তো নয়ই দু'জনেও দৌড়ান যায় না। সলিল, অচিন এলোমেলো পদক্ষেপে দৌড়ছে। এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বার সম্ভাবনা। একজনও পড়ে গেলে গ্রেপ্তার অবধারিত। এবং গ্রেপ্তার হলে থানা অবধি আর যাওয়া হবে না। তার আগেই, এই জোতের মধ্যে গুলি করে ফেলে রেখে সংঘর্ষের গল্প ফাঁদবে পুলিশ। ওদের মনে সাহস দেওয়া দরকার। দুই কমরেডকে সামনে দিয়ে ওদের ঠিক পিছনে রইল নিরুপম। ভয় পেয়ো না কমরেড। দৌড়ে যাও....আমরা এই ঘেরাও ভেঙে বেরোবোই। মাথা ঠান্ডা রেখে দৌড়ে যাও। এখানকার সব রাস্তা আমার চেনা। তোমরা ভেব না একদম।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছিল। তবু ওরা ক্ষেতের জমি, বাঁশঝাড় পেরিয়ে ছুটল। এখানে বাঁশঝাড় মানেই কয়েকটি চালাঘরও থাকবে কিন্তু সেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। ঘেরাওয়ে পড়ে যাবে। দূরে চলে যেতে হবে। আরও কিছু দূরে। দুটি মশালের ব্যবধান যখন প্রায় একশো ফুট, তিনজনেই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সামনেই বাঁশঝাড় এসে পড়ায় আড়াল নিয়ে দৌড়তে সুবিধা হয়েছিল। তা ছাড়া পুলিশ হয়ত ভেবেছিল শুধু লক্ষ্মীজোতই ঘিরবে। গ্রামে তল্লাশী চালিয়ে নকশাল পাকড়াও করবে। অর্থাৎ রাস্তিরে গোপন সভার খবর ওদের কাছে ছিল। ভেতরের কেউ বলে না দিলে তো এমন হবার কথা নয়! যাইহোক, সে রাতে কোনোক্রমে পৌঁছান গেল ঢাকনা জোতের নিরাপদ আশ্রয়ে।

বুকে হাত রাখল নিরুপম। ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। সেদিনের কথা ভাবলে এখনও উদ্বেজনা হয়। ট্রেন আদিসপ্তগ্রামে ঢুকছে।

সমস্ত ঘটনা শুনে পাঞ্চালী বলেছিল, যাক, এবারেও বেঁচে গেলে.....এই নিয়ে দু-বার.....। বুক চিতিয়ে হেসেছিল নিরুপম, আমরার তো ইচ্ছামৃত্যু.....মারা অত সহজ নয়.....। পার্টি কংগ্রেসের কথায় নিরুপম হেসে কুটোপাটি। তোমার প্রিয় কমরেড শ্রদ্ধেয় ছোড়দা যা ভাষণ দিয়েছেন না একথানা....একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে।

‘শ্রদ্ধেয় নেতাকে ধরে রেখেছি, হারাই নি কখনও। শ্রদ্ধেয় নেতার স্বপ্ন আজ বাস্তব। আমাদের এই মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পাচ্ছি পঁচাত্তর সালকে। শ্রদ্ধেয় নেতা আছেন, পঁচাত্তর সালের সূর্যের আলো বিকিরণ করছেন। শ্রদ্ধেয় নেতাকে মানা মানে বিজয়, না মানা মানে পরাজয়। কমরেডস্ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কোথায় সংশোধনবাদ লুকিয়ে আছে। সংশোধনবাদকে লড়াই না করে, তাকে পরাজিত না করে এক পা-ও এগোন যাবে না। কমরেডস্, শ্রদ্ধেয় নেতার রাজনীতি মানে আত্মত্যাগের রাজনীতি। রক্তঝরা পথই তো বিপ্লবের পথ। রক্ত দিতে হবে আরও। আসুন প্রতিটি মুহূর্তকে শক্ত হাতে কষে ধরে গ্রামাঞ্চলের মুক্তাঞ্চলকে সুদৃঢ়, সফল করে তুলি। সফল করে তুলি শ্রদ্ধেয় নেতার ৭৫-এর মহান স্বপ্নকে। জয় আমাদের হবেই কেন না শ্রদ্ধেয় নেতা বেঁচে আছেন দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কাঁধে রাইফেল হয়ে। জয় আমাদের হবেই কেন না চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।’

নিরুপমের হাত পা নেড়ে বপার গগনে পানপাণী হেসে ফেলল। ধ্যাঃ এমন করে বলেছেন?

— না তো কী! পুরো যাএপালার ভাষণ... ভোলানাথ অপেরার ‘বিপ্লববর্হি ছোড়দা’!

পাঞ্চালী বিনয় হল। এমন করে এ'ল না....উনি তো আবার চেঁচা করছেন খুব।.... নিরুপম
খামল না। যে লোকটি আনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছে তার সম্পর্কে আমার
কোনো মত নেই। পাঞ্চালীর চোখে প্রশ্ন। উত্তরবঙ্গে গিয়ে যা শুনে এসেছে নিরুপম,
সব বলল পাঞ্চালীকে। চারু মজুমদার শহীদ হবার পর বিশুদ্ধ অবস্থার সুযোগ নিয়ে
কাকের সঙ্গে আলোচনা না করেই উনি কেন্দ্রীয় কমিটির একমাত্র সহযোজিত সদস্য জগজিৎ
সিং সোহল ওরফে শর্মাকে দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকান ৫ আর ৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
শর্মা হয়ে যান কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। এবং নিজের রাজ্য কমিটির সদস্য থেকে হয়ে
যান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এরা দুজনে অত্যন্ত আনৈতিকভাবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ
না দিয়ে সুনীতি ঘোষকে দল থেকে বহিস্কার করে। নিজেদের বানানো এই কেন্দ্রীয় কমিটিকে
এরা বলে কেন্দ্র নেতার হাতে গড়া কেন্দ্রীয় কমিটি। তারপরের কথা তো সবার জানা।
শর্মা অ্যান্ড লিন বলে তাকে বিদায় করা হল। তার জায়গাটি এইবার নিলেন ছোড়দা।
পাঞ্চালীর মাথা নীচু। নিরুপম বলল, অনেক হয়েছে আর নয়, এইবার দল ছাড়তে হবে।
পাঞ্চালী মুখ তুলে তাকাল। চোখে শঙ্কা। নিরুপমের চোখ চঞ্চল। দেখ তোমার সঙ্গে
আমার আলাপ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। সেই নীতির প্রস্নে আর সমঝোতা চলে না।
আর নীতির বালাই না থাকলে তো সব ছেড়ে ছুড়ে দুজনে মিলে নিরাপদ কোনো প্রান্তে
সংসার পাতলেই হয়। পাঞ্চালীর মুখে বিষণ্ণতা। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল,
আর কয়েকটা দিন দেখে নাও.....এইবার না হয় একটু আধটু বোঝাবার চেষ্টা কর
ওদের....তারপর যা ভাল বোঝা.....দেখ....। শুধু হতাশ স্বর শুনে কষ্ট হল নিরুপমের।
ঠিক আছে, আর কিছুদিন দেখা যাক।

পাণ্ডুয়াতে মেমে স্টেশন থেকে বেরিয়েই সবুজ-জামা কমরেডকে দেখা গেল। ওর
সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিরুপম। ডান হাতের মুঠি উঠে এল বুকের কাছে। মৃদু গলায় বলল,
আর এস। এখন আর প্রকাশ্যে রোড স্যালাউট বলা নিরাপদ নয়। কিন্তু দেখা হলে কমরেডকে
মে লাল সেলাম জানাতে ইচ্ছা করে। এজন্যই রোড স্যালাউটের সংক্ষেপিত রূপ 'আর
এস'। এবং হাতের মুঠি উপরে না ছুঁড়ে, তা আলাপ করে রাখা ভূমির সমান্তরালে। বুকের
উপর। অযোযিত এই নিয়মই চালু এখন। সবুজ-জামা প্রত্যাভিবাদন করল। আর এস।
চলুন কমরেড। একবার পিছনে দেখে নিল নিরুপম। পাঞ্চালীও ঠিকঠাক নেমে পড়েছে।
একটু এগিয়ে পিছিয়ে দু'জনেই পৌঁছে গেল গন্তব্যে।

ঘরের মধ্যে ভোলানাথ, মনোতোষ, প্রবীর, অখিল, পুলক ছাড়াও পাঁচজন মহিলা
কমরেড সুদেবী, জয়ন্তা, মীনাঙ্গী, জবা আর রুবি। মিটিঙ শুরু হল। নদীয়া জেলায়
দুরন্ত আকর্ষণ হয়েছে। জেলা আঞ্চলিক কমিটির ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখের ইস্তাহার
জায়ে এসেছে মাত্র ক'দিন আগেই। কমরেড ভোলানাথ পড়তে শুরু করলেন। রাণাবঙ্কের
দীর গণমুক্তি, কৌজ লাল সেলাম.....। লিফলেট বলছে, ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়
নদীয়া জেলার চাপড়া থানার রাণাবঙ্কে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে চলমান গণমুক্তি
কৌজ আক্রমণ করলে চলমান শত্রু বাহিনীকে। কুখ্যাত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একজনকে
বন্দন ও একজনকে জখম করে জিনিয়ে নিলেন দুটি রাইফেল ও ১০০ রাউন্ড গুলি....

নিরুপম বলল, দুটো রাইফেল ঠিক আছে। কিন্তু একশো রাউন্ড গুলি? কীরকম আকর্ষণ

লাগল। নির্ঘাৎ বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। দুজনের কাছে মোট কুড়ি-পঁচিশ রাউন্ডের বেশি থাকার কথা নয়।

ভোলানাথ হাত তুলে থামতে বললেন নিরুপমকে। ইস্তাহারের দিকে মাথা ঝাঁকান। কম্পিত কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়ে গেল। ...এরা বদলা নিলেন শহীদদের, সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন লিন পিয়াওয়ের নির্ভুল গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বকে, কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের অস্ত্র সজ্জিত করলেন। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকেরা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ও পরিকল্পনায়, নিজেদের সৃজনী প্রতিভা দিয়ে চলমান শত্রুর উপর আক্রমণের সূচনা করলেন। পালন করলেন শ্রদ্ধেয় নেতার মহান নির্দেশ।

পড়া শেষ হয়নি কিন্তু ভোলানাথ থেমে নিরুপমের দিকে তাকালেন। যারা লিন-বিরোধী, সংশোধনবাদী তারাই এমনভাবে নিজেদের কমরেডদের অবিশ্বাস করে। আর চূপ করে থাকতে পারল না নিরুপম। যা হবার হবে। —হ্যাঁ, এটা ঠিকই, আমার লিন পিয়াওয়ের পথ নিয়ে এখনও সংশয় আছে, ওর রাস্তা ভুল অণ্ড মনে হয় কিন্তু তার সঙ্গে এই লিফলেটকে অবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন তো হতেই পারে কমরেডরা উৎসাহের মাথায় সাফল্যকে বড় করে দেখাচ্ছেন। আমরাও তো অনেক সময়েই বাড়িয়ে বলি...। ভোলানাথ যে কোনো উপায়েই নিরুপমের সঙ্গে ঝগড়া লাগাবেন। — আমরা লিন-বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করে ছারপোকার মত টিপে ধরার মারব। নিরুপম চূপ করে গেল। এ কথার উত্তর দেওয়া অর্থহীন।

ইস্তাহার পড়বার শেষে ভোলানাথ ঘোষণা করলেন, কমরেডস্ আজ এক অন্যায়কারীর বিচার হবে। বস্তুত, আজকের সভা সেজন্যই ডাকা হয়েছে। পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ভোলানাথ হাঁক পাড়লেন, অজয়.....

কমরেড অজয় ঘনশ্যামদাকে টিপে ঘরে ঢুকল। নিরুপম হতবাক। পাঞ্চালীর দিকে তাকাল একবার। সেও হতভম্ব। ঘনশ্যামদার বাড়িতে দুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল জবা আর রুবি। রুবির সঙ্গে অতীব অশালীন ব্যবহার করেছে ঘনশ্যাম। জবা সাক্ষী। ভোলানাথ খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন সব কিছু। — রুবি বল, বল, ঠিক কি হয়েছিল? কবে হয়েছিল? কেমন করে হল? রুবি উত্তর দেয়। জবা মাথা নেড়ে সত্যতা জানায়। ঘনশ্যাম চূপ। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছে।

তদন্ত শেষে ভোলানাথ তাকালেন ঘনশ্যামের দিকে। — কী তোমার কিছু বলার আছে? উত্তর এল না। ঘনশ্যাম দোষী। ভোলানাথ রায় দিলেন। এর কী শাস্তি হওয়া উচিত? বাম দিকের প্রান্তে চোখ রাখলেন ভোলানাথ। সুদেয়গা বলল, খতম। জয়শ্রী বলল খতম। মীনাঙ্কী বলল, খতম। ভোপানাথের চোখ ঘুরে চলল। পুলক বলল, খতম। অখিল বলল, খতম। নিরুপম একমত। ওখাড়া অন্য কোনো শাস্তি হয় না.....আর এই শাস্তিটা আমি দেব।

— তোমাদের সব ঋতমের নেশায়া পেয়েছে। পাঞ্চালীর গলা। ওর মুখ লাল। চোখ চঞ্চল। নিরুপমের চোখে বিষম। পাঞ্চালী থামল না। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাদের সব খুন, খুন করবার নেশা চেপেছে। ভোলানাথের দিকে তাঁর চোখে তাকাল পাঞ্চালী। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো শেপটারে একমাত্র থাকার সময় কখনও কোনো মহিলা কমরেডের

মাথাটা তাকান নি। ভোলানাথ চুপ। এখন যেভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ছিলেন রুবিকে, তার মধ্যেও কী একটু মৌন ঝগড়া পাবার ইচ্ছা ছিল না? ভোলানাথ কিছু একটা বলবার চেষ্টা করতেই পাখালী বলল, একটু সময় নিয়ে ভেবে বলুন। আমি কিন্তু আমার কথা প্রমাণ করতে পারি। ভোলানাথ গুটিয়ে গেলেন। অন্যদিকে মুখ ফেরাল পাখালী। কী অখিল? পুলক? মাথা বল, কখনও অন্যমনস্কতার ভান করে কোনো মহিলা কমরেডের পশ্চাদ্দেশে হাত গুলোও নি? কিংবা প্রশংসা করতে গিয়ে পিঠে হাত ঘষে, বাসনা মেটাও নি?

তাহলে কী এই লোকটার কোনো শাস্তি হবে না? সুদেষ্ণা বলল। ওর চোখে মুখে ঐরাবী। ভয়শ্রী মাথা নাড়ল। — অশালীন আচরণ করে ছাড় পেয়ে যাবে?

কেন? খণ্ড ছাড়া কী অন্য কোনো কঠিন শাস্তি দেওয়া যায় না? মাথা ঝাঁকাল পাখালী। খানখানামের মৃত্যুদণ্ড রদ হল। ঠিক হল, ওকে নির্বাসনে পাঠান হবে বীরভূমের গ্রামে। সেখানে পার্টির আশ্রয়, সংযোগ কোনো কিছু সে ব্যবহার করতে পারবে না। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাকে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পার্টির সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

ফেরার সময় ওরা চারজন। নিরুপম পাখালী আর মনোতোষ নামবে ব্যান্ডেল। প্রবীর শেওড়াফুলি। মনোতোষ ব্যান্ডেলে নেমে স্টেশন থেকে ওর সাইকেল নিয়ে কয়েকটি কাগজ বিলি সেরে ফিরবে চুঁচুড়া।

ব্যান্ডেলে নামতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্তির। তিনজনেই চলল ডানলপ কারখানার দিকে। রাস্তায় কোথাও একটা চা খাওয়া যাক, বলল পাখালী। টায়ের দোকানের কাছাকাছি আসতেই থমকে গেল নিরুপম। আশপাশটা অন্যদিনের মতোই লাগছে না। রাস্তার অনেকটা অন্ধকার। দূরে তিন চারটে সাদা গাড়ি। একটা জীপও আরও দূরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। এ রাস্তায় তো এত গাড়ি থাকে না!

হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল পাখালীর কাছে। হাঁপরে তপন বল, পাখালী বলল। দিদিমণি তোমাদের থাকার জায়গায় পুলিশ। পাখালী ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ঠিক আছে। তোর বাবা কোথায়? রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে গেছে। যাবার আগে আমায় এখানে দাঁড় করিয়ে গেল। বলল, দিদিমণি আসলেই খবর দিবি। ঠিক আছে, যা। ছেলেটা আস্তে আস্তে চলে গেল।

অবিলম্বে পালাতে হবে। কিন্তু কোথায়? মনোতোষ বলল, চুঁচুড়ায় গেলে হয়তো একটা গাবস্থা হতে পারে। ভোলানাথদাও আছেন ওইখানে। আলোচনা করে নেব —। নিরুপম থামিয়ে দিল। আর ভাবার সময় নেই। এখনই যেতে হবে।

মনোতোষের সাইকেলটা নিল নিরুপম। সামনের রডে বসাল পাখালীকে। মনোতোষ ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাবে চুঁচুড়া। ওদের জন্য অপেক্ষা করবে খাদনে মোড়ে।

এ টি রোড ধরে সাইকেল চলল। খুব জোরে চালালে অনর্থক লোকের নজর পড়বে। মশাগাট ভাল। চল্লিশ মিনিটের মাথায় চুঁচুড়া পৌঁছে গেল ওরা। খাদনে মোড়ে মনোতোষ পাড়িয়ে।

গামাধিক গাংগা ইঙ্গিত করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল মনোতোষ। বাঁদিকে তোলা ফটক। চালশাশের গাড়িগুলি সব দোতলা তিনতলা। মাঝের দু-তিনটি একতলা বাড়ির দেওয়াল উজ্জ্বল হলুদ, চাল টালির। টালির চালের প্রথম বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মনোতোষ।

পাশ দিয়ে সরু গলি। গলির মুখে ল্যাম্পপোস্ট। টিমটিম করে আলো জ্বলছে। গলির প্রান্ত দেখা যায় না। ডান দিকের দোতলা বাড়ির গায়ে নোটিশ বোলান — ‘গৃহস্থ বাড়ি’। পাঁচটি অক্ষর দিয়ে এইটিকে বাঁচানোর চেষ্টাই বুঝিয়ে দেয় লাগোয়া টালির চালের বাড়িটিতে দেহপসারিগীরা থাকেন। মনোতোষকে অনুসরণ করে সাইকেল থেকে নেমে গলিপথে ঢুকে পড়ল নিরুপম, পাঞ্চালী। সাবধানে এস, রাস্তা বেশ পিছল, শ্যাওলা জমে আছে। মনোতোষ বলল। পাঞ্চালীর শরীর কাঁপছে। এদের সঙ্গে থাকতে হবে? ওর পিঠে দু-বার মৃদু চাপড় মারল নিরুপম। ঘাবড়ে যেও না। এঁরাও তো মানুষ, বঞ্চিত মানুষ।

এখানে আর কোনো আশ্রয় তেমন নিরাপদ নয়, মনোতোষ জামাল। অনেক ভেবেচিন্তে জ্যোৎস্না সাঁপুইয়ের ঘরে শুধু পাঞ্চালীর থাকার ব্যবস্থা করা গেছে। উঠানের বাঁদিকে দ্বিতীয় ঘর। নাম বললেই হবে। তিন দিন থাকতে হবে এখানে। এর মধ্যেই আদিসপুগ্রামে ব্যবস্থা করে, সরিয়ে নেওয়া হবে ওকে। ভোলানাথদা ব্যবস্থা করছেন। পাঞ্চালী বলল, সে কী! নিরুপমের কোনো শেল্টার ঠিক হল না?

মনোতোষ মাথা নাড়ল। নাহ কিছু করা গেল না। নিরুপম মৃদু হাসল। লিন-বিরোধী কথা বলার প্রতিক্রিয়া। — ঠিক আছে তুমি যাও। মনোতোষ সাইকেল নিয়ে চলে গেল। — তাহলে? এত রাতে কী করবে? পাঞ্চালীর গলায় সৎ-উদ্বেগ। হাত বাড়িয়ে পাঞ্চালীর দু-কাঁধ ধরল নিরুপম। আমার জন্য চিন্তা কর না, ঠিক জুটে যাবে কিছু। কাছে টেনে নিল পাঞ্চালীকে। বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিল মেয়ে।

নিরুপম গাঢ়কণ্ঠে বলল, কমরেড আজ তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল বহুগুণ....। পাঞ্চালী মুখ তুলল। চোখে জিজ্ঞাসা। তুমি যেভাবে ঘনশ্যামকে বাঁচালে.....তোমার ওপর ওইরকম অন্যায় ব্যবহার করবার পরেও..... তোমার হৃদয় অনেক বড় কমরেড। নিরুপমের গলায় আবেগ। পাঞ্চালী শুনেও শুনল না। নিরুপম.....আমার নিরু.....তুমি কোথায় থাকবে একা একা? হলুদ শাড়ির চোখ মেঘলা। নীরব টুপটাপ। অন্ধকারেও দেখতে পেল নিরুপম। তার জন্যও অশ্রু আছে তবে। নিবিড় হল নিরুপম। পাঞ্চালী নির্বাক। কিন্তু ওর প্রতিটি না-বলা কথা বুঝতে পারা যায়। মিলিত শ্বাসপতনের শব্দ আর শরীরী উত্তাপ যা আদানপ্রদান করে তাকে নির্ভুল প্রকাশ করা ভাষার কর্ম নয়। ভাষা তেমন লায়েক হয়নি এখনও।

সুন্ধতা ভাঙল নিরুপম। আমি ঠিক থাকব কমরেড....বলেছি না আমার ইচ্ছামৃত্যু!



খবর এসেছে ব্রজ ওহ কলকাতায়। যে কোনো সময়ই সোর্স এসে জানাবে ঠিক কোথায় উঠেছে লোকটি। খবর পেলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কজি উলটে ঘড়ি দেখল কনকেন্দু। প্রায় পৌনে ছটা। বিকেল গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা সারা দরকার। বড়বাবু বারবার বলে গেছেন সাহেবকে রিপোর্ট দেখিয়ে বেরোতে। সাফটার মধ্যে জমা দিতে হবে। বিগত আট-ন’মাসে কি ধরনের নকশালি রই নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে? কত বই

বাজেয়াপ্ত ৩৫৫০২ ক'জন পুলিশ খতম করেছে ওরা? ওই খতম সংক্রান্ত মামলার কি অবস্থা? মামলা ছোট বড়ো নেতাদের মধ্যে এখনও ক'জনকে ধরা যায়নি? সব মিলিয়ে দলের অবস্থাটাই বা কেমন? জানতে চেয়েছেন সাহেব। ক্যালকাটা পুলিশ গেজেটে কিছু আছে। বাকিটা অন্য ফাইলে। দু-জায়গার তথ্য মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তর সাজাচ্ছে কনকেন্দু।

কীয়ে শালা! এখনও বসে বসে কি করছিস? জুতোর খটখট। বিমান ঢুকল। আগেও দেখেছে আবার ওকে ভাল করে দেখল কনকেন্দু। রোগা, রুক্ষ। গোঁফ, চুল, নখ সবই রুক্ষ। কপালেও শিরাজাল দেখা যায়। চোখ গোল। দৃষ্টি চঞ্চল। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী ও বাতপ্রকৃতির।

উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল বিমান। — এখনও শেষ করতে পারলি না? বিমান পা নাচাতে শুরু করল। কনকেন্দু হাসল। — আর বলিস না, বসে বসে মারাজি। ছোট কাজ কিন্তু কামেলার। তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়ে গেছে? দ্রুত ডানদিকে ঘাড় কাত করল বিমান। বাম হাতের আঙুল নাচিয়ে বলল, অনেকক্ষণ..... সাড়ে তিনটের সময়। আমাদের তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, হঠাৎ বাড়েও না, কমেও না। বিমান চোখ নাচিয়ে হাসল। বায়ু প্রকৃতির লোকেরা এমনই। দু-দণ্ড স্থির থাকতে পারে না। হয় হাত নাচাচ্ছে, নয় ঠ্যাঙ নাচাচ্ছে। এরা রাত জাগতে পটু। ঠাণ্ডা ভালোবাসে না। কথায় কথায় চটে যায়, নখ কামড়ায়। দাঁতে দাঁত পেষে। অকারণে দ্রুত হাঁকি প্রগলভ। মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথাও বলে। নবাব-বাদশা হবার স্বপ্ন দেখে। আর একই সঙ্গে নাচগান ভালোবাসে। কাজের খুঁটিমাটিতে আগ্রহ। সামুদ্র-জ্যোতিষ অনুযায়ী এরা জগলের মতো শৃঙ্গারী, শেয়ালের মতো দূর্ত, বরগোলের মতো ভিত্ত।

কনকেন্দু বলল, গাঃ! তাহলে একটা সাহায্য কর না। আর অল্পই বাকি.....। সাদা কাগজ এগিয়ে দিল। আমি এলে যাচ্ছি, তুমি লিখতে থাক। হাত বাড়িয়ে কাগজ নিল বিমান। 'টোয়েন্টি ফিফথ সেকশ্যারি, নাইনটিন সেভেনটি ফোর। প্রেমচাঁদ রবিদাস, কনস্টেবল ওয়জ কিল্ড.....'

'মার্চ নাইনটিন সেভেনটি টু ইস্যু অফ দ্য মাসুলি জার্নাল প্রজ্ঞন, পাবলিশড আন্ডার দ্য এডিটরশিপ অফ শ্রী ভারদারা রাও ফ্রম ওয়ারাসল ওয়জ সিজড.....'

'প্রথেন্স অফ ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য কেসেস অফ মার্ডার অফ পুলিশ পার্সোনেল ইন ক্যালকাটা.....'। কনকেন্দু বলে চলল।

বেশিক্ষণ লাগল না কাজ শেষ হতে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল বিমান। উরিঃ শালা ছটা কুড়ি.....। কনকেন্দু ধন্যবাদ জানাবার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল বিমান। নিখাদ বাত প্রকৃতির লোকেরা কিন্তু এমনভাবে অপরকে সাহায্য করে না। ওর মধ্যে নির্খাৎ জ্ঞেয় প্রকৃতির মিশেল আছে। পরে আর একবার ভালো করে দেখতে হবে ওর ধরন-ধারণ।

বিমান চলে যেতেই আলমারি খুলল কনকেন্দু। রিপোর্টের সঙ্গে বাজেয়াপ্ত পত্রিকার দু-একটি নমুনা দেখতে চেয়েছেন ডেপুটি কমিশনার। কিছুদিন আগেই বেলগাছিয়া থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি রেডগুক আর দুটি লিবারেশন। রেডবুক পাওয়ায় নতুনত্ব কিছু নেই। কয়েকবারই এখানে এখানে লাগত। গেছে। কিন্তু লিবারেশন দুটো খুব কায়দা করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

প্রথম লিবারেশনটা পুরনো — এপ্রিল-জুন ১৯৭১। মলাট দেখে বোঝার উপায় নেই। লালকালিতে ছাপা অন্য বইয়ের প্রচ্ছদ — হায়ার সেকেন্ডারি ইংলিশ কম্পোজিশন। পার্ট ওয়ান। ধর অ্যান্ড কোং। নিখুঁতভাবে সঁটানো। দ্বিতীয় লিবারেশনটা ছিল বালিশের খেলের মধ্যে। এইটি নতুন — ১৮ মার্চ ১৯৭৪। পাঁচ পাতার এই পত্রিকা সেই আগেকার লিবারেশনের মাপে নয়। এ কতকটা সাক্ষ্য-পত্রিকার মতো — পনের ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি। প্রথম পাতা লাল কালিতে ছাপা। একেবারে মাথায় বামদিকে মাও সে-তুঙ, ডানদিকে চারু মজুমদার। মাঝ বরাবর শহীদ কমরেড সুনীত মোদক ওরফে জয়দেবকে লাল সেলাম জানিয়েছে পার্টি। তার ঠিক नीচেই আর এক শহীদ শতপথী পার্বতীকেও লাল সেলাম। ভেতরের পাতার সব লেখা কালো কালিতে। এই লিবারেশন দুটি সাহেবকে দেখাতে হবে। তথ্য-বিবরণী জমা দেবার আগে একবার ভালো করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। যা সময় আছে, তাতে হয়ে যাবে। সাহেব নানারকম প্রশ্ন করেন। তার উত্তরও ভেবে নেওয়া দরকার।

উনিশশো সত্তর-একাত্তরে পুলিশ খতম বেড়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, দ্য নকশালাইটস্ উড বি ফট টু দ্য ফিনিশ। ওদের নির্মূল করতে হবে। ব্যস! নতুন মুখ্যমন্ত্রী একেবারে আদাজল খেয়ে নেমে পড়লেন। সি আর পি-র সংখ্যা বেড়ে গেল। দু-বছর আগের হিসাবে ৯৫ কোম্পানি সি আর পি এই রাজ্যে। তারপরে জম্মু কাশ্মীর - ৩৭ কোম্পানি। দেশে সি আর পি-র মোট সংখ্যাই তো ৩৬০ কোম্পানি। মিসা-তে গ্রেপ্তার করবার সংখ্যাও বাড়তে বললেন চিফ মিনিস্টার। মিসা-র সুবিধে আছে। সন্দেহভাজনকে বহুকাল বিনাবিচারে জেলে রাখা যায়। ৩০ এপ্রিল ১৯৭২ — মিসা-বন্দির সংখ্যা ৩৮২৯। এছাড়াও চালু হয়েছে ব্রিটিশ আমলের বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী দমন আইন। কাউকে গ্রেপ্তার করতে হুকুমনামা লাগে না। খুশি মতন ধরা যায়। রাজ্যের একাত্তর জেলে বন্দি রাখার ব্যবস্থা উনিশ হাজার। থাকছে চব্বিশ হাজার। তারপরে এই দু-বছর তো সবকিছুই আরও বেড়ে গেছে।

এরই সঙ্গে পুলিশের মদতে, ব্যবস্থাপনায় গুণ্ডা মস্তানদের নিয়ে গড়ে তোলা হল প্রতিরোধ বাহিনী। এদের হাতে পুলিশের রিভলবার! যে সব লুস্পেন আগে নকশালদের সঙ্গে ভিড়েছিল তারা এখন সব ‘লব কংগ্রেসি’ — প্রতিরোধ বাহিনীতে। ব্যস! হাওয়া ঘুরতে শুরু করল। এরা আত্মগোপনকারী নকশালদের খবর পেলেই পৌঁছে যায়। ধরে ফেলে। নিজেরাই খতম করে দেয়। কখনও পুলিশে জানায়। খতম করলে বৃহৎ কোনো অসুবিধে নেই। ‘দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে মৃত’, ‘নকশালদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নিহত’ অথবা ‘পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত’ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। চারু মজুমদার মারা যাবার পর দল ভেঙে চূরে শেষ। বাহাদুরের দ্বিতীয়ার্ধে আর সাড়া শব্দ নেই ওদের। ধরে জবাই করলেও রা কাড়ার কেউ নেই। যদিও বাহাদুরের জুন মাসে তৈরি হল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। তারা একটু আধটু প্রতিবাদ করছে কিন্তু তেমন কোনো ফল হয়নি। পুলিশের নীচুতলার সবাই জানে বড়কর্তাদের সমর্থন আছে নকশাল-খতমে। নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় চোখ বোলাল কনকেন্দু। পনেরোটি নিষিদ্ধ বইয়ের মধ্যে নটিই নকশাল বই। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, অন্ধ্র, বিহার, পাঞ্জাব এমনকী রাজস্থান থেকেও নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করে বই ছাপা হয়।

পুলিশ খতম সংক্রান্ত তদন্তের রিপোর্টও বেশ ভাল। বছর দুয়েক আগেও সাঁইত্রিশটি

মামলা মূল্য ৬৮। এখন রায় বেরিয়ে দোষীদের কারাদণ্ড হবার পর খতম সংক্রান্ত মামলা কম দাঁড়িয়েছে এগারো। অবস্থা অনেক ভালো। পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় যে কুচকাওয়াজ হত, নকশাল আক্রমণের ভয়ে তা বন্ধ হয়েছে সেই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। এখন আবার সমবেত কুচকাওয়াজ চালু হয়ে গেছে। তবে যে যাই বলুক নকশাল-দমনে সব থেকে বেশি কাজে লেগেছে গুপ্তা-মস্তান-সাটোবাজদের নিয়ে বানানো ওই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। গণতান্ত্রিক অধিকার পাবার জন্য আর মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি বামদল ২৭ জুলাই ১৯৭৩ পশ্চিমবঙ্গে বনধু ডেকেছিল। ওই বাহিনী স্ট্রেক পিটিয়ে বনধু ব্যর্থ করে দিল!

বাহিনী গড়ার ব্যাপারে কমিশনার আর ডেপুটি সাহেবের পাকা মাথা কাজ করেছে। উনি বারংবার সমস্ত দায়িত্বশীল অফিসারকে নকশালি বই পড়তে বলেছেন। তাতে বোঝা যাবে ওদের কৌশল, ভেতরের দ্বন্দ্বকে। ব্রাজিলের গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক কার্লোস মারিঘেলার বই এনে কনকেন্দুকে দিয়েছেন ডেপুটি সাহেব। — পড়ে দেখ, বোঝো আরবান গেরিলাদের কৌশল....তবে তো ওদের বিরুদ্ধে লড়বে। বলেছেন সাহেব। কমিশনার সাহেব তো লিখিত আদেশই দিয়ে দিলেন স্যার রবার্ট থমসনের 'কমিউনিস্ট ইনসারজেন্সি' বইটা পড়বার জন্য। ডেপুটি সাহেব বলেছিলেন, স্যার থমসন কে জান? কনকেন্দু দু-দিকে মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। লজ্জাও পেয়েছিল খুব। সাহেব বিস্তারে লেখক পরিচিতি দিলেন। উনিশশো একষাট থেকে পঁয়ষাট অবধি ঐশ্বর্য ব্রিটিশ অ্যাডভাইসরি মিশনের হয়ে ডিয়েতনামে ছিলেন। চোখে দেখা ঘটনা নিয়ে কতকটা লেখা। পড়ে দেখ, অনেক কিছু শিখবে। এরপরেই স্বর খাদে নামালেন ডেপুটি কমিশনার। — নকশাল হাঙ্গামা থামাবার দুটো রাস্তা আমেরিকান আর রাশিয়ান। আমেরিকান রাস্তা হল ওদের কিনে নেওয়া, একান্ত সংযোজন হলে খতম। আর রাশিয়ান পন্থা, শুধুই খতম। হা-হা করে হেসেছিলেন সাহেব।

সন্ধ্যা ১১টা হয়ে আসার পর ২১৫ এই পঁচিশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। সকাল সাড়ে সাতটা। ৭ টি রোড আর রাজা মনীন্দ্র রোডের মোড়ে দুই ট্রাফিক কন্সটেবল সব ডিউটিতে এসেছে। ডোজালি, পাইপগান হাতে আক্রমণ করল নকশালদের ঝোয়োড়। প্রেমচাঁদ রবিদাস ঘটনাস্থলেই নিহত। অন্যজনের আঘাত তত গুরুতর নয়। কিন্তু দুজনেরই রিভলবার নিয়ে পালিয়েছে নকশালরা।

সবাই নড়ে বসেছে। কমিশনার চটে গেছেন খুব। পুলিশের হাতে রিভলবার ছিল, ওরা তা ব্যবহারই করতে পারেনি! লজ্জার কথা। ওই দু-তিনজনকে এরা ছুঁতেও পারল না। 'অপদার্থ সব', বলেছেন বড়সাহেব। এরপরেই ক্যালকাটা পুলিশ গেজেটের বেশ কয়েকটি সংখ্যায় আবার ছপতে হল সন্তর-একাস্তরের চেতাবনি। কী করে রিভলবার ব্যবহার করতে হবে। রাস্তাঘাটে বেরবার সময়ে কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত। আত্মসম্ভত্তির কোনো জায়গা নেই পুলিশ বাহিনীতে। সমস্ত পুরোনো আদেশনামা বের করেছে কনকেন্দু। পরপর জেল গেজেট সন।

এরই পালাপাশ খোঁজখবর বিভিন্ন নকশাল গোষ্ঠীর। তাদের নেতাদের বিষয়ে। পঞ্চাশার দশ দল বর্তমানেই বেশি সক্রিয়। ওদের নিয়ে তত ভাবনা নেই। এ রাজ্যে জিলা লেফটেন্যান্ট, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট দু'জনই সমান বিপজ্জনক।

ব্রজ গুহ এখন অ্যান্টি-লিনদের সঙ্গে। জামশেদপুর, রাঁচি, দেওঘর ধানবাদ থেকে এ রাজ্যের আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমানে ঘুরে বেড়ান ভদ্রলোক। দলের খবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থাটা ওর গড়ে তোলা। ওকে ধরতে পারলে প্রচুর খবর হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না ব্রজকে। শুধু এইটুকু জানা গেছে ব্রজ গুহ ছদ্মনাম। আসল নাম সুকান্তি রায়। অধ্যাপক। আর এক অধ্যাপক সুনীতি ঘোষকেও ধরতে পারছে না পুলিশ। সুনীতি ঘোষ নাকি জগজিৎ সিং সোহলের সঙ্গে একটা নতুন দল গড়েছেন। ওরা পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ আর কাশ্মীরে সংগঠন গড়বার চেষ্টায়। এ রাজ্যে নিরুপম চ্যাটার্জিও এখন বেশ সক্রিয়। বড়বাবুর গুলি খাবার পরেও যে ব্যাটা কীভাবে বেঁচে গেল! আসলে বড়বাবু পয়েন্ট টু-টু রিভলবার থেকে চালিয়ে ছিলেন। তার ওপর একটু দূর বলেই সম্ভবত তলপেটের দিকে গুলি লেগেছিল। সেজন্যই বেঁচে গেছে ছেলেটা। কিন্তু ওই বেওয়ারিশ লাশের মতো পড়ে থাকা ছেলেটাকে বুলেট বের করে বাঁচিয়ে তুললো কারা? এই রহস্যটাই ধরা গেল না। এরপরেই যেন ওর সাহস আরও বেড়ে উঠেছে। হুগলিতে ওর ঘোরাফেরা ছিলই এখন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি থেকেও খবর পাওয়া গেছে ওর যাতায়াতের। নদীয়া থেকেও রিপোর্ট এসেছে। ও সম্প্রতি লিনবিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এতে লিন-পন্থীরা বেজায় খান্না। ওর বউ পাঞ্চালী রয়েছে লিন-পন্থীদের সঙ্গে। এটা পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার কৌশল হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যাইহোক, কিন্তু পাঞ্চালীকে গ্রেপ্তার করাটা কঠোর। ওকে ধরে নিরুপমের খোঁজখবর পাওয়া যাবে।

রিপোর্ট দেখে ডি সি সাহেব খুশি। বাকুভির শুভ। হাওয়া অনুকূল দেখে ব্রজ গুহ'র খবরটাও দিয়ে দিল কনকেন্দু। বাঃ বাঃ! সেগে থাকখোঁজ পেলেই ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়....। সাহেব উত্তেজিত। যত রাতেই হোক কী হল আমায় জানাবে। লড়ে যাও। আমি তোমার নাম পুলিশ মেডেলের জন্য পাঠাব।

রাষ্ট্রপতির দেওয়া পুলিশ পদক পেতে ভালোই লাগবে কনকেন্দু। মাস ছয়েক আগে রণজিৎ গুহনিয়োগী আর অসিতকুমার বেরা রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছেন। পুলিশ গেজেটে গুহনিয়োগীর যে বীরত্বের কাহিনী লেখা, স্পষ্ট মনে আছে। '৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভোররাতে পূর্ব কলকাতার মুরারিপুকুরে একস্ট্রিমিস্টদের আন্ডানায় হানা দিলেন রণজিৎ। পুলিশের দল নির্দিষ্ট বস্তিটি ঘিরতেই ওদিক থেকে ছুটে এল গুলি। গুলি উপেক্ষা করে রণজিৎ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললেন। বস্তির কাছে পৌঁছে গুলি চালালেন। একজন একস্ট্রিমিস্ট মারা গেল। উদ্ধার হল কিছু অস্ত্রশস্ত্র। নিঃশেষ জীবন বিপন্ন করে কর্তব্যপালনের এই নিষ্ঠা এবং অসামান্য সাহসের পরিচয় দেবার জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।' ব্রজ গুহকে ধরতে পারলে সেই বিবরণীতেও এমনই রোমাঞ্চকর গল্পকথা লিখবে কনকেন্দু। ডি সি সাহেব আবার বললেন, লড়ে যাও...সাদা পোশাকে যাচ্ছ তো? ইয়েস স্যার বলল কনকেন্দু। অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে সেলাম ঠকল।

দপ্তরে ফিরে দেখা গেল খার খালি। সোর্স আসেনি। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে এখনও দেখা নেই ব্যাটার। কিন্তু রেগে লাভ নেই। এ হল মাছ ধরার খেলা। বঁড়িশিতে টোপ দিয়ে ফাতনায় চোখ রেখে এসে থাক।। গোঁথে যানার পর খেলাও কিছুক্ষণ। খেলাও।

জানবার সাবধানে টেনে তোল। তাড়াহুড়ো করলেই সব বানচাল। টেবিল গুছিয়ে একতলায় নামতেই সোর্সের সঙ্গে দেখা। ও আমহাস্ট স্ট্রিটে থাকে। খবরের কাগজ বিলি করে। নকশাল পার্টিতে আছে। চিঠি দেওয়া-নেওয়া কাজ। কুরিয়র। এদের সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। অনেক সময় দু-পক্ষেরই দালালি করে। ওকে বহুবার বাজিয়ে দেখেছে কনকেন্দু। এখনও ব্যাটা ডাবল্ এজেন্ট হয়নি। খবর যা দিয়েছে, ঠিকঠাক। ব্রজ গুহ-ই যে সুকান্তি রায় জানবার পরে গুর বাড়িতে তল্লাশি চালান হয়েছিল। কিছুই পাওয়া যায়নি তেমন। যা একটি ছবি পাওয়া গেছে, বহু পুরনো। কোনো মফস্বল স্টুডিওতে তোলা। মুখে চোখে রঙ তুলি বোলানো। ওই ছবি দেখে এখনকার ব্রজকে চেনা অসম্ভব।

বান্চোত, এতক্ষণে এলি। কনকেন্দু ফেটে পড়ল। ছোপ লাগা দাঁত বের করে হাসল ছেলেটা। কী করব স্যার....নিশ্চিত না হলে খবর দেওয়া যায়? কনকেন্দুর উত্তেজনা কমেনি, বলল, কোথায় আছে মাল? আবার দাঁত বের করল ছেলেটা। ‘মুনশীবাজার রোড....’। বাড়ির অবস্থিতি বুঝিয়ে দিল সোর্স। ‘ঠিক আছে চল’...। আর কথা না বাড়িয়ে ওকে জিপে তুলে নিল কনকেন্দু। চার বন্দুকধারী পিছনে। এই যথেষ্ট। সোর্সকে মুনশীবাজার নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বলা যায় না যদি এ মক্কেল ফাঁদ পেতে রাখে! ওখানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এ কোনো ইঙ্গিত করল আর জানালার ফাঁক দিয়ে ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। ব্যাস। সাব ইনস্পেকটর কনকেন্দু সান্যাল খতম। সোর্স যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা বলার জন্য কেউ রইল না। এজ্ঞাড়া সোর্সকে কেউ চিনে ফেললেও মুশকিল। পুলিশের সঙ্গে ঘুরছে দেখলে ও নির্ধাৎ খতম হয়ে যাবে। ওকে দিয়ে এখনও অনেক কাজ হবে। মালটাকে জিইয়ে রাখতে হবে আরও কিছুদিন। ছেলেটা যে বাড়িটার কথা বলছে, তা বুঝে পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। কোমরে রিভলবার তো আছেই। হাতে একটা উর্চও রাখা দরকার। আজকাল যখন ওখন লোডশেডিং হয়ে যায়।

সোর্সকে এষ্টালি খানায় রেখে জীপ নিয়ে পেরিয়ে পড়ল কনকেন্দু। কনকেন্দু রোড ধরে রেলট্রেক পেরিয়ে বামদিকে পামার বাজার রোড। কমলা লাইটের জড়িয়ে একটা এগোতেই মুনশীবাজারের রাস্তা ডানদিকে। মোড়ের মাথায় জীপ থামল।

আমি ডানদিকের রাস্তায় হাঁটব। কনকেন্দু বলল। পিছনে বসা বন্দুকধারীরা একযোগে এগল, ইয়েস্ স্যার।

--- দরকার হলে আমি ছইশিল বাজাব

--- ইয়েস্ স্যার

--- আওয়াজ পেলেই তোমরা জিপ নিয়ে ঢুকে আসবে.....ঠিক আছে?

ইয়েস্ স্যার

মুনশীবাজার রোডে মাত্র কয়েকজন পথচারী। রাস্তার এক অংশে আলো নেই। যে কয়েকটি আলো জ্বলছে, বিষমাগভাব। অস্ত্রে হাত রেখে হাঁটতে লাগল কনকেন্দু।

বাড়িটা বুঝে নেতে কোনোই অসুবিধে হল না। সাদা থামওয়ালা একতলা বাড়ি। পাথরে এক টিলতে খাস জমি। গাঙা থেকে জমিতে যাওয়ার মুখে স্বল্পউচ্চতার ভাঙাচোরা কাঠের গেট। দুটি কাঠের পাথর মধ্যে এতটাই ফাঁক, অনায়াসে দু’জন মানুষ গলে যেতে পারে। বাড়িতে ঢুকতেই ডানদিকের প্রান্তে একটিমাত্র দরজা। তার ওপারেই ব্রজ গুহ’র

থাকার কথা। রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে সব। ঢুকে গেলেই হয়। কিন্তু ধৈর্য রাখতে হবে।

আবার হাঁটতে শুরু করল কনকেন্দু। দু-তিনটি বাড়ি পরেই একটা মোটর গ্যারেজ। নীলরঙা দরজার একটা ভেজান, অন্যটা আধখোলা। দরজার পাশে গাড়ি। ত্রিপল চাপা। গাড়ি ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে ফিরতি পথ ধরল। এবার ডানদিকে পড়ল সাদা থাম। উঠোনে অঙ্ককার। ডানদিকের জানালা বন্ধ, কিন্তু ফাঁকফোকর দিয়ে আলো আসছে। কম্পমান আলো। অর্থাৎ লোডশেডিং। ভেতরে হ্যারিকেন কিংবা কুপি।

আবার নেশা চাপল। কাঠের পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঢোকবার সময় একটা পাল্লায় ধাক্কা লেগে গেল। কাঁচকাঁচ করে শব্দ হল দুয়েকবার। বুকের ভেতরটা খড়্‌খড় করে উঠেছিল। নিজেকে শাস্ত করল কনকেন্দু। জমি পেরিয়ে দরজা। রিভলবার হাতে। ট্রিগারে আঙুল। কড়ায় হাত রেখেও শেষ মুহূর্তে টোকা মারল। ফিসফিসে গলায় বলল, কমরেড। দরজা খুলল না। কেউ যেন তাকে দেখছে! চকিতে পিছনে তাকাল কনকেন্দু। কেউ কি দ্রুত সরে গেল? না, কেউ নেই। ডান পাশে, বাম পাশে কোন দিকেই নেই। উত্তেজনায় মনের ভুল। এবার জোরে কড়া নাড়তেই মনে হল দরজা খোলা। ধাক্কা দিতেই হাট করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে আলো নেই। প্রতিটি আলোর বিন্দুর উপর যেন কালো কালির দোয়াত উলটে দিয়েছে কেউ! টর্চ জ্বালবার আগেই কণ্ঠস্বর, আপ কিস্কো মান্নতে হ্যায়। মহিলার গলা! টর্চ জ্বালাল কনকেন্দু। সম্পূর্ণ নিরাবরণ! আদিবাসী রমণী। কালো গ্রানাইট পাথরের ভাস্কর্য যেন। উদ্ভূত কনকশূণ, ক্ষীণ কটিদেশ, মসৃণ নিম্ননাভি। প্রত্যন্তে ঘন অঙ্ককার। টর্চ নামল না আর। সব অঙ্ককার আলোকিত করতে সবাই পারে না। আজন্মের সংস্কার হাত টেনে ধরে। কনকেন্দু আবার বলল, কিস্কো চাহিয়ে জী? মুখ কো? কয়েক পা এগিয়ে এল নারী। তার ডানহাতে ঝুলছে শায়ার প্রান্ত। আঙুলে জড়ান সেই অন্তর্বাসের রশি। অপ্রত্যাশিত উলঙ্গ প্রকাশ বাকরোধ করে। অনাকাঙ্ক্ষিত নিরাবরণতাকে কয়েক মুহূর্তের বেশি সহ্য করা যায় না। ছিটকে বেরিয়ে এল কনকেন্দু। দৌড়ে রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল। শালা, ভুল খবর দিয়েছে। জলদি এন্টালি থানায়, কনকেন্দু বলল। রাস্তায় খুব কিছু লোকজন নেই। জীপ ছুটল। থানায় ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোর্স। পেলেন? দাঁত বের করে হাসল।

সজোরে থাপ্পড় কষাল কনকেন্দু। শুয়ারের বাচ্চা! আমায় ভুল খবর দেওয়া। মেরে গাঁড় ফাটিয়ে দেব। আবার থাপ্পড়। সোর্স আহত' চোখে তাকাল। অবাকও। শালা ঘরের মধ্যে একটা কেলে রেণ্ডি....বানচোত আমার সঙ্গে মাঝারি হচ্ছে? এবার লাথি কষাল কনকেন্দু। ছেলেটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। ঠোট কেটে গেল। আবার পা চালাবার আগেই সোর্স বলল, শুনুন শুনুন.....ওই মেয়ে ঠা মাওতাল? হ্যাঁ, তাই তো.....কেন? পা নামাল কনকেন্দু। ছেলেটা ঠোট মুছেও মুছেও বলল, আরে ওই তো ব্রজ গুহের ক্যাডার বাসন্তী হাঁসদা.....অসুস্থ.....ব্রজদা ওকে সাথে নিয়ে আসে চিকিৎসা করাতে....তাহলে এবারও ওকে এনেছে.....শীগগির যান। থমকে গেল কনকেন্দু। তারপরেই দ্রুত জীপে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি চল। জলদি।

আবার মুনশীবাজার রোড। ব্যাড্রন সামনে নোমেই দুটে ভিতরে। পিছনে চার বন্দুকধারী। দরজা ভেজানই ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল আগারও। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই।

না? কোথায়? বন্ধুধারীদের তন্মায়িত লাগিয়ে কনকেন্দু দৌড়ে রাস্তায় গেল। ওই ত্রিপল নাগা গাড়ীও হাওয়া। এইবার স্পষ্ট হল সব। সোর্স ঠিকই বলেছে। ব্রজ ওহ-ই ছিল গাড়ীতে। মেয়েটা ছলাকলা দেখাচ্ছিল কনকেন্দুকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টায়। এবং সে সফল। প্রিয় নেতাকে আড়াল করেছে। তারপর দু'জনেই পালিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে পাওয়া গেল মাঝবয়সী বিহারী দম্পতিকে। তাদের দুই সন্তান। এক ছেলে — চোন্দো, পনেরো। কাছেই স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ে। মেয়েটি বোবা। জিজ্ঞাসাবাদে ওদের থেকে বেশি কিছু জানা গেল না। — আরে ওহ তো রামশঙ্করজী। একমাস ভাড়া আছে এখানে। তাদের ছেলেকে মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়ে দিয়েছে। আদমি তো দেওতা আছে। ওর বিবিও তো ভালোমানুষ। এর বেশি আর কিছুই জানে না ওরা। যে সত্যিই জানে না তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যায়। তাকে জেরা করে কোনো লাভ নেই। এতদিনে একথা বুঝেছে কনকেন্দু।

ফিরে এসে অসহ্য লাগছিল। বড়বাবুকে জানাল সব। আরে। কিছু না করেই ফিরে এলে? ফাঁকা গোলে বল ঢোকাতে পারলে না? আওয়াজ করে হাসলেন বড়বাবু। তুমি মাইরি পিওর বোকা-ই রয়ে গেলে।

সারারাত ঘুম এল না। স্বপ্নে বারংবার ফিরে এল কালীমূর্তি। আর বড়বাবুর খ্যা-খ্যা হাসি। বিশ্বনা ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল কনকেন্দু। চোখ লাল। কুতকুতে চোখের কোল ফোলা। পেটে হঠাৎ জমে যাওয়া চর্বি এখনো স্বলিত শরীর। অপরিমিত মদ্যপানের ফল। মুখটা ঠিক বেবুনের মতো দেখাচ্ছে। কতদূরে চলে এসেছে কনকেন্দু? আগের সেই পড়াশুনো আর নেই। জ্ঞানের দীপ্তি ভিত্তিমিত, ক্ষুরধার মেধা চর্চাহীনতায় বিকল। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারের যে ছেলেটি মাত্র বছর পাঁচেক আগে পুলিশে যোগ দিয়েছিল, সে আজ কত দূরে সরে গেছে! বড়বাবুর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে গিয়েই তার অবনমনের শুরু। কিন্তু তার সত্যিকারের পতন, যেদিন নিরুপমকে মারবার জন্য গুলি করলেন বড়বাবু। কারণ, সেদিন মনে মনে ওই হত্যার স্বপ্নে মুক্তি সাজিয়েছিল কনকেন্দু। পুলিশের কাজটাই বোধহয় এমন। তুমি যে পরিবার থেকেই আস না কেন, যত পড়াশুনোই কর না কেন, এক মানুষকে বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে করতে, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা বাতাবরণে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিতে, সরল স্বজ্ঞ মেধাবী ছেলেটিও ক্রমশ হয়ে ওঠে ওই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর রক্তচোষা সদস্য। এ ব্যবস্থা এমনই। সে তুমি পিস্তলের নিরীহ কাঠের বাঁট হলেও প্রাণঘাতী অস্ত্রটিকে দৃঢ়তা দিচ্ছ, মরা চামড়ার হোলস্টার হলেও তাকে আধার দিচ্ছ।

অকস্মাৎ বহুযুগ পরে যেন ঘুম ভাঙল কনকেন্দুর। যিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে তার নেতাকে পাঠাতে যান তিনি আর যাইহোক উপহাসের পাত্রী নন। মনে মনে বাসন্তী হাঁসদাকে গম্ভীর জানাল কনকেন্দু। এসব মানুষের গায়ে কোনোদিন ময়লা লাগে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় পুলিশ তাঁকে দগ্ধ করলেও তিনি অক্ষতযোনি থেকে যাবেন।

বড়বাবুর খালি হাসি কানে গাজছে। শুয়োরের বাচ্চার মাথা গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল। লেগে ডো বড়বাবুর মতোই কদম ভাষায় ওই বাসন্তী হাঁসদাকে বিশেষিত করেছে। ছিঃ। ছিঃ। কোল লাগালে নোম গেছে সে। বড়বাবু তো হাতের নাগালে নেই, নিজের মাথাতেই আঘাত করলে আঁকল কনকেন্দু। আঘাত আঘাত। আবার আঘাত। বার বার। বারংবার।



দ্রোণের হাতে মোটা কলম। কী রঙ? কালো। ও কলম ধরে হাসছে। পাঞ্চালীকে বলল, কবিতা লেখ, ওটা হাতিয়ার। কোথায় দাঁড়িয়ে দ্রোণ? পাশে এত নীল রঙের জল কেন? জল থেকে মাথা উঁচু করে আবার হাসল দ্রোণ। হঠাৎ কলম তাক করল ডানদিকে। ডানদিকের লোকটির মাথায় কালো টুপি। হাতে রিভলবার। কালো টুপি কিছু করবার আগেই কলমে আঙুল দাবাল দ্রোণ। কোনো আওয়াজ হল না কিন্তু বুলেট বেরিয়ে এল ভাসতে ভাসতে। ছিটকে পড়ল কালো টুপি। জল লাল। দ্রোণও ডুবে গেল।

ঘুম ভাঙার পরেও স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য মোটামুটি মনে আছে। কিন্তু দ্রোণের মুখ কী তারপরেও জল থেকে ভেসে উঠেছিল একবার? স্বপ্ন ব্যাপারটা অদ্ভুত। ইদানীং দ্রোণের কথা ভাবেইনি সে, কিন্তু স্বপ্নে কেমন চলে এল! দ্রোণ কী রঙের জামা পরেছিল? মনে করবার চেষ্টা করল পাঞ্চালী। ঘরের অঙ্ককার কিছুটা ফিকে। বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে রোদ্দুর ঢুকছে। দেওয়ালে আলোর কাটাকুটি। নটা বাজল মনে হয়। আলোর ঘনত্ব বুঝে, আলোর তির্যক রেখা দেখে সময় অনুমান করবার চেষ্টা, মজার খেলা। ঘড়ি দেখল পাঞ্চালী। নটা পনের। বাঃ! ভালোই মেলান গেছে। একা থাকলে বোধহয় আন্দাজ অনুভূতিগুলি প্রখর হয়ে ওঠে। আদিসপ্তগ্রাম কিংবা শেওড়াফুলির তুলনায় উত্তরপাড়ার আশ্রয়ের এই এক মস্ত সুবিধা। হোক না খুঁজছেটো কুঠরি, কাঁচা ড্রেনের গন্ধে ভরে যায় ঘর, মশাও কম নয় কিন্তু তবু তো একটি জানালা আছে ঘরে, আকাশ দেখা যায়। সব থেকে বড় কথা, একা থাকা যাক্ষে এখানে। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থেকে এলোমেলো ভাববার বিলাসিতা করা যাবে না। সন্ধ্যার মধ্যেই কমরেডরা আসতে আরম্ভ করবে। জরুরি মিটিঙ। পাঞ্চালী উঠে বসল।

মাটিতে পা রাখতেই জানালায় মৃদু টোকা। প্রথমে একবার। চার-পাঁচ সেকেন্ডের বিরতি। তারপর ধীর লয়ে তিনবার। চেনা সংকেত। কিন্তু এ তো তার আর নিরুপমের নিজস্ব। তবে কী নিরু এল? জানালা খুলতে গিয়ে থমকে গেল পাঞ্চালী। অন্য কেউ জেনে-বুঝে নকল করছে না তো? সংকেতের পুনরাবৃত্তি হতেই টান টান দাঁড়িয়ে গেল পাঞ্চালী। পুলিশ নয় তো? তেমন হলে পাল্লায়ে এখান থেকে। ছাদে উঠে সহজেই পাশের বাড়িতে লাফিয়ে যাওয়া যায়। তার আগে দেখা দরকার কে এসেছে। সাবধানে জানালার পাল্লা ফাঁক করতে একটি ছেলের মুখ। আপাদমস্তক দেখে নীল পাঞ্চালী। শ্যামলা, ছিপছিপে, গালে নরম দাড়ি। নীল ট্রাউজার, ওপদ শাট। পায়ে জুতো। বয়স? ষোলো-সতেরো হবে। গলা খাঁকারি দিল পাঞ্চালী। কাকে চাই? আমি বিশ্বনাথ, নিরুদার কুরিয়র। ছেলোটো বলল। এইবার মনে পড়ল। ও একবার নিরুপমের কাছে এসেছিল। কমরেড। ভেতরে নিয়ে আসা যায়। ঘরে ঢুকে বিশ্বনাথ অতো শূণ্যে ফেলল। মোজার ভেতর থেকে বের করল চিঠি। — নিরুদা পাঠিয়েছে। উত্তর দলে নিয়ে যাব।

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিয়েই নিজের মনে পড়তে শুরু করল পাঞ্চালী। 'হলুদ শাড়িকে যে কতদিন দেখি নাই। তাঁহার স্মৃতি সতত প্রবহমান। শুনলাম তিনি মাসিপিসির বাড়ি ভ্রমণান্তে আপাতত নিরাপদ গৃহে স্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিতে কিঞ্চিৎ ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। বৈশাখ পড়িল কিন্তু সেই বসন্তমঞ্জরীর আখ্যান শুনা হয় নাই। হলুদশাড়িকে শতকোটি পরাগরেণু পাঠাইলাম। গ্রহণ করিলে চিন্তা পুলকিত হয়।' এই ইময়াল ভরা চিঠি অন্য কেউ পড়লে বুঝেই উঠতে পারবে না। কিন্তু পাঞ্চালী ঠিক বুঝে গেল। নিক জন্মেতে চেয়েছে মাসিপিসি মানে জ্যোৎস্না সাঁপুইয়ের কাছে থাকার অভিজ্ঞতা।

কোন জায়গা থেকে শুরু করি বল তো নিরুপম? তোমার চলে যাবার পর থেকে নীচের বাসনপত্র খেয়ে পাঁচটি ঘর। উঠানে একটা টিউবওয়েল দেখেছিলে তো? ঠিক তার মুখোমুখি দরজায় কড়া নাড়তেই যে দরজা খুলল তার নাম জ্যোৎস্না। বয়েস কুড়ি-পঁচিশ। মাথার উচ্চতা, দাঁটপুষ্ট চেহারা, চুল টান করে বাঁধা। মাথায় সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। মুখে একগাদা পলুড়ার। শরীরের তুলনায় মুখটা বেশি সাদাটে। জ্যোৎস্না বলল, তুমি পাঞ্চালী তো?

হ্যাঁ

ভেতরে এস

৮কলাম। দশ ফুট-বাই দশ ফুটের ঘর। খাটের সামার তলায় একটা করে ইট লাগান। নীচের বাসনপত্র একেবারে ঝকঝক করছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, দিলে তো আমার রোজগার বন্ধ করে। আমার খরচ লাগল। পরে বুঝলাম, ও কোনো অনুযোগ করেনি। ওইটাই কথা বলার ধরন। ঠান্ডা করছিল বোধহয়। বছর তিনেকের একটি ছেলে আছে জ্যোৎস্নার। খোকন। খন্দের এলে তাকে ঘরের বাইরে পাঠান হয়। কিংবা পাশে শিউলির ঘর খালি থাকলে সেইখানেই চালান করে। আমি বললাম, তোমার খন্দের এলে আমিও না হয় খোকনকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। রোজগার বন্ধ করবে কেন? জ্যোৎস্না হাসল। পাগল, তোমায় দেখলে ওরা ছাড়বে না কী? ঠিক লাইনে ঢুকিয়ে নেবে। শিউরে উঠেছিলাম। কদিন কী অসম্ভব ঝুঁকি নিয়েছে জ্যোৎস্না। প্রথম রাতেই দরজায় ধাক্কা। জ্যোৎস্না খুলল না। আজ হবে না গো। দরজার ওপারের পুরুষ জড়ানো গলায় বলে উঠল, কী রে শালি, লাইন ছেড়ে দিলি নাকি? অন্য বাবু জুটেচে বুজি? জ্যোৎস্না বলল, আমার ছেলেটার শরীর খুব খারাপ গো, ধূম জ্বর, একটু সামলে নি দু'দিন.....তারপর তো আচিট। থাকার চোটে দরজা ভাঙার উপক্রম। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। উঠে দাঁড়লাম। এগোতেই, জ্যোৎস্না দৌড়ে এসে আমার মুখে হাত চাপা দিল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আরে ও মিটে কথা বলচে নাকি? তোমায় ঘরে ঢোকালে তো ওরই লাভ.... শুদু-মুদু কেউ পরশা জড়ে নাকি? বল? পুরুষকণ্ঠ চূপ করল। শিউলি বলল, তার চেে কদিন তুমি আমার ঘরে বস। আমার তো খাঁ খাঁ করচে। পুরুষটি পাশের ঘরে ঢুকল। ষটপটামির লব পাওয়া গেল অনেককণ। লজ্জা লাগছিল খুব। কিন্তু জ্যোৎস্নার কোনো ভাবান্তর নেই। দরজার পিঠি পিঠিই খুব জ্বর। জ্যোৎস্না জলপটি লাগাচ্ছিল ওর কপালে মাথায়। আমি

একবার ভালো করে মাথা ধুইয়ে দিলাম। জ্বর একটু নামল মনে হয়। খোকন তার মা'র হাত ধরল। তারপর অসুস্থট গলায় বলল, মা তোমার কাছে খন্দের আসবে না? জ্যোৎস্নার ঠোটে আঙুল। চুপ থাক। আমার চোখে জল এসে গেল। তিনদিন ধরে কামতাড়িতদের ঠেকাল জ্যোৎস্না। তিনদিনের রোজগারও নষ্ট হল। কেন করল জান? শুধুমাত্র নকশাল-রাজনীতির কথা ভেবে। ওই বাড়ির জ্যোৎস্না, শিউলি আরতি সবাই কত শ্রদ্ধা করে আমাদের। আমাকে জিজ্ঞাসা করল ওরা, কবে নতুন জমানা আসবে গো? আমি তো যথারীতি বললাম, এই তো পাঁচাত্তরেই শুরু হবে। জ্যোৎস্না বলল, আমার খোকন ভালো থাকবে তো? একবারও জিজ্ঞাসা করেনি, নিজে ভালো থাকবে কী না? একমাত্র চিন্তা, খোকন ভালো থাকবে তো? এইসব মানুষের কথা ভাবলে কী যে কৃতজ্ঞ লাগে! এদের কথা কোথাও লেখা হবে না। কিন্তু অসামান্য এদের ত্যাগ। বল?.....আরও কত কথা যে মনে পড়ে। কিন্তু এতসব লেখা যাবে না। সে এক বিশাল আখ্যান। অনেক সময় লাগবে। বিশ্বনাথকে অতটা সময় থাকতে বলা মুশকিল। দলের কেউ এসে পড়লে ঝামেলা। নানান জবাবদিহি করতে হবে। অথচ এই সবটাই নিরুপমকে বলতে ইচ্ছে করছে। সবই লিখতে হবে চার-ছ'লাইনের সাংকেতিক ভাষায়।

পাঞ্চালী লিখতে শুরু করল— 'মাসিপিসি কত যে গল্প বলেছে। আশীর্বাদ জানিয়েছে আমার পেটকাটা গুবলুটাকে। মাসির তিনবছরের ছেলেকে খোকন বলেছে, বড় হয়ে তোমার কাছে যাবে।' আর একবার নিরুপমের চিঠিতে দেখে বোলাল পাঞ্চালী। শেষ দিকে এসে মৃদু হাসি। কান লাল হয়ে গেল তার। আদর্শের সময়েই তো মেয়েরা পুরুষের শত-সহস্র রেণু গ্রহণ করে। একথার উত্তর এইটাই — আমি কৃতজ্ঞ।

বিশ্বনাথ চলে গেল। ভালো লাগার আঁধার কাটছিল না। আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে কতদিন সে নিরুপমের কথা ভেবেছে, কত রাত তার সঙ্গ কামনা করেছে! তার চার পাশের আলো-আঁধার-বাতাস জানে সেই গোপন কথা। কী করে নিরুপম জোগাড় করল তার সন্ধান! প্রাণের টান বোধহয় এমনই। বিশ্বের নির্জনতম কোনো প্রান্তে তাকে নির্বাসন দেওয়া হলেও নিরুপম ঠিক পেয়ে যাবে তার হৃদস্পন্দন। সেই স্পন্দনধ্বনির উৎসে ঠিক খুঁজে নেবে তাকে। চিরকুটে হাত বোলাল পাঞ্চালী। ঘ্রাণ নিল একবার। দু-বার। তিনবার। নিরুপমের লেখাকে চুম্বন করল নিবিড় আগ্রহে। চোখ বুজে এল। নিরুপম আমার নিরুপম। ভালো থেকো। পরাগমিলনে দেখা দেবে যে কুসুমকোরক' তার কী নাম? রক্তকমল? নাকি দোলনচাঁপা? অবশ্য দ্রোণ কিংবা দ্রুমি হলেও মন্দ হয় না। দ্রোণ নামটা নিশ্চয় মনে নেবে নিরুপম। ওর মন আকাশের মতো বিশাল। দিগন্তছোঁয়া। স্বপ্নের অনুভূতি অণু-পরমাণুতে বিভাজিত হয়ে রঙ-মন্ডায় মেশে। স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু আর বসে থাকলে চলবে না। পাঞ্চালী উঠে পড়ল।

হাত মুখ ধুয়ে আসতেই দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। খড় খড় খড়। ভোলানাথদা ছাড়া কেউ এমন তিনবার না জানে না। অন্যরা হয় দু-বার নয় পাঁচবার। মেঝেতে দ্রুত মাদুর পেতে দিয়ে দরজা খুলল পাঞ্চালী। শুশু ও ন্যা, সঙ্গে দুই চেলা পুলক, মনোতোষও আছে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে পাঞ্চালীকে একবার উপদেষ্টিতে দেখলেন ভোলানাথ। নতুন কিছু নয়, এইটাই ওর অভ্যাস। পোকটা সবাইকে ভয় দেখাতে ভালোবাসে। তিনজনেই ঘরে

৭.৫০ ৩০ মূঠা করে উপরে তুলল—লাল সেলাম। প্রত্যভিবাদন জানাল পাঞ্চালী। মাটিতে এসেও এসেও কজি উলটে ঘড়ি দেখলেন ভোলানাথ। এখনও গীতা, রুমি ওরা এল না। পাঞ্চালী বলল, না, কিন্তু এখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে.....প্রকাশেরও তো আসার কথা। ওরা তিনজনেই বিড়ি ধরাল। তিন মিনিটের মাথায় এসে গেল বাকি তিনজন। ওক হয়ে গেল মিটিঙ।

কমরেডস্, শ্রদ্ধেয় নেতা অমর শহীদ কমরেড চারু মজুমদার আর আমাদের অন্তরের দেতা কমরেড মতাদেব মুখার্জির পথে চলে আমরা কিছুটা হলেও আবার সেই সস্তর সালের উদ্‌গমন। সৃষ্টি করতে পেরেছি.....আবার ঝড় আসছে.....প্রতিদিন আমরা একটু একটু করে এগোচ্ছি, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে.....পাতা নড়ার শব্দে কেঁপে উঠছে ওরা। একদমে এত কথা বলে ভোলানাথ থামলেন। দম নিয়ে আবার শুরু করলেন।

কিন্তু কমরেডস্ আমাদের আত্মসম্মতিতে ভুগলে চলবে না একটা আ্যাকশনের পর আরও আ্যাকশন, আরও আ্যাকশন করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভোলানাথ বলে চললেন আগামী কাজকর্মের কথা। — হুগলি জেলায় শেওড়াফুলিতে আমাদের প্রভাব বাড়তে পেরেছি ঠিকই কিন্তু এখানে এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে আমাদের। আবার বিরতি। একটা খারাপ খবর দিই, ভোলানাথের কণ্ঠ খাদে নামল। — জানি আপনারা কষ্ট পাবেন, তবু বলা দরকার। গতরাতের ঘটনা। চুচুড়ী একটা জুতোর দোকানে দেশব্রতী বাঙালি দেবার সময় কমরেড বলরামদাকে পুলিশ ধরে, তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে ওকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মেরেছে শয়তানী। পাঞ্চালী আর্তনাদ করে উঠল, আহ সে কী! বলরামদাকে....। কথা শেষ করবই আগেই গলা ধরে গেল। চোখের জল বাধ মানল না। আর কত জীবন যাবে? আর কত কষ্ট পেতে হবে?

ভোলানাথের চোখেও অশ্রু। অশ্রুর ধারায়। উনি আজকাল খুব সহজেই গাঢ়ালালার অভিনেতার মতো চোখে জল আনতে পারেন। ওর বলার ভঙ্গীও তেমন। বিষ্ময়ের পথে এমনই রক্ত দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়.....শ্রদ্ধেয় নেতা বলেছেন....

জানা-চেনা কথাগুলিই বলে যাচ্ছেন ভোলানাথ। পাঞ্চালী ভাবছিল অন্য কথা। বলরামদা তাঁর ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে। লিন-বিরোধী হবার পর আর নিরুপম থাকে না ওইখানে। এ-দিক ও-দিক ঘুরতে গিয়ে পাঞ্চালীরও আর থাকা হয়ে ওঠেনি। নিরুপমের পর ভোলানাথদারা ওই আশ্রয় ব্যবহার শুরু করলেন। বলরামদা নিশ্চয় সংকোচবশত না বলতে পারেননি। তারপর ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লাগান হল চিঠি দেওয়া নেওয়ার কাজে। ক্রমশ দেওয়া হল দেশব্রতী বিতরণের কাজ। নকশাল-সমর্থক হলেও এত বিপজ্জনক দায়িত্ব নিতে কী মনে মনে তৈরি ছিলেন বলরামদা? মনে হয় না। কিন্তু ওঁর যা লাজুক স্বভাব, সরাসরি না বলে কারুর কাছে অপ্রিয় হওয়া গাড়ে নেই। এদিকে ভোলানাথদা আর বলরামদা কেউই তো নিরুপমের মতো সাবধানী নন। নিশ্চয় জানাজানি হয়ে থাকবে সবকিছু। বলরামদার মৃত্যু কিছুতেই মানতে পারাছিল না পাঞ্চালী। মানুষটি এত অমায়িক, সজ্জন। কাউকে তো খুন করেননি, তবু তাকে ওল করে মেরে দিল পুলিশ! অন্য কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা সংগঠন এর প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসবে না। এই সময়েই মনে হয় গোপন দলের পাশাপাশি নিজেদের জানা-চেনা

সংগঠনও জরুরি, যারা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়বে। ঠাট্টা করলেও নিরুপম এই কথাটাই বলত— ‘ওপেন’ আর ‘গোপেন’-কে মেলাতে হবে আমাদের। কথাটা বলেই হা-হা করে হাসত। ওপেন আর গোপেনে বোঝাপড়া হয় না বলেই এত সমস্যা। ওপেন বলে সব আমরাই পারব আর গোপেনেরা বলে ওপেনেরা সব আরামখোর, ভিতুর ডিম.....

সাহাগঞ্জ এলাকার শ্রমিকদের নিয়ে একটা অ্যাকশন করতে হবে....., ভোলানাথের গলা উচ্চগামে। — কমরেড বলরামদাকে হত্যার বদলা নেব আমরা। সবাই একমত। অ্যাকশনের পরিকল্পনা হয়ে গেল। ঠিক হল, পনের দিন পরে কোতরং পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অন্তত দু’টি পুলিশ খতম করতে হবে।

পার্টির বর্তমান লাইন নিয়ে কারুর কোনো প্রশ্ন আছে? ভোলানাথ বললেন। সবাই চুপ। প্রকাশ গলা ঝড়ল। ভোলানাথ ওর দিকে তাকালেন। অন্যদের নজরও ওই দিকে। প্রকাশ বলল, চিনের পার্টি তো সোজাসুজি লিন পিয়াও-কে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এর বিরুদ্ধে মানে লিনের সমর্থনে একটি কথাও বলেননি মাও সে-তুঙ.....এ অবস্থায় আমরা কেন লিন-কে আঁকড়ে পড়ে আছি? প্রকাশ অন্ধে তুখোড়। কালকুলাস ওর কাছে জলভাত। নিরুপমের তোলা প্রশ্নটাই আবার তুলেছে ছেলেটা। এমন একটা ধাঁধার মুখে পড়ে ভোলানাথ হতভম্ব। দশ সেকেন্ড কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর মুখ খুললেন। মাও সে-তুঙ-কে হয়তো ওরা বন্দি করে রেখেছে, কথাও বলতে দিচ্ছে না। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা বারে-বারে বলে গেছেন লিনের কথা। আমরা লিনের পথ মেনে চলব, তার বিরোধিতা হবে সংশোধনবাদ.....বিপ্লবের পথ ঠিক কিছুতেই সরে যাব না আমরা। বলতে-বলতে তেতে উঠলেন ভোলানাথ। — আজ আমরা বুঝতেই পারছি চিন পার্টি ঘুরে গেছে.....নেতৃত্ব দখল করেছে প্রতিক্রিয়াশীলরা.....ওরা আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছে। কমরেডস্, আজ এই অবস্থায় বিশ্ববিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র হয়ে উঠবে ভারতবর্ষ.....আমাদের দিকে তাকিয়ে সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ.....এই জন্যই আজ প্রয়োজন শ্রদ্ধেয় নেতার কথা মেনে চলা, প্রয়োজন অন্তরের নেতার প্রস্তাব অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া। হাত মুঠো করে উপরে ঝুঁড়ে দিলেন ভোলানাথ। নিচু গলায় বললেন, চিন পার্টি ইঁশিয়ার, মহাদেব মুখার্জি হ্যায় তৈয়ার.....। সম্পূর্ণ আকস্মিক, নতুন, মজার এই গ্লোগানে কেউই গলা মেলাল না। দ্বিতীয়বার গ্লোগান দিলেন ভোলানাথ। পাঞ্চালী আর প্রকাশ ছাড়া ধূয়ো দিল সবাই।

এত হইচইয়ের মধ্যেও বলরামদাও মুখ ভুলতে পারছিল না পাঞ্চালী। প্রশ্ন তুলল। আমাদের কি কোনো গুণগোল হচ্ছে? গীতা মাথা নাড়ল, আমারও তাই মনে হচ্ছে, না-হলে একের-পর-এক সবাই ধরা পড়ে যাচ্ছে কেন? রুমি বলল, সুতোয় একপ্রান্ত ধরেই কী করে এত তাড়াতাড়ি অনাপ্রাণে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ? টান পড়লেই মাঝখানে থেকে কেন কেটে ফেলা যাচ্ছে না সুতোটিকে? চোখ বড় বড় করে তিনজনের দিকে তাকালেন ভোলানাথ। হ্যাঁ, আমিও এই কথাতেই আসতাম.....আমাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ গোপনে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে.....তারাই ফাঁস করে দিচ্ছে সব। এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। পাঞ্চালী প্রতিবাদ করল। — প্রমাণ না পেয়ে কমরেডদের সম্পর্কে এমন বলা ঠিক নয়, তা ছাড়া আমাদের পদ্ধতিতেও গোলমাল থাকতে পারে.....হয়তো

দুটো পাখানা ওগার, ততটা হাঁচি না আমরা....কে কোন কাজের যোগ্য তা বিচার বিশ্লেষণ না করেই তাকে তাই দেওয়া হচ্ছে...। — মোটেই তা নয়। ভোলানাথ খামিয়ে দিলেন পাকালীকে। আমাদের আর সব ঠিক আছে কিন্তু কিছু পুরোনো লোকজন দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে....। বলতে বলতে হঠাৎ পাঞ্চালীর দিকে আঙুল তুললেন ভোলানাথ। — একটা আগেই তোমার কাছে অ্যান্টি-লিন গ্রুপের কেউ এসেছিল? পাঞ্চালী বুঝে গেল বিশ্বনাথ এর মজরে পড়ে গেছে। কিন্তু দমে যাবার কোনো কারণ নেই। সে কোমো অলমায় করেনি। হ্যাঁ নিরুপমের চিঠি নিয়ে এসেছিল। সমস্ত ঘটনাই বিশদে জমািল পাকালী।

ভোলানাথ গিরত। ছেলেটিকে তো এই জায়গা চিনিয়ে দেওয়া হল।

ভোলানাথ কী আছে? এই শেলটার পুরনো.....নিরুপম জানে.....জানে বলেই এখানে চিঠি পাঠিয়েছে...

ভোলানাথ মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন যুক্তি।

ও আগে আমাদের সঙ্গে ছিল, এখন নেই, এখন নিরুপম লিন-বিরোধী, জাতিবিদ্বেষী।

এ আগার কী কথা। ও আমার জীবনসাথী, আমায় চিঠি পাঠাবে না?

তোমার বাস্তবিক সম্পর্ক বড় হল? আমাদের কমরেডদের কথা ভাবলে না একবার? এই পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা ঘৃণা....

লোকটা বাজে বকছে। তার মিকাল। যে পাকালী পাঠায়নি জানবার পরেও একই কথা বলে চলেছে। তার আসল রাস, সঙ্গে বড় নিরুপমের ওপর। গোড়াই যাচ্ছে নিক দল জড়িয়েও এর জাতি লোকটির জন্যে কিছুই করেনি।

ভোলানাথ বললেন, নিরুপম (এ) এইবার সব খবর পুলিশে গাঁস করে দেবে....দর। পড়ে ধাবে দর। তুমিও বাদ গাবেন না....

নিরুপম মোটেই করেনি না এমন কাজ....তখন চলে এতদিনে করেনি দিত। পাকালীর কঠোর দৃষ্টি। আলনি অনর্থক এমন কথা বলছেন....

ভোলানাথ পাকালীর চালানুত্তোর চলল। অনারা শুক। কী বলবে ভাবে পাচ্ছে না। ওঠাও ভোলানাথ খেমে গেলেন। পাঞ্চালীও চুপ।

কিছু পরে নীরবতা ভাঙল। — তুমি আর এক ঘন্টার মধ্যে এই শেলটার ছাড়বে। পাকালীর দিকে তাকালেন ভোলানাথ। দৃষ্টি শীতল। ভঙ্গিতে আদেশ। তার বক্তব্য, এই আশ্রয় আর কোনোমতেই নিরাপদ নয়। পাঞ্চালীকে অবিলম্বে এই জায়গা ছেড়ে তিন নখর রাস চলে চলে যেতে হবে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে পূর্বদিকের গুলিমাতে যে চায়ের দোকান, তার পাশেই থাকবে তপেশ। সে পাঞ্চালীকে নিয়ে যাবে মিসেস স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। সেখানেই নতুন আশ্রয়।

আমি তপেশকে জানিয়ে দিচ্ছি....ও ঠিক চারটের সময় ওইখানে থাকবে....সেই বুঝে এ মিক ও মিক গুরে যেও....। ভোলানাথ উঠে পড়লেন। পুলক, মনোতোষও। কিছুক্ষণ পর করবার পর গীতা কুমি প্রকাশও রওনা দিল।

কিছুই হবে না। অকারণে ভয় পাচ্ছেন ভোলানাথদা। কিংবা ভয় নয় শুধুমাত্র জেদ করে

সরালেন তাকে। রেগে গেলে মানুষ কীরকম যুক্তিহীন হয়ে যায়। তার পদাধিকার বলে ভোলানাথদা এই আদেশ দিতে পারেন। দলের নিয়ম অনুযায়ী সেই আদেশ মানতে বাধ্য পাঞ্চালী। ঝোলার ভেতর উঁকি মারল একবার। শাড়ি, অন্তর্বাস, দাঁত মাজার সরঞ্জাম আর গামছা— এই চারটি বস্তু তো সবসময় ঝোলাতে থাকে। দুটো ইস্তাহারও ভরে নিল পাঞ্চালী।

তিন নম্বর বাস গুমটির দক্ষিণে শ্যামবাজার পাঁচমাথা। পাঁচমাথায় পৌঁছে চায়ের দোকান খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কিন্তু তপেশ নেই। অবশ্য সময় পেরোয়নি। তার ঘড়িতে তিনটে পঞ্চাশ। পাঁচমাথার মতো ব্যস্ত জায়গাতেও কেন যেন যানবাহন কিছু কম। মৃদুমন্দ গতিতে একটা চেতলাগামী দোতলা বাস বেরিয়ে গেল। তেমন ভিড় নেই। খাকি জামা পরা এক ট্রামকর্মী লোহার রড দিয়ে ট্রাম লাইনের অভিমুখ পালটাল। তারপরেই বেলগাছিয়ার দিক থেকে আসা একটা ট্রাম ঘট্যাং ঘট্যাং করে চলে গেল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের দিকে। ওপার থেকে একজন বয়স্ক লোক রাস্তা পার হয়ে এসে পাঞ্চালীর পাশ দিয়ে গেলেন। চাউনিটা ভালো লাগল না। রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে থাকলে পুরুষদের এমন লোভী চাউনি বিদ্ধ করবেই। চায়ের দোকানে বেশ ভিড়। কলরব শোনা যাচ্ছে। দোকানের ভ্যাপসা উষ্ণতা বাইরে দাঁড়িয়েও টের পাওয়া যায়। ঘড়ি দেখল পাঞ্চালী। আরও পাঁচ মিনিট। খিদে পাচ্ছে খুব। বেরোবার আগে খেয়েছিল চারটে বিস্কুট আর একভাঁড় চা। খিদে মরেনি। সিঙাড়া ভাজার গন্ধ এল হাওয়ায়। পাশের দোকানে ভাজা হচ্ছে। কালো কড়াইতে অন্তত পঁচিশ তিরিশটি সিঙাড়া। সিঙাড়ার রঙ ক্রমশ সাদা থেকে বাদামি। দুটো কিনে ফেলল পাঞ্চালী। গরম সিঙাড়া খেতে হয় সাবধানে। বেশি উৎসাহী হলে জিভ পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। খেতে খেতে পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়ে দেওয়া যায়। সামনে দিয়ে একটা সাদাগাড়ি আস্তে আস্তে চলে গেল। গাড়ির কোন্সো যাত্রী কি নজর করল তাকে? একা দাঁড়ালে এমনটা হবেই, জানে পাঞ্চালী। কিছু পরে দ্বিতীয়বার ঘুরে গেল গাড়িটা। কোনো ঠিকানা খুঁজছে নিশ্চয়। চারটে তো বাজল কিন্তু তপেশের দেখা নেই।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের দিক থেকে একটা লোক রাস্তা পার হয়ে পাঞ্চালীর দিকে এগিয়ে আসছে। হলুদ জামা, কালো ট্রাউজার। উচ্চতা ছ-ফুটের কাছাকাছি। বাম কপালে কাটা দাগ। ও কী তাকে চেনে? লোকটির জুতোর দিকে নজর গেল পাঞ্চালীর। থ্যাবড়া মাথা, কালো বুট। নাল লাগান। শব্দ উঠছে খট্ খট্। এ তো পুলিশ! ডানদিকে সাদা গাড়িটা এসে থেমেছে। আর দাঁড়ান নয়। দিনেন্দ্র স্ট্রিটের দিকে জোরে হাঁটা শুরু করতেই লোকটা তার নাম ধরে ডাকল। ওর দিকে না তাকিয়েই গতি বাড়াল পাঞ্চালী। ইস্তাহার দলা পাকিয়ে ফেলে দিল রাস্তায়। হলুদ জামা দ্রুত ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

—আপনি পাঞ্চালী মিত্র তো? কোনো উত্তর দেবার আগেই লোকটি বলল, আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করব। পাঞ্চালী বুঝতেই পেরেছে, কিন্তু ভাঙল না।

—আপনারা কে?

—পুলিশের লোক

—আমাকে গ্রেপ্তারের কারণ কি? পরোয়ানা কোথায়?

পিছন থেকে দুটি লোক এসে চোপে ধরল পাঞ্চালীর দুই হাত। একটি লোক ধুতি শার্ট পরা, অন্যজন সাদা জামা কালো প্যান্ট। ডানদিকের লোকটি কাঁধের ঝোলা কেড়ে

পুলিশ! আটটা-নটার টান দিল হৃদয় জামা। সাদা গাড়িটি দেখিয়ে বলল, গাড়িতে উঠুন।
লাফালী খাড়া।

কারণ না দেখালে আমি যাব না.....

৩ টা লোকটি কুৎসিৎ মুখভঙ্গি করল এইবার।

আমরা আপনাকে কারণ দেখাতে বাধ্য নই, গাড়িতে উঠুন....উঠুন বলছি

তাহলে আমিও আপনাদের কথা শুনতে বাধ্য নই....

পুলিশের লোকদুটি ঠেলতে পাফালীকে। একটি লোক নিতম্বে চাপড় মারল। মাথা ঘোরাতেই আটটা-নটার টান দিল হৃদয় জামা— চলুন চলুন.....।

পুলিশকে এমন গা খুশি করবার অধিকার দিয়েছে সরকার। আশপাশে ছোটখাট ভিড় জমে উঠেছে, কিন্তু কেউই কিছু বলছে না। প্রকাশ্যে একজন মহিলার সন্ত্রাসহানি করেছে পুলিশ। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে কতকগুলি বর্বর কিন্তু উপস্থিত জনতা মুক দমক। কলকাতার মানুষ কি প্রতিবাদ করবার সাহস হারিয়ে ফেলল? কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। পাফালী চৎকার করে উঠল, দেখুন আমি রাজনৈতিক কর্মী.....এই সাদা পোশাকের পুলিশ কোনো কারণ না দেখিয়ে, বিনা পরোয়ানায় আমায় জোর করে তুলে নিয়ে গাছে। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক পুলিশের পথ আটকাইলেন। আপনারা পরোয়ানা দেখাচ্ছেন না কেন? অসুবিধে কোথায়? পকেট থেকে স্মিডলবার বের করল হৃদয় জামা। গাঁচয়ে উঠল। কোনো জবাবদিহি করব না....চ্যাল...হট হট...। ভদ্রলোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে পাফালীর আটটা-নটার টান মারল লোকটি। নিমেষে শাড়ি অবিন্যস্ত। আবার গলা তুলল পাফালী। আপনারা দেখুন....একজন মানুষ নয় এরা কুকুর....মানুষ সম্পর্কে কোনো সম্মানবোধ নেই এই কৃত্তাদের....আজকে আমাদের আক্রমণ করছে, কালকে আপনাদের উপর আক্রমণ লাগবে...সানসান...তোনা....

আর বলবার সুযোগ পেল না পাফালী। তিনজনে ডাপটে ধরে তাকে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে। হৃদয় জামা তার ডান দিকে, বাম দিকে সাদা জামা। ধূতি শার্ট বসল সামনে। গাড়ি চলতে শুরু করল।



তাম্রা খুশি। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে লাফিয়ে, চাকরি নেই। এদিকে শহরের সাদা দেওয়ালে আলকাতরায় লেখা সমাজবাদী স্লোগান—গরিবি হটাও। পথচারীদের কেউ বলে, গরিবি হটাও না, গরিবরা হটে যাবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের খবরের কাগজে কমিউনিস্ট বিরোধী কলমাটি পশ্চিমবঙ্গের খোষ পর্যন্ত লিখে বসেছেন, 'গরিবী হটানো একটা আত্মশলন সর্বশ্ব আত্মবিকার তেই অধিক মর্যাদা আজও অর্জন করল না।'

১৯৭৪ এর প্রথম থেকেই গুজরাত উদ্ভাস। নবনির্মাণ সমিতির ডাকে প্রতিবাদ মিছিল। আলি বাজিয়ে দাম বাড়ার নিষা করেছে মিছিলের মানুষ। ডুখমিছিলে গুলি চালাল পুলিশ। একবার নয়, দু'বার। মানুষ খেপে গেছে। এর পরেই বিহারে ছত্র যুগ বিদ্রোহ। তাদের

দাবি তেরো দফা। প্রধান তিনটি দাবি—মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকার সমস্যার সমাধান আর শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। দাবি পূরণের লক্ষ্যে ১৮ মার্চ ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে বিধানসভা অভিযান। লাঠি, গুলি চলল। নিহত পাঁচ, আহত কুড়ি। সংঘর্ষ বেড়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়েছে। আরও একশো নিহত। পাটনা, বিহার শরিফ, রাঁচি, গয়া, মুঙ্গের, ছাপরা আর বেতিয়ায় সাক্ষ্য আইন জারি। ২৩ মার্চ বিহার বন্ধ। ১২ এপ্রিল আবার পুলিশের গুলি — আটজন নিহত।

বিস্কুদ্ধ রেলশ্রমিকরাও। তাদের দাবি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের যে বেতন, তাই দিতে হবে তাদের। বোনাস চাই। কাজের সময় সর্বক্ষেত্রে অনধিক আটঘন্টা। ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাস্ত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার। ৮মে থেকে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সতেরো লক্ষ রেল কর্মচারী।

চারুপন্থী-লিন পিয়াও বিরোধীরা একজোট হচ্ছে। চিন পার্টির পরামর্শ মেনে আগেকার ভুলভ্রান্তি শোধরানোর চেষ্টা করছে তারা। চলমান শত্রুর সঙ্গে লড়াতে লড়াতে গণফৌজ গড়তে হবে, তারপরেই ঘাঁটি এলাকা — এমন কথা তো ছিলই, তার সঙ্গে বিহারের কমরেডরা যোগ করেছেন নতুন কৌশল। ভোজপুর জেলার গরিব কৃষকরা অস্ত্র হাতে একজোট হয়ে জমিদারদের অত্যাচার ঠেকাতে শুরু করেছে। বিহারের নেতা সুরত দস্ত। সবাই তাকে জহর বলে জানে। তার সঙ্গে আছে রঘু — স্বদেশ ভট্টাচার্য। ধর্মমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া — পশ্চিমবঙ্গের এই চারটি জেলাতে প্রো- সিএম, অ্যান্টি-লিন-দের প্রবল উপস্থিতি। আন্দোলন ঠিকমতো পরিচালনা করতে মার্চের প্রথম দিকে তারা বানিয়েছে স্টেট লিডিং টিম। তাদের নেতা বিনোদ মিশ্র। সুকান্তিদাও আছেন এই টিম। উনি অবশ্য এখন কিছুকাল বিহারে। বহুদিন পরে ওর সঙ্গে আবার চিঠি বিনিময় করতে পেরেছে নিকুপম। সুকান্তিদার কথা মেনে সে এই লিনবিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এদের কাজকর্মে যুক্তি আছে, তবে সংগঠন আরও দ্রুত বাড়ান দরকার। যাদের ছেড়ে এসেছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই লিনপন্থী কমরেডদের সঙ্গেও আলাদা করে আলোচনা করতে হবে। লেগে পড়ে থাকলে ওরা বুঝবে নিশ্চয়। প্রথমে হুগলি, কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে মতবিনিময়। তারপর যাওয়া যাবে উত্তরবঙ্গে।

হিন্দমোটরের লিনপন্থীদের সঙ্গে বসল নিকুপম। তার প্রশ্ন সহজ। আপনাদের কী মনে হয় না, সরকার ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে...দমন-পীড়নের ব্যাপারে তারা অনেক বেশি মরিয়া? অসিত, স্বপন, ইন্দ্র তিনজনেই মাথা নাড়ল — অবশ্যই।

ইন্দ্র বলল, বহুগুণ বেড়ে গেছে...এখন প্রতিবাদী মিছিলের ওপর ওরা নির্বিধায় লাঠি, গুলি চালাচ্ছে, গুলি লেলিয়ে সভা ভেঙে দিচ্ছে...

কাউকে একটু অস্বী মনে হলেই তাকে মিসায় ধরে নিচ্ছে পুলিশ, অসিত বলল। স্বপন সমর্থন করে। মাথা চাড়া দিলেই, মাথা ভেঙে দাও...মানুষ ভয় পাবে আর তবেই তো বিনা প্রতিরোধে জনগণেরা কাজকর্ম চালান যায়....এই সরকার এখন খোলাখুলি মানুষথেকে....

বাঃ...বাঃ... একেবারে সঠিক কথা। নিকুপম বলল। আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। ওরা তিনজন তাকাল। নিকুপমের চোখ চঞ্চল। প্রতিবাদী মানুষের ওপর নেমে আসা অত্যাচার রোখা একটা বড় কাজ এখন, তাই না কমরেড?

বলল বলল, সেই জেনোচ তো আবার পুলিশ খতম শুরু করেছি আমরা.....শাসক
অত্যাচার করবার আগে দু'বার ভাববে.....

কিন্তু যারা পুলিশ খতম চায় না অথচ দমন ব্যবস্থা প্রতিরোধ করতে চায় তাদেরকে
লক্ষ্যে নেব না আমরা? নিরুপম বলে। ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি। ব্যাখ্যা করে নিরুপম।
আজকে সাধারণ মানুষ চাইছে এই অন্যায় অত্যাচারের থেকে পরিত্রাণ। তাদের মনের
কথা হল, তোমরা যারা মনে কর এই নরখাদককে আটকান দরকার, তারা আলাদা ছড়িয়ে
থেকো না, একজোট হও। সবাই মিলে রুখে দাঁড়াও এই বর্বর অত্যাচারী পশুদের বিরুদ্ধে।
মলমলকে তাদের থেকে বাঁচাটাই জনগণের স্বার্থ। আর এইটাই এখন পার্টির স্বার্থ হওয়া
উচিত। আজকে ছোটবড় এতগুলি রেল শ্রমিক ইউনিয়ন বিভেদ ভুলে একমঞ্চে এসে
লড়তে নামছে। কেন? সাধারণ শ্রমিক চাইছে ঐক্যবদ্ধ লড়াই।

ইশ্রু আর অসিত মাথা নেড়ে সায় দেয়। স্বপন বলে, অনেকে গোপন সংগঠনে থাকতে
চায় না, সাহস নেই....

নিরুপম খামিয়ে দেয়। না থাকুক। যে যতটা এগিয়ে এসেছে, সেখানেই দাঁড়াক, আমরা
এগিয়ে তার হাত ধরব। সব রকমের প্রতিবাদীর হাত ধরবার মতো মনের প্রসার থাকা
উচিত আমাদের। তবেই গড়ে উঠবে বহু মানুষের জোট। তাকে ভয় পাবে শাসককুল।

অসিত বলল, তাহলে কী প্রকাশ্য গণসংগঠনও গড়ব আমরা? সি এম তো এমন
গলেননি.....

অশ্বিনী বলেছেন। নিরুপম বলল। কমরেড সি এম এমন একজন মানুষ যিনি বুঝতে
পেরেছিলেন কাজের ডুল। ডুল মেনে নিয়েই শোধরাবার পথনির্দেশ দিয়েছেন। খতমের
কৌশল সিরিয়ে সমর্থন করেছেন ফসলক্ষ্যের আন্দোলন। মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন,
নারবার। সেই হায়োজো, আগে যাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের নিয়ে কাজ করবার
কথা বলেছেন। তাঁরা গোস্তার না হলে হয়তো ২০ জুলাই ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে প্রকাশ্য
মিউল নেব ওতো কলকাতার গাওয়া। একটি থামল নিরুপম। তারপর বলল, আপনারা সবাই
ওঁর 'জাগরণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ' পেখাটা বারে বারে পড়ুন....দেখুন আমি ঠিক বলছি কী
না?

আলোচনা চলল। নিরুপমদের লিনবিরোধী গ্রুপেও প্রকাশ্য গণসংগঠনের রাস্তা এখনও
নোওয়া হয়নি। একরকমের গোপন গণসংগঠন শুরু হয়েছে। বাঁকুড়ার দায়িত্বে থাকা কমরেড
শান্ত গড়েছেন 'কমিউনিস্ট যুব সমন্বয়', তাদের পত্রিকা লালরক্ষী। হাতে লেখা পত্রিকা।
সাইক্লোস্টাইল করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একই কায়দায় 'কমিউনিস্ট নারী
সমন্বয়' বের করেছে সাহসী বোন। কমরেড শান্ত'র তত্ত্বাবধানে বাঁকুড়া আঞ্চলিক সংগঠনী
কমিটি বের করেছে শ্রেনীসংগ্রাম নামে একটি মাসিক পত্রিকা। ফুলস্ক্যাপ, চার পাতা। এতে
সি পি আই (এম-এল), চারু মজুমদারের কথা থাকে, মাও সে-তুঙের কথা থাকে। বোঝা
যায় এরাও নকশালপন্থী কিন্তু শুধুমাত্র খুন খারাবিটা পথ নয় এদের। বসে যাওয়া সমর্থকদের
আগেই যোগাযোগ করে। স্টেট লিডিং টিম তৈরি হবার পর এই পত্রিকা নাম পালটে হয়েছে
শ্রেনীসংগ্রামের দেশব্রতী। হিন্দমোটরের বন্ধুদেরকে এইসব কথা, তার অভিজ্ঞতার কথা বলে
যায় নিরুপম। ওরা মুগ্ধ। ওরা নিরুপমের সঙ্গে যোগ দেয়।

হিন্দমোটরের পরে হুগলিঘাট, কোন্নগর, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী, উত্তরপাড়া ইউনিটের সঙ্গে বসল নিরুপম। ওরা দলে আসছে। তাদের দল ভাঙানোর জন্য মহাদেব মুখার্জি গম্পের কমরেডরা রেগে গেছে। ভোলানাথ পারলে তার গর্দান নিয়ে নেবে! বিশ্বনাথ খবর আনে। নিরুপম মজা পায়। আরে বাবা! যুক্তির সঙ্গে যুক্তি দিয়ে লড়, খামোকা গলার মাপ নেওয়া কেন?

পাঞ্চালীকেও আর একবার বোঝাবার ইচ্ছে হল নিরুপমের। বিশ্বনাথকে পাঠাল চিঠি দিয়ে। কিন্তু পাঞ্চালী উত্তরপাড়া থেকে চলে গেছে। — সে কী? কোথায় গেল? বিশ্বনাথ বলল, কলকাতায় যাবার কথা, কিন্তু কোন এলাকায়, কেউ তা বলতে পারে নি। নিরুপম দমে গেল। এ-খবর সহজে জানবার কোনো উপায় নেই।

কলকাতায় যাতায়াত বাড়াল নিরুপম। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরলেও পাঞ্চালীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। আশ্চর্য! কোথায় গেল মেয়েটা? পাঞ্চালীর খোঁজের পাশাপাশি লিনপঙ্খীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও চালিয়ে যায় সে।

শ্যামবাজার, মানিকতলার পুরনো বন্ধুরা নিরুপমের যুক্তি মেনে নিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ইউনিটগুলির অধিকাংশই তার সঙ্গে একমত। শুধু বাঁশদ্রোণীর কমরেডরা উলটো কথা বলল — তোমরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেছ, ক্রমশ নিয়ে আসছ শান্তিপূর্ণ পথের সংশোধনবাদী চিন্তা। নিরুপমের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি নয় ওরা। খারাপ লাগল। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। সুযোগ পেলেই বসতে হবে ওদের সঙ্গে।

অল্প সময়েই দলের মধ্যে নিরুপমের গুরুত্ব বেড়ে গেল। রাজ্যের অন্যতম প্রধান নেতা কমরেড গোপাল ত্রিবেদী তার ওপর খুবই ভরসা রাখেন। কোনো জটিল কাজ এলেই নিরুপমের সঙ্গে পরামর্শ করেন জি টি। বিহারের লিনবিরোধীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমভাবাপন্নদের যোগাযোগ গড়ে তোলা দরকার। মিলেমিশে গড়তে হবে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। সব খবর দিয়ে সুকান্তিদাকে চিঠি লিখল নিরুপম।

দূত মারফৎ সুকান্তিদার উত্তর এসে গেল। উনি নিরুপমকে পাটনায় ডেকে পাঠিয়েছেন—আজ রাত্তিরে ট্রেনে চাপ, কাল সকালে পাটনা। কাল সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে পাটনা মিউজিয়মের ভেতরে থেকো। তাড়া থাকলে পরশু সকালের ট্রেন ধরে ফিরে যাও। সকাল ছটা পঁচিশে তুফান এক্সপ্রেস পেয়ে যাবে।

সব শুনে জি টি বললেন, ঠিক আছে তুমি ঘুরে এস...এসে রিপোর্ট দিও।

সময়ের কিছু আগেই পাটনা মিউজিয়মের দরজায় পৌঁছে গেল নিরুপম। স্থানীয় মানুষরা মিউজিয়মকে বলে যাদুঘর। ছোটবেলায় নিরুপম আর স্কুলের বন্ধুরাও মিউজিয়ম না বলে যাদুঘরই বলত। শীতের ছুটিতে ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু ব্যাগে ভরে নিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হত চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর।

দেখেই বোঝা যায় কলকাতার তুলনায় পাটনা মিউজিয়ম বয়েসে অনেক ছোট। তবে এই মিউজিয়ম চত্বরটি বেশ শাও। অনেক গাছ, সবুজ হয়ে আছে। গ্রীষ্মের তাপে গাছগুলি ক্লান্ত মলিন হয়নি এখনও।

সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে মিউজিয়মের ভেতরে ঢুকল নিরুপম। বামদিকের ঘরে পা বাড়াতেই দেওয়ালে চোখ আটকে গেল। একটি অপূর্ণ ছবি। বিষয় — বৃদ্ধদেবের জীবনের

বকটি। জীবন তলায় লেগা পড়ে জানা গেল, এইটি থাকে। বহু পুরনো তিক্ততা শিল্পকর্ম। বেশ জটিল কাকাকা। শরীর অনুপাত জ্ঞান প্রথর। প্রায় দেড়ফুট-দু'ফুট আয়তক্ষেত্রে আঁকা এই জগতে প্রতিটি মানুষের অঙ্গ সংস্থাপনা, নাক মুখ চোখ কান, একেবারে নিখুঁত। পরিধান, পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক নিয়ম মেনে আঁকা। আরও অনেক থাকে আছে ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে।

জীব নেশার মতো। একটি দেখার পর অন্যটির দিকে যেতে ইচ্ছে করে। আবার ফিরে এসে তাকিয়ে থাকতে হয় ছেড়ে যাওয়া শিল্পকর্মটির দিকে। সাতান্ন বছরের পুরনো এই মিউজিয়ামকে থাকাকালি দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। উনি তিক্ততে গিয়েছিলেন যখন, লামারা উপহার দিয়েছিল।

ডুম্পিশ মুদ্রায় বসা বুদ্ধদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে গেল নিরুপম। গৌতম বুদ্ধের এমন ভঙ্গির ছবি আগে কখনও দেখেনি সে। ভালো করে দেখা দরকার। একটু বুকে মাথা এগোতেই পিঠে টোকা পড়ল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল নিরুপম।

লম্বা দাড়ি, মাথায় ফেটি জড়ান, উর্ধ্বাঙ্গে ফতুয়া, নিম্নাঙ্গে আধময়লা ধুতি। কাঁধে কালপেঁপে খোলা। চোখ দুটি কালো, মোটা ফ্রেমের রোদ চশমায় ঢাকা। ছানি কাটা হলে সাধারণত এমন চশমা পরা হয়। কে এই দেহাতী লোকটা? কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে।

আরে! সুকান্তিদা।

চশমা খুলে ফেলতেই পরিচিত চোখ মুখ হেসে উঠল। — কী...থাকছে দেখছে? রাহুলজী এমন আড়াইশো জীব উপহার দিয়েছিলেন একে। এছাড়াও দিয়েছেন, বেশ কিছু দুস্ত্রাপ্য তিক্ততা পাঁখ।

মিউজিয়ামের এই ঘরে দু'তিন জনের বেশি দর্শক নেই। একসময়ে তারাও চলে গেল। পাটির কথা আলোচনা করা যায় এইসার। কিন্তু সুকান্তিদা রাজি হলেন না। — এখানে নয়, রাতে মিটিং, তখন হবেন। এখন চল বেরনো যাক।

মিউজিয়ামের উল্লোটাদিকে পরপর কয়েকটি মিটির দোকান। ফুটপাথ ঘেঁষে চারটি ঢালা দাঁড়িয়ে। সুকান্তিদা বললেন, চল একটা মজার জিনিস খাওয়া যাক। রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের শেষ দোকানের সামনে দাঁড়াতে দেখা গেল একটা বিশাল লোহার কড়ায় নিমকি জাতীয় কিছু ভাজা চলছে। লম্বাটে গড়ন বস্তুর। শরীরে নানান প্যাঁচ খেলে গেছে। আর কিছু নেই দোকানে।

তজনী আর মধ্যমা তুলে সুকান্তিদা বললেন, দো চোঁ দিজিয়ে.....

এ আগার কী? নিরুপম বলল

সুকান্তিদা হাসলেন, একে বলে খাজা....এর চেহারা পুরীর মন্দিরের খাজার থেকে অনানকম, সেইজন্য চিনতে পারো নি...খেয়ে দেখ

লালচে করে ভাজবার পর বস্তুটিকে ফেলা হল রসভর্তি কড়ায়। দুটো শালপাতার চৌজয় একটি করে খাজা দিল দোকানদার। কামড় দিতেই কুড়মুড় করে মুখের ভেতর ভেঙে পড়ল খাজা।

সুকান্তি বললেন, কেমন?

আলোটা তো লাগছে, অনেকটা আমাদের জিবে গজার মতো, কিন্তু এর রসটা অত

ঘন নয়। নিরুপম বলল। — তাহলে কাউকে তুচ্ছ করতে আমরা খাজা কথাটা ব্যবহার করলেও খাবার হিসাবে খাজা কিন্তু ততটা খাজা নয়, কী বল? সুকান্তিদা জোরে হেসে উঠলেন। নিরুপমও হাসল, ঠিক বলেছেন.....। আচ্ছা নিম্নবর্গের জলখাবার বলেই কী খাজার এত বদনাম? সুকান্তিদা কোনো উত্তর দেবার আগেই নিরুপম ছদ্ম-গভীর গলায় চোখ বড় করে বলল, ব্যাপারটা সমাজতান্ত্রিক দিক থেকে অনুধাবন করা দরকার, কী বলেন? কফি হাউসের নিকাম, নিরীহ পশুিতেরা এমনভাবেই কথা বলে। রসিকতাটা বুঝলেন সুকান্তিদা। উনিও সহমর্মীর মতো মাথা নাড়লেন। — ঠিক বলেছেন স্যার, এই নিয়ে গবেষণা করলে ডক্টরেট না হোক কম্পাউন্ডরেট তো পেয়েই যাবেন।

খাওয়ার শেষে সুকান্তিদা টাঙ্গায় উঠলেন। উঠে এস। নিরুপমও চুপচাপ উঠে পড়ল। টাঙ্গাওয়ালাকে নির্দেশ দেওয়া হল— গান্ধী ময়দান। নিরুপম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আমরা যাচ্ছি কোথায়? সেইরকমই নীচু গলায় উত্তর এল, কাজের জায়গায়। ময়দানে নেমে রাস্তার উলটো দিকে যেতে যেতে সুকান্তিদা বললেন, ইচ্ছে করেই ঘুরপথ নিলাম। এখন এখানেও গোয়েন্দা পুলিশ বেশ সজাগ। যদিও আমার কোনো হৃদিশ এদের কাছে নেই বলেই মনে হয়, তবুও সাবধান থাকা ভালো।

অল্প কিছুটা হাঁটতেই বোরিং রোড। রাস্তা ধরে এগিয়ে বামদিকের গলিতে ঢোকা হল। একটি দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন সুকান্তিদা। ওঁর চোখ দেখে বোঝা গেল, এইখানেই আলোচনা হবে। বাড়ির সদর দরজা খোলা। দু-দিক একবার দেখে নিয়ে সুকান্তিদা বললেন, চল ঢুকে পড়ি। ভেতরে ঢুকতে নাবাল উঠোন। এককোণায় বিশাল চৌবাচ্চা। তার ঠিক পাশেই জল তোলা স্পাম্প। চৌবাচ্চার বিপরীতে দোতলা যাবার সিঁড়ি।

দোতলায় উঠতে উঠতে সুকান্তিদা বললেন, যার কাছে যাচ্ছি তারা প্রবাসী বাঙালি। এখানেই জন্ম, পড়াশুনো সব কিছু। বাংলা হিন্দি মেলানো অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষায় কথা বলে আমার সঙ্গে। দেবাশিস ঘোষ, ভারতী ঘোষ। তিনবছর হল বিবাহ হয়েছে, এখনও সন্তানাদি নেই। কর্তা ব্যাক্ত কর্মচারী। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমাদের সমর্থক। তোমার কথা ভেবে এখানেই সভা ঠিক হয়েছে, কারণ স্টেশন কাছে।

বামদিকের ঘরের সামনে দাঁড়াল ওরা। দরজায় কড়া, উপরে শিকলি। শিকলিটি দরজায় দুবার ঠুকলেন সুকান্তিদা। এতক্ষণ নড়ার করেনি নিরুপম, সুকান্তিদা হাত ওপরে তুলতে নজরে এল, ওঁর হাতের তালুর ইঞ্চি তিনেক নিচে অসুস্ত চার ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ। বোঝা যায় কিছুকাল আগেই সেলাই করা হয়েছে। ওইখানে হাত রেখে নিরুপম বলল, এইটা কী?.... তার কথা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই দরজা খুলে গেল। শ্রীময়ী মুখ। — এই যে ভারতী আমরা এসে গোলাম, সুকান্তিদা বললেন। ভদ্রমহিলা দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। — আইয়ে দাদা.... আসুন ভাইয়া। ওর শরীর ভাষায় বোঝা যায়, ওকে যতটা বলবার, বলে রেখেছেন সুকান্তিদা।

ভেতরে ঢুকে পাশের ঘরে গাওয়া হল। --- তাহলে নিরুপমবাবু.... এখন তুমি বিশ্রাম নাও.... রাত সাড়ে আটটায় সবাই আসবে। সুকান্তিদা হাসলেন। আমি একটু ঘুরে আসছি। ভারতী একবার এলেন। চায়া পিপেণা নাকি? সুকান্তিদা বললেন, না না আমি

কেউ না। তুমি পরে একে দাও। ভারতী হাসল। — হাঁ জি, ভাইয়া-কে তো দেবইআপনি কি একটু পি লিখিয়ে।

ভারতী অন্য খরে যেতেই নিরুপম জিজ্ঞাসা করল, কাটা দাগটা কীসের? সুকান্তিদা বললেন, তেমন কিছু না...পরে বলব'খন.....এখন তাড়া আছে, ঘুরে আসি। সুকান্তিদা বেরিয়ে গেলেন। মানুষটা অজুত। নিজের কথা বলতে খুব সংকোচ। কাটা দাগটা বেশ গভীর। কেউ কী ছুরি মারল ওকে? নাকি কোথাও দ্রুত পালাতে গিয়ে লোহার খোঁচা লাগল? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল নিরুপম।

সুকান্তিদা ফিরলেন পৌনে আটটায়। বাকি সবাই ঠিক আটটা পঁচিশে এসে গেল। মাটিতে গোলা হয়ে বসল সবাই। সুকান্তিদা কোমরের কষিটা একটু আলগা করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। ওর ঠিক ডান পাশে বসল কমরেড রামবাহাদুর, তারপর প্রমোদ, সুভাষ। বিপরীতে নিরুপম। অল্প কিছু সময় সৌজন্য বিনিময়ের পরেই আলোচনা শুরু হল।

নিরুপম বিশদে জ্ঞানাল পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি। আমাদের ইচ্ছা, আপনাদের মুখোমুখি এসে অভিভূত। বিনিময়, আর পার্টি পুনর্গঠন, নিরুপম বলল। কমরেড ভি এম এই কথাই জানাতে গেলেন। আপনাদের।

কথা বলতে বলতে নিরুপম লক্ষ্য করল, সুকান্তিদা মাঝে মাঝে হাই তুলছেন। চোখ ছোট হয়ে আসছে। বোঝা যায়, উনি বেশ ক্লান্ত। — যদি আপনারা রাজি থাকেন তাহলে ঠিক করা দরকার এই আলোচনা হবে কোথায়? আমরা এইখানে আসব? না, আপনারা পশ্চিমবঙ্গে যাবেন? সেক্ষেত্রে....। কথার মাঝে বিদ্যুৎ চলে গেল। পাশের ঘর থেকে দেওয়ালি এল, হাতে একটা লম্বা জুলাছে। কক্ষিটা সুকান্তিদার সামনে রেখে পকেট থেকে কয়েকটা মোমবাতি এনে করল। তারিচো মোমবাতি ভি রাখ দিজিয়ে। রামবাহাদুরের হাতে মোমবাতি দিয়ে চলে গেল দেওয়ালিস।

কমরেড সুভাষ বলতে শুরু করলেন বিহারের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। এখানকার লড়াই বেশ লজ। মাঝে মাঝেই পুলিশ ছাড়াও জমিদারদের ভাড়াটে গুন্ডা বাহিনী — সানলাইট সেনা, এক্সপ্লো সেনা — এদের সঙ্গে লড়াতে হয়।

সুকান্তিদার হাতের কাটা দাগ দেখিয়ে নিরুপম বলল, এইটা কাদের চিহ্ন? পুলিশ? না ভাড়াটে গার্দী? সুকান্তিদা খুব লজ্জা পেলেন। আরে ও কিছু না। কমরেড মহেন্দ্র গোপন কথা মাস করল। সানলাইট সেনার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দাদার হাতে গোলা লেগেছিল। হাড় ভাঙেনি। কিন্তু কিছুটা মাংস খুবলে গিয়েছে। সুকান্তিদা বললেন, আরে তেমন কিছু নয়...বাড়িয়ে বলছে এরা। মানুষটা সবসময় নিজেকে আড়াল করতে চান। জাহির করতে ঘোর আর্গি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই বোধহয় সুকান্তিদা বললেন, তবে এখানে কৃষকরা বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। বিনা প্রতিরোধে আর অন্যায় সহ্য করছে না।

কমরেড সুভাষ আবার বলতে শুরু করলেন বিহারের কথা। ওর কথার অমোঘ আকর্ষণ। শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। অওশেশ, উমেশ, সাজিদ সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। নিরুপম আড়চোখে একবার সুকান্তিদাকে দেখে নিল। তন্দ্রা এসে গেছে সুকান্তিদার। সুভাষ বলে চললেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগঠন গড়বার কৌশল, বিকাশের কথা। উনি সত্যিই অনবদ্য। বলার ধরনে কী যে মায়া! এড়াবার উপায় নেই।

হঠাৎ রামবাহাদুর চিংকার করল, আরে....আরে...। লম্ফ উলটে পড়ে সুকান্তিদার ধুতির কোঁচায় আঙুন ধরে গেছে। দ্রুত নেভানোর জন্য প্রমোদ আর অওধেশ দাদার কোঁচা হাত দিয়েই থাবড়াতে শুরু করল। সুকান্তির চটকা ভেঙে গেছে। মুখে একরাশ লজ্জা। — না, না....তেমন কিছু না, ঠিক আছে....ঠিক আছে....এত ব্যস্ত হয়ো না তোমরা। এই অবস্থাতেও ভদ্রতা করছেন সুকান্তিদা। নিরুপম রেগে গেল। — কোনটা ঠিক আছে? আঙুন লাগাটা? না এই নেভানোটা? উফ্ফ...সুকান্তিদা আপনি যা করছেন, তা কিন্তু শুধু বিনয় নয়....বিনয়ের আশ্ফালন। কমরেড সুভাষ হেসে উঠলেন। জব্বর বলেছেন। বিনয়ের আশ্ফালন! সঙ্গীদের ভোজপুরিতে ব্যাখ্যা করে দিলেন সুভাষ। ওরা হই হই করে হেসে উঠল।

কমরেড সুভাষ বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। দু-পক্ষের মুখোমুখি কথা বলা দরকার। নিরুপম জিজ্ঞাসা করল, কবে?

—জুলাইয়ের শেষ দিক হলে ভালো হয়, আমরাই যাব আপনাদের ওইখানে। সুভাষ বললেন। নিরুপম বলল, এইখান থেকে বর্ধমান পৌছন যায় সহজে.....

কিন্তু বর্ধমান নিরাপদ তো? সুকান্তিদা বললেন।

— না, না বর্ধমানে বসব না আমরা, আলোচনা হবে দুর্গাপুরে....

—বাঃ খুব ভাল। সুকান্তিদা বললেন। তাহলে তুমি সন্ধ্যাবেলায় সব, তারপর জানাও।

আলোচনা সেরে সবাই একে একে চলে গেল। শুধু সুকান্তিদা রয়ে গেলেন। উনিও সকালের ট্রেনে কলকাতা যাবেন। নিরুপম খুশি। একসঙ্গেই ফেরা যাবে। নিরুপম নামবে বর্ধমান। ট্রেন ঠিকঠাক চললে বিকেল পাঁচবেলা পৌছনোর কথা। সুকান্তিদা কলকাতা। কথায় কথায় কলকাতার কতকগুলি জায়গার সাংকেতিক নাম বললেন সুকান্তিদা। শ্যামবাজার — কৃষ্ণ, বউবাজার — স্ত্রী, বৈষ্ণবখানা — আড্ডা.....

কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব? নিরুপম তাকাল। সুকান্তিদা বললেন, তুমি বইপাড়ায় গোপালির দোকানে খোঁজ নিও...চিরকুট রাখা থাকবে। তুমিও আমাকে ওর মাধ্যমে চিঠি পাঠাতে পার। ওই আমার পোস্ট বক্স।

মৃদু হাসল নিরুপম। গোপালি এখনও নিজের গতিবিধি গোপন রেখে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। সেই তো তাকে বিদ্যাসাগরের মুণ্ড কাটার বিবরণী শুনিয়েছিল। ওর খবর একেবারে সঠিক। পরবর্তীতে কলেজ স্কোয়ারের জলের তলা থেকে উদ্ধার হয়েছিল সেই কাটা মুণ্ড! খবর দেবার বিনিময়ে গোপালি আদায় করে নিয়েছিল তার পরিচয় গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি। নিরুপম সেদিনও কাউকে বলেনি ওর কথা, আজকেও বলল না। মাথা নাড়ল শুধু। ঠিক আছে সুকান্তিদা....

বর্ধমান পৌছতে দু-ঘন্টা দেরি হয়ে গেল। অসুবিধে নেই। নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল নিরুপম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে চেনা জায়গায় পৌছতে অসুবিধা হল না। তার জন্য কমরেড ত্রিবেদী চিরকুট রেখে গেছেন — আমি আছি প্রিয়নাথদার বাড়িতে। সময় মতো চলে এস।

অঙ্ককার ঘন হতে বের হল নিরুপম। বর্ধমান স্টেশনে এসে ব্যাণ্ডেলগামী ট্রেন ধরল। পাণ্ডুয়া স্টেশন ছাড়তেই কামরায় চারটে মুখ দেখে চমকে উঠল সে। ওরা ফ্যান্সি ক্লাবের

জেল। লগাই জোতদারদের ওস্তা। মাঝে মধ্যে অকারণে গ্রামে হামলা চালায়। কাউকে নকশাল পক্ষেও হলেই খতম করে দেয়। পুলিশ-মদত রয়েছে ওদের পিছনে। তাকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলেছে জেলগুলো। কাঁধের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দিল নিরুপম। জামাকাপড় আর কয়েকটি দরকারি চিঠি। ভেতরে কোনো অস্ত্র নেই। ব্যাগুলের শেলটারেই তার অস্ত্র রাখা আছে। কিন্তু এখন কী করা যায়? ঝোলা থেকে হাত বের করল না নিরুপম। এমনভাবে হাত মাড়াচাড়া করল, যাতে মনে হয় রিভলবার আছে। বোমাও থাকতে পারে।

চোম্বাড়ে মার্কী জেলগুলো কিছুটা ঘাবড়েছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে। মাঝে মধ্যে ডাকাডাকি। বুঝতে অসুবিধা হয় না ওদের হাতেও এই মুহূর্তে অস্ত্র নেই। চলন্ত ট্রেনে ওরা হামলা করতে পারবে না। অর্থাৎ পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন থামলেই ওরা গাড়ি আটকাবে। তারপর তাকে মারধোর করে তুলে দেবে পুলিশের হাতে। সুযোগ হলে খতমও করে দিতে পারে।

ট্রেনের দরজায় এসে বাইরে তাকাল নিরুপম। চারদিকে অন্ধকার। অমাবস্যা। দু'ধারে মানক্ষেত সেরে সেরে যাচ্ছে। সামনের স্টেশন খ্যান। আর বেশি দেরি নেই। কামরার ভিতর দিকে ঢুকতেই ছেলে চারটে আড়চোখে তাকাল। সাহস হারালে চলবে না। ওদের পাশটা ভয় দেখাতে হবে। দুটো আঙুল দিয়ে ব্যাগের একদিকে খোঁচা দিয়ে উঁচু করে তুলতেই মনে হয় রিভলবারের নল। ব্যাগটা ধরে ছেলের দিকে ঠোট বেঁকিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল নিরুপম। এগিয়ে গেল ওদের দিকে ওরা খতমত খেয়ে দু-পা পিছু হটেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ গাড়ির পাঁচ কঁমল। প্রায়শই এমন হয়। পাড়িয়ে যায় কখনও। আবার ভীি দিয়ে চলতে শুরু করে। দরজার দিকে ছুটে গিয়ে গাইরে লাফ দিল নিরুপম।

ট্রি, কনুই আর কপালে চোট পেলেও চোটতে আঙুল দিয়ে বোঝা যায় রক্ত পড়ছে। চোখ করে পাড়ান গেল। খসটে খসটে হলেও হাঁটতে পারা যাচ্ছে। হাড় ভাঙেন মনে হয়। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত বের হচ্ছে খুব। কনুইয়ের চোট জ্বালা করছে। কিন্তু পাড়িয়ে থাকলে চলবে না। গত দ্রুত সম্ভব সেরে পড়তে হবে। কারণ, ওরা ট্রেন থামিয়ে নিশ্চত খুঁজতে আসবে। লাইন পেরিয়ে আবাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিরুপম।

তার অনুমান অপ্রাপ্ত। কিছুদূর গিয়েই ট্রেন থেমে গেল। ওরা নিশ্চয় শিকল টেনে থামিয়েছে। আবার এমনিতেও থামতে পারে। এইবার এদিকে আসবে ওরা। সামনে ঘন ঘোপ। তারপাশে পুকুর। নিরুপম দ্রুত এগিয়ে চলল সেইদিকে।

ঘোপের আড়াল থেকে শোনা গেল কিছু লোকের গলা। ওরা উত্তেজিত। একজন বলল, নাঃ এইদিকে নেই। অন্যজন বলল, চল লাইনের ওপারে গাঁজা যাক। ওরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘোপ থেকে বেরোল নিরুপম। হাঁটুর ক্ষতের রক্ত জমাট বেধেছে। কনুইয়ের জ্বালা কিছু কম। কপালের রক্তক্ষরণ কমে দিকে। পুকুরের জলে মুখটা ধুয়ে নিলে হয়। ওদিকে এগিয়েও পিছিয়ে এল নিরুপম। জল লাগলে ক্ষত বিষিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে ব্যাগ থেকে গামছা বের আদাজে মুখটা মুছে নেওয়া ভাল।

অদূরেই পরপর কয়েকটি মাটির বাড়ি। লঠনের আলো দেখা যায়। প্রথম বাড়ির দাওয়ার একদিকে দুটি পুকুর। অন্যপ্রান্তে উনুন। উনুনের পাশে মাটির জালা। বড় বড় ঠাঁড়। মাটির

হাঁড়ি থেকে জালায় কিছু ঢালছেন এক মহিলা। বাতাসে অদ্ভুত গন্ধ। দু-সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে গেল নিরুপম। গন্ধটা মদের।

উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই পুরুষ দুটি সচকিত। কে? এরা গরীব মানুষ, পার্টির নাম নিলে নিশ্চয় এখানে রাশ্তিরটা কাটান যাবে। নিরুপম ওদের কাছে গিয়ে ভেঙে বলল সব। কিন্তু নকশাল পার্টির নাম শুনে ওরা আতঙ্কিত। একজন বলল, না, না এখানে থাকা যাবে না। মহিলা বলল, দেখছ না চোলাই বানাচ্ছি....নানান উটকো লোক আসে....পুলিশ আসে....ওরা এলে বিপদ...। মাটির জালার দিকে তাকাল নিরুপম। মহিলার কথায় যুক্তি আছে। নিরুপম তো ধরা পড়বেই, এই পরিবারটিকেও ছাড়বে না পুলিশ। কিন্তু রাত হয়ে গেছে। নিরুপম বলল, অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা হবে না? দ্বিতীয় লোকটি বলল, চল একজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, সে ঠিক কিছু উপায় করবে। কে সে? জানতে চাইল না নিরুপম। জেনে লাভও নেই। তাছাড়া রক্তক্ষরণ হবার পর অবসন্ন লাগছে খুব। মাথাও কাজ করছে না। — চল যাওয়া যাক নিরুপম বলল। তার হাত ধরতে বলল লোকটি। — অন্ধকারে পড়ে গেলে আবার চোট পাবে। নাও হাত ধর। কনুইয়ের ওপর ধরল নিরুপম। অধিকাংশ মানুষই সাহায্য করতে চায়। কিন্তু সবার ক্ষমতা সমান নয়। নিরুপম বলল, কী নাম তোমার? — ওই আর কী....। লোকটি চুপ করে গেল। হয়তো বলতে চায় না। নিরুপমও কথা বাড়াল না আর। পরে কোনোদিন এদের সঙ্গে থেকে বিশ্বাস জাগতে হবে। কিছু পরে লোকটি বলল, পায়ন বললে হবে। তার নাম জানতে চাইল না সে।

দুধারে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে শুয়ে, সকাল হবার অপেক্ষায়। কিছুটা হাঁটবার পরেই ধানক্ষেত শেষ। কল্যাণ, খেজুর গাছের সারি পেরিয়ে চওড়া মেঠো রাস্তা। দূরে আলো দেখা গেল। বিদ্যুৎ আলো। লোকটি ডানহাতের তজনী তুলে বলল, ছই যে ইন্সটিন....খন্যান....আর এইদিকে রাজবাড়ি....

—আমরা কোনদিকে যাচ্ছি? নিরুপম বলল

— ইন্সটিন

—ওই দিকে বিপদ হবে না?

লোকটি হাসল। অত মাথা খারাপ কর কেন? যার কাছে যাচ্ছি সে ঠিক সামলাবে....। আশপাশ থেকে বেলফুলের গন্ধ আসছে। গাছটি খুঁজল নিরুপম। দেখা গেল না। কিছুটা এগোতেই সামনে দু-তিনটি দোকান। একটি মিষ্টির দোকান। হ্যাঙাক ভুলছে। অন্যদুটি মুদির। সেখানে লণ্ঠন। কলাগাছের তলায় নিরুপমকে দাঁড়াতে বলে লোকটি এগিয়ে গেল। মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে ডাকল, খোকাদা একবার আস...। সাদা শার্ট, সাদা পায়জামা পরা একজন বেরিয়ে এল। মাঝারি উচ্চতা, মাথায় ঘন চুল। ভুরু মোটা। শরীর পেশিবহল। গালে হালকা দাড়ি। বয়েস তিরিশ, বত্রিশ। লোকটিকে কলাগাছের কাছে নিয়ে এল গায়ন। নিরুপমকে দেখিয়ে বলল, খোকাদা একে দেখ। একবার নিরুপমকে দেখে নিয়েই খোকা বলল, ঠিক আছে দেখছি, তুমি যাও।

গায়ন চলে যেতে খোকা হাত নেড়ে নিরুপমকে বলল, আমার সঙ্গে এস। কী করে হল এমন?

নিরুপম বলল, ট্রেন থেকে লাফিয়েছি....

কিক্ কাণ্ড! কিক্ কাণ্ড!ঠিক আছে, শীগগির এস। থোকা বলল।

মাথাটি অঙ্গুত। একবারও নিরুপমকে তার নামধাম জানতে চাইল না। কেন সে লাগিয়েছে? কী বস্তু? কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। মিষ্টির দোকানের লাগোয়া টালির চাল, ভেট ঘরের তালি খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল নিরুপমকে। নিজেও ঢুকে এল। ঘরের আলো জ্বালাল থোকা। টিমটিমে আলো। চতুর্দিকে ময়দা, চিনির বস্তা, ডালডার টিন। কয়েকটা খালি টিন, বাগডি আর বারকোশও আছে। এই ঘর ওর কাঁচামাল রাখার জায়গা। ঘরের কোণে একটি মাদুর পাকিয়ে দাঁড় করান।

লাজামার পকেট থেকে একটা দেশলাই বাস্ক বের করল থোকা। সিগারেট খাবে? নিরুপম মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। — ঠিক আছে, তাহলে এই দেশলাই বাস্ক তোমার কাছে রেখে দাও...ওই দেখ পাশেই বাথরুম। শিকল তোলা দরজা দেখাল থোকা। ভেতরে লাইট নেই, দেশলাই জ্বালালে জানালার সামনে মোমবাতি দেখতে পাবে, জ্বালিয়ে নিও। কিক্ কাণ্ড।

নিরুপম নিজের নাম বলল। তোমায় বলা দরকার আমি কিন্তু কোনো চোর, ডাকাতি, খুঁচা নই, আমি নকশালবাড়ির রাজনীতি করি। থোকা হাসল, কিক্ কাণ্ড।জানি জানি এ আমার এলভে হয় নাকি?

কী করে বুঝলে?

আরে! তুমি কী সেই বেতাস্ত ওনবে? নাকি আমায় সব গোছাতে দেবে?কিক্ কাণ্ড...।

নিরুপম চুল করে গেল।

চিন্তা কর না, আমার কাছে গুলিও নেই, পড়েছে আমাকে না খতম করে কেউ তোমায় খুঁজছে পারবে না, ভাব না...কিক্ কাণ্ড...। থোকা জানাল, সে ঘরের বাইরে তালি মেয়ে পায়ে এক বিকৃত ডাক্তারকে আনাতে।

আমি গলা পেলে একদম সাড়া দিও না...বুঝলে?

নিরুপম মাথা নাড়ল। আবার ডাক্তার ডাকছে কেন?

কিক্ কাণ্ড...নিজের তলিমাথানা দেখেছ একবার? কপাল কনুইয়ের অবস্থা দেখেছ? ওটা দেখে মনে হচ্ছে পায়ের অবস্থাও সুবিধের নয়। একটু হেসে থোকা বলল, এই যে খাড়লট করা হিরো, তুমি ভেব না, চিন্তা কর না একদম... আমি যাব আর আসব....কিক্ কাণ্ড। থোকা চলে গেল।

গাধা ও বাইরে থেকে তালি মেয়ে গেছে, তবু ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল নিরুপম। আদালত। পরে তালি খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর দরজায় টোকা। খোল, বন্ধ....খোল। থোকির গলা। দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোককে নিয়ে ও ভেতরে ঢুকে এল। ভদ্রলোক মাঝে মধ্যে, ফসা, গোলগাল। কালো ফ্রেমের চশমা। হাতে লম্বা টর্চ, কালো ব্যাগ।

ভদ্রলোককে দেখিয়ে থোকা বলল, এই যে ডাক্তার এসে গেছে...একেবারে কৃষ্ণকেশের খুঁজের গা... গাণ বের করা, ছেঁড়াকাটা মেরামত করায় পাকা....

নিরুপম হেসে ফেলল। ডাক্তারের এমত চমকপ্রদ বিশেষণ সে আগে কখনওই শোনে নি। তবে কৃষ্ণকেশের খুঁজের সময় নিশ্চয় ভালো-ভালো ডাক্তার ছিল। প্রতিদিনই

সৈন্যরা আহত হচ্ছে, সেনাপতি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, তাকে ঔষধি খাইয়ে পরদিনের জন্য আবার সুস্থ করে তোলা দক্ষ চিকিৎসকের কাজ। উপমাটি তলিয়ে ভাববার মতো।

খোকা বলল, আমি যাই, দোকান সামলে আসি...কিক্ কাণ্ড!

সঙ্গে করে কাটা-ছেঁড়া নিরাময়ের যাবতীয় ওষুধপত্র নিয়ে এসেছেন ডাক্তার। স্পিরিট দিয়ে ভালো করে ক্ষত মুছে ওষুধ-তুলো-ব্যাণ্ডেজ লাগান হল। দেওয়া হল অ্যান্টি-টিটেনাস। এক পাতা ওষুধের বড়ি দিলেন ভদ্রলোক। এক সপ্তাহ খেতে হবে। হঠাৎ জ্বর এসে গেলে তা কমানোর বড়ি দিয়ে দিলেন ডাক্তার। বেদনাহর বড়িও দিলেন। ভদ্রলোক স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবার কল্যাণ বিভাগে কাজ করেন।

নিরুপম বলল, আপনি খুব ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করলেন! জানাজানি হলে তো আপনার চাকরি চলে যাবে...সাবধানে থাকবেন...কেউ জিজ্ঞাসা করলে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন।

আরে চুপ করুন তো। নিরুপমকে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার। ধরা পড়লে আমার না হয় চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, আর আপনি তো মশাই খতম হয়ে যাবেন। নিরুপম চুপ। একটু পরে ডাক্তার বললেন, আমার ইচ্ছে ছিল আপনাদের মতো লড়ে যাই....কিন্তু পারিনিআজ আপনাকে দেখে এত ভালো লাগছে...। ডাক্তার একটু থামলেন। দু-মিনিট পরে বললেন, কোনো সাহায্য লাগলে বলবেন। নিরুপম মাথা নাড়ল।

আলাপের মাঝখানে খোকা এসে গেল। — কি ডাক্তার? কিক্ কাণ্ড! সব ঠিক তো? ডাক্তার ভদ্রলোক হাসলেন। সব ঠিকঠাক। খোকা নিশ্চিত হয়ে হাসল এইবার। তারপর ভদ্রলোককে বলল, এ মক্কেল আমায় জিজ্ঞাসা করছে, কী করে বুঝলাম ও নকশাল? নিরুপমের কাঁধে হাত রাখল খোকা। আরে নকশাল না হলে এমন ভীমের মতো দুঃসাহস হবে কার? কে-ই বা এত কষ্ট সহ্য করবে? কিক্ কাণ্ড....নিশ্চয় পুলিশ তাড়া করেছিল?

নিরুপম বলল সব। তাহলে কান্ডকাছি গিয়েছি, বল? খোকা হেসে ডাক্তারের দিকে ফিরল। কাল সকালে কখন বেরুচ্ছে?

—সাতটায়

—বাঃ! খুব ভালো....

নিরুপমের যাবার পরিকল্পনাটিও বানিয়ে ফেলল খোকা।

—সকালে তুমি ডাক্তারের গাড়িতে চলে যেও। কী ডাক্তার পারবে তো?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি চন্দননগর অবধি যাব...ওইখানে মিটিঙ। নিরুপম বলল, তাহলেই হবে...ওইখান থেকে আমি যেখানে যাবার, চলে যাব।

ঠিক আছে তাহলে। ডাক্তার উঠে পড়লেন। খোকা বলল, কিক্ কাণ্ড! এক মিনিট.....। বাইরেটা দেখে নিয়ে এলল, অল ক্রিয়ার। ডাক্তার চলে গেলেন।

কী? খিদে পেয়েছে তো? খোকা হাসল। নিরুপম উত্তর দিল না। সেও হাসল একটু। কিক্ কাণ্ড....বুঝেছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার নিয়ে এল খোকা। লুচি ডাল। দুটো মিষ্টি। শালপাতার চোজা এগিয়ে বলল, চটপট খেয়ে নাও।

নিরুপমের কৌতূহল কমছিল না। থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এত নিশ্চিত কী করে হচ্ছে যে পুলিশ, গুভারা তোমায় কিছু করবে না?

কিছু কাণ্ড! ঘুরে ফিরে সেই একই গল্পেপো শুনতে চাইছ? খোকা বলল। ঠিক আছে গল্প তাহলে।

ওগ কথা হল— সে আর তার জনাকয়েক বন্ধু এখানে মড়া পুড়িয়ে বেড়ায়। এ অঞ্চলের কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলেই খোকা আর তার দলবলের খোঁজ পড়ে। সকাল, বিকেল, মাঝরাতির যে কোনো সময়ে ডাকলে ওরা যায়, সৎকার করে আসে। এলাকার কোনো লোক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে আসা খোকাদের কাজ। এমনকী বয়স্ক মাসি-পিসি-দিদিমারা ত্রিবেণীতে গিয়ে পূজা দিতে চাইলেও খোকা তার ব্যবস্থা করে।

খোকা বলল, এখানকার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, তারা কেন আমার ক্ষতি করবে বল? আর আমি তো সবাইকে সাহায্য করেছি, নকশাল, সি পি এম, কংগ্রেস সবাইকে....। খোকা হাসল। —আজ তুমি না হয়ে কোনো আর এস পি, এস ইউ সি-র ছেলে এলেও তার পাশে দাঁড়াইতাম....না হলে অধর্ম হতো....। একটু থেমে খোকা আবার বলতে শুরু করল। এই তো কদিন আগে ইটাচুনা কলেজের সামনে মারপিট হল। কংগ্রেসের একটা ওস্তাদ গোমা খেল। ব্যাটার হাতের তালু উড়ে গেছে। ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটছে। আমি নিয়ে এলাম। আমাদের ছেলেরা নিয়ে গেল মগরা হাসপাতালে।

নিরুপম বলল, কিন্তু কাল সকালে কোনো পুলিশ এসে যদি আমার খোঁজ করে, কী বলবে?

.....কী আর বলবে? যা সত্যি তাই বলবে।

আহ! নিরুপম চমকে ওঠে।

ওহী, শুশ কিছু কিছু খবর একটা পালটে দেব। খোকা হাসল।

নিরুপম ঠিক গৃহেও পারে না। খোকা মিটিমিটি হাসে। বলব, সকালে একটা ছেলে এসেছিল। বটে...ওই কুড়ি একশ বছর হবে। হাতটা কেটে গেছে। জল চাইল। দিলাম। তারপর স্টেশনটা কোন দিকে জিজ্ঞাসা করল। এ তল্লাটের কিছুই চেনে না। আমিও ওই দিকে যাচ্ছিলাম তাই ওকে সাইকেলে তুলে নিলাম। বলল বর্ধমান যাবে। টিকিট কাটল। ওকে বর্ধমানের ট্রেনে তুলে দিয়ে, কাজ সেরে ফিরে এলাম। নিরুপম হতবাক।

ঠিক আছে গল্পটা?কিছু কাণ্ড! অস্বথ্যামা হত ইতি গজ। খোকা হা-হা করে হেসে উঠল। এখন তো পৃথিবী ইতি-গজ'তেই চলছে, বল?

—উফ্ দারুণ শয়তানি বুদ্ধি তো তোমার! নিরুপমও হাসল।

নাও এইবার শুয়ে পড়...দেখ কোনো নিশিডাকে আবার সাড়া দিয়ে ফেল না, খোকা বলল। দু-দিকে মাথা নেড়ে হাসল নিরুপম। বাইরে থেকে তালা মেয়ে খোকা চলে গেল। ৬৩০ থেকে দরজা বন্ধ করে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল নিরুপম। শরীর খুবই ক্লান্ত। উদ্বেগ থাকলেও অচিরেই সারা শরীর জুড়ে ঘুম এসে গেল। মাঝরাতে খুঁটাট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে? উৎকর্ষ হয়ে বোঝার চেষ্টা করল নিরুপম। না, দরজায় টোকা নয়, মনে হয় ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারপাশ নিভর হলে ছোটখাট আওয়াজও কানে বাজে। দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল ভোররাত্রে। কীসের শব্দ গোমা গোমা না। আবার ঘুমিয়ে পড়ল নিরুপম। পরের বার ঘুম ভাঙল দরজা খাটখাট আওয়াজে।

টোকা নয় বেশ জোরেই শব্দ হচ্ছে। নিরুপম বলে ফেলল, কে? বলেই চুপ করে গেল। সব সতর্কতা ভুলে গণ্ডগোল করে বসেছে সে। গাড়ি ঘুম থেকে উঠলে মাথাটা ঠিক কাজ করে না। ওধার থেকে আওয়াজ এল, প্রভু আমি খোকা ডোম। আপনার রথ তৈরি, সারথি হাজির।



চন্দননগরে নেমে ব্যাণ্ডেলে প্রিয়নাথদার বাড়ি পৌছতে কোনোই অসুবিধা হল না। সব শুনে কমরেড ত্রিবেদী বললেন, খুব জোর বেঁচে গেছ। নিরুপমের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন জি টি। খুব ব্যথা করছে?

করছিল। ব্যথা কমানোর বড়ি খেয়ে নিয়েছি...এখন কিছু কম, নিরুপম বলল।

বিহারের কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণী শুনে গোপাল ত্রিবেদী খুশি। বাঃ খুব ভালো হল। ক্যালেন্ডার দেখে জি টি বললেন, ২৪ থেকে ২৮ জুলাই মিটিঙ করা যায়। ভি এম-কেও জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি একবার। তারপর ওদের খবর পাঠাতে হবে।

নিরুপম মাথা নাড়ল। ঠিক আছে।

কিন্তু কমরেড একটা বড় সমস্যা হয়েছে। জি টি বললেন।

—কী হল?

—গতকাল কমরেড অরুণ আর ঝর্ণার পুলিশ তুলে নিয়েছে...

—কোথা থেকে?

—ওরা লাটবাগান গিয়েছিল মিটিঙ করতে.... ফেরার পথে ধরেছে....

—নিশ্চয় আগে ভাগে খবর পেয়েছিল পুলিশ।

—হঁ...কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়....। ত্রিবেদী বিশদে বললেন। ওরা তাদের তিন বছরের মেয়ে টুকি-কে বাড়ির উপরের তলার মাসিমার কাছে রেখে গিয়েছিল। এখন বাবা-মাকে না দেখে টুকি কান্নাকাটি করছে। মাসিমাও আর রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। অরুণ-ঝর্ণার সেরকম কোনো আত্মীয় আশপাশে নেই, যে তাদের কাছে মেয়েটাকে রাখা যাবে।

কমরেড নিরুপম....কিছু একটা কর। জি টি বললেন। তোমাকে তো টুকি চেনে, খেলা করে....। পরিস্থিতি সত্যিই গভীর। এমন সমস্যার মুখোমুখি হবে তা কোনোদিন ভাবেনি নিরুপম। স্বপ্নেও এমন শিশু-জড়িত অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার ঘটে না। বাস্তব স্বপ্নের চেয়েও নাটকীয়।

মাসিমার কাছ থেকে টুকি-কে প্রিয়নাথদার বাড়ি নিয়ে এল নিরুপম। একটু ঝুঁকি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওকে না এনেও উপায় নেই। বাচ্চাটার জামাকাপড়, বিছানা, বালিশ গুছিয়ে রাখা ছিল। সেজন্য একেবারেই অপেক্ষা করতে হয়নি। টুকিও নিরুপমের কোলে উঠে চুপচাপ চলে এল। কমরেড ত্রিবেদী বললেন, তোমরা কদিন এখানে থাক, আমি ঝর্ণার খবর জোগাড়ের চেষ্টা করছি...টুকি-কে ওর সঙ্গে রাখলে মেয়েটা মন খারাপ করবে না।

নিরুপম একমাত। কিন্তু আবার এইসব ব্যবস্থা করতে হলে ভাল উকিল দরকার যে কোটে আপেলদান জানাবে। পুলিশ তো চারদিকে ওৎ পেতে বসে। যা করবার খুব সাবধানে করতে হবে।

মেয়েটা কাঁদছে। কোলে নিতেই ফুঁপিয়ে উঠল, কাকু...বাবার কাছে যাব...। বাচ্চারা কাঁদলে ভেতরটা তোলপাড় করে। নিজেকে সামলে নিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল নিরুপম। বাবা আর মা তো গেছে লড়াই করতে...দুই লোকগুলোকে তাড়িয়ে ফিরে আসবে...। টুকি হাসল, আমিও বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। কচি হাতের মুঠোয় খেলনা বাঁশিটা তুলল মেয়েটা।

ওই বাঁশ দিয়ে কী করে লড়বে? নিরুপম চোখ বড় বড় করে।

আমি এটা বাজালেই সবাই স্ট্যাচু হয়ে যাবে। মেয়েটা নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যায়।

ওখন বাবা তলোয়ার চালিয়ে কুচ কুচ করে দৈত্যগুলোর মুণ্ড কেটে নেবে।

এই মেয়ে নিশ্চয়ই কখনও 'গুপি গাইন..' সিনেমাটা দেখেছে। সেই দেখার সঙ্গে মিশেছে শিশুর কল্পনা। নিরুপম মজা পেল।

আর মা কী করবে?

মা তো বাবাকে বলেছে লড়তে লড়তে শহীদ হবে...কাকু আমিও শহীদ হব...

এই একরকমি মেয়ে শহীদের মানে জানে না। বাপুদি নিশ্চয় গর্ব করে শহীদ হবার কথা বলত অরুণদাকে। তাই শুনে সে-ও বলছে, শহীদ হবার কথাটা আগেকার গ্রামে শ্রায়ট শোনা যেত। 'এই তো আগামী বছরই আমি শহীদের দুনিয়ায় যাচ্ছি', 'শহীদের দুনিয়ায় গিয়ে শ্রদ্ধেয় নেতাকে খবর দিচ্ছি জাপানার দেখান পথে ভারতের বিপ্লব এগিয়ে চলেছে আলানি নিশ্চিন্ত থাকুন কমরেড' এমন কথা বছর শুনেছে নিরুপম। কমরেডদের জাপ তুলে গাথা হয়েছিল, যাতে কেউ শহীদ হলেই দেশব্রতীতে ছুপা যায়। এরা কেন গোপন না শহীদ হওয়ায় বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু নীতি-নিষ্ঠ বেঁচে থেকে দীর্ঘমেয়াদি লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাও হেলাফেলার নয়, বরং তা বেশ শক্ত কাজ।

নিরুপম বলল, লড়তে হলে তো গায়ে জোর চাই মাম্মা, এই কলাটা তাহলে খেয়ে নাও। টুকি খেয়ে নেয়।

টুকির সঙ্গে খেলা করতে করতে দ্রুত সময় কেটে যায় নিরুপমের। পাঞ্চালী জানলে গুণ মজা পেত। কোথায় যে গেল মেয়েটা! একবার কলকাতায় গিয়ে ভাল করে খোঁজা দরকার।

প্রিয়নাথদার বাড়িতেও আর থাকা গেল না। প্রতিবেশীরা কৌতূহলী হয়ে পড়ছে। কার পাচ্চা? ওই ছেলেটার? মা কোথায়? সমস্যা জটিল হবার আগেই চলে যাওয়া দরকার। সুকান্তদার সঙ্গে পরামর্শ করলে সমাধান মিলতে পারে। গোপালির দোকানে জানাশেষি ঝাঁপ খণ্ড পেয়ে যাবেন। কলকাতা যাওয়া স্থির করল নিরুপম। পরদিন সকালেই টুকিকে নিয়ে ট্রেন চেপে হাওড়া। স্টেশন থেকে বেরিয়ে কুড়ি নম্বর ট্রাম। সঙ্গে পাচ্চা থাকার সুবিধেও আছে। সবাই তাকায় ফুটফুটে শিশুটির দিকে। তাকে তেমনভাণে নজর করতে না দেউ।

গোপালি বলল, কী গুরু কতদিন পর এলে!... কার বাচ্চা? নিরুপম গভীর গলায় বলল, আমার...। গোপালি থতমত খেয়ে বলল, ও আচ্ছা আচ্ছা...! মাথা চুলকে বলল, কবে বিয়ে করলে? — এই তো কবে যেন...। বাক্য শেষ করল না নিরুপম। আর খোঁচাল না গোপালি। সুকান্তিদার চিরকুট বের করে দেখাল...আড্ডাখানায় আছি। অর্থাৎ উনি এবার বৈঠকখানা রোডের শেলটারে আছেন। এ আশ্রয় গুঁর একান্ত নিজস্ব, খুবই গোপন।

গোপালির দিকে তাকাল নিরুপম। সুকান্তিদাকে খবর দিতে হবে.....দেখা করব...খুব জরুরি। আমি আবার ঘন্টা তিনেক পরে আসছি। গোপালি বলল, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এ পাড়ায় বারবার এস না। যদি কেউ দেখে ফেলে? নিরুপম মাথা নাড়ল, ঠিক কথা, তবে কোথায় দেখা করা যায়? গোপালি ভেবেচিন্তে জানাল, সে হিন্দ সিনেমার গায়েই যে ছোট পার্ক আছে তার ভেতর অপেক্ষা করবে। নিরুপমের পছন্দ নয়। ওইখানে বেশিরভাগ বয়স্করা বসে বিশ্রাম নেয়, একটা বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়াটা অস্বস্তি দেখাবে। তার তুলনায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামটা ভাল জায়গা। টুকিকে নিয়ে গেলে বিসদৃশ লাগবে না। গোপালি বলল, হ্যাঁ এইটা ভাল বুদ্ধি। সুকান্তিদাকে ওইখানেই আসতে বলছি।

টুকিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় চলে গেল নিরুপম। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বামদিকে কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। টুকি ওই দেখ দেখ... ওই যে গায়ে বড় বড় কাঁটা, ওইটা হল কাঁটাচূয়া। টুকি বলল, এমা! তুমি জান না...ওমা! তো শজারু...। নিরুপম বলল, একদম ঠিক...কিন্তু আমারটাও ঠিক। তোমারটা ভাল নাম, শহরের মানুষ তাই বলে, আমারটা ডাক নাম...গাঁয়ের মানুষ এমন বলে।

—ওদের ডাকনাম হয় বুঝি?

—হবে না কেন? তোমার ডাকনাম টুকি, ভাল নাম মৈত্রেয়ী... তেমন ওরও দুটো নাম...

মেয়েটা মজা পাচ্ছিল। ভালুকের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে নাক টিপে ধরল, এ মা কী গন্ধ...। নিরুপম তাল ঠুকল, ভালুকগুলো নিশ্চয় সাবান মেখে চান করে না। ঠিক বলেছে, টুকি হি-হি করে হাসল। ভালুকের উদ্দেশ্যে বলল, এই তোরা চান করিস না কেন? মা বকে না তোদের? শিয়ালের খাঁচার সামনে গিয়ে নিরুপম বলল, এই দেখ টুকি শেয়াল পণ্ডিত। চারপেয়েটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল টুকি। হাতের ললিপপটি ভাল করে চুষল।

—এ চশমা পরেনি কেন?

—অ্যাঁ? চশমা কেন? নিরুপম বলল।

—এ মা তুমি জান না! শেয়াল তো চশমা পরে...আমার বইতে ছবি আছে...

—তাই বুঝি? ...তাহলে বোধহয় দিনের বেলায় খুলে রেখেছে...

—রাস্তিরে পরে কেন? ও কি অন্ধকারে দেখতে পায় না?

টুকির অধিকাংশ বাক্য এমন প্রশ্নবোধক। নিরুপম মাথা নেড়ে আন্দাজে উত্তর দিতে থাকল। তার মনটা অন্যত্র পড়ে। সুকান্তিদা যদি থাকার ব্যবস্থা না করতে পারেন, সে কোথায় রাখবে এই বাচ্চাটিকে? শিশুটির সঙ্গে সময় কাটাতে খারাপ লাগছে না কিন্তু এর ফলে দলের বহু কাজ পড়ে থাকবে। অর্থাৎ বাঁশদ্রোণীর লিনপত্ৰীদের সঙ্গে আর

নকশার বলা দরকার। পিয়ামাওয়ার গাড়িতে থাকাকালীন ওরা দু-বার খবর পাঠিয়েছে।
‘চাফাচাফি বলা দরকার ওদের সঙ্গে। তবে তার আগে টুকিকে ঠিকমত রাখার ব্যবস্থা
হলে মন আনাম পায়।

সময় মতো পৌঁছে গেল নিরুপম। দোতলার বাঁ-দিকের ঘরে গোপালি প্রাগৈতিহাসিক
মুণের লাথার দেখাছিল। এখানে আসবার আগে শার্ট পালটেছে ছেলেটা। সাদার বদলে
হলুদ জামা। হাতঘাট চটি ছেড়ে পরেছে চামড়ার কালো চটি। এ ঘরে দর্শক কম। চোখাচোখি
হেঁটে গোপালি এগিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, উনি পাশের ঘরে। আমি চললাম।
দু’লা এগিয়ে আবার ফিরে এল গোপালি। গুরু সাবধানে থেকো। পুলিশ এখনও কলেজ
স্ট্রিটে এসে তোমার খোঁজ করে। নিরুপম হাসল। কোনো কথা না বলে হাত এগিয়ে
দিল। হাত গাড়াল গোপালিও। করমর্দন করল দুজনে। গোপালি চলে গেল।

সব শুনে সুকান্তিদা বললেন, আগে আমার ওখানে চল, যেতে যেতে ভেবে নিচ্ছি।
গাধার থেকে বেরোতেই টাক্সি পাওয়া গেল। চালক জিজ্ঞাসু মুখে তাকাতেই সুকান্তিদা
বললেন হ্যারিসন রোড...ছবিঘর।

নিরুপমের কোলে মাথা রেখে টুকি ঘুমিয়ে পড়ল। আধঘণ্টা লাগল ছবিঘর পৌঁছতে।
গাছাটার খুম ভাঙতে ইচ্ছে করল না। ওকে কোলে নিয়ে সাবধানে নামল নিরুপম।
সিনেমা হলের পাশের গলি দিয়ে বৈঠকখানায় পড়ে দিকের দোতলা বাড়ির সামনে
এসে সুকান্তিদা বললেন, এস। দোতলায় উঠে পর শার্ট পাঁচটি ঘর। ডানদিকের শেষ ঘরের
তালি খুলে ঢুকে পড়ল ওরা। ছোট ঘর। এক জনের শোবার মতো খাট। কড়ি-বরগা
থেকে পাখা ঝুলছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে আলো। ঘরের পশ্চিমদিকে টানা বারান্দা।
টুকি কে খাটে ওইয়ে বারান্দায় গেল নিরুপম। নিচেই বাজার। সবজি সাজিয়ে বসে
বিক্রেতারা। আনাচেনা দৃশ্য।

সুকান্তিদা বললেন, ভেতরেই বস...কে আবার দেখে ফেলবে...

নিরুপম বলল, বাচ্চাটাকে তো এখানে রাখাও মুশকিল...আশপাশের কাকে কী গল্প
করবে...বিলদ হয়ে যাবে...। সুকান্তিদা মাথা নাড়লেন, না, না...এখানে রাখা যাবে না...খুব
আতঙ্কের পড়ে গেলে কোনোরকমে একদিন হয়তো রাখা যায়....। —তাহলে কী হবে?
জিজ্ঞাসা গলায় বলল নিরুপম। মৃদু হাসলেন সুকান্তিদা...যতদিন না অন্য কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে
ততদিন আমাদের বাড়িতে থাক। নিরুপম অবাক। —আপনার বাড়িতে!... অসুবিধা হবে
না? সৌদি তো সকালে স্কুলে যান...। — হয়তো হবে...কিন্তু রেবা ঠিক সামলে নেবে..
কী আর তোমার সৌদিকে, ও তেভাগা আন্দোলন করা মেয়ে, সুকান্তিদা হাসলেন। তাছাড়া
দুর্ভাগ্য আছে, সেও তো বড় হয়ে গেছে...অন্য কিছু তো এই মুহূর্তে মাথায় আসছে
না তোমার মাথায় কিছু এলে বল? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সুকান্তিদা। নিরুপম তো
কিছুই ভেবে নাছিল না। —এই অবস্থায় এর থেকে ভাল সমাধান আর হয় না, নিরুপম
বলল।

দুই থেকে তেরিমে একতলা থেকে একটি কিশোরকে ডেকে আনলেন সুকান্তিদা। ওর
কাঁধে হাত রেখে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন এর নাম বাবলু...এক নম্বরের
সিদ্ধান্তে ফেরিলা। জেলটি কোনো কথা না বলে হাসল। যা তোর জ্যোতিমাকে একবার

খবর দিয়ে আয়, সুকান্তিদা বললেন। বাবলু মাথা নাড়ল। ঠিক আছে। ওর শরীরভাষায় স্পষ্ট, এ কাজ অতীতেও যেমন সহজে করেছে, এবারও তাই করবে।

বাবলু বেরিয়ে যেতে নিরুপম বলল, বৌদিকে যদি পুলিশের চর অনুসরণ করে?

—এর আগে অনেকদিন করেছে...তারপর আমার টিকি-দাড়ি কোনো কিছুই সন্ধান না পেয়ে এখন ওর পিছু ধরা ছেড়ে দিয়েছে, সুকান্তিদা হাসলেন। তবে...তোমার বৌদি খুব সাবধানী...তেমন বুঝলে আজ আসবেই না...।

একঘন্টার মধ্যে বৌদি এসে পড়লেন। সুকান্তিদার চোখে চোখ রাখলেন দশ সেকেন্ড। দৃষ্টিতে চেউয়ের ওঠাপড়া আবার সমুদ্রের গভীরতা। তারপরেই নিরুপমের দিকে ফিরলেন। আরে! কেমন আছ? নিরুপম মাথা নাড়ল, ভালো। রেবাবৌদি একইরকম আছেন। শুধু কানের উপরের অংশের চুলে রূপোলি রেখা দেখা দিয়েছে। ঘুমন্ত টুকিকে দেখে বৌদি অবাক, এ কে? সমস্তটা বুঝিয়ে বললেন সুকান্তিদা। কোনো ওজর আপত্তি না তুলে বৌদি বললেন, আর কোথায় বাবে? আমাদের ওইখানেই থাক...আহা রে। মেয়েটা নিশ্চয় মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। ঠিক হল টুকিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বৌদির সঙ্গে ভাব জমাবার পর ওকে নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত।

বৌদিকে দেখে নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ল নিরুপমের। বাড়ি মানে বাবা। ঢোলা প্যান্ট, আন্তিন গুটনো শার্ট, কোমরে বেল্ট, স্ট্র্যাপ লুঙ্গান গাঢ় বাদামি চটি। বাবা মানেই লালনিশান, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে গান গেয়ে প্রভাত্যের, নিউ এম্পায়ার-স্টার থিয়েটারে নাটক, তাক ভর্তি বই—সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাত্রদের প্রথম সংস্করণ, হেঁটে ডালহৌসির অফিসে যাওয়া আসা। আর উপরের তিন কক্ষ। বড়দা তখন জাহাজের নাবিক। অকৃতদার। দশমাস জল—বন্দর থেকে বন্দরে। দুইমাস পাড়ায়। তখন লুঙ্গি পরে রোয়াক। মেজদা অপণ। চিত্রশিল্পী। সংবাদপত্রে কাজ পাবার পর বিয়ে করে অন্যত্র। এখন নাকি কুঁদঘাটে। সেজদা ভুবন। ব্যাঙ্ক করণিক, বিয়ে করেছে। এখন অফিসার হবার চেষ্টায়। বাড়িতেই থাকে। উপরের তিন জনের নাম তিন অক্ষরের হলেও নিরুপমের বেলাতেই বিধিভঙ্গ করেছিল বাবা। বাড়ির অন্য সদস্য মা-র কোনো আপত্তি কানে তোলেনি। প্রথম থেকেই কী তাকে একটু আলাদা চোখে দেখে বাবা? নিশ্চয়ই তাই, না হলে সেবার কেন দাঁড়াল তার পক্ষে? তখন ক্লাশ ইলেভেন। সি পি এম-এর যুব সংগঠনের ছেলেরা বাড়িতে এসেছিল চাঁদা নিতে। নিরুপম বলল, একটাকা দেওয়াটা কোনো সমস্যা নয় কিন্তু আপনাদের নীতি আমি মানি না...ঠিক করুন কী করবেন...। ওরা বোঝাতে শুরু করল। নিরুপম উত্তর দিচ্ছিল। হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে বৌবাজার গার্লস স্কুল শিক্ষিকা মা বেরিয়ে এসে ওদের বলল, এক্সকিউজ মি...এ তো ছোট ছেলে...রাজনীতি বোঝে না...। মা চাঁদা দিয়ে দিল ওদের। ওরা চলে গেলে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকাল। যতসব...সময় নষ্ট। বাবা প্রতিবাদ করল, যারা এসেছিল তাদেরও বয়স কম...আর ওদের কথায় কেন তুমি ঢুকবে? মা থামল না, বলতেই থাকল। নিরুপমকে লক্ষ করে হিসহিসে গলায় বলল, বাপের এই রোগটা রক্তে ঢুকে গেছে ঠিক। ভীষণ অপমান লেগেছিল নিরুপমের। তার নিজের জন্য ততটা নয়, বাবার জন্য কষ্ট হয়েছিল খুব। একা বসেছিল অনেকক্ষণ। রাগে খায়নি। মা-র কোনো হেলদোল নেই। শুতে চলে গেল। বাবা পাশে বসল—জানিস তো,

জোন ভা নটরকম আচাঁকংস। যা সারে না তা সহ্য করতে হয়, নাহলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে হয়। বাড়ি তৃতীয় কোনো পথ নেই। সহ্য করতে করতেই বাবা গান, নাটক, কবিতা সব ভেড়ে দিয়েছে। বাবার কথা ভেবে ভেতরটা হু-হু করে উঠল। কী করে যেন গুলে গেলেন রেবাবোদি।

কী বাড়ির কথা মনে পড়ছে?

না, না তেমন কিছু না।

আরে। এতে লজ্জা পাবার কী আছে? এত কাছে এসে বাড়িতে না যেতে পারলে তো আরাম লাগেনেই...শোন তুমি বরং চিঠি লেখ আমি ফেরার পথে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব...আমি ততক্ষণ টুকির ঘুম ভাঙিয়ে আলাপের পর্বটা সেরে নিই...

নিরুপম লিখতে শুরু করল। বাবা, তুমি কেমন আছ বাবা? জানি তুমি কী বলবে—আমি তো ভালোই আছি, তুই কেমন? আমি ঠিকঠাক। তোমার কথা খুব মনে পড়ে। একটু নাটকীয় ভাবে বললে, তোমার হাতের লালবাগা এখন আমাদের হাতে। বাবা তুমি বিশ্রাম নাও, আশীর্বাদ কর, এই বাগা আমরা তুলবই। ছোটবেলায় তুমি আমায় মৌলভীবাজারে কত গল্প শুনিয়েছ। সে সব গল্প আমি আমার কমরেডদের শুনিয়েছি। তোমার পটুমা কমরেড পাঞ্চালীকে শুনিয়েছি। ওরা সবাই তোমায় চিনে গেছে। এখন তুমি শুধু আমার বাবা নও, ওদের সবার পিতা। সেই যে একদম সোভিয়েট রাশিয়াকে যেমন বলা হত, মাদারল্যান্ড অফ দ্য কমিউনিস্টস, কমিউনিস্টদের পিতৃত্ব, তোমাকেও ওরা তেমনই সম্মান দেয়। বাবা, একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তোমার হাত ধরে বাজার থেকে ফিরছিলাম। পাড়ার মোড়ের চার্চ চত্বরে লাল, নীল পুষ্পিকা। তোরণ। আলোর মালা। আমি জানতে চাইলাম, কেন সাজিয়েছে? তুমি বললে, সাজাবে না?...সেই ১৮৬৩-র চার্চ একশো বছর পূর্ণ করল। আমি অবাক। এতটা পয়স! তুমি হাসলে। আমি বললাম, তাহলে এই ১৮৬৩ বাড়তে বাড়তে কোনোদিন দু হাজার সাল ছুঁয়ে যাবে? তুমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে। আমার প্রশ্নয় কাটিছিল না। আমি আবার বললাম, আমরা দুহাজার সাল দেখতে পাব? তুমি একটু থেমে বললে, তুই পার, আমি পাব না। কেন বাবা? আর তো মাত্র কুড়ি-পাঁচশটা বছর। আগামী শতাব্দী দেখব বলে লাশ হিসাবে পড়ে থেকেও আবার ফিরে এসেছি। পাঞ্চালী ফিরিয়ে এনেছে। তুমি তো জান সব। এই কদিন আগেই আবার দু-বার পাশ কাটিয়ে এসেছি মৃত্যুকে। বাবা, তোমাকেও যে থাকতে হবে। তুমি আমি পাঞ্চালী নিশান ওড়াতে ওড়াতে আন্তর্জাতিক গাইব—জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন বন্দী ক্রীতদাস... আর একটু থেকে যাও। থাকবে না? তোমার কমরেড নিরুপম।

চিঠিটা সুকান্তিদার দিকে বাড়িয়ে দিল নিরুপম। পড়ুন।

আরে। তোমার ব্যক্তিগত চিঠি আমায় পড়তে দিচ্ছ কেন?

পড়ুনই না, আপনি তো আমার সব কথাই জানেন।

সুকান্ত পড়েন। পড়ার শেষে চোখের কোনা মুছে নেন একবার।

রেবাবোদি ঠিক ভাব জমিয়ে ফেললেন টুকির সঙ্গে। ও নিরুপমকে টা-টা করে চলে গেল। সঙ্গে হয়ে গেছে। একবার বাঁশদ্রোণী ঘুরে আসা যায়। সুকান্তিদা বললেন, এখন আবার একবার খুব রাত তো হয়নি, একবার ঝপ করে দেখা করে আসি...ওরা যদি

আমাদের দিকে এসে যায় তো ভালোই হয়, নিরুপম বলল। সুকান্তিদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, যাও, যে কোনো রোমাঞ্চকর অভিযানের নেপথ্যে থাকে বিশ্বাস। না হলে অভিযানে নামা যায় না। এ ক্ষেত্রে তোমার যখন বিশ্বাস ওরা এদিকে চলে আসবে তবে যাও কিন্তু বালিগঞ্জের কৌশিককে সঙ্গে নিও...ও একটা নাটকের দলে আছে, ব্যান্ধকর্মী, আমাদের খুব কাছের। কোনো কারণে দেরি হলে আজ ওর কাছে থেকো।

সব শুনে কৌশিক বলল, আগামীকাল দুপুরে বসলেই তো হত, আজ আবার...। নিরুপম মাথা নাড়ল, দেখ না আজকেই যদি হয়। 'ঠিক আছে, তুমি একটু বস' বলে চটি গলিয়ে বেরিয়ে গেল কৌশিক। আধঘন্টা পরে ফিরে এসে হাত নাড়ল—হয়ে গেছে। পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকে এদিক-ওদিক টেলিফোন করে সব ঠিক করে ফেলেছে সে। —তবে আজ নয়, কৌশিক বলল। কালকেও হবে না। পরশু বসবে ওরা। সবাই আসতে-করতে রাত হবে। মিটিঙের সময় রাত একটা। একটু থেমে কৌশিক বলল, দেখ আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

নিরুপম হাসল। ওদের এদিকে আনতে পারলে আমাদের কত লাভ ভাব...পুরো দক্ষিণ শহরতলির সংগঠন আমাদের গ্রুপে এসে যাবে। —সব ঠিক, কিন্তু ওরা সুবিধের নয়, ভীষণ গোঁড়া, যুক্তি শুনে চায় না...অহেতুক সময় নষ্ট, কৌশিক বলল। ওরা মানবেই না।

নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিরুপমের। সে কখনো, দেখাই যাক না, কেমন না মানে? দুইয়ে-দুইয়ে চারকে তো ওরা পাঁচ বলতে পারবে না? —বলতেও পারে, কৌশিক তর্ক জুড়ল। জান ওরা 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ'-কে সি এম-এর লেখা বলে মনে করে না? —হাস্যকর কথা, কিন্তু অধৈর্য হলে চলবে না, নিরুপম বলল। ঠিক আছে এই লেখা না হয় ওঁর শহীদ হবার পর প্রচারিত হয়েছে কিন্তু ওঁর ত্রিপুরার কমরেডদের উদ্দেশে লেখা চিঠির কথা বলব, যেখানে উনি কমরেডদের কৃষক জনতার অর্থনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কথা বলেছেন, ধৈর্য ধরে সংশোধনবাদীদের বোঝাতে বলেছেন। কলকাতার যুবকদের বলেছেন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে। এমনকী স্ত্রীকে লেখা চিঠি, যাতে উনি আগের খতমের রাজনীতির ভুল ঝোক কাটিয়ে নতুন পথে চলার কথা বলেছেন, সেই কথা বলব।

কৌশিক তবু সন্তুষ্ট হল না। ও মাথা নাড়তে থাকল। —আরে দূর অত ভাবছ কেন? প্রো-লিন'রা তো আমার বউয়ের গ্রুপ... আমি ওদের ভগ্নীপতি কিংবা জামাইবাবু...আমার কোনো ক্ষতি করবে না ওরা। হো-হো করে হাসল নিরুপম। কৌশিক বলল, সব বুঝলাম...তবু সঙ্গে অস্ত্র রেখ...আছে তো?

পকেট থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের পয়েন্ট থ্রি-টু রিভলবার বের করল নিরুপম। আলো আঁধারের মধ্যেও চকচক করে উঠল অস্ত্র।



ঘুম আসছে না। সর্বাস্থে ব্যথা। শরীর অবসন্ন। তবু ঘুম নেই চোখে। কখনও আচ্ছন্নভাব আসছে আবার একটু আওয়াজ হলেই তজ্রা কেটে যাচ্ছে। উঠে বসল পাঞ্চালী। এখন রাত কত? লালবাজার গারদখানার ভেতরে বসে বোঝার উপায় নেই। ঘরটি বড়। কুড়ি-পাঁচশজন বন্দি এঁটে যায়। কিন্তু বিগত বেশ কিছুদিন পাঞ্চালী এ ঘরে একা। উপর থেকে একটি আলো ঝুলছে। ওইটি সারাক্ষণ জ্বলে থাকে। কিন্তু তার ক্ষমতা অতীব ক্ষীণ। সবসময় খরের মধ্যে আলো আঁধারি, কাছের জিনিসও নজর করে দেখতে হয়। গারদের দেওয়াল অনেকটা উচুতে শেষ। তারপর লোহার গরাদ ছাদ পর্যন্ত। এইখানে আকাশ দেখার উপায় নেই, বন্ধ নেই, আত্মীয় নেই, কিছুর নেই। এমনকী সময়টাকেও যেন কেড়ে নিয়েছে ওরা। বাইরের আওয়াজ শুনে চলমান জীবনটাকে অনুভব করে নিতে হয়।

গারদখানার বাইরে পুলিশের প্রধান কেন্দ্রটির সীমানা বরাবর দু-একটি উঁচু গাছ আছে। সেইখান থেকে সকালে-বিকালে পাখির কোলাহল-কলতান ভেসে আসে। যখন দু-একটি পাখি উসখুশ করে, বোঝা যায় ভোর হচ্ছে। কিছুপরে পাওয়া যায় দিনের প্রথম ট্রামের খন্ট — ঠঙ ঠঙ। কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের সুর। ক্রমশ গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ বাড়ে। জীবনযাপনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ভরদুপুরে প্রায়শই শোনা যায় হারমোনিয়ামের আওয়াজ। বেসুরকে সুরে বাঁধবার কসরৎ চলে। কোথা থেকে আসে এ আওয়াজ? বয়স্ক ওয়ার্ডার মহিলাটি জানিয়েছে, রাস্তার ওপারে বাদ্যযন্ত্রের দোকান আছে, বেশ কয়েকটি, সেইখান থেকে। বিকেলে মিস-ট্রামের শব্দে চাপা পড়ে যায় হারমোনিয়ামের সুর। শেষ বিকেলে আবার পাখিদের ডানা ঝাপটানো কোলাহল। রাস্তিরে সব শুনশান।

সন্ধ্যেক কঠোর শোনা গেল। দূর থেকে ভেসে আসছে। পাঞ্চালী উৎকর্ষ। কারা যেন হরিদ্বার করতে করতে চলেছে। শ্বশানযাত্রী নিশ্চয়ই। কুকুরের ডাকও শোনা গেল একবার। কিন্তু সকাল হবার কোনো সাংকেতিক শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গভীর রাত এখন। মশারাতেরও নিজস্ব লক্ষণ আছে। একা থাকতে গিয়ে তাও চেনাজানা হয়ে গেছে। পাঞ্চালী উঠে কলঘরে গেল। জ্বর রয়েছে এখনও। সেজন্য এই ঘোর গরমকালেও তাপবোধ নেই তেমন। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ। এখানে পানীয় জলের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। কলপাতা কপোঁরেশনের পাইপ বেয়ে যে তরল আসে সেই জলেই শৌচের কাজ, সে জলেই গ্নান। সেই জলই পান করতে হয়। কল খুলে দিয়ে আজলা ভরে অনেকটা জল পান করল পাঞ্চালী। ঘাড়ে, মাথায়, মুখে জলের ঝাপটা দিল। গায়ে বেশ দুর্গন্ধ। চলে এঁটে পড়ে গেছে। চুলের উকুন ছড়িয়ে গেছে শরীরেও। ভালো করে স্নান করবার উপায় নেই। কাগজ গামছা দেয়নি ওরা। কলের তলায় বসে মাথা শরীর ভেজালে তা শাড়ি নিজেই মুছতে হয়। তখন ভেজা শাড়িই একমাত্র পরিধেয়। কোনো পরিবর্ত শাড়ি দেয়নি ওরা। যে শাড়ি পরে লক-আপে ঢুকেছিল তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

শাড়ি-শায়া সব পুঁজ রক্তে মাখামাখি। কিন্তু বদলাবার উপায় নেই, অনুমতিও নেই। ব্যথার তীব্রতা বেড়ে গেল হঠাৎ। পেছনে হাত রেখে, খানিকক্ষণ দমবন্ধ করে থাকতে হল। আস্তে আস্তে শরীরের মধ্যে মিলিয়ে গেল ব্যথার উচ্ছ্বাস। আঁচল দিয়ে হাত মুখ মুছে দেওয়ালের পাশে, শোবার জায়গায় ফিরে এল পাঞ্চালী। দেওয়াল বেয়ে ছারপোকাকার দল সারিবদ্ধভাবে চলেছে। ওদের যাতায়াতের বিরাম নেই। কেন যে এত ব্যস্ততা। আজ কতদিন হল? দেওয়ালে আঁচড়ের দাগ দেখে দিনের হিসাব শুরু করল। এক, দুই, তিন, চার...। প্রথম দিনেই মাথা খাটিয়ে এই ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। শরীর থরথর করে কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ অস্বাভাবিক, তবু দেওয়ালের গায়ে একটি নখের আঁচড় কেটেছিল সে। পরদিন সকালেও তাই। দিনের হিসাব রাখা যাবে।

প্রথমদিনের অত্যাচারের কথা ভাবলেই পুলিশ বাহিনীর মুখের ওপর একদলা থুতু ছোঁতে ইচ্ছে করে। লালবাজারের ভেতর গাড়ি ঢুকতেই ওরা হুড়মুড়িয়ে নেমে তাকে টানতে টানতে দোতলায় বড়বাবুর ঘরে নিয়ে গেল। প্রশস্ত টেবিলের ওপারে বড়বাবু। চোখ বুজে চুরুট টানছেন। এপারে চারটি চেয়ারের তিনটি খালি, একটিতে সাদা পোশাকের লোক, পুলিশই হবে। হলুদ দেওয়াল। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চ পাতা। উপর থেকে আলো ঝুলছে। পাখা ঘুরছে মাঝারি গতিতে। ঘরের মধ্যে দু'জন দাঁড়িয়ে।

যে লম্বা লোকটি তাকে ধরেছিল, সে বলল, স্যার...এই হল পাঞ্চালী মিত্র...নিরুপমের বউ। বড়বাবু মাথা নাড়লেন, বাঃ! শুড জব। টেবিলের এপারের সাদা পোশাকের লোকটির দিকে তাকিয়ে বড়বাবু বললেন, কী কনকেন্দু, তুমি তো নিরুপমের ব্যাপারে স্পেশালিস্ট....তা ওর বউকে চেন নাকি? এ-খারের লোক...আগেই তাকিয়েছিল পাঞ্চালীর দিকে। সে মাথা নাড়ল, না চিনি না। এই তাহলে কনকেন্দু? এর অনেক গল্পই তো নিরুপমের মুখে শুনেছে পাঞ্চালী।

কনকেন্দুর কথায় বড়বাবু ভুরু তুলে মুখ বিকৃত করলেন। সে কী? চেন না? অবশ্য চিনবেই বা কী করে? ওরা তো সকালে বিকেলে বউ পালটায়....ওদের কাছে সব মেয়েছেলেই তো কমরেড, সবাই বউ....। খ্যা-খ্যা করে হাসলেন বড়বাবু। কনকেন্দু বাদে ঘরের অন্য সবাই হাসিতে যোগ দিল। বড়বাবু পাঞ্চালীর দিকে তাকালেন, কিরে...নিরুপম কোথায়? পাঞ্চালী মাথা নাড়ল, জানি না।

লম্বা লোকটির সাহায্যকারী দু'জন উত্তেজিত গলায় চিৎকার জুড়ে দিল, স্যার এ বহু ভুগিয়েছে...কিছুতেই আসতে চাইছিল না....আমাদের পোষা কুস্তা বলেছে। বলতে বলতে ওদের গলা আরও চড়ে গেল। স্যার, এ আমাদের ঘেন্না করে....গাড়ির মধ্যে বারবার বলছিল সরে বসতে...। বড়বাবু হুকুম দিলেন, টেবিলে তোল। বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটি লোক তাকে জাপটে ধরল। ওরা কী তার লজ্জাহরণ করবে? এক মুহূর্তের জন্য দুর্বল লাগল। অসহায় লাগল। ভয়ও যে করল একটু! কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ল মা'র কথা। মগি, সত্য ধরে থাকতে গেলে কষ্ট পেতে হয় খুব, হয়ত সম্মানহানিও হবে কোনোদিন কিন্তু ভেতরে ভেতরে অপরিসীম শান্তি পাবি। মনে জোর ফিরে এল।

কনকেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্চালীর সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওর চোখে কী একটু সহানুভূতি দেখল পাঞ্চালী? বড়বাবু বললেন, তোমার তো আবার এইসব পুজোপাঠ পছন্দ

না...যাও। কনকেন্দু চলে যেতেই তাকে বড়বাবুর টেবিলে উপড় করে ওইয়ে দেওয়া হল।

ওখনও বোঝা যায়নি, কী হতে চলেছে। তার ঘাড় থেকে পা অবধি ঢেকে দেওয়া হল কস্বল দিয়ে। এই গরমে কস্বল! তারপরেই শুরু হল লাঠির বাড়ি। পিঠ, পা, কোমর পশ্চাদ্দেশের কোনো অংশেরই ছাড় নেই। শরীরের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি। কতক্ষণ চলেছিল মনে নেই। যখন চেতনা ফিরল, সে মাটিতে শুয়ে। দুটো লোকা ওলের ঝাপটা দিচ্ছে। বড়বাবু সামনে দাঁড়িয়ে হাতে চুরুট। লোক দুটো তাকে দাঁড় করাল। পায়ে একদম জোর নেই। শরীর ফুলে উঠেছে। ভীষণ পিপাসা, কিন্তু ওরা জল দিল না।

— কীরে? এইবার বলবি? নাকি আরও কিছুক্ষণ পুজো-আচ্ছা করতে হবে? কথাটা কানে যেতেই দিদিমার গাওয়া একটা গান মনে পড়ল। কেন ডর, ভীক, কর সাহস আশ্রয়; / যতো ধর্ম স্ততো জয়।। / ছিন্ন ভিন্নে হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়? / হোক ভারতের জয় / জয় ভারতের জয় / গাও ভারতের জয় / কি ভয় কি ভয় / গাও ভারতের জয়। দিদিমা বলতেন, এ হল একশো বছর আগেকার গান — জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হত। মনে সাহস পেল পাঞ্চালী। বড়বাবু আবার বললেন, কীরে মাগি! চুপ কেন? বলবি? নাকি আবু দলাই মলাই করে দেব? ঘরের সবাই চিৎকার করে হেসে উঠল। চুরুটে লম্বা টান মারলেন বড়বাবু। টান মারতে মারতে তার দিকে এগিয়ে এলেন। লোকটির মুখে মুগ্ধ গন্ধ। কী রে শালি? বলেই তার গালে চুরুটের ছাঁকা দিলেন বড়বাবু। আর্তনাদ করে উঠল পাঞ্চালী। জানোয়ার....। তার ব্রহ্মতালুতে লাঠির বাড়ি পড়ল। আবার চেতনা লোপ পেয়ে গেল।

একসময় জ্ঞান ফিরল। ভূমিশয়্য থেকে তুলল দুজন কনস্টেবল। কাঁধে ভর দিয়ে বিধ্বস্ত শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে আসা। এবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা? অতঃপচারের পর মাথা ঠিক রাখাটাই আসল লড়াই। বড়বাবুর ঘর থেকে একতলায় নামিয়ে, লালবাজারের উঠানের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে পূর্বদিকে নিয়ে যাওয়া হল। যাবার পথে নিশ্চয়ই তার বিধ্বস্ত চেহারা, বিস্রস্ত বেশবাস দেখেছে অনেকেই। কিন্তু কারুরই কোনো হোলদোল নেই — কারণ এখানে এমন তো হয়েই থাকে।

উত্তর পূর্ব কোণে আসার পর আবার একটি বাড়ির উপরে উঠতে হল। দেখা হল এক কাঁচাপাকা চুলের রোগা, লম্বা, দেহাতী মহিলার সঙ্গে। লালবাজারে ঢুকে এই প্রথম এক মহিলার দেখা পাওয়া গেল। তার হাতে চালান দিয়ে কনস্টেবল দুজন চলে গেল। মহিলার হাত ধরতেই স্নেহের স্পর্শ পেল পাঞ্চালী। দেহাতী মহিলা ঠেট হিন্দিতে পুলিশের উদ্দেশে গালি পাড়তে শুরু করলেন। তিনিই জানালেন তাকে থাকতে হবে সেন্ট্রাল লকআপে। গারদখানা খালি। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল পাঞ্চালী। শরীর ফুলে প্রগুণ। আর শক্তি নেই। জ্বর এসে গেছে। রাতের খাবার খাওয়া গেল না।

সেদিনও এমনই মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রাস্তা থেকে দশ বারো জন বারবণিতাকে তুলে এনেছে পুলিশ। ওই স্বাধীনযৌবনারা চিৎকার করে পুলিশের উদ্দেশে গাল পাড়ছিল। আমাদের না হলেও চলে না শালাদের আবার ধরেও আনবে। রাত জাগা

ওদের অভ্যাস। ওরা সবাই তালি দিয়ে গান শুরু করে দিল। নাচতেও শুরু করল কয়েকজন। বেশ কষ্ট হচ্ছিল পাঞ্চালীর। একটুও শব্দ ভাল লাগছে না। ওদেরই একজন এগিয়ে এসে আলাপ করল তার সঙ্গে। অন্য সবাই তার সম্পর্কে কৌতূহলী। পাঞ্চালীর পরিচয় জেনে ওদের একজন বলল, দিদি তুমি খাঁটি মানুষ। সমাজ পাশ্টাবার রাজনীতিকে এরাও কত শ্রদ্ধা করে! মনে জোর ফিরে পেল পাঞ্চালী। সে বলল, কেন? তোমরাও ভেজাল নাকি? স্বাধীনতার এত বছর পরেও যে দেশ তোমাদের জন্য এমন রাস্তা বানিয়েছে, তাকে পাশ্টাতে হবে গো। ওরা মাথা নাড়ল। পাঞ্চালীর অনুরোধে স্তব্ধ হল রাতের নাচ গান। ওরা শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল পাঞ্চালীও।

বরাবর সকালে ঘুম ভাঙে পাঞ্চালীর। ঘুম ভেঙেই দেওয়ালে আঁচড় কেটেছিল সে। তারপর তাকিয়েছিল বণিতাদের দিকে। ওদের অধিকাংশেরই শোবার অভ্যাস খারাপ। শাড়ি-শায়া উঠে গেছে উপরে। কেউ আবার উন্মুক্ত। ঠোটে-গালে লেপটে রয়েছে মুখের রঙ, চোখের কাজল। করুণা হল পাঞ্চালীর। মা রে! সমাজ কী পথই দিয়েছে তোদের!

কিছু পরে ওরা জেগে উঠল। শৃঙ্খলা মেনে হাত মুখ ধুয়ে, জেলের চা খেয়ে বিদায় নিল। ওরা বিচারালয়ে যাবে, তারপর জামিনে খালাস। মাঝে মধ্যেই ওদের ধরে আনা হয় এইখানে, সেজন্য সমস্ত খুঁটিনাটি রপ্ত হয়ে গেছে।

পরদিন একইরকম জেরা আর মানসিক অত্যাচার। সেই একই প্রশ্ন, নিরুপম কোথায়? কোনো সূত্র? ওর বিষয়ে সামান্য কোনো ইদিশ, তথ্য জানতে পুলিশ মরিয়া। তার নিজের জন্য নয়, নিরুপমের জন্য ভয় করেছিল পাঞ্চালী। ওকে ধরতে পারলে পীড়ন, অত্যাচারে খুঁচিয়ে মারবে ওরা। প্রার্থনা করল, নিরুপম ভালো থেকে। আমি সহ্য করতে পারছি, ক্রমশ আরও পারব। ভেঙে পড়িনি আমি আমার। কিন্তু তুমি ভালো থেকে। নিরাপদে থেকে। ব্যতাসের কোনো কণা কী শরবে না তার এই একটি বার্তা নিরুপমকে পৌঁছে দিতে? একটি পাখিও কী তার নীরব উৎকণ্ঠার একটি মুহূর্ত নিরুপমকে পৌঁছে দিতে পারে না?

এইবার নখের আঁচড় গুনতিতে ভুল করে বসল পাঞ্চালী। অন্য চিন্তা করতে করতে বাইশ অবধি গোনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিরুপমের কথা ভাবতেই সব গুলিয়ে গেল। কেমন আছে ছেলেটা? তোমাকে ছাড়া থাকতে যে বড় কষ্ট নিরুপম! দেশের জন্য এই কষ্ট স্বীকার, জানি। কিন্তু মানবিক অনুভূতিকে কী করে পাশ কাটান যায় বল? এখনও যে তোমার শরীরের গন্ধ লেগে আছে আমার সর্বত্র। চারপাশের এই কদর্যতা এখনও চাপা দিতে পারে নি সেই সৌরভ। নিরুপম তুমি থেকে, আমরা মিলবই।

লকআপে থাকার দুদিনের মাথায় পাঞ্চালীকে নিয়ে যাওয়া হল শিয়ালদহ কোর্টে। যাবার পথে বাইরের কোলাহল শুনতে খারাপ লাগছিল না। জীবন চলছে। ন্যায়ালয়ে তাকে গাড়ি থেকে নামতে হল না। পুলিশ আধিকারিকটি বিচারালয়ের ভেতরে ঢুকলেন, খানিকক্ষণ পরে ফিরে এলেন। মুখে বিজয়ীর হাসি। মহামান্য বিচারপতি পাঞ্চালী মিত্রকে আরও পনেরদিন পুলিশের হেফাজতে রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। অজুত ব্যাপার। তার মুখদর্শন করলেন না ধর্মাবতার, তার কোনো অভিযোগ, বক্তব্য শুনলেন না, রায় দিয়ে দিলেন।

ফিরে আসার পর আবার জেরা এবং গড়গড়ানির নির্দেশমতো পূজোপাঠ চলল। জ্ঞান হারাবার মুহূর্তটিকে আলাদা করে চিনতে শিখে গেল পাঞ্চালী। চেতনা আসবার পরে

দ্রুত মাথা কীভাবে চালনা করা যায়, শিখে গেল সেই কুটকৌশল। জেরা, মার, ধাক্কা হাগান, ধাতস্থ হওয়া, চোদ্দ-পনের দিন পরে একবার বিচারালয়ে যাওয়া, আবার পুলিশের হেফাজতে ফিরে আসা। ক্রমশ এইটাই জীবনের ছন্দ হয়ে গেল। নিয়ম একই, বিচারালয় শুধু পালটে যায়। শিয়ালদহের পর ব্যাকশাল কোর্ট। তারপরে আলিপুর কোর্ট। এ এক অদ্ভুত সময় -- আইন পঙ্গু, বিচারক পঙ্গু — শুধু পুলিশ বাহিনী রাজ করে চলেছে।

গড়গাড় পুঞ্জোপাঠের আধিক্য পেছনের মাংস খেতলে গিয়ে ঘা হয়ে গেছে। শরীরের পিঁড়ি আয়তাকার থেকে রস গড়াচ্ছে। একটি ক্ষত জন্ম দিচ্ছে অন্য দূষিত ক্ষতের। তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারখানা সেন্ট্রাল লকআপের তলার ঘরেই। লালবাজারের ভেতরে সব আছে। বড়বাবু থাকেন সেন্ট্রাল লকআপের পাশের বাড়িতেই। গড়গাড় ধোলাই দেবেন। শরীরে ক্ষত হবে। আর সেই আক্রান্তের চিকিৎসাও হবে লালবাজারের চার দেওয়ালের মধ্যে। সুন্দর ব্যবস্থা। যতবার ভেবেছে ততবারই মজা পেয়েছে পাঞ্চালী, আবারও পেল।

ডাক্তার ধন মণ্ডল পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া শুরু করলেন। ছত্রিশটা সুই দেবার পরেও ঘা শুকায়নি। এইবার একটু চিন্তায় পড়েছে পুলিশ। পাঞ্চালীর চিন্তা নেই। বাঁচালে এই ক্ষতই তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে জেল-হেফাজতে পাঠাবে। সে প্রাণপণে কামনা করছে যাতে জেলে যাওয়া যায়, সেখানে অসুস্থ নিয়মিত এই অশালীন অত্যাচার মোকাবিলা করতে হবে না। কিছু সঙ্গীও নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আবার মারলে এই দূষিত ক্ষতই তাকে মারবে। তাহলে তো সব চুকেই গেল। নিয়মিত অজ্ঞান হতে হতে বোঝা গেছে, মৃত্যু মানে এমনই চেতনা হারানোর বেশি কিছু নয়।

আবার প্রথম থেকে গুনতে শুরু করল পাঞ্চালী। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ....। অচিরেই গুনতি প্রায় শেষ।একচল্লিশ, বিয়চল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ। সেন্ট্রাল লকআপে তালা খোলার ঝনঝন শব্দ হল। এত রাতে আবার তাকে নিতে এসেছে ওরা! আজ লালবাজার লকআপে তার চুয়াল্লিশতম দিন। ওদের হাতে পড়বার আগে ভাল করে ঝালিয়ে নিল পাঞ্চালী। অর্থাৎ সকালবেলায় পঁয়তাল্লিশতম নখের আঁচড় কাটতে হবে দেওয়ালে।

—বড়বাবু ডাকছেন। দু'জন কনস্টেবল এসেছে।

কেন? ওদের জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। ওরা উত্তর দেবে না। তাছাড়া উত্তর তো জানাই আছে। লালবাজারের উঠোন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটি মাথায় গেঁথে নিল পাঞ্চালী। বড়বাবুর ঘরে একই চিত্র। লোকসংখ্যা কিছু বেশি। অন্যদিন দু'জন থাকে। আজ গড়গাড় ছাড়া আরও তিনজন। নতুন মুখ। ওরা বোধহয় বড়বাবুর কাছে শিক্ষানবিশী করতে এসেছে!

কী রানি, আমাকে পছন্দ নয় তোমার? বড়বাবুর মুখে চড়া গঙ্গ মদের। শরীর থেকেও বেরোচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল পাঞ্চালীর। ওর প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার নেই।

একটা সিঁড়ি মতো লোক বড়বাবুর দিকে তাকাল। স্যার, একে একটা প্রস্তাব দিলে হয় না? বড়বাবুর ঘোলাটে চোখে জিজ্ঞাসা ফুটল।

—স্যার, এ নিরুপমকে গালাগাল করুক, বলুক নিরুপম জোর করে তাকে এই লাইনে নামিয়েছে, নিরুপমের ছবিতে হিসি করে দিক, তাহলেই ছেড়ে দেব আমরা....

বড়বাবু তারিফ করলেন, আরে কেয়া বাত!পাঞ্চালীর দিকে ফিরলেন বড়বাবু। কত ভাল প্রস্তাব...নিরুপমের খোঁজখবর দিতে হবে না...তুই শুধু ওই কথাগুলো বল... বল না...বলে দে... আর একটা ছবিও দিচ্ছি। ফাইল থেকে একটা ছবি বের করে পাঞ্চালীর হাতে দিলেন বড়বাবু। নিরুপমের ছবি। নে, এইবার ওই কাজটাও করে দে... মাইরি বলছি আমরা কেউ দেখব না....

নিরুপমের ছবি হাতে নিয়ে ওর বলা গল্প মনে পড়ল পাঞ্চালীর। মাও সে-তুঞ্জের প্রথম বউ ইয়াং কাই-হুইকে গ্রেপ্তার করেছে অত্যাচারী শাসক চিয়াং কাই-শেকের বাহিনী। তখন ইয়াং-এর বয়স তিরিশেরও কম। সঙ্গে ছোট্ট ছেলে মাও অ্যান-ইং। তাদের প্রথম সন্তান। চিয়াং বাহিনী বলছে, তুমি মাও-কে অস্বীকার কর, গালি দাও, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, ছেড়ে দেব আমরা। অন্যথায় তোমাকে মরতে হবে। ইয়াং বললেন, তোমরা আমায় যা খুশি করতে পার...বলব না...সমুদ্র শুকিয়ে গেলেও, পাহাড় ভেঙে পড়লেও আমি মাওয়ের নিন্দা অথবা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করব না...। ইয়াংকে গুলি করে মারে চিয়াং কাই-শেকের ঘাতকবাহিনী। তাদের সেই প্রথম সন্তান মাও অ্যান-ইং পরবর্তীতে কোরিয়ায় গিয়ে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল মার্কিনীদের বিরুদ্ধে। আঠাশ বছরের ছেলেটি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। বিপ্লবীরা এমনই। নীতির জন্য মরতে ভয় পায় না।

নে, এইটা দ্যাখ। বড়বাবু একটা খাতা খুলে দেখলেন। পড়তে পারছিস তো? পাঞ্চালী দেখল। খাতার পাতায় নিরুপমের নামে অশ্লীল লেখাবন্ধ। — এইগুলো পড়ে দে, তাহলেই হবে...। পড় পড়। লজ্জার কী আছে! বড়বাবু এক পা এগিয়ে এলেন। পাঞ্চালীর সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এল। এই জানোয়ারেরা ভেবেছে কী? তাকে দিয়ে এমন কাজ করাতে পারবে? বড়বাবু আবার বললেন, ও তো তোদের বিরোধী গ্রুপে আছে এখন, গালাগাল দিতেই পারিস....। লোকটির গায়ে কটু উগ্র গন্ধ। মাথাটা ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের কথাবার্তার পান্টা হিসাবে অবজ্ঞা, উদাসীনতা ছুঁড়ে দেওয়াটাই ভাল প্রতিরোধ। দিদিমার কণ্ঠস্বর মনে করবার চেষ্টা করল পাঞ্চালী। সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে / একমত ভাব ধরি, এক তানে। রাগিনী - খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

কীরে মাগী! বলবি না তো? ...চল তোকে নিয়ে খেলি। বড়বাবুর চোখের ইশারায় নতুন মুখ তিনটি তিনদিকে ছড়িয়ে গেল। পাঞ্চালীর চুলের মুঠি ধরে তাকে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলেন বড়বাবু। দেওয়ালের দিকে দাঁড়ান লোকটি তার কাঁধ ধরে ছুঁড়ে দিল পাশের সঙ্গীর দিকে। পাশের লোকটি তার কোমর ধরে আবার ফেরৎ পাঠাল বড়বাবুর কাছে। বড়বাবুর পছন্দের জায়গা পাঞ্চালীর লম্বা চুল। তিনি এবার হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়লেন দরজার দিকে। তাকে নিয়ে ফুটবল লোফালুফি খেলা চালাল চারজন। ক্রমশ গতি বাড়াল। এই ধাক্কাও সহ্য হল না বেশিক্ষণ।

যখন চেতনা ফিরল, পাঞ্চালী লকআপের ভূমিতে। আচ্ছন্নতার মধ্যেই হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালের কাছে পৌছে গেল সে। মন দিয়ে নখের আঁচড়টি কাটল। মোট সংখ্যাটি মনে আছে — পঁয়তাল্লিশ।

শরীরের কাঁপুনি কমেনি এখনও। বেশ বেলা হয়ে গেছে। কিছু পরেই যেতে হল

ডাঙারখানায়। ছোট ঘর। স্পিরিটের গন্ধ। টেবিলের ওপর ব্যাণ্ডেজ, তুলো, নানা ওষুধপত্র ছড়ান। দেওয়ালে দুটি তাক আছে। সেই তাকেও লাল-সাদা নানান রকমের তরল পদার্থ। তাঁকের মাথায় একটি রেডিও। ডাক্তারবাবু এবং তার সহযোগীরা শুনে থাকেন। ডাক্তার মণ্ডল লোকটি অমায়িক। মুখে বিনয়ের হাসি। পাঞ্চালীর উৎসাহ আছে বুঝতে পেরে মাঝে একবার আধুনিক গান নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কেন যে এই ক্ষত কখনওই জানতে চাননি উনি। সবই তো ওর জানা। ক্রমাগত দৃষ্ণের মধ্যে থাকলে যে এই বিশাল ক্ষত সারবে না। তাও উনি ভালোই জানেন। কিন্তু সেই নিয়েও ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। ওষুধ লাগান, তুলো ব্যাণ্ডেজ পাল্টান, ইনজেকশন দেওয়াটা ওর কাজ। সেই কাজটাই উনি নিষ্ঠাভরে করে যেতে চান। মাথা ঘামানোর কিংবা পুলিশকে অর্গাট উপদেশ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই তার।

যান ওই খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। ডাক্তার মণ্ডল মৃদু হাসলেন। পোশাকি হাসি। খাটে শুতেই সামনের সবুজ পর্দা টেনে দেওয়া হল। এইবার তার পুরোন ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে। তুলো সরান হবে। স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করা হবে দূষিত ক্ষত। তারপর মলম, ড্রাগো এবং ব্যাণ্ডেজ। ইনজেকশনও দেওয়া হতে পারে।

খাটের কিনারায় টেবিল। টেবিলের ওপর বাসি খবরের কাগজ। তারিখ ৪ জুলাই, ১৯৭৪। তারিখ দেখে দ্রুত হিসাব কষে নিল পাঞ্চালী। খুব পুরোনো নয়, মাত্র দু-দিন আগের। যতক্ষণ ওরা ক্ষত সাফসুতরো করবে, ততক্ষণ নেওয়া যায় কাগজটা। বাইরের জগতের সন্ধান পাওয়া যায় একটু। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে, রেডিওতে খবর শুধু হল। খবর পড়ছেন বিশিষ্ট সংবাদদাতা নাড়ুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।

‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশমতো মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে নানান বাধ্যবাধকতা নেওয়া হয়েছে। চাকুরিজীবীদের মাস মাইনের একটি অংশ জমা রাখতে হবে কম্পালসারি ডিপোজিট স্বীকৃতি। কোম্পানীগুলির নীট মুনাফা ভাগাভাগি করার উপরেও সীমা টানা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একজন মহীয়সী নারী। তিনি শুধু ভারতের নন, সমগ্র এশিয়ার মুক্তিসূর্য। তাঁর নির্দেশিত পথেই নকশাল আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমন করা গেছে। এবার কালোবাজারি, মূল্যবৃদ্ধি কখনোও রাজ্য বন্ধপরিচর...’।

নাড়ুগোপালবাবুর গলায় আবেগের কম্পন। ওদের বোধহয় এমন আবেগতাড়িত পাঠের ওপর মাইনে বাড়ি নির্ভর করে। নিরুপমের কথায় গলা কাঁপিয়ে রোজগার। কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল পাঞ্চালীর।

‘.....গাজো আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পুনরায় অশান্ত বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা যারা করছে, তাদের সাবধান করে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কোনো-কম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না....প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত পথে চলো সমস্ত অনায়াসকারীকে কঠোরভাবে দমন করা হবে...’

সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলি কীরকম নির্লজ্জের মতো প্রধানমন্ত্রীর মহিমা প্রচার করে চলেছে। যেন কোনো দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিগীতি শুরু হয়ে গেছে। খবর যিনি পড়ছেন, তাঁর গলাতেও কী আকুলতা।

গভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, ‘দক্ষিণ শহরতলিতে দুই নকশাল গোষ্ঠীর সংঘর্ষ!’ উৎকর্ণ পাঞ্চালী। ‘কাল গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলির বাঁশদ্রোণীতে দুই নকশাল গোষ্ঠীর তীব্র সংঘর্ষ হয়। নিহত হয়েছেন লিনপিয়াও বিরোধী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নেতা নিরুপম চ্যাটার্জী....’

পায়ের তলা থেকে তীব্র ঠান্ডা ছুটে এল শরীরের উর্ধ্বভাগে। তলপেটে কেমন এক অস্থিরতা! বুকের ভেতর তীব্র চাপ। নিরুপম তুমি বলেছিলে তোমার ইচ্ছামৃত্যু। তাহলে কী এ খবর কী ঠিক নয়? তবু শ্বাসকষ্ট হল পাঞ্চালীর। তারপরেই সব অন্ধকার।



কার্জন পার্কে ঢুকেই মন ভালো হয়ে গেল সুকান্তির। পার্কের বাইরে তিনটি পুলিশ ভ্যান, দুটি জিপ থাকলেও, ভেতরে মাঠজুড়ে স্লোগান লেখা নানা রঙের পোস্টার — ‘সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক’, ‘ভারত রাশিয়ার সামরিক চুক্তি ধ্বংস হোক...’। বাগানের এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু আড্ডাচক্র। গোল হয়ে বসে কুড়ি-পঁচিশজন করে ছেলে। সংখ্যায় কম তবু মেয়েরাও এসেছে। যেখানে বসেছে ওরা, তার পাশেই মাটিতে গাঁথে রেখেছে দলের নাম লেখা শালু — সিল্যুয়েট, ওপেন থিয়েটার, অরণি, মাস সিংগারস....।

সুকান্তি বললেন, বাঃ! এ তো দেখি মেলা বসে গেছে! এত গান-নাটকের দল এসেছে! কৌশিক বলল, মে দিবসে ভিড় হয়েছিল, বিশেষ জুন ফ্যাসিবাদ বিরোধী দিবসেও হয়েছে, আর আজ বিশেষ জুলাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস তো ভিড় হবেই। এখন তো সবে দুপুর একটা.... আর এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে দেখবেন, আরও কত দল এসে যাবে.... সংশপ্তক, অগ্নিজাতক, চারণদল, মেঘমন্দ্র, বাউলগর থিয়েটার ওয়ার্কস, ইউনিট থিয়েটার....সবারই তো আসবার কথা আজ। এমনকী শিলিগুড়ি, বহরমপুর, মালদা, বর্ধমান থেকেও অনেক দলই আসবে....। সুকান্তির ভালো লাগল। চন্দ্রদা তো চেয়েছিলেন বিশেষ জুলাই প্রতিবাদ মিছিল করতে, সম্ভব হয়নি। পার্টি তো আগের মতো শক্তিশালী নেই। আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সবকিছু। সেই অবস্থায় এরা যে পার্টির কোনোরকম নেতৃত্ব ছাড়াই নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ জারি রেখেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার।

এরা কী সবাই আমাদের দলের? সুকান্তি বললেন। কৌশিক মাথা নাড়ল, না এরা কেউই দলের সক্রিয় কর্মী নয়....কে লিন বিরোধী, কে লিন-পক্ষের, সেও বোঝা মুশকিল। তবে সবাই নকশাল সমর্থক। সুকান্তি বললেন, দেখ এরা কত দামী কাজ করেছে...এই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন প্রতিদিন নানান অন্যায্য দমন-পীড়ন চালাচ্ছে সরকার, তার বিরুদ্ধে এইসব গান-নাটকের দল রুখে দাঁড়িয়েছে। কৌশিক সায় দিল। ঠিক বলেছেন....এরাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে গণসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা....প্রকাশ্য থেকেও প্রতিবাদ করা যায়। সুকান্তি মাথা নাড়লেন।

তবে শুধু গানের দলই নয় এখন বেশ কয়েকটি ছোট পত্রিকা — প্রস্তুতি, বীক্ষণ, অনুষ্টপ, সূর্যতরঙ্গ — এরা সনাতন প্রতিবাদ করেছে। পড়লেই বোঝা যায় এরা বামপন্থী কিন্তু সি পি এম নয়।

এই প্রতিবাদটা কত যে জরুরি এখন। কৌশিক বলল, তবে দর্শকদের মধ্যে এমন আনন্দকেই পাবেন, যাদের মাথায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। একটু থেমে কৌশিক বলল, এই যেমন আপনার মাথার উপরেও আছে। আসলে এখানে যাদের ডিউটি সেই পুলিশ তো সবাইকে চেনে না। সুকান্তি মাথা নেড়ে বললেন, ঠিকই, যেখানে বাড়ি সেই এলাকার থানার পুলিশ চিনলেও চিনতে পারে। দুদিকে দ্রুত মাথা নেড়ে কৌশিক হাসল। ওর হাসিটা বেশ সুন্দর। গালে টোল পড়ে। দাঁত ঝকঝক করে ওঠে। — আজ অবশ্য আপনাকে চেনা শব্দ। একে তো লম্বা দাড়ি রেখেছেন। তার ওপর শার্ট-প্যান্ট। মাথায় রোদ-বাঁচানোর টুপি। পুরো চেহারাই পালটে গেছে...মনে হচ্ছে শিবনাথ শাস্ত্রী আধুনিক পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। — অ্যাঁ! সে কী গো! সুকান্তি হাসলেন। সত্যি? কৌশিক বলল, হ্যাঁ সত্যি কথা, কেউ না-চিনিয়ে দিলে, আপনাকে ধরা সম্ভব নয়।

পায়ে পায়ে উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর এগোতে দেখা গেল, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, বন্দি মুক্তি কমিটির ফেস্টুন। তার সামনে জটলা। ভিড়ের মধ্যের কিছু মুখ চেনা। সুকান্তি তাদের দিকে এগোলেন না। তার উপস্থিতি বেশি জানাজানি হলেই বিপদ। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার দশ হাত দূরে গাছের গায়ে টাঙানো একটি বড় পোস্টার — ‘সিকিম থেকে সম্প্রসারণবাদী ভারত হাত ওঠাও!’ সিকিম-কে ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে সায় দিচ্ছিলেন না রাজা চোগিয়াল। হঠাৎ রাজতন্ত্র উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। অনেকেই বলল, এর নেপথ্যে হাত আছে ভারতের। কিন্তু তেমন বড় কিছু হবার আগেই, কদিন আগে চোগিয়ালের সম্মতি আদায় করতে হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কলকাতা নাড়ছে। ভারতের পেছনে দাঁড়িয়েছে ওরা। রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ যাকে সাহায্য করছে, তার মতো সাহস বাড়বেই। এশিয়ার মুণ্ডো-সূর্যের আলো পৌঁছেছে পূর্ব পাকিস্থানে এবার পৌঁছে গেল সিকিমেও।

চলবে বলে, ভারত সম্প্রসারণবাদী, নিজের তাঁবে আনতে চাইছে সিকিমকে। সেই সূত্রে কার্জন পার্কের মাঠে এই পোস্টার টাঙিয়েছে বন্ধুরা।

এর আগে কখনও কার্জন পার্কে গান শুনতে আসেননি সুকান্তি। প্রতি শনিবারই নাকি এখানে অনুষ্ঠান হয়। মনুমেন্ট ময়দানেও হয় মাঝে মধ্যে। কৌশিক এসেছে কয়েকবার। আজ ওরই উৎসাহে আসা।

আন্দোলনে ভাটা পড়তেই প্রতিক্রিয়া দাঁত নখ বের করেছে। রেল ধর্মঘট দমন করতে সমস্ত শক্তি লাগিয়েছিল কেন্দ্র আর রাজ্যের সরকার। সতেরো লক্ষ রেলকর্মীকে দমন করতে রেলের নিজস্ব বাহিনী আরপিএফ-এর সঙ্গে নামান হল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, টেরিটোরিয়াল আর্মি আর সেনাবাহিনী। সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ সশস্ত্র শান্তিরক্ষক।

একটু সন্দেহ হলেই শুরু হল রেলকর্মী গ্রেপ্তার, জেলে ভরে রাখা, বরখাস্ত এমনকী গণকলোনি থেকে উচ্ছেদ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সায় পেয়ে গুণ্ডারা কাঁচড়াপাড়া গণকলোনীতে ভাঙচুর, লুণ্ঠপাঠ চালিয়ে উৎখাত করল সন্দেহভাজন রেলকর্মীদের পরিবার। কুড়ি দিনের মাথায় রেল ধর্মঘট প্রত্যাহত। তখন অবধি গ্রেপ্তার পঞ্চাশ হাজার, বরখাস্ত ষাটহাজার রেলকর্মী। উচ্ছেদ হয়েছে তিরিশ হাজার পরিবার।

এত দমন পীড়নের মধ্যেও সাংস্কৃতিক কর্মীদের গলার তেজ বেড়ে গেছে। সব থেকে

বড় কথা, তাদের অনুষ্ঠানে সাড়া দিচ্ছেন কত সাধারণ মানুষ। যে কোনো মাধ্যমে মনের কথার প্রতিধ্বনি ঘটলেই মানুষ উৎসাহ পায়। বাহাস্তরে মেট্রো সিনেমাহলে ‘কলকাতা একান্তর’ নামে একটি সিনেমা দেখেছিলেন সুকান্তি। সিনেমা চরিত্রের এক অভিযুক্ত হঠাৎ বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, আপনারা আছেন কোথায় মশাই? এটা কলকাতা... এটা একান্তর সাল। শুনেই দর্শকরা তীব্র করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে দিল। একান্তর সাল কথাটার মধ্যেই এমন আবেগ-প্রতিবাদ লুকিয়ে আছে! ভাবতেই গিয়ে কাঁটা দিল সুকান্তির। ওই সিনেমার আর একটি দৃশ্য মনে পড়ল। তীরধনুক, টাঙ্গি হাতে কৃষক শ্রমিকদের মিছিল। অস্ত্রগুলি আকাশে তুলে মিছিল চলেছে। স্লোগান-গানে আবেগ তুঙ্গে। কী তীব্র অভিঘাত দৃশ্যটির। আবারও হাততালি দিল দর্শক। মানুষ আগ্নেয়গিরি। মাধ্যম পেলেই উগরে দিচ্ছে লাভাস্রোত।

খুব ভাল লাগছে গো, সুকান্তি আবারও বললেন। চারদিকের দম আটকানো ভাবটা যেন এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়েছে এরা! মনের সুখে বেশ নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে এখন....তাকতক্ষণের অনুষ্ঠান? হাঁটতে হাঁটতে পরম্পরা বুঝিয়ে দিল কৌশিক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর শেষ বিকেলে মিছিল। কার্জন পার্ক থেকে এসপ্ল্যানেন্ড হয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট, ওয়েলিংটন, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, বউবাজার, কলেজ স্ট্রিট হয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধরে যাবে মিছিল। শ্যামবাজারে যাত্রা শেষ।

পশ্চিমপ্রান্তের গাছের ছায়ায় এসে কৌশিক বসল, চলুন বসা যাক। সুকান্তি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, চল বসি। ঘাসের উপর বসতে আরাম লাগে। রোদের তাপ কম। তার ওপর হাওয়া আছে। যে দলটির কাছাকাছি বসা হল, তারা হারমোনিয়াম, ঢোল, খঞ্জনি বাজিয়ে সদ্য মহলা শুরু করেছে। ওদের ঘরে বসেছে শ্রোতা, দর্শকেরা। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল দু'য়েকজন। কৌশিকও মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে সৌজন্য বিনিময় করল।

মন দিয়ে গান শুনতে থাকলেন সুকান্তি। ছেলেরা যা ঝালিয়ে নিচ্ছে তাকে ঠিক নির্ভেজাল গান বলা যাবে না। এ হল কবির লড়াই। গ্রামের কবি আর শহরের কবির চাপানউতোর।

গ্রামের কবি গান গেয়ে বলল, —জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম / পতিত পাবন সীতারাম / ঈশ্বর আশ্রয় তেরে নাম / সব কো সুমতি দে ভগবান....

শহরের কবি গানে উত্তর দেয় — জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম / দিনে দিনে বাড়ে শুধু জিনিসের দাম...। শহরের কবি বোঝাতে চাইছে শোষকের চরিত্র। আর গ্রামের কবি পুরনোপন্থী, সনাতন কুসংস্কারে বিশ্বাসী। দুজনেই হাত মুখ নেড়ে দারুণ অভিনয় করেছে। গ্রামের কবি চোখ বড় বড় করে কপালে হাত রেখে বলল— ওই শনির রোষে ভাগ্যদোষে আমরা গরীব হলাম / আর বড়লোকে বড় হল আমরা তাদের গোলাম / সবই তো ভাই ভাগ্য এবং পোড়াকপালের ফের / ভাগ্য ভাল তাই এত সুখ বড় মানুষের। শহরের কবি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে আঙুল তুলে উত্তর দিল— হল না ভাই, কথাতে নাই তোমার কোনো যুক্তি / ওটুকু শুধু জানলে পরে নাই মানুষের মুক্তি / গরীব বড়লোকের ছেলে সবাই সমান ছিল / পৃথিবী তার আকাশ বাতাস সমান বেঁটে দিল/ আরে ভাগ্য

মিঃ চাঁদা দূর সুখ দুঃখের পালা...

৩১৭ ১১০০ দিল কৌশিক। ওই লোকটা...ওকে চেনেন? প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে দাঁড়া আমি প্যান্ট পরা একজন হেঁটে আসছে। তার দু'পাশে দু'জন। একজন নীল শার্ট, অন্যজন সবুজ। অদূরেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির অনিল, আর বন্দিমুক্তির মুকুন্দ। তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। ওই লোকটির দিকে মন নেই।

ক'র কথা বলছ?ওই সাদা শার্ট-প্যান্ট?

ওঁ...

না.....চিনি না তোকে?

ও 'পশাল ব্রাঙ্কের অফিসার তরুণ পত্নবীশ...

ওই নাকি? সুকান্তি উত্তেজনা অনুভব করলেন। অন্যদিকে চলে যাব?

আপনি বসুন....আমি দেখছি।

কৌশিক উঠে এগিয়ে গেল। লোকটির পাশে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আরে! মিস্টার পত্নবীশ যে! ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। কৌশিক করমর্দন করল, নকশাল ধরতে এসেছেন নাকি? ভদ্রলোক দৃশ্যত অপ্রস্তুত।

সুকান্তি উঠে গোয়েন্দার পিছনের দিকে চলে গেলেন। অন্যমনস্কের ভান করে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করলেন। ওদের কথা শোনা যাচ্ছে — অনিলদা ইনিই সেই বিখ্যাত পুলিশ অফিসার যিনি তাবড় তাবড় নকশাল নেতাকে ধরেছেন, কৌশিক হাসল। অনিল গম্ভীর কণ্ঠে পত্নবীশকে। মুকুন্দ তাল দিল, হ্যাঁ আমরা তো জানি....উনি একমাত্র চাকরবাবু জাড়া আর সব বড় নেতাকেই ধরেছেন, তাই না?

পত্নবীশের প্রশ্নে সঙ্গী। সে এসেছিল সাদা পোশাকে নিপাট ভালোমানুষের চেহারায়ে। গোয়েন্দাটার কণ্ঠে। এখন কৌশিকদের গদগদ ভাব দেখে জাঁতাকলে পড়বার অবস্থা। অশ্রুজ্ঞান কাটাতে লোকটি বলল, না....মানে....তেমন কিছু নয়....তা এখানে কতক্ষণ চলবে? আমাদের অগ্রিমত নেওয়া ৬টা পর্যন্ত....তার আগেই, আশাকরি, ছেড়ে দিতে পারব, কৌশিক মাথা ঝাঁকাল। অনিল বলল, আপনিও থাকুন না, ভালো-ভালো গান শুনতে পারেন....একটু পরেই শুরু হবে গান, নাটক। মুকুন্দ বলল, কী যে বল অনিলদা, ওঁর ঠা গান শোনবার সময় আছে?...এসেছেন নকশাল নেতা ধরতে....। কৌশিক বলল, তা প্রশ্ন ঠিক, কিন্তু এইখানে তো ওরা কেউ আসবে না মনে হয়, ওদের তো সব গোপন গোপার....চলুন না আমি সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি....।

ওদের কথাবার্তা শুনতে আরও কয়েকজন ওইদিকে এগিয়ে গেল। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে পত্নবীশ। পকেট থেকে রুমাল বের করে দু-বার কপাল মুছল। তারপর মাথা নোড়ে বলল, আজ আর সময় নেই যে! অনিল বলল, তবে আসুন স্যার, চা খেয়ে যান। চা ওলাকে ডাকবার আগেই পিছু হাঁটা শুরু করল গোয়েন্দা-চুড়ামণি! —না না....পরে একদিন....। আজ চলি....। ওকে জীপ অবধি পৌছে দিতে গেল কৌশিক। অনিল, মুকুন্দও গেল। ভয়কে এমন ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতেও সাহস লাগে। ছেলেটার এলেম আছে। সুকান্তি চললেন কবির লড়াইয়ের দিকে।

মিঃ এসে হো-হো করে হাসল কৌশিক, কেমন অভিনয় করলাম বলুন? সুকান্তি

হাসলেন, উরি বাবা! তুমি তো দেখি একেবারে ভানু বন্দোপাধ্যায়....নিরীহ মুখ করে এমন করছিলে, হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছিল। তোমার সহ-অভিনেতারও দেখি কম যায় না!

কবির লড়াই মনে হয় শেষের দিকে। কারণ গ্রামের কবি বুঝতে পেরেছে শহরের কবির কথা। সে বলল—লেগেছে আগুন লেগেছে আমার প্রাণেতে আগুন লেগেছে / জেগেছে রক্ত জেগেছে আমার জোয়ারের টানে জেগেছে / সব দিয়ে দিয়ে সব শেষে যারা রক্তটুকুও হারাল / মনে রেখ ভাই ওই ক্ষুধার নখর বেয়নেট থেকে ধারাল....

হঠাৎ ডানদিকে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে একটি ছেলেকে দেখে চমকে উঠলেন সুকান্তি। যেন অবিকল নিরুপম! কৌশিককে দেখালেন। সেও ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, পাশ থেকে অনেকটা নিরুপমের মতো দেখতে বটে.....।

নিরুপমের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় মনটা ভার হয়ে গেল সুকান্তির। সেদিনের কথা কৌশিক সবই অনুপম্বল বলেছে। বীরেশ, বিশ্বদলের সঙ্গে আরও দু'জন অচেনা ছেলে ছিল। একজন লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, চোখের তলায় কালি। অন্যজন ক্ষয়াটে হ্যাংলাটে ধরণের। চোখে ধূর্ততার ছাপ। ওদের আলোচনা চলছিল। নিরুপম বোঝাতে চেষ্টা করছিল অতীতের ভুল এবং সি এম যে ভুল বুঝতে পেরেছিলেন সেই কথা। ওরা মানবে না। লম্বা ছেলেটি নিরুপমের দিকে আঙুল তুলল, লিঙ্গরোধীরা সংশোধনবাদী, পুলিশের দালাল। নিরুপম হতভম্ব। ক্ষয়াটে ছেলেটি গভীর গলায় বলল, ঠিক বলেছেন কমরেড, এই যে শালা এক শুয়োরের বাচ্চা দালাল এইখানে বসে। নিরুপম শুদ্ধ। কিন্তু ছেলেটি এটুকুতে থামল না। বলল, এই প্রতিব্রজ্যদল নিরুপম চ্যাটার্জী আমাদের সবার প্রিয় কমরেড পাঞ্চালী মিত্রকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। নিরুপম অবাক। পাঞ্চালী জেলখানায়! সিড়িঙ্গে ছেলেটি মুখ বেঁকিয়ে হাসল, শালা ন্যাকা, এমন ভাব করছে যেন কিছুই জানে না...। এইবার নিরুপম উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল, একদম বাজে কথা বলবেন না। পাঞ্চালী আমার স্ত্রী, ওকে আমি ধরিয়ে দেব? আশ্চর্য!লম্বা ছেলেটি ঠান্ডা গলায় বলল, পুলিশের দালাল হয়ে গেলে টাকার বিনিময়ে বাবা-মা-বউ কাউকেই বেচে দিতে হাত কাঁপে না....। ক্ষয়াটে ছেলেটি আঙুল তুলল, দালাল কুস্তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। বীরেশ দাঁত পিসল, ঠিক....একেবারে ঠিকখতম ছাড়া আর কোনো শাস্তিই এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশ্বদলও মাথা নেড়ে সমর্থন করল। কৌশিকের ধারণা পাশের ঘরে ভোলানাথ ছিল। এসব ওরই পরিকল্পনা।

ছেলেগুলো কিছু করবার আগেই হ্যাঁচকা টানে নিরুপমকে বাড়ির বাইরে এনে ফেলেছিল কৌশিক। বামদিকের গলিতে ঢুকে পড়ল ওরা। দৌড়ো....যত জোরে পারো....দৌড়ো। ওদিকের রাস্তা কৌশিকের ভালোই চেনা। সে নিরুপমকে বলেছিল, তুমি শুধু আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে যাও....সামনে একটা মাঠ পড়বে, ওইটা পেরিয়ে ডানদিকে ঢুকে গেলে ওরা আর আমাদের ছুঁতে পারবে না....জোরে দৌড়ো.....

পিছনে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। একবার-দু'বার-তিনবার। একটা গুলি নিরুপমের কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। কৌশিক পাশ্টা চালাল। নিরুপমকে বলল, তুমিও চালাও। ও ঘুরে চালাতেই, ওপাশের কেউ একটা মাটিতে পড়ল। তারপর আওয়াজ বন্ধ। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

কণ্ঠস্বর গেল। প্রশ্নটি আবারও উচ্চারণ করলেন সুকান্তি। ছেলেটাকে কিছুতেই পাঠান গেল না... না গো?

নাহ্। কৌশিক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাঁচান তো যেত, আমরা মাঠ অবধি চলেও এসেছিলাম। কিন্তু নিরুপম ভীষণ একবাক্স। তীব্র অভিমানী। একবার বলল, ওরা আমার কমেড, ওদের বিরুদ্ধে গুলি চালাতে হল! আমার বউয়ের দল আমায় খতম করতে চায়। তারপর বলল, নাঃ আগামী শতাব্দী আর দেখা হল না....। কৌশিক পূর্ণ চোখে তাকাল। নিরুপম যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। তখনই এসেছিল গুলিটা। সোজা কপালে লাগল। পড়ে গেল নিরুপম। বলতে-বলতে মাথা চোখে জল এল কৌশিকদের। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুকান্তি বললেন, যেখানে নিরুপম পড়েছিল, আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার? কৌশিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

কণ্ঠস্বর লড়াই শেষ। মূল অনুষ্ঠানের জায়গায় যাবার উদ্দেশ্যে বাদ্যযন্ত্রগুলি গুছিয়ে নিচ্ছে ওরা। তার কমানো দরকার। সুকান্তি উঠে পড়লেন। চল এই নতুন নিরুপমের সঙ্গে আলাপ করা যাক। ছেলেটির মুখোমুখি হতে দেখা গেল, পাশ থেকে সাদৃশ্য থাকলেও, সামনে থেকে অন্যরকম। ওকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আলাপ করবার আগেই সে ভুরু তুলে বলল, কণ্ঠস্বর লড়াই কেমন লাগল? দারুণ না? সুকান্তি বললেন, আমার তো অনবদ্য লাগল...। কৌশিক বলল, সত্যিই দারুণ....।

ছেলেটি দরজা দিল, প্রাণবন্ত। এমন মিশুক ছেলের সঙ্গে আলাপ হতে সময় লাগে না। ওর নাম প্রবীর — প্রবীর দত্ত। ভবানীপুরে থাকে। বাড়িতে বিধবা মা। একমাত্র সন্তান। ছেলেটির মুখ নির্মল, অনসূয় ভাবের।

সুকান্তি দিকে তাকাল প্রবীর। আপাততঃ আগে কোনোদিন দেখিনি....আজ প্রথম নাকি? সুকান্তি মাথা নাড়লেন। আমি তো কলকাতার বাইরে থাকি...। ছেলেটি আর কোনো প্রশ্ন করবার আগেই কৌশিক বলল, তুমি কি প্রতি শনিবার আস? প্রবীর হাসল। হ্যাঁ, প্রত্যেক শনিবার। আসলে গান-অভিনয়ের টান নেশার মতো, না এসে পারা যায় না। তাছাড়া প্রত্যেকবারই নতুন কিছু ঘটে। সুকান্তি বললেন, তাই নাকি? প্রবীর বলল, হ্যাঁ....মন ভালো হয়ে যাবার মতো ঘটনা...। কৌশিক বলল কীরকম?...

অনেকক্ষণ ধরে একজন চা-ওয়ালা ওদের পাশে হাঁকছিল চা-চা....। সুকান্তি ওকে ডাকলেন। চা খাবে তো? কৌশিক হয়ে প্রবীরের দিকে দ্রুত চোখ ফেরালেন সুকান্তি। ওরা দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কৌশিক বলল, সুকান্তি এখানে চা মানে কিছু চাফি...

সে আবার কি?

অনেকটা চা আর তার সঙ্গে একটু কফিগুড়োর মিশ্রণ —

সুকান্তি হাসিমুখে চা-ওলার দিকে ফিরলেন। তিনটে চা...।

ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে প্রবীর বলতে শুরু করল। একদিন কবির লড়াই সবে শেষ। দর্শকদের হাততালির রেশ রয়েছে তখনও। টোলের লাল কাপড় মেলে ধরে দর্শকদের কাছ থেকে মাথাটা চাইছে অভিনেতারা। তারা দিচ্ছে — আট আনা, এক টাকা....। শহরের কবির কাছে এগিয়ে গেলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। সাদা চুল। আধময়লা ধূতি, শার্ট, কাঁধে ঝোলা,

হাতে কালো ছাতা। ভদ্রলোক খোলা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বের করলেন।

— বড় ভালো গাইলে বাবা, এই নাও, একটু খেয়ে নাও...

কৌটো থেকে রুটি, গুড় বের করলেন ভদ্রলোক। শহরের কবি অবাক। খেতে সংকোচ করছিল।

— ও...মানে...আপনি...কোথা থেকে এসেছেন?

ভদ্রলোক হাসলেন। আমি সেই বহু গ্রাম থেকে এসেছি...জয়নগরের কাছে বহু...আমাদের ওখানকার গুড় খুব ভালো...খাও না, খাও...। শহরের কবির চোখে জল এসে গেল। প্রবীর বলল, জানেন তো ওই দৃশ্য দেখে আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। সুকান্তি মাথা নাড়লেন। তুমি সামনে ছিলে তোমার তো আসবেই.....তোমার থেকে শুনেই আমার বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় হচ্ছে!

কত মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ছে কার্জনপার্কের গায়ক-অভিনেতারা। আনন্দ পেলে দর্শকেরাও এখানে তাল মিলিয়ে গাইতে শুরু করে দেয়। প্রবীর জানাল, নাটকের মধ্যে দর্শকদেরও ডেকে নিজেদের সঙ্গে নেন অভিনেতারা।

—সে আবার কী? সুকান্তি বললেন

—হ্যাঁ...এইটা আমি জানি, কৌশিক বলল। অবশ্য বাদল সরকারের নাটকেই এমনটা হয়। এই তো মাস তিনেক আগে অ্যাকাডেমি অফ ফর্মি আর্টসের তিনতলায়, অঙ্গনমঞ্চে ওঁর নতুন নাটক ‘মিছিল’ দেখলাম, সেখানে ভিড়ে দৃশ্য সামনে বসা দর্শকদের কাউকে হাত ধরে টেনে নেয় অভিনেতারা। মিছিলের দৃশ্যও ডেকে নয়।

—বাঃ! বেশ মজার তো!আজ হেসে নাকি? সুকান্তি বললেন।

—ঠিক জানি না, আসতেও পারেন...প্রবীর বলল। চলুন আপনাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই।

প্রবীরের সঙ্গে উঠল কৌশিক। সুকান্তিও উঠে দাঁড়ালেন।

ওই দেখুন...। একটি বটগাছের লক্ষ্যে আঙুল দেখাল প্রবীর। গাছের তলায় জনা দশেক ছেলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা উত্তরপাড়ার ইউনিট থিয়েটার। ওরা দুটো অসাধারণ নাটক করে। ‘হচ্ছেটা কী’ আর ‘লাশ বিপণি’। প্রবীর হাঁটতে হাঁটতে ধারাবিবরণী দিয়ে চলল। ওদের সঙ্গে অরণি-র খুব ভালো যোগাযোগ।

ছেলেটা কতসব খবর রাখে। সুকান্তি বললেন, প্রবীর তুমি কি কোনো দলে আছ? প্রবীর হাসল। না না আমি রাজনীতির দলেও নেই, নাটক-গানের গ্রুপেও নেই....আমি দর্শক.....খুব ভাল দর্শক বলতে পারেন। সবাই গানবাজনা করলে শুনবে কে? সুকান্তি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। ছেলেটি বেশ হাসকুটে। কথায়-কথায় মন খুলে হেসে ওঠে।

— না না, কিছু একটা নিশ্চয় তুমি কর, সুকান্তি ভুরু কুঁচকে তাকালেন। —তবে কী কবিতা লেখ? এইবার ছেলেটির মুখে ব্রীড়া দেখা গেল। ও নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ চেষ্টা করি কিন্তু কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের লাইন ঢুকে পড়ে — আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়....।

এই দেখুন এই ছেলেরা....। প্রবীরের আঙুল দেখে বামদিকে তাকালেন সুকান্তি। খোল-করতাল নিয়ে তৈরি কয়েকজন।এগা হোমাস পিন্ডাসের গান করে — জন হেনরি।

এলো... এলো... এলো গান শুরু করে দিল। নাম তার ছিল জন হেনরি/ ছিল যেন জীবন্ত
জান্না। /তাড়াতাড়ি তালে তালে গান গেয়ে শিস দিয়ে / খুশি মনে কাজ করে রাতদিন....।

কৌশল ধুয়ো দিল, হো হো হো হো খুশি মনে কাজ করে রাতদিন। এই গান সুকান্তির
জান্না। একশো বছর আগে পশ্চিম ভার্সিনিয়ার রেলপথের সুড়ঙ্গ খোঁড়বার কাজে নিযুক্ত
নিগ্গো শ্রমিকদের একজন জন হেনরি। পাথুরে পাহাড় কাটায় তাঁর ক্ষমতা অবিস্মায়া।
শ্রমিকদের মতো কাজ শেষ করবার উদ্দেশ্যে স্টিমড্রিল নিয়ে আসে। ওই যন্ত্রের
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন জন হেনরি। পাথর কাটা শ্রমিকদের মধ্যে উদ্ভেজনা। পেশি
আর মোশনের তীব্র প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে জয়ী হবার মুহূর্তে ক্লান্ত জন হেনরির
চোখপাশ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্রমের বিজয়ের নিশান হয়ে ওঠেন জন হেনরি।

কিছুক্ষণ পরে আবার হাঁটতে শুরু করল প্রবীর। ওপেন থিয়েটারের জটিলার সামনে
গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কৌশিক বলল, এরা তোল বাজিয়ে গাজীর গান করে। এইটা শোনবার
মতো। প্রবীর বলল, দেখছেন না, শ্রোতা জড়ো হয়ে গেছে...এখনই শুরু হবে। দর্শকদের
থেকেই কেউ বলে উঠল, ভাই শুরু করে দিন এবার। একটি উনিশ-কুড়ির ছেলে দাঁড়িয়ে
ঢোল ঠাশে নিল। তারপর বোল শুরু করল। সুন্দর হাত ছেলেটির। একটু পরেই দাঁড়াল
গাইশ তেইশ বছরের ছেলে। ছেলেটির চুল লম্বা। শ্যামবর্ণ। সে পাশের ছেলেটির থেকে
ঢোলটা চেয়ে নিল। ঢোল বাজাতে বাজাতে অকস্মাৎ গলা ছাড়ল — আমি আগে করি
পয়গঙ্গরের চরণবন্দনা,/ তারপরেতে গাজীর গান/ শুনে সর্বজনা / শুনে বন্ধুগণ—।
দলের বাকিরা কণ্ঠ ছাড়ল, শুনে বন্ধুগণ....। শুনে বন্ধুগণ দিয়া মন দেশের कहानी /
সম্প্রতি হইয়াছে যাহা লোক জানাজানি/ শুনে জবর খবর—। যথারীতি ধুয়ো দিল বাকি
সবাই। গায়ক ছেলেটির দারুণ গলার স্বর। গায়নে বেশ একটা টান আছে। প্রতিটি চরণের
শেষ শব্দটি দিয়ে শুরু হচ্ছে পরের চরণ। প্রতিটি চরণে যেন একের পর এক কোনো
এক কুঠিরির দরজা খুলে যাচ্ছে! মাঠের মধ্যে যারা এলোমেলো ঘুরছিল, গলার দাপট
শুনে পায়ে পায়ে এদিকে চলে এল। ক্রমশ বেড়ে উঠল দর্শক সংখ্যা।

লেনিনের দেশের নেতা ব্রেজনেভ হোতা আইলেন মোদের দেশে, /গণ্ডা গণ্ডা চুক্তি
হইল কত কলম পিষে / ন্যাকা চৈতন্য —। বলার ঢঙে দর্শকরা হেসে উঠল। গানটি
বলে চলে দেশের দূরবস্তার কথা। রাশিয়া যে ভারতবর্ষের উপর ক্রমশ চেপে বসছে,
সে কথাও মজার ভঙ্গিতে শুনিতে দেয় গায়ক। শুনতে শুনতে বারে বারে সুকান্তির দিকে
তাকাচ্ছে প্রবীর। ছেলেটা বোঝবার চেষ্টা করছে কেমন লাগছে তাঁর। গান পছন্দ না হলে
যেন ওরই পরাজয়। সুকান্তি মৃদু হাসলেন। — না হে, ভাল গাইছে..কথাও একেবারে
এখনকার। ভুরু তুলে তারিফের ভঙ্গি করলেন তিনি। প্রবীর খুশি হল। এই প্রশংসা যেন
ওকেই করা হচ্ছে।

আসবে সমাজতন্ত্র কত যন্ত্র এল বিদেশ থেকে,/ আর গরীব দেশে থাকবে নাকো
এলেন নেতা হেঁকে / প্যাঁচায় ডিম পেড়েছে—। ধুয়ো শেষ হতেই গায়ক ধরল —
প্যাঁচায় ডিম পেড়েছে ঘর ভরেছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি / তাই আমেরিকার সাথে একটু হোক
না মধুর আড়ি / পাতাল রেল চলিবে—

এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই। কিছুকাল আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল

মুখ্যমন্ত্রীর বেলতলা রোডের বাড়িতে পাঁচটা ডিম পেড়েছে। সেই তুচ্ছ ঘটনাটি গানের মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ মজা করেছে ওরা। একটা অন্যরকম অর্থও তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী লোকটি অতীব উদ্ধত। কিছুকাল আগে সুকান্তির বন্ধু, দিম্মির এক সাংবাদিক, সম্মেলনের মধ্যে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার রাজ্যে বিগত কয়েকবছর বারাসাত, বসিরহাটে, জেলের মধ্যে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, নিহত হয়েছেন অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। আপনি কি এগুলির তদন্তের নির্দেশ দেবেন?

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না নতুন করে তদন্তের প্রয়োজন নেই, কারা খুনি তা আমরা জানি।

—আপনি কী এইসব তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করবেন, যাতে লোকে জানতে পারে অপরাধী কারা? আপনি কী তাদের শাস্তি দেবেন?

—না, যা হয়েছে, হয়েছে আমরা কোনো পালটা অভিযোগ করতে চাই না....

—কিন্তু খুনিদের কী শাস্তি হওয়া দরকার নয়?

—তারা আপনার বন্ধু

—আমি সাংবাদিক, আমার সব দলেই বন্ধু আছেন। যদি আপনি জানেন কারা অপরাধী, তাদের শাস্তি দিতে আপনার বাধাটা কোথায়?

—আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসেননি, কোনো তদন্তের পরামর্শ দেবার, এরকম প্রশ্ন করবার কোনো অধিকার নেই আপনার....

ঘটনাটি জানিয়ে দিম্মির বন্ধু বলেছিলেন, লোকটি রাজে বকে জানতাম, কিন্তু এত উদ্ধত জানতাম না। সেই উদ্ধত লোকটিকে জব্বর খোঁচা মেরেছে এই গাজীর গান। গান হঠাৎ দ্রুতলয়ে চলতে শুরু করল। ...তাতে কি হয়েছে আরও জ্বলন্ত লক্ষ হাজার কোটি / রক্ত দিয়ে কেড়ে নেব আমার হকের মাটি / তুমি শুনে রাখ— কৌশলীতি ধুয়ার পরেই — তুমি শুনে রাখ বেঁচে থাক শেষ থাক শেষ কয়টা বেলা, / শ্রমিক কৃষক জুটল এবার খতম তোদের খেলা/ কলের মালিক যত—। এবার কৌশিক আর প্রবীর ধুয়ো দেয়। কলের মালিক যত তোদের মত জোতদারও যাবে / হাজার মানুষ খেপে গেছে তাদের কে ঠেকাবে? / তোদের ভণ্ডাবা? —

দ্রুতলয়ে তাল দিচ্ছে দর্শকেরাও। উদ্বেজনা সংক্রামিত হয়েছে সবার মধ্যে। সুকান্তিও কিছু কম উদ্বেজিত নন। কিছুপরেই গান শেষ হল। আবেগের করতালি পড়ল বহুক্ষণ। প্যালা তোলা শুরু হতে সুকান্তি পকেটে হাত দিলেন। ওদের কিছু দিতে মন চাইছে। কৌশিক থামাল, আরে আপনি রাখুন, আমি দিচ্ছি....। আরে তা কেন....। সুকান্তি বললেন। কৌশিক হাত ধরল সুকান্তির। একদম নয়। আরে মশাই, আপনি নিজেই রুগ্ন শিল্প, ভরতুকিতে চলছে, আপনি আবার সাহায্য করতে যাচ্ছেন আর এক রুগ্ন শিল্পকে! পকেট থেকে হাত বের করুন। কৌশিকের কথা শুনে হেসে ফেললেন সুকান্তি। এরপরে আর কোনো কথা চলে না। কৌশিক চাঁদা দিয়ে দিল। পাঁচ টাকা। মৃদু হেসে সুকান্তি বললেন, বোঝা যাচ্ছে তুমি আজ ভারী শিল্প! কি গো, বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের মাইনে হয় না কি? কৌশিক লাজুক-লাজুক হাসল।

একটু এগোতেই বোঝা গেল ডানদিকে অশ্বখ গাছের তলায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। বামদিকে একটি ছেলে মুকাভিনয় করছে। সে প্রাণপণে দৌড়তে চাইছে সামনে। কিন্তু আসলে হাঁটছে পিছনে। সবাই মজা পাচ্ছে। কিন্তু খুবই শক্ত এই অভিনয়। মূল অনুষ্ঠানের

দিকে যেতে চাইল প্রবীর। —চলুন যাওয়া যাক। এই আন্তরিক ভঙ্গিটা অবিকল নিরুপমের। সুদৃষ্টি চূপ করে গেলেন। একা থাকতে ইচ্ছা করছে।

প্রবীর আবার বলল, চলুন চলুন....। একবার সুকান্তিকে দেখে নিয়ে কৌশিক বলল, ডুমি যাও, আমরা পরে যাচ্ছি...। ছেলেটা কী বুঝল, কে জানে। বলল, ঠিক আছে, চলি....পরে কখনও দেখা হবে।

অনুষ্ঠানের পর মিছিল শুরু হতেই কৌশিক বলল, আপনি মিছিলে হাঁটবেন না...

--কেন?

—ওই দেখুন, বাইরে পুলিশের সংখ্যা বেড়ে গেছে...ওরা নিশ্চয়ই এবার ডালো করে নড়া করবে সবাইকে....ধরা পড়ে যেতে পারেন....

কথাটা ভুল বলেনি কৌশিক। মাঠের মধ্যে এলোমেলো ছড়ান ছোটান জনতার মধ্যে থেকে বিশেষ কাউকে খুঁজে বের করা শক্ত। তাছাড়া ওইখান থেকে সরে পড়াও সহজ। কিংবা মিছিল চলে সারিবদ্ধ শৃঙ্খলায়, সেখানে বিশেষ কয়েকটি জায়গায় একটু উঁচুতে দাঁড়ালে প্রায় প্রত্যেকের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। দু'দিকে পুলিশ পাহারার মধ্যে মিছিল চললে হঠাৎ পালানোও শক্ত। যুক্তিতে ও ঠিক, তবু মন সায় দিচ্ছিল না।

হাঁটাই যাক না কিছুটা। সুকান্তি হাঁটতে শুরু করলেন। কৌশিক ঠিক ওর সামনে। যতটা সম্ভব আড়াল দিচ্ছে সুকান্তিকে।

চলমান মিছিলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের গান, স্লোগান। গাছে লাগান পোস্টার ফেস্টুন এখন হাতে হাতে। বড় চওড়া শাপুর শ্রমিকভাগ ধরে হাঁটছে মিছিলের অগ্রবাহিনী। পুরো শোভাযাত্রাই বর্ণময়।

কৌশিকের সামনে হাঁটতে থাকা একজনকে ছেলে গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল—
আমরা সুসংগীত / আমরা অগীতগীত / আসুক প্রবন চেতনায় / মাথা নিচুর আগে / যেন
নাকে আগুন জাগে / মুণ্ডির পথে ঠিকানা....। মিছিল দূলে উঠল। কুচকাওয়াজের ঢঙে গাইছে ওরা। কৌশিক গলা মেলাল ওদের সঙ্গে। এমন গান মিছিলে গাইতে রোমাঞ্চ।
নিজের মনে গাইতে শুরু করলেন সুকান্তি।

পূর্বদিকে এগোচ্ছে মিছিল। সামনের দু-দিকে পুলিশ পাহারা। মিছিল যাবার জন্য ওরা আন্দাজ কুড়ি ফুট চওড়া জায়গা রেখেছে। তার সামনেই চারটি কালো গাড়ি।

গা ভেবেছি, ঠিক তাই....। পিছনে তাকাল কৌশিক। দেখেছেন তো সামনে প্রত্যেককে মেয়ে নেবার কল....। সুকান্তি বললেন, হুঁ, তাই তো....। আপনি আর এগোবেন না, জোর করল কৌশিক। চার পাঁচজনের সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে বাস গুমটির দিকে চলে যান। সুকান্তি মাথা নাড়লেন, ঠিক আছে।

রাষ্ট্রা পেরিয়ে ওধারে যেতেই পূর্বদিক থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কেউ চিৎকার করল, কমরেডস্ দৌড়ে আসুন শীগগির...। সুকান্তি ভালো করে দেখলেন। মিছিলের মুখ থেকে চিৎকার করছে অনিলা। —মিছিল দৌড়ে এস...। মুকুন্দ হাত নেড়ে ডাকছে সবাইকে।

কয়েক পা এগিয়ে ঘটনাটা বুঝলেন সুকান্তি। সামনের সারি থেকে একটি ছেলেকে তুলে কালো গাড়ির মধ্যে ভরে দিয়েছে পুলিশ। গাড়ির বাইরে লাথি মারছে মিছিলের অগ্রবাহিনী। ওরা গাড়ি ঘেরাও করে হাতে হাত লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়িকে এগোতে

দেবে না এক কদম। গাড়ির সামনে পিছনে শুয়ে পড়েছে অনেক কমরেড। ওদের পিষে দিয়ে তবেই যেতে পারবে গাড়ি। একজন কমরেডকে মুক্ত করতে লড়াইয়ে নেমেছে বহু।

এবার কৌশিক চিৎকার করল, কমরেডস্ দৌড়ে আসুন....সামনে চলুন। মিছিলের পশ্চিমপ্রান্তে স্লোগান উঠল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। তীব্র নিখাদে বেজে উঠেছে কণ্ঠ। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল যেন। মুষ্টিবদ্ধ ডানবাহু উঠে গেল আকাশে। পার্ক জুড়ে প্রতিধ্বনি হল লাল সেলাম...লাল সেলাম। একটি স্লোগানে গতি পেয়ে গেল মিছিল। ছোটবেলায় শোনা কোনো রূপকথা যেন মনে পড়ে গেল সবার। আবার নকশাল বাড়ির নাম এবং প্রতিধ্বনি। স্লোগান ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্তে।

বাহারি পোস্টার, শালু গুটিয়ে ফেলেছে কমরেডরা। ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিতে ডান হাত উঠছে, নামছে। শাস্ত মিছিল নাগিনীর ফণা মেলেছে। ঝিরঝির ঝর্ণা অকস্মাৎ পাহাড়ি নদী। সামনে পেছনে তাকিয়ে কৌশিক হাঁক পাড়ল— বোল রে কমরেড / হামলা বোল...। এ রণতরঙ্গের ও জানা চেনা। মিছিল প্রত্যুত্তর করল — তা-আ-নকে সিনা, হামলা বোল। প্রতিটি ঠোটে একই উচ্চারণ — জোরসে বোল / হামলা বোল। / পুলিশ কুস্তা পে/হামলা বোল। কৌশিক আবার চাগিয়ে দিল — ফিরসে বোল / হামলা বোল। / আরে ডরতা কিউ / হামলা বোল...। মিছিল গর্জন করছে। শোভাযাত্রা দৌড়তে শুরু করল এবার। হঠাৎ প্রবীরকে দেখতে পেলেন সুকান্তি। ওকে কিছু বলবার আগেই ছেলোটো ছুটে এগিয়ে গেল পূর্বপ্রান্তে।

পুলিশবাহিনী লাঠি পেটা শুরু করল। লাঠি নয়, রাস্তায় শুয়ে পড়া কমরেডদের নির্মমভাবে লাথি মারছে ওরা। লাঠির ঝড়ঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছে ছেলেরা। তবু জমি ছাড়বে না কেউ। স্লোগান চলছেই।

এইভাবে চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে অসহ্য লাগছিল। চৌরঙ্গির দিকে এগোলেন সুকান্তি। দুটে ছেলে দৌড়ছে। দুজনেরই মাথা রক্তাক্ত। কপাল বেয়ে অঝোরে রক্ত। তার মধ্যেই একে অন্যকে বলল, কমরেড চলুন কাগজের অফিসে যাই...ওরা যদি এই অত্যাচারের খবর ছাপে, মানুষ জানবে গান গাওয়াকেও আর সহ্য করছে না সরকার...। সুকান্তি ওদের পিঠে হাত রাখলেন। আমি খবর পাঠাচ্ছি, তার আগে তোমরা ভাই ডাক্তারখানায় যাও। বাসওমটি থেকে দু'জন কর্মচারী এগিয়ে এল। খাকি পোশাক। চলুন আমরা নিয়ে যাচ্ছি। ওরাই ট্যাক্সি ডাকল। ছেলে দুটিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন সুকান্তি।

ওমটিতে ফিরতেই থমকে গেলেন সুকান্তি। একটি ছেলেকে শোয়ানো হয়েছে অফিসের টেবিলের ওপর। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। জামা প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে। খালি পা।

টেবিলের পাশে দাঁড়াতেই বুকের গভীরে আকস্মিকের ধাক্কা! এ তো সেই প্রবীর। জ্ঞান নেই। কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়েছে। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন। একজন চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। — শীগগির ট্যাক্সি ডাকুন, মেডিক্যাল কলেজ যেতে হবে। সুকান্তি বললেন। তাঁর গলায় উদ্বেগ এবং কর্তৃত্ব। দু'জনে ছুটে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি ডাকতে।

প্রবীরের কজিতে হাত রেখে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করবার চেষ্টা করলেন সুকান্তি। বৃকে মাথা রেখে একান্তভাবে পেতে চাইলেন হৃদস্পন্দন। কিন্তু সামান্য কোনো আভাসও

পাখায়া খোল না। সুকান্তি মারিয়া হয়ে চিৎকার করলেন, প্রবীর চোখ খোল....প্রবীর।

ঘন্টাটির দিকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। প্রবীরকে দেখিয়ে বলল, আমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। সুকান্তিকে একটু তফাতে ডাকল মেয়েটি। — আমি লিগ্যাল এড কর্মটির দীপা, আপনি আমায় চিনবেন না কিন্তু আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। সুকান্তি সচকিত। অজান্তেই ঝোলার মধ্যে হাত চলে গেল।

দীপা আবার বলল, আপনি ভাববেন না, আমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছি....কিন্তু সুকান্তিদা, আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবেন না....সামনে বিপদ....চারদিক ঘেরাও করে পুলিশ নির্বিচাণে মোতায়েন করেছে।

ওমুটি থেকে একটা সরকারি বাস বের হচ্ছে। দূরপাল্লার বাস। ওইদিকে যাবার আগে সুকান্তি বললেন, দীপা, তুমি ভাই একবার সত্যযুগ অফিসে খবর দিও....ওরা এই খবর ভাপবে মনে হয়...। —ঠিক আছে ঠিক আছে..আপনি শীগগির পালান....। দীপা বলল।

গম্বা না জেনেই বাসে উঠে পড়লেন সুকান্তি। আপাতত এই ব্যুহ থেকে বেরোতে হবে।



আটটি মামলায় আড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঞ্চালীকে। প্রতিটি মিথ্যা মামলা। হুগলিতে তার জন্ম, এড ওয়াশিং। এ খবর জানতে কোনো গবেষণা করতে হয় না। খুব সহজেই এই জেলার তিন জোড়দার হত্যার সঙ্গে তার যুক্ত করে মামলা সাজিয়েছে পুলিশ। বর্ধমানে তখন লিপলিপ্তারা শান্তিশালী। সেই সুবাদে দুটি পুরনো মামলায় ঢুকে গেছে পাঞ্চালীর নাম। কলকাতার তিন পুলিশ হত্যার গড়যন্ত্রকারী হিসাবেও তাকে জড়ান হয়েছে। এমন সব পোকের হত্যার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হয়েছে, তাদের চোখে দেখা তো দূরের কথা, নামই শোনার্নি পাঞ্চালী। অথচ, মজার ব্যাপার, যেখানে সত্যিই ছিল সেই বৈদ্যবাটি পুলিশ গাড়ি আক্রমণের মামলায় তার নাম নেই!

অবশ্য একটি লাভ হয়েছে। মামলার শুনানি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হেফাজত থেকে তাকে পাঠান হল জেল হেফাজতে। লালবাজার থেকে প্রেসিডেন্সি জেল। অবশেষে গড়বাগুর হাত থেকে নিষ্কৃতি। ক্রমশ শুকিয়ে এল নিম্নাঙ্গের দূষিত ক্ষত। প্রেসিডেন্সি জেলে পুরনো সাথিদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। জেল থেকেই তাকে পুলিশ গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে গাওয়া হয় আদালত। যাবার পথে কালো গাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে পাওয়া যায় শওরের মানুষের আওয়াজ। শুনানি শেষে আবার কারাগারে ফেরা। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, গান গেয়ে খারাপ কটছিল না। কলকাতার মামলা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগবে। চাঁতমোষে বর্ধমান জেলার মামলার শুনানি চালু। যেতে হল বর্ধমান জেল।

সাতদিনের মধ্যে খবর এল, চন্দননগর ন্যায়ালয়ে শুরু হয়েছে হুগলি জেলার মামলার বিচারের প্রক্রিয়া। আবার ঠাঁই নাড়া। নতুন ঠিকানা—হুগলি জেল। দ্রোণ হুগলি জেলে ছিল, সেজন্য এই কারাগারের ওপর কিছু দুর্বলতা ছিল পাঞ্চালীর। দ্রোণের কাগাকাক,

দূর থেকে হলেও, দেখতে পাওয়া যাবে। সে নিহত হয়েছে কোথায়, জানা যাবে তাও। কিন্তু এখানে দু-দিন থাকবার পরেই আর ভাল লাগছে না পাঞ্চালীর। যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে, সেখানে অন্য জেলবন্দির কেউই রাজনীতির লোক নয়। ওরা সব সাধারণ চুরি, ডাকাতি, খুনের আসামী। সঙ্গে হলেই অশ্লীল গান ধরে। গানের সঙ্গে নাচ। একটি সাত-আট বছরের ছেলেও আছে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

তৃতীয় দিন বিকেলে ওয়ার্ডার হাঁক পাড়ল, পাঞ্চালী মিত্র...। এর অর্থ কেউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। জাল দিয়ে ঘেরা একটি ছোট ঘরে আরও তিনজনের সঙ্গে দাঁড়াল পাঞ্চালী। ও দিকের ঘরও জালে ঘেরা। ও পাশে তিনজন পুরুষ, চার মহিলা। এর মধ্যে কে তার দর্শনপ্রার্থী? মাঝারি উচ্চতার শীর্ণকায়টি একটু এগিয়ে আসতেই চিনতে পারল পাঞ্চালী। আরে! মা তুমি! মা হাসল। আবছা হলেও বোঝা গেল ভদ্রমহিলার মুখের দীপ্তি এখনও অম্লান। এই তো চলে এলাম....। মেজদা নিয়ে এসেছে মা-কে। কিন্তু একসঙ্গে দু-জনকে ঢুকতে দেয়নি ওরা। মা'র পাশে দু'জন পুলিশের লোক।

কেমন আছ মা? পাঞ্চালীর গলায় বাষ্প এসে গেল। ভালো তো....। — তোর মতো মেয়ে যার, সে ভালো থাকবে না....বল? মা ভুরু তুলল। পাঞ্চালী কিছু বলবার আগেই মা বলল, শোন নিরুপমের দাদা বিশেষ করে তোর জনেই এই শালিধানের চিড়ে আর গুড় পাঠিয়েছে....। পাঞ্চালী অবাক। নিরুপমের দাদা...তার গলায় বেশি বিস্ময় ফোটবার আগেই মা বলল, হ্যাঁ রে বাবা....। হাতের ঠোঙা উপরে তুলে দেখিয়ে পুলিশের হাতে দিল মা। ওকে দিয়ে দেবেন ভাই। মিষ্টি হাঙ্গল ভদ্রমহিলা। পুলিশ মাথা নাড়ল। ঠিক আছে।

এইবার বুঝে গেল পাঞ্চালী। নিরুপমের দাদা মানে রক্তের সম্পর্কের অগ্রজ নয়, নির্ঘাৎ সুকান্তিদা। বুঝতে পেরে মজা পেল পাঞ্চালী। সে বলল, মা এরপরে যেদিন আসবে আমার জন্য সাদা শাড়ি নিয়ে এস, আর খাঁকি কামিজ। মা ভুরু কুঁচকে তাকাল। ও বাবা তোর এখনও সাদা শাড়ি পরবার অভ্যাস আছে...ছাড়িসনি? মা হাসল, তা খাঁকি জামা কেন? সে অভ্যাসটা কী নতুন? সাদা শাড়ি মানে সিগারেট, আর খাঁকি জামা বিড়ি। কলেজ থেকে ফেরার পর কখনও-সখনও পাঞ্চালীর মুখে সিগারেটের গন্ধ পেল, মা জিজ্ঞাসু চোখে, মৃদু হেসে দু-দিকে মাথা নাড়াত। দিদিমা সামনে থাকলে তখন এমন ইঙ্গিতেই বলত পাঞ্চালী — সাদা শাড়ি। পাঞ্চালী বলল, হ্যাঁ গো, মাঝে মধ্যে সাদা শাড়ি পরতে ভালোই লাগে আর খাঁকি কামিজটাও দরকার। যেটা বলা গেল না, বিড়ি খায় না সে। বিড়ি রেখে দেওয়া ওয়ার্ডারদের জন্য। বিড়ি খাইয়ে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সুবিধা হয়।

মাত্র পনের মিনিট সময় সাক্ষাতের। বাক্যালাপ আরম্ভ করতে করতেই সময় শেষ। ঠোঙা নিয়ে বন্দীশালায় ফিরে এল পাঞ্চালী। একমুঠো চিড়ে নিয়ে চিবোল কিছুক্ষণ। একখণ্ড গুড় ভেঙে মুখে পুরে দিল। সুকান্তিদা শুধু চিড়ে গুড় পাঠাবার জন্যই কী মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? মনে হয় না। নিশ্চয় ঠোঙার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত আছে। থালায় সব চিড়ে গুড় ঢেলে দিল পাঞ্চালী। এই জেলে তার অস্থাবর সম্পত্তি বলতে দুটো জিনিস — থালা আর কঞ্চল, বাটি নেই। দুটোই জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া।

কর্মখালি, ঔষধ চিকিৎসা, নাম পদবী পরিবর্তন এইসব পাঁচমিশেলি বিজ্ঞাপনের পাঠ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বানান। ডোর টু ডোর সেলসের কাজের জন্য স্মার্ট পুরুষ/মহিলা চাই। দৈনিক ১৫টা হিসাবে। গর্ভপাত-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে। আমি অণিমা চোল ব্যাকশাল কোর্টের এফিডেভিট বলে অণিমা রায় হইলাম...। নাঃ বিজ্ঞাপনে কোনো সূত্র নেই। ঠাণ্ডার নিচের জোড় খুলে ফেলতেই পাওয়া গেল ছোট চৌকো কাগজ। কাগজের ওপর পেনসিলে লেখা — নিরুপমকে সতিই হত্যা করেছে ওরা। বিশ্বদল, বীরেশের লিনপট্টী টিভি। কিন্তু আমরা ওকে চিরকাল মনে রাখব। বিশেষত, তুমি আর আমি তো রাখবই, নতুন? সু.রা.। তাহলে সতিই মারা গেছে নিরুপম। মাঝে মনে হয়েছিল এ পুলিশের অপপ্রচার। ও নেচে আছে। কখনও ভেবেছিল, পুলিশই মেরেছে তাকে তারপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের গল্প ফাঁদছে। কিন্তু এখন আর তেমন ভাববার সুযোগ নেই। যে এক শতাংশ আশা ছিল, নিবে গেল। গরাদে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল পাঞ্চালী। জেলের বাতাসে বিষ আছে। তা বোধহয় সব শুকুমার অনুভূতিকে হত্যা করে। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে এখন। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চোর ডাকাতদের মধ্যে একা কান্দতেও সম্মানে লাগে। সে গুনগুন শুরু করল মৃত্যু হবে প্রিয় মাতৃভূমি সেদিন সুদূর নয় আর...। তার গায়ে কেউ হাত রাখল। কুলসুম। গোপা, পাতলা চেহারা, চুরির আসামী। সে বলল, কী একা একা বসে আছ! চল না ওইদিকে.....আসার জমবে এবার...

পাঞ্চালী মাথা নাড়ল। ওরা তো আমায় ডাকে...আর তাছাড়া আমার ভালো লাগে না ওইসব। — আরে। তোমায় ডাকেনি তাই কি? কুলসুম হাসল। ওইরকম মনে হয় লক্ষ্মীদিকে, ভাব জমলে দেখবে ও খুঁজছিল। ওর হেতি সাহস। ও মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, লোকটা দুঃস্বরী। লক্ষ্মীদির সমস্ত গয়না হাতিয়ে নিল। তারপর অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে আশনাই। একদিন ঘরে এনে তুলল ডাকে। লক্ষ্মীদি প্রতিবাদ করায় দিদিকে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দিল শয়তানটা। লক্ষ্মীদি বেরিয়ে গিয়ে একটা ডাকাতদলের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অস্ত্র চালান শেখে। তারপর একদিন, দল নিয়ে ওই বাড়িতে ডাকাতি করল। উদ্ধার করল গয়না। বরের গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু ওই ঢালানি মেয়েটার পাছায় দু-বার ক্ষুর টেনে দিয়েছে। নে, এবার পাছা উলটে পড়ে থাক দু-মাস! এত হিম্মৎ কিন্তু কোনো হেঁকড় নেই। চল চল। হাত ধরে টানল মেয়েটি। — না আজ থাক...পরে কখনও...। পাঞ্চালী হাত সরিয়ে নিল। গরাদে হেলান দিয়ে আবার নিজের মনে সুর ধরল, সেই আলো ভরা দিন আনতে হবেই, ভালো কমরেড, সব শক্তি তোমার...।

গাইবার সময় চোখ বুজে এসেছিল পাঞ্চালীর। চোখ খুলে দেখে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী চওড়া চেহারা। বড় বড় চোখ। মুখে মেচেতার দাগ। — আরে লালদিদি এস এস, একা বসে গান খারাপ করছ কেন? লক্ষ্মী হাসল। ওর হাসিটি খুব সুন্দর। ঝকঝকে দাঁত। তার নাম লালদিদি রেখেছে এরা। পাঞ্চালী কোনো উত্তর দেবার আগেই লক্ষ্মী তার হাতে হাত রাখল। — দেখ তোমার সব কিছু আছে...পয়সা, রূপ, পড়াশুনো সব। সব কিছু থাকার পরেও তুমি মানুষের ভালোর জন্য নকশালি করতে নেমে পড়েছ, এত কষ্ট করছ! ...কত গড় মানুষ তুমি। লক্ষ্মী আবার হাসল। আর আমরা তো দেখ মুখ্যাসুখ্য গরিব

মানুষ.....নিজেদের মধ্যে খিস্তিখেউড়, নাচগান করে সময় কাটাই....তোমার হয়ত ভালো লাগবে না, সেজন্যই ডাকিনি। বোঝাই যাচ্ছে কুলসুম সব পটিপটি করে জানিয়েছে তার লক্ষ্মীদিকে। খুবই লজ্জা পেল পাঞ্চালী। চুপ করে রইল। — আরে এস এস। এইবার উঠতে হল। ওরা আট-দশজন গোল হয়ে বসেছে। লক্ষ্মী বলল, আজ প্রথমে আমরা জীবন-বেস্তান্ত শুনব...। — কার? কুলসুম বলল। ছিমতি পারুলবালা মণ্ডলের, লক্ষ্মী অঙ্গ ভঙ্গি করে হাসল। পারুল মেয়েটি খুবই রোগা, লম্বা এবং ফর্সা। রক্তাক্ততা আছে মনে হয়। হাতের কপালের শিরা ফোলা। কাঁধের হাড় বের করা।

পারুল সববেগে মাথা নাড়ল। না না আমার আবার গল্প কী?... লক্ষ্মী চোখ পাকিয়ে বলল, কেন রে টিকটিকি ভাতারি? তার বলার ধরণে সবাই হেসে উঠল। পাঞ্চালী বলল, টিকটিকি ভাতারি! এ আবার কী নাম? লক্ষ্মী বুঝিয়ে দিল। দেখছ না কেমন দুবলা-পাতলা....লম্বা আর ফর্সা...ঠিক যেন টিকটিকি। কী রে তাই না? আসরের বাকি সবার থেকে সমর্থন খুজল লক্ষ্মী। সবাই হেসে বলল, হ্যাঁ গো ঠিক ঠিক....একেবারে টিকটিকি....। পারুল রেগে গেল। হ্যাঁ ঠিক আছে আমি না হয় টিকটিকি, আর তুই? তুই তো শালী গিরিগিটি....থোবড়টা তো পুরো গিরিগিটির মাথা....। লক্ষ্মী আর পারুল লেগে গেল। দুজনেই দুজনকে আক্রমণ করে চলেছে। পারুল গলার নীল শিরা ফুলিয়ে চিংকার করছে। আর লক্ষ্মী মাঝে মাঝে থেমে একটা লাগসই মন্তব্য করে তবু পাশের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে। ওরা সবাই হেসে উঠছে। ব্যস! গরম তেলে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন! আবার শুরু হচ্ছে ধুকুমার।

পাঞ্চালীও মজা পাচ্ছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, আরে একজন থাম। গল্পটা শোনা যাক। লক্ষ্মী বলল, ও এইবার বলবে...। রাগালে বলে না....। — অ্যাঁই অ্যাঁই চুপ....। পাঞ্চালী থামিয়ে দিল লক্ষ্মীকে। নাও পারুলবালাশুরু কর...

পারুলের বর কাজ করতে সাবান কারখানায়। সচ্ছল না হলেও এক ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে কোনোরকমে চলে যেত সংসার। কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। স্বামী বেকার। ঠিকে ঝি-র কাজ ধরল পারুল। এক বাড়ির কর্তার দৃষ্টি ছিল তার ওপর। লোকটি ভয়ংকর প্রকৃতির। মাঝে মাঝেই তাকে ভোগ করবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাত। সে-বাড়ির কাউকে বলতে পারেনি পারুল। যদি কাজ চলে যায়? আর তাছাড়া বললেও কাজের লোকের কথা কেই-বা বিশ্বাস করবে? একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। বাবু তাকে ধরে লালসা মেটাল। টাকাও দিল। সে গরীব হতে পারে কিন্তু যোনকর্মী নয়, টাকা ফেরৎ দিয়েছিল পারুল। কিন্তু বাবুর কোনো মান-অপমান নেই। আবারও একদিন এমন ঘটল। এবার আর টাকা দিল না বাবু। উলটে বলল, কাউকে কিছু বললে খতম হয়ে যাবি। ভয় পেয়েছিল পারুল। একদিন ঋতুশ্রাব বন্ধ। শরীরে পরিবর্তন। স্বামী ক্রুদ্ধ। শালি অসতী....দূর হ আমার সামনে থেকে....বাড়ি নোংরা করছিস। এর আগে নিশ্চয়ই রার কয়েক বলেছে তার জীবনের কথা, তবু আজও স্বামীর ভর্ৎসনার কথা বলতে গিয়ে পারুলবালার গলা ধরে এল। লক্ষ্মী থামিয়ে দিল। পারুলের সেই অবিবেচক স্বামীরত্নটির উদ্দেশ্যে বলল, আহা হা...ভাব দ্যাখ একবার! অসৈরণ সহিতে নারি, থালার জলে ডুবে মরি। ন্যাকা চৈতন....যখন বউ ঝি-গিরি করতে গেল তখন কিছু বললে না, এখন সাধুগিরি

দেখাচ্ছে...বোঝাচ্ছে...না বোঝাচ্ছে না বাড়ির কাজের লোকের কষ্ট!

পাকলগালা আবার বলতে শুরু করল। — বাবুর সমস্ত বদামির কথা ব্যাখ্যান করলাম, বোঝালাম, তাতে পায়ে ধরলাম। কিন্তু লোকটা নির্দয়। তার পরিবারে নাকি চোনা লেগে গেছে। খাড়া খাড়া দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। দরজায় পড়ে রইলাম পুরো একটা দিন। ...ভাবলাম রাতে অন্তত ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু নিল না...। — অমন ভাতার কামড়া হয়ে পড়ে থাকবার দরকার কি ছিল? লক্ষ্মীর চোখে আগুন। যে অত তাইশ দেখাচ্ছে, তাকে তক্তা লাগি মারল না কেন?

এর জাড়ায়ে দিল আর বাবু দায়ের করল চুরির মামলা। জান দিদি সেই থেকে এই অটোটা চল এল হাজতে, বলল পারুল। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর সন্তানটিকে কী শেষপর্যন্ত দাখল করেছিল পারুলবালা? পাঞ্চালীর প্রশ্নটিকে যেন বুঝে ফেলল লক্ষ্মী। সে বলল, সেই ছেলেই এই ছেলে। পারুলের সাত বছরের ছেলেটি লক্ষ্মীর কোলে বসে। — তাই নাকি? কী নাম? পাঞ্চালী বলল। — সহদেব, লক্ষ্মী হাসল। এ আমাদের সবার আদরে-গোবরে মানুষ...ছেউ থেকে...কীরে তাই না? সহদেবের গালে চুমো দিল লক্ষ্মী। ছেলেটি পাঞ্চালীর কোলে মুখ গুঁজে বলল, উ....। আমার তো যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটার না হবে বল তো দিদি? পারুল কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর কী হবে বল তো?

লক্ষ্মী বলল, না না আর কান্না নয়...শোন আমাদের কোনো দুঃখ নেই....। সহদেবকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মী। ইশারা করে দিল, ওর হাত ধরে পারুলকে ঘিরে দাঁড়াল নাকি মেয়েরা। লক্ষ্মী গান শুরু করে দিল — কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ....। গাইতে গাইতে পারুলকে ঘিরে নাচতে লাগল সবাই। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

মহানদীদের সঙ্গে আলাপ জমে গেছে পাঞ্চালীর। শিক্ষার ছাপ না থাকলেও এরা পাতোকেই মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ভালো। বহিঃস্ব দেখে মানুষকে বিচার করাটা খুবই ভাল। একদিন আদালত থেকে ফিরে আসতে বেলা গড়িয়ে গেল। তার নির্দিষ্ট কোনায় এসে পান্দালী দেখে দুপুরের ভাত তরকারি থালায় ঢাকা দেওয়া। ভাত জলে ভেজান। ভাতে গুণ্ডা আছে অল্প। ভাত ঠিকঠিক রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে সহবন্দিরা। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

লক্ষ্মী আসার জমিয়েছে। সাঁওতালি সুরে গান ধরল। রাম বলে ভাই-ভাই, লক্ষণ বলে কীয়ে দাদা, কীয়ে দাদাভাই...। কথার কোনো মাথামুণ্ড নেই। মনে হয় সুরটা ওর জানা, কথামতো চটজলদি বানাচ্ছে আর সুরে ফেলছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে ভারী শরীর নিয়ে নাচতে শুরু করল। সাঁওতালি নাচ। সবাই উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মীর এক হাত ধরল লক্ষণ, অন্যহাতে পারুলবালা। অন্যরা কেউ সহদেবের দিকে, কেউ পারুলের।

এদের দিয়ে গান ছাড়াও নতুন কিছু করাতে পারলে ভাল হয়। তাহলে এরাও মজা লাগবে। আবার আবার মাথায় এল আঁকবার কথা। একদিন এদের কাছে প্রস্তাব পেশ করল পাঞ্চালী। চল সবাই মিলে নতুন কিছু আঁকা যাক। ওদের সবার চোখে বিশ্ময়। কী অজ্ঞান! আঁকবে। এমনসব প্রাণীর ছবি আঁকতে হবে যা বিশেষ কোথাও দেখা যায় না।

ওরা মজা পেল। লক্ষ্মী বলল, আরে লালদিদি আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি তো বাঘ, ভান্ডুক, হাতি, ঘোড়া আঁকলেও তুমি ছবির সঙ্গে ওইসব জন্তুর কোনো মিল পাবে না....। পাঞ্চালী হেসে ফেলল। তুমি বড্ড দুষ্ট! পারুলবালা যেন এতদিনে একটা করবার মতো কাজ পেয়েছে — কিন্তু আঁকতে গেলে তো কাগজ, পেনসিল চাই....

পাঞ্চালী বলল, কাগজের দরকার কী? জেলের দেওয়ালে আঁকব আমরা...শুধু কয়েকটা কাঠকয়লার টুকরো দরকার, তাই দিয়ে আঁকার কাজ হয়ে যাবে....। কুলসুম দায়িত্ব নিয়ে নিল। জেলের রান্নাঘর থেকে ও ঠিক একে-তাকে পটিয়ে কাঠকয়লার ব্যবস্থা করে নেবে। লক্ষ্মী বলল, আমিও আছি ওর সঙ্গে, কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।

চোদ্দ-পনের টুকরো কাঠকয়লা জোগাড় হতেই মহাউদ্যমে শুরু হয়ে গেল অঙ্কন সমারোহ। ঘরের দেওয়াল ভরে উঠল বিচিত্রদর্শন পাখি আর চতুষ্পদে। বিভিন্ন পাখিগুলির চেহারা একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য। তারা সব তীক্ষ্ণচক্ষু শিকারি পাখি। চোখ দুটি বড়। চতুষ্পদগুলির কেউ রোমশ, কারুর আবার তিনটে চোখ। পারুল যে চতুষ্পদটি এঁকেছে তার গলা সাপের মতো লম্বা, পেটের দুপাশে ডানা। চোখ দুটি আশ্চর্য শান্ত। দেখেই মনে হয় তৃণভোজী! লক্ষ্মীর আঁকা পাখিটির নখরে, চঞ্চুরে অহিংসা কিন্তু চোখদুটি নির্দয়। দেওয়ালে এঁকেও উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি কুলসুমের। পারুলের খড়িওয়া পিঠে কাঠকয়লা দিয়ে বাঘের মতো দেখতে কোনো প্রাণীর মুখ এঁকে দিয়েছে সে। লক্ষ্মী বলল, ওরে টিকটিকি ভাতারি, এতদিন আমি পেছনে লাগতাম খাবার বাঘও লেগে পড়েছে....। লক্ষ্মীর গলায় জাদু আছে। হি-হি করে এ ওর গায়ে টলে পড়ল সবাই।

আবার নতুন কী করা যায়? একদিন মধ্যাহ্ন এসে গেল। সন্ধ্যাবেলার আসরে পাঞ্চালী প্রশ্ন ছুঁড়ল, রান্না করলে কেমন হয়? গায়ত্রী বলল, তার মানে ডাল, ভাত, তরকারি রাঁধব আমরা? ওই খাবার তো জেলের বাবুরাই দিচ্ছে।

ননা তা নয়। পাঞ্চালী বুঝিয়ে বলল। একদিনে একটি বিশেষ পদ রাঁধবে আমাদের কোনো একজন। হয়ত একদিন কেউ বানাল আলুভাজা কিংবা উচ্ছে ভাজা। অন্যদিন হল চাটনি। শুক্কেও হতে পারে কিংবা বেগুন পোড়া।

গায়ত্রী বলল, কিন্তু ঘরের মধ্যে কী করে হবে? উনুন, কড়া, জ্বালানি, তরকারি এইসব কোথায়?

কেন হবে না? পারুলবালার উৎসাহ বেড়ে গেছে। মাথা খাটালে ঠিক হবে। নিজের খাবারের থালাটি হাত দিয়ে পিটিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে ফেলল পারুল। এই দেখ রান্নার কড়া। — এই তো টিকটিকি মাথা খাটাচ্ছে, আর কোনো চিন্তা নেই। লক্ষ্মী টিপ্পনি কাটল। ওর হাত ধরল পাঞ্চালী। তুমিও চিন্তা কর না বাপু....তোমার এত চেনাজানাতুমি চাইলে সব হবে।

সমাধান হয়ে গেল। কুলসুম আর ছোট্ট সহদেবকে দায়িত্ব দেওয়া হল জেল অফিসঘর থেকে বাতিল কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে আসবার। লক্ষ্মী ব্যবস্থা করবে দেশলাই, রান্নার তেল। আর সজ্জি — আলু, পটল, বেগুন। গায়ত্রীর দায়িত্ব নুন, চিনির। পাঞ্চালীকে মাথা খাটিয়ে জোগাড় করতে হবে হাতা, খুন্তি অথবা ওই জাতীয় কিছু। পাঞ্চালী বলল, আমার মা তো বিড়ি সিগারেট দিয়ে গেছে। তোমরা নাও না....টোকার লোকজনকে হাত করতে

সুবিধে হবে। জমান বিড়ি সিগারেট সব লক্ষ্মীকে দিয়ে দিল পাঞ্চালী। গায়ত্রী বলল, রামাটা হবে কীসে? উনুন কোথায়? — আরে! এর মাথায় একদম থান ইট....সব সময় বাগড়া দেয়, লক্ষ্মী বলল। পারুল সায় দিল, ঠিক বলেচিস, আরে বাবা তিনটে থান ইট জোগাড় করলেই তো উনুনের কাজ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী হাসল। — টিকটিকি অবধি বলে দিচ্ছে উনুন বানানোর কায়দা, আর তুই পারছিস না!

রামার ছাঁকছাঁক শব্দ উঠলে, তাকে চাপা দিতে অন্যরা গরাদের কাছে এসে লক্ষ্মীর নেতৃত্বে সমস্ত গান গেয়ে ওঠে। সেই বিচিত্র গান — রাম বলে লক্ষ্মণ ভাই....লক্ষ্মণ বলে দাদাভাই! নির্দোষ গানের ঠেলায় চাপা পড়ে যায় যাবতীয় অপরাধমূলক আওয়াজ। নিয়মভাঙায় রোমাঞ্চ আছে। গোপন কাজে নেশা। বোধহয় সেইজন্যই রামার অনুষ্ঠানটি অচিরেই সবার খুব প্রিয় হয়ে উঠল। জেলের বুদ্ধিহীন, মমতাহীন খাদ্যের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল সাহস, স্নেহ আর দক্ষতা দিয়ে গড়া কিছু প্রিয় আহাৰ্য।

রামার মতো সম্পর্কের রসায়নটিও বিচিত্র। সেখানে শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্নেহ মমতা কোনো উপাদানের সামান্য হেরফেরে স্তর পাল্টে যায়। এজন্যই বিভিন্ন স্বাদের আলুভাজার মতো একজনের সঙ্গে সম্পর্ক অন্যজনের থেকে আলাদা। যেমন কুলসুম পাঞ্চালীকে খুব শ্রদ্ধা করে, সেও অপার মমতায় মেয়েটিকে জীবনের শিক্ষা দেয়। নিয়মিত গান শোনায়। বিপ্লবের গান। লক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা যেন সমান সমান বন্ধুত্বের। আবার পারুলবালা বয়সে পাঞ্চালীর থেকে বড় হওয়া সত্ত্বেও, তার থেকে দূর অভিভাবকত্ব। ভাবতেই মজা লাগে পাঞ্চালীর। ইদানীং সে লক্ষ্য করছে, ছোট সন্তানও তার ঘনিষ্ঠ হতে চায়। তার সঙ্গে কথা না বললে অভিমান করে বসে থাকে।

লক্ষ্মীরও নজর এড়ায়নি ছোটটির ঘনিষ্ঠতা। সে সহদেবের দু কাঁধ ধরে বলল, কী রে? লালদিদি তোর বউ নাকি? ও কী কথা বললে যে বড় ঠোট ফুলিয়ে থাকিস? সবার সঙ্গে পারুলবালাও হেসে উঠল। পাঞ্চালী কোর্ট থেকে ফিরে ঘরে ঢুকলেই ওরা সহদেবকে ফেপায়। ওই দ্যাখ, তোর বউ ফিরেছে। পাঞ্চালী এগিয়ে কোলে তুলে নেয় শ্রোমিক ছেলেকে। সে তখন লজ্জায় রাজা! তবু গোটা গোটা উচ্চারণে বলে আমার সঙ্গে কথা বল....

অঙ্কন, রন্ধন ইত্যাদি মন সজীব রাখবার নানান নতুন পথ বের করলেও দেখা গেল জীবনের কাহিনীর আকর্ষণ কিন্তু অমোঘ। ঘুরে ফিরে আবার জীবন-কাহিনী বলবার পালা আসে। কখনও গায়ত্রী বলে তার না-বলা কথা, কখনও স্বপ্না। পারুলবালার সঙ্গে লক্ষ্মীকেও শোনাতে হয় জীবনের গল্প। পাঞ্চালীকে ধরে ওরা, লালদিদি এবার তোমার বেস্তান্ত শোনাও। পাঞ্চালী বলে, সে হবে'খন অন্য একদিন। আজ বরং কুলসুম বলুক। কুলসুম বলে চোরের আত্মজীবনী।

একদিন চন্দননগর কোর্টে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল বীরেশ আর বিশ্বদলের সঙ্গে। পাঞ্চালীর সামনে পড়ে ওরা বাকরহিত। ছুতোয়-নাতায় সরে পড়বার চেষ্টা করতেই, পাঞ্চালী বলল, দাঁড়াও। তারপর কোনোরকম ভণিতা না করে সোজা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা নিরুপমকে মারলে কেন? ও কী করেছে তোমাদের? বিশ্বদল আমতা আমতা করছে। বীরেশ বলল, আমরা বুঝতে পারিনি....ভোলানাথদা বলেছিল ও নাকি তোমায়

ধরিয়ে দিয়েছে....। পাঞ্চালী ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে। সেই দৃষ্টির সামনে বীরেশ কুঁকড়ে গেল।পরে বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে, কমরেড নিরুপম ধরায়নি তোমাকে....। পাঞ্চালী বলল, এখন ভুল বোঝবার পর তোমরা কী পারবে ওই প্রাণটিকে ফিরিয়ে দিতে? ওইরকম অমলিন প্রাণ? পাঞ্চালীর স্বর কঁপে গেল। ওরা দুজনেই পাথর। পাঞ্চালীর দৃষ্টি নির্গত অদৃশ্য কোনো রশ্মি যেন ওদের যাবতীয় নড়াচড়া স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশ্বদল বলল, আসলে সেইসময় ভোলানাথদা এমনভাবে বোঝাল আমাদের, ওর ওপর সন্দেহ হয়েছিল খুব....। পাঞ্চালী বলল, আমারও তো বহুদিনের সন্দেহ, ভোলানাথদা নিরুপমকে ঈর্ষা করেন...সেজন্যই উনি বারবার চেষ্টা করেছেন নিরুপমের কাছ থেকে আমায় সরিয়ে দিতে অথবা আমার কাছ থেকে নিরুপমকে....। আমি কিন্তু সন্দেহের বশে কোনো প্রতিশোধ নিই নি....। থামল পাঞ্চালী। মাথা ঝাঁকাল একবার। আর যদি আমার ধরা পড়ার কথা বল, আমার সন্দেহ এবং আশাকরি আমার অনুমান ভুল নয়, আমায় ধরিয়েছেন ওই ভোলানাথদা....। পাঞ্চালী শেষ করবার আগেই বীরেশ বলল, আমি বলছি কমরেড পাঞ্চালীতোমার অনুমান সঠিক, এ কাজ করেছে ওই শয়তান।

বিশ্বদল বলল, শুধু তোমাকে ফাঁসান নয়, ধরা পড়বার পর ও সবার নাম ঠিকানা পুলিশকে গড় গড় করে বলে দিল.... আমরা সবাই ধরা পড়ে গেলাম....আমি বীরেশ সবাই....লিনপন্থী গ্রুপ শেষ....। বীরেশ বলল, শুধু তুমিই নয় কমরেড, তোমার নামেও ও অ-কথা কুকথা বলেছে পুলিশকে....। — তাই নাকি? পাঞ্চালীর চোখ জ্বলে উঠল। বীরেশ জানাল, ভোলানাথদা বলেছে পাঞ্চালীর চরিত্র খারাপ, ছেলেদের সঙ্গে শোওয়া বসা করতে ওর ভালো লাগে। বাঃ! পাঞ্চালী হাসল। ভোলানাথদা দিচ্ছেন আমার ক্যারেকটার সার্টিফিকেট! বাঃ, খুব ভালো।

বন্দিশালায় ফিরে মনটা ভার হয়ে রইল পাঞ্চালীর। ভেতরের যে কষ্টকে বহু অভ্যাসে সে পাথরচাপা দিতে পেরেছিল, যেন বেরিয়ে আসতে চায়।

সহবন্দীরা ঘিরে ধরল তাকে। লালদিদি, আজ তোমার জীবনের কথা শুনবই শুনব। কথা বলতে ভালো লাগছিল না পাঞ্চালীর। কিন্তু ওরা নাছোড়। না লালদিদি আজ বলতেই হবে....তুমি প্রতিবার এড়িয়ে যাও। পারুলবালা বলল। শোনাও না গো রাজকন্যার পথে নামার কাহিনী.....আমার ভাল লাগবে....। লক্ষ্মী কাঁধে হাত রাখল, বলেই ফেল না...

পাঞ্চালী বলতে শুরু করল। ছোটবেলা। মা-দিদিমা। বাবার অকাল প্রয়াণ - দাদাদের চাকরি - তার স্কুল কলেজ - দ্রোণের পর্ব। তারপর নিরুপম। নিরুপমের বেঁচে ওঠার অলৌকিক কাহিনী। তার সেরে ওঠার বিচিত্র কথা। বাদ দিল না কিছুই। নিরুপমের মারা যাবার কথা বলতে গিয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল সব কিছু। দ্রোণের জন্য জমান কষ্টের উদগীরণ হয়েছিল কমরেডদের সামনে। কিন্তু নিরুপমের জন্য তার জমাত কষ্টকে একাই রহন করেছে পাঞ্চালী। একাই এক কফিনভর্তি কষ্ট টেনে টেনে পাহাড়চূড়ায় উঠতে চেয়েছে। নিরঙ্কুশ, লোকালয়হীন পর্বতশিখরে।

আজ আর পারল না। ডেঙে পড়ল সব কিছু। পলকের ভঙ্গি স্রোতস্বিনী সরিয়ে দিল উপলব্ধি। থরথর করে কাঁপছে পাঞ্চালী। চোখ থেকে নেমে আসছে অবিরল ধারা। লক্ষ্মী, পারুল কুলসুম গায়ত্রী প্রপা সনাতী ওকে ধুঁয়ে বসে আছে। পাঞ্চালীর সহমর্মীরা।

গানটো সহদেবও উঠে বসেছে পাঞ্চালীর কোলে। চুপ করে বসে আছে সবাই।

১১।৭ লক্ষ্মী উঠে দাঁড়াল। অ্যাঁই, আমাদের কোনো দুঃখ নেই...দুঃখ থাকতে নেই। গান দগল, মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি....। সবাই অবাক। — আরে তুমিও জান গানটো?

আনতাম না...লালদিদি তো গায়....শুনে শুনে শিখে নিয়েছি...আয় তোরাও ধর....।

সাঁওতালি নাচ শুরু করল লক্ষ্মী। সবাই ওর হাত ধরল। ওরা এগিয়ে পিছিয়ে গাইতে থাকল, উড়বে হাওয়ায় আকাশছোঁয়া গৌরব-উজ্জ্বল রক্ত নিশান। পাঞ্চালী স্তব্ধ হয়ে দেখছে তাদের। সাঁওতালি নাচের ছন্দে কীরকম অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে এই গানের সুর, তাল। তার সমস্ত কষ্ট, দুঃখকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায় ওরা। মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি, সোদন সুদূর নয় আর—। মহান ভারতের জনতা মহান, ভারত হবেই জনতার। গান থামল। ওরা আবার এসে বসল পাঞ্চালীর পাশে। আবার স্তব্ধতা। হঠাৎ ছোট্ট সহদেব কাঁচ কাঁচ হাতে পাঞ্চালীর চোখের জল মুছিয়ে দিল। — কেঁদ না কাঁদছ কেন? আমি এড় হয়ে এই জেল থেকে বাইরে নিয়ে যাব তোমায়। দেখো ঠিক নিয়ে যাব। ঠিক।



মিছিল বেরিয়েছে। প্রতিবাদী মিছিল। ব্রিগেড ময়দান থেকে বেরিয়ে শিয়ালদা প্রদক্ষিণ করে কলেজ স্ট্রিট হয়ে মিছিল যাবে মনুমেন্ট প্রদক্ষিণে। ওইখানেই মিছিল শেষ। ডেপুটি কমিশনার বললেন, জান তো? — হ্যাঁ স্যার। কনকেন্দু মাথা নাড়ল। —তুমি এখনই কলেজ স্ট্রিটে চলে যাও...নজর রেখো...। ডেপুটি কমিশনার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। কনকেন্দু দুটি পরিষ্কার, গাঢ়। কোনো কিছু দেখবার সময় চোখের পাতার কুঞ্জন হয় না, বিকল্প হয় না, সংযোগ মাএই যেন দেখা শেষ হয়ে গেছে, এমনভাবে। নিমেষপাত না হতেই ডান গুণে যান অন্তর্গত কী? সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী এরকম পুরুষের প্রবল মস্তগাশক্তি না তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

ডি সি সাহেব আবার বললেন, চোখ কান খোলা রেখ। দেখ হঠাৎ করে কোনো ফেরারী নকশালের সন্ধান পেয়ে যেতে পার। মৃদু হাসলেন সাহেব।

ভদ্রলোকের মুখমন্ডল শিরাবর্জিত, সূঠাম এবং সম অর্থাৎ না দীর্ঘ, না হ্রস্ব, না গোল। এমন মুখমণ্ডলকে সামুদ্রবিদরা বলেন সমবৃত্ত। এরা সাধারণত ক্ষমতাশালী হয়।

—তোমাদের ইন্সপেক্টর...মানে যাকে তোমরা বড়বাবু বল, ও নাকি ব্রিগেডে আর শিয়ালদায় সাদা পোশাক পুলিশ নজরদারির ব্যবস্থা করেছে...কিন্তু আমার মনে হয় কলেজ স্ট্রিটে তোমার নিজের থাকা দরকার। সাহেব স্থির চোখে তাকালেন। কনকেন্দু বলল, ইয়েস স্যার। —তাহলে আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়....। বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডি সি সাহেব। টেবিলে দু-বার আঙুল ঠুকলেন। —ইয়েস স্যার। সেলাম ঠুকে নিজের দপ্তরে ফিরে এল কনকেন্দু।

সব শুনে বড়বাবুর মুখ গভীর। — বলেছে যখন যাও, সব ঠিকঠাক দেখে এসে পথমে আমায় জানাবে....তারপর ডি সি সাহেব। শিয়ালদায় যে গেছে, আমি তাকে এগাছ,

মিছিলের সঙ্গে এসে ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে...যাও যাও বেরিয়ে পড়। বড়বাবু ফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলেন।

মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল কনকেন্দুর। ডেপুটি কমিশনার সাহেব যে তাকে আলাদা করে ডেকে এই বিশেষ দায়িত্বটা দিয়েছেন, এই লোকটার পছন্দ নয়। সেইজন্যই গলায় ওপরওলার ভাব এনে তাকে হুকুম দিচ্ছে। কোনো কথা না বলে, নীরবে মাথা নেড়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের পরিধেয়গুলি একবার ভালো করে দেখল কনকেন্দু। সাদা হাওয়াই শার্ট। কালো প্যান্ট। নাল লাগান জুতো। সবই ঠিক আছে। কিন্তু সার্ভিস রিভলবারটা নেওয়া দরকার। নিজের ঘরে ঢুকে কোমরে বেস্তের সঙ্গে লাগান নরম কাপড়ের খাপে ভরে নিল অস্ত্রটি। জামার ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই। টেলিফোনে লেগ লাগান ক্যামেরাটিও সঙ্গে নিল। তারপর একতলায় নেমে পুলিশ জীপের সামনের আসনে বসল। পেছনে চারজন সশস্ত্র কনস্টেবল। ওরা অবশ্য উদ্দিপরা।

চল যাওয়া যাক। বলল কনকেন্দু। চালক গাড়ি চালু করল। চোখ ফিরিয়ে বলল, কোথায়? — কলেজ স্ট্রিট.....গোলদিঘির সামনে।

কথাটা বেঠিক বলেননি ডি সি সাহেব। গোপন নজরদারি চালানোর দরকার বিশেষ। সব গুরুত্বপূর্ণ নকশাল এখনও ধরা পড়েনি। অধ্যাপক সুনীতি ঘোষ আত্মগোপন করে দিবা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার বেলেঘাটা আর গুরুর উত্তরপাড়া, রিষড়া কোলগরে তাঁর গোপন ডেরায় অতর্কিতে হানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে হয় যাবার কিছু আগেই পাখি উড়ে গেছে অথবা হানা দিয়ে চলে আসার পর পরই ঘরে ফিরে বেগতিক দেখে সরে পড়েছেন ভদ্রলোক। খবর পেতে দিল্লিতেও গিয়েছিল কলকাতার গোয়েন্দারা। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। শ্যামসুন্দর বসু নামে আর এক কম দৃশ্যমান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নেতাও ধরা পড়েনি। আর একজন হলেন সুকান্তি রায়। তাকেও ধরা যায়নি কিছুতেই। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যারা এমন লুকিয়ে চুরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা এই প্রকাশ্য মিছিলে আসবে না। কিন্তু কিছুকাল আগেই কার্জন পার্কের ঘটনায় দেখা গেল সে ধারণা ভুল। সেদিন অনেকেই এসেছিল। এমনকী সুকান্তি রায়ও নাকি এসেছিলেন। যতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা, ভদ্রলোক মিলিয়ে গেছেন। অতএব যাওয়া দরকার। হয়তো এমন কোনো সূত্র পাওয়া গেল, অথবা কোনো বার্তাবাহকের সন্ধান, যা ধরে পৌঁছে যাওয়া যাবে আসল মানুষটির কাছে। এমন একজন আপাততুচ্ছ বার্তাবাহককে ধরেই তো পাওয়া গিয়েছিল চারু মজুমদারের সন্ধান!

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভেতর গাড়ি ঢোকাতে বলল কনকেন্দু। গাড়ি এখানে রেখে উত্তরে কলেজ পাড়ার দিকে হেঁটে যাওয়াই ভাল। ওইখানে পুলিশ-গাড়ি থেকে নামলেই পাঁচজন দেখবে। আলাদা করে নজর করবে। কাজের ক্ষতি হয়। সাধারণের মতো ঘুরলে খবর পেতে সুবিধা।

জীপ থেকে নামতেই মনে পড়ল নিকুপমের কথা। একদিন ওর রক্তাক্ত দেহটা তো এখানেই ফেলে যাওয়া হয়েছে! ডেপুটিকে ভোলা যায় না। এখনও স্বপ্নে ফিরে আসে। আঙুল তুলে বলে, ভদ্রলোকের চেপে, তাঁতহাস নিয়ে পড়েছেন, এখন আয়নায় দেখুন তো নিজের চেহারা! ওই চোখদুটো নোংরামো দেখতে দেখতে এখন ঘোলাটে, মুখের

জান্না খানসাল পাগটে গেছে আপনার, ছিঃ.....আমাদের মারলেই সময়ের চাকা উলটোদিকে
খোলাখোলা পাগটের কে যেন গলা টিপে ধরে। দম আটকে আসে কনকেন্দুর। ঘুম ভেঙে
উঠে মুখে চোখে খাড়ে জল দেয়, হাত ধুতে থাকে বারংবার। নিরুপমের বউ পাঞ্চালীরও
অসম্পন্ন মনের জোর। দাঁতে দাঁত চেপে বড়বাবুর অলীল অত্যাচার সহ্য করে গেল। তবু
একটি কথাও বলল না। ওকে ভাঙতে না পেরে বড়বাবু ক্ষুধার্ত হায়নার মতো হয়ে
উঠেছেন। মেয়েটা আদালতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত জেল হেফাজতে গেলেও ওকে মিসায়
দীর্ঘদিন অনাগরচায়ে বন্দি করে রাখতে বড়বাবু উঠে পড়ে লেগেছেন। ওই জানোয়ারটার
নিদেশমতো কাগজপত্র সাজান হচ্ছে। সাধারণত, এই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিশেই
নগরপাল সিপমোহর দিয়ে দেন। অন্যথা হয় না। বড়বাবু সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে
চাইছেন। পলিপত্নীদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা গ্রেপ্তার, ভেঙে চুরমার সংগঠন। ওদের আর
হাস্যাত্মক বাধাবার কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট নেই। লিনবিরোধী গ্রুপের নেতা নিরুপমকে
হত্যা করেছে তার প্রাক্তন বন্ধুরা। তাই ওর সম্পর্কেও নতুন কোনো তথ্য পাবার নেই
পাঞ্চালীর থেকে। ওও অকারণে মেয়েটিকে গীড়ন করতে চাইছে ওই মর্যকাম জানোয়ারটি।
সম্পূর্ণ অনৈতিক এই কাজ। একই বিভাগে থেকেও কনকেন্দু আটকাতে পারছে না এই
জান্না। সে একই সঙ্গে বিভাগের কাজ নিষ্ঠাভরে করতে চায়, আবার অনৈতিক কাজকর্মও
সহ্য করতে পারে না। মাথার ভেতর দপদপ শুরু হল শরীর গুলিয়ে উঠল একবার।
গরম পড়েছে বেশ। হাসপাতাল চত্বরের এককোণে জলের ব্যবস্থা। ঘাড়ে মাথায় জল
থান্ডে জ্বীনের কাছে ফিরে এল কনকেন্দু। কান্নাকাটি কাঁধে বুলিয়ে কনসেন্ট্রল চারজনের
দিকে তাকাল। আমি ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছি, তোমরা পনের মিনিট পরে ওইখানে
চলে এস।

জান্না খানসে পেয়েছে কনকেন্দুর রাস্তার ওপারে বসন্ত কেবিন। হাত ঘড়িটা দেখল
কনকেন্দু। কিছুটা সময় আছে। চা খাওয়া যায়।

এসতে কেবনের সামনের দিকটা মোটামুটি ভর্তি। ভেতর দিকের পরপর দুটো টেবিল
খালি। প্রথমটা ছেড়ে দ্বিতীয়টায় বসতেই একটি বছর পনেরো-ষোলো'র ছেলে এগিয়ে
এল। টোপলে এক গ্লাস জল রেখেই শুরু করল, ফিশফ্রাই ওমলেট টোস্ট চিকেন
কাটলেট....। ধারাবিবরণী থামিয়ে দিল কনকেন্দু। — ওমলেট টোস্ট আর চা। চা-টা
খানোর পরে....। চারদিকে একবার দেখে নিল কনকেন্দু। নাঃ কোনো চেনা মুখ নেই।
আদিকাংশই কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে।

দুটি ছেলে, একটি মেয়ে বসল সামনের টেবিলে। একটি ছেলের লাল জামা, কালো
প্যান্ট। অন্যজন মেরুন শার্ট ঘি রঙ ট্রাউজার। মেয়েটির পরণে বাদামি তাঁতের শাড়ি।
দেশেই গোড়া যায় ওরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে। রেস্তোরাঁর ছেলেটি ওদের কাছে
গিয়ে হর্দ পেশ করতেই লালজামা ছেলেটি থামিয়ে দিল। —এক প্লেট টোস্ট, দু-কাপ
চা আর একটা সিদ্ধার্থ....বুঝলি তো? — হ্যাঁ....হ্যাঁ..., বাচ্চা ছেলেটি ঘাড় কাত করে হাসল।

কনকেন্দু অবাক। সিদ্ধার্থ আবার কী বস্তু?

রেস্তোরাঁর ছেলেটি বেশ হাসিখুশি, চটপটে। সবার ফরমাশ শুনে নিয়েই রান্নাঘরে ছুটছে।
খানার এসে যাচ্ছে দ্রুত। কনকেন্দুর ওমলেট, টোস্ট এসে গেল। খেতে খেতে সামনের

টেবিলে নজর রাখল সে। সিদ্ধার্থ জিনিসটা কী? না জানা পর্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছে।

সামনের টেবিলে তিনটি কাপ এল। দুটি কাপে ভর্তি চা। অন্য কাপটি খালি। সিদ্ধার্থ মানে খালি কাপ! হঠাৎ বুঝতে পারল কনকেন্দু। সিদ্ধার্থশব্দকে ব্যঙ্গ করে ছাত্রছাত্রীরা এই মজা চালু করেছে। শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি — এই প্রবচন বড় সেকোলে। তার চেয়ে দু-কাপ চা আর একটা সিদ্ধার্থ — অনেক জোরাল। মজাটা ধরতে পেরে কুলকুল করে হাসি পেল কনকেন্দুর। ছেলেমেয়েরা নিজেরা তো মজা পাচ্ছেই তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে চা-দোকানের এইসব সাধারণ কর্মীদের। ওরা বুঝে হোক না বুঝে হোক মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মজার খেলায় নেমে নেমে পড়েছে।

বসন্ত কেবিন থেকে বেরোতেই মেডিকেল কলেজের দিকে চোখ গেল। বিশাল দেওয়াল লিখন — ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা। কনকেন্দু বিস্মিত। বাবা! ইন্দিরাই ভারত! এই প্রধানমন্ত্রীর চারপাশে প্রচুর স্তাবক। তারাই লিখছে এইসব। এইসঙ্গে নেওয়া হয়েছে বিরোধীদের দমন করবার ব্যবস্থা। প্রতিবাদী জনসভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না চট করে। অনুমতি দেওয়ার পরেও তেমন বুঝলে হইচই পাকিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। নব কংগ্রেসের দাদাদের ছাতার তলায় যেসব গুণ্ডা মস্তান আছে তাদেরকে প্রথমে লাগান হচ্ছে সভা-মিছিল ছত্রভঙ্গ করবার কাজে। তারপর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে লাঠি-বন্দুক নিয়ে নেমে পড়েছে পুলিশ। এর সঙ্গে মিসা তো আছেই। কাউকে বেচাল দেখলেই ওই আইনের ধারায় গ্রেপ্তার। এমনকী কংগ্রেসের যেসব কর্মী ক্ষমতা বেশি, সে অন্য নেতার দক্ষিণহস্ত মস্তানটিকে এই আইনের বলে ফাঁদে টুকিয়ে দেয়। ধরা পড়া গুণ্ডাটি চিল্লাতে থাকে — ওই শালা প্রাণতোষদা আমাকে মিসা খাওয়ালা। বেরিয়ে দেখে নেব। তবে আইনের অপব্যবহার পুলিশ কর্মীরাই বেশি করে। এই তো কদিন আগেই এক সহকর্মীর জন্য আদালতে যেতে হয়েছিল কনকেন্দুকে। সে এক বর্ধিষ্ণু মুদির দোকানির বিরুদ্ধে হলুদ আর লঙ্কায় ভেজাল দেবার অভিযোগ এনেছে। এর ফলে পার্কসার্কাসের একটি স্পর্শকাতর এলাকায় জাতিদাঙ্গা লাগবার সম্ভাবনা। নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবার তালে ছিল মুদির দোকানি! গুরুতর অপরাধ। দোকানিকে মিসা'য় ধরেছে পুলিশ। কনকেন্দু বুঝতে পারছিল এর মধ্যে প্রচুর গাঁজামিল। কিন্তু কিছু করবার নেই।

কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা উঠেছে। এখন যেভাবেই হোক মুদির দোকানিকে আদালতে হাজির করতে হবে। এড়ান যাবে না। সহকর্মীর সঙ্গে থাকতে হল কনকেন্দুকে। দোকানির আইনজীবী তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে জেরা শুরু করলেন।

—আমার মক্কেল কীসে ভেজাল দিয়েছিল?

— হলুদ আর লঙ্কায়

—কাঁচা লঙ্কা না শুকনো লঙ্কা?

—শুকনোমুদির দোকানে যেমন বস্তায় রাখা থাকে....

—বেশ বেশ....তা লঙ্কার বস্তার পাশে আর কি কি বস্তু ছিল?

—মুসুর ডাল, মুগডাল, চিনি, ময়দা, তেজপাতা, হলুদ, নুন....

—বাঃ আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভাল!

তদন্তকারী অফিসার আহ্বাদিত।ধন্যবাদ!

আইনজীবী বললেন, বস্তায় যে হলুদ ছিল, লম্বায় কতটা? আপনার কড়ে আঙুলের মতো?

—আমার আঙুলের থেকে একটু ছোট সাইজের....

—ভেবে বলুন....

—হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ছোট....। কনিষ্ঠাটি ভাল করে দেখালেন অফিসার।

—বাঃ!আর যে শুকনো লক্ষা ছিল তার বোঁটা দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, বোঁটা ছিল....

—ভাল করে ভেবে উত্তর দিন....

—হ্যাঁ হ্যাঁবোঁটা ছিল....

—অর্থাৎ আপনি গিয়ে দেখলেন, বস্তার মধ্যে লম্বাটে চেহারার হলুদ আর অন্য একটা বস্তায় আছে বোঁটাসুন্দু লাল শুকনো লক্ষা। তাই তো?

—হ্যাঁ স্যার....

এইবার বিচারপতির দিকে ফিরলেন আইনজীবী।

—ইওর অনার আমার জেরা শেষ.....আপনিই বলুন, ইওর অনার, গোটা হলুদ আর বোঁটা আছে এমন গোটা-গোটা শুকনো লক্ষায় আমার মক্কেল ভেজাল দেবে কী করে?

তদন্তকারী পুলিশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, না স্যার, স্যার এখন মনে পড়েছে....ওতে বোঁটা ছিল না...

—আর হলুদও আস্ত ছিল না, গুঁড়ো ছিল তাই তো?

পুলিশটি যন্ত্রের মতো বলল, হ্যাঁ স্যার....

আইনজীবী হাসলেন। আপনার এমন দারুণ স্মৃতি....কোন বস্তায় কী আছে মনে রইল আর হলুদ যে গুঁড়ো ছিল মনে রইল না! আবার শুকনো লক্ষার লম্বা-লম্বা বোঁটা নেই, তাও মনে ছিল না....হাঃ হাঃ....কত টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন?

এইবার তখমত খেয়ে গেল অফিসারটি। না মানেন.....স্যার.....ঘুষ.....না স্যার....। সব বুঝে বিচারপতি বন্দিকে মুক্তি দিলেন।

আদালত থেকে বেরোবার মুখে ওই আইনজীবী কনকেন্দুদের দিকে এগিয়ে এলেন। তদন্তকারী অফিসারটির উদ্দেশ্যে আশপাশের সবাইকে শুনিয়ে বললেন, আপনাদের এই অন্যায়ে দেখেই সাত বছর আগে ইন্দিরা গান্ধীর মামা এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি অনারেবল মুন্না বলেছিলেন, পুলিশ হল দেশের সবচেয়ে সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী।

ইউনিভার্সিটির লাগোয়া চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসল কনকেন্দু। সে এই দোকানিকে চেনে। বসন্ত সিং। নেপালি। তবে চট করে বোঝা যায় না। বরং ওর মুখে, ব্যবহারে বেশ একটা উত্তরপ্রদেশীয় ভাব আছে। — বহু দিন পরে এদিকেচা খাবেন তো? বসন্ত বলল। —আজ থাক। হাসল কনকেন্দু। একটু পরেই মিছিল আসবে। তখন টেলি-লেন্স লাগান ক্যামেরায় চোখ রেখে মিছিল যাত্রীদের মুখগুলি দেখবে কনকেন্দু। এই লেন্সের কল্যাণে সন্দেহভাজনের মুখটি দেখা যাবে ভাল করে। সবাই ভাববে সে চিত্র-সাংবাদিক। কেউ বাধা দেবে না। এই পদ্ধতি তার নিজের আবিষ্কার। এতে এগিয়ে-পিছিয়ে অনেককেই ভালো করে দেখে নেওয়া যায়।

আজকের মিছিলের অনুমতি না দিলে জল বহুদূর গড়াত। জয়প্রকাশ নারায়ণ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু থাকবেন মিছিলে। বয়স হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ কিন্তু দমেননি। পাটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিয়ে শুরু করেছেন আন্দোলন। গত নভেম্বরের চার তারিখে পুলিশের লাঠি-গ্যাস অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার স্বৈচ্ছাসেবক নিয়ে মিছিল করেছিলেন পাটনার রাস্তায়। পুলিশের লাঠিতে জয়প্রকাশ আহত। প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর পাটনা বন্ধ। ৬ নভেম্বর বিহার। বিহারের বিক্ষোভ সাড়া ফেলেছে এ রাজ্যেও। এক মঞ্চে এনেছে ছড়িয়ে থাকা কংগ্রেস-বিরোধীদের। এ বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর অবাধ সূচু নির্বাচনের দাবিতে নাগরিক সম্মেলন হয়ে গেল। সভা ডেকেছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট লোকজন সব — রমেশচন্দ্র মজুমদার, তিমিরবরণ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু...। সভাপতি বিখ্যাত আইনজীবী, প্রাক্তন বিচারপতি ডি এম তারকুম্ভে। এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন তিন পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক নেতা — সংগঠন কংগ্রেসের প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সি পি এম-এর জ্যোতি বসু আর জনসংঘের হরিপদ ভারতী। প্রত্যেকেই বললেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ এক মঞ্চে এনেছে তাঁদের। হল ভর্তি। রাস্তায় উপচে পড়েছে লোক। এরপরেই ৬ মার্চ সংসদ অভিযান করেছেন জয়প্রকাশ। তাঁর নেতৃত্বে লালকেল্লা থেকে পাঁচ লক্ষাধিকের মিছিল এগিয়ে গেল সংসদ ভবনের দিকে। জেপি-র দৃষ্টি সেই মিছিলে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তিদল আর সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্য-সমর্থক ছাড়াও রয়েছে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। অবশ্য সি পি এম যোগ দেয়নি। তাঁদের এই মিছিলে। প্রধানমন্ত্রী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ নিয়েছেন, বলেছেন জেপি। প্রতিরোধ না করতে পারলে সমূহ বিপদ। সেই জেপি আজ ৬ জুন ১৯৭৫, কলকাতার মিছিলে। এই মিছিলকে অনুমতি না দিলে দেশজুড়ে হইচই বাড়ত।

উলটো দিক থেকে যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। অর্থাৎ মিছিল এগিয়ে আসছে। সামনে এগিয়ে গেল কনকেন্দু।

রাড় করবে ভালো, বউ করবে কালো। পুরুষ কঠ। চকিতে ফিরে তাকাল কনকেন্দু। ময়লা রঙ, চোয়াড়ে মার্কা ছেলেটার শিরা বের করা দু-হাতেই স্টিলের বাল। কালো চোঙা-প্যান্ট, বেগুনি গেঞ্জি। চুলে বাহারি টেরি। সামনের দিকের চুল সিঙাড়ার মতো পাকান। ওর সঙ্গী ছেলেটি বলল, বাঃ হেভি দিয়েছিস...বউ হবে কেলো, অন্য কেউ ফিরে তাকাবে না আর প্রেমিকা হবে একেবারে বৈজয়ন্তীমালা.....হেভি বলেচিস্ মাইরি.....। সঙ্গীটির চোখ লাল, গাঁজা খাবার লক্ষণ স্পষ্ট। চুলটা কদমছাঁট। ছেলেদুটিকে চেনা লাগে। একটু ভাবতেই মনে পড়ল। এরা মণিকতলার বাপ্পা রায়ের পোষা গুণ্ডা। কিন্তু এরা এখানে কেন? তবে কী ওরা মিছিলে হামলা করবার ছক করেছে? ওদের উলটোদিকে গিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে এল কনকেন্দু। ইচ্ছা করে বেগুনি গেঞ্জির সঙ্গে মৃদু ধাক্কা লাগাল। হ্যাঁ অস্ত্র আছে। তার মানে গণ্ডগোলের মতলব। ওদের চাউনি লক্ষ করে বোঝা গেল, রাস্তার ওধারেও সঙ্গীরা আছে। দু-দিক থেকে আক্রমণ করবে ওরা।

বেগুনি গেঞ্জি পরা ছেলেটি বলল, চল আজ সন্ধ্যাবেলায় রামবাগান যাই, নতুন মাল এসেছে...একদিন গিয়েছিলাম। তাকাতেই দিল্ নিংড়ে নিল মাইরি! সঙ্গী বলল, কোথাকার?

এখানকার ভাগ্যে বোলাদান থাকবে না। পাচার হয়ে যাবে, তার আগে চালিয়ে নে...।
খাক খাক করে হাসল বেগুন গেলি। কনকেন্দুর কান গরম হয়ে উঠল। রগের কাছটা
দলদল করল। আজ পাঞ্চালীর মতো সং—সুস্থ মেয়েকে জেলে ভরা হয় আর এইসব
নোংরা, অসুস্থ জন্তকে দেওয়া হয় নির্বিঘ্নে কলকাতার রাজপথে চলাফেরা করবার অধিকার।
এদের সাহায্য নিয়েই তো নকশালদের খতম করা হয়েছে।

মিডিল সামনে চলে এসেছে। সামনের সারিতে লাল শালু ধরে হাঁটছে পনেরো-কুড়িজন।
শালুতে লেখা গণতন্ত্রের কঠরোধের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে কোনো
দলীয় পতাকা বা ফেস্টুন নেই। স্লোগান উঠেছে, গণতন্ত্রের কঠরোধ মানছি না মানব
না। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ মানছি না মানব না। দুধারে মানুষের ভিড়। সাধারণের চোখ
দেখে বোঝা যায়, ওদের সমর্থন মিছিলকারীদের প্রতি।

একটা দাঁড়ান ট্রাকের মাথায় উঠে পড়ে ক্যামেরায় চোখ রাখল কনকেন্দু। সারি সারি
মাথা। মিছিলের শেষ দেখা যাচ্ছে না। সত্যিই মহামিছিল। এক লক্ষ লোক হয়ে থাকলে,
আনন্দ্য না। জেলি গাড়ির ভিতরে। কিন্তু এই গাড়িতে জ্যোতি বসু নেই। মস্তুর গতিতে
এগিয়ে আসছে জয়প্রকাশের গাড়ি। দু-ধারের জমায়েত থেকে আওয়াজ উঠল— জয়প্রকাশ
নাগরিক জিন্দাবাদ। জেলি নমস্কার করলেন। হঠাৎ ওই গাড়ির বনেটের ওপর উঠে পড়ল
দু'জন মেয়ে। একজন সবুজ শাড়ি। অন্যজন নীল। তারা কুৎসিত ভঙ্গি করে নাচতে আরম্ভ
করল। গণগোল পাকানোর সূচনা হচ্ছে। ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল কনকেন্দু।
ছুটে গেল পুলিশ জীপের কাছে। ড্রাইভারের হাতে ক্যামেরা দিয়ে, কনস্টেবল চারজনকে
বলল, আলটি থেকো। অদূরেই দু-গাড়ি পুলিশ এসে গেছে। ওদের কাজ বামেলা বন্ধাট
সামলান। তবু এদেরকেও সাবধান করল কনকেন্দু।

জেলি এ গাড়ির কাছাকাছি এসে দেখা গেল, আরও কয়েকজন মেয়ে গাড়ি আটকেছে।
জেলি বেরোমী স্লোগান দিচ্ছে তারা। স্লোগানের তালে তালে বনেটে-চড়া মেয়েদুটি বিকট
অজ্ঞানী করে নাচছে। সেই বেগুন গেলি আর তার সঙ্গীসহ মোট আট-দশজন গুণ্ডা
প্রকৃতির ছেলে দাঁত বের করে হাসছে। হাততালি দিচ্ছে। বেগুনি গেলি হাসতে হাসতে
বলল, এই সবুজ শাড়িটা কে বে? সঙ্গী বলল, আরে ও তো শংকরী, ভূপালদার
ভায়ী...চিনিস না? হেভি ফাইটার। — আর ওই অন্য মালটা? বেগুনি গেলি তাকাল।

ওটা তো পোতিভা...কালুদার মেয়ে হেভি জিনিস...তুলবি নাকি? সঙ্গীর কথায় বেগুনি
গেলি চোখ পাকাল। — দূর শালা, মাজাকি করিস না...দাদা জানলে সোজা মিসায়
ভরে দেবে। চল চল অ্যাকশন শুরু কর....

কনকেন্দুর মাথার শিরায় গরম স্রোত। এ শুয়োরের বাচ্চারা বড্ড বেড়েছে। বেগুনি
গেলি কলার ধরে টানল কনকেন্দু। ছেলেটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল,
কান গায়ে হাত দিয়েছিস, জানিস? কোনো কথা না বলে সপাটে চড় কষাল কনকেন্দু।
ছেলেটা ছিটকে পড়ল। ব্যাটা কোমরে হাত দিতে যেতেই ওর পাঁজরে লাথি চালান
কনকেন্দু। পুলিশের বুটকে এরা ভালই চেনে। ছেলেটা কাতরাতে কাতরাতে বলল, আমি
কি করলাম স্যার?... সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে স্যার....আমি বাম্পাদার লোক। কনকেন্দু ইশারা
করল কনস্টেবলদের। ওরা হাতকড়া পরিয়ে জীপে তুলে নিল বেগুনি গেলিকে। ওর

সঙ্গীটিকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল কনকেন্দু। কিন্তু একজনের হাল দেখে অন্য ছেলেগুলি উধাও।

যাবার কথা বড়তলা থানা কিন্তু ইচ্ছে করেই বেগুনি গেঞ্জিকে নিয়ে মুচিপাড়া থানায় চলল কনকেন্দু। জেপি-র মিছিলে অবরোধ সামলানোর দায়িত্বে সে নেই। তার জন্য অন্য পুলিশ অফিসার আছে। গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে তার কাজ দরকারি তথ্য সংগ্রহ। আপাতত সে-সবে মন নেই তার। এই শয়তানটাকে শায়েস্তা করতে হবে। এ ব্যাটাকে মিসায় ভরতে পারলে, পাঞ্চালীর জন্য কিছু করতে না পারার কষ্ট যেন লাঘব হয়। নিজের মতো করে বড়বাবুর কাজের একটা প্রতিবাদ করা যায়।

মুচিপাড়ার গোলক সেন কনকেন্দুর চেলা। একটু আভাস দিতেই গোলক ধরে ফেলল। — কোনো চিন্তা কর না...দেখ না কী করি। নিমেষে ঘটনা সাজিয়ে ফেলল গোলক। বেগুনি গেঞ্জি পরা ঘণ্টেশ্বর দাস ওরফে ঘন্টুকে চুনাপুকুর লেনের একটি পুরনো বাড়ির চিলেকোঠার ঘর থেকে ধরা হয়েছে। সে ওইখানে আগ্নেয়াস্ত্র বানাবার কারখানা খুলে বসেছিল...

কনকেন্দু বলল, কিন্তু....

গোলক থামিয়ে দিল, চিন্তা কর না, ওর পাশের বাড়ির বাড়িওলা আমার লোক, সাট্রার কারবারি, সাক্ষী দিয়ে দেবে...। হ্যাঁ যা বলছিলাম, ঘন্টুকে জেরা করে পুলিশ জেনেছে, ও নকশালদের অস্ত্র বিক্রি করতো...হাওড়া ব্রিজ উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করছিল ওরা....।

বিবৃতির বয়ানে ঘণ্টেশ্বরের সই নিয়ে নিষ্ঠুর গোলক। — তুমি অফিসে যাও আমি কাগজপত্র তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ জানিয়ে অফিসের দিকে রওনা দিল কনকেন্দু। এইসব মামলা সাজান সে বড়বাবুর কাছেই শিখেছে। এইবার তার প্রয়োগ করবে।

সব শুনে ডি সি সাহেব খুশি। চেয়ার ছেড়ে উঠে কনকেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, গুড জব! এক ধাক্কায় একটা টেরিস্ট ধরে আনলে! একটা রিপোর্ট বানিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন সাহেব। কনকেন্দু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। সাহেবের কপাল অর্ধচন্দ্রের মতো— অর্ধেন্দু ললাট। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী এরা ধনবান। কীসে ধন উপার্জন করা যায়, ভালো জানে। চেয়ারে বসলেন সাহেব।

—সি পি আই, সি পি এম এরা কেমনভাবে দেখছে জেপি-র আন্দোলন? সাহেব আঙুল দিয়ে টেবিল ঠুকতে শুরু করলেন।

—স্যার সি পি আই তো জেপি-র বিরুদ্ধে, কংগ্রেসের পক্ষ নিয়েছে....ওরা বলছে জেপি ক্ষমতায় এলে দেশে ফ্যাসিবাদ আসবে....

—আর সি পি এম?

—ওরা প্যাঁচে পড়ে গেছে...

—কী রকম?

—ওরা না পারছে জেপি-কে খোলাখুলি সমর্থন করতে কারণ ওদের মতো জেপি-র সঙ্গীরা অনেকেই কমিউনিস্ট বিরোধীআবার ওই আন্দোলনের সঙ্গে না থেকেও উপায় নেই কারণ এরাই বর্তমানে স্বৈরাচার বিরোধী মূলস্রোত....মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন জেপি....

ডি পি দাঃ৩৭ হাসলেন, বেশ মজার ব্যাপার তো....

৩১। দাঃ, বেশ মজার....সি পি এম দিম্মিতে জেপি-র মিছিলে ছিল না কিন্তু এইখানে জেপি-র সঙ্গে মিছিল করল....

আবার হাসলেন ডিসি সাহেব। — বেশ মজার পার্টি। দিম্মির উদাহরণ দেখিয়ে বলবে, আমরা জেপি-র সঙ্গে নেই। আবার প্রয়োজন হলে কলকাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলবে, আমরা আছি।

আচ্ছা.....নকশাগুলোর খবর কী? ডিসি ভুরু তুলে তাকালেন। সাহেবের ভুরু আর কানের মাঝখানের অংশটি ভাল করে দেখল কনকেন্দু। দু-দিকের রংগই দেখল। নাঃ, এর শব্দপ্রদেশ ঐশ্বর্য কিংবা বিস্তীর্ণ নয়। উচু নয়। পূর্ণ বা বিশাল নয়। বরং নিচুর দিকে। এরা অনেক বিষয়েই দুঃখী। আশ্চর্য, সাহেবকে দেখে বোঝা যায় না। অর্থাৎ নিজের মনোভাব গোপন রাখতে পারেন ভদ্রলোক।

কনকেন্দু বলল, স্যার এখানে তেমন কিছু হচ্ছে না তবে বিহারে লিন-বিরোধী গ্রুপটা বেশ শক্তিশালী....ওরা ভোজপুর আর গয়াতে পুলিশের সঙ্গে লড়াই...উত্তরপ্রদেশের শূণ্যদিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে গেছে ওরা...

ডিসি বললেন, ওড... আচ্ছা শোন....ওই যে দু-তিন মাস আগে আমরা ময়দানের একটা মেলায় যোগ দিয়েছিলাম....সেখানে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছিল...মনে আছে?

হ্যাঁ স্যার। জাতীয় প্রদর্শনী। রচনার বিষয় — কলিকাতা পুলিশের নিকট আপনি কি আশা করেন এবং কি করেন না। প্রতিযোগিতা হয়েছিল, পনের থেকে আঠারো বছরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে....

ঠিক ঠিক। টেবিলে আঙুল ঠুকলেন ডিসি। সামনের ১৮ অগস্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হলঘরে প্রতিযোগিতায় সফল প্রথম তিনজনকে পুরস্কার দেওয়া হবে... ড্রয়ার থেকে একটি পাণ্ডুলিপি বের করলেন ডিসি সাহেব। — এইটা ওদেরই একজনের লেখা...। কমিশনার চাইছেন এই লেখাটা ক্যালকাটা পুলিশ গেজেটে ছাপা হোক। সবাই জানুক আমাদের সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কী ধারণা! আমাদের যা ভালো দিক দেখিয়েছে ছেলেমেয়েরা সেগুলো আরও বাড়তে হবে, আর ভুলভ্রান্তি শোধরাতে হবে...

হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিল কনকেন্দু। প্রথা মারফি সেলাম ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজ দপ্তরে এসে লেখাটিতে দ্রুত চোখ বোলাল একবার।

'...ঘুম নেবার ঘটনা সাধারণ কনস্টেবল থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অফিসারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার মাঝে দাঁড়ানো কনস্টেবলের উদ্দেশ্যে চলন্ত গাড়ি থেকে পায়সা ঝুড়ে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে....'

লেখাটি খামচা খামচা পড়ল কনকেন্দু।

'...প্রায়ই শোনা যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী। অবশ্য দৃষ্টান্ত দমন করা এবং শিষ্টকে পালন করাই পুলিশের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের প্রতি দৈহিক অত্যাচারের দু'একটি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু যখন দেখি অপরাধী দমনের নাম করে পুলিশ পল্লী নিরীহ ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে যায়, বেশ কিছুদিন আটকে রেখে

দেয় এবং নিষ্ঠুর দৈহিক নির্যাতনের দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন বিকল করে দেয়, তখন মনটা পুলিশের প্রতি ঘৃণায় ভরে ওঠে...’।

নিরুপমের চোখ ভেসে উঠল। সেখানে অবশ্য ঘৃণা কম ভৎসনা বেশি। মুখে চোখে জল দিতে ছুটল কনকেন্দু।

কলকাতার মহামিছিলের রেশ কাটতে না কাটতেই বড় ঘটনা। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভার আসন বাতিল। ওই আদালতে ইন্দিরার বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা চলছিল। রায় ঘোষিত হবার দু-দিন পরেই প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মতো জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন রাষ্ট্রপতি। ওইদিন ভোরবেলা থেকেই বিরোধীপক্ষের নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু হল। দশটি নকশালগ্নপ সহ মোট ছবিবিশটি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু নিষিদ্ধ তালিকায় সি পি এম বা সি পি আই-এর মতো কমিউনিস্ট পার্টির নাম নেই! জরুরি অবস্থা জারির এক সপ্তাহ পরেই প্রধানমন্ত্রী কুড়ি দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীদের ঋণবিলোপ। শহর অঞ্চলে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া। মুচলেকা শ্রমিক প্রথা রদ। ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশাসনিক পরীক্ষার জন্য এইসব কর্মসূচির দফাগুলি মুখস্থ রাখতে হয়, এছাড়া এসবের আর কোনো মূল্য নেই, সবাই জানে।

এদিকে মিসা আরও জোরদার করা হল। রাষ্ট্রপতির জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী, মিসায় আটক কোনো ব্যক্তি, বিদেশী নাগরিক হলেও, স্বাধীনতার দাবি জানাতে পারবে না। স্বাভাবিক ও সাধারণ আইনের সাহায্য প্রার্থনা করে সে আদালতেও যেতে পারবে না।

বড়বাবু খুশি। এখন কোনো শালা হুমকি ফোকর দিয়ে গলে বেরোতে পারবে না। পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে মিসার কাগজ দ্রুত ছড়িয়ে আনছেন বড়বাবু। পাঞ্চালী এখন প্রেসিডেন্সি জেলে।

একদিন বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়ল কনকেন্দুর। লোকটার সামনে বসে পুলিশের উকিল। — শোন তুমি এখনই আলিপুর কোর্টে চলে যাও...আজকে পাঞ্চালী মিএর মামলা উঠবে। উকিলের দিকে তাকাল লোকটি। — আপনি আর একটা তারিখ চেয়ে নিন....এর মধ্যে আমি ওকে মিসায় আটকে নিচ্ছি.... শরীর নাচিয়ে হাসল হুমদোটা। হাসতে হাসতে কনকেন্দুর দিকে ফিরল। এরপরে আর ও মেয়েছেলের জন্য তোমাকে কোর্টে দৌড়তে হবে না। ঘামের কটু গন্ধ ভেসে এল হাওয়ায়।

পাঞ্চালীর মুখেমুখি কনকেন্দু। একটু কৃশ দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। কেমন আছেন? বলল কনকেন্দু। পাঞ্চালী গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। — ভালোই....পুলিশ হেফাজতের চেয়ে অনেক ভালো....। ঠোঁটের কোণের হাসির রেখা দেখা গেল। কোর্ট লকআপে থাকা বিচারাধীন বন্দির সঙ্গে এইভাবে কথা বলার নিয়ম নেই। কিন্তু আজ কনকেন্দু মরিয়া। দায়িত্বে থাকা পুলিশটি তার চেনা। ওকে অনুরোধ করে পাঁচ মিনিট কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে।

পাঞ্চালীকে ভাল করে দেখল কনকেন্দু। ওর কপালের শিরাজাল উন্নত, লতার মতো বিস্তৃত। এই কপালকে উন্নত শিরা বলতে হয়। সামুদ্রবিদ্যা অনুযায়ী এরা ধনী। এই ধনী মানে অর্থসমৃদ্ধি নয়, এদের মনের ভাঁড়ার ধনে পরিপূর্ণ। এই মেয়ের ভুরু বিশাল আর উন্নত — বিশালোন্নতভিরতিসুখিনঃ। সুখের বাহ্য উপকরণ থাকুক না থাকুক এদের মন

সুখসাগরে ডুবে থাকে। এই মানুষটিকে মিসায় আটকাতে চলেছেন বড়বাবু। কনকেন্দু আর নাথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। বলে ফেলল সব কথা।

এক মিনিট চুপ করে রইল পাঞ্চালী। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল, দূর, এই নিয়ে এত মন খাণ্ডারের কী আছে? যা সামনে আসবে, ভয় না পেয়ে তার মুখোমুখি হতে হবে....।

জানেন তো আমার ডায়েরিতে সব লিখে রেখেছি.... বড়বাবুর সমস্ত অত্যাচারের বিবরণ হত্যার তালিকা....সাল, তারিখ, সময় দিয়ে লেখা আছে সব, বলল কনকেন্দু। পাঞ্চালীর চোখে কৌতূহল। — লিখে রেখেছেন কেন?

আগামীতে কোনো মানুষের হাতে তুলে দেব ডায়েরিটা.....

—সত্যি?

সত্যি....সত্যি....কিন্তু আমায় লুকিয়ে রাখতে হয় ডায়েরি....বড়বাবু জেনে গেছেন...অবশ্য আমার বাড়িতে তল্লাশি চালালেও কেউ সহজে পাবে না... হয়তো আমায় খুন করে দেবে বড়বাবুর চেলারা....

পাঞ্চালী হাসল। আপনি তো পুলিশ, আপনার বাড়ি তল্লাশি হবে কেন? আর খুনই না কেন? ওরেন?

আপনি জানেন না, বড়বাবু একটি নোংরা হায়না....উনি নিজের জন্য সব করতে পারেন....

দূর, অত সোজা নাকি? ... ভাববেন না

কনকেন্দু কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে। তারপর চোখ তোলে। এক আই এ এস অফিসার তার বাড়িতে বঙ্ক নকশালপত্নীকে একদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। খবরটা জানতে, পেরেই মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুলে দিয়েছেন বড়বাবু।

তারপর? পাঞ্চালীর গলায় ধ্বংস উদ্বেগ।

মুখ্যমন্ত্রী ওই অফিসারকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন, তলপেটে লাথি মেরে বিপ্লব ঘটিয়ে দেব....ভাবতে পারেন?...

পাঞ্চালী চুপ করে থাকে। কিছু পরে ঘটনার শেষাংশ বলে কনকেন্দু। অফিসারের চাকরি চলে যেত। নেহাৎ ভদ্রলোক অত্যন্ত মেধাবী....সি পি আই-এর এক বয়স্ক নেতা ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করায় তার চাকরিটা কোনোমতে টিকে গেছে, তবে পদোন্নতি আপাতত বন্ধ....

—এই তুলনায় আমি তো চুনো পুঁটি....গুণ্ডা দিয়ে আমায় খতম করতে ওর বুক একটুও কাঁপবে না। খতম করবার পর রটিয়ে দেওয়া হবে কোনো নকশাল মেরেছে আমায়। পাঞ্চালী চুপ করে শোনে। কনকেন্দুর চোখ বিস্ময়িত। জোরে শ্বাস নেয়।

খুব গ্লানি হয়....জানেন....বড়বাবু নিরুপমকে গুলি চালান....বাধা দিতে পারিনি.... কনকেন্দুর চোখ লাল, মুখ দিয়ে লাল গড়ায়। আজ উনি আপনাকে মিসা দেবার ছক কষছেন, কিন্তু কিছু করতে পারছি না....। কনকেন্দুর শরীর কাঁপে। ডায়েরিটা নেবেন আপনি? নেবেন? এতে সব আছে সমস্ত অত্যাচারের কথা....আপনি সবাইকে জানিয়ে দিন....পাপের গোণা কমে....

পাঞ্চালী উত্তর দেয় না। কনকেন্দুর কাঁপুনি বাড়ে। — ওই দেখুন... নিরুপম আমার

দিকে তাকিয়ে আছে...আঙুল তুলেছেদেখতে পাচ্ছেন? কনকেন্দু অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হাত নাড়ে। ওই যে...ওই যে....।

স্বাভাবিকভাবেই পাঞ্চালী কোর্টের লোকজনের মধ্যে নিরুপমকে দেখতে পায় না।



শহরে বসন্ত। এই টালির চাল, বাঁশের চাঁচের বেড়ার ঘরে বসেও বেশ বুঝতে পারা যায়। বন্ধ জানালা, নড়বড়ে দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে দক্ষিণের বাতাস। বন্ধ জানালাটি অবাধ করে দিলেন সুকান্তি। রোদ্দুর ডোরাকাটা বাঘ হয়ে ঝাঁপিয়ে ঢুকল ঘরে। সেই সঙ্গে বাইরের হাওয়া। বিকেল পাঁচটা। এমন সময়ে রাস্তায় বেরিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কত মানুষের কথা শোনা যায়। আজকে আরও ইচ্ছে করছে কারণ আর মাত্র বারো-চোদ্দ ঘণ্টা পরেই নির্বাচন। এর আগে এমন হয় নি, কিন্তু এবারের ভোট নিয়ে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে সুকান্তির।

সামনের গলিপথের কোণে চার পাঁচটি বালক আঙুল গায়ে গুলি খেলছে। রাস্তা দিয়ে যে দুজন গেল তাদের একজনের ময়লা সাদা পম্পিডো, আকাশি নীল শার্ট, অন্যজনের ঢোলা প্যাণ্টের পায়ের কাছটা ছেঁড়া, হাওয়াই শার্ট, শার্টের রঙ খয়েরি। হাঁটার ধরণ দেখে মনে হয়, এখনই তেমন কিছু তাড়া নেই। রাস্তার প্রান্তে দুটি বাঁশের খুঁটির মাথায় দাঁড় করান চটাইয়ে একদা লেখা ছিল — গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। বাক্যটির দুটি ‘না’-তে আলকাতরা বুলিয়েছে কোনো রসিক।

উল্টোডাঙা খালপাড়ের এই বসতি বেশ মজার। এখানে হরেক পেশার মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! লোহার ছাঁট ব্যবসায়ীর সহকারী থেকে চোলাই মদ বিক্রয়কারী, বিস্কুট কোম্পানীর করণিক থেকে কারখানার শ্রমিক, সবাই আছে। পল্লীর প্রান্তে একেবারে খালের গায়ে আরও গরীব কিছু পরিবারের বসত। ওরা প্লাইউড কেটে চামচ বানায় — আইসক্রিম, ভেলপুরি খাবার চামচ। সেই চামচ কিনে নিয়ে যাবার মাতব্বর আছে। তারাই ওদের হোগলা পাতার বুপড়ি বানাতে মদত দিয়েছে। এখানকার অধিকাংশ পরিবার এসেছে চব্বিশ পরগণা থেকে। দক্ষিণের থেকেই বেশি।

সুকান্তি যে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছেন তা এই নতুন পল্লীর প্রান্তে, খালপাড় বুপড়ির সূচনায়। একদিকে ভি আই পি রোড, সল্টলেক। অন্যদিকে স্টেশন। চারদিক এখনও বেশ খালি। সেই বিচারে এই বাড়ীর অবস্থিতি মুস্তাঞ্চলে বলা যায়। অন্তত গোকুল প্রায়শই ঠাট্টা করে সেই কথাই বলে থাকে। গোকুল পাত্র কাজ করতে রেলে, থাকত কাঁচড়াপাড়ার রেল কলোনিতে। রেল ধর্মঘটের সময় নব কংগ্রেসিরা আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও উৎখাত করল। ধর্মঘটে যোগ দেবার অপরাধে চাকরিটাও চলে গেল। এ-দোর ও-দোর ঘুরে গোকুল শেষ পর্যন্ত চাকরি পেল দক্ষিণদাঁড়ির ইস্ট ইন্ডিয়া পেপার মিলে। রেলে যেসব যন্ত্রপাতির কাজ আর ঝালাই শিখেছিল, সবই কাজে লেগে গেল এই কারখানায়।

কাঁচড়াপাড়া থেকে উৎখাত হতেই গোকুল তার স্ত্রী করবী আর সাত বছরের মেয়ে বিজয়াকে নিয়ে চলে এল খালপাড় পল্লীতে। জমান পয়সায় এক ফালি জমি কিনে, বানিয়ে নিল শওপোড় বেড়ার ঘর। চাকরি পাবার কিছুকাল পরেই হোগলা পাতার ছাউনি সরিয়ে টালির চাল করেছে গোকুল। বিধবা শাশুড়িকেও নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলা গাঙের ব্যথায় হাঁটতে পারেন না। অনেক কষ্ট করে তাকে দিয়ে দৈনন্দিন অত্যাবশ্যিকীয় কাজগুলি করান হয়। করবীই করায়। এই মেয়ে পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমতী। সে বাড়ি বসে আচার বানায়, বড়ি-কুচো নিমকি ভাজে, সেলাই ফোঁড়াইও করে। ওই বড়ি-আচার সাইকেলে চাপিয়ে কাঁকড়গাছি-উন্টোডাঙ্গার আবাসনে বাবুদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বেচে আসে কপোনির অনুপ। এই বাড়িগুলি তার চেনা কারণ সকালবেলায় খবরের কাগজ আর বিকেলে দুপুরে বোতল নিয়ে সে তো প্রত্যহই যায়। ফলে এই ব্যবসায় করবীর হাতে যেমন দুটো পয়সা আসে, অনুপেরও পুষিয়ে যায়।

সামনের স্কুলে বিজয়াকে ভর্তি করে দিয়েছে করবী। মেয়ের পড়াশুনোয় ছেদ পড়া উচিত নয়। এছাড়া কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপের পর সে বাড়ির সব প্রাপ্তবয়স্কের নাম ভোটার তালিকায় ওঠাতে পেরেছে। অতএব ওরা সবাই এখন এই নতুন পল্লীর পাকাপাকি বাসিন্দা।

সেই যে রেল ধর্মঘটের সময় আলাপ হয়েছিল গোকুলের সঙ্গে, ও ভোলেনি। নিয়মিত গোগাগোগ রেখেছে সুকান্তির সঙ্গে। আশ্রয়ের অসুবিধার কথা জেনে সে-ই তার বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেয় সুকান্তিকে। কিছু দোনামোনার পর রাজি হয়ে যান সুকান্তি। কারণ সাতাট চট করে এমন নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া কঠিন এখন আর দ্বিতীয় কথা হল, এ অঞ্চল থেকে উন্টোডাঙা ছাড়াও শিয়ালদা জেওড়া স্টেশনও তেমন দূর নয়। যাতায়াতের সুবিধা। অতএব গোকুলের পরিবারে এখন মোট পাঁচজন সদস্য।

যে মাসে সুকান্তি থাকেন, সেখানেই কয়েক সপ্তে একটি নেয়ারের খাট ধরে গেছে। খাটের ওপর জামাটা, স্টোভ সত রান্নার মাগতীয় সরঞ্জাম। ঘরের কোণে মাটির উনুন। উনুনের জ্বালা চার দুটো উপরে লক্ষ্মীর পট, দেওয়ালে মটান। দিনে দু-বার পটে মাথা ঠেকায় করবী। লাশের মতো দুটি সফ্র ওগাপোশ। একটিতে গোকুলের শাশুড়ি লক্ষ্মীমণি। অন্যটির প্রতিটি পাখায় চারটি করে থান ইঁট। উপরে করবী, বিজয়া নিচে গোকুলের শোবার ব্যবস্থা। বাইরের লক্ষ্মীর খবর এখানে আসে প্রধানত দু-ভাবে। একটি মাধ্যম রেডিও অন্যটি সকালের খবরের কাগজ। এছাড়া সুকান্তির একটি নিজস্ব মাধ্যম আছে — বার্তাবাহক। সে মাঝে মাঝে এসে কমরেডদের চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকা এবং কখনও রেবার চিঠি আর তার পাঠান টাকা দিয়ে যায়। একশো, দুশো। যা পান, সবটাই এই যৌথ সংসারে দিয়ে দেন সুকান্তি। করবী বলে, কাকা সবটা নয়, ঘোরাঘুরির জন্য হাতে কিছু রাখুন। কাকা মাথা নাড়েন, লাগলে তোমার থেকে চেয়ে নেব'খনএখন তো রাখ। হাসেন সুকান্তি। এ বাড়িতে তিনি গোকুলের কাকা। বয়স আর চেহারা দিব্য মানিয়ে গেছে।

করবী বলল, কাকা চা... হাত বাড়িয়ে কাপ নিলেন সুকান্তি। করবীর কাজে ছন্দ আছে। সকাল সাড়ে চারটে, পাঁচটায় উঠে পড়ে। হাত মুখ ধুয়ে, চুলে চিকণি বুলিয়ে পটে মাথা ঠেকাবে। তারপরেই সংক্ষিপ্ত জলখাবার পর্ব। গোকুল বেরিয়ে গেলে বিজয়াকে তাঁর কানে ছুটে স্কুলে পাঠান। তারপর লক্ষ্মীমণির পরিচর্যা। বিকেলে জনতা স্টোভে চা, তারপর

সাড়ে পাঁচটা ছটা নাগাদ উনুন ধরান। বাড়ির পিছন দিকে ধরালেও, ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায় ঘর থেকেই। ধোঁয়াও কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। আবার সন্ধ্যাবেলায় পটে মাথা। রাত নটা, সাড়ে নটায় ঘুম। এছাড়া উপায় নেই, কারণ এই কলোনিতে বিদ্যুৎ সংযোগ আসেনি এখনও। তখন রেডিওটা সুকান্তির বিছানায়। খুবই নিচু আওয়াজে খবর শোনে সুকান্তি। খবর বলতে ইন্দিরা গান্ধীর জয়গাথা। সঞ্জয় গান্ধীর দূরদৃষ্টি। ১৯৭৬-এর গোড়া থেকেই ইন্দিরার এই কনিষ্ঠ পুত্রের উত্থান। বছরের মাঝামাঝি তিনি অপ্রতিরোধ্য! খবরের কাগজেও একইরকম, তবু, তারই মধ্যে মজার কথা পাওয়া যায়। যেমন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী নিজের পিঠ পেতে দিয়েছেন, হাতি থেকে নামার সময় সঞ্জয় যাতে পা রাখতে পারে। অন্য কোনো এক মুখ্যমন্ত্রী নাকি সঞ্জয়ের চম্পল বহন করেছেন।

রাস্তায় ঠকঠক শব্দ হল। শব্দটি চেনা। জানালায় মুখ রাখলেন সুকান্তি। যা ভেবেছিলেন তাই। বুধিয়া চলেছে, দুই বগলে ক্রাচ। উমেশের সম্বন্ধি বুধিয়া। দুজনেরই চমৎকার শরীর। উমেশ ট্যাক্সি চালায়। কদিন আগে পর্যন্ত বুধিয়াও চালাত। উমেশের দেশ ভোজপুর, বুধিয়ার ভাগলপুর। একসময় বুধিয়া খুব সুন্দর কথা বলত। একেবারে নিজের মনের কথা। তখন ওর বাক্যে দু-একটি ফারসি উর্দু শব্দও ঢুকে যেত। নিশ্চয়ই শুনে সংগ্রহ করা। তাহলেও ও ঠিকঠাক প্রয়োগ করতে পারে শব্দগুলি। কম কথা নয়। ছেলেটির গানের গলাও চমৎকার। হোলির আগে মাঝে মাঝে গলা ছাড়ত।

ফাগুন মে ফসলিয়া পাকল্ ছে
রসবা তো লবালব ভরল্ ছে
লহ লহ কে ক্ষেত পছাড়
গোরিয়া কাটে দে....

ভাগলপুর, ভোজপুরে কিছুকাল থাকার সুবাদে অঙ্গিকা গীতি আর ভোজপুরি গানের মর্ম বুঝতে অসুবিধা হয় না সুকান্তির। ফাল্গুনে ফসল পেকেছে। পাকা শস্যদানা রসে টাইটবুর। ক্ষেতের চতুর্দিকে পাকা ফসল। প্রিয়তমা এইবার ফসল কাট। জোতদার অপেক্ষা করে আছে।

ঢোল বাজাতে বাজাতে উদ্বেল হয়ে উঠত বুধিয়ার গলা — লে লৈ হোলি রসদার/
গোরিয়া কাটে দে / তৈয়ার ছে জোতদার / গোরিয়া কাটে দে / তৈয়ার ছে জোতদার/
গোরিয়া কাটে দে....

সম্প্রতি বুধিয়ার দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পূজোর সময় মূলুকে গিয়েছিল বুধিয়া। দশেরা পরিয়ে দেওয়ালি চলে গেল, তবু ফেরে না। খত পেয়ে উমেশ গেল। সঙ্গে করে নিয়ে এল বুধিয়াকে। ওর ডান পা কাটা পড়েছে। বগলে কাঠের অবলম্বন। কী হল রে? কী হল? ঝাঁপিয়ে পড়ল কলোনির সবাই। সবাইকে বলল বুধিয়া তার দুঃখ-কথা। তার প্রিয় কাকাবাবু সুকান্তিকে আলাদা করে বলেছিল অঙ্গিকা হিন্দিতে অনুপুঙ্খ সহ।

ভাঙা টিনের চাল, ফালতু কাঠ জুড়ে খাঁচা বানিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড় করান হয়েছে স্বাস্থ্য শিবির। গান বাজছে, ওম জয় জগদীশ হরে....। মাঝে মাঝে চোঙা ফুঁকে ঘোষণা চলছে, এস এস অপারেশন করিয়ে যাও আর ছোট সুখী পরিবার বানাও। ওইটি আদতে নির্বীজকরণ শিবির। সঞ্জয় গান্ধী আওয়াজ দিয়েছে সবাইকে ধরে-ধরে খাসি করে দাও।

কথা কম কাজ বেশ। ব্যস! আমলারা লেগে পড়েছে। এত কথা বুধিয়া জানতই না। আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও পুলিশ জোর করে ধরে আনে, তারপর নাসবন্দি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাটাচ্ছেড়া করবার ফলে ক্ষতে সংক্রমণ ঘটে গেল। পুঁজ ছড়িয়ে পড়ল ডান পায়ে। তখন আবার সরকারি হাসপাতাল। সেখানেও দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না। আরও বাড়াবাড়ি। ধুম জ্বর। তখন টনক নড়ল ডাক্তারদের। জীবন বাঁচাতে গেলে ডান পা কটতে হবে। কাটা পড়ল। গ্রামের মুখিয়রা দয়াপরবশ হয়ে কাঠের অবলম্বনটি কিনে দিয়েছে। গুণিয়া বলেছিল, ওরাজুর এক পাল্লায় এত পাপের বোঝা ভরেছে ওরা, অন্য পাল্লায় আমরা কি চাপাব চাচা? তারপর থেকেই হাসিখুশি ছেলেটি কেমন বদলে গেল। ঠকঠক করে রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। বড় রাস্তায় যায়, ফিরে আসে। একপায়ে তো আর ট্যান্ড চালান যাবে না। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে কাজের খোঁজ করে সে। কখনও উমেশের ট্যান্ডে শহরে ঘুরে ফেরে। চোখে ঘোলাটে ভাব। কথাবার্তা কমে গেছে। অবশ্য উমেশ তেমনই আছে। ছেলেটা চুপচাপ কিন্তু অনেক খবর রাখে। বুধিয়ার সঙ্গে আলাপ হবার পর সেও এসে আলাপ করেছিল সুকান্তির সঙ্গে। ভোজপুরি টানে দু-একটি কথাও উত্তর দেবার পর থেকে সুকান্তিকে কাছের লোক মনে করে উমেশ। ওই বলেছিল, ভোটে তো শুধু দল পাষ্টাবে চাচা। চেহারা বদলাবে শুধু। সবাই মুখে গরিবি কমানোর কথা বলে ভোট চাইবে কিন্তু ভেতরের চেহারা এক থেকে যাবে। কংগ্রেস পার্টি, তারপর ওদের বিরোধী পার্টির মিলমিশ করে কদিন আগে সে জনতা পার্টি বানিয়ে ভোটে লড়তে নেমেছে, সব এক হয়। এই তো সেদিন, কান্টার সামনে দাঁড়িয়ে ভোজপুরি গানও লেগেছিল উমেশ।

সমাজবাদ গাওয়া মীরে মীরে আমি
জাতি সে আয়ি, খোড়া সে আয়ি, আংরেজি বাজা বাজাই

সমাজবাদ....

নোটোয়ামে আয়ি.....ভোটোয়ামে আয়ি....

বিরলাকে খরমে সমাই সমাজবাদ

গান্ধি সে আয়ি....আন্ধি সে আয়ি....কিতনি মারাইওরায়ি

সমাজবাদ.....

কংগ্রেস সে আয়ি...জনতা সে আয়ি....ঝাঙকে বদলি হো যাই সমাজবাদ...

ডলার সে আয়ি....কুবল সে আয়ি....বিশ্বাসে বহে লড়াইসমাজবাদ...

গানে কি ধারাল বাঙ্গ। সবারই মুখে সমাজবাদ। কংগ্রেস পার্টি, জনতা পার্টি, গান্ধি, বিড়লা সবাই সমাজবাদের ভক্ত। আমেরিকা, রাশিয়া সবাই। এ ভোজপুরের এক ধরণের লোকগীতি ব্রহ্মা'র সুরে বাঁধা গোয়ালারা বিশেষ করে এই লোকগীতি গায়। দিন কুড়ি আগে ব্রহ্মা'র গানকালাঁন গানটি একবার শুনেছিলেন সুকান্তি। কিন্তু তখন গানের অর্থ এতো ভাল বোঝেননি। উমেশের দৃষ্ট, সুরেলা গলায় সব স্পষ্ট হয়ে গেল। রাতের দিকে খাটোলাটে বসে নিয়মিত দারু পান করে উমেশ। তার সেই দড়ির খাটের চারপাশে ভিড় জমায়েত মূল্যবোধ বড়। ঢোল বাজিয়ে অন্যান্য গানের সঙ্গে, হঠাৎ কোনোদিন, সবাই মিলে 'সমাজবাদ গাওয়া' শুরু করে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওধারে চন্দ্রদার মুখ ভেসে উঠল। চোখে বেদনার ছোঁয়া।

— কেমন আছেন?

— ভাল না চন্দ্রদা। জরুরি অবস্থা জারির পর থেকে ভীষণ অবস্থা। হাজার হাজার লোক বিনা কারণে বন্দি, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, মৌলিক অধিকার খর্ব, সংবাদপত্রের মুখে তালা, সভাসমিতি ধর্মঘট করা চলবে না, বিচারব্যবস্থা পদ্ম, লক্ষ লক্ষ লোকের শুভ্রানালীতে সেলাই পড়েছে...

— সেকী শুভ্রানালীতে?

— হ্যাঁ চন্দ্রদা...বয়সের কোনো বাছবিচার নেই....গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে সমস্ত পুরুষকে ধরে আনা হচ্ছে নির্বীজকরণ শিবিরে....এমনকী সড়কের উপর ট্রাক থামিয়ে ধরে আনা হচ্ছে ড্রাইভারদের....কেন? না জনসংখ্যা কমাতে হবে....দেখেও মনে হয় হরিজন আর আদিবাসী গ্রাম নির্বীজকরণের প্রধান লক্ষ্য.....

— এ তো স্বৈরাচারের চূড়ান্ত....একনায়কতন্ত্র....

— একেবারে ঠিক....উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশে নাসবন্দি আতঙ্ক....জীপের আওয়াজ পাওয়া মাত্র গ্রাম খালি করে পুরুষরা উধাও হয়ে যায়.... রাস্তিরে ওরা সবাই মিলে গ্রাম থেকে দূরে কোনো খোলা মাঠে শুয়ে রাত কাটায়....

— আপনি বিনা বিচারে বন্দির কথা বলছিলেন....

— হ্যাঁ চন্দ্রদা, জেলখানায় আর জায়গা নেই....প্রতিদিন অন্তর একজন করে বন্দি মারা যাচ্ছে বিহারের জেলখানায়...সেখানকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। যে মিসা চালু হয়েছিল আমাদের মানে নকশালদের ধরে রাখার জন্য, কিছু পরে তা হাত বাড়াল সি পি এম-এর দিকে। সি পি এম-এর পর ধর্ম হল দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের সোস্যালিস্ট পার্টির লোকজনকে....তারপর কংগ্রেসের মতামতের বিরুদ্ধবাদীদের....এখন সরকারি আমলাদেরও ছাড়া হচ্ছে না....

— কী বলছেন!

— হ্যাঁ চন্দ্রদা...যে আমলা সঞ্জয় গান্ধীর কথাবার্তা শুনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, অথবা তার পরিবারের লোকজনদের উলটোপালটা কাজকর্ম নিয়ে মৃদু প্রশ্ন তুলছেন....তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে....

— এ তো ভয়ংকর অবস্থা।কোনও প্রতিবাদ নেই রাজ্যে?

— চেষ্টা হয়েছিল খবরের কাগজে লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিবাদ করবার....যে ক'জন চেষ্টা করেছিলেন তাদের উপর আক্রমণ নামান হয়েছে। তিনজন নামী সাংবাদিক জেলের মধ্যে। দর্পণ আর ফ্রন্টিয়ারের অফিসে পুলিশি তল্লাশীএকটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত...তার ওপর নতুন ব্যবস্থা, সেন্সরশিপ....

— দৈনিক খবরের কাগজও সেন্সরশিপের আওতায়?

— ঠিক তাই.... স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার কেউ বাদ নেই....রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জওহরলালেরও ছুটকারা মেলেনি...আকাশবাণী থেকে রবিবাবুর কয়েকটি গানের সম্প্রচার নিষিদ্ধ....নিষিদ্ধ নেহরুর আত্মজীবনী কয়েকটি অংশ। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হরিজন অথবা ইয়ং ইন্ডিয়া থেকে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ উদ্ধৃত করা চলবে না....

জান গান! এ তো অন্য তালিকা...

মজার গ্যাপারও খটেছে...

কীরকম?

অমরদাশংকর একটি গল্পে লিখেছেন — ইংরেজ গিয়েছে কিন্তু স্কচ এসেছে... সেপার কর্তৃপক্ষ আলাও করল...গল্পটি ছাপা যায়নি....

এরা মুখ...

মুখ গলে মুখ। ...এক মন্ত্রী স্টেটসম্যান অফিস থেকে বেরিয়ে গর্ব ভরে ঘোষণা করেছেন, সব 'সেগাস' করে এলাম...। বলতে বলতে সুকান্তি হেসে ওঠেন। চন্দ্রদাও যোগ দেন।

কিন্তু সুকান্তি একটা কথা বলুন, নাসবন্দি নিয়ে গরীব মানুষ কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ করছে না?

করেছে...দিল্লির তুর্কমান গেটের মুসলমান মহল্লা থেকে প্রতিরোধ করেছে ওরা...
গাঃ, খুব ভাল।

কিন্তু তারপরেই বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তুর্কমান গেট, অমরদাশংকর, মুজাফফর নগর সব....ওদের বক্তব্য খুব সহজ, যারাই প্রতিবাদ করবে তাদের বাসস্থান এমনভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে...যা পার কর্তৃপক্ষ নাও.....

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন সুকান্তি — এছাড়াও শহরের সৌন্দর্য বাড়ানোর নামে দিল্লির কিছু বাড়ি, খোপড়ি, কোনো কোনো বাড়ির গাড়িবারান্দা, অলিন্দ, ক্যবিনেট সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে...ওবে সামান্য ফুলও এখন একটু পরিবর্তন দেখছি। চন্দ্রদার চোখে জিজ্ঞাসা।

এই বছরের ১৮ জানুয়ারি রুদ্ভিপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে মার্চে নির্বাচন ঘোষণা করেন। তারপর থেকে একটু একটু করে মুখ খুলছে কেউ কেউ.....

কীরকম? কীরকম?

জগজীবন রাম পদত্যাগ করে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বহুগুণা আর নান্দনী শতপথীকে নিয়ে উনি গঠন করেছেন নতুন দল, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি। এদের সঙ্গে মোরারজী দেশাই আর অন্যান্য বিরোধীরা মিলে তৈরী করেছেন নতুন জোট — এনাতা পার্টি। এদের ভোটের চিহ্ন হল চক্রের মধ্যে লাঙলধারী কৃষক। তারপর দিল্লির শাঠী ইমাম বলেছেন, স্বৈচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। রামলীলা ময়দানে বিরোধী পক্ষের সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে। সেই তুলনায় ইন্দিরার বোট ক্লাবের সভায় ভিড় হয়নি তেমন। তারপর আমাদের এখানে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এরা সব বিবৃতি দিয়েছেন জগদীশ অমর প্রভাষারের দাবিতে....

গাঃ বেশ! ...আর অন্য কোনো লেখক কবি কিছু বলেছেন নাকি?

হ্যাঁ এই তো সেদিন আমাদের ফ্রন্টিয়ারের সমর সেন আনন্দবাজারে স্পষ্ট লিখেছেন, জ্যোতি তান কংগ্রেসকে নয় বিরোধীদলকেই দেবেন, তারপর এই তো একসপ্তাহ আগে লুডহিয়ান চলে যাওয়া কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই সোজাসাপ্টা বলেছেন, কংগ্রেস আর তার গোলাপাড়া সি পি আই কে হারাতে হবে.....যদি এদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্যুৎের

খুঁটিও দাঁড়ায় তাহলে সেই খুঁটিকেই ভোট দেব আমরা....চন্দ্রদা, সভায় সে কী হাততালি!

চন্দ্রদা হাসেন। বাহ্ খুব ভাল। কিন্তু এই অবস্থায় সি পি আই কংগ্রেসের পক্ষে কেন?

— ওদের মতে জয়প্রকাশ নারায়ণ, যাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা জোট বেধেছে, তিনি সম্ভাব্য ফ্যাসিবাদের অগ্রদূত। তাকে আটকাতে জরুরি অবস্থা জারি করে ইন্দিরা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন.....

চন্দ্রদা থামিয়ে দেন। বাঃ মজার তো, কিন্তু বর্তমানের শাসক কংগ্রেস যে কোনো প্রতিবাদ সহ্য করছে না, বিরুদ্ধবাদীদের একের পর এক খুন করে চলেছে, স্বৈরাচারের প্রতিটি লক্ষণ স্পষ্ট, একনায়কতন্ত্রের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে, তার বিরুদ্ধে তো একটি কথাও বলছে না ওরা? আগামীর কথা ভেবে ওরা বর্তমানকে ভুলে যাচ্ছে কেন?

— এইটাই তো কথা....একথা অনেক বামপন্থী বলছেন আজ....এমনকী সি পি আই-এর ভেতরের অনেকেই দলের এই ধরনধারন দেখে বিরক্ত.....তবে চন্দ্রদা, একটা আশার কথা, অনেক সাধারণ, রাজনীতির বাইরের মানুষও ক্রমশ এগিয়ে আসছেন.....সেদিন দেখলাম ধর্মতলায় আমাদের খোকনের স্ত্রী রমা হাতে পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে, ইন্দিরার জেলখানা থেকে রাজবন্দিদের মুক্তি চাই.....

— খুব ভাল, আবার প্রতিবাদ শুরু হয়েছে.....কিন্তু আমাদের দলের কী অবস্থা?

— চন্দ্রদা, ভাল নয়....আবার সংগঠিত হবার চেষ্টা চলছে....আমরা যারা আপনাদের পথে বিশ্বাসী মানে চারু মজুমদারপন্থী কিন্তু লিন পিয়ারও বিরোধী তারা রাজ্যের হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ছাড়া বিহারের কোনো কোনো জেলায় শক্তি বাড়িয়েছে.....ওইখানে প্রায় প্রতিদিন পুলিশ আর জমিদারের গুণাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কিছুদিন আগে হিন্দুস্থান টাইমসের সাংবাদিক, আমাদের সঙ্গী সত্যব্রত দত্তের ছেলে জহর মানে সুব্রত লড়াতে গিয়ে মারা গেল। তারপর বিনোদ মিশ্র সম্পাদক এখন। সবাই আমাদেরকে ভি এম গ্রুপ বলে। অন্যদিকে মহাদেবরা লিনপন্থী....সবাই ধরা পড়ে গেছে.....তবে গতবছরের ফেব্রুয়ারী মাসে ওদের পঁয়তাল্লিশ জন আলিপুর জেল ভেঙে পালিয়েছিল.....

— বাঃ! সাহস দেখিয়েছে ওরা.....জরুরি অবস্থাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এই কাজ করা দারুণ কৃতিত্বের...

— ঠিকই, সাহসের কাজ! কিন্তু বাইরে তে ওদের লুকিয়ে থাকার মতো সংগঠন নেই....অনেকেই ধরা পড়ে গেছে তারপর....

— ও আচ্ছা! কিন্তু নির্বাচনটা কবে?

— আগামীকাল.....

— তাই নাকি! তাহলে তো খুব উত্তেজনা.....

— হ্যাঁ চন্দ্রদা, সবাই উত্তেজিত....কুমারটুলির সত্যনারায়ণ সিং অনুগামী কিছু নকশাল ছেলে তো কংগ্রেস বিরোধী মিছিল বের করেছে রাস্তায়....সেদিন স্টেটসম্যানে পড়লাম নকশালদের একটি অংশ ভোট দেবার পক্ষপাতী....মহাদেবরা অবশ্য এর ঘোর বিরোধী। ওরা বলেছে যারা এরকম চিন্তাভাবনা করে তারা সংশোধনবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল....কানু সান্যালকে আক্রমণ করেছে মহাদেব....

— কানু কী বলেছে সেইটা বলুন....

কালীগঞ্জ গেলো, যাগা এ সময় নির্বাচন বয়কটের কথা বলে, তারা পরোক্ষ
খবরদারের হাত শক্ত করে...
চন্দ্রদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কানু ঠিকই বলেছে। সুকান্তি, আপনি যতজনকে
পারবেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেবার কথা বলবেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা একজোট
হয়ে অন্যান্য গামপহীদদের নিয়ে একটা জোট করা গেলে আরও ভাল হত...কারণ, মানুষ
এমনটাই চাইছে, তাই না?

ঠিক চন্দ্রদা, মানুষ এমনই চাইছে...তার সামনে প্রতিবাদের আর কোনো স্বাভাবিক
অস্বাভাবিক কোনো অস্ত্র নেই... কাগজ, সভাসমিতি, মিছিল, ধর্মঘট, সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ
কিছু হোট এখান আছে শুধু নির্বাচন.....তাই সেই হাতের পাঁচটিকেই আঁকড়ে ধরতে চায়
তারা ...

আমি তো বলেছি, জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ.....মানুষ চাইলে আমরা তার
বিরুদ্ধে দাঁড়াব কেন? তাদের সঙ্গে থেকে পরবর্তীতে এইটি বোঝাবার চেষ্টা করব হাতবদলে
মূল সমস্যার সমাধান হয় না কিন্তু আপাতত অত্যাচার কমাতে যদি ভোট দিয়ে শাসক
পাল্টাতে হয়, হবে....

একটু ধৈর্য চন্দ্রদা বললেন, তবে মানুষ কী যথেষ্ট রেগে আছে? কী মনে হয়?
চন্দ্রদা, মানুষ ভেতরে ভেতরে গুমরোচ্ছে.... একটু এদিক-ওদিক দেখলেই ফেটে
পড়ছে...এই তো সেদিন রাস্তার সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—

সে কী! মাইট শো'য়ে সিনেমা দেখতে আজকাল।রেবার সঙ্গে নাকি?
... আরে না না। উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা ময়, পেছনের সারিতে বসে এক কমরেডের
সঙ্গে ফিস ফিস করে জরুরি কথা বলে নেওয়া.....গয়া থেকে এসেছিলেন কমরেড
জালপাতাল....

তারপর কী হল?

মূল সিনেমা আরম্ভের আগে সরকারি তথ্য প্রচারে ইন্দিরাকে পর্দায় দেখান হল।
বাস! সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চিংকার....ডব্রমহিলার নামে অল্লীল গালাগাল.....অকথ্য খিঁজি
ওক হয়ে গেল....

বলেন কী! চন্দ্রদা হাসতে আরম্ভ করলেন। চন্দ্রদার গলা পাতলা। হঠাৎ সেই গলা
নাশীর হয়ে গেল। হি - হি - হি - হি। ধোঁয়ার ওপারে করবীর মুখ। কাকা, একা বসে-
গেসে হাত নেড়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন?

সুকান্তি লজ্জা পেলেন। না না, আসলে এই সময় রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটি....আপন মনে
কথা গল....অনেকদিনের অভ্যেস....সেইজন্যই বোধহয়....

না, কাকা আজ আর বেরোবেন না, চতুর্দিকে পুলিশ, করবী বলল। ও ঠিকই
বলেছে। ভোট উপলক্ষ্যে পুলিশের সংখ্যা বেড়ে গেছে। রাস্তায় হাঁটলে বিপদের সম্ভাবনা।
সুকান্তি মাথা নাড়লেন, ঠিকই বলেছে, সেইজন্যই বেরোচ্ছি না।

কখনও খুম, কখনও জাগরণে রাস্তারটা কোনোরকমে কাটে। ডোর সাড়ে চারটেয়
বিজ্ঞানায় উঠে এসেন সুকান্তি। জানালার বাইরের অন্ধকারে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। করবীও
উঠে পড়েছে। জনতা স্টোভে চায়ের জল চাপায়। হাত মুখ ধুয়ে শটে মাথা ঠেকিয়ে,

চা দেয় সবাইকে। গোকুল উঠে পড়ে। লক্ষ্মীমণিও। দ্রুত আলু-চিড়েভাজা বানায় করবী। জলখাবার। গোকুলও প্রস্তুতি নেয়। সকাল-সকাল ভোট দিতে যেতে হবে। না হলে যদি সেই পাঁচ বছর আগে বাহাস্তরের মতো ভোটকেন্দ্র দখল করে ছাণ্ডা মারে ওরা। নতুন পক্ষী জেগে উঠেছে। সবাই দলে-দলে বেরিয়ে আসে। এবার নিজের ভোট নিজে দেওয়া চাই।

গুছিয়ে বেরোবার মুখে লক্ষ্মীমণি আবদার করেন, তিনিও ভোট দেবেন। তাই নাকি? গোকুল বিস্মিত। ভদ্রমহিলা মাথা নাড়িয়ে হাসেন, হ্যাঁ দেব, দিতেই হবে। ওরা তো আমাদের গরু-বাছুর ভাবে, অন্তত একদিন বোঝাই আমরা তা নয়। সুকান্তির গায়ে কাঁটা দেয়। শরীরের যন্ত্রণা নিঃশব্দে হজম করে উঠে বসবার চেষ্টা করেন ভদ্রমহিলা। কী জামাইবাবা, আমায় নিয়ে যেতে পারবি নে? গোকুল চুপ করে যায়। কীভাবে নেওয়া যাবে? করবীও দিশা খুঁজে পায় না।

ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে না-বলা কথাটি পড়ে ফেলেন সুকান্তি। ওর যাওয়া মানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট। এখন প্রতিটি ভোট দরকারি।

দাঁড়ান কিছু একটা ব্যবস্থা হবে, সুকান্তি মৃদু হাসেন। বুধিয়াকে ডেকে পাঠান। ঠক ঠক করতে করতে বুধিয়া এসে দাঁড়ায়। সমস্তটা বিস্তারে বলেন সুকান্তি। এমনকী লক্ষ্মীমণির শেষ বাক্যটিও বাদ পড়ে না। বুধিয়া মাথা নেড়ে, হ্যাঁ তুলে বলে, হবে হবে উপায় জরুর হবে কিছু।

উমেশকে নিয়ে ফিরে আসে বুধিয়া। উমেশের হাতে পিঠে জড়ান মোটা দড়ি। একেবারে নতুন। একটি হাতল-ওলা চেয়ার জোগাড় হয়ে যায়। চেয়ারে বসান হয় লক্ষ্মীমণিকে, দড়ি দিয়ে চেয়ারটি নিজের পিঠে বেঁধে নেয় উমেশ। জয় বজরঙ্গবলী....। হাঁক পেড়ে চেয়ারে বসা লক্ষ্মীমণির ভার পিঠে তুলে নেয়। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সাবাসী দেয় উমেশকে।

শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে উমেশ। নিশ্চিত কদমে হেঁটে যায়। তার পিছনেই করবী। ঠক-ঠক করতে করতে চলেছে বুধিয়া। তারপরেই গোকুল। ওদের পাশেপাশে চলেছে কলোনির অন্য মেয়েরা। ছেলেরাও। সুকান্তি দেখেন জানালা দিয়ে। গত তিন দশকে ভোট দেবার জন্য মানুষের এমন মরিয়া ভাব আর দেখেননি তিনি। বাড়ির কথা মনে পড়ে। রেবা সুরভি নিশ্চয় ভোট দেবে। এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই দেবে, তিনি নিশ্চিত। তাঁর ভোটটি নষ্ট হবে। ও পাড়ায় যাওয়া সম্ভবই নয় এখন। তবে অন্য কেউ যাতে তাঁর ভোট না দিতে পারে, সে ব্যবস্থা রেবা করেছে...

দু-ঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা ফেরৎ আসে। ঘরের সামনে দুটো খেঁকুরে চেহারার ছেলে উমেশের পথ আটকায়। কি রে, কাকে ছাপ দিলি? গাই-বাছুর তো? উমেশ দাঁত বের করে মাথা নাড়ে, না দিয়ে উপায় আছে? এখানে থাকতে হবে তো....। ছেলেদুটো হাসে। তৃপ্তির হাসি। বউদি....? করবী মাথা নেড়ে বলে, আমরা তো সব একসঙ্গে গিয়েছিলাম, দেখছ না? ছেলে দুটি সবাইকে একবার দেখে নেয়। লক্ষ্মীমণিকে হিসাবের মতোই নেয় না। বুধিয়াকেও না। দাদা?...দাদা কোন দিকে মারলেন? লালপাটি নয় তো? গোকুলের দিকে তাকায় ওরা। গোকুলের হাত মুঠো। স্পষ্ট দেখতে পান সুকান্তি। অঘটন ঘটে যাবার

আমার কনকী বলল, ঠাট্টা করছ দাদাভাই? জিতলে কলোনিতে বিদ্যুৎ আসবে...ইলেকট্রিক লাইন কাটাতে কে না খেতে চায় বল? আর তাজ্জড়া উল্টো পাটির কাউকে তো চোখেই দেখলাম না। ছেলেদুটো দাঁত বের করে হাসে। এ মহিমায় ঢুকতে পেলে তো! ডানদিকের ছেলটি বলে, এ গর্ভদ পুরো ফিট...পুরো আমাদের লাইনের....। অন্যজন বলে, বউদি একদিন এসে চা খেয়ে যাব। করবীকে আপাদমস্তক দেখে। প্রথমজন বলে, চল চল ওদিকে যাও। দুজনেই চলে যায়।

গোকুল ঘরে ঢুকে গজগাতে থাকে। শালারা ভেবেছেটা কী...যাবার সময়েও ওদের অন্য ডিআজ্ঞা জ্বালিয়েছে। কোনো অনুরোধ নয় একেবারে ধমকি দেয় ওদের ভোট দেবার জন্য। সুকান্তি হাসেন। শান্ত হও...ঠাণ্ডা মাথায় লড়ে যেতে হবে...গেরিলা লড়াই। বুধিয়া হাসে, চুপকে চুপকে উলটো চিহ্নে চাপ মেরেছে সে। উমেশও তাই। লক্ষ্মীমণি বলেন, না ওয়া গার্টে বাত ধরেছে, মনে তো আর ধরেনি। ঠিক কী না বেয়াইমশাই? সুকান্তি চাত্তালি দেন। আরে বেয়ান, আপনি তো একেবারে বীরঙ্গনার মতো লড়ে গেলেন....

কিছুক্ষণ পরে খবর আসে, ভোটের কেন্দ্র দখল করেছে তেরঙ্গা পার্টি। দরজা বন্ধ করে পলাতন হয়ে ভোট দিচ্ছে। বোমার আওয়াজ আসে। লাঠি চালনার খবরও। তবে কী হানান যাবে না ওদের? নানান কেন্দ্র থেকে খবর আসে গণ্ডগোলের। তবে কী মস্তানদের আশা আনিবার?

পরের কয়েকটি দিন টানাপোড়েন চলল। উড়োজাহাজে ভরে যায় পল্লী। ২০ মার্চ রাত্তিরে জেগে থাকেন সুকান্তি। বেতারে খবর আসছে ভোটের ফলাফল। প্রথম খবর আসে সঞ্জয় গান্ধী পরাজিত। সুকান্তি উঠে বসে বিছানায়। বাঃ বেশ খবর! সমুচিত জবাব পেয়েছে উদ্ধৃত্য। মাঝরাতের খবর — ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত। অবিশ্বাস্য ঘটনা। সুকান্তি উত্তোজিত গলায় চিৎকার করেন, গোকুল, গোকুল উঠে পড়...। কী করে যেন নিমেষে খবর ছাড়িয়ে পড়ে খালপাড় পল্লীতে। উমেশ ঢোল বাজায়। বুধিয়া ঠক ঠক শব্দ তুলে ছুটে আসে। কাকাবাবু তরাজুর অন্যাপান্না ভরে দিয়েছে সবাই। হা-হা...। উম্মাদের মতো হাসতে থাকে বুধিয়া। সব খাসির অভিশাপ লেগেছে। দেখবেন কাকাবাবু এতেই শেষ নয়। দেখবেন কাকাবাবু দেখবেন....। কলোনির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ায় বুধিয়া। গোকুলের ঘরের বেতার ধারাবিবরণী দিয়ে চলে। উত্তর মধ্য পূর্ব পশ্চিম ভারতে কংগ্রেস চরমার। সংসদে সংখ্যালঘু। রাজ্যে জয়ী হয়েছে বামফ্রন্ট।



চলচরে খোর অঙ্ককার। তার মধ্যেই নদী অতিক্রম করতে হবে। সেতুটি প্রশস্ত নয় একেবারেই। পাশাপাশি দুজনে হাঁটা অসম্ভব। একজনকেও যথেষ্ট সাবধানে পা ফেলতে হয়। কারণ দুধারে কোনো বেড়া নেই। নিচে উচ্ছাসহীন, মসীবর্ণ জলরাশি। ভাবলেশহীন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মহাকাল যেন। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেই নির্বিকার চিন্তে

আত্মস্থ করে নেবে। সেতুর সামনের শুভ্র অবধি যেতে পারলে একটু দম নেওয়া যায়। পায়ে পায়ে সেতুর মাঝামাঝি পৌঁছতেই পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল কোনো দূরপাল্লার রেলগাড়ি। গম্ গম্ শব্দ। পায়ের তলার ধাতব পথ কেঁপে উঠল। রেলগাড়ির প্রতিটি কামরার আলো দ্রুত স্পর্শ করে সরে যাচ্ছে। আওয়াজে কিছু হয়নি, পায়ের নীচের অবলম্বন কম্পিত হতেও নয়, আলোর স্পর্শে মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হল। মহাকাল অপলক তাকিয়ে। অবিকল কুমিরের চোখ!

নীচে পড়বার মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল পাঞ্চালীর। এই স্বপ্ন সে আগেও দেখেছে। কেন যে বারে-বারে ফিরে আসে এমন ভয়াল অন্ধকারের ছবি! জানলা দিয়ে আকাশ দেখল সে। অন্ধকার ফিকে হয়নি এখনও। ঘড়িতে চারটে বেজে দশ। বাতাসে শিরশিরে ভাব। গায়ের চাদর সরিয়ে বিছনা থেকে উঠল পাঞ্চালী। পাশের টেবিলে রাখা ঢাকা দেওয়া গেলাস থেকে জল খেল। অ্যালার্ম ঘড়ি ঠিকঠাক। খাতাবইগুলির উপর হাত রাখল একবার। ট্রানজিস্টারটিকেও ছুঁয়ে নিল। আলনার পাশে রাখা চামড়ার সূটকেশটি যথাস্থানে। আলনার শাড়ি অন্তর্বাস সব যে যার নিজ জায়গায় ঘুমোচ্ছে। দরজার খিল তোলা। ছিটকিনি বন্ধ। বাথরুম ঘুরে এসে আবার শুয়ে পড়ল পাঞ্চালী। সামনের বাড়ির আলসেতে চারটি কাক চুপচাপ বসে। এখনও ঘুম ভাঙে নি ওদের! তবে গ্রে স্ট্রিটের এই একতলার ঘর থেকে হাতিবাগান বাজারের ব্যস্ততা ঘুরে পাওয়া যায় বেশ। বিক্রেতারা যে কত ভোরবেলা ওঠে তা বোঝার উপায় নেই। রাত্রেও তো অনেকক্ষণ জেগে থাকে ওরা....।

কিছু কিছু স্বপ্ন আছে, চুষকের মতো স্বপ্ন। এ স্বপ্ন তেমনই। বিগত কয়েকমাস ধরে তার ঘুমের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে। ঘুম ভেঙে গেলেও রেশ থাকে বহুক্ষণ। মন খারাপ হলেও একে এড়ান যায় না কিছুতেই। এ যেন অতীতের কিছু ঘটনার চাবিকাঠি। স্বপ্ন দেখা দিলে অতীতের স্মৃতিগুলিও আসবে। যথারীতি, এই ভোররাত্রেও এল।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবার পরেই বন্দিমুক্তি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পাঞ্চালী গিয়েছিল বাড়িতে। তাকে এতদিন পরে দেখে মা-দাদা-বৌদি সব আত্মীয় পরিজনদের কী আনন্দ! কথা আর ফুরোতে চায় না। একটি কথার সূত্রে অন্য কথা, তার সূত্রে আবার অন্য কিছু। জেলের বাইরে এসে পূর্বপরিচিতদের খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে। পাঞ্চালী প্রথমেই গেল মগরায়, নিবারণের কাছে। উনি যথারীতি বাগানে হাঁটাচলা করছেন। হাতে আঁকশি। চতুর্দিকে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। পেয়ারাগাছের ডাল বেয়ে কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়াচ্ছে। শব্দ করছে — চিক্ চিক্.....চিক্ চিক্ চিড়িক্চিড়িক্ চিক্....। বেড়ার দরজা খুলে ঢুকতেই কাঁচ কাঁচ আওয়াজ হল। নিবারণ ফিরে তাকালেন না। হয়তো শ্রবণে সমস্যা হয়েছে, কিংবা অন্যমনস্ক। ঘর থেকে কমলা বেরিয়ে এল। আরে! কেমন আছ! — ভালো.....হাসল পাঞ্চালী। বলল সব কথা।

কমলা শিবনাথ এ বাড়িতেই থাকে এখন। ওদের ছোট ছেলেটা বড় হয়েছে। একদম দ্রোণের মতো দেখতে, বলল কমলা। নিবারণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পাঞ্চালী। মানুষটির শরীরে বয়সের ছাপ পড়েছে এইবার। দেহ শীর্ণ, চামড়া শিথিল, চুলের ঘনত্ব কমে গেছে।

এর লায়ন হাত দিয়ে লায়ন লায়ন কল পাওয়া। কে?.... নিবারণ খোলাটে চোখে তাকালেন। আমি পাঞ্চালী। কল্লের মনে হাসলেন বৃদ্ধ। — ও হৈম.... তুমি এলে।এস, এস....। পাঞ্চালী হতভম্ব। তার মধ্যে নিজের স্ত্রীকে আবিষ্কার করেছেন বৃদ্ধ! — এস, এস....। তাকে টেনে নিয়ে গেলেন পেয়ারাগাছের তলায়। — নাও, পেয়ারা খাও....। আঁকশিটা পাঞ্চালীর হাতে দিলেন নিবারণ। — নাও পাড় পাড়.... ডাঁসা দেখে পাড়। বৃদ্ধের মুখে শ্মিত হাস।

তিনটে পেয়ারা পাড়ল পাঞ্চালী। একটা এগিয়ে দিল বৃদ্ধকে, অন্যটি কমলাকে। পেয়ারা হাতে নিয়ে নিবারণ হাসলেন। — হ্যাঁ.....এইটা আমি এখনও খেতে পারি। জান, আমার সব কিছু নড়ে গেছে, দাঁত কিন্তু এখনও তেমন শক্ত। তোমার মনে আছে হৈম, দাঁতে ছুঁলে কেমন আঁখ খেতাম আমরা? পাঞ্চালী স্তব্ধ। কী বলবে এই বৃদ্ধকে? কমলা মৃদুস্বরে বলল, কখন যে কোন জগতে ঘুরে বেড়ান হৃদিশ পাওয়া মুশকিল। নিবারণের হাত ধরল কমলা। বাবা, এ পাঞ্চালী.....পাঞ্চালী.....মা নয়, ভাল করে দেখুন। এইবার বৃদ্ধের চোখে ঐকিক দিল। — ও খুকুমণি এসেছি.....আয় আয়.....ছেলে কোথায়? পাঞ্চালী উত্তর দেবার আগেই বললেন, বুঝেছি পরে আনবি....।

ঘরের ভেতরে গেলেন নিবারণ। শৈল আচার্যের হিসাবের খাতা নিয়ে দাওয়ায় ফিরে এলেন। ছেলেকে বলবি, কদিন আগেই, এই তো সপ্তমাসের জুন মাসে রেফ্রিজারেটর কিনেছি। দাম পড়ল ৪৭২১ টাকা। এর মধ্যে শুধু ৬ টাকার বকশিস আছে। কমলা বলল, এই রে শুরু হল....। নিবারণ সোজা টাকালেন পাঞ্চালীর দিকে। কিন্তু চোখের তারা কাঁপছে। দিনকাল ভালো নয়, বুঝেছি খরচ করবি। যে হারে জিনিসের দাম বাড়ছে, সংসার চালান মুশকিল।দাম না ১৯৭৪-এ পুজো বাজার হল ৫৭৩ টাকা ৯ পয়সায়, প্রায় একই জিনিস কিনতে পাঁচাস্তরে খরচ হয়ে গেল ১২১১ টাকা ২৯ পয়সা। নিবারণের ধারাবিবরণী চলল। দুটি জিনিসের দাম বহুদিন পরে বেড়েছে — রেডিও লাইসেন্স ১৫ আর জুতো পালিশ। ১৯৭৫-এ রেডিও লাইসেন্স ফি বছরে ১৮ টাকা। আর জুতো পালিশ ১৫ পয়সা। আগে ছিল ১০ পয়সা। কেরোসিন লিটার প্রতি ১ টাকা ৭ পয়সা।

পাঞ্চালীর সামনে দাঁড়ালেন নিবারণ। শোন খুকুমণি শোন.....ছেলে তো পড়তে ভালবাসে এজন্য পাঁচাস্তরের ১৯ মার্চ শরৎসাহিত্য কেনবার ফরমশ করে এসেছি, অগ্রিম দিতে হয়েছে ২৫ টাকা। নিবারণ হিসাবের খাতার পাতা উল্টালেন। পাঞ্চালী কোনো উত্তর দিল না। একবার কমলার দিকে তাকাল। ওরও অসহায় অবস্থা। ...এই যে ১৯৭৬-এর হিসাবটা দেখ আর সাতাস্তরের দিকেও তাকা। নিবারণ চলে এলেন সাম্প্রতিক বাজারদরে। ছিয়াস্তরে সর্বের তেল কেজি প্রতি ৬ টাকা। এই সাতাস্তরে তা হল ১১ টাকা। এক বছর আগে যে চাল এক কেজি ২ টাকা ৪০ পয়সা, এ বছর তা ২ টাকা ৭০ পয়সা। কেরোসিন এখন লিটার প্রতি ১ টাকা ২৮ পয়সা, চুল ছাঁটতে ১ টাকা....। কী করে চালাবে মানুষ বল? নিবারণ তাকাল। পাঞ্চালী নিরুত্তর। ভদ্রলোক আর কথা গোপন অবস্থায় নেই। কমলাকে ইঙ্গিত করে পাঞ্চালী চলে যাবার জন্য এগোয়। কমলা বলে, আমার এস। পাঞ্চালী মাথা নাড়ে।

নিবারণের দারাপাত চলতে থাকে। লুঙ্গি সেলাই সহ ১৯ টাকা ৮০ পয়সা.....একটা

মহাভারত ৭৮ টাকা... পূজাবার্ষিকী ১০ টাকা ৫০ পয়সা....।

নিবারণের কাছ থেকে ফেরার পথে মনখারাপ হয়েছিল পাঞ্চালীর। ওঁর স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে। হয়তো ভালই। স্মৃতি অটুট থাকলে দ্রোণ আর নিক্রপমের জন্য কষ্ট বাড়ত নিশ্চয়ই। বাড়ি ফিরে আবার মন ভাল হয়ে গেল। দাদারা হইচই করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। ওরা মাথায় করে রেখেছিল। কিন্তু পাঞ্চালী স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। জীবন-নির্বাহের উপায় খুঁজতে আরম্ভ করল সে। অচিরেই বোঝা গেল জেলের বাইরে জীবনযাপন কম শক্ত নয়। সব নামী সংস্থাতেই চাকরিতে ঢোকবার বয়ঃসীমা আছে। তার প্রাপ্তসীমা পেরিয়েছে পাঞ্চালী। তার ওপর নকশালকে কেউ চাকরিতে নিতে চায় না। কলেজ পাশ করবার পর ছাঁসাত বছর যে পরিচিত বাঁধান রাস্তার বাইরে সম্পূর্ণ অন্য জীবন কাটিয়ে এসেছে তার পক্ষে জীবিকার উপায় বের করাই দুরূহ। আতান্তরে পড়ে গেল পাঞ্চালী। তবে কী বাকি জীবনটা বাড়িতেই কাটাতে হবে? দাদারা আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাঞ্চালী সেই অনুদান নিতে রাজি নয়।

নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করতে উপায় পাওয়া গেল। সমাজচিত্র পত্রিকার সম্পাদক পুলকেশ ঘোষ পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির লোক। উনি সুকান্তিদাকে চেনেন। মেধাবী নকশালদের প্রতি উনি সহানুভূতিশীল। পাঞ্চালীকে ভাল লেগে গেল তাঁর। চাকরি হয়ে গেল। মাসিক বেতন ১৭০ টাকা। লেখার প্রুফ সংশোধন, ছাপাখান পাঠান, পত্রিকা বিতরণের ব্যবস্থা সব কিছুতেই অংশ নিতে হবে পাঞ্চালীকে। নিজে হবে আকর্ষক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার। সম্পাদকের ধারণা মেধাবী নকশালদের অভিজ্ঞতা জানবার উৎসাহ আছে পাঠকের। কাজে যোগ দেবার প্রথম দিনেই পুলকেশবাবু বসেছিলেন, আপনার জানাচেনা কমরেডদের মধ্যে যাদের জীবনটা বেশ রোমাঞ্চকর, নাটকীয় আছে তাদের সাক্ষাৎকার নিন, সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখা তৈরি করুন। চমৎকার বিষয়। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলা যায়? অনেক ভাববার পর সুকান্তিদার কথা মনে এল। পাঞ্চালী খোঁজ করেছিল। কিন্তু উনি এখনও প্রকাশ্যে আসেননি। অন্যান্যদের খোঁজখবর শুরু করল পাঞ্চালী। মাঝে একবার কনকেন্দু সান্যালের খোঁজ করেছিল। ওর সেই ডায়েরি পেলে মন্দ হয় না। বড়বাবুর অত্যাচারের বিবরণী ছেপে দেওয়া যাবে। মানুষ জানবে পুলিশ কি নির্মম কাণ্ড করেছে সেদিন। কাগজের অফিস থেকে ফোন করে জানা গেল কনকেন্দুবাবু স্বৈচ্ছাঅবসর নিয়েছেন।

— বাড়ির ঠিকানা?

— উনি তো এখন মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি! এরপরে আর যোগাযোগ করা হয়নি।

পত্রিকার পাশাপাশি দুজন ছাত্রীকে পড়াবার কাজ জুটে গেল। মাস গেলে কুড়ি-কুড়ি চল্লিশ টাকা। গ্রে-স্ট্রিটে এক কামরার ঘরের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। মাসিক ভাড়া ৭০ টাকা। ঘরের ব্যবস্থা হতেই ব্যাঙেল-বলাগড় রোডের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে পাঞ্চালী। মাঝে মাঝে বাড়ি যায়, সবার সঙ্গে দেখা করে আসে। সম্পর্কের সুস্থতা রাখতে এই দূরত্বটুকু দরকার।

অ্যালার্ম বাজতেই সচকিত পাঞ্চালী। আর শুয়ে শুয়ে আলস্য করলে চলবে না। উঠতে হবে। অল্প কিছু বাজার। সকালের চা-বিস্কুট-পাঁউরুটি। খেয়েই বেরোতে হবে পড়াতে

মদন মিএ পেন। বেথুন স্কুলের ছাত্রীটির হালকা ভূর। স্কুলে যাচ্ছে না। এট কাদা দিনের বেলায় পড়িয়ে যেতে বলেছেন ওর বাবা। ফেরৎ এসেই স্নান খাওয়া করে পত্রিকার দপ্তর।

দপ্তরে ঢুকতেই পুলকেশবাবু ডেকে পাঠালেন। কথা আছে। ধূতির খুঁট দিয়ে মোটা কাপো ফ্রেমের চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছিলেন পুলকেশ। পাঞ্চালী ঘরে ঢুকতেই বললেন, এসুন....। পাঞ্চালী চেয়ার টেনে বসল। চশমা পরে সোজা তাকালেন পুলকেশ।

মরিচকাপি সম্পর্কে কিছু জানেন?

মোটামুটি জানি। পাঞ্চালী বলল।

সরকার ওদের অবরোধ করেছে, ওই দ্বীপে খাদ্য পানীয় কিছু নিয়ে যেতে দিচ্ছে না....

এ তো অমানবিক বর্বরতা। পাঞ্চালী তীব্র চোখে তাকাল।

পুলকেশ মাথা নাড়লেন। ঠিক তাই। একমাত্র আনন্দবাজার ছাড়া আর কেউ তেমন লিখে না ওদের নিয়ে...। পুলকেশ অন্যান্যনস্ক হয়ে গেলেন। ক্ষমতায় আসার মাত্র দু বছরের মধ্যে এতটা হিংস্র কেউ হতে পারে!ভাবা যায় না....।

পাঞ্চালী বলল, আমি ওদের নিয়ে লিখব....।

পুলকেশ বললেন, আমি এইটাই চাইছিলাম, বলতে সংকোচ হচ্ছিল...বেশ ঝামেলা কিন্তু....আপনি যেতে পারবেন? — হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, পাঞ্চালী মাথা ঝাঁকাল। পুলকেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুব ভাল....তাহলে অখিলকে ডাকছি....অখিল কীর্তনিয়া....ও উদ্বাস্ত সর্মাণের সভা। কুমিরমারি হয়ে মরিচকাপি....ওই আপনাকে নিয়ে যাবে।

অখিল জানাল, কুমিরমারিতে অনেক পুলিশের চর। ওরা কাউকেই মরিচকাপি যেতে দিচ্ছে না। সাংবাদিককে তো নয়ই উদ্বাস্তপরিচয় নেওয়া দরকার। পাঞ্চালী মাথা নাড়ল। আগামীকাল সকালে কয়েকটি কাজ সেরে দুপুর দুটোয় অখিল পৌছে যাবে শিয়ালদহ স্টেশনে। সাউথ স্টেশনের টিকিটঘরের সামনে সে অপেক্ষা করবে। পাঞ্চালী হাসল, ঠিক আছে। অখিল চলে গেল। পুলকেশবাবু বললেন, শুনুন....সঙ্গে গরম চাদর নেবেন, ওদিকে ঠাণ্ডা হবে এখন। টেবিলের ওপর রাখা একটি সাদা খাম তুলে এগিয়ে দিলেন ডপ্তরালোক। এইটা রাখুন...। কী? পাঞ্চালী ভুরু তুলল। একশো টাকা... রাহাখরচ বাবদ অগ্রিমফিরে এসে হিসাব। হাসলেন পুলকেশবাবু।

যাবার আগে মরিচকাপি নিয়ে পুরনো পড়াশুনো একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। তার সংগ্রাহের পত্র-পত্রিকাগুলি দেবরাজ থেকে বের করে চোখ বুলোতে শুরু করল পাঞ্চালী। ১৯৭৮ সালের মার্চে দল্লকারণ্য থেকে এক লক্ষেরও বেশি বাঙালি উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে আসেন সুন্দরবনের মরিচকাপি দ্বীপে নিজেদের উদ্যোগে বসতি স্থাপনের জন্য। তারা সরকারের কাছে কোনোরকম অর্থসাহায্য চাননি। তারা ঠিক করেছিলেন চাষ আবাদ করে, মাছের ডেড়ি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। সরকারের কাছে তারা শুধু ওই দ্বীপে থাকার অনুমতিটুকু চেয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে তার নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই উদ্বাস্তরা এসেছিলেন এ রাজ্যে। অতীতে উদ্বাস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই বামফ্রন্টের নেতারা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন আন্দামানে পূর্ববঙ্গ

থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নেন তখন এই কমিউনিস্ট পার্টিই ভূমিপুত্রের ছুতোয় সেই কাজে বাধা দিয়েছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় দণ্ডকারণের মানুষ ভাবলেন এবার তাহলে নিজভূমেই ফেরা যাক। ১৯৭৮ এর মার্চে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত লক্ষাধিক উদ্বাস্তু রাজ্যের হাসনাবাদ রেল স্টেশনে পৌঁছলে তাদের আটক করে ফেরৎ পাঠান হয়। কিছু মানুষ গ্রেপ্তার এড়িয়ে ছাড়িয়ে পড়ে। সমস্ত সরকারি বাধা অতিক্রম করে ১৯৭৮-এর ১৮ এপ্রিল প্রায় তিরিশ হাজার হিন্দুমূল মানুষ মরিচঝাঁপি দ্বীপে পৌঁছে যান। পরবর্তী ন'মাসে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় লবণাক্ত জলে ঘেরা জনশূন্য অরণ্যসংকুল এই দ্বীপে তারা এক জনপদ গড়ে তুলেছেন। সেখানকার মানুষকে প্রতিপদে হেনস্থা করছে সরকারি পুলিশ। গত সেপ্টেম্বরে বন্য়ার সময়ে ওরা উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দিয়েছে। তারপর এই ১৯৭৯'র ২৪ সেপ্টেম্বর ওদের অমানবিকতা চরমে — পাশের দ্বীপ কুমিরমারি থেকে খাদ্য, পানীয় জল মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাওয়া আটকে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই অবরোধ চলছে! এই উদ্বাস্তুরা কারা? খুলনা, যশোর, ফরিদপুর থেকে আসা দরিদ্র কৃষক। অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। একাংশ পৌত্তলিকব্রিয়। মরিচঝাঁপির অবস্থানটা কোথায়? সুন্দরবনের কুমিরমারির দক্ষিণে। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল, প্রস্থে আট মাইল।

দণ্ডর থেকে বেরোতে কিছু দেরি হয়ে গেল। হেঁটেই ঘরে ফেরে পাঞ্চালী। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির ভেতরে কাঁসর ঘন্টা বাজছে। সংলগ্ন ফুটপাথরত একটি লোককে দেখে থমকে গেল সে। লোকটি রুদ্রাক্ষের মালা, কাঠি, কবচ — তাবিজ এইসব বিক্রি করছে। একটি কণ্ঠি আর একটি রুদ্রাক্ষের মালা কিনল পাঞ্চালী। কালীবাড়ির পাশের দোকান থেকে কিনে নিল কিছুটা প্যাঁড়া। আর জবা ফুলে একটি চন্দনও কিনল। দশ-বারোটি দোকান ছাড়াতেই কাপড়ের দোকান। সেখান থেকে শাড়ির দৈর্ঘ্যের গেরুয়া থানকাপড় কিনে নিল একটা। এই পোশাকেই সে যাবে মরিচঝাঁপি। তার সঙ্গে গলায় কণ্ঠি, কপালে চন্দন, হাতে জপের মালা। মাঝে মাঝে নাম জপ করবে!....

অখিলের সঙ্গে চলল পাঞ্চালী। কাঁধের ঝোলায় খাতা কলম ছাড়াও শাড়ি চাদর চিড়ে গুড় নিয়েছে। ক্যানিং পর্যন্ত ট্রেন। তারপর লঞ্চ চেপে ওপারে। পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ডাঙায় নেমে কিছুটা হাঁটবার পর জনবসতি পাতলা। মাঠ, ক্ষেত, দূরে জঙ্গল দেখা যায়।

একটি চায়ের দোকানে নিয়ে এল অখিল। দোকান চালায় হাষীকেশ মাঝি — কুড়ি-একশ। অখিল বলল, রাতটা এইখানে কাটিয়ে সকালে আবার কিছুটা হেঁটে পৌঁছতে হবে কুমিরমারি। তারপর নৌকায় মরিচঝাঁপি। হাষীকেশও সঙ্গে যাবে। এই কদিন ওর দোকান সামলাবে ওর ছোটভাই সুবল — কুমিরমারিতে থাকে।

সন্ধ্যা ঘন হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল দূর থেকে দুটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। এদিকেই। ওদের হাতে আলো। নির্ধাৎ পুলিশের চর, অখিল বলল। অথবা পার্টির লোকও হতে পারে। ওদের কয়েকজনও তো পুলিশের সঙ্গে মিলেমিশে উদ্বাস্তু আর সাংবাদিক খেদাচ্ছে! ওদের কথায় এরা দু-দলই নাকি বহিরাগত! অখিল হাসল। শ্লেষের হাসি।

পাঞ্চালী বলল, চিন্তা কর না। বলবে আমি শ্রীশ্রী রামদাস তুকারাম ঠাকুর বাবাজির আশ্রম থেকে এসেছি। সামনে উৎসব। তাই খবর দিতে এসেছি দুই ভক্তকে। চোখ আধবোজা করে জপ করবার ভঙ্গি করল পাঞ্চালী।

হঠাৎ যদি বৃষ্টি পড়ত, দু'জনের নাম জানতে চায়? অখিল বলল। তার চোখে মুখে উদ্বেগ।

চিন্তা নাই। হৃষীকেশ মাথা নাড়ল। চিন্তা নাই....বলব মালতী বৈরাগী আর সুমতি মন্ডল....ঠিক আসে? অখিল হাসল এইবার, ঠিক আসে।

আগন্তুক দুটি পুলিশের চর। ওরা জানতে চাইল। কোনো নতুন লোক এসেছে এ ওয়ার্ডে? হৃষীকেশ, অখিল দুজনেই জোরে মাথা নাড়ল। নাঃ। জপে নিমগ্ন পাঞ্চালীকে আলাদা করে ওয়ার্ডেই করল না পুলিশের ছানারা। ওরা চলে যাবার পর অখিল জোরে শ্বাস নিল। যাক, বাঁচা গেল। পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশ বলল, এইবার চক্ষু খোলেন....। পাঞ্চালী চোখ খুলতেই হৃষীকেশ হাসল। — যা একখান ভড়কি দিসেন.....পুলিশ একেরে কুপোকাৎ...আমারে আপনার চেলা কইরা নেন। পাঞ্চালী চোখ পাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, হঃ! অখিল, হৃষীকেশ দুজনেই হেসে উঠল।

চা-দোকানের চালের নিচে একটি মাচা আছে। ওই মাচায় শুয়ে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু ওইখানে ওঠা হবে কীভাবে? দোকানের পেছন থেকে একটা ল্যাকপ্যাকে বাঁশের মিড়ি নিয়ে এল অখিল। পাঞ্চালী তরতর করে উঠে গেল। অখিল আর হৃষীকেশ শোবে নিচে, বেঞ্চি জোড়া করে। মাচায় শোয়া বেশ মজার। একটু নড়লেই মচমচ শব্দ। পাশ ফিরলেই দুলে উঠছে। দুলতে দুলতে ঘুম এসে গেছে।

ভোর হতেই ঘুম ভেঙে গেল পাঞ্চালীর। অখিল আগেই উঠে পড়েছিল। চলুন, তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। সকালের কাজকর্ম সেজেইটা শুরু করল তিনজনে। অঙ্ককার পাতলা হয়ে আসছে। কাদা শুকিয়ে মাটির পথ একটু খেবড়ো। মাঝে মাঝে আলপথ ধরে হাঁটতে হচ্ছে। এমন রাস্তায় বহুবার হেঁটেছে পাঞ্চালী। সেজন্য খুব কিছু অসুবিধা হল না।

যেখানে এসে দাঁড়াল ওরা, সেই কুরানখালি নদীর ওপারেই মরিচঝাঁপি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবুজ বনভূমি। বৃকের ভেতরটা উদ্বেজনায় গুড়গুড় করে উঠল। ঘুরে আসতে পারলে দারুণ লেখা হবে। ওখানকার মানুষজনের মুখের কথা নিয়ে এখনও অবধি কেউই লেখেননি।

কিন্তু মরিচঝাঁপি ঘিরে পাহারা। সরকারি বাম্পীয় শকট 'গঙ্গালহরী' পরিক্রমা করে চলেছে দ্বীপ। শব্দ উঠছে ভট্ ভট্ ভট্ ভট্....। ওদের শ্যানদৃষ্টি। কোনো নৌকা দেখলেই কাছে এসে ফাঁস বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ভেঙে দিচ্ছে, যাতে আর ব্যবহার না করা যায়। কী নির্মম ওরা! কুমিরমারির নৌকাঘাটে দাঁড়িয়ে মন খারাপ হয়ে গেল পাঞ্চালীর। ওরে কী ওপারে যাওয়া যাবে না? সামনেই মরিচঝাঁপি। নদীর উপরে যেন বৃহৎ এক কঙ্কণের পৃষ্ঠদেশ। ওপারের দু-একটি ঘর, কয়েকজন অধিবাসীকে দেখা যাচ্ছে এপার থেকেই। যে করেই হোক যেতে হবে। মরিয়া ভাব এসে যায় পাঞ্চালীর। — হৃষীকেশ ডাট, কিছু একটা কর, বলল পাঞ্চালী। অখিল আমি যাবই।

পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশ হাসল, একটু সবুর করেন, দেখতিসি....। ছেলোটির চোখে মুখে বুদ্ধি। একখান ছিপ জোগাড় করে আনতিসি। গঙ্গালহরীর দিকে আঙুল তুলে অখিল বলল, কিন্তু ওরা দেখতে পেলেই তো যাওয়া বরবাদ। হৃষীকেশ মাথা নাড়ল, না না....উপায় আসে....। অখিল, পাঞ্চালী দুজনের চোখেই ডিঙাসা।

হৃষীকেশ ব্যাখ্যা করে। সরকারি লঞ্চ যখন দ্বীপের অন্যদিকে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ছিপ বাইতে হবে। ওরা ঘুরে এদিকে আসবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। যাব না? হৃষীকেশ প্রশ্ন ছুড়ল। পাঞ্চালী হাসল, বাঃ দারুণ বুদ্ধি করেছ। অখিল মাথা নেড়ে সায় দিল। — এছাড়া আর উপায়ও নাই।

পাহারাদার-লঞ্চ মুখ ফেরাতেই দ্রুত ছিপে উঠে পড়ল ওরা। প্রাণের দায়ে দাঁড় টানল সবাই। অচিরেই মরিচঝাঁপি পৌঁছে গেল নৌকা। নামবার জায়গায় দলদলে কাদা। —দিদি. পারবেন? না আপনাকে পাঁজাকোলা করে পার করে দেব? অখিল বলল। — না না.....পারব। এ কাদার ধরণ জানে পাঞ্চালী। একটু সময় নিলেই পা বসে যায়, কোমরও ডুবে যেতে পারে। এ কর্দম পেরোতে হয় লঘু পায়ে, তীব্র গতিতে। ছিপ থেকে নেমেই উপরের বনভূমি লক্ষ্য করে তীব্রগতিতে ছুট লাগাল পাঞ্চালী। শাড়িতে কাদা লেপে গেল একটু। তা হোক। তবু নিজে নিজেই পেরিয়েছে, সাহায্য লাগেনি। সরকারি লঞ্চের আওয়াজ কানে আসতেই অখিল, হৃষীকেশও ছুটে এসে লুকিয়ে পড়ল বনভূমিতে। ছিপটিকে টেনে উপরে তুলে লুকিয়ে রাখবার সময় পাওয়া গেল না। পাহারাদার-লঞ্চ চলে যেতে, ফিরে গিয়ে দেখা গেল, ছিপটিকে নিয়ে গেছে ওরা। — ফেরা হবে কী করে? পাঞ্চালী বলল। — চিন্তা কইরেন না দিদি ইদিকে আরও ছিপ আসে। হাসল হৃষীকেশ। অখিল বলল, চলুন....। একটু এগোতেই গভীর খাল। অবশ্য খুব চমক নয়। পারাপারের কোনো সেতু নেই। একটা লম্বা শক্তপোক্ত বাঁশ পাতা আছে যেতে ধরবার জন্য আর একটি বাঁশ। এক-পা এক-পা করে পেরিয়ে গেল ওরা।

শেষ পর্যন্ত মরিচঝাঁপিতে ঢোকা গেলে খুব ভরে নিঃশ্বাস নিল পাঞ্চালী। নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে অনির্বচনীয় সুখ। মনের ভেতরে যেতেই অনেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সুধীরবাবুকে ডেকে নিয়ে এল অখিল। সুধীর মন্ডল এখানকার উদ্বাস্তু সমিতির নেতা। উনি গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে শুরু করলেন।

এই বসতির নাম নেতাজীনগর....। বাইরের পৃথিবীর কোনো খবর এখানে পৌঁছছে না। অল্প কয়েকজন দরদী মানুষের সাহায্য ছাড়া তেমন বড় কোনো অনুদান পাননি। কিন্তু তবু নিজেদের দুটি মাত্র হাত দিয়ে জনপদ গড়ে তুলেছেন এঁরা। প্রত্যেকের একটি করে বাড়ি আছে এইখানে। বাড়ি মানে মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। নিজেরাই বানিয়েছেন স্কুল, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যদিও কোনো ডাক্তার নেই সেখানে। গ্রামে মাটির রাস্তা। সব খুব পরিচ্ছন্ন। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সব ব্যবস্থাই করা হচ্ছে এইখানে, জানালেন সুধীর। আছে নানান ধরণের কুটির শিল্প। যেমন বিড়ি, পাউরুটি, কাঠের কাজ, বয়ন শিল্প এইসব। এছাড়াও মাছের ভেড়ি করবার জন্য কয়েকটি জায়গা বাঁধ দিয়ে ঘেরা হয়েছে, যা থেকে বছরে রোজগার হবে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা। — এই টাকায় আমরা অনায়াসে স্বাবলম্বী হতে পারব, কারুর সাহায্য লাগবে না....। স্কুল বানিয়েছি আমরা, নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ...। সুধীরের চোখ ঝলমল করে উঠল। তাছাড়া দ্বীপের চারদিকে বাঁধ দেবার ফলে লবণাক্ত জল আর ঢুকবে না। দু-বছর বৃষ্টিতে ভিজলে মাটির নোনাভাব কেটে যাবে। তখন এই মাটিতে শস্য ফলান যাবে। ধান, শাকসব্জি। তখন সব কিছুর চাষ হবে এইখানে। সূত্রগুলি খাতায় লিখে নিল পাঞ্চালী।

গজ নামাস ধরে ভাঁবন মতো গড়ে তোলা এই সভ্যতাকে ধবংস করতে চাইছে সরকার।
লাগী। জল এক, খাদ্য আমদানি বন্ধ। সাংবাদিকদের যাতায়াত রুদ্ধ। তবু এঁরা বাঁচার চেষ্টা
করে চলেছেন। মাছ, কাঁকড়া খাওয়া হত। মাছ ধরতে যাবার নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে পুলিশ।
অতএব তা বন্ধ। ডাতের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরণের নুন ঘাস। এ অঞ্চলের
গাসন্দারা বলে যদুঘাস। কেউ কেউ মজা করে জ্যোতি বসুর নাম জুড়ে দিয়ে বলছেন
জ্যোতিপালং। সেট গাসপাতা সেদ্ধ করে খেতে হয়। পানীয় জল আনতে হচ্ছে কুমিরমারি
থেকে চোরাপথে। তবে এইখানে নলকূপ বসাতে সাহায্য করেছেন কলকাতার দু-তিনজন
দর্শী মানুষ। তাদের নাম বলতে চাইলেন না সুধীর। যদি ওরা বিপদে পড়ে যান....।

খুঁজে খুঁজে সবার সঙ্গে কথা বলল পাঞ্চালী। মনোবল অটুট। ওরা শেষপর্যন্ত লড়তে
চান। আমরা তো আর কিছু চাই না, শুধু থাকতে চাই এখানে, বললেন সুধীরবাবু। অখিল
এলল, আমরা মাছের চাষ করব, সে মাছ না হয় সরকারকেই বিক্রি করব...ওদের সব
শর্ত মেনে নেব....শুধু বলুক আমরা ভারতের নাগরিক.....।

সরকারের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেই রায়পুর থেকে কলকাতায় এসেছেন এঁরা।
অনেকেই নিজেদের সম্বল বিক্রি করে চলে এসেছেন। সুধীর জানালেন, প্রত্যেকেই রেলের
টিকিট কেটে এসেছে। অখিল বলল, ঠিক....প্রত্যেকেই ২৫ টাকা ৩৬ পয়সার টিকিট
কেটেছে। এই তথ্যটিও লিখে নেওয়া দরকার। এইসব ছাড়াও তথ্য লেখাটিকে মানবিক
করে তোলে। লিখে নিল পাঞ্চালী।

বিকেলের দিকে চারটি ছেলে দৌড়ে এসে খবর দিল, সিঁমার ভর্তি পুলিশ। গ্রাম
ভেঙে নদীদূর পাড়ে ছুটল সবাই। অধিকাংশের হাতে হেতালের লাঠি। কারুর হাতে বর্শা,
টাঙ্গ এবং বাঁটা। পাঞ্চালী ভিড়ে মিশে গেল। পুলিশ ওকে দেখে গ্রেপ্তার করলে এখানকার
মানুষ আরও বিপদে পড়ে যাবে। একই সরকার এখানকার মানুষের স্বাধীনতায় চক্রান্তের
গজ পাচ্ছে, পাঞ্চালীর খোঁজ পেলে তো সহজেই গল্প ফাঁদবে মরিচঝাঁপিতে নকশাল ঘাঁটি
গোড়েছে। দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন। এই ধূয়ো তুলে দ্বীপের মানুষজনের ওপর সহজেই
অত্যাচার নামাবে ওরা।

পুলিশ আধিকারিকেরা সিঁমার থেকে নামলেন না। এক কর্মচারী চোঙা ফুঁকে বলতে
শুরু করল, আপনারা দয়া করে মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে যান। এরপরে আমরা জোর করে
উচ্ছেদ শুরু করব। পাড়ে দাঁড়ান মরিচঝাঁপির মানুষ চিৎকার করে উঠল, আমাদের লাশ
লয়। যান, আমরা যামু না। গায়ে কাঁটা দিল পাঞ্চালীর।

কুমিরমারির মানুষের সঙ্গে আলোর সংকেতে কথা বলে এপারের মানুষ। ওপারের
দুটি আলো জ্বলছে, নিভছে....। টর্চের আলো। পাঁচবার এমন হল। অখিল বলল,তার
মাঝে, এখনও পুলিশ আছে ওধারে। এখন গেলেই ধরা পড়ে যাব।

মানুষের আবার একটি ছিপ জোগাড় করে আনল হাষীকেশ। এখন পাহারা টিলেটাল।
ওরা দ্রুত পৌঁছে গেল কুমিরমারি। বাকি রাস্তারটা আবার হাষীকেশের চায়ের দোকানে
কাটিয়ে সকাল হতেই ফেরার পথ ধরল পাঞ্চালী। অখিল সঙ্গে এল ক্যানিং স্টেশন পর্যন্ত।
শ্রীযাপদার ট্রেনে চাপতে নিশ্চিত লাগল।

চার পাঁচদিন পরে, সরস্বতী পূজোর দিন খবর এল মরিচঝাঁপির মানুষের ওপর পুলিশ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিয়েছে পুলিশ। এই নতুন সরকারের জমানায় প্রথম গুলিবর্ষণ! পাঞ্চালী লিখল সব। অভিজ্ঞতার একটি টুকরোকেও ফেলল না। লেখাটি বেরোবার পরেই পড়ুয়াদের মধ্যে সাড়া পড়ল একটু। অন্যান্য সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যার সমাজচিত্র বিক্রি হল বেশি। আরেকবার ছাপতে হল সংখ্যাটি। ব্যস ওই পর্যন্তই। মনে রাখার মতো কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন হল না।

দু'জন নামী সমাজকর্মী বীণাদি, কমলাদিও ঘুরে এসেছেন মরিচঝাঁপি। মনুমেন্ট ময়দানে জনতা পার্টির সভায় পুলিশের অত্যাচারের কথা বললেন বীণাদি। বীণাদি সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক বেণীমাধব দাসের মেয়ে, গ্রাজুয়েট। ১৯৩২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য রাজ্যপাল স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেছিলেন। ন'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। সেই মানুষ প্রতিবাদ করছেন, তবু চারদিকে নড়াচড়া হল না তেমন।

সরকারের সাহস বেড়ে গেল। গুলি চালাবার চার মাসের মাথায় মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়ল সি পি এম-এর গুন্ডা বাহিনী। সঙ্গে পুলিশ আর আধা সামরিক ফৌজ। ঘরদোর, স্কুল, গ্রন্থাগার সব ভেঙে চুরমার করে জ্বালিয়ে দিল। পিটিয়ে আধমরা করে দিল প্রতিবাদীদের। ওরা দেশি অস্ত্র হাতে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওই বর্বরতার বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ যুঝতে পারলেন না।

মরিচঝাঁপি ঘুরে আসা সমাজকর্মীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি ছোট লেখা তৈরি করতে বললেন পুলকেশবাবু। প্রথমেই কমলাদির কথাই গেল পাঞ্চালী। দিদির মুখ থমথমে। — লজ্জা করে বড় লজ্জা করে....আমরাওঁদের পাশে থাকতে পারলাম না। জান তো আমি আর বীণাদি দুজনেই যাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরকার সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে, এমনকী বন্ধ রেখেছে সিনেমালয়। কমলাদির চোখের তীব্রতা বেড়ে গেল, জান এ কাজ আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী? পাঞ্চালী মৃদু হাসল। — কিন্তু আপনারা ওইখানে ঢুকেই বা কী করতেন? কমলাদি মাথা নাড়লেন। কিছুই পারতাম না কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে মার খেতে পারতাম। কথার তীব্রতায় পাঞ্চালী চুপ করে গেল। একটু থেমে কমলাদি বললেন, স্বপ্নভঙ্গের কষ্টটা থাকত কিন্তু লজ্জাটা মুছে যেত।

কমলাদি জানালেন, লাইব্রেরি ঘরে সুভাষচন্দ্রের একটা চমৎকার বড় ছবি টাঙান ছিল। পুলিশ সেই ছবি লাগি মেরে ভেঙে দিয়েছে...। বলতে বলতে দিদির চোখ জ্বলে উঠল, ওধু আমি আর বীণাদি এই দু'জনে উপস্থিত থাকলেই এইটা হতে পারত না। আমরা বেঁচে থাকতে পুলিশের স্পর্ধাই হত না ওই ছবি স্পর্শ করবার।না হয় বড়জোর হারাবংশী বীরের রক্তে নকল বুদ্ধিগড় ভেসেই যেত, তবু তো এমন লজ্জা করত না। কমলার চোখে জল এসে গেল।

দপ্তরে ফিরেই লিখতে বসল পাঞ্চালী। মরিচঝাঁপি — দ্বিতীয় পর্ব।



নতুন লেখা নিয়ে কথাবার্তা হয় পুলকেশবাবুর সঙ্গে। উনি নতুন নতুন বিষয় প্রস্তাব করেন। একদিন পুলকেশবাবুর সঙ্গে লেখার আলোচনায় পাঞ্চালী বলল, আচ্ছা মরিচকাপিতে এও বড় অনায়াস করল জ্যোতি এসুর সরকার, কিন্তু তেমন কোনো আন্দোলন হল না কেন গলা তে।

কাগা কহেণে? পুলকেশবাবু হাসলেন। ...করলে আপনারা করতেন....কিন্তু আপনাদের তো রাজ্যটা গ্রুপ। উনি একটু হেসে পাঞ্চালীর দিকে তাকালেন, কী? ঠিক কী না?

শুনতে খারাপ লাগলেও ওঁর কথাটা সত্যি। সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন তো আছেই। তারপর আজিজুল হক, সুবীর তালুকদারদের সেকেন্ড সেন্ট্রাল কমিটি, সেকেন্ড সি পি। নারায়ণ সান্যাল, ভবানী রায়চৌধুরী, গৌতম ঘোষরা বানিয়েছেন সি পি আই এম-এল, পাটি ইউনিটি। সন্তোষ রাণা, ভাস্কর নন্দীদের প্রতিশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সি পি আই এম-এল। অসীম চ্যাটার্জির দল কমিউনিস্ট রিভলুশনারি লীগ অফ ইন্ডিয়া, সি আর এল আই। সি পি আই এম-এল, নিউ ডেমোক্রেসি। এছাড়াও হয়ত আরও কিছু খুঁচরো গ্রুপ আছে। এখন আবার কানু সান্যাল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। হয়ত উনিও আবার একটা দল গড়বেন। এত দল তো একসঙ্গে হতেই পারল না। তার আগেই পুলিশ ওইখানকার অধিবাসীদের মেরে ধরে জেলে দিয়ে দিল।

পুলকেশবাবু আবার বললেন, পারলে অগ্নিদেবী পারতেন, বাকি বামপন্থীরা তো সব সরকারি খাতায় নাম লিখিয়েছে। ধূতির বটস দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করলেন ভদ্রলোক। একটা কথা শুনুন....। এইবার গভীর শ্বাস। সি পি এম মানুষের সঙ্গে থেকে ওদের নিজস্ব কায়দায় আন্দোলন করে বড় হয়েছে। ওরা লড়াকু মানুষের মনস্তত্ত্ব খুব ভাল জানে, সেইজন্য এইটাও ভাল জানে কীভাবে তাদের কণ্ঠরোধ করতে হয়।আর তাছাড়া যে তিনটে কাজ ওরা করেছে, তারপরে রাজ্যের মানুষ চট করে ওদের বিরুদ্ধে যাবে না। পুলকেশ একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে বিস্তারে গেলেন। প্রথমত বন্দিমুক্তি। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়া ওরা। মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। আগের জমানার সেই দম আটকান অবস্থা আর নেই। তাই না? পাঞ্চালী মাথা নাড়ল। তা অবশ্য ঠিক।

তারপর দেখুন ভূমি সংস্কার। গরীব, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারি খাস জমি বিতরণ করেছে ওরা। আর তিন নম্বর, সবচেয়ে বড় কাজ হল অপারেশন বর্গা। পুলকেশবাবু ব্যাখ্যা করলেন। ভাগচাষী, বর্গাদারের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। জমির মালিক, জোতদারের খেয়ালখুশি মতো ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হত, ঠিকঠাক ফসলের ভাগও পেত না ওরা। এখন বর্গাদারের নাম উঠে যাচ্ছে সরকারি খাতায়। নিয়ম হয়েছে, যদি বর্গাদার শ্রম ছাড়াও চাষের অন্যান্য জিনিস সার ইত্যাদি দেয় তাহলে সে পাবে উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বাকিটা জমির মালিক। আর মালিক সেইসব জিনিস দিয়ে

হেঁয়ালি...তা কিছু বুঝলে? বসির মাথা নাড়ল, ননা এখনও বুঝিনি, চেষ্টা করে যাচ্ছি...। মনে মনে লেখার ধরণটি একটু গুছিয়ে নিল পাঞ্চালী। বলল, আচ্ছা বসিরভাই, বাউল আর ফকিরের মধ্যে তফাৎটা কোথায়? — কী বলি বল তো? দুজনেই তো মূলে এক..., বসির কিছু অন্যমনস্ক। পাঞ্চালী ছাড়বে না। — সহজ কথায় বোঝাও না...ওদের গানের মধ্যেও কী কোনো তফাৎ নেই? বসির বলল, হ্যাঁ একটা বাইরের পার্থক্য অবশ্য আছে....। পাঞ্চালী তাকাল। বসির নিজের মনেই বলল, বাউল চৈতন্যদেবের গান গেয়ে শুরু করে আর ফকির গান শুরু করে নবিতত্ত্ব দিয়ে....।

এক সপ্তাহ পরে আবার একদিন বসিরকে আসতে অনুরোধ জানাল পাঞ্চালী। ততদিনে লেখাটা কিছু এগিয়ে যাবে। আরও কোনো প্রশ্নের উদয় হলে, জেনে নেওয়া যাবে তাও। বসির বলল, নিশ্চয়ই আসব। মানুষ সঙ্গ চাইলে দিতে হয়...আর তাছাড়া তোমাকে একটা জিনিস দেবারও আছে।

আবার এল বসির। আরও কথা বলে সব কিছু জেনে বুঝে নিল পাঞ্চালী। লেখাটা মন্দ হবে না। যাবার মুখে একটি কাগজের খাম এগিয়ে ধরল বসির।

—কী আছে ওতে?

— মাটি। বসির বলল।

— মাটি!.....

— হ্যাঁ....শেষ সময়ে দ্রোণ এই মাটিটুকু খামটি ধরেছিল.....সেই মাটি দিয়েছিল আমার হাতে। শেষ সময়ের ঘটনাটি বিশদে বন্ধু বসির। বলতে বলতে ওর চোখ আর্দ্র। পাঞ্চালীরও কণ্ঠ বিকল। নীরবে হাত বাড়িয়ে কাগজের মোড়কটি নিয়ে কাঁধের ঝোলায় ভরে নিল।

বসিরকে নিয়ে লেখাটি পড়লেন পুলকেশবাবু। চমৎকার হয়েছে, বললেন সম্পাদক। লেখাটি বের হল— গতকালের বিপ্লবী, আজকের ফকির। পাঠকদের অনেকেই অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিল।

বসিরের চিঠি এল কিছুদিন পরে। ছোট্ট চিঠি। প্রিয় পাঞ্চালী, লেখাটা ভালোই। কিন্তু আমি আর ফকির হতে পারলাম কই? একবার ঠিক করলাম এক মাস মিথ্যা কথা বলব না। সামান্য এই প্রতিজ্ঞাটুকুই রাখতে পারলাম না। আমি ফকির জীবনচর্যার যোগ্য নই। একথা ভাবলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। বসির।

চিঠি পড়ে পাঞ্চালী জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে রইল। ও যদিও দ্রোণের বন্ধু, কিন্তু বসিরের এই ধরনটার সঙ্গে নিরুপমের খুব মিল। নিরুপমও প্রতিমুহূর্ত নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে চাইত।

নিরুপমের কথা মনে পড়ায় মনটা ফকির-বাউল হয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে এসেছে। চেয়ারে ঝোলাটা রেখে দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পাঞ্চালী। এলোমেলো হাঁটতে অজান্তেই পৌঁছে গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। পার্কের পাশে অখিল মিস্ত্রি লেনে ভিড় জমেছে। গান বাজছে। নীল শালুতে সাদা অক্ষরে লেখা — জয় সাহার অবিরাম সাইকেল চালনা। আয়োজনে শ্রদ্ধানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব। পাঞ্চালী এগিয়ে গেল। একটি বছর কুড়ির ছেলে, মাথায় টুপি,

সাইকেল নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে। তার চারদিকে বাঁশের বেড়া। বেড়ার ভেতরে, কোনায় একটি বেঞ্চির উপর রাখা কাঠের বাস্ক। তার গায়ে লেখা, মুদ্রিত হস্তে দান কক্ষন। বাস্কটির ঢাকনা লম্বালম্বি কাটা। সেইখানে টাকা পয়সা গুঁজে দিচ্ছেন কেউ কেউ। বেড়ার পরিধি বরাবর দাঁড়িয়ে আছে লাল ব্যাজ সাঁটা স্বেচ্ছাসেবক। সাইকেল আরোহীর নীল জামায় সেফটি পিন দিয়ে লাগান দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট। নিশ্চয় তার উৎসাহী বন্ধুরা পাগিয়ে দিয়েছে। সাইকেল চালাতে চালাতেই সে জলপানের ইঙ্গিত করল। ক্লাবের একজন স্বেচ্ছাসেবক আধ বোতল জল এগিয়ে দিল। এক হাতে বোতল ধরল ছেলেটি। সাইকেল চালনা করতে করতেই এক ঢোক জল গলায় ঢেলে নিল বছর কুড়ির ছেলেটি। ঘিরে থাকা জনতা হাততালি দিয়ে উঠল। মিষ্টি করে হেসে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ছেলেটি। পাঞ্চালীর পাশে একজন মাঝবয়সি লোক। পুরোহাতা সাদা গেঞ্জি আর ধূতি। ভদ্রলোক অবাঙালি। তিনি সামনে দাঁড়ান স্বেচ্ছাসেবকের কাঁধে হাত রাখলেন। — আচ্ছা ভাইয়া জল খাওয়াটা তো দেখলাম। কিন্তু এ জলবিয়েগ...মানে পেছাপটা কীভাবে করে?

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকাল ছেলেটি। ছেলেটি গম্বাকটা। ওষ্ঠের মাঝ বরাবর মোটা সেলাইয়ের দাগ। সেইটাও কী করে দেখাবে? স্বেচ্ছাসেবক ছেলেটি রেগে গেল। — না...মানে....প্রশ্নকারী ভদ্রলোক আমতা আমতা করলেন। স্বেচ্ছাসেবকটি নরম হল এইবার। — অঙ্কুরা ওঁকে ঘিরে দাঁড়াই। ঐকজন সাইকেলের হাঁতল ধরে। ঐকজন প্যান্টের বোঁতা ধরে। অন্যজন পাত্র ধরে। জয় কিন্তু সাইকেল ছেড়ে নামে নী...। স্বেচ্ছাসেবকটি মুখে গর্ব। মাঝবয়সি জিজ্ঞাসা করলেন, ও কতক্ষণ চালাবে ভাই? ওঁর তেঁ ইচ্ছে...। ঐকজন গম্বাক চালাবার, বলল স্বেচ্ছাসেবকটি। অনেক বঁকিয়েছেন.....এইবার চাঁদা দিন...। ভদ্রলোক গেঞ্জি তুলে কোমরে বাঁধা গেঁজে থেকে দশ টাকা বের করলেন, এইটা দিয়ে দিও তোমাদের জয়কে....। মাঝবয়সি চলে গেলেন।

মধ্য কলকাতা আর উত্তর কলকাতা এমনই বিচিত্র। বিচিত্র সব লোকজন। এইসব অঞ্চলেই এমন হজুগের খেলা এখনও রয়ে গেছে! চারদিকে তাকাল পাঞ্চালী। উন্টোদিকের পঞ্চাশ ষাটটি মুখের মধ্যে একজনকে চেনা লাগল। মাথায় কদমছাঁট চুল। চেহারা য দোহাতী ভাব। কোঁচকান ধূতি শার্ট। বয়স নিশ্চয় ষাট পেরিয়েছে। খুবই যেন চেনা কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না পাঞ্চালী। কে হতে পারে? চোখ বন্ধ করে ভাবল একবার। কোথায় দেখেছে ভদ্রলোককে?... আদালতে? না, তা নয়। তবে কী নিরুপমের কোনো চেনা?আবার একবার ভদ্রলোককে দেখল পাঞ্চালী। ইনি তো সুকান্তিদা! হ্যাঁ ঠিকই...ইনি সুকান্তিদা। উন্টো দিকের জমায়েতের দিকে এগোল পাঞ্চালী।

পাঞ্চালীকে দেখে সুকান্তিদাও অবাক। — আরে....আরে....মজার মেয়ে তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা.....চল চল। সুকান্তিদা পার্কের ভেতর ঢুকলেন। দুজনে পার্কের বেষ্টিতে বসল।

বহুদিন পরে প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হলে অবরুদ্ধ কথা একযোগে বেরিয়ে আসতে চায়। এবং সেই কথন পরম্পরা মেনে আসে না। কখন যে কোন কথাটা বলতে হবে, তা কথকও জানে না। কেউ যেন তাকে বলিয়ে নেয়। পাঞ্চালী বলল তার মরিচঝাঁপির

অভিজ্ঞতা। — সি পি এম যে বিপ্লব করবে না আমরা তো বলতামই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মানুষ খতম করবার রাস্তা নেবে ভাবিনি। সুকান্তিদা বললেন, হ্যাঁ মরিচকাপিতে ওরা একটা পরীক্ষা চালাল....কেমন করে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখোমুখি না হয়েও গরীব মানুষের লড়াইকে নির্মমভাবে দমন করা যায়। এই পরীক্ষার সাময়িক সাফল্যে আজ তারা উল্লসিত।তবে জেনে রেখ এই উল্লাস একদিন না একদিন মরণ আর্তনাদ হয়ে দাঁড়াবেই....।

পাঞ্চালী চুপ করে গেল। পার্টির ইস্তাহারে এমনভাবেই হিসাব করে লেখা থাকে সব কিছু। — আপনাদের লিবারেশন গ্রুপের খবর কী? ওরা কিছু করল না কেন? ছিটেফোঁটা হলেও ভেতরের বিরক্তি চাপা দিতে পারল না পাঞ্চালী। সুকান্তিদার মুখে স্নান হাসি। — না গো করবার চেষ্টা করেছে...আমাদের সামান্য ক্ষমতা নিয়েও ওদের পাশে আমরা জ্বলাম....আমিও তো ওখানে গিয়েছি বেশ কয়েকবার। এইবার পাঞ্চালী লজ্জা পেল। না জেনেই সে লিবারেশন গ্রুপকে দোষ দিয়েছে। অথচ সুকান্তিদা রাগলেন না, বিরক্ত হলেন না একটুও। আগের মতোই নম্র গলায় বোঝাতে শুরু করলেন।বসতি গড়ার প্রথম কয়েকমাস মরিচকাপির মানুষ প্রতি পদে সরকারের আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে। ওদের সংগ্রামী নেতারা মূলত গোপনে থেকে লড়াই পরিচালনা করেছেন, সরকারের সঙ্গে কোনো আপোস আলোচনায় বসেননি। আশপাশের পুরনো বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে মরিচকাপিকে গড়ে তুলেছিলেন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো।কয়েকটি সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর বামফ্রন্ট কৌশল পালটাল। একদল দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য দুর্গে পড়ল জনদরদী সেজে। ওদের উদ্দেশ্যই ছিল ক্রমশ ওই ইস্পাতের মতো মানুষদের আত্মনির্ভরতার পথ থেকে সরিয়ে আনা। আর একদল বাইরে থেকে রক্তাক্ত থাকল, এ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত! জনসমর্থনকে বিভক্ত বিভ্রান্ত করে দিল। সুকান্তিদা মাথার চুলে হাত বোলালেন। — এর বিরুদ্ধে আমরা তেমন কোনো জোরাল প্রচার রাখতে পারিনি।তবে মরিচকাপি থেকে আমরা অনেক শিক্ষা নিয়েছি। এইসব নিয়ে একটি লেখা আছে, লিবারেশনের জুলাই ১৯৭৯ সংখ্যায়। — আমায় দেবেন? পাঞ্চালী বলল। সুকান্তিদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। একটু থেমে বলতে শুরু করলেন দলের আরও খবর।নতুন ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। আগেকার ভুল শোধনের চেষ্টা হচ্ছে...জোর দেওয়া হয়েছে কৃষকদের গণআন্দোলন, সংগঠনে। প্রকাশ্যের সঙ্গে গোপন লড়াই মেলাবার চেষ্টা চলছে...মাস তিনেক আগে ভোজপুরে পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন হয়ে গেল.....কমরেডরা নতুন চিন্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাঞ্চালীর মাথায় সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন এসে গেল। — বিপ্লব আর কতদূর? এখন এই আশির দশকের দোরগোড়ায় এসে কী মনে হয় আপনার? সুকান্তিদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একবার মাথায় হাত বোলালেন। — দেখ, সমস্ত মনে হত কালকেই বিপ্লব হবে, খুব দেরি হলে পরশু। আর এখন মনে হয় কবে যে হবে....কতদিন পরে....কে জানে! স্নান হাসলেন মধ্যযুগে ছুঁতে চলা মানুষটি। একটু পরেই আবার উজ্জিয়ে উঠে বলতে শুরু করলেন, আশা ছাড়লে চলবে না। পৃথিবী পালটাবেই। মানুষের ওপর ভরসা রাখতে হবে। বাড়তে হবে নিজেদের উদ্যম। একজনের হতাশাই বহুজনের মধ্যে হতাশার জন্ম দেয়। একথা কার জান?...

কমবেশ ১৫ মিনিটের মধ্যে পান্থালী বলল। না না...চন্দ্রদা ঠিক এইভাবে বলেননি। একথা বলতে আমাদের নিরুপম। নিরুপমের প্রসঙ্গ তুলেই নিশ্চূপ হয়ে গেলেন সুকান্তিদা। মাথা নীচ। নিজের মনে কথা বলছেন....হাত পা নড়ছে.... কিন্তু স্বর স্পষ্ট হচ্ছে না। কিছু পরে মুখ তুললেন। — ছেলেটা কী যে ভালবাসত তোমায়। বলত, পাঞ্চালীর মন পড়ে আছে আমার দিকে, কিন্তু ভালোবাসার অভ্যাস পড়েছে ঘ্রোণের উপর....। বলতে বলতে সুকান্তিদার চোখ জলে ভরে গেল। পাঞ্চালীর ভেতরের যাবতীয় জমান দুঃখ-কষ্ট-আবেগ আছড়ে পড়ল সুকান্তিদার কাঁধে। ভেতরের ব্যথা প্রকাশ করতে গেলে একটি নির্ভরযোগ্য, নির্মল, শক্ত কাঁধের প্রয়োজন। চতুর্দিকের তুষার ঝড়ের মধ্যে সুকান্তিদার সাহচর্য তেমনই এক সুখোক্ষ আশ্রয়। ইঠাৎ পাঞ্চালী বলল, দাদা....নিরুপম যেখানে মারা গেছে সেখানকার মাটি এনে দিতে পারেন? সুকান্তিদা অবাক। হ্যাঁ পারি....কিন্তু কেন গো? ঘ্রোণের আঁকড়ান মাটি পাবার কথা বলল পাঞ্চালী। — নিরুপমের স্পর্শ ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নই, আপনি তো জানেন....। পাঞ্চালীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন সুকান্তিদা। বাঃ ভাল ভেবেছ।যদিও মাটিতে মাটিতে গুণের পার্থক্য আছে....কোনটো এটেল, কোনোটি দোঁআশলা....তবু মাটি তো....। সুকান্তিদা বললেন, ঠিক আছে তুমি পরশু দিন এইসময়ে এস, এনে দেব....। পাঞ্চালী বলল, এইখানেই তো? সুকান্তি উপরে নিচে মাথা নাড়লেন।

কথামত পার্কে যেতেই পাঞ্চালী দেখল সুকান্তিদা বসে আছেন। মুখ গভীর। সুকান্তিদা বললেন, এই নাও লিবারেশন....আর এই যে....আমার অনুরোধের বস্তু। একটি হলুদ মোড়ক এগিয়ে দিলেন উনি। ওর ভেতরেই তার নিরুপমের ছোঁয়া মাটি। মোড়কটি সাবধানে খোলায় ভরে নিল পাঞ্চালী।

সুকান্তিদার তাড়া আছে। উঠে পড়লেন। পাঞ্চালী লক্ষ করল তার দিকে পিছন ফিরে চোখ মুছলেন সুকান্তিদা। বারংবার। মিনিটখানেক খুবই ভালবাসেন নিরুপমকে। কিছুক্ষণ একা বসে থাকার পর পাঞ্চালীও উঠে পড়ল। তার খোলায় এখন তার দুই প্রেমিক, দুই শহীদের মাটি। বিষম লাগছে। মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে গোলদিঘির দিকে চলল সে।

কফি হাউসের নিচে, হিন্দু স্কুলের দিকে ছোটখাট জটলা। উঁকি মারল পাঞ্চালী। একটা ছোঁড়া জামা পরা লোক চকখড়ি দিয়ে রাস্তায় অঙ্ক কষছে। এক লক্ষ চূয়াস্তর হাজার পাঁচশো বাহান্নকে পাঁচ লক্ষ তের হাজার তিনশো সতের দিয়ে গুণ! লোকটিকে ভাল করে দেখে চমকে উঠল পাঞ্চালী। আরে! এতো প্রকাশ! সেই উত্তরপাড়ার মিটিঙে আলাপ হয়েছিল।

পাঞ্চালী ডাকল, প্রকাশ....প্রকাশ। ও মুখ তুলে তাকাল, চোখ দ্যুতিহীন। ঠোটে সামান্য হাসির ভাব এল।

আবার মাথা নামিয়ে অঙ্ক মন দিল প্রকাশ।

এই আখ্যান এখানেই শেষ হতে পারতো।
কিন্তু অন্তত দু'টি চরিত্র তো এর তিরিশ বছর
পরেও সজীব। তারা তো এই তিন দশক
ধরে দেখে নিল শাসককুলের ক্রমাগত
অধোগমনের পরম্পরা। বুঝে নিল গ্রামে,
শহরে সরকারপুষ্ট মাতব্বরদের উত্থান আর
তাদের দাদাগিরি'র রসায়ন। তিন দশকের
শেষ দশকে সরকার ভয়ংকর। তারা যেন
এই সত্য বোঝাতে উঠে-পড়ে লেগেছে —
শাসকদের চোখ সব জমানাতেই রক্তবর্ণ।

গুরু হয় প্রতিক্রিয়া। আবার ক্ষোভ
জমতে-জমতে প্রতিবাদ। শাসকের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদী মিছিল। আবার সুবিচার পাবার
আন্দোলন। আবার সেই লড়াইয়ের
আবহ।

এই সবই নিশ্চয় মথিত করেছে সেই
দু'জনকে। সৎ-যুক্তির হাত ধরে পথ
চলেছে ওই দুইজনা ॥

17.2.66

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থামতেই তদ্রূপ কেটে গেল পাঞ্চালীর। সামনে তাকাতে দেখা গেল একটি গরু। রোদ ঝলসানো জাতীয় সড়কের বাম দিক থেকে ডান দিকে চলেছেন। গিয়ার পাশ্টাতে পাশ্টাতে দয়ানন্দ বলল, এই না হলে গরু, হঠাৎ করে রাস্তা পার হবার শখ হয়েছে! চালকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল পাঞ্চালী। হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। বারোটা আঠাশ। তার মানে, পৌছতে আরও আড়াই ঘন্টা। ঝোলার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মোড়ক দুটিকে অন্তর্ভুক্ত করল পাঞ্চালী। এটা তার অভ্যাস অথবা মুদ্রাদোষও বলা যায়। মোড়কে দ্রোণ আর নিরুপমের বধ্যভূমির মাটি। এদের যত্ন করে রাখতে হয়। মোড়ক পাশ্টাতে হয়। দল পাঁকিয়ে গেলে আবার ঝুরঝুরে করতে হয় মাটি। অনেক যত্ন। বিগত তিন দশকে পারিপার্শ্বের বদল ঘটলেও এই দুই মূর্তিমান তার সঙ্গে থাকে সবসময়। নিরুপমের কথায় সুকান্তিদার কথাও মনে এল। উনি সেই যে মাটি এনে দিলেন তারপর কোথায় গারিয়ে গেলেন! পরবর্তীতে ঝুঁজে ঝুঁজে ওর বাড়িতে ঝিয়েছিল পাঞ্চালী কিন্তু ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে হয়েছে সবাইকে। গাড়ি ভেঙে আধুনিক বহতল উঠছে। একতলায় লাগপাটির অফিস। আশপাশের কেউই সুকান্তিদার ঠিকানা দিতে পারল না। এইটুকু জানা গেল, উনি বর্তমানে বাস করছেন না বা ওই বাড়িতে মেয়ের কাছে থাকেন। সুকান্তিদা বোধহয় এখন আর আগের মতো অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়েন না। নিশ্চয়ই শরীর অশক্ত এখন। তবে লেখেন। মাঝে মাঝে ওর নিবন্ধ নানান কাগজে, সাময়িক পত্রে দেখা যায়। লেখায় অবশ্য সেই আগেকার মতোই ধার, অকাটা যুক্তির অবতারণা।

গরুকে পাশ কাটিয়ে আবার গাড়ির গতি বাড়াল চালক। ওর মুখটা একবার দেখে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল পাঞ্চালী। সামনের আসনে বসবার মজা অনেক। গাড়ির গতি সম্পূর্ণ অনুভব করা যায়। তাছাড়া তাকে সামনে বসতেই হবে, কারণ পিছনের আসনে বসা কলেজ পড়ুয়া সাত তরুণ-তরুণীকে সেই পথ চিনিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলি বেশ প্রাণবন্ত। নানান বিষয়ে পড়াশুনো করে। সবচেয়ে বড় কথা রাজনীতি নিয়ে ভাবে। অন্যায় দেখলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ওরা। কফি হাউসে আলাপ হয়েছিল ওদের সঙ্গে তারপর থেকে সেই পরিচয় ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। একদিন না গেলে ওরা পাঞ্চালীর খোঁজখবর নেয়। কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারও দেখিয়ে এনেছে ওরা। পাঞ্চালীর জীবনের কাহিনী প্রায় সবই জানা ওদের। পাঞ্চালীও ওদের প্রত্যেকের গল্প জানে। প্রতিটি কণ্ঠস্বর চেনে।

পাঞ্চালীদি, এই নাও.....। পিছনের আসন থেকে শৌর্যেন্দু হাত বাড়িয়েছে। হাতেও তালুতে সাদা চুয়িংগাম। না রেআমি খাই না। পাঞ্চালী বলল। আরে খাও তো.....দেখবে

ঘুম একেবারে চটকে চ! শৌর্যেন্দুর কথায় হেসে ফেলল পাঞ্চালী। — কি সব যে বলিস.....আচ্ছা দে। হাসতে হাসতে হাত এগিয়ে দিল সে। স্নায়ুর অসুখের জন্য যে ওষুধ খেতে হয়, তাতে বড় ঘুম পায়।

ঝোলাতে আয়না আর চিরুণি আছে। টেনে চুল আঁচড়ালে ঘুম কেটে যায়। আয়নায় একবার মুখ দেখল পাঞ্চালী। সেদিনের একুশ বছরের সেই মেয়েটির কৃষ্ণ কেশপাশে এখন তুষারযুগ! চোখের পাশে, মুখের চামড়ায় কুঞ্জন। গলার চামড়াও শিথিল। বলিরেখা গভীর। বয়সের ছাপ শরীরে। বিগত তিরিশ বছরে যেন কোনো জাদুকর নিঃসাড়ে তার জাদুদণ্ডটি বুলিয়ে গেছে শরীরে, মনে। আর তাছাড়া কম ধকল তো সহ্য না দেহযন্ত্রটি। সাদা চুল ভালই লাগে পাঞ্চালীর। প্রসঙ্গ উঠলেই সে হেসে বলে প্রতিটি চূলে রয়েছে অভিজ্ঞতা! অবশ্য কলেজ, গ্রামে থাকা, জেলজীবন, জেল থেকে বেরোবার পরও গত তিরিশ বছরে কম কিছু অভিজ্ঞতা হল না। সব মেলালে তো চল্লিশ বছর! জাদু-সময় পাঞ্চালীর সামর্থ্যে সীমানা টানলেও উদ্যমে লাগাম পরাতে পারে নি।

গাড়ির জানালার পাশ দিয়ে রাস্তা, ধানক্ষেত সব দ্রুত চলে যাচ্ছে পিছনে। দ্রুত সরে যাচ্ছে দুটি রঙ — কালো আর হলুদ-সবুজ। বিগত তিন দশকে কত বদলে গেল রাজ্য, দেশ, পৃথিবী। এখন অনেক খবরের কাগজ। তাদের সবাই একরকমের নয়। সুর ভিন্ন-ভিন্ন। রেডিও'র দাপট কমলেও, টেলিভিশন জনপ্রিয়। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে এখন বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল। তারপর মুঠোফোন, কম্পিউটার আর ইন্টারনেট তো যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব। এখন সহজেই যোগাযোগ করা যায় দূর ভূখণ্ডের মানুষজনের সঙ্গে। কত ছোট হয়ে গেল পৃথিবীটা। কিন্তু দেশের অবস্থা যেমন কে তেমন। কোনোরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে চলছে।

পিছনের ছেলেমেয়েদের কলরব হঠাৎ বেড়ে উঠল। ওরা ঠিক কী নিয়ে যে কথা বলছে খেয়াল করেনি পাঞ্চালী। সে তার নিজের মনেই চলেছে। গাড়ির সামনের আসনে বসবার এই আর এক মজা। নিজের মতো থাকা যায়। আশপাশের দৃশ্য দেখে, নিজের সঙ্গে কথা বলেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

...এবার ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে কে চ্যাম্পিয়ন হবে বলতো? জ্যোতিষের গলা। শৌর্যেন্দু বলল, স্পেন কিংবা হল্যান্ড। — স্পেন? মিত্রাক্ষর প্রশ্ন ছুড়েছে। ফুটবলের ব্যাপারে শৌর্যেন্দু বিশেষজ্ঞ। ও রাত জেগে বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেলা দেখে থাকে। দেখ স্পেন এবার অসাধারণ খেলছে... হল্যান্ডও তাই... হয় হল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন, স্পেন রানার আপ, নাহলে উলটোটা। তবে আমার খুব মনে হয় স্পেনই জিতবে এবার....ওদের স্ট্রাইকার, ডিফেন্স দুটোই ভাল। শৌর্যেন্দুর মত।

অভিজ্ঞান বলল, আমাদের দেশে এত লোক....কেন যে একটা ভাল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের ফুটবল টিম হল না....। — কী করে হবে? অনুষ্কার তীক্ষ্ণ গলা। শালা....যে দেশের অর্ধেক শিশু আগারওয়াট, অপুষ্টিতে ভোগে, সেভেনটি পারসেন্টের বেশি মেয়ে আর বাচ্চা অপুষ্টি রিলেটেড রোগের শিকার, এদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্টের ফুসফুসে যক্ষ্মা, সেখানে হবে ফুটবল টিম!শালা....। অপুষ্টি কমা সব হবে....ছেলেরা মেয়েরা সবাই ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স সব কিছুতে নাম করবে...।

৭৫.৭, ১১।১১, ৩০.৭৫...। কমরেড ঠানদি লাল সেলাম। সবাই হই হই করে উঠল।
 ওয়ালো একটু কমতেই, জ্যোতিষ বলল অপুষ্টি, অনাহার কমানোর চেষ্টা নেই অথচ
 ডি.এ.এ. খাতে খরচ বেড়ে গেল সিন্ধুটি ফোর পারসেন্ট। — একদম ঠিক। শৌর্যেন্দুর
 গলা। দেশে প্রতি ২৮ মিনিটে একজন করে কৃষক আত্মহত্যা করছে কেন? রাজ্যে প্রতিবছর
 হাজার বারোশ কৃষক আত্মহত্যা করে কেন? সেই সমস্যার সমাধান নেই কিন্তু বিদ্রোহী
 গরীব মানুষকে মারার অস্ত্র কেনা চলছে...ইজরায়েল থেকে কেনা হচ্ছে এমন নাইট ডিসন
 সাপমেশিনগান, যাতে রাতের অন্ধকারেও টার্গেট দেখা যায়....। অভিজ্ঞান বলল, এক্স নাইনটি
 ৭৫।৬... রাতের অন্ধকারেও চারশো মিটার দূরের টার্গেট কাবু করা যায়। সাড়ে তিন কেজি
 ওজন। তিরিশটি বুলেট থাকে ম্যাগাজিনে। সাড়ে সাতশো থেকে নশো গ্রাউণ্ড ওল
 চালালেও ক্ষমতা কমে না। তবে ওইটা এখনও কেনা হয়নি, কথাবার্তা চলছে....।
 — তুই মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস না ছোড়দা। জ্যোতিষ তেড়েফুঁড়ে বলল। আরে
 কথাবার্তা বলছে কী এমনি এমনিই! জ্ঞান বাড়বার জন্য?...।

ওদের কলরব শুনতে ভালোই লাগছে পাঞ্চালীর। যে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা আত্মহত্যার
 হিসাবে দেশের মধ্যে শীর্ষে, সেখানকার কলেজের ছেলেমেয়েদের জীবনকে ভালবেসে
 পাথে নামবার এমত উদাহরণ দেখলে বড় আনন্দ হয়। বুক ভরে ওঠে। ওদের কথাটা
 ঠিক। দেশের অবস্থা তো বটেই রাজ্যের অবস্থাও ভয়াবহ। গত তিনদশকেরও বেশি
 সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। ওরা বিপ্লবের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল
 আর দেওয়ালেও লেখে না, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান। কারণ ওদের পথ বদলেছে।
 ওরা মনে করে কংগ্রেসের সঙ্গে দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকতে অন্যায় নেই। ওরা এখন শাসক।
 এ৭৭ শাসক হিসাবে ওদের সঙ্গে পূর্বের কংগ্রেস সরকারের খুব কিছু তরিতফাৎ নেই।
 সেই একইরকম চোখরাঙানি মাতব্বর আয়ত্ত করে নিয়েছে এরাও।

জাতীয় সড়ক এখন বেশ মসৃণ। খানখন্দহীন রাস্তায় গাড়ি চলবার একটা ঘুমপাড়ানি
 ছন্দ আছে। সেই দুপুর্নিতে ঘুম পায়। ঘুম না পেলেও নিজের মনে বহুদূর চলে যাওয়া
 যায়। পাঞ্চালী কখনও ফিরে যায় অতীতে, কখনও চলে আসে ছেলেমেয়েদের টুকরো
 কথায়।

— আরে মামু যাওয়া হচ্ছে প্রতিবাদ করতে, এখনই এমন ল্যাদ খেয়ে গেলে চলবে?
 ...সকালবেলায় শুকনো নেশা করেছিস নাকি? উঠে পড়...উঠে পড়। মিত্রাক্ষরের গলা।
 শৌর্যেন্দুর ঘুম ভাঙল ওরা। লেখনী বলল, মামু তো আবার ঘুমোলেই বার্গম্যান কিংবা
 ফেলিনি-র ফিল্ম দেখে। অভিজ্ঞানের হাসির আওয়াজ, আজ কোনটা দেখলে গুরু?
 জ্যোতিষ বলল, এইট অ্যান্ড হাফ, ফেলিনি? নাকি দ্য ওয়াইল্ড স্ট্রবেরি, বার্গম্যান? এয়া
 খেপাতে চাইছে। কিন্তু শৌর্যেন্দু একদম রাগল না। গভীর গলায় বলল, বার্গম্যান। একটা
 কফিন.....ডালা খোলা হল....দেখলাম আমিই শুয়ে আছি.....দেওয়ালে বিশাল ঘড়ি, ঝাঁটা
 নেই.....প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে কাঁটা নেই.....শহরের কোনো ঘড়িতে কাঁটা নেই....।

আরে মামুর জবাব নেই....পুরো সররিয়েলিস্ট স্বপ্ন..... ফাটিয়ে দিয়েছে বস, প্রকৃতি
 চিৎকার করল, তালিয়াঁ....। সবাই হাততালি দিল।

আরে তোরা আমায় তালি দিচ্ছিস! শৌর্যেন্দুর গলা। যদি জানতিস বড়দা আজকাল

কার স্বপ্ন দেখছে, মাথায় তুলে নাচতিস! কার? ...কার? জ্যোতিষ আর অনুষ্কা একযোগে বলল। প্রকৃতি হেসে বলল, ইয়ে.....মানে.....বোম্বের কেউ নাকি? — ধ্যাৎ! কী যে বলিস! মিত্রাক্ষরের ফাঁদে পড়া লজ্জা লজ্জা গলা। — সর্বজয়া.....শৌর্যেন্দু ঘোষণা করল। — অ্যাঁ.....মানে সর্ব...মানে...পথের পাঁচালি? জ্যোতিষ। ইয়েস মাই ডিয়ার, শৌর্যেন্দু বলল, পথের পাঁচালি বাই সত্যজিৎ রে...। ভারতের হাঁড়ি ফুটছে.... ট্রাক ফরওয়ার্ড..... কাট টু সর্বজয়ার মুখ....বিগ ক্রোজ আপ.....ব্যস আমাদের মিত্রাক্ষর.....মানে বড়দা একেবারে ফিদা! আবার তালি দিল সবাই।

হঠাৎ অনুষ্কা বলল, দেখ দেখ কী সবুজ। পাঞ্চালী আগেই দেখেছে। জানালার দু'ধারে ক্ষেত....সবুজ গালিচা পাতা দিগন্ত জুড়ে। দেখলেই চোখের আরাম, মনের শান্তি। কিছুক্ষণ নীরব সবাই। অনুষ্কা বলল, নিজের হাতে গড়া এই ক্ষেত থেকে উচ্ছেদ হলে তো কষ্ট হবেই...।

.....কিন্তু উলটো যুক্তিটাও তো ভাবা দরকার। এ গলা প্রকৃতির। কৃষিতে আর নতুন এমপ্লয়মেন্ট অপারচুনিটি হচ্ছে না, গ্রোথও হচ্ছে না, ফলে কাজের সুযোগ বাড়াতে চাই ইন্ডাস্ট্রি....। প্রকৃতি বলে যায় সরকারি যুক্তি। কৃষিজমিতে মোটরগাড়ির কারখানা হলে তাকে ঘিরে হবে অ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রি.....অনুসারী শিল্প। গাড়ির যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা, মোটরবাইক কারখানা....অন্তত চল্লিশটা এইরকম ইন্ডাস্ট্রি হবে ওইখানে....

— আরে শোন, শোন। শৌর্যেন্দু থামিয়ে দিল প্রকৃতিকে। প্রথমেই শুনে রাখ, আমরা কেউই শিল্পের বিরোধী নই, যে শিল্পগুলি কৃষিব্যবস্থার পাশাপাশি কাঁধ মিলিয়ে চলবে তাতে তো আপত্তি থাকবার কথা নয়.....জ্যোতিষ সায় দিল। — যেমন ধর জৈবিক সার তৈরির কারখানা, ভাল শস্যবীজ, পশুপালার শিল্প কিংবা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মানে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি.....এইগুলো তো কৃষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে... এতে তো আপত্তি নেই.... এতে বহু লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হয়....। এই সঙ্গে আর একটা কথা। জ্যোতিষ বলে চললো। কৃষিজমিতে যাতে বড় পুঁজি আক্রমণ না করে, দেখতে হবে। বড় পুঁজির সাহায্য নিয়ে দেশের লোকের খাদ্য সুরক্ষা নয়, চাই কৃষিজমিতে যারা কাজ করছেন তাদের স্বাধীনতা, চাই খাদ্য সত্ত্বার নিশ্চয়তা ... মানে কোনো এলাকার কৃষকদের হাতে থাকা উচিত সেই এলাকার চাষের সমস্যা সমাধানের, ফলন বৃদ্ধির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণী-ক্ষমতা, কর্তৃত্ব। বড় পুঁজির আক্রমণ হলে তা সম্ভব নয়। এরই পাশাপাশি কৃষিজমি দখল, নদী-খাল নষ্ট, মাছ-চাষীদের উচ্ছেদ, বন-জঙ্গল ধবংস, জীববৈচিত্র্য নষ্ট এসব বন্ধ হওয়া দরকার। তোকে পরে একদিন সময় নিয়ে বিশদে বোঝাব সব। শৌর্যেন্দু চিৎকার করল, এই তো...এই তো কাকা ঠিক বলেছে। ..এতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু যা এরা সবাই আনতে চাইছে তা হল বড়পুঁজি, পুঁজিনিবিড়, উচ্চপ্রযুক্তির শিল্প। প্রকৃতি বলল, পুঁজিনিবিড় মানে? শৌর্যেন্দু হাসল, ও তাই তো, একটু শক্ত বাংলা হয়ে গেল....এর মানে হল যেখানে প্রচুর টাকা লগ্নি মানে ইনভেস্ট করতে হয়ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ....এইবার বুঝলি তো? প্রকৃতি বলল, ও আচ্ছা।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, আবার শৌর্যেন্দু বোঝাতে শুরু করল, এই ধরনের শিল্প লাভ করে খরচ কমিয়ে...এতে সাধারণত প্রতি এক থেকে পাঁচ কোটি লগ্নি পিছু একটি চাকরি সৃষ্টি

হয়। হাইলি কোয়ালিফায়ড ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্টের চাকরি। আর এইসব মডার্ন টেকনলজির শিল্পে খুব বেশি অ্যানসিলারি ইউনিট হয় না। তার জন্য উর্বর জমি নষ্ট করে কৃষকদের উচ্ছেদ করা অর্থহীন।

এইটাই তো কথা, জ্যোতিষ বলল। ওরা অন্য কোথাও যাবে না, দানছত্র করতে আসছে না তাহলে সরকারই বা কেন কৃষক তাড়িয়ে সস্তায় জমি, কর ছাড়, শ্রম আইনে ছাড় আর বিদ্যুৎ জলের দামে দেবার দানছত্র করবে?

আরে কাকা কি বললে।ছেলেমেয়েরা হইহই করে উঠল।

ছেলেমেয়েদের সম্মেলক চিংকারে পাঞ্চালী মজা পেল। ওরা রোগটা ধরেছে ঠিক। ওগাল জেলার সিঙ্গুরের উর্বর জমি সরকার দিতে চাইছে এক বড় শিল্পপতিকে। তাদের সঙ্গে চুক্তিও করেছে সরকার। সেই চুক্তির খুঁটিনাটি গোপন রাখা হয়েছে। তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অনেকেই। অন্যদিকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া সিঙ্গুরের কৃষক শুরু করেছেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। এমনভাবে জমি দেওয়ায় বিপদে পড়ে যাচ্ছে বর্গাদাররা। বর্গা নথিভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু ভূমিসংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী তাদের হাতে জমির মালিকানা দেওয়া হয়নি। ফলে জমি নিয়ে নেওয়ায় জমির মালিক তেমন আপত্তি করছে না কারণ জমির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে এককালীন মোটা টাকা পেলেই খুশি। অন্যদিকে বর্গাদারের তীব্র আপত্তি। হবেই। কারণ তার বেঁচে থাকা জমি নির্ভর। ইদানীংকালে জমির মালিকদের সঙ্গে সখ্য বেড়েছে গ্রামের বামফ্রন্ট নেতাদের। তারা বর্গাদার নথিভুক্ত করাও চাইছে। ফলে ওই জমিতে অনথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যাও হাজার খানেক হবেই।

এই অঞ্চলের সমস্যা মেটানোর আশেপাশে মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ কারখানা, রাসায়নিক এলাকা বানানোর পরিকল্পনা শুরু। কি রাসায়নিক? আশপাশের এলাকার কোনো ক্ষতি হবে কী না? সেই বৃত্তান্ত নিয়ে লুকোচুরিতে গ্রামের মানুষের উদ্বেগ বাড়ছিল। ২০১৭ একদিন জমি দখলের খবর জানাজানি হতেই প্রতিরোধ। পুলিশ আর পাটিগ ওগুরা একযোগে নেমে পড়ল প্রতিবাদীদের শিক্ষা দিতে। গুলি চালিয়ে চোদ্দজন মহিলাকে হত্যা করল তারা। শাসককুল চেপ্টা করেছিল মরিচকাপির কায়দায় অত্যাচার চালানোর খবর প্রচার বন্ধ রাখতে। পারেনি। কয়েকটি টিভি চ্যানেল সব খবর ফাস করে দিল। জীবন্ত দেখাল নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের ওপর গুলি আর পুলিশের গুলিবর্ষণ। চোখে দেখতে পাবার অভিঘাত গভীর। মানুষ ফেটে পড়ে।

ছিয়াস্তর-সাতাস্তর সালের পরে আবার শহরে দেখা গেল প্রতিবাদের স্রোত। পাঞ্চালী হেঁটেছিল সেই মিছিলে। কিন্তু এত কাণ্ডের মধ্যে নকশালপন্থীদের উপস্থিতি তেমনভাবে চোখে পড়ল না। সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে প্রতিবাদী মানুষকে নেতৃত্ব দেবার অবস্থায় নেই তারা। এবার ভাঙা জোড়ার পরে এখন নকশালপন্থীদের দুটি বড় দল — সি পি আই(এম এল) লিবারেশন আর সি পি আই (মাওয়িস্ট)। দ্বিতীয় দলটিকেই এখন চলতি কথায় মাওবাদী এল। হচ্ছে। প্রতিটি ঘটনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে পাঞ্চালী।

কি গো পাঞ্চালীদি....হ্যাং করে গেলে নাকি? মিত্রাকরের গলা। ফিরে তাকাল পাঞ্চালী। খুব একটা ভাল না জানলেও পত্রিকার কাজ চালানোর মতো কম্পিউটারের জ্ঞান আছে তার। একেক সময় যন্ত্রটির পর্দায় নির্দেশিকার চিহ্ন এক জায়গায় আটকে যায়। এ বোতাম

টেপ, সে বোতাম টেপ, কোনো কিছুতেই তিনি নড়বেন না। ধ্যানমগ্ন সাধুর মতো হয়তো বা তার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে! তাকেই বলে হ্যাং করে যাওয়া। কিন্তু হঠাৎ এইকথা? মিত্রাক্ষর বলল, আমরা নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছি, মোবাইল বাজছে, তোমায় ডাকলামও দু'বার কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই.... এদিকে দেখি চোখ খোলা, বাইরে তাকিয়ে আছ....তাই ভাবলাম হ্যাং করে গেছ। পাঞ্চালী হেসে ফেলল। আরে....আমি তো তোদের কথাই ভাবছিলাম। কত কী জানিস তোরা! তোদের বয়সে আমরা এতকিছু জানতাম না....। শৌর্যেন্দু বলল, অ্যাঁই....অ্যাঁই....একদম বাজে কথা....পুরনো প্রেমিকদের কথা ভেবে চলেছ....আর এইসব বলছ এখন....। — কী সত্যি নাকি? জ্যোতিষ্ক বলল, চারপাশের গ্রাম দেখে পুরনো কথা মনে আসছে? পাঞ্চালী হাসল, আসছিল না যে তা নয়, তবে এখন তোদের কথাই ভাবছিলাম....।

—আচ্ছা ঠিক আছে, মেনে নিলাম। সেই সময়ের তোমাদের থেকে এই সময়ের আমরা অনেক বেশি খবর রাখি...কিন্তু আর কী তফাৎ দেখছ?

— অনেক কিছুই বদলে গেছে... সে তো ধোপার লিস্টি বানাতে বসতে হয়...

— ঠিক আছে, লম্বা লিস্ট বানাতে হবে না...তুমি শুধু বল তোমার নিজের দেখা কী হারিয়ে গেছে...কোনও আওয়াজ? কোনো মানুষ? কোনো খেলা?

— বাবা!এ তো সমাজ-গবেষকের মতো প্রশ্ন করলি! পাঞ্চালী একটু হেসে চুপ করে গেল।

পিছনের সবাই স্তব্ধ। ওরা উত্তর শোনবার জন্য উন্মুখ। পাঞ্চালীর মনে আসে নিরুপমের কথা। ও রাস্তার খেলার কথা বলেছে অনেকবার — ডাংগুলি, পিটুটু...। তারপর এ-পাড়া ও-পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ। সেখানে খেলোয়াড়দের উচ্চতা কোনোমতেই চারফুট দশ ইঞ্চির বেশি হওয়া চলবে না। রঙা হত চার-দশের ফুটবল। আর বলটিও ছোট — টেনিস কিংবা রবারের বল। রাস্তার কোনায় গুলিও খেলত ওরা। সবটাই বলল পাঞ্চালী। এইটা হারিয়ে গেছে। তারপর হারিয়ে গেছে নিজের কানে শোনা কিছু ফিরিওয়ালার ডাক — ঘুগনি, বেলফুল, কুলপি মালাই কিংবা মালাই বরফ। পাঞ্চালী জানাল। অভিজ্ঞান বলল, হ্যাঁ....হ্যাঁ....এই মালাই বরফ আমার কাকাও বলেছে...। গরমকালের সন্ধ্যাবেলায় নাকি আসত ওরা। — হ্যাঁ ঠিক। পাঞ্চালী বলল। সন্ধ্যাবেলায় আর কোন শব্দ হারাল? একটু ভাবতেই মনে এল। আগে সন্ধ্যার ঝোঁকে পাওয়া যেত শাঁখের আওয়াজ। পাড়ার কোনো ছোটখাট পুজোর থান থেকে ভেসে আসত কাঁসর ঘন্টার শব্দ। — তাই নাকি? লেখনী অবাক। পাঞ্চালী মাথা নাড়ল। — হ্যাঁ রে। আমাদের তো দেবদ্বিজে ভক্তি নেই কিন্তু ওই আওয়াজটা শুনতে বড় ভাল লাগত। এই তো সেদিনও...সাতাস্তর, আটাস্তরআশি সালেও তো শুনেছি মনে হয়....। জ্যোতিষ্ক বলল, এখন আর ওইসব শোনা যায় না....। —নাঃ এখন তো আর শুনি না, পাঞ্চালী বলল। হয়তো এখনও শাঁখ, কাঁসর ঘন্টা বাজে কিন্তু চতুর্দিকে যা গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, শোনা যায় না....।

অনুধা জানতে চাইল, কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ হারিয়ে গেছে কী না..। এই প্রশ্নের উত্তরে বেশি ভাবতে হল না পাঞ্চালীকে। সুকান্তিদার মুখ ভেসে এল। এরা বটগাছের মতো কত বিপন্ন পাখিকে আশ্রয় দেন। সুকান্তিদার পরিচয় দিয়ে পাঞ্চালী বলল, এই

সেদিনও এইরকম একাধিক মানুষ ছিলেন শহরের প্রায় প্রতিটি পাড়ায়। এইসব জনমিতার মতো মানুষেরা যে কোথায় হারিয়ে গেলেন।...

জনমিতা মানে? প্রকৃতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

— অভিধান দেখে নিবি। কপট রাগের ভঙ্গি করল পাঞ্চালী। সারাক্ষণ ইংরেজি বই পড়লে হবে? বাংলাটাও একটু শিখে নে...।

জ্যোতিষ হাসল। কীরে প্রকৃতি? ...কেস্ খেয়ে গেলি তো? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই প্রকৃতি ফেটে পড়ল, এমন দাঁত বের করে হাসছিল, যেন তুই জানিস...বল তো কী মানে? চাপ পেলেই বত্রিশ পাটি অল আউট যেন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন...শালা। জ্যোতিষ হাসতে হাসতে বলল, আর তুই কীসের? ফেয়ার অ্যান্ড...। বাস্ বাস্ আর নয়, মিত্রাক্ষর থামিয়ে দিল। এইবার ইন্টারভাল...সামনেই কোলাঘাট ধাবা।

যদিও ভাড়ার গাড়ি তবু এর ড্রাইভারকে খেতে ডাকা উচিত। গাড়ি থেকে নামবার সময় পাঞ্চালী চালকের দিকে তাকাল। দয়ানন্দ...তুমিও খেয়ে নিও...ঠিক আছে? দয়ানন্দ বলল, জী।

খাবার খুব সহজ — আগু কারি আর রোটি। শুধু শৌর্যেন্দু আর মিত্রাক্ষর খেতে চাইল মোমো আর চাউমিয়েন। সে কীরে। ধাবায় আজকাল এইসব চিনে খাবারও পাওয়া যায় নাকি! পাঞ্চালী অবাক। মিত্রাক্ষর বলল, নিশ্চয়ই। এখন তো চিনে খাবার হইহই করে চলে...দেখ না, শহরের রেস্টোরাঁ থেকে কুটিপাতে সর্বত্র চিনের জয়...রোলের দোকানকে হটিয়ে দিচ্ছে মোমো-চাউ...। — জনপ্রিয় খাবার, শৌর্যেন্দু যোগ দিল। আর জানই তো জনগণের সঙ্গে সবাই থাকতে হয়... ধাবাই বা ব্যতিক্রম হবে কেন? লেখনী বলল, এরপর দেখবে নাগাতে ইডলি, দোসাও পাওয়া যাচ্ছে...চিকেন কিংবা মটর দোসা!...

খাবার ফরমাল দিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, মেটে রঙের টেবিলে মুখোমুখি বসল সবাই। সামনের বাটিতে পেরাজ, লঙ্কা। এ ধাবার খাবার স্বাদু। নীরবে খেয়ে চলেছে সবাই। এ সময়ে সবাই নিজের মনে কথা বলে। হঠাৎ শৌর্যেন্দু বলল, ...আসলে এ রাজ্যের নেতারা সব এক-একটা পাগলা জগাই...সারাক্ষণ তিড়িং বিড়িং করছে। মোমোতে একটা কামড় বসাল শৌর্যেন্দু। আজ বলছে এই করব, সেই করব, কাল বলছে কে আমাদের আটকাবে? ...বিরোধীদের মাথা ভেঙে দেব...। মিত্রাক্ষর হাসল। — সত্যি ...এখানে একরকম...বিদেশে ওরা আবার অন্যরকম। একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল মিত্রাক্ষর। একজন ওদের নেতাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কী রাজ্যের বিমানবন্দর আধুনিকীকরণে পঞ্চাশ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগে রাজি? পাগলা উত্তর দিল হোয়াই ফিফটি? হোয়াই নট্ হান্ড্রেড? রুটি চিবোতে চিবোতে অনুচ্চা বলল, ভাবতে পারিস। ..এ পাগল, না পাঞ্জামা? হেসে উঠল সবাই।

— দেখ বাপু রাজ্যের মাথা হলে তিনটে কাজ করতেই হবে তোমায়। এক টুকরো তন্দুরি রুটি ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরে দিল জ্যোতিষ। সবাই তাকিয়ে, ছেলেরা রুটি চিবিয়ে যাচ্ছে। — এতো স্লো ইন্টারনেট স্পিড চলে না আজকাল, প্রকৃতি বলল। একটু তাড়াতাড়ি ডাউনলোড কর...তাড়াতাড়ি...। জ্যোতিষ অপ্রস্তুত। — বাঃ ভেরি গুড প্রকৃতি, ওয়েল সেড...। মিত্রাক্ষর হাসল। ফুলটস বল পেয়েছিল কী ওভার বাউন্ডারি...সোজা ছকা...।

জ্যোতিষের দিকে তাকাল মিত্রাক্ষর। কী কাকা এইবার তো তোমার পয়েন্ট কাটা গেল....খেলা ড্র....নাও এইবার শুরু কর...। — আমি বলছি, শৌর্যেন্দু থামাল জ্যোতিষকে। এক নম্বর, রামরাজ্য গড়বার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দুইনম্বর, প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে বলতে হবে কেন্দ্রের বঞ্চনা কিংবা বিরোধীদের চক্রান্ত আর তিননম্বর কথা হল, কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে লাঠি গুলি চালিয়ে দমন করে বিনাবিচারে জেলে ভরবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাম-রাবণ দুজনেই এই নিয়ম মেনে চলে।

পাঞ্চালী নীরবে মাথা নাড়ল। সত্যিই, এখনকার ছেলেমেয়েরা কত সহজে এই সারসত্য বুঝে গেছে। নির্বাচনী ব্যবস্থায় থাকতেও হয় প্রকাশ্য দলকে। আবার থাকলেও রাজত্ব করতে এসে এই সবই করে থাকে তারা।

মিত্রাক্ষর বলল, আসলে কী জানিস তো, এখন লড়াই একটাই...নীতির সঙ্গে নীতিহীনতার...। পাঞ্চালী মন দিয়ে শুনল বাক্যটি। নিজের মনে দু-বার আবৃত্তি করল। কোনো কোনো বাক্য সহজ সরল। অথচ তা নিমেষে সারসত্যটিকে চিনিয়ে দেয়। মিত্রাক্ষরের উচ্চারণ তেমনই কিছু। সবাই চুপ করে গেল।

একদল মানুষ সুস্থ সম্পর্ক গড়বার শপথে নীতি রচনা করে। পরবর্তীতে কেউ সরে এসে নিজের সুবিধের পথ নেয়। বানিয়ে নেয় তার স্বপক্ষে কিছু প্রয়োজনীয় যুক্তি। নিজের মনকে ভোলাতে হবে তো! এই চ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই না করলে বিপদ। ক্রমশ সেই পথভ্রষ্ট মানুষ ঘনঘন নীতি বদলায়, নিজের নীতি নিয়েই লড়াই করে। কোনো একদিন তার আর নীতির প্রয়োজন হয় না। সে নীতিহীন হয়ে গেছে। সে নিষ্ঠদের দলে টানতে চায়। লোভ দেখায়। না এলে এরা তাকে ক্ষমা করে, হয় করে, অপমান করে। তাতেও কাজ না হলে সেই তন্নিষ্ঠ মানুষটির ক্ষম অপেক্ষা করে থাকে নীতিহীনদের হাতে শারীরিক নিপীড়ন। তাদের হাতে কোনোদিন ক্ষত-বিক্ষতও ঘটে তার। তখন আবার এই ভ্রষ্টরাই শ্রদ্ধেয় মানুষটির ছবিতে মালা দেয়। শোকগাথা লেখে! ওদের কাছে অপমান আর শ্রদ্ধার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সবই প্রয়োজন-ভিত্তিক। যুগে যুগে, কালে কালে সারা পৃথিবীতে এমনই ঘটনা চলেছে। এই সরকারি দল তো তেমনই ভ্রষ্ট কিছু মানুষের আখড়া। অথচ কত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, নীতি, ত্যাগ মিশেছিল শুরুর দিকে। সব গ্রাস করে নিল কিছু সুবিধাভোগী। তারাই রাজপাট চালাচ্ছে এখন।

....এর মধ্যে ওই পাগলা জগাই লিখেছে... জ্যোতিষের গলা। পাঞ্চালী তাকাল। —লিখেছে যে এখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এখন পুঁজিবাদের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। শৌর্যেন্দু হাসল, ও পাগলাটা তো পুঁজিবাদের জন্য কাজ করছে।

লেখাটা পড়েছে পাঞ্চালী। ওই লেখায় শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা, কৃষকের স্বার্থরক্ষা নিয়ে একটিও কথা নেই। উচ্ছেদ নিয়ে কিছু বলা নেই। পুঁজির আক্রমণ নিয়ে কোনো সাবধানতা নেই। বরং পুঁজির স্বার্থরক্ষা নিয়ে একগাদা স্তব্ধ আছে...।

মিত্রাক্ষর বলল, দ্যাখ মার্কসও পুঁজির প্রসার চেয়েছিলেন, তবে এমনভাবে নয়। মিত্রাক্ষর আরও বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জ্যোতিষের মোবাইল বেজে উঠল। কথা বলতে বলতে ছেলেটা হঠাৎ গভীর হয়ে গেল। শৌর্যেন্দু, মিত্রাক্ষরের দিকে তাকাল একবার। কথা শেষে চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল জ্যোতিষ।

কী চল, রে? অভিজ্ঞান বলল। জ্যোতিষ মুখ তুলল। — আমি যাব নারে...।
সে কী। কেন? সবার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। জ্যোতিষ জানাল, ঝাড়গ্রামের ওই সভায়
গোলে নাকি সবাইকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। যাদেরকে মারা হয়েছে
তারা মাওবাদী। ওরা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। এখন ওখানে যাবার অর্থ মাওবাদীদের
সমর্থন করা।

অভিজ্ঞান বলল, কী আশ্চর্য! এত রাগী রাগী কথা বলে তুই এখন এমন ভয় পাচ্ছিস
কেন? আমি এই প্যাংলা চেহারা নিয়ে যেতে পারলে, তুই পারবি না কেন? চল, চল...।
জ্যোতিষের কাঁধে হাত রাখল অভিজ্ঞান। ও কোনো উত্তর দিল না। শৌর্যেন্দু বলল,
আমরা কী অন্যায় করছি? যৌথবাহিনী শালবনীর জঙ্গলে কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে
মেয়েছে। বলছে, ওরা উগ্রপন্থী। ওদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল। তার মধ্যে এক তরুণ আর
তরুণীকে নিহত জন্তুর মতো হাত পা বাঁশে বেঁধে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে...এইটা বর্বরতা
...অমানবিক কাজ...। লেখনী বলল, হ্যাঁ ঠিকই...আমরা সেই বর্বরতার প্রতিবাদ করতে
গাচ্ছি... কোনোরকম রাষ্ট্রদ্রোহিতা তো নয়...। অনুষ্কা বলল, আমি তো সবটা জানি... ঘুমন্ত
অবস্থায় ওদের মেরে দিয়ে তারপর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে পুলিশ সংঘর্ষে মৃত্যুর গল্প ফাঁদছে।
মেয়েটির স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। অভিজ্ঞান বলল, শোন...ওরা মাওবাদী হলেই বা ক্ষতিটা
কোথায়? আমরা তো অন্য কিছু নয়, মৃতকে যথাযথ সম্মান দেখান হয়নি বলে প্রতিবাদ
করছি...।

প্রকৃতি থামিয়ে দিল। ঠিকই...কিন্তু নন...বলল ধারায় গ্রেপ্তার মানে বিনাবিচারে
জেলে ফেলে রাখবে...এটা তো মুশকিল...কলকাতায় থেকেও তো প্রতিবাদ করা যেত।
মিঞাকর মাথা নাড়ল, না রে কলকাতায় থেকে বলা আর ওইখানে গিয়ে গ্রামের মানুষের
পাশে দাঁড়িয়ে সাপোর্ট, সলিডারিটি জানানোর মধ্যে অনেক তফাৎ। তা না হলে আর
গাটের কড়ি শুনে গাড়ি ভাড়া করে ঝাড়গ্রাম যাব কেন? বল?

প্রকৃতি জ্যোতিষ দুজনেই চূপ। ওদের শরীরভাষায় বোঝাই যাচ্ছে, যেতে নারাজ।
শৌর্যেন্দু, বলল, আশ্চর্য! আমরা সবাই থাকব...গ্রেপ্তার করলে সবাইকে করবে, 'তোরা
দুজনে এত ভয় পাচ্ছিস কেন? চল, চল...চারটেয় মিটিঙ শুরু...এখান থেকে আরও দু-
খন্টা। জ্যোতিষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। না, আমার অসুবিধে আছে...। মুহূর্তে আবহাওয়া গভীর।
ডেপেমেয়েদের চোখে মুখে উত্তেজনা, বিরক্তি...। কিছু পরিমাণ রাগও জমা হয়েছে।

পাঞ্চালী কথা বলল এইবার। — শোন...ওরা ফিরে যেতে চাইছে তোরা এমন করে
আটকাচ্ছিস কেন? হতেই পারে ওদের অস্বস্তি হচ্ছে...এমনভাবে চাপ দিলে তা কমবে?
জ্যোতিষের দিকে তাকাল পাঞ্চালী। — নে বস...খাওয়াটা শেষ কর তাড়াতাড়ি। প্রকৃতির
পিঠে হাত বুলিয়ে দিল একবার। চিন্তা করিস না...সাবধানে ফিরে যা।

খাওয়া শেষ করে পাঞ্চালীর সামনে দাঁড়াল জ্যোতিষ। কেউ কথা বলছে না ওর
সঙ্গে। একা যাস না... প্রকৃতিকে নিয়ে যা, বলল পাঞ্চালী। পকেটে পয়সাকাড়ি আছে
না দেব? জ্যোতিষ মাথা নাড়ল, আছে। ওরা যাবার মুহূর্তে পাঞ্চালী বলল, যদি শুনিস
আমরা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছি...সবার বাড়িতে খবর দিয়ে দিবি... আর, আমরা খবরটা

দিবি পত্রিকা অফিসে....কেমন? জ্যোতিষ, প্রকৃতি দুজনেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।
— ঠিক আছে, তোরা কীসে ফিরবি? ট্রেনে? জ্যোতিষ আবার মাথা নাড়ল। তাহলে
আর দেরি করিস না, এগিয়ে পড়।

কোলাঘাট থেকে আবার যাত্রা। পিছনের সবাই চূপচাপ। মাঝে মাঝে নিচুগলায় কথা
বলছে। শালা...রেনিগেড..., অনুষ্কার ফিসফিসে স্বর। বোঝাই যাচ্ছে দলত্যাগী দুজনের এই
আচরণ বিশেষত জ্যোতিষের এই ব্যবহার ওদের কাছে অপ্রত্যাশিত। এইভাবেই মানুষ
চিনতে চিনতে ক্রমশ ওদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। পাঞ্চালী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। রাস্তার দু-
ধারে সবুজ। মাঝে মাঝে হলুদ সর্ষে ক্ষেত। পানের বরোজ। সুপুরি বাগানও চোখে পড়ল
দু-একটি। এই জমি কোনোদিন ছেড়ে দিতে হলে, কষ্ট তো হবেই।

আদিবাসী এলাকায় অবশ্য এত কৃষির সমৃদ্ধি নেই। ওখানে কঠিন দারিদ্র্য। প্রতিদিন
বঞ্চনা আর অপমান। ভারতের অধিকাংশ আদিবাসী প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন। গরীব আদিবাসীরা
অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তীশগড়, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের যে এলাকায় থাকেন
সেই বনাঞ্চলে, সেই জঙ্গলঘেরা টিলায়, পাহাড়ে আছে বিপুল খনিজ সম্পদ। এই সম্পদ
অধিগত করতে দেশবিদেশের শিল্পগোষ্ঠী সার বেঁধে আসছে। ওদের একটাই লক্ষ্য
আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের সাম্রাজ্যের পত্তন। পূর্ববাসনের ব্যবস্থা না করে
উচ্ছেদ করলে, স্বাভাবিকভাবেই ভূমিপুত্র আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জন্মাবে। এই
বঞ্চনার প্রতিবাদে আদিবাসীদের একজোট করেই সাম্রাজ্যবাদের উত্থান।

তবে শালবনীর লালগড়ের জোট বাঁধার কাহিনীটি ভিন্ন। ঘটনাক্রমটি স্পষ্ট মনে পড়ল
পাঞ্চালীর। ২ নভেম্বর ২০০৮। শালবনীতে এক বড় শিল্পপতির ইস্পাত প্রকল্প উদ্বোধন
করে মুখ্যমন্ত্রী ফিরছিলেন। ফেরার পথে কলাইহাতিতে মাইন বিস্ফোরণ ঘটল। তারপরেই
ওই এলাকায় শুরু হয়ে গেল পুলিশের নির্মম অত্যাচার। ৩ নভেম্বর। সপ্তম, অষ্টম, নবম
শ্রেণীর তিন ছাত্রকে ধরল পুলিশ। ওদের বিরুদ্ধে আনা হল রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ষড়যন্ত্র, হত্যার
চেষ্টা, মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি নানান ভয়ংকর অভিযোগ। পরে জামিনে মুক্ত ওরা।
৫ নভেম্বর। লালগড় অঞ্চলের পর্যটনশ্রী গ্রামে নৈশ অভিযানে নামল পুলিশ। পুলিশের
বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে নষ্ট হল ছোটপেলিয়া গ্রামের ছিতামণি মুরুর চোখ। পানমণি
হাঁসদার বৃকের উপর পড়ল পুলিশের নাল লাগান বুটের লাথি। পাঁজর ভেঙে গেল।
আরও মহিলা আক্রান্ত হন। অভিযোগ ওঠে ধর্ষণ, স্ত্রীলতাহানির। একে অভাব, তার ওপর
অপমান। এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। পরের দু-দিনের মধ্যে এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে গেল
অত্যাচারের খবর। সিসুুর, নন্দীগ্রামের কৃষকরা যা করেছিলেন এরাও সেই পথ ধরলেন।
পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচতে, লালগড়ের হাজার হাজার নারীপুরুষ রাস্তা কেটে, গাছের
গুঁড়ি ফেলে গ্রামে ঢোকবার পথ দুর্গম করে দিয়ে গড়ে তুললেন এক ধরনের মুক্তাঞ্চল।
গড়ে উঠল পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। তাদের দাবি খুবই সামান্য —
অত্যাচারী পুলিশের বড়কর্তাকে গ্রামে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। পুলিশ চাইল না। শহরের
কিছু সংবেদী মানুষ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলকাতার ওদের সমর্থনে জনমত
গড়ে উঠতে থাকে। দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে, বিদেশ থেকেও লালগড়ের অত্যাচারিত
মানুষের উদ্দেশে সমর্থনবার্তা এসে যায়।

একশেষেই মাওবাদীরা এই আন্দোলনে ঢুকে পড়ল। আন্দোলনের রাশ হাত নিয়েই তারা শত্রু করল শত্রু ওখম। স্কুল পড়ুয়াদের সামনে শিক্ষককে হত্যা। নিহত সি পি এম কমীর দেহ দিনের পর দিন রোদে ফেলে পচান। অত্যন্ত অববেচনার কাজ। এর ফলে যে আন্দোলন অনেক রকম মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ে উঠেছিল, সেই গণতান্ত্রিক আবেদনটা নষ্ট হয়ে গেল। শহর-শহরতলি-মফস্বলের অনেক সংবেদনশীল মানুষ, যারা ছিলেন এর পক্ষে, সরে গেলেন। আর রাজ্য সরকার যা চাইছিল, সেই দমন নামানোর অছিল। পেয়ে গেল। শুরু হল অপারেশন গ্রিন হাট। কেন্দ্রের পুলিশ আর রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যৌথবাহিনী জঙ্গল ছাউনি ফেলল। ২০১০-এর গোড়া থেকেই মাওবাদী সম্মুখে আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে যৌথবাহিনীর পুলিশ।

পিছনের আসন অনেকক্ষণ নীরব। ছেলেমেয়েদের এমন স্রিয়মাণ দেখতে ভাল লাগে না। পাঞ্চালী বলল, কীরে তোরা সবাই ন্যাদ খেয়ে গেলি নাকি? ...গান কর না... গান...তোদের প্রিয় বব ডিলানের সেই গানটা যেটা আমায় শেখালি, ধর দিকিনি...। পিছনে নড়াচড়ার শব্দ হয়। শৌর্যেন্দু, তুই মাউথ অরগ্যান এনেছিস? — হ্যাঁ দিদি...ওইটা তো সবসময় পকেটেই থাকে। — বাঃ শুভ!ইন্টারলিউটটা ভাল করে বাজাবি। অনুষ্কা...তুড়ি মেরে ভাল দিতে হবে...। মিত্রাক্ষর, লেখনী, অভিজ্ঞান তোদের সবার গলায় ভাল সুর, অতএব বৎসরা এবার কষ্ট ছাড় জোরে!...

পাঞ্চালী ধরল, হাউ মেনি রোডস্ মাস্ট আসন ওয়াক ডাউন বিফোর ইউ কল হিম এ ম্যান? ...সম্মেলক কষ্ট জেগে উঠল হাউ মেনি সিজ মাস্ট আ হোয়াইট ডব সেল বিফোর শি স্লিইপ্‌স ইন স্যাণ্ড? গান আরম্ভ হয়ে গেলে সে তার নিজের গতিতে চলে। ...ইয়েস, হাউ মেনি টাইমস্ কষ্ট আসন ম্যান টার্ন হিজ হেড্, প্রিটেন্ডিং হি জাস্ট ডাজনট সি?...
AMARBOI.COM

শৌর্যেন্দুর মাউথ অরগ্যানের আওয়াজ গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে দু'ধারের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেটা ওইটুকু যন্ত্র থেকে কী ভাল সুর জাগায়। রক্তের শিরায় শিরায় মিশে যায় সেই সুর...। ...ইয়েস, হাউ মেনি ডেথ্‌স্ উইল ইউ টেক টিল হি নোজ দ্যাট টু মেনি পিপল হ্যাভ ডায়েড? দ্য আসার মাই ফ্রেন্ড ইজ ব্রোয়িন ইন দ্য উইন্ড, দ্য আসার ইজ ব্রোয়িন ইন দ্য উইন্ড.....।

গানের শেষে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। পাঞ্চালী বলল, খুব ভাল গেয়েছিস। শৌর্যেন্দু, অনবদ্য বাজালি...। শৌর্যেন্দু বলল, ইস্ জ্যোতিষ্কটা থাকলে আরও ভাল হত, কী সুন্দর শিস্ দেয় কাকা...। লেখনী বলল, প্রকৃতি থাকলেও মজা হত...ও কেমন কায়দা করে ইংরেজি উচ্চারণ করে। আমরা সাদামাঠা ভাবে বলি ডাউন, ও বলবে ডাউন....হাউ মেনি রোডস্ মাস্ট আসন ওয়াক ডাউন...

অনুষ্কা বলল, কেন যে ওরা শুধুমুদু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল? অভিজ্ঞান বলল, দেখ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে ওদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না... জঙ্গলমহলে যা মারকাট চলছে...কে যে ঠিক বোঝা মুশকিল...আজকাল অনেকেই ওইখানে সাধারণ প্রতিবাদ সভাতে যেতেও ভয় পাচ্ছে...ভাবছে, এই রে এর পেছনে বোধ হয় মাওবাদীরা....ওরা গণসংগঠনকে শুধুমাত্র নিজেদের বাঁচবার ঢালের মতো ব্যবহার করতে চাইছে। -- হঁ...কথাটা কিন্তু

একবারে ভুল নয়, মিত্রাক্ষর বলল, ওরা একটা বেশ বড় বেসড্ মুভমেন্টকে খুচরো মারকাট করে শেষ করে দিল...

লেখনী।। ...সব মিলিয়ে দেখবি, ওদের কাছে সবার ওপরে অস্ত্র সত্য...

মিত্রাক্ষর।। ...একদম ঠিক কথা। চাঁদা আদায়...অস্ত্রশস্ত্র কেনা ...লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ...আক্রমণ...এলাকা দখল...আবার চাঁদা আদায়...এইভাবেই চলছে সব।

অনুষ্ঠা।। এটা পুরোপুরি ঠিক নয় ... ওভারসিমপ্লিফিকেশন ... ছত্তিশগড়ে ওরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করেছে, ওদের জন্য স্কুল, হেলথ-সেন্টার খুলেছে আর তাছাড়া এইভাবে লড়াই করে যদি একদিন পুরো দেশ হাতে এসে যায় তাহলে তো ভালই...ক্ষতিটা কোথায়?

অভিজ্ঞান।। ঠিক আছে তর্কের খাতিরে না হয় মানলাম ওরা গরিব আদিবাসীদের মধ্যে ভাল ভাল কাজ করেছে। কিন্তু এমন কাজ ওরা একা নয়, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই করে থাকে। আর দ্যাখ, ওদের পথে দেশ হাতে এসে যাবে কী না ঠিক বলতে পারব না, তবে এটা যে মার্কস-লেনিনের পথ নয়, মাও-এর দেখান রাস্তাও নয়, তা হলফ করে বলতে পারি! মাও-কে তো এদের মতো হঠকারীদের বিরুদ্ধে লড়তেও হয়েছিল...

শৌর্যেন্দু।। একদম বাজে কথা...

অভিজ্ঞান।। মাও এদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা স্বীকার করতে চায় না যে সামরিক ব্যাপার রাজনৈতিক কাজকে সম্পন্ন করবার একটা উপায় মাত্র। এমন কথাও এরা বলে, আপনি যদি সামরিক ব্যাপারে দক্ষ হন, তবে আপনি রাজনৈতিক ব্যাপারেও দক্ষ। এর অর্থ, সামরিক বিষয়টিকে রাজনীতির ওপরে জায়গা দেওয়া। বিশুদ্ধ সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হল একটি নিকৃষ্ট ধরণের রাজনীতি...ভাড়াটে সেনার মানসিকতা...এ হল সামরিক বিষয়ের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস আর ব্যাপক জনগণের শক্তির ওপর আস্থার অভাব...

অনুষ্ঠা।। একদম উল্টো পাশটা কথা বলিস না তো...

মিত্রাক্ষর।। আরে! তুই ওর ওপর রেগে যাচ্ছিস কেন? এটা তো মাও সে-তুঙের কথা ও স্রেফ বাংলা অনুবাদের উদ্ধৃতি দিল...

অনুষ্ঠা।। তবু তো ওরা কিছু করেছে, আর সবাই তো এই অবস্থাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

লেখনী।। না রে, এ পুরো ঠিক নয়, লিবারেশন গ্রুপ যারা, তারা একটু অন্যরকম...

অনুষ্ঠা।। দূর! ওরা পুরো জালি, সি পি এম-এরই চকচকে সংস্করণ!

মিত্রাক্ষর।। দেখ আমি যদূর পড়েছি ওদের লেখাপত্তর, খারাপ লাগে নি... ওদের প্রকাশ্য গোপন দু-রকম সংগঠনই আছে। তবে এ রাজ্যে এখনও ওদের শক্তি বড় কম...বোধহয় সেইজন্যই কোনো ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে না...আগামীতে হয়ত বেড়ে উঠবে ওরা...আর যদি ওরাও শুধুমাত্র ভোটের লাইন নিয়ে পড়ে থাকে, প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখেও পার্লামেন্টের মহিমা প্রচার করে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করে, এ পথেই খোলনলচে পাশ্টান সম্ভব, মানুষই ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওদের...তবে এখনই ওদের ছোট করা উচিত নয়...

লেখনী।। আর...পছন্দ না হলেই কাউকে জালি-ফালি বলিস না তো...এ কী কথাবার্তা।

পঞ্চম ০৭ নং, তাকে গাধা দিলাম...খতম করলাম...এইগুলো এবার বন্ধ হওয়া দরকার।

আগে গাধাপসিমা কী যে বললি! শৌর্যেন্দুর গলা। তোর গলায় প্রতিবাদ এলেই টোটো তিরতির করে ঝলসে ওঠে...বড় চুমু খেতে ইচ্ছে করছে..। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। নিশ্চয়ই লেখনীর আপত্তি নেই। নিশ্চয়ই শৌর্যেন্দু ঠোটে ঠোট চুমু খাচ্ছে...। পাঞ্চালী এই ছেলেমেয়েদের অনেক কিছুই বুঝতে পারে। নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। নতুন যুগের সুর, তাল, ভাষা তো পালটে যাবেই। কিন্তু এই একটি জিনিসের সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারেনি এখনও। ওরা মাঝে মাঝেই এমন প্রকাশ্যে চুমু খায়। এই মানসিকতা সে বুঝতেও পারে না ঠিক। যা একান্তে সম্পন্ন করবার, তা কী করে প্রকাশ্যে করে এরা? কেনই বা করে? সে প্রতিবাদ করে না কখনওই। অনামনস্কতার ভান করে। সামনের আসনে কাঠ হয়ে বসে রইল পাঞ্চালী। কিছু পরে লেখনী বলল, আমি এবার তোর কান কামড়াই...। জোরে নয় কিন্তুশৌর্যেন্দু বলল। ইঠাৎ পাঞ্চালীর নজরে পড়ল অল্প কিছুদূরে রাস্তার বামদিক ঘেষে দাঁড়িয়ে একটি ছোট গাড়ি। গাড়ির পিছনে রোগা, লম্বা, শ্রবীণ গোছের মানুষ। ভদ্রলোক হাত দেখিয়ে সামনের গাড়িগুলিকে থামবার অনুরোধ জানালেন। পরপর চারটি গাড়ি বেরিয়ে গেল, কেউ থামল না।

পাঞ্চালী হাত তুলে থামতে বলল দয়ানন্দকে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। লম্বা, শ্যামবর্ণ, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট, কালো ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পাঞ্চালীর বয়সি, অথবা বছর দুয়েক বড়ও হতে পারেন।

—আমার নাম হীরেন সমাদ্দার, ফর্টনাইটলি ড্রাইভেস্ট ম্যাগাজিনের সাংবাদিক....আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন? ...আমাদের গাড়িটা আঁরান হয়ে গেছে...ওদিকে আবার সময়মতো পৌঁছতে না পারলে...। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন ভদ্রলোক।

ভাল করে দেখল পাঞ্চালী। গাড়ির সামনের কাঁচে লেখা প্রেস। বনেট তোলা। একজন বনেটে মাথা গুঁজে খুঁটখাট করে যাচ্ছে।

— আপনি যাবেন কোথায়? পাঞ্চালী বলল

— সে তো অনেক দূর.... ঝামেলার জায়গা...তবে আমাকে সামনে খড়গপুরে নামালেই চলবে...

— ঠিক আছে, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। পিছনের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল পাঞ্চালী। কী রে? ঠিক বলেছি তো? — অবশ্যই। ওরা হই হই করে উঠল। আরে...আমাদের দিদি যা বলে সব ঠিক...।

হীরেনবাবুর মুখে হাসি ফুটল। ধন্যবাদ। উনি নিজেদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারাপদ, আমি এদের সঙ্গে যাচ্ছি, খড়গপুরে গাড়ি ভাড়া করে নেব। এর মধ্যে সারান হয়ে গেলে, আমায় মোবাইলে জানিও। শৌর্যেন্দু আর মিত্রাক্ষর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। পাঞ্চালীও নামল। হীরেনবাবু বললেন, আমাদের ড্রাইভার ট্রাকে চেপে চলে গেছে ইঞ্জিনের কোনো যন্ত্র আনতে। বনেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে মিত্রাক্ষর বলল, তাহলে ইনি কে? ও তো তারাপদ, আমাদের ফটোগ্রাফার। হাসলেন ভদ্রলোক। তারাপদ এদিকে এস, তোমাকে সবাই ড্রাইভার ভাবছে...

পাঞ্চালীর করা প্রশ্নটি শৌর্যেন্দু আবার করলো, আপনি যাবেন কোথায়?

— ঝাড়গ্রাম....আজ ওইখানে একটা সভা হবে...

— আরে! আমরা তো ওইখানেই যাচ্ছি...

— তাই নাকি! ওঃ তাহলে তো খুব ভাল হল। হীরেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল। ফটোগ্রাফারের কাঁধে হাত রাখলেন ভদ্রলোক। তারাপদ, তাহলে আমি ওদের সঙ্গে সোজা ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি, তুমিও ওইখানেই চলে এস। তারাপদ মাথা নাড়ল, ঠিক আছে। মিত্রাক্ষর বলল, আপনি চাইলে ক্যামেরাটা আমরা নিয়ে যেতে পারি...তাহলে খালি হাতে আসতে পারবেন। তারাপদ হাসল, না ভাই চিত্রসাংবাদিক কখনও নিজের ক্যামেরা হাতছাড়া করে না....কখন কী কাজে লাগে...। হীরেনবাবুর দিকে তাকাল তারাপদ। — দাদা, আপনি চিন্তা করবেন না....গাড়ি সারান না হলেও আমি ট্রাক, মোটর সাইকেল কিছু চেপে ঠিক পৌঁছে যাব।

পিছনের আসনেই বসান হল হীরেনবাবুকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এক-দেড় বছর অধ্যাপনা। তারপর থেকেই সাংবাদিকতা করছেন ভদ্রলোক। অভিজ্ঞতা কম নয়। খবর জোগাড় করবার নানান কাহিনী শোনাচ্ছেন ভদ্রলোক। ছেলেমেয়েরা শুনছে। তর্কও করছে।

অভিজ্ঞান।। আপনারা শহরের ভদ্রলোকদের মানে আমাদের সমস্যা নিয়ে বেশি লেখালেখি করেন, কিন্তু গ্রামের গরিব কি ছোট শহরের গরিবদের কথা তেমন লেখেন না...

হীরেন।। কেমন শুনি?

লেখনী।। এই ধরুন শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হয় কিন্তু গ্রামের পানীয় জলদূষণ নিয়ে তেমন একটা লেখা দেখা যায় না কারণ এটা আদতে গ্রামের গরীব মানুষের সমস্যা...

মিত্রাক্ষর।। দেখুন, শহরে একটি ধর্ষণের ঘটনা হলে, সংবাদমাধ্যমে তা বিপুল প্রাধান্য পায়, খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে যায় সেই খবর, অথচ গ্রামে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটায় মুখিয়া, রাজনৈতিক গুস্তারা, পুলিশ.....অধিকাংশ অত্যাচারই অশিক্ষিত গরীব মানুষের ওপর। কিন্তু ছাপা হয় না, হলেও খুবই ছোট করে....ভেতরের পাতায় সংক্ষিপ্ত সংবাদে...তারপরে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, ডাক্তার নেই, সেখানে পৌঁছতে পাকা সেতু, ভাল রাস্তার প্রয়োজন সেই সব কথা প্রায় ছাপাই হয় না...হলেও বছরে একবার কি দু'বার অথবা ভোটের আগে...

হীরেন।। আমি পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছি না এই কথা। তবে উলটো দিকটাও ভাবতে হবে একবার। আমাদের কাগজ বা যে কোনো কাগজ পড়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তরা। তারা অধিকাংশই থাকে শহর কিংবা শহরতলিতে। এরা তো কাগজে সেই সমস্যারই আলোচনা, প্রতিফলন দেখতে চাইবে, যা তাদের সমস্যা....তারা পড়লে কাগজের বিক্রি বাড়বে...আবার বিক্রির সংখ্যা দেখিয়ে কাগজের মালিক বিজ্ঞাপন জোগাড় করবে। বিজ্ঞাপন দেবে কারা? বড় বড় বেসরকারী কোম্পানি, যা চালায় নার্মী শিল্পপতিরা....আর কিছু আসবে সরকারি সংস্থা থেকে....

অভিজ্ঞান।। বুঝেছি...যারাই বিজ্ঞাপন দেবে, তারা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবে কাগজের নীতি। কোনো জনবিরোধী, কৃষক উচ্ছেদকারী সংস্থা সংবাদপত্রে

পাতাজোড়া গিঞ্জাপন দিলে সেই কাগজের মালিক ওই কোম্পানির নামে খারাপ কথা লেখার আগে দু'বার ভাববে....

হীরেন।। আব্দুললুটলি কারেঙ্ক।যতবড় সংবাদমাধ্যম তার তত চিন্তা। আনুষঙ্গিক খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে অথচ বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে না তেমন, তখন অনেক ভেবেচিন্তে চলতে হয় তাকে। উচিত কথা লেখার আগেও অনেক মাথা ঘামাতে হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজ চালাতে গেলে এই সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে তোমায়....

হীরেনবাবুর কথা বেশ আকর্ষক। ছেলেমেয়োগা মজা পেয়েছে। গল্পে আড্ডায় রাস্তা ফুরোতে সময় লাগে না। অচিরেই ঝাড়গ্রাম পৌঁছে গেল গাড়ি। আরও কিছু গাড়ি ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

কিছুটা ফাঁকা জমি। তারই একদিকে মঞ্চ। অদূরেই গ্রামের বাড়ি। দোকানও রয়েছে। ভিড় হয়ে গেছে বেশ। আদিবাসী মানুষের ভিড়। কত লোক? আন্দাজে বোঝবার চেষ্টা করল পাঞ্চালী। তা প্রায় হাজার তিন চার বা তার কিছু বেশি মানুষ হতে পারে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল পাঞ্চালী। চলল ভিড়ের শেষের দিকে। ওইখানে থেকে সমগ্রটিকে বোঝা যায়। হীরেনবাবু চলে গেছেন সামনের দিকে। ছেলেমেয়েরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

সভা আরম্ভ হতে যাকে মঞ্চে হাত ধরে তুলে চেয়ারে বসান হল, তাকে দেখে চমকে গেল পাঞ্চালী। সুকান্তিদা। বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন। নব্বই পেরিয়েছে নিশ্চয়ই। শীর্ণ হয়ে গেছে শরীর। তবে কাঠামোটি এখনও ঝড়ু।

আমার বন্ধুরা। সুকান্তিদা কথা বলতে শুরু করলেন। কণ্ঠস্বর পাতলা হয়ে গেছে। কিন্তু ওই আওয়াজেই বুকের ভেতরটা স্মৃতিমেদকে সুকান্তিদা মানেই নিরুপম। নিরুপমের প্রসঙ্গে দ্রোণ। ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে মোড়ক দুটি নিয়ে নিল পাঞ্চালী। স্মৃতি এমনই। বুকের কোথায় যে জমা থাকে তার জন্য এত অঙ্গির, ভালোবাসা, বোঝাই যায় না।

আপনাদের একটা পুরনো ঘটনা বলি। অবশ্য খুব পুরনো নয় মাত্র নব্বইর আগেকার কথা। সুকান্তিদার গলা। ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিটা সেই একইরকম। ১৮ এপ্রিল ২০০১। অসমের ধুবুড়ি জেলার বরাইবাড়ি গ্রামে সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত হলেন আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের পনেরজন জওয়ান। মৃত সীমান্তরক্ষীদের বিকৃত দেহ এই ছেলেমেয়ে দুটির মতোই বাঁশের খুঁটিতে ঝোলান অবস্থায় ফেরৎ দিয়েছিল ওধারের সংঘর্ষকারী সেনাবাহিনী। সারা দেশ দিক্কার জানিয়েছিল সেই ঘটনাকে। তার নিজের দলের সমালোচনা থেকে তখনকার প্রধানমন্ত্রীও রেহাই পাননি। সেই নিষ্ঠুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল এই পশ্চিমবঙ্গে। সেখানে এমন এক শাসকদল যারা মুখে অন্তত নিজেদের মানুষ-দরদী, বামপন্থী বলে থাকে...। সুকান্তিদা একটু থামলেন। জল খেলেন। আবার শুরু করলেন।

....সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাটাও ভেবে দেখুন আপনারা। এরা এই মৃতদেহ বহনের দ্বি-প্রথম পাতায় ছেপে, তাকে সাফল্য বলে প্রচার করছে। আশ্চর্য! কেউ কোনো জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করলে আমরা বলি সাফল্য, পাহাড়চূড়ায় উঠলে, কোনো শত্রু পরীক্ষা পাশ করলে, খেলায় কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারালে, আমরা ওই একই কথা বলে থাকি। সুকান্তিদা থামলেন আর একবার। পাশের থেকে একজন জল এগিয়ে দিল। উনি খেলেন না। দম নিলেন ভাল করে। ঠোট নড়ে উঠল আবার।

...আসলে একটা ভয়ের আবহ তৈরি করবার চেষ্টা চলছে। বোঝান হচ্ছে, তোমরা মাওবাদী হলে বা ওদের সমর্থন করলে এই হাল হবে। নবতিপন্ন মানুষটিকে যেন বলায় পেয়েছে। বলছেন। থামছেন। দম নিচ্ছেন। আবার বলছেন।

— রাজনীতির নামে আমি মোটেই কথায়-কথায় মানুষ খতম সমর্থন করি না। কিন্তু একটি কথা আমি ভেবে চলেছি...। সুকান্তিদা বললেন ভাবনার কথা। গরিব মানুষ ও রকম পথ বাছলেন কেন, যেখানে মরণ ছাড়া আর কিছু নেই? আমরা কী তবে এমন একটা নির্দয় হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, যেখানে সমাজের হিংসা অপমান বঞ্চনার থেকে মৃত্যুকে বেশি পছন্দ করছেন গরিব মানুষ? যদি তাই-ই হয়, তাহলে এই সমাজব্যবস্থাকে আমি সমর্থন করব কেন? সুকান্তিদার গলা কেঁপে গেল। এই উৎপীড়ক ব্যবস্থাকে আমি পদাঘাত করি। মঞ্চে পা ঠুকলেন সুকান্তিদা। একবার, দু'বার তিনবার। প্রবল হাততালি পড়ল। গায়ে কাঁটা দিল পাঞ্চালী। সে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে।

দেখেই চিনতে পারলেন সুকান্তিদা। চোখের পাতায় কম্পন। চোখ উজ্জ্বল। সারা মুখ জুড়ে নির্মল হাসি। আরে, পাঞ্চালী! আমাদের মজার মেয়ে...কেমন আছ? সুকান্তিদার ডান কানে শ্রবণ-সহায়ক। ওঁর দু'হাত জড়িয়ে ধরল পাঞ্চালী। ধরে-ধরে তাকে সভার পিছনের দিকে নিয়ে এল। এদিকটা ফাঁকা, একটু এগোলেই গ্রামের পথ। ওইদিকে গেলে একান্তে কথা বলা যায়।

— সুকান্তিদা, আবার কতদিন পরে দেখা হবে...তিন দশক পেরিয়ে গেছে...ভাবিনি আর দেখা হবে। পাঞ্চালীর চোখে অশ্রু। সুকান্তিদা হাসেন। চূলে হাত বোলান। মুখের ওপর এলানো সূর্যের আভা। — পাঞ্চালী...আমরা হলাম নদীর জলে ভেসে যাওয়া দু'টি কাষ্ঠখণ্ড। কিছুদূর একসঙ্গে পরস্পরকে জেনে-ছুঁয়ে ভেসে যাওয়া। হঠাৎ স্রোতের টানে কাঠের খণ্ডদুটি দু'দিকে। আবার কখন ফিরে এসে কিছুদিন একত্রে ভাসা।

পাঞ্চালী বলল, আমার অবাক লাগছে আপনি এই বয়সে কী করে এতদূর কষ্ট করে এলেন। — না এসে পারলাম না গো। কাগজ দেখে মনে হল, এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে। আর এইখানে এসে এদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ করাটাই ভাল। কী জান...প্রতিবাদ, সংগ্রাম এমনই বস্তু, রক্তে থেকে যায়। সুকান্তিদা হাসলেন। অপরূপ দেখাল। — এক তরুণ বিজ্ঞানী বন্ধু নিয়ে এল, সেই দু'কথা বলতে বলল...। পাঞ্চালী জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর? সুকান্তিদা থামিয়ে দিলেন। — ওই দেখ, দেখ...। ডানদিকে আঙুল তুললেন।

ওধারে দৌড়ে বেড়াচ্ছে কতকগুলি কিশোর। হাতে ছোট তীরধনুক। অন্যদিকে মাটিতে পড়ে একটি গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, পাতা। বাচ্চাদের খেলা দেখতে মজা লাগে। সুকান্তিদার হাত ধরে পাঞ্চালী ওই দিকে এগিয়ে গেল। বালির বস্তার এক পাশের ছেলেগুলি হয়েছে পুলিশ। তারা মাঝে মাঝে ছোট লাঠি হাতে নিয়ে উলটো দিকে তাক করে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে গুডুম গুডুম...। ট্যা ট্যা ট্যা ট্যা ট্যা...। তীর ছুঁড়ছে। বস্তা থেকে কিছু দূরে মাটিতে পড়ে থাকা ডালপালায় আঁড়াল নিয়েছে অন্য কয়েকটি ছেলে। তারাও ওইরকম লাঠি বস্তার দিতে তাক করে মুখ দিয়ে করে চলেছে একই আওয়াজ। ওরাও তীর ছুঁড়ছে। সুকান্তিদা বললেন, কী কাণ্ড! এই বালকবয়সেই এরা যুদ্ধ শিখে নিল! পাঞ্চালী মাথা

নাড়ল, তাঁ সাভা কথা...দপকথার যুদ্ধ নয় একেবারে জঙ্গলমহলের লড়াই...

কাছে মোটেই ছেলেগুলি খেলা ছেড়ে ছুটে এল। পাঞ্চালী আর সুকান্তিদাকে ঘিরে নাড়াল ওরা। পাঞ্চালী জিজ্ঞাসা করল, কী করে তোরা নিজে নিজেই বানিয়েছিস এই খেলা? ওদের একজন হেসে বলল, হ্যাঁ। — তোমাদের তো দারুণ বুদ্ধি, সুকান্তিদা বললেন। খেলা ছাড়া আর তোমরা কী জান? গান জান? গান?

এক মিনিটের স্তব্ধতা। এ ওকে কনুই দিয়ে ঠেলছে। হঠাৎ দুটি ছেলে গান ধরল।

লালগড়ের লাল মাটি...

জাইগে উঠে বহু বিটি

পলাশ টায়ে হল সাইয়ের খেলা...

দালাল পুলিশ ইবার ছেইড়ে পালা...

একটা বাচ্চার মুখ যেন দ্রোণের মতো। তার পাশের বাচ্চাটা যেন নিরুপম। কী যে অপূর্ব গাইছে ছেলে দুটি! পাঞ্চালীর চোখে জল এসে যায়। হা-হা করে বুকের ভেতর। মুচড়ে ওঠে।

ওরা আমলাতলে জাহান নিলি

আর ছিতামণির চোখ নিলি

তদের অনেক হল ইবার খতম তদের খেলা

দালাল পুলিশ ইবার ছেইড়ে পালা....

পাঞ্চালী স্তব্ধ হয়ে গেল। সুকান্তিদাও নিরুপম কী যেন মগ্ন বুকের ভেতরে। কোলা থেকে মোড়ক দুটি বের করল পাঞ্চালী। নিরুপম আর দ্রোণের বধ্যভূমির মাটি। সুকান্তিদা তাকিয়ে রইলেন। মোড়ক থেকে মাটি বের করে মুঠোয় ভরে নিল পাঞ্চালী। সেই মাটি মাথিয়ে দেয় কিশোর গায়ক দুজনের মাথায়, মুখে, গালে। ওদের জড়িয়ে আদর করে — আমার নিরুপম, আমার দ্রোণ তোমরা ভাল তো? সমস্ত আদর অশ্রু হয়ে যায়। বাঁধ ভেঙে যায় পাঞ্চালীর।

ছেলেদুটি অবাক। লজ্জা পেয়ে ছুট লাগায়। ওদের অনুসরণ করে বাকিরাও।

ফেরার পথে মিত্রাক্ষরের সঙ্গে দেখা। আরেঃ.....তুমি এখানে? এদিকে আমরা খুঁজছি.... ও হাঁক পাড়তেই বাকি চারজন হাজির। সুকান্তিদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল পাঞ্চালী।

কী পাঞ্চালী, এরা সব তোমার আটটা-নটার সূর্য? সুকান্তিদার গলায় নির্মল কৌতুক। পাঞ্চালী হাসল। — শুধু তাই নয়, একেবারে কম্পিউটার যুগের, এই মেঘলা সময়ের সূর্য! সুকান্তিদাও হাসলেন। বেশ বলেছ। একটু থেমে বললেন, ঠিকই....এখন সময়টা খুব শক্ত....সমস্যা খুব জটিল। কয়েকমুহূর্ত পাঞ্চালীর দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন।এখনকার প্রযুক্তি বিশেষত কম্পিউটার সারা পৃথিবী জুড়ে একটাই ভাষা, একটাই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। শুধুমাত্র আমেরিকায় যা কম্পিউটার আছে তা পৃথিবীর বাকি দেশগুলির সমস্ত কম্পিউটারের চেয়ে বেশি। অন্তত ৮০ শতাংশ ওয়েবসাইটের ভাষা ইংরেজি অথচ সারা বিশ্বে দশজন মানুষের মধ্যে একজনও ওই ভাষায় কথা বলে কী না সন্দেহ। এইরকম আগ্রাসন চলতে থাকলে একবিংশ শতাব্দীর শেষে বিশ্বের ছ'হাজার ভাষার অর্ধেক লুপ্ত হয়ে যাবে। এইসব ভাষায় তখন আর কেউ কথাও বলবে না, লিখবেও

না। ভাব কত জটিল অবস্থা এখন, বললেন সুকান্তিদা।

কিন্তু কম্পিউটার কত সুবিধে করে দিয়েছে আমাদের....এইটা তো ভাবতে হবে...তাই না? অভিজ্ঞান বলল। মিত্রাক্ষর বলল, কত সহজে কমিউনিকেট করা যায় পৃথিবীর নানাপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে...। ঠিকই, লেখনী সায় দিল, কত বিভিন্ন দেশের খবর আমরা ইজিলি, এক নিমেষে পেয়ে যাই....। শৌর্যেন্দু বলল, তাছাড়া আমাদের যে কথা চলতি খবরের কাগজে ছাপে না তা আমরা নিজেদের ওয়েবসাইটে বা ব্লগে লিখে জানাতে পারি অ্যাক্সেস দ্য গ্লোব...। অনুষ্কা মাথা নাড়ল। দেখুন, এইটা ছিল বলেই তো আমরা সিন্দুর, নন্দীগ্রাম তারপর এই জঙ্গলমহলের ভিকটিমদের সাপোর্টে অন্যান্য দেশের নামী লেখক, ইন্টেলিজেন্টসিয়ার সমর্থন কত ফাস্ট পেয়ে গেছি আর তা আমাদের স্ট্রেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে...। পাঞ্চালীও শরীরভাষায় সমর্থন করল ওদের।

সুকান্তিদা আবার হাসলেন। যেন রূপকথার জ্ঞানী বৃদ্ধের হাসি। দেখ বন্ধুরা, আমার বয়স এখন বিরানব্বই। আমি এই বয়সেও কম্পিউটারের ব্যবহার শিখেছি। খুব ভাল নয় অবশ্য। তবে নিয়মিত মেল পাঠান, ওয়েবসাইট কিংবা ব্লগ পড়া, এই কাজগুলি করে থাকি.... কখনও ইউটিউবে গিয়ে গানও শুনি....।

ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ। পাঞ্চালীও হতবাক। একটু দম নিয়ে সুকান্তিদা বললেন, নিশ্চয়ই এই নতুন প্রযুক্তি....তারপর এই মোবাইল ফোন আমাদের অশেষ উপকার করেছে। কিন্তু যে কোনো বিজ্ঞানের আবিষ্কার দেশের মানুষের সুস্থতা, সমাজের গড়নের উপযোগী করে প্রয়োগ করতে হয়। তবেই তা সেই দেশের শ্রমরাজ্যের মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে তেমন কোনো উদ্যোগ তো দেখিনি, সেই চেষ্টাও দেখছি না। সুকান্তিদা দম নিতে থামেন। পাঞ্চালী আর ঝোলা থেকে জলের বোতল বের করে এগিয়ে দেয়। এক ঢোক জল খেয়ে সুকান্তিদা বলেন, দেখ তো সারা বিশ্ব জুড়ে কত রকমের মানুষ, কত রকমের ভাষা, কত রকমের সংস্কৃতি। এই বৈচিত্র্য নষ্ট করে তুমি একটি কম্পিউটার ভাষা জানা কিছু একরকমের একরঙা মানুষ বানাতে চাও? ছেলেমেয়েগুলি স্তব্ধ। পাঞ্চালী ওদের দিকে তাকাল। এইটা কিন্তু ঠিক কথা। সুকান্তিদার হাত শক্ত করে ধরল পাঞ্চালী। আন্তে-ধীরে হাঁটতে শুরু করল। ছেলেমেয়েরাও পাশে পাশে।

হঠাৎ অনুষ্কা বলল, মাওবাদীদের কাজকর্ম আপনি সমর্থন করেন না কেন? — আমার বক্তৃতায় তো কারণটা বললাম। অনুষ্কার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান সুকান্তিদা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, দেখ একটা দল যখন খেলতে নামে তখন দু'রকম খেলোয়াড় থাকে। কেউ কেউ ধৈর্য ধরে উইকেটে থেকে প্রতিপক্ষের গতিবিধি বুঝে, বিচক্ষণের মতো ব্যাট চালিয়ে রান তোলে আবার কেউ খেলতে নেমে আগুপিছু না ভেবেই ব্যাট চালাতে শুরু করে। একটু দম নেন সুকান্তিদা। — এই দ্বিতীয় ধরনের খেলোয়াড়দের দর্শন — হয় ছক্কা নয় ফক্কা। এরা অনেক হাততালি পায়, আবার সহজে আউটও হয়ে যায়। অনুষ্কার দিকে একবার কৌতুকী চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলতে থাকেন — ভেবে দেখ, যে কোনো দলের মেরুদণ্ড কিন্তু প্রথম ধরনের খেলোয়াড় ... এরাই আদতে দলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তোমার ওই মাওবাদীরা এলোপাথাড়ি ব্যাট চালানো খেলোয়াড়। সুকান্তিদা হাসেন। ওঁর বলার ভঙ্গি এমন, অনুষ্কারও না হেসে উপায় থাকে

না। তবে আটটা ঠিক, গলা খাঁকারি দেন সুকান্তিদা, দেশে যতদিন বঙ্গনা-শোষণ থাকবে, এমন কাজকর্ম দেখা দেবেই। একশো বছর আগেও এমন বিপ্লবপন্থী ছিল, যাট বছর আগেও ছিল... এখনও আছে ... মনে হয়, এখন কিছুকাল থাকবেও। আর তাছাড়া, সুকান্তিদা বলবেন, দেখে বন্ধুরা এই সমস্যার যে কী সমাধান আমি জানি না, এও স্পষ্ট নয়, কি ভাবে কোন পথে দেশের এই চূড়ান্ত অসম ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সুস্থ এক সমাজ গড়া যাবে। তবে ভেবে না হতাশ হয়ে পড়েছি...মানুষের সৃজনশীলতার ওপর বিশ্বাস চলে যায়নি আমার।তোমরাআমার আটটা-নটার সূর্যেরা...তোমরাও এই নিয়ে ভাব, নিশ্চয় সমাধান এসে যাবে....। সুকান্তিদা থামলেন। ছেলেমেয়েদের মুখেও কথা নেই।

দু-মিনিট পরে নীরবতা ভাঙেন সুকান্তিদা। — বিজ্ঞানীদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় সমাজ নিয়েও। আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বড় স্তম্ভ আলবার্ট আইনস্টাইন। এই চিন্তাবিদ বিজ্ঞানীর ভালবাসার ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র। বলতেন, ধনতন্ত্র মানুষকে স্বার্থপর করে, ব্যক্তিমানুষের অবনমন ঘটায় আর সমাজতন্ত্র মানুষকে নৈতিকতা শেখায়। তাকে যে নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জন্যও বাঁচতে হবে এই কথাটি ভাবতে শেখায়।

পাঞ্চালীর দিকে তাকালেন সুকান্তি। জান তো....সেই লেনিনের সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৯১ সালে ভেঙে টুকরো হবার পর এখন আবার ওই দেশের মানুষ জোট বাঁধতে শুরু করেছে। এই তো সাতমাস আগেই আবার রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গে নভেম্বর বিপ্লব স্মরণ করে লেনিন স্টালিনের ছবি হাতে মানুষের টল নেমেছিল।

পাঞ্চালী বলল, সুকান্তিদা আমি এখনও স্বপ্ন দেখি...

সুকান্তি বললেন, প্রত্যেক মানুষই স্বপ্ন দেখে। যারা বলে স্বপ্ন দেখে না, আসলে তারা আগের রাতের স্বপ্ন মনে রাখতে পারেন না....। একটু দম নিলেন সুকান্তি। আর কী জান...আমাদের স্বপ্ন বুলেট প্রুফ। সুকান্তির গলা কেঁপে গেল। আমিও তো প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত নতুন বিশ্বাসে বাঁচি। আমাদের বাঁচা ফুরোয় না। স্বপ্ন মরে না। পাঞ্চালী বলে, হ্যাঁ তাই তো। ঠিক কথা।

স্বপ্ন মরে না।

নির্দেশিকা

* রচনায় উদ্ধৃত কবিতা-গানের লেখক/গীতিকার/সুরকারের নাম অনেক ক্ষেত্রেই লেখায় উল্লেখ আছে।

* যে কবিতাগুলিতে লেখকের নাম নেই তার অধিকাংশই দ্রোণাচার্য ঘোষের। অবশিষ্ট কবিতা/গানের লেখক এবং সুরকারের নাম :

পৃঃ ৪২	মধুসূদন দত্ত
পৃঃ ৬২	ডায়েরির টুকরো কবিতা দ্রোণের নয়, রকের আড্ডায় শোনা।
পৃঃ ১২৭	কথা-সুর : দিলীপ বাগচী
পৃঃ ১৩৪	কথা-সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
পৃঃ ১৬৭	দু'টি গানেরই কথা-সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
পৃঃ ২২১	কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার-গায়ক : অংশুমান রায়
পৃঃ ৩০৩	লেখক
পৃঃ ৩৩১-৩২২	মস্তুর বাংলা অনুবাদক : অরিন্দম চক্রবর্তী
পৃঃ ৩৮৬	শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (জর্জ মীরজাফর গোস্বামী)
পৃঃ ৩৯১	জন হেনরি গীতিকা রূপান্তর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস
পৃঃ ৩৯১	গাজীর গান : কথা-সুর : শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (জর্জ মীরজাফর গোস্বামী)
পৃঃ ৩৯৩	‘আমরা সূর্য সেনা’ —সেদিন কিছু ছেলে এই গানটি গেয়েছিলেন। পরবর্তীতে, আশি-র দশকে নৈহাটির ‘অগ্নিবীণা’ দলটি এই গান গাইত। কথা-সুর কার? বই প্রকাশের সময় অবধি জানা যায় নি।
পৃঃ ৪১৬	লোকগীতিটি ভাগলপুর প্রবাসী বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত
পৃঃ ৪১৭	লোকগীতিটি অভিজিৎ মজুমদারের সৌজন্যে সংগৃহীত
পৃঃ ৪৫৯	লালগড়ের স্থানীয় গানটি কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত

এই গ্রন্থ রচনায় যে-বই এবং সাময়িক পত্রিকার সহায়তা

- ১) In the wake of Naxalbari. Sumanta Banerjee
- ২) Naxalbari and After a frontier anthology. Edited by Samar Sen, Debabrata Panda, Ashish Lahiri
- ৩) The Historic Turning-Point, A Liberation Anthology (Vol. 1 & 2). Edited by Suniti Kumar Ghosh
- ৪) দৃশ্যকল রায়চৌধুরী সংখ্যা (১-৩) / এবং জলার্ক
- ৫) চাক মজুমদারের কথা / সৌরেন বসু
- ৬) অক্ষরক চাক মজুমদার / সংকলক : অমিত রায়
- ৭) History of the Long March. Foreign Language Press. Peking 1958
- ৮) স্মৃতি সত্তা সংগোজ দণ্ড / সম্পাদনা, স্বপন দাসাধিকারী
- ৯) নকশালবাড়ির প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস / শান্তি পাল
- ১০) নকশালবাড়ি 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' / খোকন মজুমদার
- ১১) দাওচাওরী থেকে সত্তার এবং আগে পরে / ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী
- ১২) ফিরে দেখা / সুনীতিকুমার ঘোষ
- ১৩) সত্তার দিনগুলি (১-২) / দেবাশিস ভট্টাচার্য
- ১৪) লালগাজারে ৬৪ দিন / মলয়া ঘোষ
- ১৫) Naxalbari, Before and After. Suniti Kumar Ghosh
- ১৬) নকশালবাড়ি ২ একটি মূল্যায়ন / সুনীতিকুমার ঘোষ
- ১৭) মনিচক্রিণ : নেত্রপের অন্তরালে / জগদীশচন্দ্র মণ্ডল
- ১৮) চন্দ্র মেলায় ঠাটগুণ্ড / যোগেশচন্দ্র বাগল, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
- ১৯) জোয়ার ভাটিয় গাতি সত্তার / অমলেন্দু সেনগুপ্ত
- ২০) মুকজয়ের গান / সম্পাদনা : স্বপন দাসাধিকারী
- ২১) সত্তার শব্দ লেখক শিল্পী / সম্পাদক : স্বপন দাসাধিকারী
- ২২) নকশালবাড়ি আন্দোলনের দিনগুলি / সম্পাদনা : অর্জুন গোস্বামী
- ২৩) সত্তার দশকের কবিতা, রক্তে ভাসে স্বদেশ সময় / সম্পাদনা : পুলক চন্দ
- ২৪) দেশব্রতী সংকলন ১-১০ / এবং জলার্ক
- ২৫) চাক মজুমদার সংখ্যা ১-৯ / এবং জলার্ক
- ২৬) কারাগার বধ্যভূমি স্মৃতি কথকতা / কল্লোল
- ২৭) The Naxalites : Through the eyes of the Police. Edited by Ashoke Kumar Mukhopadhyay
- ২৮) মুক্তি কোন পথে / সম্পাদনা : অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
- ২৯) দেশব্রতী, ৬ জুলাই ১৯৬৭, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, ২৪ অক্টোবর ১৯৬৮, ১০ জুলাই ১৯৬৯, ১৭ জুলাই ১৯৬৯, ২৪ জুলাই ১৯৬৯, ২২ জানুয়ারি ১৯৭০, ৫ মার্চ ১৯৭০, ১৯ মার্চ ১৯৭০, ২ এপ্রিল ১৯৭০, ৯ এপ্রিল ১৯৭০, ১৬ এপ্রিল ১৯৭০, ২৩ এপ্রিল ১৯৭০, ১৪ জুন ১৯৭০, সেপ্টেম্বর ১৯৭০

৩০) Liberation, July 1973

৩১) কারাগারে ১৮ বছর / আজিজুল হক

৩২) সাত্র দ্যুতি গোলাপের / কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংকলনে প্রকাশিত)

৩৩) আটকের আড্ডা / কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হৃদয় পত্রিকায় প্রকাশিত)

৩৪) অবিরত লড়াই / কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খোঁজ পত্রিকায় প্রকাশিত)

৩৫) খাজনা আদায়ের কাচারি, অত্যাচার এবং বিদ্রোহের ভাস্কর্য / বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং ১৯৭০

৩৬) সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি / বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং ১৯৬৮

৩৭) চারু মজুমদার সমগ্র - আবু সালেহ সম্পাদিত

৩৮) গ্রামে চলো / স্বর্ণ মিত্র

৩৯) আজকের দেশব্রতী, বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১০

৪০) কালীমায়ের বোমা ও অন্যান্য রচনা / অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

৪১) যেখানে ডাক্তার নেই / সম্পাদনা শাহাদত চৌধুরী

৪২) দক্ষিণদেশ ও কানাই চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা / এবং জলার্ক

৪৩) প্রস্তুতি, এপ্রিল ১৯৭৪

৪৪) তুমি হবে কি বিদেশিনী / বিষ্ণু দে

৪৫) Maoist 'Spring Thunder'. Arun Prosad Mukherjee

৪৬) Left Extremist Movement in West Bengal: Amiya K Samanta

৪৭) মিসা ১৯৭৩ / শ্যামল রায়

৪৮) সরোজ দত্ত (পুস্তিকা) / ছাত্র সংগ্রাম কমিটি -

৪৯) জঙ্গল সাঁওতাল / সম্পাদনা : আশিস মৈত্র, রঞ্জন সেন, অর্ণব ঘটক

৫০) চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ / নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী

৫১) চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ (১-৩) / রেড টাইডিংস

৫২) চরিত্রানুমান বিদ্যা / পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

৫৩) মরিচকাপি, ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস / মধুময় পাল সম্পাদিত

৫৪) রাণাবঙ্কের বীর গণমুক্তি ফৌজ লাল সেলাম / ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ লেঃ)-র নদীয়া আঞ্চলিক কমিটি প্রকাশিত ইস্তাহার ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৩

৫৫) মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে কলঙ্কিত ১৫ই আগস্ট ধবংস করুন / মধ্য কলিকাতা এরিয়া কমিটি প্রকাশিত ইস্তাহার, ১৯৭৩

৫৬) Confession in an Impasse. Peking Review, No 5, 1969

৫৭) এতদিন ডাকে না-ফেলা চিঠি / অশোক মিত্র

৫৮) Reflections of a one-time Maoist activist. Sumanta Banerjee

৫৯) সমাজতন্ত্র কেন / এ্যালবার্ট আইনস্টাইন, অনুবাদ : মৃদুল দে

৬০) প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গান

৬১) রূপকথার দেশে / স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়

৬২) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন / অনুষ্টপ

৬৩) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) : একটি মূল্যায়ন / সুনীতিকুমার ঘোষ

৬৪) Undesirable Alien. Regis Debray



অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১০ এপ্রিল ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশা

জনসংযোগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক।

গত তিন-দশক ধরে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং কলকাতার সমাজচিত্র নিয়ে লিখেছেন ছ'টি গবেষণা-নির্ভর বই—টেগাটের আন্দামান ডায়েরি, প্রথম দিনের রবি, কালীমায়ের বোমা ও অন্যান্য রচনা, চেনা পাড়া অচেনা মানুষ ইত্যাদি। প্রবন্ধের জন্য পেয়েছেন আনন্দ-সোসেম পুরস্কার।

লিখেছেন উদয়শংকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী—উদয়শংকর: টোয়েন্টিয়েথ সেন্চুরি'স নটরাজ। সম্পাদনা করেছেন তিনটি বই—দ্য নকশালাইটস : থু দ্য আইজ অফ দ্য পোলিস, 'টেররিজম' আ কলোনিয়াল কন্সট্রাক্ট এবং পার্টিশন অফ বেঙ্গল (যুগ্ম সম্পাদনা)।

কিশোরদের জন্য লেখা আখ্যায়িকা 'সূর্য সেন' বহুপঠিত। কিছুকাল আগে বাংলাদেশে এর একটি সংস্করণ বেরিয়েছে।

লেখকের প্রথম উপন্যাস 'অগ্নিপুরুষ' পাঠক-সমালোচক মহলে সমাদৃত।

'আটটা-নটার সূর্য' লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস।

RED
BOOK

১৯৬৩-২০১০ সময়কালের
গটভূমিতে লেখা এই তথ্য-স্বল্প
উপন্যাস গভীরভাবে উপলব্ধি
করায় নরুশালবাড়ি আন্দোলন ও
তার গতিপথ। যেখানে চার
মজুমদার, কানু সান্যাল, সবেজ দত্ত
প্রমুখ নামী ব্যক্তিদের পাশে বহু
অন্য-অজ্ঞাত- স্বল্পজাত মানুষের
নিরব উপস্থিতি। তাদের বিশ্বাস—
'ভালোবাসা আর বিশ্ব
বিস্তার আর ভালোবাসা—
কেউ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।
বিশ্বের জন্যই ভালোবাসা
আর ভালোবাসার জন্যই বিশ্ব'।



9 788129 518976

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~